পশ্চিমবঙ্গের
পূজা-পার্বণ ও মেলা

ভারতের লোকগণনা, ১৯৬১
পশ্চিমবঙ্গ
খণ্ড ১৬, পার্ট ৭-বি

পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা

দ্বিতীয় খণ্ড

অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থনা
অরুণকুমার রায়

তত্ত্বাবধায়ক
সুকুমার সিংহ

সম্পাদক
অশোক মিত্র

- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  প্রথম খণ্ড (যন্ত্রস্থ)

- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  দ্বিতীয় খণ্ড (বর্তমান গ্রন্থ)

- পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা
  তৃতীয় খণ্ড (মুদ্রণ অপেক্ষায়)

- পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা
  চতুর্থ খণ্ড (সংকলন হইতেছে)

মানচিত্র : শ্রীসুবীর চট্টোপাধ্যায় শ্রীসত্যেন গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীজলধি দাসগুপ্ত শ্রীবিজন মজুমদার

আলোকচিত্র : শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সিংহ
মুখ্য আলোক চিত্রশিল্পী, আনন্দবাজার পত্রিকা

ডাঃ নন্দদুলাল ভট্টাচার্য
রেজিষ্ট্রার জেনরলস্ অফিস, দিল্লী

শ্রীঅরুণ কুমার রায়

রেখচিত্র : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
ও অঙ্কন : শিল্পী শ্রীজিতেন দাস
ও
শ্রীঅরুণ কুমার রায়

ভূমিকা

'পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর' থেকে পশ্চিমবঙ্গের উৎসব ও মেলা সম্পর্কে যে তালিকা তৈরী করা হয়েছিল তা প্রতিটি জেলায় পুলিশ সুপারিন্টেডেন্ট এবং জেলাবোর্ড কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে। সংগৃহীত তালিকা দুটির সমন্বয়ে কয়েকটি স্তম্ভে বিভক্ত একটি বিস্তীর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হয়। যেমন—প্রতি জেলায় থানাওয়ারী মৌজা নম্বরসহ গ্রামের নাম, স্থানীয় নামে খ্যাত উৎসব ও মেলার নাম, ইংরাজী মাসানুসারে উক্ত উৎসব ও মেলার সময়কাল, স্থায়িত্ব ও পরিশেষে লোকসমাগমের সংখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরণের তালিকা সংগ্রহের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল এ বিষয়ে একটি সার সংগ্রহ করা এবং বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশব্যাপী বিশেষ কোন উৎসব বা মেলার বিস্তৃতির চিত্র তুলে ধরা।

নানা বিরুদ্ধ কারণবশতঃ কতকগুলি চিরাচরিত ও প্রাচীন উৎসব ও মেলা আজ অবলুপ্ত হতে চলেছে। ঐ দ্রুত অপস্রয়মান উৎসব ও মেলাগুলি সম্বন্ধে এখনই স্থায়িভাবে নথী প্রস্তুত করতে না পারলে ভবিষ্যতে আর কোন দিনই সুযোগ পাওয়া যাবে না। এই প্রয়োজনে এবং পূর্ব প্রকাশিত পুস্তকটি যে জিজ্ঞাসা জাগিয়ে তুলেছিল তা লক্ষ্য করে, জনগণনা দপ্তর এ বিষয়ে আরো বিশদ অনুসন্ধান করা প্রয়োজন মনে করেন।

এই কর্তব্য সাধনে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করে কি উপায়ে বিস্তারিত প্রাথমিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে তার বিচার করা হয়। কেবলমাত্র সরকারী বা আধা সরকারী বিভিন্ন দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের উপর নির্ভর না করে প্রতিটি অঞ্চলের অধিবাসীর কাছে তথ্য সরবরাহের জন্য আবেদন জানানো প্রথম প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়। স্থির হয়, প্রথমতঃ প্রাথমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের নিকট, জেলার দৈনিক ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলির সম্পাদকের নিকট, যুব সংঘ, গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, গ্রাম ও শহরের গ্রন্থাগারগুলি, এমন কি ডাকবিভাগের পিওনদের নিকটও আবেদন জানানো হবে। প্রথমবারের তুলনায় এবারে তথ্য সংগ্রহের উপায় এইভাবে বহুলাংশে ব্যাপক করা হয়। বলাবাহুল্য, জেলাবোর্ড, পঞ্চায়েত এবং আধা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট আবেদন জানানো হবে বলে স্থির করা হয়। দ্বিতীয়ত এ বিষয়ে একটি সুপরিকল্পিত প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা একান্ত প্রয়োজন বলে বিবেচিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল কিভাবে এমন একটি প্রশ্নমালা প্রস্তুত করা যায় যা অর্থপ্রকাশে স্বয়ংসম্পূর্ণ অথচ আবেদনে পর্যাপ্ত, যার ফলে যে-কোন সংবাদদাতার সম্মুখে এই প্রশ্নমালা উপস্থিত করলে তিনি সহজেই তাঁর ভাষায় স্থানীয় তথ্যাদি সম্পর্কে বক্তব্য প্রকাশের পূর্ণ সুযোগ পাবেন।

পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে এ বিষয়ে বারবার আলাপ আলোচনা করে চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে যথেষ্ট সময় ব্যয়িত হয়।

প্রশ্নমালা প্রস্তুতকালে পরবর্তী পাতায় উল্লিখিত কয়েকটি বিষয়ের উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখা হয়।

(ক) প্রশ্নগুলির ভাষা এমন সহজবোধ্য হবে যাতে প্রাথমিক শিক্ষাজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও বুঝতে অসুবিধা না হয়। অন্যপক্ষে ঐগুলির প্রয়োগ এমন ব্যাপক রাখা দরকার যাতে সকল প্রকার তথ্য আহরণ করা যায়। সম্পাদনাকালে অপ্রাসংগিক অংশ বাদ দিয়ে বিশদ তথ্যাদি সংরক্ষণে সযত্ন হতে হবে।

(খ) প্রশ্নগুলির সমন্বয়ে যেন যে গ্রামে বা স্থানে মেলা বসে বা উৎসব পালন করা হয়, সেই গ্রামের বা স্থানের পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিকার চিত্র সুস্পষ্টভাবে আহরণ সম্ভব হয়।

(গ) পূজা বা পার্বণের যে সকল বিশিষ্ট আচার-অনুষ্ঠান বা ধর্মাচরণের মধ্য দিয়ে আঞ্চলিক বিশেষত্ব ফুটে ওঠে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের উপর যেন এই প্রশ্নমালা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

(ঘ) প্রশ্নমালার মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য এবং সুবিদিত উৎসবের বা মেলার তথ্যাদি ছাড়াও যেন স্বল্পখ্যাত অথচ গুরুত্বপুর্ণ উৎসব ও মেলার তথ্য অন্বেষণও সম্ভব হয়। জেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত উৎসবাদি ও মেলা ব্যতীতও অন্যান্য উৎসব বা মেলার বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই কারণে যে, অনুমোদিত উৎসব বা মেলার সংখ্যা সমস্ত উৎসব ও মেলার সংখ্যার তুলনায় অতি নগণ্য।

(ঙ) মেলা যে আয়তনেরই হোক না কেন প্রতিটির প্রকৃতি ও ক্রয়বিক্রয়ের আয়তন সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করতে হবে। আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে সেই অঞ্চলের গ্রামশিল্প, শিল্পের গতি ও গঠন পদ্ধতি, কাঁচা মালের গতি ইত্যাদি অনুধাবন করা সম্ভব হবে। এসব তথ্য ছাড়াও প্রশ্নমালা থেকে স্থানীয় জনপ্রিয় আমোদ-প্রমোদের একটি তালিকা পাওয়া যাবে।

চূড়ান্ত প্রশ্নমালা তৈরি করতে বেশ কয়েক মাস সময় লেগে যায়। অতঃপর প্রশ্নমালা ছাপানোর পর পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র প্রায় দশ সহস্র প্রশ্নমালা ডাকযোগে প্রেরিত হয়। এই আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে সংখ্যায় এবং সহৃদয়তায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসমাজই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। পূরণ করা প্রতিটি ফর্ম পাওয়ার পর পরীক্ষা করা হয়েছে এবং যে সব ক্ষেত্রে আরও বিশদ বিবরণের প্রয়োজন মনে হয়েছে, সে সব ক্ষেত্রে আরও পত্রালাপের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে।

প্রথমে সংগৃহীত তথ্যাদি জেলা ও থানা বরাবর পৃথক করা হয়েছে। পরীক্ষা ও সত্যাসত্য নিরূপণের পর পরে সেগুলি আবার সংকলনের সুবিধার জন্য তিনটি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। যেমন,—

(ক) প্রশ্নমালার 'ক' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে প্রথম পর্বে গ্রাম, তার অধিবাসী,

গ্রামবাসীর উপজীবিকা, যাতায়াতের ব্যবস্থা এবং গ্রামের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারাবাহিক তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(খ) প্রশ্নমালার 'খ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে দ্বিতীয় পর্বে উৎসব, দেবদেবীর পূজা, বিশেষ করে অনুষ্ঠানপদ্ধতি ও পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

(গ) প্রশ্নমালার 'গ' বিভাগের তথ্যাদির ভিত্তিতে মেলা ও সংশ্লিষ্ট আমদানিরপ্তানি, ক্রয়বিক্রয় ও আমোদ-প্রমোদ সম্পর্কে তথ্য ও বিবরণী দেওয়া হবে।

উল্লিখিত পর্ব তিনটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এই অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের সম্পূরক হিসাবে একটি বিস্তারিত সূচীপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সম্ভাব্য বিষয়ে গ্রন্থের পরিশিষ্টে বিশেষ উৎসব ও মেলা সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, গ্রন্থ ও নথীপত্র থেকে বিস্তৃত উদ্ধৃত সন্নিবেশিত হবে।

প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া সত্ত্বেও অনুসন্ধানের পরে দেখা যায় যে অনেক মেলা-পার্বণ বাদ পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কোন থানায় হয়তো মাত্র কয়েকটি উৎসব ও মেলা ছাড়া অন্য কোন উৎসব মেলার বিবরণী আসেনি। তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে, সংবাদ সংগ্রহে ফাঁক থেকে গেছে। অতএব, সারা বছরে এক একটি বিশেষ অঞ্চলে কোন কোন বিশেষ দেবদেবীর পূজাচার কিভাবে পালন করা হয় এবং সারা দেশব্যাপী ঐ সকল উৎসবাদির প্রসার সম্পর্কে সঠিক অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে ডাকযোগে দ্বিতীয়বার একটি সমীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ২

তারিখ: ১৮ই মার্চ, ১৯৫৮

সবিনয় নিবেদন,

পশ্চিমবঙ্গের সেন্সাস দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছে। সংগৃহীত তথ্যাদি সেন্সাস দপ্তর হইতে প্রকাশিতব্য একটি পুস্তকে সংকলিত করা হইবে। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ সম্পর্কে সামগ্রিক চিত্র পাইবার জন্য পমিশ্চবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামে সারা বছরে কি কি পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। আপনার ডাকঘরের/ইউনিয়নের অধীনে যে গ্রামগুলি আছে, সেগুলির প্রত্যেকটিতে সারা বছরে কি কি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা যদি আপনার ডাকঘরের/ইউনিয়নের কর্মীদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া আমাদের জানাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা একান্ত বাধিত হইব।

পর পৃষ্ঠায় আমরা পূজাপার্বণের একটি তালিকা সন্নিবিষ্ট করিতেছি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নহে এবং ইহার বহির্ভূত বহু পূজাপার্বণ পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন গ্রামে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এক একটি গ্রামে যে যে পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে যেগুলি আমাদের

প্রদত্ত এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত, সেগুলির ক্ষেত্রে সেই সেই গ্রামের নামোল্লেখ পূর্বক তালিকা অনুযায়ী পূজাপার্বণগুলির ক্রমিক সংখ্যার উল্লেখ করিলেই চলিবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি 'ক' গ্রামে 'শ্রীপঞ্চমী', 'বিশ্বকর্মা', 'নাগপঞ্চমী' পূজা বা উৎসব পালিত হয় তবে 'ক' গ্রামের নাম লিখিয়া তাহার কক্ষে ৬১।৩৯।২৯ লিখিলেই চলিবে। তালিকায় নাই, এমন পূজাপার্বণ অনুষ্ঠিত হইলে অনুগ্রহ করিয়া পরিষ্কারভাবে উহার নামটি লিখিয়া দিবেন। পূজাপার্বণের নামগুলি লিখিবার সময় প্রত্যেকটির পাশে যে মাসে উহা অনুষ্ঠিত হয় যদি তাহার উল্লেখ করিতে পারেন, তাহা হইলে খুবই ভালো হয়। একান্ত ব্যক্তিগত বা পারিবারিক এবং নিত্যনৈমিত্তিক পূজা-পার্বণগুলির উল্লেখ না করাই বাঞ্ছনীয় হইবে।

এতদ্‌সংলগ্ন পোষ্টকার্ডটিতে উক্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়া ফেরত পাঠাইলে, আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না। উত্তর লিখিবার সময় জেলা ও থানার নাম উল্লেখ করিতে ভুলিবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি গ্রামের পূজা-পার্বাণগুলি সম্পর্কে উপরিউক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে পারিলে, আমাদের এই গ্রন্থখানি পূর্ণাঙ্গ হইবে ; এবং উহার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই তথ্য সংগ্রহ সম্ভব নহে। আমরা জানি, নিজ নিজ কর্তব্যকর্মে সবিশেষ ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার এই প্রচেষ্টায় নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের এই কষ্ট ও যত্ন-স্বীকার আমরা সর্বদাই কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করিব। অনুগ্রহ করিয়া পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব, ইতি—

পূজা-পার্বণের তালিকা

১। অনন্তচতুর্দশী
২। অন্নপূর্ণা
৩। অক্ষয়তৃতীয়া
৪। অম্বুবাচী
৫। আদিবাসী উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬। ইদলফেতর
৭। ইদুজ্জোহা
৮। ইন্দ্র
৯। উত্তরায়ণ
১০। কার্তিক
১১। গঙ্গা (জাহ্নবী)
১২। খ্রীষ্টান উৎসব
(উৎসবের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
১৩। গণেশপূজা
১৪। গম্ভীরা
১৫। গন্ধেশ্বরী
১৬। গাজন
১৭। গোষ্ঠাষ্টমী
১৮। গৌরী
১৯। চড়ক
২০। চণ্ডী
২১। জগদ্ধাত্রী
২২। জুমাৎ-উল-ভিদ

২৩। ঝাঁপান
২৪। ঝুলনযাত্রা
২৫। দশহরা
২৬। দোলযাত্রা
২৭। দুর্গা
২৮। ধর্মরাজ
২৯। নাগপঞ্চমী
৩০। নারায়ণ
৩১। নীল
৩২। পদ্মা
৩৩। পীরের উৎসব
(পীরের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৩৪। পৌষ সংক্রান্তি (মকর সংক্রান্তি)
৩৫। ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম
৩৬। বারুণী
৩৭। বাসন্তী
৩৮। বিশালাক্ষ্মী
৩৯। বিশ্বকর্মা
৪০। বিষহরি
৪১। বিষ্ণু
৪২। বৈশাখী পূর্ণিমা
৪৩। ব্রহ্মা
৪৪। ভীম একাদশী
৪৫। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া
৪৬। মনসা
৪৭। মহরম
৪৮। মাঘী পূর্ণিমা
৪৯। মাঘোৎসব
৫০। রটন্তীচতুর্দশী
৫১। রথযাত্রা
৫২। রাখী পূর্ণিমা
৫৩। রামনবমী
৫৪। রাস
৫৫। লক্ষ্মী
৫৬। শনি
৫৭। শিব
(যে নামে উপাসিত, তাহার উল্লেখ করুন)
৫৮। শিবরাত্রি
৫৯। শীতলা
৬০। শ্যামা
৬১। শ্রীপঞ্চমী (সরস্বতী)
৬২। ষষ্ঠী
৬৩। সত্যনারায়ণ
৬৪। সাধুসন্তের আবির্ভাব বা তিরোধান উৎসব
(সাধুসন্তের নামোল্লেখ করিতে হইবে)
৬৫। সবেবরাৎ
৬৬। স্নানযাত্রা
৬৭। সূর্য্য
৬৮। ক্ষেত্রপাল

সংবাদদাতাদের নিকট প্রেরিত পত্রের নমুনা

পত্রসংখ্যা ১

তারিখ : ৯ই জুলাই, ১৯৫৭

সবিনয় নিবেদন,

বিগত জনগণনার (১৯৫১ সাল) কার্য্যে সমগ্র দেশবাসীর নিকট হইতে আমাদের দপ্তর যে অকুণ্ঠ সাহায্য লাভ করিয়াছে, কৃতজ্ঞতার সহিত সর্বদাই আমরা তাহা স্মরণ করি। জনগণনার

সারণী ও বিবরণী সমূহে আমরা আমাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রূপটিই তুলিয়া ধরিতে চেষ্টিত হইয়াছিলাম। এ বিষয়ে যতটুকু সাফল্য অর্জিত হইয়াছে তাহা আপনাদের সকলের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রসাদগুণেই সম্ভব হইয়াছে; যতটুকু হয় নাই তাহা আমাদেরই অক্ষমতায়। আমাদের বিভিন্ন কার্য্যে আমরা সর্বদাই আপনাদের নিকট হইতে উদার ও অকৃপণ সাহায্য ও সহযোগিতা পাইয়া থাকি; ইহা আমাদের বিশেষ সৌভাগ্য। নিজের দেশকে প্রকৃতভাবে বুঝিবার ও জানিবার জন্য আজ সকলেই যে আগ্রহান্বিত, ইহা তাহারই অভ্রান্ত পরিচয়।

১৯৫১ সালের জনগনার পরে "পশ্চিমবঙ্গের মেলা ও পরবের" একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ আসন্ন হওয়ায় সুধী ও বিদ্বৎজনেরা অনেকেই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছেন, যেন দ্বিতীয় সংস্করণে পশ্চিমবঙ্গে উপাসিত দেবদেবী এবং তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসব, মেলা ও পরবের বিশদ বর্ণনা ও বিবরণী এই পুস্তকে স্থান পায়। বলা বাহুল্য, ইহা করিতে পারিলে পুস্তকখানির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বর্ধিত হইবে, এবং সুধী ও বিদ্বৎ সমাজে এবং সাধারণভাবে দেশবাসীর নিকট ইহা সমাদৃত হইবে। একান্ত প্রয়োজনীয় এই দায়িত্ব পালনে আমরা ব্রতী হইয়াছি। এতদ্‌সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি এই উদ্দেশ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে।

এই দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে হইলে বিপুল তথ্যরাজি সংগ্রহ আবশ্যক। বলা বাহুল্য, সরকারের পক্ষ হইতে নিযুক্ত কর্মচারী মারফৎ তাহা সম্ভব নয়। কারণ, সত্যনিষ্ঠার সহিত এই ধরণের তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য স্থানীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার একান্ত প্রয়োজন; ইহা ছাড়া প্রয়োজন স্ব স্ব গ্রাম ও অঞ্চল সম্পর্কে প্রগাঢ় মমতা ও একাত্মবোধ এবং তাহার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতনতা। এগুলির অভাবে সংগৃহীত তথ্য কোন ক্রমেই সম্পূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না। আমাদের বিচারে, সত্যনিষ্ঠ এই তথ্যসংগ্রহ শুধু মাত্র আপনাদের মত ব্যক্তিরাই করিতে পারেন। আমরা জানি, নিজের দেশের প্রকৃত রূপ ও বৈশিষ্ট্য সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিবার কাজে নানারকম কষ্ট স্বীকার করিয়াও বিনা পারিশ্রমিকে আপনারা এই দায়িত্ব গ্রহণ করিতে বিমুখ নন। আপনাদের কাছে আমরা যে নিষ্ঠা, সততা ও পূর্ণাঙ্গ বিবরণী আশা করি, তাহা অল্প সময়ের জন্য স্বল্প বেতনে নিযুক্ত কর্মচারীদের নিকট হইতে আশা করা যায় না।

আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি সংলগ্ন প্রশ্নপত্রটি যথাসাধ্য পূরণ করিয়া ফেরত পাঠান, তবে এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নগুলি ছাড়াও আপনি যদি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অন্যান্য তথ্য যোগ করেন, তাহার জন্য বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিব। এক দফায় সম্ভব না হইলে, দুই তিন দফাতেও তথ্য প্রেরণ করিতে পারেন। সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নপত্রগুলি পাঠাইবেন, তাহা হইলে আপনাকে ডাক মাশুল দিতে হইবে না।

আপনার সংগৃহীত তথ্য পুস্তকে সন্নিহিত করিবার সময় আমরা আপনার নাম ঠিকানা প্রকাশ করিয়া ঋণ স্বীকার করিব। আশা করি আপনার আপত্তি হইবে না। অনুগ্রহপূর্বক পত্রপ্রাপ্তির পক্ষকালের মধ্যে উত্তর পাঠাইলে বাধিত হইব, ইতি—

প্রশ্নমালার উত্তর প্রসঙ্গে

১। উত্তর লিখিতে শুরু করিবার আগে প্রশ্নমালাটি আগাগোড়া একবার পড়িয়া নিলে ভালো হয়।

২। প্রত্যেকটি প্রশ্নের ডান দিকের খালি অংশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া কালিতে উত্তর লিখিতে হইবে। যে সব প্রশ্নে কিংবদন্তী, ইতিহাস, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিস্তৃত উত্তর চাওয়া হইয়াছে স্বভাবতঃই ডানদিকের খালি অংশে সেইগুলির উত্তরের স্থান সংকুলান হইবে না। সেই কারণে প্রশ্নমালার শেষে ৪, ৫ ও ৬ নং পৃষ্ঠা খালি রাখা হইয়াছে। প্রশ্নসংখ্যার উল্লেখপূর্বক এই প্রশ্নগুলির উত্তর এই তিনটি পৃষ্ঠাতে লেখাই যুক্তিসঙ্গত হইবে। প্রয়োজন হইলে সমান মাপের সাদা কাগজ যুক্ত করিয়া পৃষ্ঠা সংখ্যা বৃদ্ধি করাও চলিবে।

৩। আমরা আশা করি উত্তরদাতারা সকলেই সমস্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার জন্য চেষ্টিত হইবেন। উত্তরগুলি যাহাতে সত্যনিষ্ঠ এবং যথাযথ হয় সে দিকে বিশেষ ভাবে সজাগ থাকিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

৪। কোন কারণে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর না হইলে, উত্তরদাতাদের নিকট হইতে আমরা অন্ততঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নসংখ্যাগুলির উত্তর অবশ্যই আশা করিব :

২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০, ১১, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭ ও ১৮।

৫। উত্তর সংগ্রহ কাজ সম্পন্ন করিতে স্বভাবতঃই কিছু সময় লাগিবে। আমরা আশা করি প্রশ্নমালা পাইবার পর অনধিক পক্ষকালের মধ্যে উত্তরগুলি লিখিয়া এটি ফেরৎ পাঠানো সম্ভব হইবে। মুদ্রিত প্রশ্নমালার বাহিরে প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি থাকিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। উৎসব, পার্বণ বা মেলার প্রত্যক্ষ বিবরণীসমূহ একদফায় সম্ভব না হইলে দুই তিন দফায় পাঠানো চলিবে। প্রশ্নমালাটি যত্ন করিয়া রাখিতে অনুরোধ করা যাইতেছে ; কারণ ময়লা হইলে বা ছিঁড়িয়া যাইলে উহা হইতে উত্তরের পাঠোদ্ধার ও সংকলন খুবই দুরূহ হইবে।

৬। উত্তর লেখা শেষ হইলে সংলগ্ন খামটিতে উত্তরসহ প্রশ্নমালাটি ফেরত পাঠাইতে হইবে। খামে সেন্সাস অফিসের ঠিকান ও ডাক মাশুল দেওয়া আছে।

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব পার্বণ ও মেলা

প্রশ্নমালা

গ্রামের নাম :

মৌজা :

থানা :

জেলা :

ক। গ্রাম বিবরণী :

১। গ্রামের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী জড়িত থাকিলে তাহার বিবরণী দিন।

২। গ্রামে কোন কোন জাতির বাস? কতোগুলি পাড়া আছে? ঘর বা জনসংখ্যা হিসাবে পাড়াগুলিকে ক্রমিকভাবে উল্লেখ করুন। প্রধান উপজীবিকা কি কি?

৩। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ কি? নিকটবর্তী রেলস্টেশন, মোটর ও নৌকা চলাচল ব্যবস্থার উল্লেখ করুন।

খ। পূজাপার্বণ ও উৎসবের বিবরণী :

৪। উৎসবের নাম, উপলক্ষ ও সময়কাল :

৫। কতোকালের প্রাচীন উৎসব? কোনো ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার বিবরণী দিন। উৎসবটি কি নির্দিষ্ট গ্রাম ও এলাকা বা জাতি ও শ্রেণীর নিজস্ব বিশেষ উৎসব? না, সমগ্র জেলা বা অঞ্চলের সার্বজনীন উৎসব?

৬। দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে হইলে, দেবদেবীর নাম ও মূর্তির বর্ণনা (ধ্যান জানা থাকিলে ধ্যান উদ্ধৃত করুন) : গ্রামের সাধারণের দেবদেবী, না ব্যক্তিবিশেষের দেবদেবী? মন্দির বা স্থান আছে? থাকিলে তাহার মোটামুটি বর্ণনা। মূর্তি না থাকিলে উপাস্য দেবদেবীর স্বরূপ কি? শক্তি হইলে তাঁহার ভৈরব কে, এবং কাছেপিঠে তাঁহার স্থান কোথায়? শিব হইলে তাঁহার প্রকাশ কি? গ্রামে কয়টি পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা, প্রভৃতি আছেন।

৭। উৎসবের উপলক্ষ কি কোনো সাধুসন্ত বা পীরের আবির্ভাব বা তিরোধান? সাধু বা পীরের জীবনী, ধর্মপ্রচার, তাঁহার সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী বা ইতিহাসের বিবরণী দিন।

৮। পূজা বা উৎসব কবে হইতে শুরু হয়, কতোদিন ধরিয়া চলে? উহার প্রস্তুতি করে হইতে শুরু হয়—প্রস্তুতির মধ্যে কোনো বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহার উল্লেখ করুন। প্রত্যেক দিনের পূজা বা উৎসব পদ্ধতির ধারাবাহিক বিবরণী দিন। সমগ্র পূজা বা উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? সার্বজনীন ভোজ, অন্নসত্র বা প্রসাদ বিতরণ প্রভৃতির আয়োজন হয় কি?

৯। মানত দেওয়া হইলে সাধারণতঃ কি কি মানত দেওয়া হয়? বলি দেওয়া হইলে কি কি পশুপাখি বলি দেওয়া হয়? কি ভাবে এবং উৎসবের কোন সময়ে বলি দেওয়া হয়?

১০। পূজা বা উৎসবের প্রধান সেবায়েত বা ভক্ত কোন সম্প্রদায় বা জাতির লোক? পূজারীর বর্ণ, গোত্র ও পদবী কি?

১১। হিন্দু দেবদেবীর পূজা হইলে অহিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? অহিন্দু উৎসব হইলে হিন্দুরা অংশ গ্রহণ করে? মোটামুটি সংখ্যা কতো?

১২। পূজা বা উৎসব উপলক্ষে কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধুসন্ন্যাসীর আগমন হয়? কারণ কি?

গ। মেলা বিবরণী:

১৩। মেলা বসে কোথায়? কয় বিঘা জমিতে বসে? কাহার জমি—জমিদারের না উপাস্য দেবতার? দান, তোলা, প্রভৃতি আদায় করা হয়? মেলা সকালে বসে না বিকালে বসে? নির্দিষ্ট এই স্থানটিতে মেলা বসিবার কারণ কি?

১৪। কতোদিনের প্রাচীন মেলা? কতোদিন ধরিয়া চলে? কতো লোক আসে? প্রধানতঃ কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের লোক আসে? আশেপাশের কোন কোন গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে লোক আসে? সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী কোথা হইতে এবং কতো আসে? পুরুষ ও নারীর মোটামুটি সংখ্যা কতো? যাত্রীরা প্রধানতঃ কি কি যানবাহনে আসে?

১৫। মেলায় জিনিসপত্র বিক্রেতারা প্রধানতঃ কোন কোন স্থান হইতে আসে? তাহারা কি প্রতি বৎসরই আসে? কি কি জিনিস বেশি আসে?

১৬। মেলায় কতোগুলি দোকানপাট বসে? খোলা জায়গায় কতো লোক বসে? ফেরিওলার সংখ্যা কতো?

১৭। সমস্ত দোকানপাট ও ফেরিওলার মধ্যে কতোগুলি:

(ক) খাবারের দোকান—ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার।

(খ) বাসনকোসনের দোকান—তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ, মাটি, ইত্যাদি।

(গ) মনিহারী দোকান-লণ্ঠন, টর্চলাইট, আয়না, চিরুনি, অন্যান্য রকমারী জিনিসপত্র।

(ঘ) ঔষধপত্রের দোকান—কবিরাজি, হাকিমী, টোট্‌কা, প্রভৃতি।

(ঙ) বই, ছবি, পুস্তিকা প্রভৃতির দোকান—কি ধরণের বই, ছবি ও পুস্তিকার প্রচলন বেশি?

(চ) কাপড়চোপড়ের দোকান—মিল, তাঁত, কাটাকাপড়, লুঙ্গি, গামছা, সতরঞ্চ, তৈরী পোষাক, ইত্যাদি।

(ছ) কৃষি বা কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান—কি কি যন্ত্রপাতি? গরু, মহিষ, ছাগল, প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয় হয় কি?

(জ) শিল্পসামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান—তাঁতের তৈরী জিনিসপত্র, বেত, চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলো, মাটির পুতুল বা হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, পাত্র, বাঁশের জিনিস, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য জিনিস-পত্র। এগুলি প্রধানতঃ কোন কোন অঞ্চলের বা গ্রামের? ইহারা কি প্রতি বছরই আসে?

(ঝ) অন্যান্য দোকান।

১৮। মেলায় আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা কি? খেলাধূলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, জলসা,

ইত্যাদির বিবরণী দিন। যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও অন্যান্য গান-বাজনার বিষয়বস্তু কি? কাহাদের দল, কোথা হইতে আসে? গ্রামের কোনো নিজস্ব দল আছে? অধিকারীর নাম ও ঠিকানা। পালা বা গান সংগ্রহ করিয়া পাঠানো সম্ভব? প্রতিবার কি একই লোক আসে? কতো লোক দেখে বা শোনে?

১৯। উৎসব উপলক্ষে মাদকদ্রব্য পান কি কোনো প্রয়োজনীয় ধর্মাচার?

২০। অন্যান্য মন্তব্য।

অশোক মিত্র

ভারতের রেজিষ্ট্রার জেনরল

প্রাসঙ্গিকী

বাঙালীর সমাজ জীবনে পূজা-পার্বণ ও মেলার যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। বর্তমান গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জিলার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ধর্মের ও সম্প্রদায়ের পূজা-পার্বণ ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলা সম্পর্কে সন্নিবেশিত তথ্য থেকে দেখা যাবে যে ঐ উৎসবগুলির মধ্যে যেমন কতকগুলি সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি প্রচুর বৈসাদৃশ্যও আছে। সামগ্রিকভাবে পশ্চিম বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, সভ্যতা, আচার ও অনুষ্ঠান সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন বলে মনে না হলেও, এর এক বৈশিষ্ট ও মৌলিকত্ব আছে। আবার পশ্চিম বাংলার পটভূমিকায় আলোচ্যমান জেলাচতুষ্টয়ের বিভিন্ন পূজা-পার্বণ ও মেলার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন ঐক্যসূত্র যেমন দেখতে পাওয়া যাবে, তেমনি দেখা যাবে একাধিক বৈচিত্র। আহৃত তথ্যের ভিত্তিতে বৈদিক সংস্কৃতি, আর্য সভ্যতা, উপজাতীয় বিশ্বাস, মুসলমানী যুগের কৃষ্টি, প্রতীচ্যের ভাবাদর্শ, গ্রামীণ মূল্যবোধ এবং নগর জীবনের প্রভাব বিভিন্ন স্থানের উৎসব-পার্বণ ও মেলার মৌলিক আদিরূপকে কতটা পরিবর্তিত করতে পেরেছে, সে বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক অনুসন্ধানের ভিত্তিতে মন্তব্য করার প্রয়োজন আছে।

ম্যাক্‌ডোনেল ও কীথ প্রণীত নাম ও বিষয়ের বৈদিক সূচীপত্রে উল্লিখিত 'সমন' শব্দটির ঋগ্বেদীয় প্রয়োগ দ্ব্যর্থক বলে মনে করা হয়েছে। পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকে কথাটির অর্থ যুদ্ধ, আবার অনেকে উৎসব বলে মনে করেন। মতান্তরে, আপামর জনসাধারণের আনন্দ-উৎসবাদিই 'সমন' শব্দটির যথাযথ অর্থ। বিভিন্ন উৎসবের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরা যেতে পারে। দেখা যায়, উৎসবে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে আমোদ-প্রমোদানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন। যশোলিপ্সু কবিরা প্রশংসা পাবার জন্যে উপস্থিত হতেন, পারিতোষিক লাভ করার প্রয়াসে খ্যাতনামা ধনুর্ধররা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন এবং ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রখ্যাত অশ্বারোহীরা সমবেত হতেন। এ ছাড়া, অবিবাহিতা তরুণী ও যুবতী নারী উৎসবের মধ্যে মনোমত পতিনির্বাচনের সুযোগ পেতেন। অন্যদিকে, প্রভূত অর্থ উপার্জনের এই সুবর্ণসুযোগ বারাঙ্গনাকুল সহজে হারাতেন না।

প্রাচীন ধর্মসাহিত্য ও পৌরাণিক গ্রন্থে বর্ণিত উৎসবগুলির ভিত্তিমূল আপাতদৃষ্টিতে বহু ক্ষেত্রে ধর্মীয় বলে মনে হলেও ধর্মাচারের মধ্যেই সেগুলি সীমাবদ্ধ ছিল না। প্রতিটি উৎসবেই ধর্মাচারের সঙ্গে আনন্দানুষ্ঠানের এবং আনন্দানুষ্ঠানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদানপ্রদানের এবং ভাববিনিময়ের এক নিবিড় যোগ ছিল। বিভিন্ন দেবদেবীর পূজায় অথবা কোন নৃপতির অভিষেক ক্রিয়ায় ধর্মীয় আচার এবং আনন্দানুষ্ঠান সমাজ জীবনে প্রতিটি মানুষকে একদিকে যেমন প্রাণচঞ্চল

করে তুলত, অপরদিকে তেমনি বিভিন্ন ঋতুতে অনুষ্ঠিত উৎসবে সর্বসাধারণের আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠত। কোন উৎসবই একক ব্যক্তি-কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান ছিল না। ব্যক্তিবিশেষের উৎসবও সকলের উপস্থিতিতে সামাজিক অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হত। সর্বজনীন অনুষ্ঠানগুলিতে গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের যুগ্ম সত্তার ও ভাবাবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটত। আচারঅনুষ্ঠানের এবং ক্রিয়াকর্মের বিষয়ে কোন বিশেষ ব্যক্তির মতামত ভিন্নরূপ হলেও, যৌথভাবে সম্প্রদায়ের বা গোষ্ঠীর আচরণের কোন তারতম্য হত না।

বর্তমানে পূজা-পার্বণের প্রকৃতির এবং অংশগ্রহণকারী জনসাধারণের বৃত্তি, শিক্ষা, সমাজ এবং অর্থনীতি যত পরিবর্তিতই হোক না কেন, প্রাচীনকালের পূজা-পার্বণ ও উৎসবের সংগে যে এর যোগসূত্র এখনও ছিন্ন হয়নি বর্তমান গ্রন্থের তথ্যে তার সম্যক প্রমাণ পাওয়া যাবে। গ্রন্থে অনেক উৎসব স্থানীয় মানুষের ধর্ম, লোকাচার ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে উদ্‌যাপিত হয় সন্দেহ নেই ; কিন্তু লোকায়ত এই ধর্ম, আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে সনাতন ধর্ম, ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের কোন মিল নেই একথা বলা চলে না। উদাহরণ হিসাবে বিভিন্ন ব্রত ও পার্বণের অনুষ্ঠানে উপবাসের ভূমিকার বৈশিষ্ট লক্ষনীয়। আহার্য ও পানীয় গ্রহণ না করে উপবাস পালন করার নীতি ধর্মশাস্ত্রে যেমন নির্দেশিত হয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে পরিমাণ ও গুণানুসারে নিয়ন্ত্রিত স্বল্প পথ্যগ্রহণের রীতিও উপবাসের অঙ্গীভূত বলে স্বীকার করা হয়েছে। দর্শপূর্ণমাস-ইষ্টিদিবসে ব্রতপালনের তিনটি পথের উল্লেখ করে তৈত্তিরীয় সংহিতায় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—যদ্‌গ্রাম্যানুপবসতি তেন গ্রাম্যানবরুন্ধে যদারণ্যস্যাশনাতি তেনারণ্যান্ যদানাশ্চানুপবসেৎ পিতৃদেবত্যঃ স্যাৎ। উপবাসের মুখ্য লক্ষ্য গৌতমধর্মসূত্র অনুসারে ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংযম বলে হরদত্ত ব্যাখ্যা করেছেন। উপবাসের দ্বারা যে বিভিন্ন পাপের প্রায়শ্চিত্ত ও মুক্তি সম্ভব তার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে একাধিক উল্লেখ আছে। পরাশর-মাধবীয় গ্রন্থে দক্ষের এক উদ্ধৃতি অনুসারে উপবাস মাহাত্ম্যের প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায় (অয়নে বিষুবে চৈব চন্দ্র সূর্যগ্রহে তথা। অহোরাত্রোষিতঃ স্নাত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥)। বিভিন্ন বর্ণের মানুষ তো বটেই, এমন কি ম্লেচ্ছগণও যে উপবাসকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন মহাভারতের অনুশাসন পর্বে (১৬৬,১) তার প্রমাণ পাওয়া যায়। পাপমুক্তির উপায় হিসাবে উপবাসের এই ভূমিকা সকল ধর্মেই স্বীকৃত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ, খৃষ্টানদের লেণ্ট উৎসব ও মুসলমানগণের রমজান পরবের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। পাপহারকরূপে উপবাসের ভূমিকার কথা অবহিত হয়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পূজা-পার্বণের মধ্যে উপবাসপালনের উপযুক্ত উপলক্ষ খুঁজে পেলেন। সর্বভারতীয়, সর্বকালীন, সর্বধর্মীয় এই অনুশাসন জনসাধারণ এখনও সমান নিষ্ঠার সংগে পালন করে চলেছেন।

ধর্মানুষ্ঠানের অন্যতম উদ্দেশ্য যদি পুণ্যার্জন হয় এবং উৎসবকে কেন্দ্র করে উপবাসকে যদি প্রাচীন কালের সমাজের মানুষ পুণ্যার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করে থাকেন, তাহলে তার সঙ্গে পুণ্যস্থান দর্শন বা তীর্থযাত্রাকেও পুণ্যসঞ্চয়ের অন্যতম পন্থা হিসাবে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ সমানভাবেই স্বীকার করেছেন। নৈসর্গিক সৌন্দর্য, কোন পুণ্যতোয়া স্রোতস্বিনী অথবা জলাশয়, দেবতাদের আবাসস্থলস্বরূপ

পর্বতমালা, একাধিক নদীর মিলনস্থান, অথবা অলৌকিক বিভূতিসম্পন্ন সাধু বা ঋষির বসবাসের জন্য যে কোনো স্থান পবিত্রতা অর্জন করতে পারে এবং তীর্থের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। ব্রহ্মপুরাণে তীর্থের চারটি শ্রেণীবিভাগ বর্ণিত আছে—যেমন, দৈব (দেবতাসৃষ্ট), আসুর (অসুর সম্পর্কিত), আর্ষ (ঋষি প্রতিষ্ঠিত) এবং মানুষ (নৃপতিবর্গ প্রবর্তিত)। আলোচ্যমান গ্রন্থের তীর্থ ও পবিত্র স্থানগুলির ক্ষেত্রে কতদূর এই শ্রেণীবিভাগ প্রযোজ্য, তা বিশ্লেষণ করে দেখার উপযুক্ত বিষয়। যে শ্রেণীরই হোক না কেন, আজও ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার চারটি জেলার মানুষের আচরণকে যে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমানভাবে প্রভাবিত করেছে, তা অস্বীকার করা যায় না।

উপাসিত দেবদেবীবিষয়ক তথ্যাদি হ'তে দেখা যাবে যে প্রকৃতির বিভিন্ন রূপজ লৌকিক দেবদেবী, গ্রাম্য দেবদেবী, আধিব্যাধি-নিয়ামক দেবদেবী, অবতাররূপে স্বীকৃত সাধুসন্ত, অনিষ্টকারী প্রেতাত্মা ও আধিভৌতিক অলৌকিক শক্তি, বৃক্ষ, সর্প ও প্রাণী উপাসনার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। এ ছাড়াও গ্রামের বিভিন্ন লৌকিক উৎসব-অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন ঋতুতে অনুষ্ঠিত উৎসবের সঙ্গে ধর্মীয় সংস্কার ও ধর্মবহির্ভূত বিশ্বাস জড়িয়ে আছে।

দৈনন্দিন বাজার, অর্ধসাপ্তাহিক বা সাপ্তাহিক হাট যদি গ্রামীণ জীবনের নিত্যদিনের প্রয়োজনমাফিক পণ্য ও ভোগ্যবস্তুর চাহিদা মেটাতে কোন বিশেষস্থানে নিয়মিত বসে, মেলা বসে সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। কোন উৎসব বা অনুষ্ঠানে জনসাধারণের নিত্যপ্রয়োজন মেটানর তাগিদ মেলায় আগত বিক্রেতা ও ব্যবসায়ীবৃন্দের যতটা না দেখা যায়, তার থেকে বেশী প্রয়োজন দেখা দেয় গ্রামীণ সমাজের সঙ্গে এক বিশেষ ধাঁচের শিল্পজাত দ্রব্যের পরিচয় স্থাপনের। বৃহত্তর অঞ্চলের অধিকতর ব্যাপক আকারের ক্রয়বিক্রয়ের কেন্দ্রীয়করণই যেন মেলার উদ্দেশ্য বলে মনে হয়। স্বভাবতঃই, লাভলোকসানের খতিয়ানটা সেখানে তত বড় করে কেউ দেখেনা। মেলার অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে সামাজিক দিকটাও জড়িয়ে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে মেলা বসে বটে, কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাইরে থাকে মেলার প্রাণকেন্দ্র। তাই, জনসাধারণের মেলামেশা ও ভাববিনিময় হয়ে ওঠে কিছুটা অবাধ, প্রাণচঞ্চল ও আনন্দময়। সেখানে জাতি, ধর্ম ও ভাষার কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে। যে মেলায় যত বেশী লোকসমাগম, সেই মেলার জৌলুষ, স্থায়িত্ব ও আনন্দও তত বেশী। আলোচ্যমান গ্রন্থে এই ধরণের কয়েকটি বড় মেলার প্রসিদ্ধি চারটি জেলার মধ্যে বা বাংলাদেশের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সর্বভারতীয় পরিসরে ছড়িয়ে পড়েছে।

২

গ্রন্থের তথ্য আহরণের ও প্রণয়নের কাজে নানাভাবে সাহায্য একাধিক ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে সাহায্যকারী সংবাদদাতাদের নাম ও ঠিকানা যথাস্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোকচিত্র দিয়ে সাহায্য করেছেন আনন্দবাজার পত্রিকার মুখ্য আলোক চিত্রশিল্পী শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সিংহ, রেজিষ্ট্রার জেনরলের অফিসের ডক্টর নন্দদুলাল ভট্টাচার্য, নদীয়া

জেলার শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায় এবং ভারত সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়। বেলুড় মঠ ও বিবেকানন্দ সমাধিমন্দিরের চিত্র দুইটি বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে ইউনাইটেড স্টেট্‌স ইনফর্মেশন সার্ভিসেস্ কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। শ্রীরাম চন্দ্র ভড় অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিশেষ দায়িত্ব নিয়ে গ্রন্থটির মুদ্রণের কাজ পরিচালনা করেছেন। শ্রীমতী উমারানী সেন সংকলন, গ্রন্থণা ও প্রুফ সংশোধন কাজে সাহায্য এবং পরিশিষ্ট 'খ'-এর স্থানসূচী প্রস্তুত করেছেন। বিনা পারিশ্রমিকে পূজাপার্বণের রেখচিত্র এঁকে দিয়ে শিল্পী শ্রীজিতেন দাস আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা ও পুস্তক দিয়ে সাহায্য করে জীবন মিলন লাইব্রেরী ও রেনবো ক্লাব এবং মদন মোহন লাইব্রেরী আমাদের বিশেষভাবে উপকৃত করেছেন।

অনুসন্ধান, সংকলন ও গ্রন্থণায় পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দফতরের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅরুণ কুমার রায় দীর্ঘদিন ধরে অভিনিবেশের সঙ্গে যে গবেষণামূলক অনুসন্ধান-কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, বর্তমান গ্রন্থের বহুক্ষেত্রে তার চিরস্থায়ী ছাপ রয়েছে। বহুস্থানে শীত, গ্রীষ্ম বা বর্ষা যে কোন ঋতুতে ব্যক্তিগত অসুবিধার কথা গ্রাহ্য না করে শ্রীরায় যেভাবে কর্তব্য সাধন করেছেন, তাতে তত্ত্বাবধানের কাজে আমি ব্যক্তিগতভাবে উৎসাহিত বোধ করেছি।

মুদ্রণের জন্য ঘনশ্ প্রেসের সত্ত্বাধিকারী শ্রীতিনকড়ি দারিক ও তাঁর মুদ্রনালয়ের কর্মীবৃন্দ আমাদের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত রেখচিত্র এবং ছবির ব্লকগুলি আর্ট এনগ্রেভার্স, কলিকাতা, প্রস্তুত করেছেন।

সম্পাদক শ্রীঅশোক মিত্র, আই. সি. এস্. বর্তমান গ্রন্থটির প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজে তত্ত্বাবধানের সর্বময় কর্তৃত্ব আমার হাতে দেওয়াতে, আমি তাঁর কাছে বিশেষভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ। যে দায়িত্ব ও কর্তব্যভার তিনি আমাকে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন, তার যথাযথ মূল্য আমি দিতে পেরেছি কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।

গভীর আগ্রহ ও সৎ চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটির কোন স্থানে যদি কোন ত্রুটি বা প্রমাদ থাকে, তার জন্য তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে ত্রুটি একান্ত আমারই।

আদমসুমারী দফতর,
পশ্চিমবঙ্গ।

সুকুমার সিংহ
অফিসর অন স্পেশ্যাল ডিউটি

সংকলন ও গ্রন্থণা প্রসঙ্গে

১৯৫৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গ জনগণনা দপ্তর হইতে পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া একটি গ্রন্থ সম্পাদনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এই বিষয়ে তথ্যাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের শেষার্ধ হইতে ১৯৬০ সালের প্রথমার্ধ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলায় বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রায় দশ সহস্র মুদ্রিত প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে তথ্যাদি সম্বলিত প্রায় তিন সহস্র প্রশ্নমালা আমাদের নিকট ফেরত আসে। পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত এই বিপুল তথ্যরাজী একটি মাত্র গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব না হওয়ায় উহা চারিটি খণ্ডে প্রকাশ করিতে মনস্থ করা হয়। বর্তমান গ্রন্থটি উহার দ্বিতীয় খণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। প্রথম খণ্ডটিতে মালদহ, পশ্চিম দিনাজপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলার পূজা-পার্বণের তথ্যাবলী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং আলোচ্য দ্বিতীয় খণ্ডটিতে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জেলার পূজা-পার্বণের তথ্যাবলী সন্নিবেশিত করা হইল। উল্লিখিত চারিটি জেলার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭৫৯টি, নদীয়া জেলায় ৬৮৪টি, হাওড়া জেলায় ৭২৩টি এবং হুগলী জেলায় ৩১০টি অর্থাৎ মোট ২,৪৮৬টি প্রশ্নমালা প্রেরণ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে মোট ৬৯০টি প্রশ্নমালা আমাদের হস্তগত হয়। উহার ১৯টিতে কোন তথ্যাদি ছিল না এবং ১০৬টি প্রশ্নমালার অসম্পূর্ণ তথ্যাদি গ্রন্থে ব্যবহার করা সম্ভব হয় নাই। ফলে অবশিষ্ট মোট ৫৬৫টি প্রশ্নমালা হইতে মুর্শিদাবাদ জেলার ২০৩টি গ্রামের, নদীয়া জেলার ১১৫টি গ্রামের, হাওড়া জেলার ৯৬টি গ্রামের এবং হুগলী জেলার ১৬৪টি গ্রামের অর্থাৎ মোট ৫৭৮টি গ্রামের পূজা-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত তথ্যাদি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

পরিশিষ্ট 'ক'-এ প্রদত্ত মেলা সারণিটি প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্য ও বর্তমান সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যের সমন্বয়ে প্রস্তুত। এই মেলা সারণিতে মুর্শিদাবাদ জেলার ২৭৩টি, নদীয়া জেলার ১৩৭টি, হাওড়া জেলার ১৬৪টি এবং হুগলী জেলার ১৫১টি অর্থাৎ চারিটি জেলার মোট ৭২৫ টি মেলার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। উহার মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার ১৩৫টি, নদীয়া জেলার ৯১টি, হাওড়া জেলার ৮০টি এবং হুগলী জেলার ১১১টি—মোট ৪১৭টি মেলার বিস্তারিত বিবরণী দেওয়া হইয়াছে।

সম্পাদনার সুবিধার জন্য বিভিন্ন সূত্রে সংগৃহীত তথ্যাদি 'গ্রাম বিবরণী', 'উৎসব বিবরণী' ও 'মেলা বিবরণী'—এই তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হইয়াছে।

গ্রাম বিবরণী অধ্যায়ে প্রদত্ত গ্রামগুলিকে প্রতি জেলার থানা ভিত্তিতে ক্রমিক মৌজা নম্বর অনুসারে সাজানো হইয়াছে। যেক্ষেত্রে গ্রামের নাম মৌজার নাম হইতে ভিন্ন, কেবলমাত্র সেক্ষেত্রে মৌজার নামটি বন্ধনীর মধ্যে উল্লেখ করা হইয়াছে। গ্রামের সহিত প্রদত্ত প্রথম স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মৌজা নম্বর, দ্বিতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি বর্গ মাইলে গ্রামের আয়তন, তৃতীয় স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামে বসবাসকারী মোট পরিবারের সংখ্যা এবং চতুর্থ স্তবকের সংখ্যাগুলি গ্রামের মোট লোকসংখ্যা বুঝিতে হইবে। উদ্ধৃত পরিসংখ্যানটি ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে প্রাপ্ত।

এই অধ্যায়ে 'ক' হইতে 'চ' পর্যন্ত ছয়টি স্তম্ভে গ্রাম সম্পর্কে নানা তথ্য-বিবরণী পরিবেশিত হইয়াছে। উহার (ক)-এ গ্রামে যে-সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের বাস ও মোট পাড়ার সংখ্যা, (খ)-এ গ্রামবাসীর প্রধান উপজীবিকা, (গ)-এ গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশনসহ যাতায়াতের ব্যবস্থা, (ঘ)-এ গ্রামে সারা বৎসরে অনুষ্ঠিত যাবতীয় পূজা-পার্বণাদি, (ঙ)-এ গ্রামে অনুষ্ঠিত মেলার উপলক্ষ, সময়, স্থায়িত্ব ও প্রাচীনত্ব এবং (চ)-এ গ্রাম্য দেবদেবী ও পূজার নির্দিষ্ট স্থান, মন্দির, মসজিদ-দরগাহ এবং পরিশেষে গ্রামের নামকরণ ও গ্রাম সম্পর্কে কোন ইতিহাস বা কিংবদন্তী থাকিলে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রতিটি গ্রাম বিবরণীর শেষে সংবাদদাতার নাম, পেশা ও ঠিকানা দেওয়া হইয়াছে।

'উৎসব বিবরণী' অধ্যায়ে 'গ্রাম বিবরণী'তে উল্লিখিত উৎসব-পার্বণাদির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিশদ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইসব উৎসব-পার্বণাদির বিবরণ উৎসবের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কালী তাহা যে নামেই উপাসিত হউক না কেন উহা 'কালীপূজা'; ধর্মরাজের গাজন, শিবের গাজন, চড়ক বা নীলপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্বণগুলিকে 'চড়ক-গাজন-নীলপূজা' অথবা ধর্মরাজ, জগন্নাথ বা রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি যে-কোন দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইলে উহা 'রথযাত্রা' এবং হিন্দু সাধুসন্ত বা মুসলমান পীর-ফকিরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলিকে "আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব" এইরূপ শিরোনামার অন্তর্ভুক্ত করিয়া একত্রে উহার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

'মেলা বিবরণী' অধ্যায়ে 'গ্রাম বিবরণীতে' উল্লিখিত মেলাগুলির মধ্যে যেগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া গিয়াছে কেবলমাত্র সেইগুলির বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে মেলা-বিবরণগুলি উৎসব বিবরণীতে প্রদত্ত শিরোনামা অনুসারে বর্ণানুক্রমে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যেক্ষেত্রে আমাদের সংবাদদাতা কোন গ্রামে অনুষ্ঠিত একাধিক মেলার স্বতন্ত্র বিবরণী না দিয়া কেবলমাত্র একটি মেলার বিস্তারিত বিবরণী দিয়া অন্যগুলি উহার অনুরূপ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেক্ষেত্রে আমরাও একটিমাত্র মেলার বিশদ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছি, প্রতি ক্ষেত্রে একই মেলা-বিবরণী বারংবার উল্লেখ করা অপ্রয়োজনবোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে।

পক্ষান্তরে, যে-সকল পূজা-পার্বণ ও মেলা সম্প্রতি বন্ধ হইয়া গিয়াছে অথচ আমাদের সংবাদদাতারা উহার বিবরণী প্রেরণ করিয়াছেন, প্রয়োজনবোধে উক্ত তথ্যাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে

গ্রন্থে প্রতিটি জেলার "পূজা-পার্বণ", "মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম", "মেলার মাসপঞ্জী" এবং "প্রতীক গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি"—এই চারি প্রকারের মোট কুড়িটি মানচিত্র দেওয়া হইয়াছে। "পূজা-পার্বণ" ও "প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" মানচিত্রে সমগ্র জেলার পূজা-পার্বণগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রতিটি ভাগের জন্য পৃথক প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়াছে। মানচিত্রের সহিত প্রদত্ত নির্দেশিকাতে ঐ সকল প্রতীক চিহ্নের ব্যাখা করা হইয়াছে। "প্রতীক গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনা স্থানাদি" বলিতে যে সকল মন্দিরে বা দেবালয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং নিয়মিত নিত্যপূজা হয় মানচিত্রে কেবলমাত্র সেইসকল স্থানের মন্দিরাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

উৎসব বা মেলা তাহা যত বৃহৎ অথবা ক্ষুদ্রাকারের হউক না কেন উহার সবগুলিকেই গ্রন্থে স্থান দেওয়া হইয়াছে। মূলতঃ স্থানীয় সংবাদদাতাদের উপর আস্থা রাখিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্যাদিকে কোনরূপ বিকৃত না করিয়া গ্রন্থটি সম্পাদনা করা হইয়াছে। এবিষয়ে আমাদের নিজস্ব মতামতের কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা হয় নাই; কেবলমাত্র সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় অংশটুকু বর্জন করা হইয়াছে মাত্র। যদিও তথ্য বিবরণী যাহাতে নির্ভুল হয় সে বিষয়ে যতদূর সম্ভব যত্ন গ্রহণ করা হইয়াছে, তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে তথ্য-বিবরণীর মধ্যে অসামঞ্জস্য বা ভুল-ত্রুটি অসম্ভব নহে। বলা বাহুল্য সারা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করা সম্ভব নহে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক হইতে যে সকল উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে তাহা আমাদের আহৃত।

২

বাঙ্গালী উৎসব-প্রিয়তার কথা খুবই সুবিদিত। অতি প্রাচীনকাল হইতেই স্থানভেদে, কালভেদে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ধর্মীয়-পূজা-পার্বণ-ব্রত অথবা পারিবারিক আনন্দানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের দেশে সারা বৎসর নানা উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। আবার ঐ সকল উৎসবাদির কতকগুলিকে কেন্দ্র করিয়া নানা স্থানে মেলা বসিতেছে। এই সকল পূজা-পার্বণগুলি কতকালের প্রাচীন এবং ঠিক কোন সময় হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছিল স্বভাবতঃই জানিতে কৌতূহল জাগে। কিন্তু আমাদের ধর্মানুষ্ঠানের বিবিধ ক্রিয়া-কর্ম বিশ্লেষণ করিয়া তাহার দ্বারা পূজা-পার্বণগুলির সঠিক সময় নিরূপণ করা বা উহার ধারাবাহিক ইতিহাস সংগ্রহ করা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার।

কালের প্রভাবে, স্থানীয় লোকের উদাসীনতায়, আর্থিক অনটনে অথবা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বহু প্রাচীন পূজা-পার্বণ ও মেলা আজ যেমন একেবারেরই বন্ধ হইয়া

গিয়াছে বা পূর্ব-আড়ম্বর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে, তেমনি আবার নানাস্থানে নূতন করিয়া বহু উৎসব বা মেলা প্রবর্তিতও হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলী জেলায় অনুষ্ঠিত বিবিধ উৎসব-পার্বণ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ তথ্যাদি পর্যালোচনা করিলে উপরিউক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যাইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখা যায় মুর্শিদাবাদ জেলার বুজরুগ দেবগ্রামে শ্যামচাঁদ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া অথবা নওপাড়া গ্রামে মনসাতলায় মাঘীব্রত উপলক্ষে যে উৎসব বা মেলা হইত, মাত্র কয়েক বৎসর হইল উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; হাওড়া জেলার সেকরাহাটি গ্রামে গাজন বা মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী পূজা পূর্বের তুলনায় যেমন আড়ম্বরশূন্য হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি গত পাঁচ হইতে পনর বৎসরের মধ্যে এই চারিটি জেলার বিভিন্নস্থানে অনেকগুলি নূতনভাবে উৎসবের আয়োজন ও তদুপলক্ষে মেলার প্রচলন হইয়াছে এবং উত্তরোত্তর তাহাদের জনপ্রিয়তা বাড়িতেছে। পরিশিষ্ট 'ক'-এ প্রদত্ত মেলাসারণির প্রাচীনত্ব স্তম্ভের দিকে লক্ষ্য করিলে আমাদের যুক্তির সারবত্তা বুঝিতে পারা যাইবে। পক্ষান্তরে, ইহাও দেখা যাইতেছে যে অতীতের আড়ম্বরপূর্ণ উৎসবগুলির কোন কোনটি ঠিক সমান আড়ম্বরের সহিত অদ্যাপি প্রতিপালিত হইতেছে। উদাহরণস্বরূপ আমরা মাহেশের রথযাত্রার কথা উল্লেখ করিতে পারি। যদিও প্রাচীন শ্রীরামপুর আজ একটি আধুনিক শহরে পরিণত হইয়াছে ও উহার পারিপার্শ্বিকতার আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে, তথাপি শত বৎসর পূর্বে মাহেশের রথযাত্রার যে সমারোহ ও লোকসমাগমের বিবরণ পাওয়া যায় তাহার তুলনায় আজিকার মাহেশের রথযাত্রার সমারোহের ও আচার-অনুষ্ঠানের বিশেষ কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় না। নদীয়া জেলার শান্তিপুরের রাস উৎসব বা হাওড়া জেলার রামরাজাতলার রামনবমী উৎসব সম্পর্কে ঠিক একই কথা বলা যায়।

ইহাভিন্ন, একদা শ্রীচৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করিয়া যেমন বাংলার নানাস্থান তীর্থ-গৌরবের মর্যাদা পাইয়াছে, বর্তমানে যুগাবতার ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া নানাস্থানে মঠ-মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং উৎসব-পার্বণ ও মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। হাওড়া জেলার বেলুড় মঠ ব্যতীত শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান হুগলী জেলার কামারপুকুর আজ হিন্দুদিগের তীর্থস্থানস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ দেশ স্বাধীন হইবার পর বরেণ্য দেশনেতাদিগের জন্মোৎসব উপলক্ষে বা সরকারী প্রচেষ্টায় জনশিক্ষামূলক উৎসব ও মেলার প্রচলন হইতেছে। মাত্র কয়েক বৎসর হইল নদীয়া জেলার হবিবপুরে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্যোগে নেতাজী জন্মোৎসব অথবা কৃষ্ণনগরের অন্তর্গত আশাননগরে সরকারী উদ্যোগে কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী মেলা বসিতেছে। চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘের আয়োজিত অক্ষয় তৃতীয়ার মেলাটি একটি জনশিক্ষামূলক মেলারূপে পরিচিত।

তৃতীয়তঃ পাশ্চাত্য অনুকরণে ইদানীংকালে কোন কোন স্থানে নববর্ষ উৎসব পালিত হইতেছে। হাওড়া জেলার পাঁচলা থানার অন্তর্গত জুজারসাহা গ্রামে এবং উলুবেড়িয়া থানার অন্তর্গত জগৎপুর গ্রামে নববর্ষ উপলক্ষে যে উৎসব ও মেলা হইতেছে তাহা সম্প্রতিকালের।

এই গ্রন্থে অনেকগুলি স্বল্পখ্যাত ও প্রখ্যাত পূজা-পার্বণ ও মেলার বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। উহার মধ্যে কোনটির স্থায়িত্ব মাত্র একদিন বা কয়েক ঘণ্টা মাত্র, আবার কোনটির স্থায়িত্ব মাসাধিককালব্যাপী। কোন উৎসবের ব্যাপকতা ও প্রভাব হয়ত একটি ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ, আবার কোনটি হয়ত একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা সারাদেশ জুড়িয়া বিস্তৃত। এই কারণে এ সম্পর্কে লিপিবদ্ধ প্রতিটি তথ্যবিবরণী ক্ষেত্রবিশেষে একঘেয়েমীতে পরিণত হইলেও প্রতিক্ষেত্রে উৎসব বা মেলাগুলিতে কোন্ কোন্ গ্রাম বা অঞ্চল হইতে লোকজন ও ব্যবসায়ীরা আসেন তাহার বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রসংগতঃ মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, হাওড়া ও হুগলা জেলার কয়েকটি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ পূজা-পার্বণ ও মেলার বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

দ্বাদশযাত্রার অন্যতম রথযাত্রা উপলক্ষে হুগলী জেলার মাহেশ ও গুপ্তিপাড়ায়, মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলায়, নদীয়া জেলার নবদ্বীপে; রাসযাত্রা উপলক্ষে নদীয়া জেলার নবদ্বীপ ও শান্তিপুরে, মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি রাজবাড়ীতে, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়ায় এবং হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে; দোলযাত্রা উপলক্ষে নদীয়া জেলার নবদ্বীপে এবং ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ-নেহালিয়ায় এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুরে সাড়ম্বরে উৎসব ও মেলা হয়।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া নানাস্থানে স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উহার মধ্যে নদীয়া জেলার নাকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত গোটপাড়ায় গোপীনাথ-দেবের, রানাঘাট থানার আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরদেবের, চাকদহ থানার যশড়ায় জগন্নাথদেবের, মুর্শিদাবাদ সাদেকবাগে ও মতিঝিলের পূর্বপাড়ে কুমারপুর গ্রামে রাধামাধবের এবং হুগলী জেলার মাহেশের জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবের বিশেষ খ্যাতি আছে।

শিবঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া মূলতঃ ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজনোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব ও মেলা বসে হুগলী জেলার প্রখ্যাত শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে ও বলাগড় থানার অন্তর্গত মহানাদ গ্রামে। মহানাদের শিবরাত্রি উৎসব 'মানাদের জাত' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাভিন্ন, মুর্শিদাবাদ জেলার ভরতপুর থানার অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামে কপিলেশ্বর শিব ও হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুরে হট্টেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

চড়ক ও গাজন উপলক্ষে হুগলী জেলার তারকেশ্বর মন্দিরে এবং চুঁচুড়ার ষণ্ডেশ্বর শিব মন্দিরে, নদীয়া জেলার নবদ্বীপে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি থানার অন্তর্গত রূপপুর গ্রামে

উৎসব ও মেলা বসে। নবদ্বীপের 'সাতগাজন' উপলক্ষে—নিশীথ রাত্রে শিবকে নিয়ে যে রকম ধূম ক'রে সুসজ্জিত চতুর্দোলায় চড়িয়ে চতুর্দোলাশুদ্ধ নাচানো হয় ঢাক, কাঁসী, ডগরের সাথে সঙ্গেতে, আর সেই নটরাজ শিবের নাচের তালে তাল মিলিয়ে ভক্তরা যেমন ভাবে নাচে এমনটি আর কোথাও চোখে পড়ে না। রূপপুর গ্রামের গাজনোৎসবটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে এই স্থানে রুদ্রদেব নামে খ্যাত মূর্তিটি শিবমূর্তি নহে—বৌদ্ধমূর্তি। এবং প্রেম ও অহিংসার প্রতীক বুদ্ধদেবকে কেন্দ্র করিয়া গাজন উৎসব উপলক্ষে সন্ন্যাসব্রতীদের নর-করোটি লইয়া বীভৎস নৃত্য এবং অসংখ্য পশুবলি হইয়া থাকে।

ধর্মরাজ ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া এই চারিটি জেলার বহু গ্রামে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। সাধারণতঃ বৈশাখ হইতে আষাঢ় মাসের মধ্যেই ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে ব্যতিক্রম স্বরূপ নদীয়া জেলার চাকদহ থানার ঘেটুগাছি ও গোটেরা গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে এবং হুগলী জেলার বলাগড় থানার তিলডাঙ্গা ও মুণ্ডখোলা গ্রামে মাঘ মাসে এবং খানাকুল থানার নন্দনপুর গ্রামে মাঘ মাসে ধর্মরাজ ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসবের কথা উল্লেখ করা যায়।

বিভিন্ন যোগে পরলোকগত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও নদ-নদীতে স্নান বহু প্রাচীনকাল হইতে পূণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত। এই উদ্দেশ্যে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে হুগলী জেলার ত্রিবেণীতীর্থে, চৈত্র মাসে বারুণী তিথিতে বৈদ্যবাটী নিমাইতীর্থ ঘাটে এবং হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত সীতাপুর গ্রামে মাঘ মাসে 'আক্ষিনস্নান' উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচ্য চারিটি জেলায় নানা নামে প্রসিদ্ধ বহু দেব-দেবীর পূজা-অর্চনা হইয়া থাকে। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলার নবগ্রাম থানার অন্তর্গত কিরীটেশ্বরী দেবী (ইহা একটি পীঠস্থান বলিয়া খ্যাত), বহরমপুর থানার বিষ্ণুপুরের করুণাময়ী কালী, নদীয়া জেলার রানাঘাট থানার উলা-বীরনগর গ্রামের উলাইচণ্ডী, কৃষ্ণনগরের সিদ্ধেশ্বরী কালী, দেপাড়ার নৃসিংহদেব, হাওড়া জেলার আমতায় মালাইচণ্ডী, ডোমজুড় থানার মাকড়দহের মাকড়চণ্ডী, হুগলী জেলার চণ্ডীপুর থানার শিয়াখালা গ্রামের উত্তরবাহিনী দেবী, জাঙ্গিপাড়া থানার রাজবলহাট গ্রামের রাজবল্লভী দেবী এবং মগরা থানার বংশবাটী গ্রামের হংসেশ্বরী দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজা এবং কৃষ্ণনগরের বারদোল আঞ্চলিক লোকোৎসবরূপে বিশেষ প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর কার্তিক সংক্রান্তিতে মহাধুমধামের সহিত হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় সর্বজনীন অনেকগুলি 'বাবু কার্তিক' পূজা হয়। এই সকল সর্বজনীন উৎসবগুলির মধ্যে একটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরে প্রাচীনকাল হইতে গঙ্গাপূজা ও তদুপলক্ষে পূণ্যস্নান ব্যতীত নবগ্রাম থানার অমরকুণ্ড গ্রামে গঙ্গাদিত্য মন্দিরে একযোগে গঙ্গাদেবী ও আদিত্য (সূর্য) পূজা হইয়া থাকে।

ইহাভিন্ন গ্রাম্য দেব-দেবীকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এই চারিটি জেলার বহু গ্রামে পঞ্চানন, ক্ষেত্রপাল, বামনদেব, নোয়াজন ঠাকুর, ব্রহ্মদৈত্য, শীতলা, মনসা, চণ্ডী, বিলেশ্বরী, ওলেশ্বরী, জাগেশ্বরী, বৃদ্ধেশ্বরী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে। এই সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা থানার নওপুকুরিয়া গ্রামে মাড়ুমনী (ডোমের কন্যা—ডুমনী) পূজা, নদীয়া জেলার চাকদহ থানার মথুরাগাছি গ্রামের খেদাই ঠাকুর (মনসা) পূজা, নাকাসীপাড়ার ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজা এবং হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার রতনপুর গ্রামে রতনমালা দেবী গাজন এবং ডোমজুড় থানার নার্ণা গ্রামের পঞ্চানন ঠাকুরের গাজন উৎসব উল্লেখযোগ্য।

স্থানীয় অঞ্চলে বিভিন্ন নামে খ্যাত বহু শাক্ত দেবী আছেন। যেমন, যোগাদ্যা, বিশালাক্ষী, সর্বমঙ্গলা, সিংহবাহিনী, গণেশজননী, বিন্ধ্যবাসিনী, রাজরাজেশ্বরী, সাবিত্রীদেবী, কমলেকামিনী, যশদায়িনী, বাগ্‌দেবী, জগৎগৌরী প্রভৃতি।

নদীয়া জেলার হরিণঘাটা থানার অন্তর্গত বিরহী গ্রামে প্রাচীনকাল হইতে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। স্বজনোৎসব উপলক্ষে আলোচ্য চারিটি জেলার মধ্যে এই একটি মাত্রই মেলার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে এবং এই কারণেই ইহা উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয়, মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অন্তর্গত ভগীরথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে 'দইমেলা' নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং কেবলমাত্র স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের ষষ্ঠীতলায় প্রথম সন্তান-সম্ভবা মহিলাগণ কর্তৃক দধি বিক্রয় এবং অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক দধি ক্রয় নিশ্চয় অভিনবত্বের দাবী রাখে। বলা বাহুল্য ইহা স্থানীয় লোকাচার মাত্র—কোন শাস্ত্রীয় আচার নহে।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মহোৎসব উপলক্ষে নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জে বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তমঠাকুরের, ভরতপুরে গদাধর গোস্বামীর, নদীয়া জেলার চাকদহ থানার যশড়া গ্রামে জগদীশ পণ্ডিতের, শ্রীপাট ফুলিয়ায় দেবানন্দঠাকুরের, অপরাধভঞ্জনপাটরূপে খ্যাত শ্রীপাট কুলিয়ায়, হুগলী জেলার সপ্তগ্রামে উদ্ধারণদত্তঠাকুরের এবং সপ্তগ্রামের অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথদাস ঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চন্দননগরে জগদীশঘাটে 'খুস্তীর মেলা' নামে খ্যাত মহোৎসবটিও উল্লেখযোগ্য।

এই প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী থানার অন্তর্গত আহিরণ গ্রামে খেতুরপঞ্চমী উৎসবটি উল্লেখযোগ্য। বর্তমান পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্গত রাজশাহী জেলার খেতুর গ্রাম বৈষ্ণবদিগের একটি শ্রীপাট। এই গ্রামে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। খেতুরীতে তৎকালীন বৈষ্ণবগণ একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রথম মহাসম্মেলন বলিয়া অভিহিত। এই ঘটনার স্মারক হিসাবে এই গ্রামে অদ্যাপি মহোৎসব হইয়া থাকে।

দেশবিভাগের পর জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত আহিরণ গ্রামে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। প্রতি বৎসর কোজাগরী পূর্ণিমার পরবর্তী পঞ্চমী তিথি হইতে এই স্থানে পাঁচদিনব্যাপী মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন, নদীয়ার চাকদহ থানার অন্তর্গত ঘোষপাড়ায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমা তিথিতে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের তীর্থক্ষেত্র সতীমার মন্দিরে এবং নাকাসীপাড়ার অন্তর্গত নাঙ্গালা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রামসীতা কেন্দ্র করিয়া প্রধানতঃ প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে রামসীতা পূজার প্রচলন খুবই অল্প বলিয়া কথিত। আলোচিত চারিটি জেলায় মোট নয়টি স্থানে রামনবমী উপলক্ষে উৎসব ও মেলা বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আড়ম্বরপূর্ণ উৎসব ও মেলা অনুষ্ঠিত হয় হুগলী জেলার চুঁচুড়ায় অবস্থিত ইমামবাড়ায় এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালবাগে। পীরের উরস্ উপলক্ষে এই জেলা চতুষ্টয়ের নানা স্থানে বহু উৎসব ও মেলা হয়। তন্মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ খাজা খিজিরকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মুর্শিদাবাদে অনুষ্ঠিত বেরা উৎসব, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানায় অনুষ্ঠিত ফুরফুরা শরীফ-এর উৎসব এবং পাণ্ডুয়ার মাঘ মেলা বিশেষ প্রসিদ্ধ। মুর্শিদাবাদের বেলডাঙ্গা থানা স্থানীয় মুসলমানগণ 'চেহলাম পরব' নামে একটি উৎসব পালন করেন। নদীয়া জেলার শান্তিপুরে 'গাজী মিঞার বিবাহ' উৎসব চমৎকারিত্বের দাবী রাখে।

উৎসবাদির ন্যায় মন্দিরাদি সম্পর্কে ঠিক একই মন্তব্য করা যায়। প্রাচীন মন্দিরাদির অনেকগুলি আজ যেমন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছে, পক্ষান্তরে আলোচিত চারিটি জেলায় নানাস্থানে নূতন নূতন মন্দির বা দেবালয়ও নির্মিত হইয়াছে। তবে এক্ষেত্রে প্রভেদ এই যে অপ্রাচীন মন্দিরগুলি প্রাচীন মন্দিরগুলির ন্যায় আটচালা, চারচালা, জোড়-বাংলা প্রভৃতি বাংলা দেশের বিশেষ মন্দির গঠন রীতিতে বা পোড়ামাটির শিল্পকার্যে সমৃদ্ধ নহে।

এই গ্রন্থে বহু জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। মূলতঃ কোন গ্রামের উৎপত্তি বা নামকরণ প্রসঙ্গে এবং দেবদেবীর আবির্ভাব ও মাহাত্ম্য কীর্তনের উদ্দেশ্যে কিংবদন্তীগুলি

প্রচলিত। এই সকল কিংবদন্তীগুলির মধ্যে একই কিংবদন্তী যেমন বিভিন্ন দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক স্থানে প্রচলিত আছে, তেমন কল্পনার বৈচিত্রেভরা পুরাণ বা ইতিহাসাশ্রয়ী নানা কিংবদন্তীও আছে। সাধারণ সমষ্টিমনের সৃষ্ট এই সকল জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর মধ্যে কতটুকু কল্পনার অতিরঞ্জন বা অতিশয়োক্তি আছে অথবা কতটুকু বাস্তবতার ছাপ আছে তাহার সূক্ষ্ম পার্থক্য যোগ্য ব্যক্তি নিরূপণ করিবেন।

উৎসবের সহিত আমোদ-প্রমোদের সম্পর্ক নিবিড়। অতি প্রাচীনকাল হইতে উৎসব-পার্বণ উপলক্ষে রামায়ণগান, কবিগান, বোলানগান, সারিগান, কথকতা, মনসামঙ্গল ভাসান, কালীকীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন, তরজা, পুতুলনাচ, খেলাধূলা, ম্যাজিক, সার্কাস, নাগরদোলা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইত। অভিনয় রীতি আমাদের দেশে আধুনিক নহে, এমন কি পাশ্চাত্য অনুকরণেও নহে। ইংরাজ আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই যে আমাদের দেশে অভিনয় রীতি প্রচলিত ছিল তাহা পণ্ডিতগণ প্রমান করিয়াছেন।

আলোচিত চারিটি জেলায় উৎসবাদি উপলক্ষে উল্লিখিত সমুদয় আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হইলেও কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের জনপ্রিয়তাই বেশী। মুর্শিদাবাদ জেলায় শ্রীলম্বদর চক্রবর্তী ও শেখ গুমানী কবিগায়ক হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ। যদিও এখন বহু স্থানে পুতুলনাচের আসর বসে তথাপি ইহার আকর্ষণ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে বলিয়া মনে হয়। কোন কোন স্থানে আধুনিক জলসার আসর বসিতেছে। প্রায় প্রতিটি মেলায় আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে জুয়া ও লটারী খেলা হয় দেখা যাইতেছে।

স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজনীন আনন্দই উৎসবের সার্থকতা। বহুজনের মিলনক্ষেত্র উৎসব উপলক্ষে গ্রামীণ সমাজ-জীবন ক্ষণিক হইলেও আনন্দে মুখরিত হইয়া উঠে একথা সত্য। তথাপি অবিমিশ্র সুখ বলিয়া বোধহয় কিছুই নাই। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের নায়ক যেমন মাহেশের রথযাত্রায় রাধারানীর সন্ধান পাইয়াছেন, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদুঃখিনী সর্বজয়ার মনে আড়ংঘাটার যুগলকিশোরদেবের মেলার সুখস্মৃতি যেমন স্মরণীয় হইয়া আছে অথবা কবিগুরুর সেই সুখী বালিকাটির বাঁশির আনন্দের স্বর যেমন স্নানযাত্রা মেলায় হাজার লোকের হর্ষধ্বনিকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে, অপরদিকে আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে দেশ প্লাবিত হইলেও মাতৃহারা কাঙালিনীর ম্লানমুখ অথবা "রায় বাবুদের গুপি পেয়েছে জরির টুপি, ফুলকাটা সাটিনের জামা" বলিয়া অবুঝ সন্তানের দাবীতে অক্ষম পিতামাতার বেদনা বা সেই দুঃখী বালকটি যে "একটি রাঙা লাঠি কিনবে একটি পয়সা নাহি" তাহার দুঃখ হাজার লোকের মেলাকে বাস্তবিক করুণ করিয়া তুলে।

কোজাগরী পূর্ণিমা, ১৮ই আশ্বিন, ১৩৭৫,
পশ্চিমবঙ্গ আদমসুমারী দফতর,
কলিকাতা-১।

অরুণ কুমার রায়

সূচী

মানচিত্র সূচী :

চিত্র সূচী :

॥ মুর্শিদাবাদ ॥

মানচিত্রে
মুর্শিদাবাদ জিলার
পূজা-পার্বণ ও মেলা

পূজা পার্বণের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, গন্ধেশ্বরী, গৌরী প্রভৃতি	
শিব, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি	
ধর্মরাজ-গাজন প্রভৃতি	
বিশালাক্ষী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চণ্ডী, মনসা, (বিষহরি) শীতলা, ষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি	
কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি	
রাস, দোল, ঝুলন, পঞ্চমদোল, গোপাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ফুলদোল, স্নানযাত্রা প্রভৃতি	
স্নানাদি — বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, উত্তরায়ণ, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি	
অনন্তচতুর্দশী, অক্ষয়তৃতীয়া, নববর্ষ, বৈশাখীপূর্ণিমা, ভীম একাদশী জামাইষষ্ঠী, অম্বুবাচী প্রভৃতি	
মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি	
আদিবাসীদের উৎসবাদি — বাঁধনা, করমপূজা, মারাংবুরু প্রভৃতি	
পীরের উরস	
সাধুসন্তদের আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসবাদি	
বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি	
... ...	
... ...	

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, মহামায়া, গন্ধেশ্বরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, বিশালাক্ষ্মী, ষষ্ঠী, যুগাদ্যা, গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি . .. .

চড়ক, গাজন, গম্ভীরা ... ...

শিব, শিবরাত্রি, ব্রহ্মা, কার্তিক, গণেশ, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি ... ...

রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, গোষ্ঠাষ্টমী, রামনবমী, মহোৎসব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি · ...

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

পৌষসংক্রান্তি, পৌষপার্বণ, মাঘীপূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অম্বুবাচী, বৈশাখীপূর্ণিমা, নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া, অনন্ত চতুর্দশী, উত্তরায়ণ স্নান প্রভৃতি ... ...

আদিবাসীদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

ধর্মরাজের গাজন ... ...

সাধু-সন্ত ও পীরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব ... ...

বিবিধ পূজা ও উৎসব ... ...

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট ...	
১,০০০ পর্যন্ত	
১,০০১ — ২,৫০০ ...	
২,৫০১ — ৫,০০০ ...	
৫,০০১ — ১৫,০০০ ...	
১৫,০০১ — ২৫,০০০ ...	
২৫,০০১ এবং তদূর্দ্ধ ...	

মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
জিলা মুর্শিদাবাদ
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের ”
জিলার ”
মহকুমার ”
থানার ”
মৌজার অবস্থিতি
নদীয়া
বর্ধমান

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

মাস	প্রতীক
বৈশাখ	১ (বৃত্তের মধ্যে)
জ্যৈষ্ঠ	২ (বৃত্তের মধ্যে)
আষাঢ়	৩ (বৃত্তের মধ্যে)
শ্রাবণ	৪ (বৃত্তের মধ্যে)
ভাদ্র	৫ (বৃত্তের মধ্যে)
আশ্বিন	৬ (বৃত্তের মধ্যে)
কার্তিক	৭ (বৃত্তের মধ্যে)
অগ্রহায়ণ	৮ (বৃত্তের মধ্যে)
পৌষ	৯ (বৃত্তের মধ্যে)
মাঘ	১০ (বৃত্তের মধ্যে)
ফাল্গুণ	১১ (বৃত্তের মধ্যে)
চৈত্র	১২ (বৃত্তের মধ্যে)
চান্দ্রমাস	●
মাস অনির্দিষ্ট	◉

মেলার মানপঞ্জী
জিলা মুর্শিদাবাদ
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের ,,
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের
ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটিবিচ্যুতি সম্ভব।
সম্পাদক।
জি লা ব র্ধ মা ন

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি ... ...

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি ... ...

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ... ...

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা ... ...

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধি মন্দির ... ...

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল ... ...

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল .. ..

প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস
জিলা মুর্শিদাবাদ
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
রাজ্যের ,,
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক।
যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা ভক্ত সমাগম হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ

থানা ঃ ফরাক্কা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ জোড়পুকুরিয়া (মৌজা ঃ জাফরগঞ্জ)।
৪৭।৮৩৫˙৫৬।৫৭৭।৩,২৭৪

(ক) চাঁই ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরে রেলস্টেশন তিলডাঙ্গা। আধ মাইল দূরে বল্লালপুর গ্রাম হইতে মোটর বাস পাওয়া যায়। বর্ষাকালে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে নীলপূজা ও শিবের গাজন এবং চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ইদ-উল-ফেতর্ ও ইদুজ্জোহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) "ভোলানাথ" শিবের স্থান আছে।

গ্রামটি একটি প্রকাণ্ড বিলের মধ্যে অবস্থিত। বর্ষাকালে বন্যার জলে গ্রামটি প্রায়ই ডুবিয়া যাইত। এই বন্যার প্রকোপ হইতে বাস্তুভিটা রক্ষা করিবার জন্য গ্রামবাসীরা গ্রামের চারিদিকে জোড়া জোড়া পুকুর খনন করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ গ্রামটির নাম জোড়পুকুরিয়া হইয়াছে।

শ্রীআজিমুদ্দিন আহমেদ, প্রধান শিক্ষক,
৫নং জোড়পুকুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জাফরগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ বল্লালপুর।৪৯।৭৩১˙৩২।১৬৪।১,০০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, কামার, কাহার, কৈবর্ত, রবিদাস ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন তিলডাঙ্গা। বল্লালপুর হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে হরিবাসর, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসা-পূজা ও কার্তিকে কালীপূজা হয়। মনসা ও কালীপূজায় ছাগ, পায়রা, আখ, কুমড়া ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) কালীর একটি মূর্তি এবং শ্বেতবর্ণা মনসার একটি মূর্তি আছে। উভয়ই গ্রামের সাধারণের দেবী এবং উভয় দেবীর নামেই আড়াই কাঠা করিয়া দেবোত্তর জমি আছে।

শ্রীশাহ মহম্মদ বিশ্বাস, শিক্ষক,
বল্লালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নয়নসুখ, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম ঃ দিলোয়ারপুর (মৌজা ঃ বেনিয়াগ্রাম)।
৫৫।১,২৮৪˙৭৪।৫১৭।২,৭৯৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তিলডাঙ্গা। পার্শ্ববর্তী গঙ্গা নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) মহরম ও ইদুজ্জোহা। চান্দ্রমাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের উল্লিখিত উৎসব দুইটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইদুজ্জোহা উপলক্ষে গরু, ছাগ ইত্যাদি কোরবানি করা হয়।

(ঙ) মহরমের মেলা। একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মসজিদ আছে।

শ্রীমহাদেব চন্দ্র হালদার, প্রধান শিক্ষক,
বেনিয়াগ্রাম বিদ্যালয়,
পোঃ বেনিয়াগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম ঃ হাজারপুর (মৌজা ঃ কুলী)।
৫৮।২,৯৮৯˙২৯।১,৬৭৫।৯,৬৮৯

(ক) কামার, কুমার, তিয়র, ছুতার, গোয়ালা, চামার, কৈবর্ত ও নাপিত। গ্রামে পাঁচটি পাড়া—কুমারপাড়া, তিয়রপাড়া, ছুতারপাড়া, গোয়ালাপাড়া ও কৈবর্তপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধুলিয়ান গঙ্গা গর্ভে বিলুপ্ত হওয়ায় বর্তমানে নিমতিতা হইতে ট্রেন ধরিতে হয়। ধুলিয়ান হইতে গ্রামের নিকট দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। পার্শ্ববর্তী গঙ্গা নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত চলিত। ১৯৫৮ সালে গঙ্গা দুই মাইল সরিয়া যাওয়ায় জলপথে যাতায়াতের অসুবিধা হইয়াছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং কার্তিকে কালীপূজা। দুর্গাপূজাটি ষাট এবং কালীপূজাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ ও কালীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ পাল, শিক্ষক,
হাজারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুলী-ভায়া-ধুলিয়ান,
মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : ব্রাহ্মণগ্রাম (মৌজা : কুলী)।
৫৮।২,৯৮৯'২৯।১,৬৭৫।৯,৬৮৯

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, চাঁই, মালো, শুঁড়ি, চামার, বৈষ্ণব ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে সাত মাইল দূরে তিলডাঙ্গা রেলস্টেশন। নৌকাযোগে ধুলিয়ান যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে অষ্টমপ্রহর নামযজ্ঞ মহোৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে শ্যামাপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব। লক্ষ্মীপূজা ও শ্যামাপূজার রাত্রিতে দেশাচারমতে এবং নিজ নিজ সংস্কার অনুযায়ী গ্রামবাসীদের মধ্যে বহু ব্যক্তি বাজি রাখিয়া নানাপ্রকার খেলাধুলা করিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীকেশব চন্দ্র সাহা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ নয়নসুখ,
মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : নয়নসুখ (মৌজা : কুলী)।
৫৮।২,৯৮৯'২৯।১,৬৭৫।৯,৬৮৯

(ক) কামার, গোয়ালা, ডোম, ব্রাহ্মণ, কুমার, মালো, চাঁই, সদ্‌গোপ, হালুই, নাপিত, ধোপা, কেওট ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিমতিতা রেলস্টেশন হইতে মোটর যোগে ধুলিয়ান গ্যাঞ্জেস পর্যন্ত আসিয়া সেখান হইতে নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামের পাশে গঙ্গা নদী প্রবাহিত। নদীপথে নয়নসুখ ঘাট হইয়া বল্লালপুর হল্ট স্টেশন হইতে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে ও আষাঢ়ে অষ্টমপ্রহর নামকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ়ে রথযাত্রা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে শ্যামাপূজা এবং ফাল্গুনে শিবরাত্রি উৎসব। দুর্গাপূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারিদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে।

(চ) শিব (নর্মদেশ্বর), দুর্গা, কালী এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাকা মণ্ডপ ও মন্দির আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সিংহ, শিক্ষক,
নয়নসুখ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নয়নসুখ, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : মহাদেবনগর।
৬৩।৮৪৮'৫১।৯৪৮।৫,৩০৪

(ক) কামার, কুমার, স্বর্ণকার, গোয়ালা, তিলি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধুলিয়ান নদী গর্ভে বিলীন হওয়ায় নিমতিতা হইতে মোটর যোগে ধুলিয়ান হইয়া যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, ইদ-উল-ফেতর্ ও ইদুজ্জোহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মহরমের মেলা।

(চ) গ্রামে দুর্গামণ্ডপ ও কালীর মন্দির আছে।

শ্রীগিয়াসউদ্দিন, শিক্ষক,
মহাদেবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মহাদেবনগর-ভায়া-ধুলিয়ান,
মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : খেজুরিয়া

(ক) ব্রাহ্মণ, নাগর, মুসলমান, ডোম, মুচি, বেনিয়া, গোয়ালা, কলু, হাজারি, নাপিত ও জেলে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খেজুরিয়া।

(ঘ) বৈশাখে শিবপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব, মাঘে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুনে দোল উৎসব। কালীপূজায় ছাগ, মহিষ, পায়রা, কুমড়া, আঁখ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সাহা, প্রধান শিক্ষক,
খেজুরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম : গয়ানাথপুর

(ক) গোয়ালা, হালুই, মুসলমান, দোসাদ, রাজবংশী, চামার ও নাগর।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তিলডাঙ্গা। খেজুরিয়া ঘাট হইতে নৌকা যোগে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) শ্রাবণে মনসাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন। গাজন উৎসব উপলক্ষে সংক্রান্তির সাতদিন পূর্ব হইতে গাজন-সন্ন্যাসীদের শিবপূজা ও নাচ শুরু হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীশ্রীপতি কুমার মিশ্র, শিক্ষক,
ফরাক্কা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ফরাক্কা, মুর্শিদাবাদ।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ ফরাক্কা

উৎসব বিবরণী

দুর্গাপূজা

হাজারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সাড়ম্বরে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি স্থানীয় কুম্ভকার সম্প্রদায়ের উদ্যোগে ও অর্থানুকুল্যে পালিত হইলেও স্থানীয় অন্যান্য সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করেন। গ্রামে টালীর চালাযুক্ত একটি পাকা দুর্গামণ্ডপ আছে। প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে ঐ মণ্ডপে দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া ষষ্ঠী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত যথারীতি পূজা হয়। অষ্টমী তিথিতে পারিবারিক মঙ্গল কামনায় গ্রামবাসী অনেকেই নৈবেদ্যের ডালা লইয়া দুর্গামণ্ডপে পূজা দিতে আসেন। ঐরূপ পূজার সংখ্যা প্রায় আড়াইশত। সন্ধি পূজা উপলক্ষে চালকুমড়া ও আখ বলি দেওয়া হয়। নবমী পূজার দিন যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং যজ্ঞ শেষে মণ্ডপে উপস্থিত সকল ব্যক্তিদের কপালে যজ্ঞের তিলক দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : ফরাক্কা

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

খেজুরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমী তিথিতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বেওয়া, বেনিয়াগ্রাম ও অর্জুনপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ গরুর গাড়ীতে ও পদব্রজে মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বেওয়া ও অর্জুনপুর গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে; ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় সাত-আট জন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, শিল্পজাত দ্রব্য, মাটির পুতুল, হাঁড়ি-কুঁড়ি ও বাঁশের জিনিসপত্র প্রভৃতি আমদানী হয়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে মহাদেবনগরে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় একবিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকে বেচাকেনা ও লোক সমাগম বেশী হয়।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী মহেশপুর, সমরেনপুর, নূতন মালঞ্চা, মালঞ্চা-সমসেরগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহু নরনারীর সমাগম হয়। মোট প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট খোলা জায়গায় বসে এবং মিষ্টান্ন, মাছ, শাকসজী ইত্যাদির দোকানই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মহরমের মেলা

দিলোয়ারপুর গ্রামে মহরম পরব উপলক্ষে হাটতলায় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ বেওয়া, বেনিয়াগ্রাম, ইমামনগর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নয়নসুখ, জাফরগঞ্জ, কাশীনগর, লাঙ্গলডিহি, নিসিন্দা, খেজুরিয়া, যজ্ঞেশ্বরপুর, বিন্দুগ্রাম প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। মেলায় প্রায় আঠাশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। দা, কুড়ুল, কাটারি, কাস্তে, ফাল ইত্যাদি কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং জাফরগঞ্জ, কাশীনগর ও লাঙ্গলডিহি হইতে তাঁতের কাপড়-চোপড় এবং নয়নসুখ গ্রাম হইতে মাটির পুতুল ও হাঁড়ি-কুঁড়ি মেলায় আমদানী হয়। ইহাভিন্ন খাবার ও চাল-ডাল ইত্যাদি বিক্রয় হয়।

মেলায় লাঠিখেলা, কুস্তি ও হাসানহোসেন-এর স্মরণে ঝাড়নি গান হয়।

রথযাত্রার মেলা

নয়নসুখ গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে গঙ্গা নদীর তীরে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং বেওয়া, বেনিয়াগ্রাম ও অর্জুনপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী এবং সাইকেল করিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বেনিয়াগ্রাম, হুসেনপুর, রঘুনাথপুর, হাজারপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মিষ্টান্ন ও মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি প্রচুর পরিমাণে মেলায় আমদানী হয়। ছোট-বড় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় কুড়ি পঁচিশজন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় ও কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র ও শাকসজী, চাউল, কলাই, আম ইত্যাদির দোকানপাট বসে এবং গরু ও মহিষ ক্রয়-বিক্রয় হয়।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সামসেরগঞ্জ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দোগাছি।৭৫।১,৩৯৮´৫০।৫০।১৩,১৮২

(ক) মাহিষ্য, রাজবংশী, ধোপা, নাপিত, মুচি, ও মুসলমান। পাড়া চারিটি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে পাকুড় রেলস্টেশন এবং সাত মাইল দূরে নিমতিতা রেলস্টেশন। গ্রামের মধ্য হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়া দুই মাইল দূরে নবনির্মিত জাতীয় সড়কের সহিত মিশিয়াছে। উক্ত রাস্তায় নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে নৌকাযোগে যাতায়াতেরও সুবিধা আছে।

(ঘ) বৈশাখে গ্রামদেবতার পূজা, আশ্বিন-কার্তিকে লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যায় কালীপূজা ও ষষ্ঠীপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি লক্ষ্মীর মন্দির এবং কালী, গ্রাম-দেবতা ও ষষ্ঠীর স্থান আছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এই গ্রামে কালীপূজা উপলক্ষে তিন-চারদিনের জন্য একটি মেলা বসিত। গত কয়েক বৎসর হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক,
চাচণ্ড জুনিয়র বেসিক্ বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ দোগাছি,
মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : লস্করপুর।৭৭।১,২৪৮´০০।২৫৫।১,৩৮৭

(ক) মাহিষ্য, রাজবংশী, ডোম, কামার, ধোপা ও মুসলমান প্রভৃতি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিমতিতা। গ্রামের নিকট দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে শতাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি হরি-সভায় রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত হরিসভায় রাধাকৃষ্ণের নিত্যপূজা এবং প্রত্যহ সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত নিয়মিত নামসংকীর্তন হয়। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে সারা মাস ব্যাপী নামসংকীর্তন উৎসব এবং কার্তিক মাসে যে-কোন একদিন নামসংকীর্তন ও ভাগবৎ পাঠ হয়। বৈশাখ মাসে উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজের আয়েজন করা হয়।

প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে ঘট স্থাপন করিয়া দুর্গাপূজা হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি হরিসভা আছে।

শ্রীবিনয়েন্দ্র নাথ সরকার, শিক্ষক,
লস্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : ধুসড়ীপাড়া। ১০৪।৮১৮´০৪।৮৮৫।৪,৪১৯

(ক) কামার, স্বর্ণকার, নাপিত, ছুতার, জেলে, মাহিষ্য, কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মুচি ও বৈষ্ণব। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিমতিতা হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) শারদীয়া শুক্লপক্ষে মনসা (পদ্মা) পূজা।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মনসা পূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীভুবন মোহন সরকার,
গ্রাম ও পোঃ ধুসড়ীপাড়া,
মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : জীয়ৎকুণ্ড (মৌজা : হাসিমপুর)।
১০৫।১১১'৫৩।১৫৬।৮২৭

(ক) মাহিষ্য ও রাজবংশী।
গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিমতিতা। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে এবং নিকটবর্তী গঙ্গা নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) পৌষ সংক্রান্তিতে জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরীর পূজা। গ্রামে একটি গাছের নীচে জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরী দেবীর পাষাণে খোদিত মূর্তি আছে। ইনি গ্রামের সাধারণের দেবী। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে ইঁহার যথারীতি বার্ষিক পূজা হয়। দেবীর নিকট পাঁঠা ও পায়রা মানসিক করা হয়। মানতের পশু-পক্ষীগুলিকে বলি না দিয়া উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকে দেবীর নিকট মানসিক করিয়া থাকেন।

(ঙ) জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরীর পূজা উপলক্ষে মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শোনা যায় যে, গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ-এর আমলে জীয়ৎকুণ্ড একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। সেই সময় এখানে জনৈক বিত্তশালী নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার এক তিয়র জাতীয় অতিশয় বুদ্ধিমান কর্মচারী ছিল। উক্ত ব্রাহ্মণ একদা সস্ত্রীক তীর্থ পর্যটনে বাহির হইলে ঐ কর্মচারীটি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া প্রভুর সম্পত্তি দখল করে। তাহার পর সে নিজকে রাজা বলিয়া প্রচার করিয়া এই অঞ্চলে স্বীয় শক্তি বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে। তাহাকে দমন করিবার জন্য গৌড়েশ্বর হোসেন শাহ একদল সৈন্য পাঠান; কিন্তু বার বার যুদ্ধ করিয়াও তাহারা এই তিয়র রাজাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না। কারণ তিয়র রাজের দুর্গের মধ্যে একটি কুণ্ড ছিল, প্রবাদ আছে, সেই কুণ্ডের জল তিয়র রাজের মৃত-সৈনিকদের শরীরে ছিটাইয়া দিলে তাহারা পুনর্জীবন লাভ করিত। তিয়র রাজের জনৈক অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় হোসেন শাহ-এর সেনাদলের এক ব্যক্তি গোপনে দুর্গে ঢুকিয়া ঐ কুণ্ডে গোমাংস নিক্ষেপ করিয়া কুণ্ডের জল অপবিত্র করিয়া দেয়। ইহাতে তিয়র রাজ তাহার মৃত সৈন্যদের পুনরুজ্জীবিত করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে, ফলে তাহার পরাজয় ঘটে। কথিত আছে যে, পরাজিত তিয়র রাজ কুণ্ডের সুড়ঙ্গ পথ দিয়া পাতালে প্রবেশ করিবার পর কেহ তাহার সন্ধান পায় নাই।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সেন, প্রধান শিক্ষক,
হাসিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সামসেরগঞ্জ

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

দোগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে কান্দীর নিকটবর্তী জজান্‌ গ্রামের জমিদার এই পূজার যাবতীয় ব্যয় ভার বহন করিতেন। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের পর অর্থাৎ বাং ১৩৬২ সাল হইতে ইহা সর্বজনীন পূজায় পরিণত হইয়াছে। আরো উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এই কালীপূজাটি প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হইত। পূজার এই সময় পরিবর্তন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। এই অঞ্চলের জমিদারীকার্য পরিচালনার জন্য জজানের জমিদার কদমসার নামক গ্রামে একটি কাছারি স্থাপন করেন। কাছারি বাড়িটি পূর্বে একজন নীলকর সাহেবের কুঠি ছিল। সেইজন্য লোকে ইহাকে কদমসায়র কুঠি বলিত। কাছারির কার্য পরিচালনার জন্য তৎকালীন জমিদার একজন ইংরাজ কর্মচারী নিযুক্ত করেন। তখন কার্তিক মাসে পূজা হইত। দোগাছি গ্রামের পুরোহিত যথাসময়ে কালীপূজার খরচ মঞ্জুর করাইবার জন্য ম্যানেজারের নিকট গেলেন। কার্তিক মাসে জমিদারের খাজনা দাখিলের সময়। জমিদারের টাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেই সাহেব ম্যানেজার কালীপূজার নাম শুনিয়া চটিয়া উঠিয়া বলিলেন, "ড্যাম্‌ ইওর কালী, পূজা বন্ধ কর"। পুরোহিত সাহেবের ক্ষিপ্ত মেজাজ দেখিয়া আর কিছু বলিতে পারিলেন না। অতএব পূজা হইবে না বলিয়া স্থির হইল। কিন্তু পূজার নির্দিষ্ট দিন অর্থাৎ কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথির গভীর রাত্রিতে সাহেব স্বপ্ন দেখিয়া হঠাৎ বিছানা হইতে লাফাই উঠিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"হামার বন্দুক লাও।" চীৎকার শুনিয়া চাকর-বাকর সাহেবের নিকট ছুটিয়া গেলে সাহেব ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বুঝাইলেন যে, জিহ্বা বাহির করিয়া কালী তার বুকের উপর চাপিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পর সুস্থ হইয়া সাহেব আবার ঘুমাইলেন কিন্তু পরমুহূর্তেই "বন্দুক লাও, বন্দুক লাও" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি ভয়ে আর সেই রাত্রে ঘুমাইতে পারিলেন না এবং তৎক্ষণাৎ দুইজন পাইককে দোগাছি গ্রামের পুরোহিতের নিকট পাঠাইয়া কালীপূজার আয়োজন করিতে অনুরোধ করেন; কিন্তু সেই রাত্রিতে পূজা করা সম্ভব না হওয়ায় পরবর্তী অমাবস্যায় কালীপূজা করা হয়। সেই বৎসর হইতে এই গ্রামের কালীপূজা অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। উক্ত পুরোহিত মহাশয়ের দুইজন পৌত্র এখনও জীবিত আছেন—তাঁহাদের মুখেই এই ঘটনা শুনা যায়।

উৎসবের দিন দক্ষিণাকালীর ধ্যানে যথারীতি দেবীর পূজার্চনা হয়। এই দিন আশেপাশের গ্রাম হইতে শতাধিক নরনারী মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। পূর্বে পাঁঠা বলি হইত, এখন বলি প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণের নিকট থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয় এবং তেলেভাজা, ময়রা ও মনিহারী দ্রব্যের কয়েকটি দোকানপাট বসে।

গ্রামদেবতাপূজা

দোগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামদেবতার সর্বজনীন পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই ষষ্ঠী তিথিতে গ্রামের এয়োস্ত্রীরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া সাড়ম্বরে গ্রামদেবতার পূজা করেন। ইহাভিন্ন, গ্রামে কোন সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে অথবা চাষ-আবাদে অজন্মা দেখা দিলেও গ্রামবাসীরা গ্রামদেবতার পূজা দেন। গ্রামদেবতার কোন মূর্তি নাই। একটি শিরীষ গাছের নীচে ইহার নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে রক্ষিত কয়েকটি পাথরের নুড়িকে গ্রামদেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। গ্রামে যে-কোন পূজা বা উৎসবের সময় সর্বাগ্রে ঐ নুড়িগুলির গায়ে তেল-সিঁদুর মাখাইয়া দেওয়া হয়।

দোগাছি গ্রামের এই গ্রামদেবতা সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। গ্রামের প্রবীণদের মুখে শুনা যায় যে, পূর্বে এক বৃদ্ধা প্রত্যহ একটি ঝুড়িতে তুলিয়া উল্লিখিত নুড়িগুলিকে গঙ্গায় স্নান করাইয়া আনিত। ক্রমে বৃদ্ধা বার্দ্ধক্যবশতঃ শক্তিহীনা হইয়া পড়িলে নুড়িগুলি উঠান-নামান তাহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া পড়ে। তখন ঝুড়ি লইয়া গ্রামদেবতার স্থানে গমন করিলেই নুড়িগুলি নাকি আপনা হইতেই তাহার ঝুড়িতে

লাফাইয়া উঠিয়া আসিত এবং ঝুড়িসহ নিকটস্থ একটি পুকুরের নিকট গেলেই নুড়িগুলি লাফাইয়া পড়িয়া নিজেরাই জলে স্নান করিয়া পুনরায় ঝুড়িতে ফিরিয়া আসিত। পরে গ্রামদেবতার স্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে নুড়িগুলি পূর্বের মত লাফাইয়া আবার স্বস্থানে হাজির হইত।

মনসাপূজা (পদ্মাদেবী)

ধুসড়ীপাড়া গ্রামে আশ্বিন মাসে শুক্লপঞ্চমী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে মনসা (পদ্মা) পূজা হয়। পূজাটি সর্বজনীন এবং প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

এই গ্রামে পদ্মাদেবীর পূজা প্রচলন সম্পর্কে কিংবদন্তী শোনা যায় যে, বর্তমান পূজারীর উর্ধতন তৃতীয় পুরুষ একদিন নদীর ঘাট হইতে বাড়ী ফিরিবার সময় একটি সর্প দেখিতে পান এবং ঐ সর্পটি তাঁহার পিছু পিছু বাড়ী পর্যন্ত আসিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। এই ঘটনার পরে তিনি মাঝে মাঝে স্বপ্নাদেশ শুনিতেন কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে— "আরে মূর্খ অবিলম্বে আমার পূজার আয়োজন কর, নচেৎ তোর অমঙ্গল হবে"। ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি একটি সর্পকে তাঁহার বিছানার আশেপাশে দেখিতে পাইতেন। পর পর কয়েক রাত্রি এইরূপ স্বপ্ন দর্শনের পর তিনি পদ্মা দেবীর পূজার আয়োজন করেন এবং সেই হইতেই গ্রামে পদ্মাদেবীর পূজা হইয়া আসিতেছে।

গ্রামে পদ্মাদেবী পূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর বেহুলা, লখিন্দর, জরৎকারু মুনি ও আস্তীক মুনিসহ পদ্মের উপর উপবিষ্টা পদ্মাদেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা হয়। দেবীর দুই হাতে বিষধর নাগ এবং অপর দুই হাতে যথাক্রমে পদ্ম ও বরাভয়।

প্রায় দুইমাস পূর্ব হইতেই পূজার প্রস্তুতি অর্থাৎ প্রতিমা তৈয়ারী শুরু হয়। ভাদ্রমাসের শুক্লপঞ্চমীর দিন দেবীকে বেদীর উপর স্থাপন করিয়া পূজা করা হয় এবং পূজায় একটি পাঁঠা, একটি চালকুমড়া এবং কচুর ডাঁটা বলি দেওয়া হয়। ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমীর দিন পূজা হয়, কিন্তু কোন বলি হয় না। নবমী পূজার দিন পূজার নির্দিষ্ট একটি পাঁঠা বলির পর মানতের পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এইদিন কোন কোন বৎসর পনের-বিশটি, আবার কোন কোন বৎসর সাত-আটটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মানতকারীরা নিজ নিজ মানতের পাঁঠাগুলি লইয়া একটি সারিতে দাঁড়াইয়া থাকেন। পূজান্তে পূজারী আসিয়া গঙ্গাজল, ফুল, তুলসী-পাতা, দূর্বা ইত্যাদি দিয়া মন্ত্রোচারণের সহিত পাঁঠাগুলিকে দেবীর নিকট উৎসর্গ করেন। তাহার পর এক একটি পাঁঠাকে হাড়িকাঠে ফেলিয়া "জয় মা পদ্মাদেবীর জয়" বলিয়া খড়্গের দ্বারা মস্তক ছিন্ন করা হয়। বলি দিবার সঙ্গে সঙ্গে ছিন্ন মস্তক পাঁঠাটির গলদেশ হইতে বিদ্যুৎবেগে রক্তের ফোয়ারা বাহির হইতে থাকে। একটি মাটির সরাতে করিয়া সেই রক্ত খানিকটা ধরিয়া রাখা হয় এবং তাহার পর সেই রক্ত ও পাঁঠার ছিন্নমুণ্ড দেবীর নিকট দৃষ্টি ভোগের জন্য দেওয়া হয়। বাকি অংশ দেবীর প্রসাদরূপে মানতকারী নিজের গৃহে লইয়া যান।

বিজয়া দশমীর দিন মধ্যাহ্নে পদ্মাদেবীর প্রতিমা নিম-তিতার জমিদার বাড়ীর সম্মুখে লইয়া গিয়া একটি মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয়। সন্ধ্যার সময় প্রতিমা বিসর্জন প্রত্যক্ষ করিতে এই স্থানে বহু লোকের সমাগম হয়।

দেবীর সেবায়েত ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত। প্রতিদিন পূজান্তে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সামসেরগঞ্জ

মেলা বিবরণী

জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরীপূজার মেলা

জীয়ৎকুণ্ড গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে জীয়ৎ-কুণ্ডেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপের চারিদিকে প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আট হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, সাইকেলে এবং পদব্রজে মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং পনের-কুড়ি জন ফেরীওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং উহার মধ্যে ময়রা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, বই-ছবি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা ও হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। প্রধানতঃ স্থানীয় ব্যবসায়ীগণই প্রতি বৎসর মেলায় দোকান দিয়া থাকেন।

মনসা (পদ্মাদেবী) পূজার মেলা

ধুসড়ীপাড়া গ্রামে পদ্মাদেবীর বিসর্জন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লদশমী তিথিতে পূজা প্রাঙ্গণের আশেপাশে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

মেলায় সাধারণতঃ কামালপুর, পুরাতন মণ্ডলপুর, নিমতিতা, সেরপুর, আরঙ্গাবাদ, হিরাণপুর, শিবনগর লোহরপুর, দুর্গাপুর ইত্যাদি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ ট্রেণে, গরুর গাড়ীতে এবং পদব্রজে মেলায় আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন নিমতিতা ও আরঙ্গাবাদ হইতে প্রতি বৎসরই কিছু সংখ্যক বিক্রেতা ও ফেরীওয়ালা মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলায় সর্বমোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। দোকান-পাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, ঔষধপত্র ও কাপড়-চোপড় ইত্যাদি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহা ছাড়া, শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা (আট আনা হইতে ৪৲।৫৲ টাকা পর্যন্ত) আদায় করা হয়।

মেলায় মনসামঙ্গল গানের আসর বসে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় পনের শত শ্রোতার সমাগম হয়।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সুতী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বহুতালী।
২০।২,৩৫২’৮২।৮৩৬।৪,৭৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, যাদব, তিলি, বারুই, জেলে, ক্ষত্রিয়, চামার, রাজবংশী, ছুতার, নাপিত, কুনাই ও মুসলমান। গ্রামে পাড়া দশটি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজগাঁ (বীরভূম) হইতে হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে বীরভূম জেলার সীমানা।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, ইদলফেতর ও ইদুজ্জোহা উৎসব।

(ঙ) কার্তিক মাসে অমাবস্যার পরের দিন কালী প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে বিকালে মাত্র কয়েক ঘণ্টার জন্য আট-দশটি ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান বসে। প্রতিমা বিসর্জন দেখিতে এই সময় দুই-তিন শত লোকজনের সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে দুর্গাপূজার জন্য টিনের চালাযুক্ত মাটির ঘর এবং কালীপূজার জন্য একটি পাকা ও একটি কাঁচা বেদী আছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের দুইটি মসজিদ আছে; উহার একটি পাকা অপরটি মাটির ঘর বিশেষ। ইহা ব্যতীত, গ্রামে মালিক দেওয়ান সাহেব নামক জনৈক ফকিরের একটি সমাধি স্থান এবং মহরম উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামটি অতি প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। গ্রামের একাংশ রাঢ় অঞ্চলের মাঠ, অপরাংশ বাগড়ী ভূমি। শেষাংশে রবিশস্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু বাঁকা নদীর অত্যধিক প্লাবনে ফসল ভাল হয় না। গ্রামের জেলিয়া কৈবর্ত মৎস্য ব্যবসায়ীরা মাছের চাষ করেন এবং বহু দূরবর্তী স্থান হইতে চারা মাছ খরিদ করিবার জন্য ব্যবসায়ীরা এখানে আসেন। গোপজাতি দই, দুধ, ক্ষীর, ছানা প্রভৃতির ব্যবসায় করিয়া থাকেন। এখান হইতে নিয়মিতভাবে বহু স্থানে ছানা সরবরাহ করা হয়।

শ্রীধীরেন্দ্র কুমার বাচস্পতি, প্রধান শিক্ষক,
বহুতালী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রামঃ ও পোঃ বহুতালী-ভায়া-নলহাটী,
মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : হিলোড়া। ৩৩।২,৬৮০’৩৭।৪৯০।২,৫৮৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, গোয়ালা, বৈরাগী, কৈবর্ত, ছুতার, কামার, নাপিত, বৈশ্যসাহা, রাজবংশী, মুচি, ডোম, কুনাই ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবয়ায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পূর্বে জঙ্গীপুর রোড, পশ্চিমে বাঁশলই এবং মুরারই। ভারত সরকারের অধুনা নির্মিত জঙ্গীপুর-ধুলিয়ান জাতীয় সড়কের প্রায় চার-পাচ মাইল পশ্চিমে হিলোড়া গ্রামটি অবস্থিত। এই রাস্তায় মোটর চলাচল করে। বর্ষাকালে গ্রামের উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম ধারে এই ইউনিয়নস্থিত হারুয়া, ডাহিনা, গম্ভিরা এবং বংশবাটী গ্রাম ব্যতীত অন্যান্য প্রায় সকল স্থানে যাতায়াত করিতে হইলে নৌকার প্রয়োজন হয়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের বনবিহার উৎসব, আষাঢ়ের শেষ বৃহস্পতিবার জোরান বিবির উৎসব, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণে রাসযাত্রা, মাঘে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে পঞ্চমদোল উৎসব, চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলপূজা, কংসব্রত ও শিবের গাজন উৎসব এবং মহরম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন, জীতাষ্টমীতে গেরিয়া পূজা এবং প্রতি শনি-মঙ্গলবার স্থানীয় তপশীল সম্প্রদায়ের বিশেষ উৎসব ঘুরকী পূজা হয়। এই পূজায় চাষী পরিবারের স্ত্রীলোকেরা মানসিক পূজাদি দেন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা, কার্তিক মাসে সাতদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের দক্ষিণ দিকে খড়ের চালাযুক্ত একটি ভগ্ন শিবমন্দির ও সাধারণের রক্ষাকালী ও শীতলা দেবী আছে। ইহাভিন্ন গ্রামে বহু শিবলিঙ্গ আছে।

পূর্বে হিলোড়া একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। বর্তমানেও রাস্তায় স্থানে স্থানে ইঁটের গাঁথনির ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। এই গ্রামে বহু দীঘি ও পুষ্করিণী আছে। ধানক্ষেতগুলি গ্রাম হইতে বহু দূরে অবস্থিত। তাহা হইতেই বুঝা যায় গ্রামটি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

এই গ্রামটি মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার সীমান্তে অবস্থিত; ফলে উৎসব-পার্বণে বীরভূমের অন্তর্ভুক্ত আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীরাও অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃপক্ষে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে যে মেলা বসে, তাহা বীরভূমের অন্তর্গত জাজিগ্রাম নামক গ্রামেই বসে এবং সেইজন্য ইহা জাজিগ্রাম-হিলোড়ার মেলা নামেই অভিহিত।

শ্রীঅবনী ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
হিলোড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ হিলোড়া,
মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : বংশবাটী। ৪০।৩,৪৯৫'৮২।৫০৭।২,৭২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, গন্ধবণিক, নাপিত, কামার, কুমার, ছুতার, কলু, ধোপা, রাজবংশী, মাল, হরিজন ও মুসলমান। দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড হইতে বর্ষাকাল ভিন্ন, অন্যান্য ঋতুতে মোটরবাস ও সাইকেলে যাতায়াত করা যায়। বর্ষাকালে নৌকার প্রয়োজন হয়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা ও রাজ-রাজেশ্বরী পূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক। ইহাছাড়া, আষাঢ়, আশ্বিন ও চৈত্র শুক্লপঞ্চমীতে এবং কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বুদ্ধেশ্বরীদেবীর পূজা হয়। রাজরাজেশ্বরী ও বুদ্ধেশ্বরী পূজা সর্বজনীন।

(ঙ) রাজরাজেশ্বরী পূজার মেলা। মাঘমাসে দশদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে একটি পাকা মন্দিরে রাজ-রাজেশ্বরীদেবী ও তাঁহার ভৈরব শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

বংশবাটী গ্রাম সম্পর্কে সঠিক কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। তবে লোক পরম্পরায় শোনা যায় যে, গ্রামের পূর্বদিকে বর্তমানে যে বিল আছে খুব সম্ভব অতীত কালে ঐদিক দিয়া গঙ্গার ধারা প্রবাহিত হইত। ইহার ফলে সেই সময় গ্রামটি রাঢ় এবং বাগড়ী অঞ্চলের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। এই গ্রামের পূর্ব দিকে "রাজঘাট" নামক স্থানে পাকা ঘাটের চিহ্ন দেখা যায় এবং গ্রামের ভিতরে যাতায়াতের পথগুলি বেশ প্রশস্ত এবং পুরাতন ইঁট দ্বারা বাঁধানো। এখনও ঐ বাঁধানো পথগুলি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। তাহাছাড়া, গ্রামটির জাতিগত বিন্যাস ইহার অতীতের গৌরবের স্মৃতি বহন করিতেছে।

গ্রামের মেলাতলা স্থানটি (বর্তমানে যে স্থানে একটি ক্লাব ঘর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) অতীত কালে এই গ্রামের প্রাণকেন্দ্র ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই স্থানটিকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে গ্রামের ঘর-বাড়ী ও রাস্তাঘাট সহরের কায়দায় সজ্জিত ছিল। এখনও এই গ্রামের সুসজ্জিত বসতি দেখিয়া ইহাকে রুচিসম্পন্ন সুষ্ঠু পরিকল্পনা অনুযায়ীই বসান হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে প্রায় তিন-চারি শত পুষ্করিণী আছে। ইহাদের অনেকগুলির ঘাট বাঁধানো ছিল—এখনও তাহার চিহ্ন দেখা যায়। এই পুষ্করিণীগুলির মধ্যে সাতটি বড় বড় স্বচ্ছসলিলা দীঘি আছে। ইহাদের নাম—শিবসাগর, রসসাগর, পদ্মসাগর, কৃষ্ণসাগর, রামসাগর, গঙ্গাসাগর ও জগৎসাগর। এই দীঘিগুলির মধ্যে কয়েকটির ঘাট এখনও অভগ্ন অবস্থাতে আছে। ইহাছাড়া, গ্রামের

বাহিরে দক্ষিণদিকে "রাজুরা" নামক একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে। প্রবাদ আছে, মুর্শিদাবাদের কোন এক নবাবের আমলে এই দীঘিটি খনন করা হয়। বহুকাল হইতে এই দীঘিতে রাজরাজেশ্বরী প্রতিমার বিসর্জন হইয়া আসিতেছে। এই দীর্ঘাকার দীঘির মধ্যস্থলে প্রায় দশবিঘা পরিমাণ স্থান ঘিরিয়া একটি পাকা প্রাচীর বেষ্টিত প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা আছে। দীঘিটিতে সারা বৎসর গভীর জল থাকে। অনেকেই বলেন যে, এই দীঘিটি রাঘব বিশ্বাস নামে নবাবের জনৈক কর্মচারী কর্তৃক খনিত হইয়াছিল। প্রত্যেক দীঘির বাঁধানো ঘাটের উপর পাকা মঠ ছিল। এই মঠগুলির কয়েকটি আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল দীঘি এবং শত শত স্বচ্ছসলিলা পুকুর এবং তাহার বাঁধানো ঘাট গ্রামের প্রাচীন ঐতিহ্যের, সামাজিক মর্য্যাদার এবং আর্থিক অবস্থার অতীত পরিচয় বহন করিতেছে।

শ্রীঅনিল কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
বংশবাটী জুনিয়র বেসিক্ বিদ্যালয়,
পোঃ জাজিগ্রাম-ভায়া-মুরারই,
মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : হারুয়া।৪৩।৮৭৭৩৫।৩৯৬।২,৮৮৮

(ক) মুসলমান, রাজবংশী, হরিজন, কামার, কুমার, গন্ধবণিক, তিলি ও ছুতার।

আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড।

বর্ষাকালে গ্রামের উত্তর-পূর্বদিকের বিল ও জলাভূমি পাগনা ও বাঁশলই নদী দ্বারা বেষ্টিত থাকায় বন্যার জলে প্লাবিত হয় এবং কার্তিক মাস পর্যন্ত তাহাতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক উৎসবটি স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক পালিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তির সাত দিন পূর্ব হইতে বুড়াশিবের গাজন আরম্ভ হয় এবং চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিশেষ ধূম-ধামের সহিত চড়কপূজা হইবার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে তিন-চারদিন ব্যাপী গান বাজনা ও আমোদ-প্রমোদ চলে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে সাড়ম্বরে পূজা, ছাগবলি ও সর্বজনীন ভোজ হয়। কালীমূর্তিটি শ্রীজীতেন্দ্র নাথ নন্দী নামে সৈন্য বাহিনীর জনৈক হাবিলদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। কালীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, লক্ষ্মী ও কালীর মন্দির আছে।

শ্রীশিবশঙ্কর কবিরাজ, শিক্ষক,
গ্রামঃ ডাহিনা,
পোঃ হারুয়া,
মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : আরঙ্গাবাদ (মৌজা : ইছলিপাড়া)। ৫৯।৬৮৩৮৬। শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত

(ক) তাঁতী, কুমার, বারুই, জেলে এবং মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন নিমতিতা হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। নিকটবর্তী পদ্মা নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রী পূজা, মাঘে সরস্বতী পূজা।

গ্রামের তাঁতী সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে চারিদিন ব্যাপী অনন্তব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে ব্রহ্মার মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয় এবং উৎসবান্তে ঐ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

ইহাভিন্ন, গ্রামের বাগশিরা পাড়ার জমিদার গৃহে প্রতিষ্ঠিত শতাধিক বৎসরের প্রাচীন রাধাগোবিন্দ

জীউর দোল, ঝুলনযাত্রা প্রভৃতি উৎসবাদি বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) অনন্তব্রহ্মপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্রহ্মমন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির, পাঁচটি শিবমন্দির ও তাঁতীপাড়ায় একটি শীতলা মন্দির আছে।

দিল্লীর বাদশাহ আরঙ্গজেব-এর নামানুসারেই গ্রামের নাম আরঙ্গাবাদ হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়। বাদশাহ-এর আমলে এই গ্রামে একটি সরাইখানা ও সেনানিবাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এই গ্রামের ভূগর্ভ হইতে কারুকার্য খচিত অনেকগুলি ইষ্টক ও একটি লম্বা কালোপাথর পাওয়া গিয়াছে। মাত্র সাত-আট বৎসর আগে গঙ্গা নদীর ভাঙ্গনের ফলে এই গ্রামের কিছু অংশ ভাঙ্গিয়া গেলে সেখান হইতে বাদশাহী আমলের বহু আশরফী পাওয়া যায়। ইহাভিন্ন, গ্রামের কয়েক স্থানে মাটির নীচে হাতীর হাড় এবং গ্রামের "শেখপুরা" পাড়ায় আরবী অক্ষর খোদাই করা কতকগুলি লম্বাকারের পাথর পাওয়া গিয়াছে। গ্রামে একটি প্রাচীন ভগ্ন ইন্দারা আছে। ঐ ইন্দারার নীচে নামিবার জন্য সিঁড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। অনুমান করা হয়, বাদশাহী সেপাইদের জলপানের সুবিধার জন্য উক্ত ইন্দারাটি নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীমহেন্দ্র নাথ দাস, প্রধান শিক্ষক,
আরঙ্গাবাদ জুনিয়র বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ আরঙ্গাবাদ,
মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : রমাকান্তপুর।৮৪।৯৪ ১০।২৯৯।১,৮১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, তাঁতী, রাজবংশী, তিলি, বৈশ্যবণিক, ভুঁইমালী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে ব্যাণ্ডেল-বারহারওয়া লুপ রেলপথে সাজনিপাড়া রেলস্টেশন হইতে জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামের পূর্বদিকে প্রবাহিত গঙ্গা নদী দিয়া আষাঢ় হইতে কার্তিক মাস পর্যন্ত স্টীমার ও নৌকা চলাচল করে। মালপত্র আমদানী রপ্তানীর জন্য এই জলপথ বিশেষ সাহায্য করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘে সরস্বতী পূজা, চৈত্রে রক্ষাকালীপূজা এবং সংক্রান্তিতে নীলপূজা ও চড়ক।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

রক্ষাকালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি রক্ষাকালীর মন্দির ও একটি শিবলিঙ্গ আছে।

গ্রামটি বহুকালের প্রাচীন। চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবের পরিক্রমায় "সাধিয়ানুরপুর" নামক যে গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা এই রমাকান্তপুর গ্রামের পাশেই অবস্থিত।

শ্রীঅনাথবন্ধু মিশ্র, শিক্ষক,
খড়িবোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নুরপুর, মুর্শিদবাদ।

৭। গ্রামঃ আহিরণ।১০২।২.১৭০'০৪।১,১০০।৪,০৯৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোয়ালা, রাজবংশী, বৈশ্য বণিক, কামার, চামার, ধোপা, নাপিত ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। জাতীয় সড়ক গ্রামের নিকট দিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কোজাগরী পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে খেতুর পঞ্চমী মহোৎসব এবং চৈত্র শুক্লাষ্টমীর তিথিতে সর্বজনীন বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি গত চৌদ্দ-পনের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং আটদিন ব্যাপী চলে। উৎসব উপলক্ষে সিনেমা প্রদর্শনী, কবিগান এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) খেতুর পঞ্চমীর মেলা। আশ্বিন মাসে চারিদিন ব্যাপী। মেলাটি দশ বৎসরের প্রাচীন।

লক্ষ্মীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি দশ বৎসরের প্রাচীন।

বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি দশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাসন্তী, লক্ষ্মী ও দুর্গার মন্দির আছে একটি পঞ্চানন্দ, একটি শিবলিঙ্গ ও একটি রাধা-গোবিন্দের মূর্তি আছে।

শ্রীবিজয় কুমার মজুমদার, শিক্ষক,
আহিরণ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ আহিরণ,
মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : আলমপুর ।১০৫।৩৯৩'৪০।২৪৪।১,৩৮৬
জেহেলীনগর ।১০৬।৮৩'৭০।৮১।৪৯৭

(ক) মাহিষ্য, রাজবংশী, ছুতার, ব্রাহ্মণ, নাপিত ও ডোম।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আহিরণ এবং গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে জঙ্গীপুর রোড রেলস্টেশন। গ্রামের মধ্য দিয়া ফরাক্কা-রামনগর জেলাবোর্ডের রাস্তা এবং পশ্চিম পাশে অনতিদূর দিয়া কলিকাতা-শিলিগুড়ি জাতীয় সড়ক চলিয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকাযোগে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখে মহামায়াপূজা ও সংক্রান্তিতে ব্রহ্মা-পূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা এবং মাঘে সরস্বতীপূজা। ইহাছাড়া, শ্মশানকালী, ষষ্ঠী, রক্ষাকালী এবং বুড়াশিব প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) মহামায়াপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) মহামায়া ও দুর্গাদেবীর মণ্ডপ আছে। মহামায়াদেবীর মণ্ডপে রক্ষাকালী ও শিবের স্থান আছে। ইহাছাড়া, একটি বুড়াশিবের ও একটি শ্মশানকালীর স্থান আছে।

গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, গিরিয়ার প্রথম যুদ্ধে (১৭৪০ খৃঃ) নবাব সরফরাজ খাঁ-র অন্যতম সেনানায়ক আলমচাঁদ বাহাদুরের নামানুসারে গ্রামটি আলমপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। গ্রামে "সেখের-ডিহি" নামে একটি স্থান আছে—সেই স্থানটি খুঁড়িয়া প্রচুর হাড় পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই গ্রামটিও গিরিয়া প্রান্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস, শিক্ষক,
আলমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আহিরণ, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সুতী

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোধান উৎসব

(জরান বিবি)

জরান বিবির উৎসব হিলোড়া গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ উৎসব। এই উৎসবের প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায়, জরান বিবি নামক কোন এক মহীয়সী মুসলমান মহিলা স্বীয় সাধনা বলে অনেক কিছু অলৌকিক কার্য করিতে পারিতেন। তাঁহার যোগ সাধনায় মুগ্ধ হইয়া বাদশাহ তাঁহাকে বহু সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে আষাঢ় মাসের শেষ বৃহস্পতিবার খিচুড়ী ভোগ হইয়া থাকে। ঐদিন হিন্দু-মুসলমান সকলেই চাউল, পয়সা ইত্যাদি দান করিয়া জরান বিবির আত্মার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন।

(সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ পীর)

সুতীর নিকট ছাপঘাটি গ্রামটি বিখ্যাত মুসলমান ফকির সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ ও আনন্দময়ীর সমাধিস্থান অবস্থানের জন্য প্রসিদ্ধ।

"ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সৈয়দ মর্ত্তুজা হিন্দ নামে একজন মুসলমান ফকির জঙ্গীপুরে বাস করিতেন। জঙ্গীপুরের বালিঘাটায় তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত। বেরিঙ্গী জেলায় তাঁহার পৈতৃক নিবাস ছিল। তাঁহার পিতা সৈয়দ হোসেন কাদেরী একজন ফকির ছিলেন। মর্ত্তুজা বাল্যকাল হইতেই জঙ্গীপুর ও নিকটবর্তী স্থান সমূহে বাস করিতেন। তিনি অতি অল্প বয়সে ফকির হন এবং ঈশ্বর উপাসনায় আত্মনিয়োগ করেন।

জঙ্গীপুরের দুই মাইল দক্ষিণে চড়কা গ্রামের রাজাক সাহেব তাঁহার গুরু ছিলেন। মর্ত্তুজা সুতীর নিকট ছাপ ঘাটিতে একটি আস্তানা নির্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতেন। ......প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে তিনি এই স্থানেই দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মুসলমান ফকির হইয়াও হিন্দু ধর্মের অনুশীলন করিতেন বলিয়া তিনি মর্ত্তুজা হিন্দ নামে পরিচিত ছিলেন। আনন্দময়ী নামক এক ব্রাহ্মণ কন্যা তাঁহার ভৈরবী বা সাধক সহচরী ছিলেন। এইজন্য উভয়ে মর্ত্তুজানন্দ নামে অভিহিত হইতেন। মর্ত্তুজার কবরের পার্শ্বে আনন্দময়ীর সমাধি আজও দেখিতে পাওয়া যায়। মর্ত্তুজা অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস। পশ্চিমদেশীয় মুসলমান হইয়াও তিনি সুললিত ও মধুর বাংলা পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলী পদকল্পতরু গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। তাঁহার একটি পদের কিছু অংশ প্রদত্ত হইল :

মোরে কর দয়া, দেহ পদছায়া, শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইনু জলে, প্রাণ না রহে তোমা বিনু ॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রহিনু তুয়া পায়ে জীবন মরণ ভরি ॥

মুসমলান, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব সকলে তাঁহাকে আপনার ভাবিয়া ভক্তি করিতেন। ছাপঘাটিতে তাঁহার দরগাহ হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হয়। প্রতি বৎসর রজব মাসে তথায় একটি মেলা বসে এবং বহু ফকির ও গৃহী আসিয়া সমাধি দুইটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া থাকেন। মর্ত্তুজার স্ত্রীর নাম ছিল নিজাম বিবি এবং তাঁহাদের চারিপুত্র ও দুই কন্যা লাভ হয়, তাঁহার এক কন্যার সহিত জঙ্গীপুরের প্রাচীন মসজিদ্ প্রতিষ্ঠাতা সৈয়দ কাসিমের বিবাহ হয়। সৈয়দ মর্ত্তুজার বংশ বর্তমানেও বিদ্যমান আছে।"

[বাংলায় ভ্রমণ ২য় খণ্ড : পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ১২০]

"ছাপঘাটির দরগায় পুজো দেবার সময় মুসলমানরা বলেন 'জয় মা কালী', আর হিন্দুরা বলেন 'আল্লা হো আকবর'।"

[শ্রীবিনয় ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : ১৯৫৭ : পৃঃ ৭৯০]

কালীপূজা (রক্ষাকালী)

রমাকান্তপুর গ্রামে প্রতিবৎসর চৈত্র মাসে সর্বজনীন রক্ষাকালী পূজা হইয়া থাকে। এই পূজা এবং উৎসবটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। পূর্বে এই গ্রামের পশ্চিম পাশ দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত

হইত। বর্তমানে গ্রামের পূর্বদিক দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। ভাগীরথীর তীরে গ্রামবাসীরা একটি "থান" বা স্থান প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইখানে শ্মশানকালীর পূজা করিতেন। শ্রীমনমোহন চৌধুরী নামক জনৈক ব্যক্তি সর্ব-প্রথম এই স্থানে রক্ষাকালী পূজার প্রচলন করেন। সেই সময় হইতে এই গ্রামে রক্ষাকালী পূজা চলিয়া আসিতেছে। আরম্ভে পূজার সময় "থানে" একটি অস্থায়ী খড়ের ঘর তৈয়ারী করিয়া তাহার মধ্যে রক্ষাকালী প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হইত। ত্রিশ বৎসর পূর্বে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর নায়েব পরলোকগত ভবকালী দত্ত মহাশয় ঐ স্থানে রক্ষাকালীর জন্য একটি পাকা মন্দির তৈয়ারী করাইয়া দেন।

রক্ষাকালী খুব জাগ্রতা দেবী বলিয়া পূজিত হন। মানসিক করা ও মানসিক পূরণই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য। চৈত্র মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্যন্ত পূজা চলে। যে বৎসর চৈত্র মাসে পাঁচটি মঙ্গলবার পড়ে, সেইবার চতুর্থ মঙ্গলবারে এই পূজা হইয়া থাকে। ইহা-ছাড়া, মানতকারীদের সুবিধা অনুযায়ী বৎসরের যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার রক্ষাকালী পূজা দেওয়া চলে। তবে চৈত্র মাসের পূজাতেই প্রধান উৎসব হয়। এই সময় এই গ্রামের এবং আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের অধিবাসীরা রক্ষাকালীর নিকট তাঁহাদের মানত শোধ করেন। মানত হিসাবে সাধারণতঃ পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। চৈত্র মাসের পূজার সময় প্রায় তিন-চারিশত পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। মানতের বলি দিবার জন্য মানতকারীদের প্রত্যেককে পূর্বাহ্নে দেবীর পূজারী বা সেবায়েতের নিকট বারো আনা দক্ষিণা দিয়া বলি দিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে হয়। যাঁহারা মানত পূরণের জন্য ভোগ ইত্যাদি দিয়া থাকেন, তাঁহাদিগকেও অনুরূপ দক্ষিণা দিতে হয়। পূজার সময় গ্রামের প্রত্যেক বাড়ী হইতে অন্ততঃ একজনকে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবাসী থাকিতে হয়; পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রাম হইতে যাঁহারা ভোগ ও বলি লইয়া আসেন, তাঁহাদিগকেও পূজা না হওয়া পর্যন্ত উপবাসী থাকিতে হয়। পূজান্তে সকলে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। প্রতি বৎসর রক্ষাকালীর মৃন্ময়ী প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয় এবং ঐ প্রতিমা একবৎসর রাখিয়া পরবর্তী পূজার দিন দ্বিপ্রহরে বিসর্জন দিয়া নূতন প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। রক্ষাকালীর পূজারী হাজরা পদবীধারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

খেতুর পঞ্চমী উৎসব

বিগত দশ বৎসর যাবত আহিরণ গ্রামে আশ্বিন-কার্তিক মাসে লক্ষ্মী পূর্ণিমার পরবর্তী পঞ্চমী তিথি হইতে পাঁচদিন ধরিয়া মহাসমারোহে খেতুর পঞ্চমী মহোৎসব পালিত হইতেছে। খেতুর পঞ্চমী মহোৎসব বৈষ্ণবদের একটি প্রধান উৎসব এবং বৈষ্ণব সাহিত্যে এই উৎসবটি সুবিদিত। বর্তমানে পূর্ব পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খেতুর গ্রাম বৈষ্ণবদিগের একটি শ্রীপাট। পদ্মা নদীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামেই বৈষ্ণব মহাজন নরোত্তম ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে খেতুর বা খেতুরীর কায়স্থ পরিবারে নরোত্তম দাসের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্ত এবং মাতা নারায়ণী দেবী। নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব সম্বন্ধে বৈষ্ণব সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, তাঁহার জন্মের পূর্বে গৌড় গমন কালে শ্রীচৈতন্যদেব খেতুর বা খেতুরীর দিকে লক্ষ্য করিয়া "নরোত্তম, নরোত্তম" বলিয়া ডাক দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের এই আহ্বানেই নাকি পৃথিবীতে নরোত্তম ঠাকুরের আবির্ভাব হইয়াছিল। রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও নরোত্তম অতি বাল্যবয়সেই সংসার ত্যাগ করিয়া পদব্রজে বৃন্দাবন গিয়া সুপ্রসিদ্ধ সাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। প্রেম, পাণ্ডিত্য ও ভক্তির দিক দিয়া নরোত্তম বৈষ্ণব সমাজে একজন শীর্ষস্থানীয় মহাজন। মহাপ্রভুর দ্বিতীয় অবতার হিসাবেও ইনি শ্রদ্ধা পাইয়া থাকেন। "ঠাকুর মহাশয়" উপাধি প্রাপ্ত নরোত্তম দাসের রচিত "প্রার্থনা", "প্রেমভক্তি চণ্ডিকা", "পাষণ্ড-দলন" প্রভৃতি গ্রন্থ বৈষ্ণবদের মধ্যে নিত্য পঠিত হয়। নরোত্তম দাস কীর্তন গানের একটি নূতন ঢং প্রবর্তিত করেন—উহা "গড়ানহাটি" বা "গড়েরহাটি" নামে বর্তমানে সুপ্রসিদ্ধ। শ্রীনরহরি চক্রবর্তী রচিত বিখ্যাত বৈষ্ণব গ্রন্থ "নরোত্তম বিলাস"-এ নরোত্তম দাসের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে। ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ তাতজ ভ্রাতা রাজা সন্তোষ দত্তের সহায়তায় নরোত্তম স্বীয়

জন্মস্থান খেতুরে ছয়টি বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং এই উপলক্ষে খেতুরীতে তৎকালীন বৈষ্ণবগণ একটি মহাসম্মেলন আহ্বান করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের প্রথম মহাসম্মেলন বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে এবং মহোৎসবে বাংলার সমস্ত স্থান হইতে প্রধান প্রধান বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়াছিলেন। ইহাই খেতুর বা খেতুরী পঞ্চমীর মহোৎসব বলিয়া অভিহিত। এখনও প্রতি বৎসর লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে খেতুরে এই ঘটনার স্মারক হিসাবে মহোৎসব হইয়া থাকে।

দেশ বিভাগের পর স্থানীয় জনৈক বৈষ্ণব ভক্ত শ্রীমহেন্দ্র নারায়ণ দাস স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া আহিরণ গ্রামে এই উৎসবের প্রবর্তন করেন। গ্রামে গ্রামে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া বিগত দশ বৎসর যাবত উৎসবটি পালিত হইয়া আসিতেছে। উৎসবটি পাঁচদিনব্যাপী চলে এবং প্রায় পক্ষকাল পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজা

রমাকান্তপুর গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা হইয়া থাকে। ইহা এই গ্রামের একটি প্রাচীন সর্বজনীন পূজা ও উৎসব। পূর্বে এই পূজাটি খুবই জাঁকজমকের সহিত হইত; বর্তমানে সেরূপ আর নাই। জগদ্ধাত্রীদেবীর কোন নির্দিষ্ট মন্দির নাই। প্রতি বৎসর গ্রামবাসীদের মনোমত স্থানে মণ্ডপ তৈয়ারী করিয়া তাহাতে দেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা হয়। সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত পূজা চলে। পূজান্তে প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই পূজা উপলক্ষে গ্রামে আমোদ-প্রমোদের বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়। এই সময় একটি মেলাও বসে।

মহামায়াদেবীর পূজা

মহামায়াদেবীর পূজা ও উৎসব আলমপুর-জেহেলীনগর গ্রামে একটি বিশেষ প্রাচীন উৎসব। প্রায় শতাধিক বৎসরকাল অবধি এই উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। ভগীরথ ভণ্ড নামক একজন প্রাচীন বণিক এই গ্রামে প্রথম মহামায়া পূজার প্রচলন করেন। এই দেবীর কোন মূর্তি নাই। বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বিশেষ জাঁকজমকের সহিত ইহার পূজা হইয়া থাকে। পূজা চব্বিশ ঘণ্টা কাল স্থায়ী হয়। এই উৎসবের দিন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দল হরিনাম সংকীর্তন করিয়া থাকে এবং দেবীর নিকট নানারকম ফলমূল ও মিষ্টি মানত দেওয়া হয়। আগে ছাগ বলি দেওয়া হইত, বর্তমানে ঐ প্রথা বন্ধ হইয়াছে। মানতের বলিগুলি দেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তবে পূজা বা উৎসবের সময় ছাগ উৎসর্গ করা হয় না। শুক্লপক্ষে যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার মানতকারীরা ইহা করিয়া থাকেন। লোকমুখে শুনা যায় যে, গ্রামে একবার মোটেই বৃষ্টি হইতেছিল না। স্থানীয় গদাইপুর নিবাসী শ্রীলক্ষ্মণ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সাধু সকলকে নিরম্বু উপবাস থাকিয়া মহামায়ার মাথায় জল দিতে বলেন। ইহাতে নাকি সুফল ফলে। সেই সময় হইতে গ্রামে দেবীর পূজা শুরু হয়। এমন কি, স্থানীয় মুসলমানরাও দেবীর নিকট মানত দিয়া থাকেন। এই এই উৎসবটি আলমপুর গ্রামের অধিবাসীদের এবং বিশেষতঃ মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎসব।

দেবীর বর্তমান পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী এবং কশ্যপ গোত্র। দেবীর প্রাচীন পূজামণ্ডপ ভাগীরথী বক্ষে বিলীন হইয়া গিয়াছে। শ্রীপাঁচকড়ি দাস নামক স্থানীয় এক ভদ্রলোক দেবীর মন্দির তৈয়ারী করিবার জন্য প্রায় দেড় বিঘা জমি দান করিয়াছেন। তাহাছাড়া, দেবোত্তর আরো প্রায় দেড় বিঘা জমি আছে।

পূজাটি বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার বেলা দশটা হইতে শুরু হইয়া পরদিন সকাল নয় ঘটিকা পর্যন্ত চলে। চব্বিশ ঘণ্টার এই উৎসবে গ্রামের সর্বসাধারণ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগদান করেন।

রাজরাজেশ্বরীদেবীর পূজা

বংশবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লাসপ্তমী হইতে নবমী পর্যন্ত মহাধুমধামের সহিত রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। পূজা ও উৎসবটি যে কতকাল আগে প্রবর্তিত হইয়াছিল তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না। তবে লোকমুখে শুনা যায় যে, প্রায় আড়াইশত বৎসর আগে এই উৎসবটির সূচনা হয়। বংশবাটি গ্রামের ভট্টাচার্য বংশের জনৈক পূর্বপুরুষ রাজরাজেশ্বরী মাতার ষোড়শী মূর্তি নির্মাণ

করিয়া বাৎসরিক পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লসপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত ঠিক দুর্গাপূজার মত এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। রাজরাজেশ্বরী মাতার ধ্যান ভগবতীর ধ্যানের মতই। ইঁহার ভৈরব শিব। গ্রামের মধ্যস্থলে রাজরাজেশ্বরী মাতার পাকা মন্দির আছে। কাশী ছাড়া অন্য কোথাও এইরূপ মূর্তির অর্চনা হয় বলিয়া জানা যায় না। সাধারণতঃ ফলমূল, মিষ্টান্ন, ছাগ ও মহিষ বলি মানত হিসাবে দেওয়া হয়। ছাগ বলি হয় অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে। আরো অধিক সংখ্যায় ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয় নবমীর দিন। এই পূজা বা উৎসবের জন্য কোন সেবায়েত নাই। তবে একটি পূজা কমিটি আছে। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী মজুমদার। পূজাটি সর্বজনীন।

বংশবাটী গ্রামের শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার মহাশয়ের রচিত একটি গীতিকা হইতে রাজরাজেশ্বরী মূর্তি ও পূজার মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যায়। গীতিকাটি নিম্নরূপ :

রাজরাজেশ্বরী মাতার আগমনী গীতি

শোভিছে কেমন হেররে নয়ন
ঐ যে ভুবন মোহিনী,
এমন সুষমা কি আছে উপমা
প্রভাকর প্রভা যিনি।

শম্ভু স্বয়ম্ভু শমন
হরি ধরি সিংহাসন,
শিবশবোপর জোড় করি কর
নাভি পদ্মে মা জননী।

অপরূপ মার দৃশ্য
মুগ্ধ হেরি এই বিশ্ব
বিশ্বনাথোপরি
বসি বিশ্বেশ্বরী
মা এ বিশ্ব প্রসবিনী।

কি সুন্দর মনোহর বংশবাটি হেরি।
মহোৎসবে পূজে সবে রাজরাজেশ্বরী ॥
(মাগো) এইভাবে কোনভাবে কারে কর দয়া।
কার শক্তি ওগো শক্তি জানে তোর মায়া ॥
সত্যযুগে দক্ষযজ্ঞে শুনি দক্ষ বালা।
তুমি আদ্যা মহাবিদ্যা করেছ কি লীলা ॥
কালী তারা অসি ধরা রূপে এলোকেশী।
কিবা সাজে মা বিরাজে হইয়া ষোড়শী ॥
পরে দেবী মা ভৈরবী ও ভুবনেশ্বরী।
ছিন্নমস্তা কি অবস্থা ধুমাবতী বুড়ী ॥
তুমি উমা মা অসীমা বগলা কমলা।
তন্ত্রে উক্তি আদ্যাশক্তি মুগ্ধ করে ভোলা ॥
বিবরণ সাধুজন কাছে আছে জানা।
এ গ্রামেতে যে রূপেতে করেছ করুণা ॥
মিথ্যা নয় এ বিষয় শুনি পূর্বাপর।
ছদ্মবেশে মাতা আসে ভবানন্দ ঘর ॥
কৃপা করি মাগো তারে কর মহীপাল।
ভক্তজনে শ্রীচরণে রাখ চিরকাল ॥
ভয়ঙ্কর সরোবর গ্রামের দক্ষিণে।
ভক্ত জন্য অবতীর্ণ হও মা এখানে ॥
ঘাটে বসি মা ষোড়শী রূপে আলো করি।
সেই পথে চাই হাতে আসিছে শাঁখারি ॥
ডাকি তারে মৃদুস্বরে কন বিশ্বমাতা।
গ্রামে পূজ্য ভট্টাচার্য্য হন মম পিতা ॥
শাঁখা দাও দাম লও গিয়া তাঁর কাছে।
বলো তাঁরে বড় ঘরে সিন্ধুকেতে আছে ॥
কথা মিষ্ট শুনি তুষ্ট শাঁখারি সুজন।
যত্ন করে শাঁখা তাঁরে পরান তখন ॥
আসি গ্রামে সে প্রথমে ভট্টাচার্য্য বাড়ী।
চার টাকা, পরে শাঁখা তোমার কুমারী ॥
অত্যাশ্চার্য্য ভট্টাচার্য্য এই কথা শুনি।
হেসে বলে, নাহি ছেলে না আছে নন্দিনী

মিথ্যা নয় মহাশয় শাখারি যা বলে।
দেখ গৃহ এ সন্দেহ মিটিবে তা হ'লে ॥
চিন্তি মনে গৃহপানে চাহিল ঠাকুর।
অর্থ আর অলঙ্কার দেখিল প্রচুর ॥
হৃষ্ট হয়ে দ্রুত গিয়ে শাখারিকে কয়।
এস কোথা সে দুহিতা দেখাবে নিশ্চয় ॥
দুজনায় রাজুরায় যায় তাড়াতাড়ি।
ঘাট শূন্য দেখি ক্ষুন্ন হইল শাখারি ॥
ভক্তিভরে কর জোড়ে ডাকে বার বার।
কোথা তুমি চাই আমি দেখিতে আবার ॥
হেনকালে মধ্যস্থলে শাখাপরা কর।
দেখি মনে ধন্য মানে দোঁহে পরস্পর ॥
ধরি ধৈর্য্য ভট্টাচার্য্য বলে চল সনে।
দিব দাম পূর্ণকাম মম এতদিনে ॥
এই দাস তব পাশ নাহি চায় মূল্য।
বিশ্বমাতা বলে পিতা কেবা তাঁর তুল্য ॥

ওহে দ্বিজ পদরজ দেহ অভাগায়।
নিরাপদে আশীর্বাদে রব হে সদাই ॥
লয়ে ধূলি যায় চলি শাখারি তখন।
চিন্তা করি নিজ পুরী চলিল ব্রাহ্মণ ॥
গৃহে আসি ভাবে বসি রুদ্ধ করি কক্ষ।
অনশনে মার ধ্যানে থাকে এক পক্ষ ॥
ভক্তে দয়া মহামায়া থাকে অনুক্ষণ।
মা ষোড়শী রূপে আসি দেন দরশন ॥
বলে মাতা শুন পিতা পূজার বিধান।
দশভূজা মত পূজা মকরে নির্মাণ ॥
এত বলি যান চলি দিয়ে এ আদেশ।
খুলি দ্বার আজ্ঞা মার বলে সবিশেষ
দ্বিজবাণী তুষ্ট শুনি যত শিষ্যগণ।
ভক্তিভরে শাক্তাচারে করিল পূজন ॥
সেই হতে এ গ্রামেতে এলো কৃপা করি।
দ্বিজ কীর্ত্তি এই মূর্ত্তি রাজরাজেশ্বরী ॥

ভক্ত প্রতি ভগবতী করুণা অপার।
দয়া করে শাখারিরে করেন উদ্ধার ॥
কৃপানেত্রে চাও পুত্রে নাহি জানি ধ্যান।
ব্যোমকেশ মাগে শেষ চরণেতে স্থান ॥

বৃদ্ধেশ্বরীদেবীর পূজা

বংশবাটী গ্রামে বৃদ্ধেশ্বরীদেবীর পূজাটিও বেশ প্রাচীন। বৃদ্ধেশ্বরীদেবীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শুনা যায় যে, লালগোলার রাজা রাম শঙ্কর রায় একবার স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গ্রামের অদূরে প্রবাহিত ভাগীরথী তীর হইতে একটি প্রস্তর মূর্তি পান। প্রস্তর মূর্তিটি উঠাইয়া আনিয়া তিনি গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে প্রতিষ্ঠা এবং পূজার ব্যবস্থা করেন। ইনিই বৃদ্ধেশ্বরীদেবী। বৃদ্ধেশ্বরীদেবীর মূর্তি পক্ষীরূপা। দ্বাপরে কংস কর্তৃক নিধন হইবার হাত হইতে মুক্তিলাভের জন্য যশোদা দুহিতা কারাগার হইতে পক্ষীরূপ ধরিয়া উড়িয়া গিয়াছিলেন। এই কল্পনায় বৃদ্ধেশ্বরী-দেবী পক্ষীরূপা। দেবীর নিত্যসেবার জন্য লালগোলার রাজা প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি দেবোত্তর করিয়া দেন। এই দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে এখনো দেবীর নিত্য পূজা হইয়া আসিতেছে। আষাঢ় মাস, আশ্বিন মাস ও চৈত্র মাসের শুক্লনবমী এবং কার্তিক মাসে ভূতচতুর্দশী (কালীপূজার রাত্রে)—এই চারদিন খুব ধুমধামের সহিত বৃদ্ধেশ্বরীদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

ব্রহ্মাপূজা

জেহেলীনগর গ্রামে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে বুড়াশিবের স্থানে ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা প্রধানতঃ স্থানীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের পূজা। পূর্বে ব্রহ্মাপূজার দিন গ্রামবাসীরা কেহই কাজে যাইতেন না; এইদিন সকলেই কাজ হইতে বিরত থাকিতেন। কারণ এইরূপ বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, ব্রহ্মাপূজার দিন কাজ করিলে গ্রামের সমূহ অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এখন যদিও এই বিশ্বাসটি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে, তথাপি একেবারে উঠিয়া

যায় নাই। ব্রহ্মাপূজা সম্পর্কে আরও শোনা যায় যে, প্রাক্তন পূজারী ৺গঙ্গাধর চক্রবর্তী মহাশয় যতদিন পূজা করিয়া গিয়াছেন, ততদিন পূজা সমাপ্ত হইবার পূর্বমূহুর্তে নাকি মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইয়াছে। ব্রহ্মাপূজার দিন গ্রামের শ্মশানকালীর নির্দিষ্ট স্থানে তেল-সিঁন্দুর দিয়া পূজা করা হয়।

শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের উৎসব

হিলোড়া গ্রামের শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুর পূজাটি বহুদিনের প্রাচীন। ইহার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় যে, বহুকাল পূর্বে রামাইত সন্ন্যাসীর একটি দল এই শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের বিগ্রহ লইয়া হাঁটা রাস্তায় শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে যাইতেছিলেন। সুতীর তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ছাপঘাটিতে পৌছাইবার পর নিত্য দেবপূজার সময় উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা পদ্মাতীরে আস্তানা করিয়া ঠাকুর সেবার ব্যবস্থাদি করেন। সেই সময় নিকটস্থ বাজিতপুর গ্রামে অষ্ট ধাতু নির্মিত যাদব রায়ের বিগ্রহসহ, বলরাম, সর্বেশ্বর ও মদনমোহন বিগ্রহের পূজা-আরতি হইতে ছিল এবং তাহার ঘন্টার ধ্বনি শুনিয়া সন্ন্যাসীদলের কয়েকজন খোঁজ-খবর লইবার জন্য বাজিতপুরে উপস্থিত হন। হাঁটা পথে লইয়া যাইবার পক্ষে শ্যামসুন্দর বিগ্রহ ভারী বোধ হওয়ায় উক্ত রামাইত সন্ন্যাসীর দল বাজিতপুরস্থ যাদবরায়ের সেবায়েত মোহান্তকে শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের নিত্যসেবা ও পূজার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি রাজী হওয়ায়, তাঁহারা শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরকে বাজিতপুরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া চলিয়া যান।

এখন হইতে প্রায় চারিশত বৎসর আগে, শুনা যায়, বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধক হরিদাস বাবাজী নাকি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরকে লইয়া রাত্রিকালে বৃন্দাবনের পথে যাত্রা করেন। হিলোড়া গ্রামে পৌছাইতেই প্রভাত হইলে, তিনি শ্যামাসুন্দরদেবকে এই হিলোড়া গ্রামেই প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই হইতে এই হিলোড়া গ্রামেই শ্যাম-সুন্দরদেব ঠাকুরের নিত্য পূজা ও সেবা হইয়া আসিতেছে। প্রাতঃস্মরণীয়া রানী ভবানী এবং নবাব পরিবারের ভক্তিমতী মহিলা আসরুপন্নেসা বেগম শ্যামসুন্দর ঠাকুরের নিত্যসেবার জন্য বহু নিষ্কর জমি দেবোত্তর দান করিয়াছেন।

শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুর খুব জাগ্রত বলিয়া এই অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস। ভক্তিভাবে তাঁহার নিকট যাহা কামনা করা যায়, তাহাই নাকি পূর্ণ করেন। পঞ্জিকা মতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে শ্যামসুন্দর ঠাকুরের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তিতে বনবিহার উৎসব, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে উত্থান একাদশী, অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে পঞ্চমদোল উৎসব সমূহ মহাধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মালদহ প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানে শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের বিগ্রহ লইয়া পরিক্রমা মিছিল বাহির হয়। শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের মানতে দুধ, ছানা, মাখন এবং বিশুদ্ধভাবে তৈয়ারী কাঁচা ছানার মিষ্টি ও ফল সমূহ উৎসর্গ করা হয়। ঠাকুরের বর্তমান সেবাইত রাধাবল্লভ দেবশর্মা, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

শ্যামসুন্দরদেবের প্রাচীন মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে হনুমান দাস নামক জনৈক ভক্ত বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দিক খোলা। ইহাতে তিনটী চত্বর ও তিনটি প্রাঙ্গণ আছে। উত্তর চত্বরের মন্দির সংলগ্ন বাহির কাছারি বাড়ী, পূর্ব চত্বরে খামার ও গোলাবাড়ী। পূর্ব চত্বরের অর্ধাংশে মন্দির মধ্যে প্রবেশের জন্য পূর্ব-পশ্চিম বেষ্টিত প্রাচীর। উহার দুই ধারে মহান্তদের সমাধি মন্দির। মন্দির প্রাঙ্গনের মধ্যে দক্ষিণভাগে নানারকম ফুল গাছ ও তুলসী গাছ আছে। প্রাঙ্গণের উত্তর দিকে খোলা বারান্দা। তাহার উপর কিছু উত্তরে প্রভুজীর মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমভাগে ভোগমন্দির। ভোগ-মন্দিরের দক্ষিণে ভিতর কাছারি বাড়ী। ভিতর কাছারি বাড়ীতে মহান্ত, পূজারী ও কর্মচারীদের থাকার স্থান আছে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ সুতী

মেলা বিবরণী

অনন্তব্রহ্মাপূজার মেলা

আরঙ্গাবাদ গ্রামের তাঁতি পাড়ায় প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনন্তব্রহ্ম পূজা উপলক্ষে ব্রহ্মামন্দির সংলগ্ন জমির উপর সাতদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রত্যহ এই মেলায় প্রধানতঃ সুতী থানার অন্তর্গত প্রায় সকল গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিন হইতে চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ পদব্রজেই আসিয়া থাকেন। মেলায় বড় দোকানের সংখ্যা প্রায় কুড়িটি এবং ফেরিওয়ালাসহ ছোট-দোকানের সংখ্যা প্রায় ষাট। যে-সমস্ত দোকানপাট বসে তাহার মধ্যে ময়রা, তেলে-ভাজার দোকান, তামা-পিতল, কাঁচ ও লোহার তৈয়ারী জিনিসের দোকান, মাটির বাসনের দোকান, বই, কাটা-কাপড়, মিল ও তাঁতের কাপড়ের দোকান এবং মাটির পুতুলের দোকান থাকে। মেলা উপলক্ষে যাত্রা, কবিগান ও আলকাপ গানের আয়োজন করা হয়।

কালীপূজার মেলা

মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত হিলোড়া গ্রামটি বীরভূম জেলার সীমান্তে অবস্থিত। এই গ্রামে কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে যে মেলাটি বসে, তাহা বীরভূম জেলার অন্তর্গত জাজিগ্রামে বসিয়া থাকে। এই কারণে মেলাটি জাজিগ্রাম-হিলোড়ার মেলা নামে স্থানীয় অঞ্চলে খ্যাত। মেলাটি চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতি বৎসর সাতদিনব্যাপী চলে। যাত্রীরা প্রধানতঃ হিলোড়া ও জাজিগ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম সমূহ হইতে এবং ধুলিয়ান, জঙ্গীপুর, নলহাটি ও রামপুরহাট হইতে গরুর গাড়ী ও সাইকেল যোগে আসেন। প্রায় সাতহাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং উহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক দেখা যায়।

মেলা বসিবার স্থানটির কিয়দংশ দেবোত্তর এবং অবশিষ্টাংশ ব্যক্তি-বিশেষের। মেলায় দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যা প্রায় সত্তরটি। ইহাভিন্ন, মিলের, তাঁতের ও কাটা-কাপড়ের দোকান ; লোহা ও কাঁচের বাসনপত্রের দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতি, বিভিন্ন কারুশিল্পের দোকান, বই-ছবির দোকান এবং কাঠের তৈয়ারী আসবাবপত্রের দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং লটারী ও জুয়া খেলা চলে। ইহাভিন্ন, গত দুই-তিন বৎসর যাবত শহরাঞ্চলের একটি দল সিনেমা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতেছে।

(রক্ষাকালী)

রমাকান্তপুর গ্রামে চৈত্র মাসে রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে গ্রামের হিন্দু পাড়ার পশ্চিমে রক্ষাকালীর মন্দির সংলগ্ন প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর দুই দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া শুনা যায়।

জঙ্গীপুর মহকুমার অধীন সুতী, সামসেরগঞ্জ, রঘুনাথগঞ্জ ও লালগোলা থানা হইতে এবং অন্যান্য অঞ্চল এমন কি গঙ্গার অপর পার হইতেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। ইহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা অধিকাংশই হাঁটিয়া আসেন এবং দূরাগতরা গরুর গাড়ীতে ও ট্রেনে আসেন। মেলায় প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে। তাহার মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, লোহা, পিতল, কাঁচ ও তামার বাসনপত্র, কৃষিযন্ত্রপাতি, মাটির খেলনা, ধামা, কুলা এবং জুতা প্রভৃতির দোকান বসে।

এই মেলা উপলক্ষে নাগরদোলা ছাড়া আর কোনরকম আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হয় না। বিক্রেতাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

হারুয়া গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক ও শিবের গাজন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জমির উপর একটি মেলা

বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং একদিন মাত্র স্থায়ী হয়।

হিলোড়া, আহিরণ, মহেশাইম প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়ন হইতে হাঁটিয়া এবং গরুর গাড়ীতে মোট প্রায় দুই হাজার যাত্রী মেলার আসেন।

মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। দোকান-পাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির বাসনপত্র ও খেলনা-পুতুলের দোকান, লোহার তৈয়ারী কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদির দোকান এবং তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নৃত্য-গীত ও আলকাপ গানের ব্যবস্থা করা হয়।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে রমাকান্তপুর গ্রামের দক্ষিণে নুরপুর ডাকঘরের উত্তরে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং চার-পাঁচদিনব্যাপী চলে।

মেলায় সুতী এবং রঘুনাথগঞ্জ থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে মোট প্রায় দেড়হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং জঙ্গীপুর ও আরঙ্গাবাদ হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। খাবার, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, চা-পান-বিড়ি এবং শাকসব্জী প্রভৃতির মোট পনের-ষোলটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান আলকাপ গান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা চলে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এখানে মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানীর একটি কুঠীর ছিল এবং ঐ কুঠীরের অনেক কর্মচারী এখানে বসবাস করিতেন। জমিদারী হইতে জগদ্ধাত্রীপূজা ও মেলার জন্য অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইত বলিয়া মেলা উপলক্ষে নানা প্রকার আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হইত। কলিকাতা হইতে নামকরা পেশাদারী যাত্রা-থিয়েটারের দল আসিত এবং শেখ গুমানী, শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী প্রভৃতি বিখ্যাত কবিয়ালরা আসিতেন। বর্তমানে অর্থাভাবে মেলাটির পূর্বের জাঁকজমক বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

মহামায়াপূজার মেলা

আলমপুর গ্রামে বৈশাখ মাসে মহামায়ার পূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ পার্শ্বস্থ ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর দুই দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

রঘুনাথগঞ্জ থানার জরুর, দফরপুর, তেঘরী, মিঠিপুর, হিলোড়া, আহিরণ, নুরপুর, বহুতালী ইত্যাদি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার-পাঁচ হাজার যাত্রী আসেন। রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত কাগুপুর, খিদিরপুর, জঙ্গীপুর, ভৈরবটোলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে বিক্রেতারা আসেন। মেলায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকান বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে সাধারণতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, পিতল, তামা, লোহা, কাঁচের বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, কবিরাজী ঔষধ-পত্রের দোকান, বইয়ের দোকান, তাঁত, মিল ও কাটা-কাপড়ের দোকান প্রভৃতি দেখা যায়। তাহাছাড়া, বাঁশের জিনিস, মাটির পুতুল, পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকান বসে। মেলায় দোকানদারগণের নিকট হইতে কোন রকম তোলা আদায় করা হয় না।

রাজরাজেশ্বরীদেবীর পূজার মেলা

বংশবাটী গ্রামে মাঘ মাসে রাজরাজেশ্বরী মাতার পূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত দেবীর মন্দিরের সামনে দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরে প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। নবমী পূজার দিন হইতে দশ-বারো দিন ব্যাপী মেলাটি স্থায়ী হয়।

আশেপাশের ইউনিয়নভুক্ত গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় সাত শত নরনারীর সমাগম হয় মাত্র বারো-চোদ্দটি দোকানপাট ও চার-পাঁচজন ফেরীওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার ও মনিহারী দোকান ব্যতীত তামা, পিতল, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের কয়েকটি দোকান

বসে। বিক্রেতারা আরঙ্গাবাদ, নয়াগ্রাম ও কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন।

মেলা উপলক্ষে যে-সমস্ত আমোদ-প্রমোদের অয়োজন করা হয়, তন্মধ্যে যাত্রা, কবিগান, থিয়েটার, ম্যাজিক, সিনেমা ও আলকাপ গান অন্যতম। কিন্তু কবিগান, সিনেমা, ম্যাজিক প্রতি বৎসর নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয় না। গ্রামের একটি যাত্রাদল যাত্রাভিনয় করেন এবং আলকাপ গানের দলটি আসে পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম হইতে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : রঘুনাথগঞ্জ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সেকান্দরা।১৪।১,০৮৬'৮।১৯৫৪।৫,৫৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, কুমার, ছুতার, তাঁতী, তিলি ও নাপিত। পাড়া এগারটি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড। গ্রামের অনতিদূরে জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। ইহাভিন্ন, গরুর গাড়ী ও বর্ষাকালে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমায় সাড়ম্বরে কৃষ্ণ-কালীপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণকালী মূর্তির অভিনবত্ব আছে; উহার উর্দ্ধাঙ্গ কালীমূর্তি এবং নিম্নাঙ্গ কৃষ্ণমূর্তি। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কৃষ্ণ-কালীপূজার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) কৃষ্ণ-কালী, শিব, তক্ষকনাগ এবং জীয়ৎকালীর পৃথক পৃথক স্থান আছে। প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার সাধারণতঃ স্থানীয় অঞ্চলের মৃতবৎসা এবং বন্ধ্যা নারীরা জীয়ৎকালীর নিকট মানসিক করিয়া থাকেন। মানত হিসাবে এই দুইদিন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বহু মুসলমানও জীয়ৎকালীর নিকট মানসিক করিয়া থাকেন।

শ্রীভগবতী চরণ রায়, প্রধান শিক্ষক,
সেকান্দরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গিরিয়া, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : মিঠিপুর।১৫।৬১৮'১৭।৫৫২।৩,৩৫০

(ক) রাজপুত, ক্ষত্রিয়, কনৌজী ব্রাহ্মণ, দোসাদ, রাজবংশী, ব্যাধ, বৈষ্ণব ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও রেশমশিল্প ব্যবসায়।

(গ) এই গ্রামের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিক দিয়া এক মাইলের মধ্যে ভাগীরথী নদী বেষ্টন করিয়া আছে। দেড় মাইল দূরে জঙ্গীপুর শহর। রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা। ইহাভিন্ন, গ্রামে নাগপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন। কালীপূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজাটি রাণী ভবানীর আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মহরমের মেলা একদিন। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) কালীমন্দির, দুর্গামণ্ডপ এবং মহরম উৎসবের জন্য নির্ধারিত কারবালা স্থান আছে। এই গ্রামে গিরিয়ার যুদ্ধ খ্যাত সরফরাজ খাঁ-র বংশধরগণ এখনও বসবাস করিতেছেন।

শ্রীভূপতি ভূষণ সিংহরায়, সভাপতি,
৫নং মিঠিপুর ইউনিয়ন,
পোঃ মিঠিপুর, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : গিরিয়া।৩৫।১,৫২২'২৬।১,১৫৪।৬,৭২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, ছুতার, বৈষ্ণব, গোয়ালা, মালো, বৈশ্যবণিক, মুচি, ডোম, স্বর্ণকার ও মুসলমান। পাড়া ছয়টি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড এবং আহিরণ হল্ট স্টেশন। জঙ্গীপুর হইতে লালগোলা পর্যন্ত জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। গ্রামের মধ্য দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত। বর্ষাকালে নৌকা এবং স্টীমার চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখী সংক্রান্তিতে সত্যনারায়ণের পূজা আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতী পূজা। সত্যনারায়ণ পূজাটি পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। কালীপূজায় একদিন সর্বজনীন প্রসাদ

বিতরণ করা হয়। সরস্বতী পূজাটি পঞ্চমী হইতে সপ্তমী পর্যন্ত তিনদিন ধরিয়া চলে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি সাত-আট বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে দুইটি পাকা মন্দির আছে। উহার একটিতে মদনমোহনদেবসহ রসিকরায় ও রসবতী বিগ্রহ এবং অপরটিতে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির দুইটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা হয়। ইহাভিন্ন, গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দতলা আছে।

গিরিয়া গ্রামটি ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কারণ এই স্থানে দুইবার যুদ্ধ হয়। একবার নবাব আলিবর্দী খাঁ-র সহিত সরফরাজ খাঁ-র এবং দ্বিতীয়বার ইংরাজদের সহিত মীরকাসেমের।

শ্রীঝড়ূপদ দাস, শিক্ষক,
গিরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গিরিয়া, মুর্শিদাবাদ।

Giria—Village in the Jangipur subdivision, situated on the east bank of the Bhagirathi about five miles north-east of Jangipur. It is also the name of a *taraf* or tract of country in *pargana* Shamaskhali, which includes six villages on the east bank and three on the west bank of the Bhagirathi. The name has been given to two battles fought in the neighbourhood, the first between Ali Vardi Khan and Sarfaraz Khan in 1740 and the second between the English and Mir Kasim's army in 1763.
(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p.l).

৪। গ্রাম : ভৈরবটোলা (মৌজাঃ গিরিয়া)। ৩৫।১,৫২২'২৬।১,১৫৪।৬,৭২৩

(ক) মাহিষ্য, রবিদাস, ব্রাহ্মণ, কাহার ও মুসলমান। পাড়া চারটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আহিরণ হইতে মোটর বাস পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিকে কালীপূজা এবং প্রতি শনি ও মঙ্গলবার শ্মশানকালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে কালীর একটি স্থান আছে। কোন মন্দির নাই। ইনি গ্রামের সাধারণের দেবী।

শ্রীঅবনী কান্ত দাস, শিক্ষক,
ভৈরবটোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ লবণচোয়া, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : গোসাঁইপুর।৬৭।২২৬'২৮।৩৩২।১,৮৩২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। পাড়া পাঁচটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড এবং লালগোলা। লালগোলা হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। পদ্মা নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহরমের মেলা। একদিন। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীআহম্মদ হোসেন, প্রধান শিক্ষক,
গোসাঁইপুর ইষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দয়ারামপুর, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : মণ্ডলপুর।১০৭।৯৩৭'১০।১৯৪।৯৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, চামার, কামার, রাজবংশী, নাপিত, সদ্‌গোপ, বেনে, কুড়ল ও সাঁওতাল। গ্রামে

নয়টি পাড়া—সাঁওতালপাড়া, কুড়লপাড়া, কামারপাড়া, চামারপাড়া, মোড়লপাড়া, বৈরাগীপাড়া, বামুনপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড এবং গনকর রোড। বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময় জঙ্গীপুর রোড স্টেশন হইতে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) মাঘ মাসের শুক্লপ্রতিপদে বুড়াশিবপূজা। মাঘ-ফাল্গুনে সাঁওতালদের কালীপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বুড়াশিবের স্বরূপ শিবলিঙ্গ আছে। বর্তমানে ভগ্ন প্রায়। শিবের পাকা বাঁধানো স্থান আছে।

মণ্ডলপুর গ্রামটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়া মনে হয় ইহা বহুদিনের প্রাচীন গ্রাম। গ্রামের অনতিদূরে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষের ছোট ছোট ইষ্টকখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা-ছাড়া, "আকসাটি" নামে একটি প্রাচীন পুকুর ও তৎসংলগ্ন ডাঙ্গা, "নলকুয়া" নামে ছোট একটি পুকুর, "বাগিচা ডাঙ্গা" নামে একটি বাগানবাড়ী ও "দুর্গাডাঙ্গা" নামে দুর্গাপূজার একটি স্থান এখনও বিদ্যমান। অনেকে মনে করেন, এই স্থানে জনৈক রাজার বসবাস ছিল এবং উপরোক্ত নিদর্শনগুলি তাঁহারই কীর্তি।

শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
মণ্ডলপুর স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাড়ালা, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : বাড়ালা॥১০৮।১,৫৫৫·১০।৪৩০।২,০৫১

(ক) ধোপা, নাপিত, তিয়র, রাজবংশী, শুঁড়ি, বেদে, মাল, কুড়ল, হাড়ি, মুচি, বেনে, গোয়ালা, রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও মুসলমান। পাড়া ছয়টি।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জঙ্গীপুর রোড। গ্রামের মধ্য দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা, পৌষে পৌষ-পার্বণ ও নবান্ন উৎসব, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) বাড়ালা গ্রামে বহুকালের প্রাচীন একটি কালী মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত কালী এবং শিব মূর্তি আছে। এই কালী দক্ষিণাকালী নামে পরিচিতা। দক্ষিণাকালী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীর বিশ্বাস। গ্রামে নলকূপ নামে একটি কূপ আছে। কিংবদন্তী এই যে, বহুকাল পূর্বে এইস্থানে নল নামে জনৈক রাজা বসবাস করিতেন। তাঁহার পুত্রবধূ নাকি একদিন এক ঘর হইতে আর এক ঘরে হাত বাড়াইয়া নিজের ছেলেকে কোলে তুলিয়া লইয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া রাজার সন্দেহ হয় যে, তাঁহার পুত্রবধূ মানবী নয়—রাক্ষসী। তখন তিনি একটি কূপ খনন করাইয়া তাহার মধ্যে ঐ পুত্রবধূকে নিক্ষেপ করিয়া প্রাণনাশ করেন। এই কূপে এখনও পর্যন্ত জল আছে। সম্ভবতঃ গঙ্গার সহিত ইহা সংযুক্ত। শবদাহ করিতে অক্ষম বহু দরিদ্র পরিবার মৃতদেহ এই কূপের মধ্যে ফেলিয়া যায়। স্থানটিতে বহু সাধক কালী সাধনা করেন।

শ্রীরমাদাস ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বাড়ালা,
মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : মির্জাপুর॥১৩১।৭২৯·৮১।৪৬৫।২,২৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কামার, কুমার, ছুতার, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, গোয়ালা, তাঁতি, সাহা, চামার, কুনাই, মালো, শাখারী, তিলি, কায়স্থ, বৈষ্ণব, নাপিত, পুণ্ডরীক ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গনকর। জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে শীতলাপূজা, কার্তিকে রক্ষাকালীপূজা, দক্ষিণাকালীপূজা, কার্তিকপূজা এবং শিয়ালকালীরপূজা।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

কার্তিকপূজার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে যথাক্রমে দক্ষিণাকালী, শিয়ালকালী, রক্ষাকালী এবং শীতলার স্থান আছে। শীতলার শিলামূর্তি আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আছে।

মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জ হইতে গ্রামটি চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামের মধ্য দিয়া রেল লাইন চলিয়া গিয়াছে। তাঁতীরাই গ্রামের মধ্যে বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায়। পূর্বে এই গ্রামে প্রায় সাতশত ঘর তাঁতীর বাস ছিল, বর্তমানে প্রায় তিনশত ঘর তাঁতী বাস করেন। সকলেই রেশম শিল্প ব্যবসায়ী। Twisted yarn দিয়া বস্ত্র বুনিয়া থাকেন। কিছুদিন পূর্বে "রেশম শিল্পী সঙ্ঘ", "অভয় আশ্রম" ও "রেশম শিল্প সমিতি" নামে তিনটি সমবায় সমিতি স্থাপিত হইবার পর তাঁতীদের অবস্থার একটু উন্নতি হইয়াছে।

শ্রীরমাকান্ত আচার্য, প্রধান শিক্ষক,
মির্জাপুর দ্বিজপদ উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম : রঘুনাথপুর।১৫৩।৩৬৮·৯৯।১৯৫।১,১১৫

(ক) পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, গোয়ালা, নাপিত, মাল, ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবণিক, চাঁই, ফুলডোম (বীর বংশ), চামার ও কামার। পাড়া পাঁচটি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মণিগ্রাম। লোকাল বোর্ডের রাস্তা আছে। বর্ষাকালে নিকটস্থ ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকায় চলাচল করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, চৈত্রে শিবপূজা ও ব্রহ্মাপূজা। রঘুনাথপুর গ্রামের কোন একটি পরিবারে একদা একটি শিশু সন্তান পুড়িয়া মারা যায়। সেই হইতে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ব্রহ্মাপূজা হইয়া থাকে। ব্রহ্মাপূজার সহিত বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা হইয়া থাকে। চার দিন ধরিয়া পূজা হয় এবং পনর দিন পূর্ব হইতে মূর্তি প্রস্তুতের কাজ শুরু হয়। মানত হিসাবে চিনি, বাতাসা ও নানা রকম মিষ্টি দ্রব্যাদি দেওয়া হয়। ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় পদবী ধারী ব্রাহ্মণ প্রধান সেবায়েত।

(ঙ) ব্রহ্মাপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পনর বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ব্রহ্মা ঠাকুরের পাকা মন্দির আছে।

শ্রীপ্রভাকর দাস, শিক্ষক,
রঘুনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কলাবাগ, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : রঘুনাথগঞ্জ

উৎসব বিবরণী

কার্তিকপূজা

মির্জ্জাপুর গ্রামে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি কার্তিকপূজা হয়। বহুকাল পূর্ব হইতেই এই গ্রামে কার্তিকপূজার প্রচলন আছে। পূর্বে চল্লিশ-পঞ্চাশটি পূজা হইত। বস্তুতঃ কার্তিকপূজা এই গ্রাম ও আশেপাশের গ্রাম সমূহের একটি আঞ্চলিক উৎসব বলিয়াই গণ্য হয়। গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে সর্বপেক্ষা বর্ধিষ্ণু ও সংখ্যাধিক তাঁতী সম্প্রদায় তাঁহাদের বাড়ীতে নিজ নিজ কৌলিক প্রথা-অনুযায়ী কার্তিকপূজা করিয়া থাকেন এবং এইজন্য তাঁহাদের মধ্যে পূজাটি একটি বিশেষ উৎসবের আকার ধারণ করে। পূজা উপলক্ষে কোন কোন পরিবারে কার্তিকের একক মৃন্ময় মূর্তি গঠন করা হয়, আবার কোন কোন পরিবারের দুই দিকে দুই কার্তিক এবং মধ্যস্থলে শিব—এইরূপ মূর্তি গঠন করা হয়। শিবসহ দুই কার্তিক সজ্জিত পূজাগুলি দিনের বেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য কার্তিকপূজাগুলি সাধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী রাত্রেই অনুষ্ঠিত হয়। পূজার পরদিন রাত্রে গ্রামের বারোয়ারী তলায় সমস্ত কার্তিকমূর্তিগুলিকে একত্রে রাখিয়া গভীর রাত্রি পর্যন্ত উৎসব করা হয়। এই দিন বারোয়ারীতলায় প্রায় এক হাজার হইতে দেড় হাজার নরনারী সমবেত হন।

কালীপূজা

মণ্ডলপুর গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায় প্রতি বৎসর রটন্তী চতুর্দশী তিথির পরবর্তী অমাবস্যা তিথিতে স্ব স্ব গৃহে কালী পূজা করিয়া থাকেন। বাঁধনাপরবের ন্যায় এই কালীপূজাও সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কালীপূজার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করা হয় এবং ঐ বেদীর উপর একটি জলপূর্ণ কলসী স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা হয়। পূজার দিন রাত্রে যাঁহার বাড়ীতে পূজা তিনি একটি বড় পিতলের কলসী মাথায় লইয়া পুকুরের জলে নামেন এবং এক ডুবে ঐ কলসী জলপূর্ণ করিয়া বেদীতে স্থাপন করেন। অতঃপর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের সর্দার পূজা করেন। পূজায় ছাগ ও মোরগ বলি দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে মদ্য পান করেন।

বাড়ালা গ্রামে একটি প্রাচীন পাকুড় গাছের নীচে পুরানো ছোট ইঁটের তৈয়ারী ভগ্নপ্রায় একটি ঘরে দক্ষিণা-কালীর স্থান আছে। দেবী প্রস্তর নির্মিত। আষাঢ় মাসে নবমীর দিন এই গ্রামের এবং আশেপাশের গ্রামের অধিবাসীরা দুধ, চাউল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি নৈবেদ্য দিয়া দেবীর বিশেষ পূজা করিয়া থাকেন। পূজায় পায়সান্ন ভোগ দেওয়া হয়। প্রায় এক হাজার নরনারী এই পায়সান্ন ভোগ পাইয়া থাকেন। পুনরায় মাঘ মাসের রটন্তীচতুর্দশীতে খিচুড়ী ও মাংস ভোগ দিয়া দেবীর পূজা করা হয়। এই সময়ও প্রায় এক হাজার নরনারী প্রসাদ পান। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পূজার সময় দক্ষিণাকালীর তিন দিন ধরিয়া পূজা করা হয়। ইহাছাড়া, প্রত্যহ দক্ষিণাকালীর পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা আছে। প্রত্যহ সন্ধ্যায় ভক্ত সমাগম হয় এবং তাঁহারা মায়ের স্থানে কীর্তনাদি করিয়া থাকেন।

মির্জ্জাপুর গ্রামে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দক্ষিণাকালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে পূর্ব প্রান্তে দক্ষিণাকালীর স্থান আছে। পূজাটি জনৈক ব্রাহ্মণ পরিবারের কৌলিক পূজা। এই পরিবারের জনৈক তান্ত্রিক সাধক কর্তৃক পূজাটি প্রবর্তিত হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। উক্ত সাধক পঞ্চমুণ্ডির বেদী তৈয়ারী করিয়া দক্ষিণাকালীর পূজার্চনা করিতেন। এই কারণে গ্রামবাসীরা স্থানটিকে মহাপবিত্র স্থান বলিয়া মনে করেন। মূর্তি নির্মাণ করিয়া কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে দক্ষিণাকালীর বাৎসরিক পূজা হয়। পূজারী পরিবারের পূজার সময় পশুবলি দেওয়া হয়। প্রতি বৎসর কালী প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়।

মির্জ্জাপুর গ্রামের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত রক্ষাকালীর স্থানে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে রক্ষাকালীর বাৎসরিক পূজা হয়। বাৎসরিক পূজার পরদিন স্থানীয় সর্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত চাঁদা দিয়া শিশু ও দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করা হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ঐদিন সকলেই মায়ের খিচুড়ী প্রসাদ গ্রহণ

করেন। বাৎসরিক পূজা ছাড়াও গ্রামে বসন্ত বা কলেরা রোগ দেখা দিলে রক্ষাকালীর বিশেষ পূজা দেওয়া হয়।

মির্জ্জাপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে শিয়ালকালীর স্থান অবস্থিত। এই দেবীর পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন বা তিথি নাই। শিয়াল বা কুকুর কামড়াইলে লোকে দেবীর নিকট মানসিক করেন। স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, দেবীর নিকট মানসিক করিলে শিয়াল বা কুকুরের কামড় হইতে বিষ সঞ্চারিত হইতে পারে না এবং আহত ব্যক্তি নিরাময় লাভ করেন। বৎসরান্তে মানতকারীরা দেবীর নিকট মানতের পূজা দিতে আসেন। শিয়ালকালীর স্থান সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া মানতকারীরা পূজা দিয়া থাকেন। দেবীর কোন স্থায়ী পূজারী না থাকায় মানতকারীরা নিজেরাই সঙ্গে করিয়া পূজারী এবং মানতের পশু বলিদান দিবার জন্য খাতক লইয়া আসেন। কালীর ধ্যানে দেবীর যথাবিহিত পূজা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বাঙালা গ্রামে বহুকাল হইতে চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক-পূজা ও শিবের গাজন হইয়া আসিতেছে। চড়কপূজার সময় শিবমন্দিরের নিকট লতাপাতার একটি অস্থায়ী ঘর তৈয়ারী করা হয়। চড়কপূজার তিনদিন গ্রামের জাগ্রত-দেবী দক্ষিণাকালীকে ঐ ঘরে রাখিয়া খুব ধুমধামের সহিত শিব ও দক্ষিণাকালীর পূজা করা হয়। এই সময় অনেকে শিব ও কালীর ভক্ত হন। ভক্তরা পূজার তিন দিন উপবাস করেন। দক্ষিণাকালীর মন্দিরের নিকট একটি পুকুর আছে। এই পুকুরে সারা বৎসর চড়কগাছটিকে ডুবাইয়া রাখা হয় এবং চড়কপূজার সময় চড়কগাছ পুকুর হইতে তোলা হয়। চড়কগাছের গায়ে লোহার আঁকড়া বাঁধা আছে। পূর্বে ভক্তরা এই আঁকড়া পিঠে ফুঁড়িয়া চড়কগাছে ঘুরিতেন। বর্তমানে এই প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও ভক্তরা মাথায় আগুন নিয়া ধূপদান উৎসব পালন করেন। জোড়ায় জোড়ায় ভক্তারা বেগুনের কাঁটা বুকে চাপিয়া ধরিয়া একসঙ্গে গড়াগড়ি দেন এবং আগুনের কুণ্ড জালাইয়া তাহার উপর আগুন ঝাঁপ দেন।

স্থানীয় মাঠের মধ্যে নলকূপ নামে একটি কূপ আছে। ঐ স্থানে পূর্বে মৃতদেহ ফেলা হইত। চড়কপূজার সময় ভক্তরা নলকূপ হইতে মড়ার মাথা আনিয়া তাহাতে সিঁন্দুর মাখাইয়া বাঁ-হাতে ঝুলাইয়া ঢাক-ঢোলের বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতে করিতে সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। নৃত্যের মাঝে মাঝে তাঁহারা "শিবোমহে" বলিয়া ধ্বনি বা বোল দিয়া থাকেন। চড়কপূজার তিনদিন ভক্তরা সর্ব প্রকার শারীরিক ও মানসিক সংযম পালন করিয়া থাকেন।

শীতলাপূজা

মির্জ্জাপুর গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে প্রাচীন একটি অশ্বত্থগাছ ও একটি শ্যাওড়া গাছের নীচে শীতলা দেবীর নির্দিষ্ট স্থান ও বেদী আছে। ঐ বেদীর উপর স্থাপিত প্রায় সাড়ে চার হাত লম্বা, দেড়হাত চওড়া এবং একহাত উঁচু একটি শিলাখণ্ডকে শীতলা জ্ঞানে পূজা করা হয়। শীলাখণ্ডটির মধ্যস্থলে একটি গর্ত আছে। শীতলাদেবীর পাশেই সাতটি শিবলিঙ্গ—তাহার পাশে পাথরে খোদাই করা একহাত উঁচু যোগিনী মূর্তি আছে। ইহার নিকটেই শীতলাপুকুর নামে একটি পুকুর আছে। শীতলাদেবীর স্থায়ী ব্রাহ্মণ পূজারী আছেন—প্রতিদিন দেবীর পূজা হয়। তবে বৈশাখ মাসের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার বিশেষ পূজা হয় এবং ঐ মাসের মঙ্গলবার ও শনিবারে সবিশেষ আড়ম্বরের সহিত বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলা বসে। এই সময় অর্থাৎ বৈশাখ মাসের মঙ্গল ও শনিবারে আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে দলে দলে নরনারী সমবেত হইয়া শীতলার নিকট মানতের পূজা দিয়া থাকেন। যে-কোনো রোগ বা ব্যাধি, বিশেষতঃ বসন্ত রোগের আক্রমণ হইতে উদ্ধার পাইবার ও নিরাময় লাভ করিবার উদ্দেশ্যে স্থানীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা শীতলাদেবীর নিকট মানত করিয়া থাকেন। মানত হিসাবে পদ্মফুল ও অন্যান্য ফলফুল, মিষ্টান্ন, পাঁঠা, ঢাক, ঢোল ইত্যাদি উৎসর্গ করা হয়। গঙ্গাজলের ভার (দুইটি জলপূর্ণ কলসীকে 'ভার' বলে) এবং ঘটপূর্ণ দুধও মানত দেওয়া হয়। স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের বহুলোক শীতলা-দেবীর নিকট মানত করিয়া থাকেন। মানতের পশুগুলি বলি দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে নানাস্থান হইতে কয়েকটি কীর্তনের দল আসিয়া শীতলাপূজার বেদীর চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তন গাহিয়া থাকেন।

মির্জাপুর গ্রামের এই শীতলাদেবী খুবই জাগ্রত দেবী বলিয়া প্রত্যেক পরিবারের যে-কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে শীতলাদেবীর স্থানে পূজা দেওয়া হয়। কয়েক বৎসর পূর্বে স্থানীয় মহকুমা শাসকের সভাপতিত্বে একটি পূজা কমিটি গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে উক্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে দেবীর পূজাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে। যাত্রীদের সুবিধার্থে একটি বিশ্রামাগার ও নলকূপের ব্যবস্থাও করা হইয়াছে।

শিবপূজা (গম্ভীরা উৎসব)

মণ্ডলপুর গ্রামে দীর্ঘকাল যাবত মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া মাকরী সপ্তমী তিথি পর্যন্ত বুড়াশিবের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মাকরী সপ্তমীর দিন হোম করিয়া ষোড়শোপচারে বুড়াশিবের পূজা হইয়া থাকে। বুড়াশিবের যাঁহারা ভক্ত হন, তাঁহারা মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদে নাপিতের কাছে কামান করিয়া গঙ্গাস্নানান্তে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন এবং ঐ দিন রাত্রিতে খৈ-দৈ খান। তাঁহারা এইভাবে চতুর্থী তিথি পর্যন্ত নিয়ম পালন করেন। বাসন্তী পঞ্চমীর দিন দিবাভাগে উপবাস করিয়া সন্ধ্যার সময় তাঁহারা স্থানীয় জমিদারের "হালদার পুকুর" নামে পুকুরটির ধারে মাত্র আড়াই মুড়ো খড়ের জালে খিচুড়ী রান্না করিয়া শিবের নামে উৎসর্গ করিয়া ঐ খিচুড়ী পুকুরের জলে ফেলিয়া দেন। পরে শেষ রাত্রিতে তাঁহারা খৈ-দৈ ভক্ষণ করেন। এই খিচুড়ী রান্নার পূর্বে ভক্তগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া কুল গাছের কাঁটাভর্তি ডাল ভাঙ্গিয়া আনেন এবং তাহার উপর গড়াগড়ি দেন। ইহার পর ভক্তরা দ্বাদশ প্রণাম করেন।

দ্বাদশ প্রণামের স্থানীয় মন্ত্র নিম্নরূপ :

"আদি বন্দ্য অনাদি বন্দ্য।
আর বন্দ্য ধর্মের পা ॥
ত্রিশ কোটী দেবতা বন্দ্য।
আর বন্দ্য গুরুদেব ব্রহ্মা ॥
ডাহিনে দামোদর বন্দ্য বাঁয়ে হনুমান।
শিরে তুলি বন্দ্য গোঁসাই ॥
জাজ্জ্বল্যমান।
আর বন্দ্য সরস্বতীরগণ ॥"

প্রতিবারে এই মন্ত্র পাঠান্তে ভক্তরা নিম্নলিখিত দেবতাদের উদ্দেশ্যে দ্বাদশ প্রণাম করেন। যথা :

১। গয়ায় যে গদাধর তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
২। কাশীতে যে বিশ্বেশ্বর তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৩। পাইকরে যে ক্ষেপাকালী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৪। গদাইপুরে যে পেটকাটী মা তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৫। তক্ষকে যে নাগেশ্বরী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৬। জরুরে যে জরুরেশ্বরী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৭। বাড়ালার যে দক্ষিণাকালী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৮। সিদ্ধিকালীতে যে সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
৯। বন্যায় যে বন্যেশ্বরী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
১০। মণ্ডলপুরে যে মোড়াকালী তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
১১। সামনে যে বুড়াশিব তাঁহার চরণে দ্বাদশ প্রণাম।
১২। আপন আপন মাতাপিতা গুরুর চরণে দ্বাদশ প্রণাম।

প্রত্যহ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া এই দ্বাদশ প্রণাম তৃতীয়া, চতুর্থী এবং পঞ্চমীর দিন রাত্রিতে জানান হয়। ভক্তদের মধ্যে যিনি দেয়াসী, তিনি পঞ্চমীর রাত্রিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিছু সিম বা বেগুন সংগ্রহ করিয়া প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর দুয়ারে রাখিয়া আসেন। সকাল বেলায় গৃহস্থগণ ঐ দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিয়া কালো কলাই-এর সহিত সিদ্ধ করেন এবং ঐ সিদ্ধ কলাই দিয়া শীতলাষষ্ঠীর ভোগ দেন। ষষ্ঠীর দিন ভক্তগণকে নিরম্বু উপবাস থাকিতে হয়। এইদিন তাঁহাদের পক্ষে মলমূত্র ত্যাগ, থুথু ফেলা এমন কি ধূমপান করাও নিষেধ। সকাল বেলায় ভক্তগণ প্রথমে শিবলিঙ্গে উত্তমরূপে গব্যঘৃত ও হলুদ মাখাইয়া আপন আপন দেহে উহা মাখেন এবং নূতন কাপড় পরিয়া একগাছি সরু দড়ি দিয়া তুলসী মঞ্জরী কোমরে বাঁধেন। এই প্রথাকে গ্রামে 'কাঁচবাঁধা' বলে। তাহারপর ভক্তগণ হালদার পুকুরে স্নান করিয়া বুড়াশিবতলায় দাঁড়াইয়া বোলান গান করেন। বোলান গানের সময় বুড়াশিবের সম্মুখে ভক্তরা সারি দিয়া দাঁড়ান এবং সকলে একসঙ্গে গান করেন। পরপৃষ্ঠায় কয়েকটি বোলান গান দেওয়া হইল :

নমঃ শিবায়ঃ

(১)

দেহ দেহ হরের ধ্বনি দেহ জয়জয়কার।
মন দিয়া শুন হে নর ধর্ম বিচার ॥
পঞ্চদেবতা শিরে বন্দ্য হরিতে ভকৃতি।
গঙ্গার চরণ বন্দ্য আর লক্ষ্মী সরস্বতী ॥
এস মাগো সরস্বতী মোর কণ্ঠে বসো।
মেলে যেন গাঁথের ফুল পাঁচিল জুড়ে এসো ॥
মেলে যেন গাঁথের ফুল কুঁদের কুঁদলী।
পাট মহাদেব শাখ চালাবেন পাছে খান গুঁড়ি ॥
কি শাঁখ চালাব ভাইরে ওড়াই কাপড় নাই।
আপনি গিয়ে তাঁত বুনে হনুমান বুনে নলী ॥

(২)

হিন্দুর পাকে ফেলে নলী দেন্থর পাকে তোলে।
এসো রে কাপড়ে ভাই গাঙ্গের মণ্ডপ যায় ॥
গাঙ্গের মণ্ডপ যেতেরে ভাই কি কি নিয়ম চাই।
নয়া হাঁড়িটি আলো চাল এঁটের কলাপাত ॥
সারাদিন না খাবি ভাইরে বেলগাছের সোহাগ।
নয় বাহন না ওরা বাহন টোনা বাহন আর ॥
পিঠের মাস খান খান হ'লো মাঘ মাসের জারে ॥

(৩)

আগে যায় ওরা পাছে যায় বান।
ষোলশত দৈত্য দানা পড়িল পরান ॥
পড়িল ব্রততী সাগরের কূলে।
কেহ বান্দে কাঁচ দড়ি কেহ বান্দে চুলে ॥
মৎস্য মকর তারা পলায় যে দূরে।
মৎস্য মকর পলায় না কারে যেরা ॥
পাতালের বাসুকীর ডরে হালে গা।
আইল ব্রততী লইয়ে প্রহর ॥
উদিত হৈলা গোসাঁই এল দামোদর।
চড়ে মারন চাপড়ে সে নাই ॥
দহ দহ অনলে পোড়ায়ে সে মারে।
দহ দহ অনল ঘোষের কেদার ॥
সে ভাই তরিলে নাহিক নিস্তার।
ইহাতে তরাবেন ভাই ভোজন ॥
এক দুইয়ে হবিষে নাগ নাহি পায়।
প্রথম হবিষে নুন তেল খায় ॥
অষ্টম দরিদ্রে তাকে এসে পায়।
একুশ হবিষে নয় নিরাধার ॥
সেই নর না যায় যমের দুয়ার।
সেই নর থাকে ভাইরে শিবের ভুবনে ॥
পবনের পুত্র তবে বীর হনুমান।
ধর ধর হনুমান বাটার তাম্বুল খাও ॥
শিব আজ্ঞা হ'লো বাছা ব্রহ্মাসদন যাও।
হনুমান রথে চড়ি গেল ব্রহ্মার ভবন ॥
চতুর্বেদ করি ব্রহ্মার বন্দিলা চরণ।
আসুন বসুন কৈলা গোসাঁই কমল লোচন ॥
কি কারণ আইলা বাছা পবন নন্দন।
গোসাঁই ইহলোক অন্যলোক পরলোকে গতি ॥
মর্ত্তের ব্রততী করেছেন ব্রত।
ইহার লাগি তোমায় সেবেন শিব ভোলামহেশ্বর ॥
যেখানে আছেন শিব ভোলানাথ, সেখানে আছি আমি।
আনন্দ করি ব্রত হনুমান করাও গিয়ে তুমি ॥
নিবেদন কৈলা কিছু পবন নন্দন।
অঙ্গ বাড়াইয়া হনুমানকে দিয়া আলিঙ্গন ॥
ইহার অঙ্গিকার ভার তোমার চরণে লাগে।
কেশের আগে ব্রততী যদি এক কেশ নড়ে ॥
জলন্ত অনলে প্রবেশিলে যেন মরে।
পবনের পুত্র তবে বীর হনুমান।
হনুমান রথে চড়ি গেলা পূর্ব দুয়ার ॥

(৪)

পূর্ব দুয়ারে আছে হেঙ্গুল মণ্ডলী।
হেঙ্গুল মণ্ডলীকে বল ডাক দিয়ে ॥
দাতা আইলোরে ব্রততী এল প্রহর ভরিয়ে ॥
এলো আজ্ঞা হ'লো দাও দুয়ার ছাড়িয়ে।
যুঝিবারে যায় বীর ঢাল খাঁড়া লয়ে ॥

কার কিঙ্কর পরিচয় দাওরে আগিয়ে।
পরিচয় দিলেন হনুমান করেন কোলাকুলি ॥
কেহ কারো লইলা ভাই চরণের ধূলি।
পূর্ব দুয়ার বীর যায় ছাড়াইয়ে ॥
দক্ষিণ দুয়ারে বীর পড়ে লাফ দিয়ে।
দক্ষিণ দুয়ারে আছে কুবের ভাণ্ডারী ॥
কুবের ভাণ্ডারীকে বল ডাক দিয়ে।
দাতা আইলোরে……চরণের ধূলি ॥
দক্ষিণ দুয়ার বীর যায় ছাড়াইয়ে।
পশ্চিম দুয়ারে বীর পড়ে লাফ দিয়ে ॥
পশ্চিম দুয়ারে আছে গোবর মণ্ডলী।
গোবর মণ্ডলীকে বল ডাক দিয়ে ॥
দাতা আইলোরে……চরণের ধূলি।
পশ্চিম দুয়ার বীর যায় ছাড়াইয়ে ॥
উত্তর দুয়ারে বীর পড়ে লাফ দিয়ে।
উত্তর দুয়ারে আছে হিম প্রহরী ॥
হিম প্রহরীকে বল ডাক দিয়ে।
দাতা আইলোরে……চরণের ধূলি ॥
উত্তর দুয়ার বীর যায় ছাড়াইয়ে।
চার দুয়ার ছাড়াইয়ে এল পবন নন্দন ॥
বসিবারে দিল বীরকে ইজুক আসন।
কপাট ঘুচাও ভাই হুরুক ধুরুকে ॥
ঠাকুর দেখি স্থবুল তুরুকে।
স্থবুল তুরুকে নিদে ঘোর ॥
পাট ব্রাহ্মণে চাহে কোড।
পাট ব্রাহ্মণে রথে যায় ॥
রথে যায় না নড়ে রং।
ব্রতভীকে ব্রত দিও সিঁদুর রং ॥
সিঁদুর রং পেয়ে সে।
ডরে ডরায় পৃথ্বীতে ॥
আনরে বালার দড়ি।
শঙ্করে পুজিব হাতে মেরে তালি ॥
তোমার ডালি খাবো না দাবো।
সন্দেশে পরাপর যাবো ॥
হেম পরাপর পেয়ে পুয়ে।
ভাঙ্গা মণ্ডপ ছেয়ে ছুঁয়ে ॥

বৈস গোসাঁই প্রভাত হ'য়ে।
গামবির পাটে গা গড়াইয়ে ॥
এক প্রহর দুই প্রহর কাতর হ'য়ে মনে।
দোষ মেগে লই শিবের চরণে ॥
সিনান করাব গোসাঁই কেমনে সে জানি ॥
আনগা ব্রহ্ম কমণ্ডুলের পানি।
সেও পানি নেতের ছানি ॥
বিষ্ণু দিলেন খাপরের পানি।
সেও পানি নেতের ছানি ॥

(৫)

শিব দিলেন জটের পানি।
সেও পানি নেতের ছানি ॥
আনগা গয়া গঙ্গার পানি।
সেও পানি নেতের ছানি ॥
আনগা গয়া ভাগীরথীর পানি।
সেও পানি নেতের ছানি ॥
পাঁচ পানি নিরামিষ জল।
তাম্বার গারু গঙ্গার জল ॥
তাম্বার গারু মাটির ভরত।
সিনান করাব গোসাঁই আকাশেরই তরফ ॥
সিনান করাব গোসাঁই ভোলা মহেশ্বর।
রক্ষা কর প্রভু অষ্ট প্রহর ॥
ঢাক ঢোলে ভাই তুমি হও সাক্ষী।
কুবের ভাণ্ডারী তুমি হও সাক্ষী ॥
নীলাম্বর তুমি হইও সাক্ষী।
ষষ্ঠীর প্রথম প্রহরে প্রহর দিয়ে ॥
যে বর মাগে সে বর পেয়ে।
মনের বাসনা সিদ্ধি করে ॥

ইহাই শিবের বোলান নামে অভিহিত। গ্রামে তিনটি দেবতার স্থানে ইহা পাঠ করান হয়। এই গ্রামের মণ্ডল বংশের যে-কোন এক ব্যক্তি লেখা দেখিয়া পদ্য ছন্দে বোলান পাঠ করিয়া থাকেন আর ভক্তরা তাহা আবৃত্তি করেন। তিনটি স্থানের মধ্যে প্রথমে শিবতলায় তারপর কালীতলায়, সর্বশেষে গ্রাম্য দেবী মোড়াকালীতলায় বোলান গান পাঠ করা হয়। অতঃপর দেয়াসী মোড়া-কালীকে মাথায় করিয়া শিবতলায় লইয়া আসেন। পরে

বোলান গান শেষে ভক্তগণ ঢাকীকে সঙ্গে করিয়া শ্রীশ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক নিম্নলিখিত বিবিধ গান করিতে করিতে গ্রামের প্রতি গৃহ হইতে চাউল, পয়সা আদায় করেন এবং সংগৃহীত অর্থাদি ভক্তরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লন।

গান

পাতায় পাতায় বেড়ায় কৃষ্ণ
ডালে না দেয় পা।
তা দেখে যশোদা রানী
কপালে মারে ঘা॥
নামো নামো নামো বাছা
দেব দামোদর।
খেলতে দেব সোনার পাশা
খেতে দিব সর॥
গাছ থেকে নামরে গোপাল
ওরে যাদুমণি।
খেতে দেবো দুধ ক্ষীর
খেতে দেবো ননী॥

এইরূপ নানা প্রকার গান গাহিয়া ভক্তরা সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘুরিয়া বেড়ান। সন্ধ্যার সময় শিবের মাথায় ফুল ও ফল চড়ান হয়। সাধারণতঃ কোন স্ত্রীলোকের সন্তান হইতে দেরী হইলে অথবা কোন কুমারীর বিবাহ হইতে দেরী হইলে তাঁহারা ভক্তদের নিকট আসিয়া শিবের মাথায় ফুল বা ফল চড়ান।

এই অনুষ্ঠানে শিবের মাথায় প্রথমে আতপ চাউল চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়, পরে তাহার উপর ফুল বা ফল চড়ান হয়। যদি ঐ ফুল বা ফল আপনি গড়াইয়া ভক্তদের হাতে পড়ে তবে সন্তান হইতে বা বিবাহ হইতে দেরী নাই বুঝিতে হইবে। ফুল বা ফল পৃথক পৃথক ভাবে চাপান হয়। সন্তানের জন্য ফল এবং বিয়ের জন্য ফুল। রাত্রিতে ধুপবানের অনুষ্ঠান হয়। ভক্তদের মধ্যে দেয়াসী ব্যক্তি এই কাজ করেন। তাঁহার জিভ ফোঁড়ানো হয়। কখনো কখনো অন্য ভক্তদেরও ফোঁড়া হয়। পরে জলন্ত অগ্নি-শিখায় ধুনার ছিটা দেওয়া হয়। ইহাই ধুপবান।

ধুপবানের শেষে আর একবার বোলান গান পাঠ করান হয়। মাকরী সপ্তমীর দিন ভোর রাত্রিতে মোড়াকালীকে ভক্তগণ আবার মস্তকে করিয়া তাঁহার স্থানে রাখিয়া আসেন। মোড়াকালী গ্রাম্য দেবী এবং তিনি খুব জাগ্রত। শ্রাবণ মাসের প্রতি শনি-মঙ্গলবারে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। দক্ষিণাকালীর ধ্যান মন্ত্রে ইঁহার পূজা হয়। পূজায় ছাগ বলিদান হয়। ইনি গ্রামের রক্ষাকর্ত্রী। শুনা যায়, এই মোড়াকালীর মহিমায় মণ্ডলপুর গ্রামে ডাকাতি হয় না। একবার কোনো কালে একদল ডাকাত ডাকাতি করিতে আসিয়া মায়ের কাছে প্রণাম করিয়া আর চক্ষে দেখিতে পায় নাই। তারপর তাহারা (ডাকাতরা) মায়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আবার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পায় এবং ডাকাতির আশা ছাড়িয়া দিয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যায়।

ভক্তগণ মাকরী সপ্তমীর দিন সকালে কোমর হইতে তুলসী মঞ্জরীর বাঁধন খুলিতে খুলিতে নিম্নোক্ত ছড়া কাটেন:

"নাচিয়ে কাঁদিয়ে মোরা হইলাম উল্লাস,
গম্ভীরা ছাড়িয়া শিব যাও হে কৈলাস।"

গানের সঙ্গে সঙ্গে খুব জোরে ঢাক বাজিতে থাকে। ইহাকেই ভক্তগণ শিবকে কৈলাস পাঠিয়ে দেওয়া বলেন। পরে ভক্তগণ স্নানাদি সারিয়া আহার বা পারণ করেন।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : রঘুনাথগঞ্জ

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

গিরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় গ্রামবাসীর উদ্যোগে এবং তৎকালীন গিরিয়া বি. ও. পি. ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত প্রধানকর্মকর্তা শ্রীশান্তিপদ ব্যানার্জী মহাশয়ের আপ্রাণ চেষ্টায় এই মেলার প্রবর্তন হয়।

মেলায় প্রধানতঃ সুতী, জঙ্গীপুর, দয়ারামপুর, কালীতলা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুরগাড়ী ও সাইকেলে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জঙ্গীপুর, কালীতলা, দয়ারামপুর, নূরপুর, মিঠিপুর, বিশ্বনাথপুর ও একবরপুর গ্রামসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় প্রায় সতর-আঠারটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরীওয়ালা আসেন। মেলায় নানারকম জিনিসপত্রের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি বেশী আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য গান-বাজনা, আলকাপ গান, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের একটি যাত্রাদল অভিনয় করে ; অধিকারীর নাম শ্রীবৈদ্যনাথ উপাধ্যায়, গ্রাম এবং পোঃ গিরিয়া, জেলা : মুর্শিদাবাদ।

ভৈরবটোলা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালী-পূজা উপলক্ষে স্থানীয় লবণচোয়ার সরকার বংশের দানকৃত প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ মিঠিপুর আহিরণ, নূরপুর, দয়ারামপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা বেশী।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি এবং শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকানের সংখ্যা বেশী। তাছাড়া, প্রতি বৎসর ফতুল্লাপুর গ্রামের সুন্দর মাটির পুতুলও এই মেলায় আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দক্ষিণাস্বরূপ কিছু অর্থ গ্রহণ করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় গ্রামবাসীগণ রাত্রিকালে হরিনাম সংকীর্তন করেন।

(কৃষ্ণকালীপূজার মেলা)

সেকান্দরা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসপূর্ণিমায় কৃষ্ণকালী পূজা উপলক্ষে গ্রামের উত্তর প্রান্তে সাধারণের প্রায় পাঁচ-সাত বিঘা পরিমাণ জমির উপর সাত-আট দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ মিঠিপুর, দয়ারামপুর এবং তেঘরী ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী যোগে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জঙ্গীপুর থানার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় দোকান-পাটের মধ্যে খাবারদাবার, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়-চোপড় এবং চা-পান-বিড়ির দোকানই বেশী। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য আলকাপ গান, যাত্রা এবং কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে; অধিকারীর নাম শ্রীজগন্নাথ দাস, গ্রাম : সেকান্দরা, পোঃ গিরিয়া।

কার্তিকপূজার মেলা

মির্জাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক সংক্রান্তিতে কার্তিকপূজা উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলাটি প্রাচীন। প্রায় বার হাজার যাত্রী এই মেলায় উপস্থিত হন। পূজার দুই-এক দিন পূর্ব হইতে স্থানীয় ও আশে-পাশের গ্রাম হইতে বিক্রেতারা মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। দোকানপাটের মধ্যে অধিকাংশই মিষ্টান্ন খাবার ও মনিহারী দোকান। ইহাভিন্ন, অন্যান্য জিনিসের দোকানপাটও থাকে।

মেলায় সার্কাসের দল আসে।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

বাড়ালা গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর পাচ দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ আশেপাশের এবং কিছু সংখ্যক দূর গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় একশত এবং অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি ও কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র আমদানী হয়। তাহাছাড়া, প্রতি বৎসর রঘুনাথগঞ্জ এবং জঙ্গীপুর হইতে শিল্পসামগ্রী আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সিনেমা, নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী, যাত্রাগান, থিয়েটার, কবিগান, আলকাপ গান এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়। গ্রামে একটি থিয়েটার দল আছে; অধিকারী নাম—শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায়। মেলায় আনন্দানুষ্ঠান বৃদ্ধির প্রচেষ্টার আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু এই যে, বিভিন্ন গ্রামের জগদ্ধাত্রী দেবীর প্রতিমাগুলিকে সাধারণের দর্শনের জন্য মেলা প্রাঙ্গনে আনিয়া কিছুক্ষণের জন্য রাখা হয়। পরে একে একে প্রতিমাগুলিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। তাহাতে মেলার যাত্রীগণের পক্ষে বিভিন্ন গ্রামের প্রতিমাগুলিকে একসঙ্গে দেখিবার সুযোগ হয়।

মহরমের মেলা

মহরম উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর গোসাঁইপুর গ্রামে পদ্মা নদীর তীরে স্থানীয় জনৈক জোতদারের প্রায় সাত বিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ দয়ারামপুর, পিরারাপুর, আকবরপুর, রঞ্জিতপুর, ইন্দ্রপুর, জালালপুর, শিবপুর, গোবিন্দপুর, ভাব্‌কী, শিমূলতলা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চল হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় ছয় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ উপরোক্ত গ্রামসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন এবং প্রায় পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় প্রায় আশি-পঁচাশিটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। উল্লেখযোগ্য দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানই প্রধান। ইহাভিন্ন, অন্যান্য দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য লাঠি খেলা প্রদর্শনী, ঝারনি, মোরাসিয়া, জারীগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই মোরাসিয়া এবং ঝারনি গানের দল আছে; অধিকারী শ্রীকাইমুদ্দিন মিঞা, গ্রাম : গোসাঁইপুর।

মিঠিপুর গ্রামেও বিগত দশ বৎসর যাবত মহরম উৎসব উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। এই মেলায় সাত-আট মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামসমূহ হইতে প্রধানতঃ মুসলমানগণ ঢাকঢোল ও অন্যান্য বাজনাসহ লাঠি খেলিতে খেলিতে কারবালা স্থানে সমবেত হন। বহু অমুসলমানও খেলায় যোগদান করেন। মহরমের মেলায় প্রায় চার-পাচ হাজার লোকের সমাগম হয়। মেলায় পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে।

ব্রহ্মাপূজার মেলা

রঘুনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষে চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা সরকারী জমির উপর প্রায় সপ্তাহকালের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পনর বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং মণিগ্রাম, গোবিন্দপুর, তেঘরী, পাইকপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নশিপুর, কালীতলা, কাবিলপুর, হরহরি, তেঘরী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায়

প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দোকানই বেশী বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।

শীতলাপূজার মেলা

মির্জ্জাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার শীতলাদেবীর পূজা উপলক্ষে পূজা স্থান সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের জমিতে একদিনের জন্য মেলাটি বসে।

মেলায় প্রধানতঃ মির্জ্জাপুর, দফরপুর, রঘুনাথগঞ্জ মিঠিপুর, সাগরদীঘি, মণিগ্রাম, বথেশ্বর, বংশবাটী প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড়-দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীদের সুবিধার্থে অস্থায়ী বিশ্রামাগারের ব্যবস্থা করা হয়।

বিক্রেতারা প্রধানতঃ মির্জ্জাপুর, রঘুনাথগঞ্জ, কালীতলা, সাগরদীঘি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় পনর-কুড়িটি এবং ফেরীওয়ালার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ-ষাটজন। মেলায় বিভিন্ন প্রকার জিনিসের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি ও কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বেশী আমদানী হয়। মেলাটি প্রাচীন।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সাগরদীঘি

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সেখদীঘি (মৌজা : রমনা সেখদীঘি)।
৬।৪৪৬'৭৪।৪৪০।২,১৯৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন গনকর ও মোরগ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়া জাতীয় সড়ক গিয়াছে। জঙ্গীপুর হইতে সেখদীঘি হইয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব, মাঘে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা।

চান্দ্রমাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ, মহরম, সবেবরাত পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) আবু সৈয়দ ত্রিমিজ নামে জনৈক ফকিরের সমাধি আছে।

সেখদীঘি গ্রামটি খুব প্রাচীন। এই গ্রামে "সেখেরদীঘি" নামে একটি প্রাচীন ও সুবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে গৌড়রাজ হোসেন্ শাহ এই দীঘিটি খনন করান। দীঘি খনন করিবার পর গৌড় হইতে পুরী পর্যন্ত যে রাস্তা তৈয়ারী করা হয়, তাহা জঙ্গীপুর হইয়া এই দীঘির পাশ দিয়া চলিয়া গিয়াছিল। দীঘির নাম অনুযায়ী ইহার পাশে রাজপথের উপর যে বসতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, কালক্রমে তাহাই সেখদীঘি নামে পরিচিত হইয়া উঠে।

শ্রীকমলাকান্ত পাল, শিক্ষক,
গ্রাম : ফুলবাড়ী,
পো: ধনপৎগঞ্জ,
মুর্শিদাবাদ।

Sheikher Dighi (J. L. 6)—This is a very big tank excavated north-south during the Mohammedan times about 6 miles north of the railway station Morgram (Azimganj-Nalhati Line) on the Moregram-Jangipur badshahi road which runs through Khargram on to Burdwan district. On the north of this tank is a tomb of Abu Said Tirmis. The tank itself was excavated by Husein Shah of Gour in 1540.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 191)

"মুর্শিদাবাদ জেলায় সাগর দীঘি ও মহেশ পালের দীঘির পর এতবড় দীঘি (সেখের দীঘি) আর নাই। দীঘির পার্শ্বস্থ গ্রামটিও সেখের দীঘি নামে পরিচিত। দীঘির পশ্চিম তীরে একটি প্রস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়রাজ হুসেন শাহ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে এই দীঘি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখের দীঘির ধারে আবু সৈয়দ ত্রিমিজ নামক একজন ফকিরের সমাধি আছে। ইহার নানারূপ অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল বলিয়া প্রকাশ। কথিত আছে, দীঘি খননের পর জল বাহির না হইলে হুসেন শাহের অনুরোধে ফকিরের আদেশ মত তাঁহার এক চেলা তাঁহার নিকট হইতে একটি দণ্ড লইয়া দীঘির গর্ভে পুঁতিলে জল বাহির হয়।"

[বাংলায় ভ্রমণ : ২য় খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃ: ১১৯।]

২। গ্রাম : বক্রেশ্বর।১৪।৮৫৪'০৯।৬৯।৩২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, গন্ধবণিক, রাজপুত, কামার, মালো মুচি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) আজিমগঞ্জ-নলহাটি রেলপথে অবস্থিত মোর-গ্রাম অথবা শেহাপুর গনকর স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। জঙ্গীপুর হইতে মোরগ্রাম পর্যন্ত যে জাতীয় সড়ক গিয়াছে, তাহাতে মোটরবাস চলাচল করে। সেখদীঘি গ্রাম হইতে মোটরবাস ধরিতে হয়।

(ঘ) ফাল্গুনে বক্রেশ্বর মহাদেবের শিবরাত্রি উৎসব।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের উত্তরে বন্যেশ্বর নামে খ্যাত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বন্যেশ্বর শিবের নামানুসারে গ্রামের নাম "বন্যেশ্বর" হইয়াছে।

শ্রীঅবনী কুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
বন্যেশ্বর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ তাঁতিবিরল, মুর্শিদাবাদ।

Banyeswar (J. L. 14)—This is about two and a half miles to the west of Ramna Sheikher Dighi and contains an ancient Siva temple dedicated to Banyeswar Siva. In the village there are remains of an old Badshahi bridge on the road from Ramna Sheikher Dighi to Birbhum *via* Lohagarh and Bhadrapur.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 191)

৩। গ্রাম : আথুয়া॥২৬।১৬৬·৫৬।৯৬।৫১৬

(ক) মুসলমান ও মাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন লোহাপুর। গ্রামে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে; বর্ষায় পথ চলাচলের অসুবিধা হয়।

(ঘ) চান্দ্রমাস হিসাবে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় মহরম, ঈদ্ ও সবেবরাত উৎসব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) জেলাবোর্ডের রাস্তার ধারে দরবার সাহেব নামে অভিহিত জনৈক পীরের স্থান আছে। প্রতি বৃহস্পতিবার এই পীরস্থানে "শিরনি" দিয়া ভক্তরা পূজা দেন। পূর্বে পীরোত্তর জমি ছিল। ফাল্গুন মাসে পীরের উরস্ উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা হইত। বর্তমানে ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গ্রামটি বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের সীমান্তে অবস্থিত।

শ্রীমহম্মদ নাসিরুদ্দিন, প্রধান শিক্ষক,
আথুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ তাঁতিবিরল, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : বেলোরিয়া॥৩২।৩৮৪·৪৬।১৩৪।৭২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজপুত, মাল, ছুতার, কামার, নাপিত, মুচি ও শুঁড়ি। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে রেলস্টেশন মোরগ্রাম এবং এক মাইল দূরে বাসস্ট্যাণ্ড জঙ্গীপুর।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও চৈত্রে শিবের গাজন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বুড়া শিবের পাকা মন্দির এবং মাটির তৈয়ারী ও খড়ের চালাযুক্ত দুর্গামন্দির আছে। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে শীতলা মায়ের শিলা মূর্তি অবস্থিত।

গ্রামটি ক্ষুদ্র হইলেও নবাব সরফরাজ খাঁ-র আমলেও গ্রামখানির অস্তিত্ব ছিল। বাংলার মসনদ যখন নবাব আলিবর্দী খাঁ-র হস্তগত হয় সেই সময়, হরিজী রায় চৌধুরী নামে জনৈক ব্যক্তি নবাব সরকারে কাজ করিতেন। তখন এই গ্রামে মাত্র দুই-তিন শ্রেণীর নিম্ন হিন্দু জাতির বসতি ছিল। কার্যব্যপদেশে রায় চৌধুরী মহাশয় বেলোরিয়া গ্রামে মাঝে মাঝে আসিতেন। গ্রামে কোন ব্রাহ্মণের বসতি না থাকার জন্য এবং সরকারী নানা কাজে সুবিধা-সুযোগের আশায় গ্রামবাসীগণ স্বায়নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ রায় চৌধুরী মহাশয়কে এই গ্রামে বসবাস করিবার জন্য অনুরোধ করেন। অনুরোধের কারণেই হউক অথবা প্রয়োজনের খাতিরেই হউক, তিনি এই গ্রামেই বসবাস শুরু করেন। তাহা দেখিয়া বহু উচ্চ হিন্দু পরিবার বিভিন্ন স্থান হইতে আসিয়া এই গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। যে-কয়েক জন ব্রাহ্মণ এই

গ্রামে আছেন তাঁহারা সকলেই রায় চৌধুরী মহাশয়ের বংশধর অথবা তাঁহার সমসাময়িককালের। গ্রামের পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদি তাঁহার বংশধরগণেরই দ্বারা প্রচলিত হয়।

শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরী, জোতজমা,
গ্রাম : বেলোরিয়া,
পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : পাউলী।৩৭।২৪২'০৬।১৪৬।৭১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈশ্যবণিক, মালি, কুনাই, নাপিত ছুতার, চামার এবং মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের উত্তরে প্রায় চার মাইল দূরে গনকর, পূর্বে চার মাইল দূরে মণিগ্রাম এবং দক্ষিণে প্রায় ছয় মাইল দূরে মোরগ্রাম রেলস্টেশন। গ্রামের দেড় মাইল পশ্চিমে সেখদীঘি গ্রাম হইতে জাতীয় সড়কের উপর দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ়ে রথ, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গা-পূজা ও লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণে নবান্ন, পৌষে পৌষপার্বণ, মাঘে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে বাসন্তী-পূজা ও চড়কপূজা। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায়ের চান্দ্রমাস অনুযায়ী সবেবরাত, ঈদ্, মহরম এবং ফাতেতা-দোয়াজ-দাহাম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) পাউলী গ্রামটি বুজরুক, ফতেপুর (মৌজা নং ৩৬) এবং খাড়গ্রাম (মৌজা নং ৩৫)—এই তিনটি মৌজা লইয়া গঠিত। বুজরুক, ফতেপুর এবং খাড়-গ্রামে হিন্দুর বাস। পাউলীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বাস আছে। হিন্দু পল্লীর মধ্যে একটি পীরস্থান এবং মুসলমান মহল্লায় বুড়াইচণ্ডীর একটি প্রস্তর মূর্তি আছে। খাড়গ্রামে গ্রামদেবীতলা বলিয়া একটি স্থান আছে। পূর্বে সম্ভবতঃ এখানে একটি বেদী ছিল ; বর্তমানে তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আশেপাশের হিন্দু গ্রামবাসীগণ স্থানটিতে ভক্তি সহকারে পূজা-অর্চনা করেন। বুজরুক-ফতেপুরে পূর্বে একজন সিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। খাড়গ্রামে একটি উন্মুক্ত স্থানে পাথরের একটি শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীকাজী আবদুল হামিদ, প্রধান শিক্ষক,
পাউলী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গনকর, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : কান্তনগর।৪৩।৬১২'৪৮।৪০৮।২,৩৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজপুত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, কামার, নাপিত, ডোম ও চাঁইমণ্ডল। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে রেলস্টেশন মণিগ্রাম। গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত ভাগীরথী নদীতে বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করে।

(ঘ) শ্রাবণে মনসাদেবীর পূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণে নবান্ন এবং মাঘে সরস্বতীপূজা।

গ্রামে মনসা পূজাটি ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন ; তবে ওঝারা এই উৎসবে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। উৎসবটি ষাট হইতে সত্তর বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে পাঁচ-সাত রাত্রিব্যাপী মনসামঙ্গল গান হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মনসাদেবীর একটি মন্দির, একটি পঞ্চানন্দ এবং বেলগাছের নীচে একটি শিবের স্থান আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীর দিন গ্রামের মেয়েরা শিবের স্থানে সমবেত হইয়া সন্তানদের মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীর পূজা করেন। গ্রামের অনেক লোক বৎসরে দুইবার ভক্ত হন। এই সময় তাঁহারা কঠোর নিয়মব্রত পালন করেন এবং গৃহত্যাগ করিয়া শিবের স্থানেই রাত্রি-যাপন করেন। শিব সম্বন্ধে নানাবিধ গান রচনা করিয়া তাঁহারা এই কয়দিন গ্রামে গ্রামে ঐ গান গাহিয়া বেড়ান।

শ্রীপ্রিয়নাথ দাশ, শিক্ষক,
গ্রাম : কান্তনগর,
পোঃ বালিয়া, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : মণিগ্রাম।৪৬।১,৫৩৭·২৪।৩২৪।১,৭৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তিলি, মালি, হাড়ি, ডোম, কুনাই, কামার, ছুতার, ধোপা, নাপিত, মুসলমান, সাঁওতাল এবং কোল। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, চৈত্রে বাসন্তীপূজা এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাঁধনাপরব।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্রমাসে ছয়দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের দেবদেবীর পৃথক পৃথক মন্দির বা পূজামণ্ডপ আছে। দুর্গা ও কালীদেবীর দুইটি অতি প্রাচীন মন্দির এবং একটি পীরস্থান আছে।

শ্রীঅমিয় কুমার রায়, শিক্ষক,
মণিগ্রাম স্পেশ্যাল ক্যাডার বিদ্যালয়,
পোঃ মণিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : বুজরুগ দেবগ্রাম।৮০।১৯১·০৫।২২।১২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কামার, রাজপুত, মাল ও ছুতার। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে, যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, কামারপাড়া, মালপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাগরদীঘি হইতে গ্রাম পর্যন্ত কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামের পশ্চিম দিকে জাতীয় সড়ক দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও চৈত্রে বুড়াশিবের পূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ আছে এবং একটি গোলাকার পাথরকে বুড়াশিব জ্ঞানে পূজা করা হয়। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস যে, অনাবৃষ্টি হইলে বুড়াশিবের মাথায় জল ঢালিয়া পূজা দিলে বৃষ্টি হয়।

শ্রীস্বরোজ কুমার মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম : পোপাড়া,
পোঃ সাগরদীঘি, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামে বর্তমানে কোন মেলা বসে না। পূর্বে শ্যামচাঁদ ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে প্রায় আটদিন ধরিয়া একটি মেলা বসিত। বর্তমানে কয়েক বৎসর হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আমাদের সংবাদদাতা উক্ত মেলা সম্পর্কে যে তথ্য পাঠাইয়াছেন তাহা আমরা মেলা বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করিলাম।

৯। গ্রাম : চন্দনবাটী।৯২।৯৪৪·৩৫।১৫৮।৮৪০

(ক) মুসলমান, ফুলমালী, মুচি, নাপিত, রাজপুত, মাহিষ্য এবং সাঁওতাল।

গ্রামে নয়টি পাড়া আছে, যথা—সাঁওতালপাড়া, মোল্লাপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দেওয়ানপাড়া, মল্লিকপাড়া, বাহিরাপাড়া, হাড়িপাড়া, সোমপাড়া ও রাজপুতপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে রেলস্টেশন সাগরদীঘি।

(ঘ) ফাল্গুনে দোল উৎসব ব্যতীত সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বাঁধনাপরব এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ্, মহরম, সবেবরাত ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) এই গ্রামের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ আছে। লিঙ্গটির উচ্চতা দেড় হাত, ব্যাস সাড়ে চার হাত এবং গৌরীপট্টের পরিধি সাড়ে এগার হাত। কথিত আছে যে, শিবলিঙ্গটি মহীপাল রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। শিবলিঙ্গটি একটি উচ্চ ঢিপির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সন্দেহবশতঃ বাংলা ১৩৩৩ সনে মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত আজিমগঞ্জ নিবাসী শ্রীনির্মল কুমার সিংহ নওলাক্ষা বাহাদুর উক্ত ঢিবি খনন করাইলে ঢিবির নীচে একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়।

গ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে বলা হয় যে, চন্দন শাহ নামে একজন পীর এই গ্রামে বাস করিতেন

এবং খুব সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম চন্দনবাটী হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রভূষণ রায়, শিক্ষক,
চন্দনবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চন্দনবাটী, মুর্শিদাবাদ।

Chandanbati (J.L. 92)—Remains of a building have been excavated by Shri Nirmal Kumar Singha Nowlakha of Azimganj. A huge Siva lingam, one of the largest to be seen, has also been excavated here. The remains are presumably of the Pala period and exhibit solid masonry work.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 190)

১০। গ্রাম : সমসাবাদ।৯৬।১,১২৬২৩।১৬৮।৮৯০

(ক) ব্রাহ্মণ, শূদ্র, বাগ্‌দী, কাহার, মুচি ও সাঁওতাল। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। নামুপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে সাগরদীঘি রেলস্টেশন।

(ঘ) ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহে শ্যামসুন্দর জীউর পূজা ও উৎসব হয়। শ্যামসুন্দর জীউর বিগ্রহ সারা বৎসর ভিন্ন গ্রামে থাকে, উৎসবের সময় বিগ্রহকে এই গ্রামে আনিয়া পূজা করা হয় এবং পূজান্তে বিগ্রহটি আবার পূর্বস্থানে রাখিয়া আসা হয়। ঠাকুরের সহিত পূজারীও আসেন। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) শ্যামসুন্দরজীউ পূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, শিক্ষক,
সমসাবাদ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ সমসাবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১১। গ্রাম : নওপাড়া।১৩৫।১,৬৫৫১৬।২১২।১,২৬৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, বাগ্‌দী, মাল, হাড়ি, কুনাই, নাপিত, চামার, সাঁওতাল ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মণিগ্রাম। গ্রামের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে রাসোৎসব এবং মাঘে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজাটি একশত বৎসরের এবং রাসোৎসবটি পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। দুর্গা ও সরস্বতীপূজাটি মাত্র এগার বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

পূর্বে এই গ্রামে মাঘীব্রত বা বানব্রত নামে একটি উৎসব পালন করা হইত। গত দুই-তিন বৎসর হইল উৎসবটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় নব্বুই বৎসরের প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির, একটি নারায়ণের মন্দির এবং রাসোৎসবের জন্য একটি মাটির ঘর আছে। শিব ও মনসার একটি করিয়া পাথরের মূর্তি আছে। ইহাছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষের নারায়ণ, বিষহরি ও মদন-মোহনদেবের মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত মন্দির আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্যপূজা হয়।

শ্রীসন্ধি কুমার প্রামাণিক, প্রধান শিক্ষক,
নওপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মণিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১২। গ্রাম : বিষ্ণুপুর।১৩৮।৫৯৬১৯।৯০।৪২৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সদ্‌গোপ, কুনাই, মাল, চামার এবং ফুলডোম। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মণিগ্রাম। নিকটবর্তী জেলাবোর্ডের রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে এবং ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আষাঢ় মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রাম-দেবতার পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথি হইতে সপ্তমী পর্যন্ত বানব্রত উৎসব ও শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত শ্যামসুন্দর-দেবের মহোৎসব এবং তদুপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ সেবা করা হয়। গ্রামদেবতাপূজা ও বানব্রত উপলক্ষে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বানব্রত উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শ্যামসুন্দরদেবের উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি গত পনর বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আছে এবং গ্রামদেবীর একটি শিলা মূর্তি আছে।

শ্রীচণ্ডী কুমার বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
বিষ্ণুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মণিগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১৩। গ্রাম : বালানগর (মৌজা: সিংহেশ্বরী গৌরীপুর)। ১৫৩।৬২৪'৭৩।১৪২।৭৪৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মহীপাল হল্ট স্টেশন। বর্ষাকালে দামুস নামক বিল দিয়া ভাগীরথী নদী পথে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় গণেশপূজা, আশ্বিনে কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, মাঘে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সিংহেশ্বরীর মন্দির আছে। জনশ্রুতি আছে, পালবংশীয় রাজা নবম মহীপাল মন্দির সংস্কার ও দেবী নিত্যপূজার জন্য ভূমিদান করিয়াছিলেন। বর্তমানে নাটমন্দির ও অন্যান্য বাড়ীঘর সমস্তই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে; কেবলমাত্র উহাদের ভগ্নস্তূপ পড়িয়া আছে। জীর্ণ মন্দিরে কোন প্রকারে দেবীর পূজার্চনা হইতেছে। বর্তমান দেবীর সেবায়েত শ্রীসুধাকর পাড়ে। কিছু দেবোত্তর জমির আয় হইতেই সিংহেশ্বরীর সেবাকার্য চলে।

বালানগর গ্রামের মাঝে দামুস নামে একটি প্রকাণ্ড বিল আছে। এই বিলের খয়রা মাছ জেলার মধ্যে বিখ্যাত। বিলে অন্যান্য মাছও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বালানগর গ্রামের লেবুও খুব বিখ্যাত।

শ্রীমনীন্দ্র নাথ দাস, প্রধান শিক্ষক,
বালানগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মুর্শিদাবাদ।

১৪। গ্রাম : পাইট কালডাঙ্গা। ১৫৯।৩২৩'৬৫।১৬১।৮৬৯

(ক) মুসলমান।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে—উপরপাড়া ও নীচুপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মহীপাল হল্ট রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী।

(ঘ) গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ৩রা চৈত্র শাহ সারফুদ্দিন পীরের উরস্ পালন করেন। দশ বৎসর হইল এই উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে। শাহ সারফুদ্দিন পীর সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি পাঞ্জাব প্রদেশের অধিবাসী এবং নানা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। এই অঞ্চলে তিনি আউলিয়া বলিয়া খ্যাত ছিলেন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম প্রচার করিতেন। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীনুরুল আবসার, শিক্ষক,
পাইট কালডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাহাপুর-ভায়া-আজিমগঞ্জ,
মুর্শিদাবাদ।

১৫। গ্রাম : গোঁসাই গ্রাম। ১৭৪।১৩০'১১।৪২।২২৮

(ক) সদ্‌গোপ, মাল, রবিদাস, সাঁওতাল, মাহালী ও ঘাটোয়াল।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে আজিমগঞ্জ রেলষ্টেশন। গ্রামের মধ্য দিয়া জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা ও গ্রাম্য দেবী ষষ্ঠীপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে পুকুর পাড়ে নিম ও পিটুলি গাছের নীচে ষষ্ঠী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

জানা যায় যে, এই গ্রামে বহুকাল পূর্বে অনেক গোঁসাই বা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত লোক বাস করিতেন। খুব সম্ভবতঃ সেই কারণে গ্রামের নাম গোঁসাইগ্রাম হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশু শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
গোঁসাইগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আজিমগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ সাগরদীঘি

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

নওপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত্রিতে কালীর মৃন্ময় প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। পূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়। বিসর্জনের দিন আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুই-তিনশত সাঁওতাল নরনারী মদ্য পান করিয়া মাদল, করতাল ও নাগারা প্রভৃতি বাদ্যসহকারে সারারাত্রিব্যাপী নৃত্যগীত করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে একটি মেলাও বসে।

গণেশপূজা

বালানগর গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে সর্বজনীন গণেশ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পনর দিন পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয় এবং পূর্ণিমা হইতে দ্বিতীয়া পর্যন্ত গণেশের মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়। পূর্ণিমার দিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। গণেশের স্তব নিম্নরূপ ঃ

"নমঃ বাসুদেবায় নমঃ।
নমঃ গণপতি নমঃ।
তুমি হে পুরুষোত্তম একদন্ত কুঞ্জের বদন।
চতুষ্কর লম্বোদর, বিঘ্নহর হরের নন্দন।
তুমি অখিলের পিতা, অঞ্চলের জ্ঞানদাতা,
তব নাম করিলে সিদ্ধ হয়।
তুমি দেব নিরঞ্জন, ব্রহ্মময়ী নন্দন,
সর্বাগ্রে তোমার পূজন।
আকাশ পাতাল তুমি
ত্রিলোকের কর্তা তুমি
ত্রিভুবন তোমাতে নিরূপণ।
তুমি স্থল, তুমি জল,
তুমি অনিল, অনল,
ভেদান্তর কে জানে তোমার।
ভেদাভেদে যেই জন,
ভোগাভোগে ভোগে সেই,
তুমি আত্ম নিরূপণ,
অসীম মহিমা তোমার।
প্রণমি ছন্দ ইতি,
আমারে করান স্বপথে মতিগতি,
হে দেব, তোমার গতি অগোচর।"

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বেলোরিয়া গ্রামে বৈশাখের ২৪শে হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত বুড়াশিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে বুড়াশিবের একটি পাকা মন্দির আছে।

গাজন উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। বৈশাখের ২৪ তারিখে ব্রতীগণ চুল-দাড়ি কাটিয়া গঙ্গা স্নান করিয়া মন্দির হইতে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। এই দিন হইতে এই মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত সংযম পালন করেন, এমন কি পরিবারবর্গের অন্যান্যদের সহিত এই কয়দিন কোন সংস্রব রাখেন না। দিনান্তে একবার ফলমূল আহার করিয়া গ্রামের শিব মন্দিরে অথবা অন্য কোন দেবদেবীর মন্দিরে রাত্রিযাপন করেন। মধ্যে একদিন সন্ধ্যাকালে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা হয়। হবিষ্যান্ন গ্রহণ কালে কুকুরের ডাক অথবা যে-কোনো প্রকারের শব্দ কানে প্রবেশ করিলে আর সে অন্ন গ্রহণ করা চলে না। সেইজন্য ভক্তগণ হবিষ্যান্ন গ্রহণ কালে কাপড় দ্বারা ভাল করিয়া কান ঢাকিয়া বাঁধেন। দিবাভাগে ঢাকের বাজনাসহ তাঁহারা প্রকৃতি বেশে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চাল ও পয়সা সংগ্রহ করেন। ব্রত গ্রহণের তৃতীয় দিবসে সন্ধ্যার পর বিরাট মিছিল ও বাজনাসহ মাঠ হইতে কণ্টাকিয়ারীর কাঁটা-লতাসহ একটি বোঝা সংগ্রহ করিয়া শিবতলায় আসেন।

এই কাঁটাতে গড়াগড়ি দিবার পূর্বে শিবের অনুমতি লাভের আশায় তাঁহারা সারিবদ্ধ ভাবে ঘাড় দোলাইয়া এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে থাকেন। ইহাকে "ভরণ" দেওয়া বলে।

সংক্রান্তির পূর্বদিন ব্রতীরা মন্দিরে আসিলে পর এইস্থানে কয়েকটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। যেমন,

প্রথমে একটি তীক্ষ্ণ লৌহ শলাকা দিয়া ভক্তদের কপাল ফোঁড়া হয়, ইহাকে বলে "রত্নবাণ"। অতঃপর প্রত্যেক ভক্তের পা উপরদিকে একটি বাঁশের সহিত বাঁধিয়া মাটির দিকে মাথা ঝুলাইয়া দোল দেওয়া হয় এবং মাথার নীচে স্থাপিত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ধুনার ছিটা দেওয়া হয়; ইহাকে বলা হয় "বিলেবাণ"। শেষদিন ভক্তগণ মালা-চন্দনে বিভূষিত হইয়া একে অপরের ঘাড়ে চাপিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিয়া সারা গ্রাম ঘুরিয়া বেড়ান এবং গ্রামের গৃহস্থগণের বাড়ীতে ফলমূল আহার করিয়া থাকেন। তারপরদিন পূর্ব সংগৃহীত চাল-পয়সায় বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

গাজনের সময় বুড়াশিবের নিকট মানত হিসাবে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বুড়াশিবের সেবায়েত চক্রবর্তী পদবীধারী ব্রাহ্মণ। উৎসবটি সর্বজনীন।

মাঘীব্রত

নওপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজার পরদিন অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে মনসাতলায় মাঘীব্রত নামে একটি বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। তবে গত দুই-তিন বৎসর হইল ইহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উৎসবটি যে-ভাবে পালন করা হইত নীচে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

উৎসবের সাত-আট দিন পূর্ব হইতে কতিপয় ভক্ত ক্ষৌরকর্মাদি সম্পন্ন করিয়া এবং গঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিতেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীরা এই কয়দিন শুদ্ধাচার ও সংযম পালন, প্রতিদিন দেবতার উদ্দেশ্যে অঞ্জলি প্রদান, তৃণশয্যায় শয়ন ও ফলমূলাদি ভক্ষণ প্রভৃতি নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধন করিয়া দিন অতিবাহিত করিতেন এবং গ্রাম গ্রামান্তরে ঘরে ঘরে ঘুরিয়া নৃত্যগীত করিয়া বেড়াইতেন। পূজার দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীর দিন মন্দিরের সন্নিকটে একটি বার-চৌদ্দ হাত উচ্চ মঞ্চ এবং কলাগাছ কাটিয়া দুই হাত দীর্ঘ ও দুই হাত প্রস্থবিশিষ্ট একটি কলাগাছের "মাড়" তৈয়ারী করা হইত। উক্ত মাড়ের উপর পাঁঠা বলি দিবার দুইখানি ধারাল খড়্গ খাড়াখাড়ি ভাবে রাখিয়া প্রধান ভক্তকে তাহার উপর দাঁড় করাইয়া অন্যান্য ভক্তগণ মাড়সহ তাহাকে মাথায় করিয়া গ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরাইয়া আনিয়া মনসাদেবীর মন্দিরে নামাইয়া দিতেন। সেই সময় অন্যান্য ভক্তগণ ধুপধুনা জ্বালাইয়া ঢাকঢোল বাজাইতে শুরু করিতেন। পরে অন্যান্য ভক্তগণ মনসার উদ্দেশ্য প্রণাম জানাইয়া একে একে মঞ্চের উপর হইতে নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেন। জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক পূজা অনুষ্ঠিত হইত। পূজার শেষে পাঁঠা বলিদানের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটিত। পূর্বে স্থানীয় জমিদারগণ নিজেদের ব্যয়ে এই উৎসব করিতেন বটে, তবে গ্রামবাসীগণ সকলেই এই উৎসবে যোগ দিতেন।

রাসযাত্রা

প্রতি বৎসরে নওপাড়া গ্রামে কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাসযাত্রা উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণ-এর মূর্তি পূজা করা হয়।

পূজা মণ্ডপে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মধ্যস্থলে স্থাপন করা হয় এবং উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া একটি ঘূর্ণায়মান চক্রের উপর গোপ-গোপীদের মৃন্ময় মূর্তি সাজান হয়।

চারদিনব্যাপী উৎসবের প্রতিদিন সকালে যথারীতি পূজার আরম্ভ হয় এবং সন্ধ্যায় আরতির পর পূজা শেষ হয়। ফল, মিষ্টান্ন, দুধ, ছানা ইত্যাদি ভোগ দেওয়া হয়। পূজার চতুর্থ দিন বেলা ১২ ঘটিকা হইতে বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বহু স্ত্রী-পুরুষেরা আসেন। তাঁহারা মদ্য পান করিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে সারারাত্রিব্যাপী নৃত্য-গীত করেন ও পরদিন সকালে নৃত্য করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

শিবরাত্রি উৎসব

বন্ধেশ্বর গ্রামের উত্তরদিকে একটি গম্বুজাকৃতি প্রাচীন পাকা মন্দিরে "বন্ধেশ্বর" নামে খ্যাত একটি অনাদি লিঙ্গ শিব প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের প্রবেশ পথ দক্ষিণে এবং বাহির হইবার পথ পূর্বদিকে। উত্তরদিকে মন্দির সংলগ্ন "ক্ষীরভাণ্ডার" নামে একটি ছোট কুণ্ড বা চৌবাচ্চা আছে। পশ্চিমে মন্দির পরিসীমার মধ্যে প্রায় তিন হাত উচ্চ একটি তুলসী মঞ্চ আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ দক্ষিণ-

দিকের চত্বরটি পাকা। এই চত্বরের মধ্যে স্থাপিত যূপকাষ্ঠে মানতের পাঁঠাগুলিকে বলিদান দেওয়া হয়। মন্দিরের সম্মুখে অর্থাৎ দক্ষিণদিকে একটি বড় পুষ্করিণী আছে, ইহা "দধিসাগর" নামে অভিহিত। পুষ্করিণীটির ঘাট পূর্বে বাঁধান ছিল, বর্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। মন্দিরের পশ্চিমদিকে কয়েকটি বট ও আম গাছ এবং একটি প্রাচীন কালীমন্দিরের ভগ্নাবশেষ, উত্তর দিকে শিমুল গাছ এবং পূর্বদিকে অশ্বত্থ, নিম ও কেলিকদম্ব গাছ আছে। অশ্বত্থ গাছটির নীচে ষষ্ঠীদেবীর স্থান আছে—ষষ্ঠীদেবীর শিলামূর্তি। বক্রেশ্বর শিবের মন্দিরের গর্ভগৃহের মধ্যস্থলে তামার পাত দিয়া মোড়া গৌরীপট্টের উপর অনাদিলিঙ্গ বক্রেশ্বর শিবের ঊর্ধাংশ দেখিতে পাওয়া যায়।

বক্রেশ্বর শিব নামে অভিহিত এই অনাদিলিঙ্গ শিবের প্রকাশ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শুনা যায়, বহুপূর্বে এই স্থানটি বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। সেই সময় বীরভূম জেলার নলহাটি থানার বারা (গ্রাম সম্পর্কে বীরভূম জেলা দ্রষ্টব্য) নামক গ্রামে জনৈক গোয়ালার একটি গাভী প্রত্যহ রাত্রিকালে গোপনে এই জঙ্গল পরিপূর্ণ স্থানে আসিয়া নির্দিষ্ট একটি স্থানে দাঁড়াইলে আপনা হইতেই তাহার দুধ নিঃসৃত হইত। ক্রমশঃ গাভীর দুধ কমিয়া যাইতেছে লক্ষ্য করিয়া অনুসন্ধানের জন্য এক-রাত্রিতে গোয়ালা নিজে গোপনে গাভীর অনুসরণ করিয়া এই জঙ্গলাকীর্ণ স্থানটিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং যে-স্থানে গাভীটি দুগ্ধ দান করিত সেই স্থানটি পরীক্ষা করিয়া এই অনাদিলিঙ্গ শিব দেখিতে পায়। তাহার পর হইতে বক্রেশ্বর শিবের পূজার প্রচলন হয়।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বক্রেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শুধু এই অঞ্চলেই নয়, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের জেলার এক বিরাট অংশের অধিবাসীরা বক্রেশ্বর শিবকে বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া মনে করেন। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময় লাভের কামনায় এবং অন্যান্য বিষয়ে মনস্কামনা জানাইয়া বহুলোক বক্রেশ্বর শিবের নিকট মানত করেন এবং মনস্কামনা সিদ্ধ হইলে তাঁহারা শিবের নিকট মানত পূরণ করিতে আসেন। সাধারণতঃ প্রতি সোমবার মন্দিরে মানতকারীদের সমাগম হয় এবং এইদিনে বক্রেশ্বর শিবের সম্মুখে তাঁহারা মানতের পাঁঠা ও ছাগ বলি দেন। সোমবার ভিন্ন অন্যান্য দিনেও যাত্রীরা আসেন, তবে সংখ্যায় অনেক কম। কেবল বৈশাখ ও পৌষ মাসে বক্রেশ্বর শিবের নিকটে ছাগ বা পাঁঠা বলিদান নিষিদ্ধ—সেইজন্য এই দুই মাস পাঁঠা বলি বন্ধ থাকে। অবশ্য মানত হিসাবে পাঁঠা বলি ভিন্ন গঙ্গাজল, দুধ প্রভৃতি দ্বারা পূজা দেওয়া চলে। ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীতে শিবরাত্রি উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে বক্রেশ্বর শিবের বিশেষ উৎসব হয় এবং উৎসবে বহু পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

শিবরাত্রির উৎসবই বক্রেশ্বর শিবের প্রধান উৎসব। এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি শুরু হয় এবং দূরবর্তী অঞ্চল হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ইহা এই অঞ্চলের একটি সর্বজনীন উৎসব। শিবরাত্রি উপলক্ষে চারদিন ধরিয়া একটি মেলা বসে। কিছু সংখ্যক অহিন্দুও এই উৎসবে যোগদান করেন।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : সাগরদীঘি

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বালানগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে সিংহেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন প্রায় চার-পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং চাঁদপুরচক, অনুপপুর, রমনা সেখদীঘি প্রভৃতি ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ চাঁদপুরচক, অনুপপুর এবং রমনা সেখদীঘি গ্রাম হইতেই প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। প্রায় পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং চৌদ্দ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, লোহা ও মাটির বাসন-কোসন, খেলনা প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানপাটও কিছু কিছু বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।

পাউলী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে গ্রামের বাহিরে পূর্বদিকে একটি পুকুরের ধারে সাধারণের প্রায় পাঁচ-ছয় কাঠা জমির উপর স্বল্প সময়ের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের যাত্রীগণ আসেন। খোলা জায়গায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি খাবার ও মিষ্টান্নের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

বাসন্তীপূজার মেলা

মণিগ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলার স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জঙ্গীপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, কালীতলা ও সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় কুড়িজন ফেরিওয়ালা ব্যতীত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি দোকানপাট বসে। উহার অধিকাংশই ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি ইত্যাদির দোকান। তাহাছাড়া, কাপড়-চোপড়, কৃষি ও কারিগরীসংক্রান্ত জিনিসপত্র, ঔষধপত্র, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে। পূজার ব্যয়নির্বাহের জন্য মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, লটারী, যাত্রা, কবিগান, ঝুমুর, আলকাপ গান, সার্কাস, নাগরদোলা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে আলকাপ গান ও কৃষ্ণযাত্রার দল আছে। যাত্রাদলের অধিকারীর নাম শ্রীগঙ্গাধর গাঙ্গুলী, কৃষ্ণযাত্রা দলের অধিকারীর নাম শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মণ্ডল। আলকাপ গানের দলের অধিকারীর নাম শ্রীসাধু চরণ বারিক, শ্রীহরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও শ্রীহাসান শেখ। আনন্দানুষ্ঠানে প্রায় তিন-হাজার শ্রোতার সমাবেশ ঘটে।

রাসযাত্রার মেলা

দত্তপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উপলক্ষে রাসমন্দির সংলগ্ন প্রায় সাত কাঠা জমিতে তিন-চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় নব্বুই বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় চার-পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনের সংখ্যাই বেশী।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জঙ্গীপুর, আজিমগঞ্জ ও সাগরদীঘি হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মোট প্রায় ত্রিশ-বত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং তাহার অধিকাংশই মিষ্টান্ন, মনিহারী, চা-পান-বিড়ি, কাঁচ ও লোহার বাসন-কোসন, শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকান। তাহাছাড়া, মাটির পুতুল ও খেলনার দোকানপাটও বসে। মেলায় দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও লুটেনাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। শেখ গুমানী ও শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী-র কবিগানের দল বীরভূম হইতে আসে।

শিবরাত্রির মেলা

বনেশ্বর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে বনেশ্বর শিবমন্দির ও তৎসংলগ্ন দধিসাগর নামে দীঘির চারিপাশ ঘিরিয়া ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ-বার বিঘা পরিমাণ জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমিটি স্থানীয় জোতদারের।

বহুকালের প্রাচীন এই মেলাটিতে জামুয়া, জরুর, মির্জাপুর, মোরগ্রাম, সাগরদীঘি, মণিগ্রাম প্রভৃতি ইউনিয়ন সমূহ এবং অন্যান্য জেলা এমন কি বিহার প্রদেশ হইতেও প্রায় চার-পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় সমাগত যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

ভদ্রপুর, লোহাপুর, সাগরদীঘি, আজিমগঞ্জ, লালগোলা, ভগবানগোলা, নিমতিতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ মেলায় প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মোট প্রায় দুইশতটি দোকানপাটের মধ্যে সত্তর-আশিটি দোকান খোলা জায়গায় বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ জন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বাসন-কোসনের দোকান, শিল্পসামগ্রীর দোকান ও কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান বেশী দেখা যায়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক এবং সিনেমা দেখাইবার ব্যবস্থা করা হয়।

শ্যামচাঁদজীউপূজার মেলা

বুজরুগ দেবগ্রামে প্রতি বৎসর শ্যামচাঁদ জীউর উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসিত। প্রাচীন এই মেলাটি কয়েক বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হইত। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুরগাড়ী, সাইকেলে ও হাঁটিয়া আসিতেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সাগরদীঘি, জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিতেন। একশত হইতে দেড়শত দোকানপাট বসিত। তাহার মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, শিল্প-সামগ্রী প্রভৃতির দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মাটির পুতুল, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতির দোকানপাটও বসিত।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত। গ্রামে যাত্রা, থিয়েটার ও কবিগানের দল ছিল। এই সকল অনুষ্ঠানে প্রায় তিন-চার শত শ্রোতার সমাগম হইত।

শ্যামসুন্দরদেব পূজার মেলা

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শ্যামসুন্দরদেবের পূজা ও উৎসব উপলক্ষে সমসাবাদ গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত একটি পুকুরপাড়ে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং বাড়ালা, নবগ্রাম, সাগরদীঘি, বোমারা, পুড়াপানালী, ভগবানগোলা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার যাত্রী আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সাগরদীঘি, লোহাপুর, নলহাটী, রামপুরহাট, বহরমপুর, খাগড়া, কান্দি, নবগ্রাম, পাঁচগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন।

মেলায় প্রায় তিনশত দোকানপাটের মধ্যে পঞ্চাশটি দোকান খোলা জায়গায় বসে। বহু ফেরিওয়ালা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, বাসন-কোসন, মনিহারী,

বই-ছবি, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মেলায় কৃষি ও কারিগরীসংক্রান্ত জিনিসপত্র, শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রা, কবিগান, জলসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে কবিগানের দল আসে। শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী ও শেখ গুমানী-র দল প্রায় প্রতি বৎসরই কবিগান করেন। গ্রামে একটি যাত্রাদল আছে।

বিষ্ণুপুর গ্রামে ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত আটদিন ব্যাপী শ্যামসুন্দরদেব ঠাকুরের পূজা ও উৎসব উপলক্ষে গত পনর বৎসর যাবত একটি মেলা বসিতেছে।

মেলায় আশেপাশের দুই-চারিটি গ্রাম হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত যাত্রী আসেন। যাত্রীগণের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জঙ্গীপুর, লালগোলা, সাগরদীঘি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, কৃষ্ণযাত্রা, আলকাপ গান, কবিগান ও কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ লালগোলা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ যশাইতলা (মৌজা ঃ সাহাপুর)।
৬৬।২৯৩'৬৮।১৯৭।১,১২৬

(ক) গোয়ালা, রাজবংশী, জেলে, বৈশ্য ও চামার। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলষ্টেশন ভগবানগোলা। জিয়াগঞ্জ-জঙ্গীপুর গ্যাঞ্জেস রাস্তার পাশে গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামের মধ্যেই মোটরবাস ষ্টাণ্ড আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গ্রামের সাধারণের দেবী যশাই-কালীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা-ভিন্ন, কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী কার্তিকপূজা, পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে। উল্লিখিত উৎসব উপলক্ষে আলকাপ গান, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়। এই সকল আনন্দোৎসবে গড়ে প্রায় একসহস্র নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন।

(ঙ) যশাইকালী পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) একটি অশ্বথ গাছের নীচে যশাইকালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং এইজন্য গ্রামটির নাম যশাইতলা হইয়াছে।

শ্রীআব্দুল আজিজ, প্রধান শিক্ষক,
দৌলতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দিয়ারী ফতেপুর, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ রামচন্দ্রপুর।৭৫।৩২৮'১৭।২৪৫।১,২৭৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন লালগোলা হইতে মোটরযোগে পণ্ডিতপুরে আসিয়া ভাগীরথী নদী পর্যন্ত সেচ বিভাগ কর্তৃক তৈয়ারী রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) মাঘে সরস্বতীপূজা। উৎসবটি বহুকালে প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীআলতাফ হোসেন, প্রধান শিক্ষক,
ইলিমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম ঃ লালগোলা।৮০।১,৪৪৫'৭১
শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, তাঁতি, কামার, জেলে, ডোম, মেথর, চামার, ধোপা, নাপিত ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) শিয়ালদহ হইতে পূর্ব রেলপথের একটি শাখা লালগোলাঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। স্থানটি পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়। ইহাভিন্ন, লালগোলার মধ্য দিয়া কলিকাতা হইতে আসাম পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) আষাঢ়ে রথযাত্রা উৎসব। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

এই উৎসবটি লালগোলা রাজ পরিবার কর্তৃক প্রবর্তিত এবং অদ্যাপিও তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইতেছে। অবশ্য বর্তমানে উৎসবটিকে এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব বলা যাইতে পারে। এমন কি অহিন্দুরাও এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

ইহাভিন্ন, এই শহরে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা ও সরস্বতীপূজা প্রভৃতি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ়ে একমাসব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) এইস্থানে লালগোলা রাজ পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি কালী মন্দির, চারিটি শিবমন্দির, একটি সত্যনারায়ণ মন্দির, একটি রঘুনাথজীউর মন্দির, একটি

চক্রধরের মন্দির ও জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত মাড়োয়ারীগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পরেশনাথের মন্দির এবং রথতলা নামে একটি স্থান আছে।

পদ্মার চর হইতে লালগোলার উৎপত্তি বলিয়া এখানকার জমি খুব উর্বরা। "লাল" শব্দের অর্থ প্রাচুর্য। খুব সম্ভবতঃ এখানে প্রচুর শস্য (যেমন ধান, পাট ও রবিশস্য) উৎপন্ন হইত বলিয়া এই স্থানের নাম লালগোলা হইয়াছে।

প্রাচুর্যের নিদর্শনস্বরূপ জোতখামার ও ভগবানগোলা গ্রামের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

লালগোলায় থানা, ডাকঘর, বালক-বালিকাদের জন্য উচ্চ ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রভৃতি আছে।

শ্রীমণি মোহন সেনগুপ্ত, এম. এ. বি. টি.
লালগোলা এম. এন. একাডেমী,
পোঃ লালগোলা, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : ব্রহ্মোত্তর মানিক চক্।
৯৪।৬৫০'১৩।৬৭৫।৩,৬৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যবণিক, গোয়ালা, কামার, স্বর্ণকার, নাপিত, চামার ও মুসলমান।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভগবানগোলা ঘাট। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ জেলাবোর্ডের রাস্তা। গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত পদ্মা নদীতে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং পৌষ মাসে পনেরদিনব্যাপী মনসা পূজা হয়। মনসা পূজাটি গত বারো বৎসর এবং দুর্গাপূজাটি গত ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি ছয় বৎসরের প্রাচীন।

মনসাপূজার মেলা। পৌষ মাসের সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় বারো বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুর্গাদেবী ও মনসাদেবীর দুইটি নির্দিষ্ট স্থান আছে; পূজার সময় ঐস্থানে অস্থায়ী ঘর তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয়।

বহুকাল পূর্বে এখানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন এবং গ্রামটি তাঁহাদের ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি ছিল। খুব সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রামের নাম "ব্রহ্মোত্তর" হইয়াছে।

শ্রীরাখাল চন্দ্র কর্মকার, প্রধান শিক্ষক,
দিয়াড় মানিক চক্ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মানিক চক, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—

দেওয়ান সরাই (মৌজা নং ১৭) গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে আশে-পাশের দুই-তিনটি গ্রামের মুসলমানগণ যোগদান করিয়া থাকেন। মহরম উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

বাউসি (মৌজা নং ৬৪) গ্রামে অনুষ্ঠিত গাজী মোছলেম উদ্দীন পীর সাহেবের রওজায় উৎসব সম্পর্কে উৎসব বিবরণী অধ্যায় দেওয়া হইল।

জোতভিখান (মৌজা নং ৬৭) গ্রামে মহরম উপলক্ষে একটি মেলা বসে উহার বিস্তারিত বিবরণী মেলা বিবরণী অধ্যায় দেওয়া হইল। বিবরণীটি দৌলতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীআব্দুল আজিজ সাহেব কর্তৃক প্রেরিত।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ লালগোলা

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব (গাজী মোছলেম উদ্দীন পীর)

বাউসি গ্রামে (মৌজা নং ৬৪) প্রতি বৎসর ৮ই অগ্রহায়ণ গাজী মোছলেম উদ্দীন পীর সাহেবের সমাধি-ক্ষেত্রে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমাধিক্ষেত্রটি জিয়াগঞ্জ-জঙ্গীপুর রাস্তার পাশে অবস্থিত। ছবদার আলী ফকির নামক জনৈক ব্যক্তি এই উৎসবটির প্রবর্তক। উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার গণ্যমান্য এবং আলেম ব্যক্তির সমাবেশ হয়। তাঁহারা এই দিন ধর্মালোচনা এবং জনসাধারণের মধ্যে ধর্মোপদেশ প্রচার করেন। উৎসবের প্রধান উদ্দেশ্য পীর সাহেবের আত্মার শান্তি কামনা এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা।

কালীপূজা (যশাই কালী)

যশাইতলা গ্রামে বহু প্রাচীন কাল হইতে বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার যশাইদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সাধারণতঃ সকাল হইতে বৈকাল চার ঘটিকা পর্যন্ত চলে। ইহা সমগ্র অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব।

এই গ্রামে যশাইকালীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী শোনা যায় যে, বহু প্রাচীনকালে একজন কলু একখণ্ড প্রস্তর গরুর গাড়ী করিয়া লইয়া যাইবার সময় পথিমধ্যে তাঁহার গাড়িখানা ভাঙ্গিয়া যায় এবং উক্ত ব্যক্তি প্রস্তরখণ্ডটি সেই স্থানেই রাখিয়া চলিয়া যান। রাত্রিকালে জনৈক গ্রামবাসীর প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, "আমি আর এই স্থান হইতে যাইব না। তোমরা যদি আমাকে রাখ, তবে তোমাদের মঙ্গল হইবে।" ইহার পর হইতেই প্রস্তরখণ্ডটিকে সেই স্থানেই রাখিয়া পূজাচনার ব্যবস্থা করা হয়। শোনা যায়, অনেকে এই দেবীর নিকট মানত করিয়া সুফল লাভ করিয়াছেন। ক্রমে দেবীর মাহাত্ম্য দিকে দিকে প্রচারিত হয় এবং দূরদূরান্ত হইতে বহু নরনারী দেবীর নিকট মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। উক্ত প্রস্তর খণ্ডটি আজও এই গ্রামের একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের তলায় প্রতিষ্ঠিত আছে। যশাইদেবী বা যশাইকালী নামে অভিহিত মূল প্রস্তর খণ্ডটির পাশে আরও কতকগুলি ছোট ছোট প্রস্তর খণ্ড রহিয়াছে।

দেবী সর্বসাধারণের এবং ইহাকে দক্ষিণা কালীর ধ্যানে পূজা করা হয়। পূজারী পরাশর গোত্রীয় অধিকারী পদবীধারী ব্রাহ্মণ। দেবীর নিকটে দুধ, চিনি, গঙ্গাজল, ধূপ, দীপ, তেল, সিঁদুর এবং ছাগ ও পায়রা মানত করা হয়। উৎসবে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রায় অধিকাংশ গ্রামবাসীই যোগদান করেন।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : লালগোলা

মেলা বিবরণী

মহরমের মেলা

জোতভিখান (মৌজা নং ৬৭) গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম উপলক্ষে বুড়াপীর সাহেবের সমাধিক্ষেত্রের পার্শ্ববর্তী পীরোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং মহরম মাসের ১০ই তারিখে এবং ইহার চল্লিশদিন পরে আর একদিন মেলা বসে। মেলায় আগত প্রায় তিন হাজার যাত্রীর অধিকাংশই মুসলমান। যাত্রীগণ প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হাঁটিয়া, সাইকেলে, গরুর গাড়ীতে ও ঘোড়ায় চড়িয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ লালগোলা, ভগবানগোলা এবং জিয়াগঞ্জ হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় দশজন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, পান-বিড়ি ও শিল্পসামগ্রীর দুই-চারটি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য লাঠিখেলা ও কুস্তি প্রতিযোগীতা হয়। মেলায় মহরমের "তাজিয়া" বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আসে এবং লাঠিখেলা দেখিবার জন্য প্রায় দুই হাজার লোকের সমাগম হয়।

মনসাপূজার মেলা

ব্রহ্মোত্তর মানিক চক্ গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় দৈনিক গড়ে প্রায় একশত লোকের সমাগম হয়; সমাগত যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষের সংখ্যা সমান সমান।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় পঁচিশ-ছাব্বিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং ফেরিওয়ালা আসেন প্রায় কুড়িজন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, আলকাপ গান এবং মনসামঙ্গল গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি আলকাপ গানের দল আছে। অধিকারীর নাম শ্রীশশী ভূষণ মণ্ডল, গ্রাম : বিশ্বনাথপুর, পোঃ কৃষ্ণপুর-সিঙ্গুরপাড়া।

সরস্বতীপূজার মেলা

রামচন্দ্রপুর গ্রামে মাঘ মাসে সরস্বতী প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে নদীর তীরে সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং লালগোলা, রঘুনাথগঞ্জ ইত্যাদি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুই-হাজার যাত্রী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী লোকের সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়া এবং গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জঙ্গীপুর এবং লালগোলা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বাসন-কোসন, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি প্রভৃতির আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সাইকেল ও ঘোড়দৌড় প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাছাড়া, জুয়া খেলা হইয়া থাকে।

রথযাত্রার মেলা

লালগোলায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় রথতলায় লালগোলা রাজপরিবারের প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং কৃষ্ণপুর, সাহাবাদ, জোতখামার, রামনগর, শিকারপুর, সেখালীপুর, ভগবানগোলা, দেওয়ানসরাই, যশাইতলা, নশীপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যান্য স্থান হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়া আসেন। কেহ কেহ বাসে বা গরুর গাড়ীতে আসেন।

মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন।

মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, লোহার জিনিসপত্র, কৃষি বা কারিগরীস ক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, খেলনা প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, বই ছবি, কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধের এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। মেলায় গরু, মহিষ, ছাগল প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ম্যাজিক ও সিনেমা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া খেলা চলে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : ভগবানগোলা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দেবীপুর (মৌজাঃ হনুমন্তনগর)। ১।৭,৭৩১'৯১।১,২১৫।৭,১১৩

(ক) চাঁই, চামার, কামার, স্বর্ণকার, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভগবানগোলা। গ্রাম হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া ভগবানগোলা যাতায়াতের পাকা রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। মোটর এবং ঘোড়ার গাড়ীযোগে গ্রামে পৌছান যায়। বর্ষাকালে নদীতে নৌ-চলাচল করে।

(ঘ) মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও কৃষ্ণজননীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও শিবের গাজন। কৃষ্ণজননীপূজাটি চাঁই সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কৃষ্ণজননীপূজার মেলা। মাঘ মাসে সাত দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) কৃষ্ণজননীরপূজার জন্য একটি মাটির ঘর আছে।

শ্রীএলাহিবক্স, প্রধান শিক্ষক,
দেবীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কাঞ্চনগর-ভায়া-ভগবানগোলা,
মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : কান্তনগর।২।২,০৯৯'৫৩।১,১৩৬।৬,৫৭৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভগবানগোলা হইতে গরুর গাড়ী করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন কার্তিকপূজা এবং এই মাসের শেষ মঙ্গলবার বা শনিবার কালীপূজা। কালীর কোন মূর্তি নাই। একটি নির্দিষ্ট গাছের নীচে কালীপূজা হয়। পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। ইহাভিন্ন, মহামায়া ও শিবপূজা হয়। উৎসবগুলি আনুমানিক দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ্, বকরঈদ, ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম, ফতেহা-ইয়াজ-দাহাম, আখেরী-চাহার-সুম্বা প্রভৃতি উৎসব বৎসরের বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কার্তিক, কালী, মহামায়া, শিব এবং সরস্বতীদেবীর স্থান আছে। প্রতি গৃহে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা হয়।

শ্রীসাজ্জাদ হোসেন, শিক্ষক,
কান্তনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কান্তনগর, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : মহিষাস্থলি। ৬।৮৯২'১১।১,০৬৫।৫,৬১১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে আধ মাইল দূরে ভগবানগোলা রেলস্টেশন। গ্রামের মধ্যে সরকারী পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, ইহা কুমারপাড়ার সর্বজনীন উৎসব। গত পনর বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে "গিরিধারী আশ্রম" নামে একটি আশ্রমে মাটির একটি কুঁড়ে ঘরে গিরিধারী, রাধারমণ, মদনমোহন ও রাধারাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে এই বিগ্রহগুলি পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমার সানিমোহর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেশ বিভাগের পরে ১৯৪৯ সালে সেবায়েত শ্রীনগেন্দ্র নাথ দাস বিগ্রহগুলিসহ এই গ্রামে কুমারপাড়ায় আসিয়া প্রায় পনর কাঠা পরিমাণ জমির

উপরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়া বিগ্রহগুলির নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়, শিক্ষক,
মহিষাস্থলি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : মিঞাপাড়া (মৌজা : মহিষাস্থলি)। ৬।৮৯২'১১।১,০৬৫।৫,৬১১

(ক) মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভগবানগোলা।

(ঘ) পীর করিমশাহের উরস্ উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের মধ্যে একটি মসজিদ এবং পীর করিমশাহের সমাধি স্থান আছে।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়, শিক্ষক,
মহিষাস্থলি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : ভগবানগোলা (মৌজাঃ মহিষাস্থলি)। ৬।৮৯২'১১।১,০৬৫।৫,৬১১

(ক) কুমার, কামার, গোয়ালা, বৈষ্ণব ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভগবানগোলা। মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা এবং কৃষ্ণাষ্টমীতে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব। কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, পৌষে দাতাপীর বা দাদাপীর সাহেবের উরস্, মাঘে সরস্বতীপূজা ও চৈত্রে বাসন্তীপূজা।

(ঙ) দাতাপীর সাহেবের উরস্ উপলক্ষে মেলা। পৌষ মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) দাতাপীর বা দাদাপীর সাহেবের সমাধিস্থান ব্যতীত রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুরের আখড়া এবং "ভৈরবী" আশ্রম নামে পরিচিত প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন একটি আশ্রমে গৌরগোবিন্দ, গৌরগোপাল, রাধাকৃষ্ণ ও জগন্নাথ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীআলাউদ্দীন, প্রধান শিক্ষক,
ভগবানগোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ।

Bhagwangola—The name originaly belonged to a river mart on the Padma, 5 miles to the east, which served as the Gangetic port of Murshidabad. So important was it as the source of the city's supplies, that, during the wars with the Marathas, Ali Vardi Khan was forced to keep a garrison in it,............In its neighbourhood a battle took place in 1697 between the Afghan rebels under Rahim Shah and the imperial troops under Zabardast Khan. It was here that Siraj-ud-daula embarked on his flight north-wards after the battle of Palassey. The place was visited on 2nd August 1824 by Bishop Heber, who wrote—"I found the place very interesting and even beautiful...... ......" The place inspired the good Bishop to a poem......

About a century ago the main stream of the Padma receded from the village, and in its place sprung up the present village, which in contra-distinction was called New Bhagwangola or Alatali.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. xlvi)

৬। গ্রাম : রাণীতলা। ৭।৪৯'২৩।৬৯।২৮৪

(ক) কায়স্থ, কুমার, কলু, গোয়ালা ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জিয়াগঞ্জ ও ভগবানগোলা।

(ঘ) মাঘ মাসে ব্যক্তি-বিশেষের শিবপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি খড়ের চালাযুক্ত শিবমন্দির, একটি বৃক্ষমূলে সন্ন্যাসী ঠাকুরের স্থান এবং আর একটি বৃক্ষমূলে যশাইদেবীর স্থান আছে। যশাইতলায় প্রতি

বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পূজা দেওয়া হয়।

গ্রামে "রামাইত" সম্প্রদায়ের একটি আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত নরসিংহদেবের বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে রথ, দোল প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কিছুকাল পূর্বে বিগ্রহটি অপহৃত হইলে আখড়াটি নষ্ট হইয়া যায়।

রাণীতলা গ্রামের পূর্বদিক সংলগ্ন খাগজানা (মৌজা নং ৮৪) গ্রামে রায় পদবীধারী বৈদ্য জমিদার বংশের বসবাস আছে। সম্ভবতঃ তাঁহারা বর্গীর হাঙ্গামার সময় বর্ধমান হইতে এই অঞ্চলে আসেন। তাঁহাদের উদ্যোগে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা এবং চৈত্র মাসের বাসন্তী পূর্ণিমাতে কমলে-কামিনী পূজা এবং তদুপলক্ষে মেলা বসিত। উৎসব ও মেলার কয়দিন নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদ ও গান-বাজনা হইত, এমন কি মেলায় গণিকাদের অস্থায়ী আস্তানা পড়িত। মেলায় বিভিন্ন দেবদেবীর মৃণ্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হইত— এই প্রদর্শনী বিশেষ দর্শনীয় বস্তু ছিল।

গত বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে রাণীতলা গ্রামে উক্ত রায় পরিবারের উদ্যোগে চারদিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পূজা ও মেলার আয়োজন করা হইয়াছিল। ভবিষ্যতে মেলাটি নিয়মিত বসিবে কিনা তাহা অবশ্য এখনও বলা যায় না।

রাণীতলা একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের মধ্য দিয়া বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্গত নাটোর হইতে পুণ্যশীলা রাণীভবানী আজিমগঞ্জ রেলস্টেশনের উত্তরে বড়নগর নামক স্থানে তাঁহার গঙ্গাবাসের বাটীতে যাতায়াত করিতেন। এই গ্রামে তাঁহার বিশ্রাম স্থান ছিল। এখানে "গিন্নিহাটা" নামক একটি বৈকালীন হাট আছে—প্রতি শনি-মঙ্গলবার হাট বসে। রাণীভবানী ঐ হাটের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দুইটি বৃহৎ দীঘি খনন করাইয়া গ্রামের জলকষ্ট দূর করিয়াছিলেন। তখন ইহার নাম "রামবাগ পুরাণ" পুষ্করিণী ছিল। উহার একটি দীঘি বর্তমানে মজিয়া গিয়াছে। ফার্সী ভাষায় দীঘিকে "তলাও" বলে। "রাণীতলাও" হইতে সম্ভবতঃ এই গ্রামের নাম রাণীতলা হইয়াছে।

শ্রীসরোজাক্ষ পদ ঘোষ হাজরা, প্রধান শিক্ষক,
রাণীতলা স্পেশাল ক্যাডার বিদ্যালয়,
পোঃ বলীপুর বলাগাছি-ভায়া-ভগবানগোলা,
মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম: গিরিধারীপুর। ১০৫।২২২৪৩।৩১২।১,৫০৩

(ক) শুঁড়ি, বৈরাগী, কামার, চামার ও মুসলমান। গ্রামে পাড়া চারিটি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ভগবানগোলা। জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত ভৈরব নামে পদ্মার একটি শাখা নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে গঙ্গাপূজা।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। আষাঢ় মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে।

শ্রীশুকুরউদ্দীন, শিক্ষক,
আখেরীগঞ্জ স্পেশাল ক্যাডার বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ আখেরীগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ ভগবানগোলা

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(পীর করিমশাহ)

মিঞাপাড়া গ্রামের সীমান্তে পীর করিমশাহের একটি সমাধি আছে। পীর করিমশাহের কোন বংশধর জীবিত আছেন কিনা তাহা জানা যায় না। শুনা যায়, তিনি গুজরাট প্রদেশ হইতে আসিয়া এই গ্রামের বর্তমান সমাধি স্থানের নিকট একটি আস্তানা স্থাপন করিয়া সাধন-ভজন করিতেন। তিনি জাতিতে মুসলমান হইলেও তাঁহার ইষ্টনাম ছিল "রামনাম"। তিনি খড়ম পায়ে "রামনাম" করিয়া গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। এই কারণে তৎকালীন বহু মুসলমান তাঁহার উপর ক্ষুব্ধ হইয়া ছিলেন।

শুনা যায়, এখনও নাকি গভীর রাত্রিতে সমাধির উপর তিনি খড়ম পায়ে দিয়া ঘুরিয়া বেড়ান।

স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস তাঁহার নামে মানত করিলে সুফল পাওয়া যায়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের লোকই সমাধি স্থানে মানত দিয়া থাকেন।

মুসলমানগণ তাঁহার সমাধিস্থলে আসিয়া নামাজ পড়িয়া মুরগী মানত দিয়া থাকেন আর হিন্দুরা হরিনাম সংকীর্তনের দল লইয়া হরিনাম কীর্তন করেন।

হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের লোকেরাই তাঁহার সমাধি স্থানটিকে পবিত্র জ্ঞান করেন এবং ভক্তিভরে পূজা দেন।

(দাতাপীর)

ভগবানগোলার নিকটবর্তী শেখপুরা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে দাদাপীর বা দাতাপীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়।

দাদাপীর বা দাতাপীরের প্রকৃত নাম শাহ সুফী সৈয়দ হজরত নাশের আলি। তিনি ৫৬৪ সনের ২৫শে চৈত্র পশ্চিম অঞ্চল হইতে বঙ্গদেশের মুর্শিদাবাদ জেলার ভগবানগোলা থানার দেড় মাইল দক্ষিণে বর্তমান বাঁধপুল ও জাতীয় সড়কের পাশে শেখপুরা গ্রামের সিকি মাইল উত্তরে একটি স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী শোনা যায়, এখানে আসিয়া তিনি তৎকালীন শাসন কর্তাদের নিকট আস্তানা প্রতিষ্ঠার জন্য একটি রুমাল পরিমাণ জমি প্রার্থনা করেন। ইহাতে শাসকগণ অবাক হইয়া তাঁহাকে রুমাল পরিমাণ জমি দিবার হুকুম করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অলৌকিক ক্ষমতাবলে তিনি রুমালের চারিকোনা ধরিয়া যতই টানিতে লাগিলেন ততই নাকি রুমালের আয়তন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ব্যাপার দেখিয়া রাজকর্মচারীগণ বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে রুমাল টানা বন্ধ করিবার অনুরোধ করেন। যে পর্যন্ত রুমালের চারি কোণা টানা হইয়াছিল, সেই জমির পরিমাণ ছিল প্রায় ত্রিশ বিঘা। এই ত্রিশ বিঘা জমির উপর তিনি একটি আস্তানা স্থাপন করেন। বর্তমানে উহার মধ্যে মাত্র আঠার বিঘা আছে।

৫৯৬ সনের ১৯শে পৌষ পীরসাহেব দেহরক্ষা করিলে তাহার মরদেহ উক্ত আস্তানার মধ্যেই সমাধিস্থ করা হয়।

পীরসাহেবের বর্তমান খাদেম মোহম্মদ ইউশফ আলামীর। ইঁহারাই বংশপরম্পরায় পীরের খাদেম কার্যে নিযুক্ত আছেন।

পীরসাহেব সম্পর্কে সঠিক কোন বিবরণী পাওয়া যায় না, খাদেমদিগের নিকট রক্ষিত ফার্সি ভাষায় লিখিত একটি তামার ফলক হইতে কেবলমাত্র তাঁহার এই স্থানে আগমন ও দেহরক্ষা সম্পর্কে জানা যায়। এখন এই ফলকটি পাওয়া যায় না। তবে খাদেম-এর কাছে ফলকের একটি বাংলা অনুবাদ কাগজে লেখা আছে। তিনি "দাতাপীর" বলিয়া অধিক প্রসিদ্ধ হইলেও অনেকে তাহাকে "দাদাপীর" বলিয়া থাকেন।

শুনা যায়, পীরসাহেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে জনৈক ব্যক্তি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া পীরসাহেবের সমাধিতে ময়দা ও মোরগ মানত করিয়া নিরাময় লাভ করে। এই ঘটনা প্রচারিত হইলে প্রতি বৎসর ১৯শে পৌষ পীরের তিরোধান দিবসে মানতকারী বহু নরনারীর সমাগম হইতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এই স্থানে উৎসব ও একটি মেলার সূচনা হয়।

উৎসবের দিন পীরের দরগায় ভক্তরা ছাগ, মোরগ, মুরগী, চাল-ডাল, ময়দা, চিনি, বাতাসা পেঁড়া, পয়সা ও মাটির ছোট ছোট ঘোড়া মানত দিয়া থাকেন। উৎসবের দিন বহু দূর-দূরান্ত হইতে যাত্রীরা আসেন।

দাতাপীরের অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়। ঐ সকল কিংবদন্তীর দুই একটি নীচে উদ্ধৃত করা হইল।

পীরসাহেব একবার তাঁহার আস্তানার নিকটবর্তী গ্রামের কোনও এক অধিবাসীকে পাঁচ সের আতপ চাউল-গুঁড়া ও একটি মোরগ দিবার জন্য আদেশ করেন। ঐ ব্যক্তি তাহা আনিয়া দিলে, উহার দ্বারা তিনি খাদ্য প্রস্তুত করিয়া সর্বসাধারণকে ভোজের জন্য আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ পাঁচ সের চাউলের গুঁড়ার রুটী ও একটি মোরগের মাংস শত শত লোক তৃপ্তির সহিত আহার করিয়াও শেষ করিতে পারেন নাই। জীবিতাবস্থায় তিনি নাকি প্রায়ই এইরূপ ভোজ দিতেন।

পীরসাহেবের কবরের উত্তর দিকে একটি কাঁঠাল গাছ ছিল। এই গাছে পীরের মৃত্যুর দিন অর্থাৎ প্রতি বৎসর ১৯শে পৌষ একটি কাঁঠাল পাকিত। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে কবরের উপরে অবস্থিত ঘরে আগুন লাগিয়া ঐ কাঠাল গাছটি পুড়িয়া যায়। এই গাছটি গ্রামের বহু প্রাচীন ব্যক্তি দেখিয়াছেন বলিয়া শুনা যায়।

গত ১৩৪৫ সনের ভীষণ বন্যায় পীরসাহেবের আস্তানার আশেপাশের সকল গ্রাম জলমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু পীর-সাহেবের কবরের চারিদিকের দশ-বারো হাতের মধ্যে জল প্রবেশ করিতে পারে নাই। ইহাও পীরের অলৌকিক মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

(রামচন্দ্র কবিরাজ ঠাকুর)

'পরম বৈষ্ণব রামচন্দ্র কবিরাজ ভগবানগোলার নিকট-বর্তী স্বীয় বাসস্থান তেলিয়াবুধুরী গ্রামে গৌরগোবিন্দ, গৌরগোপাল, রাধাকৃষ্ণ ও জগন্নাথ এই বিগ্রহ চতুষ্টয় প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তরকালে তাঁহার বংশধরগণ গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার সময় উক্ত বিগ্রহ চতুষ্টয়ের সেবার ভার রামদাস বাবাজী মহারাজকে অর্পণ করেন। তিনি ভগবানগোলাতে মন্দির তৈয়ারী করিয়া বিগ্রহগুলির নিত্যসেবার ব্যবস্থা করিয়া যান। শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এই মন্দিরে প্রতি বৎসর আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে রামচন্দ্র কবিরাজের তিরোধান উপলক্ষে একটি উৎসব পালন করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে ষষ্ঠীতে অধিবাস, সপ্তমীতে নামযজ্ঞ, অষ্টমীতে মহোৎসব এবং নবমীতে ধুলোট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এই অঞ্চলের সবজনীন উৎসব।

"ভগবানগোলার নিকটবর্তী তেলিয়াবুধুরী গ্রাম বৈষ্ণব সাহিত্যে সুপরিচিত। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ ও তদীয় অনুজ বিখ্যাত পদকর্তা গোবিন্দ দাস এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা উভয় ভ্রাতাই সুপ্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য। রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম দাসের বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। স্বকৃত পদে নরোত্তম দাস বহু স্থানে রামচন্দ্রের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতা গোবিন্দ দাস কবিরাজ প্রথমে ঘোর শাক্ত ছিলেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের কৃপায় দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই সময়ে তেলিয়াবুধুরী গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্য আসিলে একটি মহোৎসবের অনুষ্ঠান হয়।"

(বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ২৮৯)

"...পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজ চৈতন্য সহচর পরম ভাগবত চিরঞ্জীব সেনের পুত্র ও শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিত্র। চিরঞ্জীব সেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য। তাঁহার বাড়ী কুমারনগর ছিল; কিন্তু তিনি দামোদরের কন্যা সুনন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীখণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে তাঁহার পুত্রদ্বয় কুমারনগরে পৈত্রিক বাসস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত স্থানের বৈষ্ণবদ্বেষী শাক্তগণ দ্বারা উৎপীড়িত হওয়াতে পদ্মাপারস্থিত তেলিয়াবুধুরী গ্রামে বাড়ী করেন। গোবিন্দ দাসের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র কবিরাজ নরোত্তম ঠাকুরের সুহৃৎ ও স্বয়ং প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি ছিলেন...

এইরূপ কথিত আছে, তিনি (গোবিন্দ দাস) ৪০ বৎসর পর্যন্ত শাক্ত ছিলেন, তারপর গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে আদিষ্ট হন; তদানুসারে অনুমান

১৫৭৭ খৃঃ অব্দে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। ইহার পর তিনি আরও ছত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।... শেষ বয়সে কবিকে বুধুরী গ্রামে স্বীয় পদসংগ্রহ কার্যে ব্যস্ত দেখা যায়"

[বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, দীনেশচন্দ্র সেন : ৮ম সংস্করণ পৃঃ ১৮৩]

কৃষ্ণজননী পূজা

দেবীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরের সপ্তমী হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত মহাসমারোহে কৃষ্ণজননীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি চাঁই সম্প্রদায়ের হইলেও এই উৎসবে গ্রামের অপরাপর হিন্দু-অহিন্দু প্রায় সকল সম্প্রদায়ই যোগদান করেন। কৃষ্ণজননীর মূর্তি ভগবতী মূর্তির অনুরূপ। তাঁহার দক্ষিণে লক্ষ্মী, বামে সরস্বতী পদপ্রান্তে যুক্তকর গরুড়। দেবীর কোলে শ্রীকৃষ্ণ। যশোদার শিশু পুত্র শ্রীকৃষ্ণ বনে গরু চড়াইতে গেলে ভগবতী স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া বনমধ্যে কৃষ্ণকে কোলে লইয়া ননী খাওয়াইতেছেন—এইভাবে প্রতিমা তৈয়ারী করিয়া কৃষ্ণজননীর পূজা করা হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে দেবীর একটি মাটির দেবালয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবীর একটি পুষ্করণীসহ প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর জমি আছে।

সপ্তমী হইতে দশমী পর্যন্ত সাড়ম্বরে দেবীর যথারীতি পূজা ও ভোগ দেওয়া হয়। প্রধানতঃ ফলমূল, ভোগ ইত্যাদি দেবীর নিকট মানত করা হয়। কেহ কেহ অবশ্য পাঁঠা মানত করেন---মানতের ঐ সকল পাঁঠাকে দেবীর নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে সপ্তমীর দিনে থিয়েটার, অষ্টমীর দিন যাত্রা এবং নবমী ও দশমীর দিন যথাক্রমে কবিগান এবং আলকাপ-গান ইত্যাদি হইয়া থাকে।

গ্রামের চাঁই সম্প্রদায়ই দেবীর সেবায়েত। বাৎস্য গোত্রীয় মিশ্র পদবীধারী ব্রাহ্মণ দেবীর পূজারী। পূজার নবমী এবং দশমীর দিন প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে।

গঙ্গাপূজা

গিরিধারীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর সাধারণতঃ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসের মধ্যে গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রাচীন এবং গ্রামের মৎস্যজীবী সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে এই পূজার আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, গঙ্গাদেবীর পূজা করিলে মৎস্য শিকারে তাঁহারা লাভবান হইবেন।

গ্রামে গঙ্গাদেবীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি মাটির দেওয়াল এবং করগেট টিনের ছাউনীযুক্ত। গ্রামের সকলের চাঁদায় মন্দিরটি মেরামত করা হয়।

শুঁড়ি সম্প্রদায়ই দেবীর সেবায়েত। পাশের গ্রামের বন্দোপাধ্যায় পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ দেবীর পূজারী। পূজা উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়া থাকে। এই উৎসবে গ্রামের প্রায় সকল সম্প্রদায়ই যোগদান করিয়া থাকেন।

শিবপূজা

রাণীতলা গ্রামে শ্রীপঞ্চমীর পরে শীতলাষ্টমীর দিন শিব-পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা গ্রামের রায়বংশীয় কায়স্থদের পারিবারিক পূজা। বর্গী হাঙ্গামার পর রায়বংশীয়গণ বর্ধমান হইতে এই গ্রামে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তখন হইতেই পূজাটি চলিয়া আসিতেছে। ইহা ব্যক্তিগত পূজা হইলেও যে-কোন লোক শিবের ভক্ত হইতে পারেন। এই শিবপূজাতে গাজনের মত বহু লোক ভক্ত হইয়া থাকেন।

রায়পরিবারের বসতবাটী সংলগ্ন একটি গাছের নীচে খড়ের চালাযুক্ত স্থানে শিবের পূজা হয়। প্রতি বৎসর মহাদেবের মৃণ্ময় মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হয় এবং পূজান্তে মাকরী সপ্তমীর দিন বিসর্জন দেওয়া হইয়া থাকে।

শিবের বর্তমান সেবায়েত শ্রীপ্রদ্যোত কুমার রায়, ইঁহাদের গোত্র মৌদ্গল্য। উৎসবের দুইদিন পূর্বে ব্রতীগণ ক্ষৌর কার্য সম্পন্নের পর হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া সংযম পালন করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহারা ঢাকের বাজনাসহ দল বাঁধিয়া নিকটবর্তী গ্রামসমূহে বাড়ী বাড়ী নৃত্যগীত করিয়া কিছু কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করেন। তাহা দ্বারা এবং রায় পরিবারের প্রদত্ত আরও কিছু খাদ্যদ্রব্য দ্বারা সমগ্র গ্রামে একদিন সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। পূজার রাত্রিতে ভক্তরা ঢাকের বাদ্যসহ নৃত্যগীত করিয়া "ধূপবান" প্রজ্জ্বলিত করে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ ভগবানগোলা

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব মেলা (দাতাপীর)

ভগবানগোলার নিকটবর্তী শেখপুরা গ্রামে দাতাপীর বা দাদাপীর সাহেবের (শাহ্ সুফী সৈয়দ হজরত নাসের আলী) উরস্ উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১৯শে পৌষ হইতে আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলায় সকল সম্প্রদায়ের দৈনিক গড়ে প্রায় আট-দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং নানাবিধ মিষ্টান্ন, মাটির জিনিসপত্র, বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কাঠের আসবাব-পত্র, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি জিনিসপত্রের অনেক দোকান-পাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ভেল্কীবাজি-খেলা, আলকাপ গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। তাহাছাড়া পীরের সমাধি নিকটস্থ বাকাচাতালে ধর্মসভার আয়োজনও করা হয়।

কৃষ্ণজননী পূজার মেলা

দেবীপুর গ্রামে মাঘ মাসে কৃষ্ণজননীপূজা উপলক্ষে দেবীমন্দির সংলগ্ন প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর সাতদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। প্রতিদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পযন্ত লোকসমাগম ও বেচাকেনা হয়।

প্রধানতঃ ভগবানগোলা, লালগোলা, আখরিগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, জিয়াগঞ্জ, সাগরদীঘি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের দৈনিক গড়ে প্রায় ছয়-সাত হাজার যাত্রী সাধারণতঃ ট্রেনে, গরুর গাড়ীতে এবং ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা বেশী।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ লালগোলা, ভগবানগোলা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরীওয়ালা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিস-পত্র, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা, হাঁড়িকুঁড়ি প্রভৃতি জিনিসপত্রের আমদানী বেশী হয়। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক, জুয়া, লটারী, যাত্রা, থিয়েটার এবং কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।

ভগবানগোলা থানার মানিকডাঙ্গার শ্রীদেবেন্দ্র নাথ সরকার, জিয়াগঞ্জ থানার শ্রীবনমালী, বল্লালপুরের শ্রীদেবেন দাস ও শ্রীঅনাদি ভূষণ ঘোষ, নবগ্রাম থানার শ্রীঅনুকুল ঠাকুর, প্রমুখ ব্যক্তিগণ বিভিন্ন বৎসর নিজ নিজ যাত্রাদলসহ এই মেলায় আসেন। সাগরদীঘি থানার শ্রীগোপাল হালদার ও জঙ্গীপুরের শ্রীধনঞ্জয় সরকার এই মেলায় আসিয়া আলকাপ গান করিয়া থাকেন।

গঙ্গাপূজার মেলা

গিরিধারীপুর গ্রামে আষাঢ় মাসে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে দেবীমন্দির সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ-বার কাঠা জমিতে সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু-দিনের প্রাচীন এবং প্রতিদিন অপরাহ্নে লোকসমাগম হয়।

মেলায় প্রধানতঃ আশেপাশের এবং সরসপুর, মহম্মদপুর, আমোদহরা, ভগবানগোলা প্রভৃতি ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের দৈনিক প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ীতে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আখরিগঞ্জ, বেণীপুর, কুঠিবাড়ী, নাশিপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় নানাবিধ মিষ্টান্ন, বাসন-কোসন, মনিহারী, খেলনা, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকানই বেশী। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কবিগান, আলকাপ গান, ভাসান গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে একটি আলকাপ গানের দল আছে। ভাসান গানের দল ভাঁড়িপাড়া গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ রানীনগর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ চাতরা।৩৩।৬৬৩'৬৭।১৬৬।৯৯৩

(ক) মাহিষ্য, চাঁই, ব্রাহ্মণ, কলু, ধোপা, কামার, নাপিত, পাটনী এবং মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে সাত মাইল দূরে পূর্বদিকে জিয়াগঞ্জ রেলস্টেশন এবং প্রায় সাড়ে সাত মাইল দক্ষিণ-পূর্বে মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশন। এই দুইটি রেলস্টেশন হইতে লালগোলাঘাট হইয়া শিয়ালদহ স্টেশনে পৌছান যায়। গ্রাম হইতে নদীতে খেয়া পার হইয়া লোকাল বোর্ডের রাস্তা দিয়া দক্ষিণে প্রায় ছয় মাইল অতিক্রম করিয়া দৌলতাবাদ নামক স্থানে মোটরবাস পাওয়া যায়। এই স্থান হইতে মোটর-বাসে পশ্চিমে জেলার সদর শহর বহরমপুরে যাওয়া যায়। গ্রামের পাশ দিয়া প্রবাহিত ভৈরবী নদীতে বর্ষাকালে নৌ-চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) কার্তিকে কালীপূজা। ইহা মাহিষ্য সম্প্রদায়ের উৎসব। পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। ইহাছাড়া, চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায়ের দুইটি কালীপূজা হয়, একটি পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন, অপরটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। চৈত্রে শিবপূজা। পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাশাপাশি দুইটি কালীমন্দির ও একটি শিবলিঙ্গ আছে।

চাতরা গ্রামটি অতি প্রাচীন। গ্রামের পশ্চিম দিকে ভৈরব নদী প্রবাহিত। শুনা যায়, পূর্বে এই নদীর তীরে চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায়ের পূর্বপুরুষগণ বসবাস করিতেন। এই চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায় এতদঞ্চলে চাতরা নামে অভিহিত হইতেন। প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে ভৈরব নদীর ভাঙ্গনে পুরাতন চাতরা গ্রামটি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বর্তমান চাতরা গ্রামটি ভৈরব নদীর তীরে রামনগর চাতরার পূর্বদিকে অবস্থিত। পুরাতন চাতরা বর্তমানে চর চাতরা নামে অভিহিত এবং ঐ স্থানে চাষ-আবাদ হয়।

শ্রীরাজকুমার সরকার, মৎস্যজীবি,
নওদা, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ ইসলামপুর। ৫৬।১,০১১'১২।৭৭৭।৪,২৬৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, তাঁতি, কায়স্থ, নাপিত, কামার, তিলি, সাহা, কুরি, বৈষ্ণব, গোয়ালা, বাগ্‌দী, মেথর, ধোপা, মাহিষ্য, কৈবর্ত, পাটনী, কুমার ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, জোত্‌দারী, চাকুরী, রেশম বস্ত্রশিল্পী, জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। গ্রামের নিকট দিয়া জলঙ্গী-বহরমপুর পাকা রাস্তা গিয়াছে। নবদ্বীপ ঘাট হইতে খরিয়া বা ভৈরব নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখে হরিসভার উৎসব, আশ্বিনে দুর্গা-পূজা এবং চৈত্রে শিবপূজা।

(ঙ) গ্রামে একটি শীতলা এবং একটি মনসা দেবীর স্থান আছে।

(চ) ×

শ্রীলক্ষ্মীনাথ সেনগুপ্ত, কাব্যতীর্থ, শিক্ষক,
ইসলামপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—ইসলামপুর গ্রামের নিকটবর্তী চকগ্রামে (মৌজা নং ৫৬) কালীতলায় কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ মেলা বিবরণী অধ্যায় দেওয়া হইল।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ রানীনগর

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

চাতরা গ্রামে চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দুইটি কালীপূজা হয়। কালী মন্দির দুইটি পাশাপাশি অবস্থিত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এখানে একটিই পূজা হইত; অবশ্য তখন মূর্তি গড়িয়া পূজা করা হইত না। কিছুকাল পূর্বে কলেরার প্রকোপে চাঁইমণ্ডলদের বহু আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মূর্তি পূজার আয়োজন হয়। তাহার পর প্রায় কুড়ি বৎসর পরে চাঁইদের মধ্যে দুইটি দলের সৃষ্টি হয় এবং দুইটি পৃথক পূজার প্রচলন হয়। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

চাঁইমণ্ডলদের এই দুইটি কালীপূজা ছাড়াও গ্রামের মাহিষ্য সম্প্রদায়ের একটি কালীপূজা হয়। এই পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

দুর্গাপূজা

ইসলামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিশেষ সমারোহের সহিত একটি প্রাচীন দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গা প্রতিমার মস্তকোপরি বৃষারূঢ় নারায়ণ, সরস্বতীর মস্তকোপরি হংসারূঢ় ব্রহ্মা, কার্তিক ও গণেশের পাশে যথাক্রমে জয়া ও বিজয়া এবং উপরে দুই পাশে দুই মকর মূর্তি থাকে, এইরূপে বাইশ পুতুলসহ দুর্গা প্রতিমা তৈয়ারী করা হয়। বাইশটি পুতুলের বাইশটি ভোগ হয়। পূজাটি এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ এবং শোনা যায় যে, এই পূজায় নাকি নানারূপ অলৌকিক ঘটনা ঘটে। বাইশ পুতুল পূজায় সোনার গহনা অথবা কুমড়া বলি মানত দেওয়া হয়। পূজার সেবায়েত বৈদ্যবংশীয়, পূজারী ব্রাহ্মণ।

গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত ভৈরব নদীতে বিজয়া দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে কয়েক হাজার লোকের সমাগম হয়। বিসর্জন উপলক্ষে বাইশ পুতুল এবং আশেপাশের গ্রামের অন্যান্য দুর্গা প্রতিমাসহ নৌকা বাইচ হইয়া থাকে। ইহা সাধারণতঃ মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত চলে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : রানীনগর

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

চাতরা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে চাঁইমণ্ডল সম্প্রদায়ের কালীপূজা উপলক্ষে মন্দিরের পাশে প্রায় দেড়বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ পাহাড়পুর, ডাঙ্গাপারা, ধর্মপাড়া, উলাসপুর, তেঁতুলিয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় একহাজার নরনারীর সমাগম হয়। সর্বাপেক্ষা দূরের-যাত্রী জিয়াগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে এবং হাঁটিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ ডাঙ্গাপাড়া, ধর্মপুর, উলাসপুর, তেঁতুলিয়া, গোপীনাথপুর, পাহাড়পুর, লোচনপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মোট প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে। তাহার মধ্যে অধিকাংশই ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, পুতুল এবং মাটির হাঁড়ি-কুড়ির দোকান।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, আলকাপ-গান, স্থানীয় দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয় এবং জুয়াখেলা চলে। মুর্শিদাবাদ হইতে সেখ গুমানী, শ্রীদেবেন দাস, শ্রীকিশোর কৌড়া এবং বীরভূম হইতে শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিয়ালগণ আসেন। এই অনুষ্ঠানে প্রচুর লোক সমাগম হয়।

চক্‌গ্রামের কালীতলায় প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং ডাঙ্গাপাড়া, বহরমপুর, কলাডাঙ্গা, রামকৃষ্ণপুর, নিধিনগর, জলঙ্গী এবং ডোমকল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ ছয় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুরগাড়ী, বাস, সাইকেলে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশে-পাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। দোকানপাটের মধ্যে অধিকাংশই মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড় এবং শিল্পজাতসামগ্রীর দোকানপত্র দেখা যায়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, যাত্রা এবং থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়। কবিগানের জন্য শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তী এবং সেখ গুমানী প্রভৃতি কবিয়ালগণ আসেন। যাত্রা এবং থিয়েটারের দল স্থানীয়।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : জিয়াগঞ্জ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সাদেকবাগ। ৩।৯৪'২১। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, যুগী, বৈরাগী, নমঃশূদ্র। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন জিয়াগঞ্জ হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে জগন্নাথজীউর রথযাত্রা উৎসব। বাংলা ১১৪৯ সনে সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়। তাহাছাড়া, তুলসীবিহার, স্নানযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, অন্নকূট, নবান্ন, দোলযাত্রা, রামনবমী ও শারদীয়া পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে নয়দিনব্যাপী। মেলাটিও উৎসবের সমসাময়িককাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বে নাকি এই স্থানটি বিভিন্ন ধর্মের সাধকদের আবাস-স্থল ছিল এবং সাধক মস্তরাম আউলিয়া এইস্থানে একটি আখড়া প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বের সাদেকবাগ নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গেলে জিয়াগঞ্জ থানার অন্তর্গত চৌংরাবালী গ্রামে আর একটি নূতন আখড়া স্থাপন করিয়া সাধকগণ এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। খুব সম্ভবতঃ এই কারণে স্থানটি "সাদেকবাগ" নামে খ্যাত হইয়াছে।

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র দত্ত, গ্রামসেবক,
মুকুন্দ বাগ, মুর্শিদাবাদ।

Sadek Bag (J. L. 3)—This used to be the old Sadhak Bag containing the original monastery of Mastaram Aulia facing the palace of Rani Bhabani and her temples across the river. This monastery used to be very large establishment just on the left bank of the Bhagirathi and contained cells for meditation built under the level of the ground. Almost the entire monastery has tumbled into the bed of the river and traces of the original building still remains forming a sharp clitff or bluff above the river. The solid masonry work reminiscent of the tumbled down ruins of Jagat Seth's palace further down the river is still to be seen projecting from the bed of the Bhagirathi in winter. The tomb of Mastaram Aulia has now been destroyed by the river.
(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 187-188)

২। গ্রাম : ছোট গোবিন্দপুর (মৌজা : জিয়াগঞ্জ)। ৬।৯৪'৫২। (শহরাঞ্চের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আজিমগঞ্জ।

(ঘ) বৈশাখে পুষ্পদোল উৎসব ; শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা ও গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব, আশ্বিনে নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব, কার্তিকে রাসযাত্রা উৎসব ও ভাগ্যচন্দ্রের তিরোভাব উৎসব, মাঘে সচ্চিদানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব এবং চৈত্রে বৃন্দাবনী উৎসব। উল্লিখিত উৎসবগুলি বেশ প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে রাধাকৃষ্ণের একটি পাকা মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখে একটি আটচালা আছে। মন্দির প্রাঙ্গণের চারিপাশে অনেকগুলি পাকা ঘর আছে।

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র দত্ত, গ্রামসেবক,
মুকুন্দবাগ, মুর্শিদাবাদ।

Jiaganj—Town in the Lalbagh subdivision, situated on the east bank of the Bhagirathi,

6 miles north of Murshidabad and opposite Azimganj station on the East Indian Railway. It forms part of the Azimganj municipality and is connected with Azimganj by a ferry across the Bhagirathi; during the rains, a steamer service plies to Dhulian and Calcutta. Though it is no longer such an important emporium as it was, Jiaganj is still a large depot where rice, jute, silk, bell-metal etc., are collected for export. It contains some large houses, the property of Jain merchants, many of whom dwell here, though the main colony lives at Azimganj.
(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. li)

৩। গ্রাম: নেহালিয়া।১৩।৪৮'৪৮।২৮।১৭৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন জিয়াগঞ্জ।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে পাঁচদিনব্যাপী ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা ও ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ঝুলনযাত্রার মেলা। শ্রাবণ মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী, মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কারুকার্যখচিত ইষ্টক নির্মিত দক্ষিণ দুয়ারী একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা রাধামোহন ঠাকুরের মন্দির নামে খ্যাত। মন্দির পার্শ্বে ভোগ রন্ধনশালাও আছে।

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র দত্ত, গ্রামসেবক,
মুকুন্দবাগ, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম: সৌদগঞ্জ। (মৌজা: গোলজারবাগ)। ১৪।৮৩'১৯।৯৩।৩৯২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন জিয়াগঞ্জ।

(ঘ) চৈত্র মাসের পূর্ণিমাতিথিতে কমলেকামিনী-পূজা। পূজাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা সাধারণতঃ চৈত্রসংক্রান্তির পাঁচ-ছয়দিন পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। উৎসবের কয়দিন প্রত্যহ প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজারী সর্বশ্রী কৃপাসিন্ধু ভট্টাচার্য ও বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য। এই পূজায় হিন্দু ও অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই যোগদান করেন।

(ঙ) কমলেকামিনীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে এক-সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে কমলেকামিনীদেবীর দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র দত্ত, গ্রামসেবক,
মুকুন্দবাগ, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম: আজিমগঞ্জ।৩৯।২০৭'৫৭। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন আজিমগঞ্জ।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গাপূজা। পূজাটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীঅমূল্য চন্দ্র দত্ত, গ্রামসেবক,
মুকুন্দবাগ, মুর্শিদাবাদ।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ জিয়াগঞ্জ

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর)

জিয়াগঞ্জ বাজারে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা-তিথিতে গঙ্গানারায়ণ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব পালিত হয়।

গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক নরোত্তম দাস ঠাকুরের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। নরোত্তম ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি প্রাচীন মণিপুরের মহারাজা ভাগ্যচন্দ্রকে শিষ্যত্ব দান করেন এবং পরে মণিপুরের সমস্ত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার শিষ্য হন। প্রবাদ আছে যে, ঝুলন পূর্ণিমায় শেষরাতে এক ব্রাহ্ম মুহূর্তে মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তন করিতেছিলেন। সেই সময় গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর গৌরগোবিন্দের পাদপদ্ম সেবা করিতে করিতে ফুল হইয়া বিলীন হইয়া যান। মহারাজা ভাগ্যচন্দ্র এই অলৌকিক দৃশ্য দর্শনে গুরুদেবকে ডাকিতে থাকেন। তখন তিনি ভাগ্যচন্দ্রকে তাঁহার জন্য দুঃখ না করিয়া বরং তাঁহার তিরোভাব উৎসব পালনের জন্য নির্দেশ দেন। এইভাবে গুরুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তিনি গ্রামে প্রতি শ্রাবণী পূর্ণিমায় গুরুর তিরোভাব উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেন।

(নরোত্তম ঠাকুর)

জিয়াগঞ্জ বাজারে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শুনা যায় যে, নরোত্তম ঠাকুর রাজশাহী জেলার অন্তর্গত খেতুরিয়া গ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্তের পুত্র। ইনি জাতিতে কায়স্থ এবং পরম বৈষ্ণব ভক্ত ছিলেন। বৈষ্ণব হওয়ায় তিনি "ঠাকুর" উপাধি লাভ করেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইনি একজন খ্যাতনামা এবং বহু বৈষ্ণব গ্রন্থে তাঁহার নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার আবির্ভাবের পর খেতুরিয়া গ্রাম "শ্রীমা" নামে পরিচিত হয়। গৌরাঙ্গ, বল্লভকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রজমোহন, রাধারমণ ও রাধাকান্ত নামে তাঁহার ছয়টি বিগ্রহ ছিল। গঙ্গানারায়ণ নামে তাঁহার এক প্রিয় শিষ্যকে দীক্ষা দেওয়ার পর তিনি গম্ভীরা নামক স্থানে বসবাস করিতে থাকেন। উক্ত স্থানটি ক্রমে "গম্ভীরা পাঠ" নামে পরিচিত হইয়া উঠে। প্রবাদ আছে যে, একদা কৃষ্ণচরণ ঠাকুর ও গঙ্গানারায়ণ ঠাকুর নামে নরোত্তম ঠাকুরের দুইজন শিষ্য তাঁহার অঙ্গ মার্জনার সময় দুধ হইয়া তিনি গঙ্গাজলে বিলীন হইয়া যান। সেই দিনটি ছিল আশ্বিনের কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি। সেই হইতেই আজ পর্যন্ত গম্ভীরাপাটে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে তাঁহার তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

ঝুলনযাত্রা

জিয়াগঞ্জ বাজারে প্রতি বৎসর শ্রাবণী শুক্ল একাদশী তিথিতে সাড়ম্বরে রাধাকৃষ্ণের ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সাড়ে চারশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা শ্রাবণী শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ হইয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত চলে এবং এক সপ্তাহ পূর্ব হইতেই উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। উৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন সকালে বিগ্রহের অভিষেক ও যথারীতি পূজার্চনার পর সন্ধ্যাকালে শুভলগ্নে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দোলায় স্থাপন করিয়া দ্বাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত বিশেষ ভোগ-পূজা হয়। প্রতিদিন পূজান্তে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূর্ণিমার শেষে প্রতিপদ তিথিতে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ দোলা হইতে নামাইয়া মন্দিরে পুনঃ-প্রতিষ্ঠার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।

নেহালিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে শুক্ল একাদশী তিথিতে রাধামোহন ঠাকুরের ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। শ্রাবণী শুক্ল একাদশীতে আরম্ভ হইয়া পাঁচদিন-ব্যাপী উৎসব চলে। উৎসবের প্রথম দিন সকালে সমারোহে রাধামোহন (রাধাকৃষ্ণ মূর্তি) ঠাকুরের অভিষেক ক্রিয়ার পর যথারীতি পূজার্চনা আরম্ভ হয়। এইদিন সন্ধ্যায়

রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয়কে দোলায় স্থাপন করিয়া দ্বাদশী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত যথারীতি পূজা ও ভোগ হয়। পূর্ণিমার দিন পূজা এবং ভোগ বিশেষ জাঁকজমকের সহিত হইয়া থাকে।

রথযাত্রা

সাধকবাগ বা সাদেকবাগ গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথজীউ-র রথযাত্রা উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি বাংলা ১১৪৯ সনে প্রথম আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর আষাঢ়ের প্রতিপদ হইতে দশমী তিথি পযন্ত নয়দিন-ব্যাপী উৎসবটি চলে। প্রতিপদ তিথিতে জগন্নাথদেবের স্নানাভিষেক উৎসবও দ্বিতীয়ায় যাগযজ্ঞাদির পর জগন্নাথ-দেবের বিগ্রহ রূপার থালায় করিয়া রথে স্থাপন করা হয়। বিকালে ভোগ ও আরতির পর জগন্নাথদেবের রথ টানা পর্ব শুরু হয়। সন্ধ্যাকালে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ গুণ্ডিচা বাড়ীতে আনিয়া একটি সিংহাসনের উপর স্থাপন করা হয়। গুণ্ডিচা বাড়ীতে সপ্তমী তিথিতে রথে করিয়া জগন্নাথ বিগ্রহকে পুনরায় মন্দিরে আনিবার পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। সাধকবাগ গ্রামের আখড়ার মহন্ত মস্তরামজী বাংলা ১১৪৯ সনে নাটোর রাজা রামকান্ত রায়ের অর্থ সাহায্যে বত্রিশ চাকা ও সতের চূড়াবিশিষ্ট একটি রথ নির্মাণ করেন। কিন্তু উল্লিখিত রথটি কালের প্রভাবে নষ্ট হইয়া গেলে, বাংলা ১৩২৭ সনে মেদিনীপুর জেলার রাজা সতীপ্রসাদ গর্গ ও গোপাল প্রসাদ গর্গ নামে ভ্রাতৃদ্বয়ের অকুণ্ঠ সহযোগিতায় এবং অর্থ সাহায্যে জগন্নাথ দেবের বর্তমান রথটি নির্মিত হয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ

মেলা বিবরণী

কমলেকামিনীপূজার মেলা

সৌধগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে কমলেকামিনী-পূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। দোকানপাটগুলি খোলা জায়গায় বসে এবং মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি, মাটির তৈয়ারী খেলনা, হাঁড়িকুঁড়ি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদি আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, লটারী, সার্কাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

গঙ্গাপূজার মেলা

আজিমগঞ্জ-এ প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গার চরে প্রায় পনর-কুড়ি বিঘা পরিমাণ জমির উপর গঙ্গাপূজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলার জায়গাটির কিছু অংশ রেলওয়ে বিভাগের এবং কিছু অংশ স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ ট্রেনে, গরুর গাড়ীতে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় অঞ্চল হইতে আসেন। প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টিটি দোকানপাট বসে। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বই-ছবি, বাসন-কোসন, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং কুটিরশিল্পজাত জিনিসের দোকানের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, লটারী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

ঝুলনযাত্রার মেলা

নেহালিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে রাধাগোবিন্দজীউ-র মন্দিরের সম্মুখে সেবায়েতের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে সব সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় গ্রামবাসী। মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। তাহা ছাড়া মেলায় দশ বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবার, মনিহারী, বই-ছবি, মাটি, কাঠ ও কাগজের তৈয়ারী নানাবিধ খেলনা ইত্যাদির দোকানই বেশী। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, ঝুমুর, কীর্তন ও আলকাপ গানের ব্যবস্থা করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

সাধকবাগ বা সাদেকবাগে গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে স্থানীয় আখড়ার সম্মুখে প্রায় পনর-ষোল বিঘা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ জমির উপর নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং জিয়াগঞ্জ, বাহাদুরপুর, মুকুন্দবাগ, লালগোলা, ভগবানগোলা, সাগরদীঘি প্রভৃতির বিভিন্ন অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের দৈনিক গড়ে প্রায় দেড়-দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। তবে আজিম-

গঞ্জ, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। মোট দোকানপাটের সংখ্যা সত্তর হইতে আশি এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা কুড়ি হইতে পঁচিশ। উল্লিখিত দোকানপাটের মধ্যে তেলেভাজা, ময়রা ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি এবং শিল্পজাত জিনিসপত্রেরও কয়েকটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, নামকীর্তন, নাগরদোলা, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। তাহাছাড়া, জুয়া খেলার রেওয়াজ আছে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ

থানা : মুর্শিদাবাদ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মুর্শিদাবাদ শহর (মৌজা : কেল্লা নেজামত)।৫২।৮১'৫৭। শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুর্শিদাবাদ সিটি ও লালবাগকোর্ট রোড। মোটরবাস ও নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে বেরা উৎসব। ইহাভিন্ন, বৎসরের বিভিন্ন সময় দুর্গা, লক্ষ্মী, কালী, সরস্বতী, কার্তিক প্রভৃতি নানা দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) বেরা উৎসবের মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন। মেলাটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়, সাংবাদিকতা,
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

Murshidabad—"Though Murshidabad was the capital of Bengal for nearly a century, its history cannot be traced back to any distant date, and there are divergent accounts of its origin. According to Tieffenthaler, it was founded in the time of Akbar, and this seems to be corroborated by the fact that there is a place to the east of the town called Akbarpur. There is, however, no trace of this name in the old records, where it is always known as Makhsusabad, or its variant Makhsudabad. The *Riyazu-s-salatin* says that the place was called Makhsusabad after a merchant named Makhsus Khan who built a *sarai* there, and its founder may have been a noble man of that name who is mentioned in the *Aain-i-Akbari.* He was the brother of said Khan, Governor of Bengal under Akbar (1587—1595 A. D.) and served in Bengal and Bihar ; a stone masque at Hazipur in the Patna District, which was built by a Makhsus khan, may have been erected by him. There is also a mention of the town, as "Murasudabad founded by a Yavana, *i.e.*, a Musalman, in the *Brahmanda* section of the *Bhavishyat Purana*, which was probably composed in the fifteenth or sixteenth century. Yet another account is given by Raymond, the translator of the *Sair-ul-Mutakharain* (*circ.*, 1786), who says it was first called "colaria" then "Macsoodabad" and finally "Moorshoodabad." Kolaria was a place in the east of the town, where Murshid Kuli Khan had his residence.

......The town contains the administrative head quarters of the Lalbagh subdivision, but has no industries except a few that were fostered by the luxury of the Mughal Court Ivory curving is an old speciality of the place ; the artificers, now few in number, produce highly-finished work. Other industrial arts are the embroidery of articles with gold and silver lace, the making of musical instruments and *hookahs*, and the manufacture of silk fabrics."

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. lii liii.)

২। গ্রাম : কুমিরদহ।৮৭।১,০৫২'৭১।১৭০।৮৪৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের ২৮শে তারিখে এই গ্রামের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের একটি মহোৎসব হয়, পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীপূজা এবং মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শিবপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। লক্ষ্মী পূজাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের এবং শিবপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি লক্ষ্মীর, দুইটি কালীর ও একটি শিবের মন্দির আছে। কালীমন্দির দুইটি ভগ্নপ্রায়।

বর্তমান কুমিরদহ গ্রামটি অতীতে ভাগীরথীর চরাভূমি ছিল। এখনও গ্রামের পাশে একটি বিরাট দহ তাহার প্রমাণ দিতেছে। এই দহের ছয় মাইল উত্তরে আর একটি দহ আছে। পূর্বে এই সকল দহ হইতে কুমীর উঠিয়া চরায় রৌদ্র পোহাইত। বণিকরা এই পথে বাণিজ্যে যাইবার কালে এই সকল দহগুলিকে "কুমিরদহ" নামে চিহ্নিত করিয়াছিলেন। দহের নিকটবর্তী এই চরাভূমিতে কালক্রমে জনবসতি গড়িয়া উঠিলে গ্রামটি কুমিরদহ নামে খ্যাত হয়।

কিংবদন্তী আছে, এই নির্জন চরাভূমিতে একজন ধর্মপ্রাণ দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। বাণিজ্য শেষ করিয়া চাঁদসদাগর একবার এই পথে স্বদেশে ফিরিতেছিলেন। তিনি যখন দহের নিকটবর্তী হইলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সেই সময় ব্রাহ্মণ আপন কুটীরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাইয়া শঙ্খ বাজাইতে ছিলেন। এই নির্জন জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সওদাগর বিস্মিত হন এবং তাহার রহস্য উদ্ঘাটনের অভিপ্রায়ে অনুচরবর্গসহ চরার জঙ্গলে প্রবেশ করেন। জঙ্গলের কিছু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার পর সেই অরণ্যবাসী ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটে। অতঃপর ব্রাহ্মণের আতিথেয়তায় সন্তুষ্ট হইয়া সওদাগর ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিতে চাহিলে ব্রাহ্মণ এই চরায় তাঁহাকে একটি গ্রাম বসাইতে অনুরোধ করেন। ক্রমে ক্রমে আশেপাশের গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া এই চরায় বাস করিতে থাকেন এবং কালে এই গ্রামের উৎপত্তি হয়।

এই গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত; কিন্তু ইঁহারা ঘোষ পাড়ার সতীমায়ের সত্যধর্ম মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করেন। ডিম, মাংস ইত্যাদি ও কেহ গ্রহণ করেন না; কেহ গোপনে আহার করিলে এবং তাহা প্রকাশ পাইলে তাঁহাকে সমাজে দণ্ড পাইতে হয়। ইহাভিন্ন, কয়েক ঘর মাহিষ্য ও মুচি সম্প্রদায়ের লোক এই গ্রামে বাস করেন।

শ্রীসত্যগোপাল মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ তেতুলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম: বাটী।১০৩।৭০৭'৩৭।২০৫।১,০২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোয়ালা, চাঁই, মণ্ডল, কামার, তাঁতী, নাপিত, তেলি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে কাশিমবাজার ও মুর্শিদাবাদ রেলস্টেশন এবং দুই মাইল দূরে পাকা রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে ভৈরব নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা যায়। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা ও কালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা ও শ্রীপঞ্চমীর পরের ষষ্ঠী তিথিতে শিবপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব। সমস্ত উৎসবই সর্বজনীন ও প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে আটদিনব্যাপী, মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে শিবের পাকা মন্দির ও স্থান আছে।

শ্রীকিশোরী মোহন চক্রবর্তী, শিক্ষক,
সওদাপাড়া-কলাডাঙ্গা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কলাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: কুমারপুর (মৌজা: ৪১) গ্রামে রাধামাধবের স্নানযাত্রা উৎসব সম্পর্কে উৎসব বিবরণী দ্রষ্টব্য।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ মুর্শিদাবাদ

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

বাটী গ্রামে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথির পরের দিন, অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথি হইতে প্রায় সপ্তাহকালব্যাপী শিবপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন ইহার প্রস্তুতি মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে শুরু হয়। প্রতিপদ হইতে প্রতি রাত্রিতে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় শতাধিক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারী ভক্ত একত্রিত হইয়া বোলান ছড়া পাঠ এবং শিবায়ন গান করেন আর দিনের বেলায় আশেপাশের প্রায় আট-দশটি গ্রামে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছড়া ও পাচালী গান করেন। এই গানের সময় ঢাক-ঢোল বাজান হয়। পঞ্চমীর দিন রাত্রিতে চন্দ্রোদয়ের পর ভক্তরা নদীতে ঘি-খিচুড়ী অর্পণ করিয়া বাড়ী আসিয়া হবিষান্ন গ্রহণ করেন। পরের দিন ভোর হইতে ভক্তরা "শিব-বন্দনা" ও "ভক্তপড়া" আরম্ভ করেন। "ভক্তপড়া" একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান। ইহাতে সন্ন্যাস গ্রহণকারীদের মধ্যে একজন ভক্তদের কর্তা হন এবং তিনি সিঙ্গা ফুঁকিয়া অপরাপর ভক্তগণকে আহ্বান করিলে ভক্তগণ সমবেত হইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে শুইয়া পড়েন। এই সময় ঢাকের বাজনার তালে তালে সাষ্টাঙ্গ প্রণতঃ উক্ত ভক্তদের দেহের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একযোগে উঠা-নামা করিতে থাকে। তাহা মাঝে মাঝে ভক্তদের উচ্চারিত "শিববল মহাদেব" রবে চতুঃসীমা প্রকম্পিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সময় অনেক ভক্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। প্রত্যেক ভক্তের পরিধানে শাড়ী, গলায় উত্তরীয়, হাতে তিন-চারিটি বেতের ছড়ি ও পায়ে নূপুর বাঁধা থাকে। বেলা একটার পর পাচ হাত লম্বা একখানি ত্রিশূল-প্রোথিত তক্তার উপর একজন ভক্তকে শয়ন করাইয়া অন্যান্য ভক্তরা তক্তাটিকে মাথায় লইয়া "কর্তা সন্ন্যাসীকে" সম্মুখে রাখিয়া অর্ধ মাইল দূরবর্তী ভাগীরথী নদীতে যান এবং তথায় স্নান করিয়া সমবেত কণ্ঠে "শিববল মহাদেব" রবে উচ্চ নিনাদ করিতে করিতে শিব মন্দিরে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর প্রধান পঁচিশজন ভক্ত পাঁচ সারিতে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকে দুইহাতে দুইখানি ত্রিশূলে গব্যঘৃত সিক্ত বস্ত্র জড়াইয়া উহাতে অগ্নি সংযোগ করেন এবং ঐ প্রজ্জলিত ত্রিশূল দুইটি কোমরের দুইপাশে বিদ্ধ করিয়া দুর্দমনীয় তেজে নাচিতে থাকেন। মধ্যে মধ্যে ত্রিশূলের আগুনে ধুনা নিক্ষেপ করিয়া অগ্নিশিখা অনির্বাণ রাখা হয়। ইহাকে বানফোঁড়া বলে। এই খেলা রাত্রি দশটা পর্যন্ত চলে।

পরে শিবের যথারীতি পূজা শেষ হইলে মধ্য রাত্রিতে হোম হয়। পরের দিন প্রাতঃকালে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বিকালে শিবের ভক্তরা প্রসাদ ও জলগ্রহণ করিয়া থাকেন। শিবের নিকট ফলমূল, মিষ্টান্নাদি মানত দেওয়া হয়। শিবের সেবায়েত মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত এবং পূজারী, চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ। উৎসবে হিন্দু-মুসলমান মিলিয়া প্রায় দুই হাজার লোক অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

স্নানযাত্রা উৎসব

"মোতিঝিলের পূর্ব্ব তীরে কোঁয়ারপাড়া বা কুমারপুর (মৌজা নং ৪১) গ্রামে রাধামাধবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে একটি বড় মেলা হয়। কথিত আছে, খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সুপ্রসিদ্ধ জীব গোস্বামীর শিষ্যা হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণী বৃন্দাবন হইতে আসিয়া এই স্থানে রাধামাধব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন; অপর মতে হরিপ্রিয়া ঠাকুরাণীর শিষ্য জীব গোস্বামীর বংশীয় বংশীবদন গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। জনশ্রুতি, এক্রাম উদ্দৌলার মৃত্যুর পর নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ মন্দিরের বাদ্যধ্বনিতে অত্যন্ত বিরক্তি অনুভব করেন এবং বৈষ্ণবগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য গোঁসাঞজীর নিকট মুসলমানী খানা পাঠাইয়া দেন। গোঁসাঞজীর সম্মুখে থালার ঢাকা খুলিলে দেখা গেল খানার পরিবর্তে এক ছড়া যুঁই ফুলের মালা রহিয়াছে। নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ এই খবর অবিশ্বাস করিয়া নিজে পুনরায় খানা দেখিয়া প্রেরণ করেন। সে বারও খানার বদলে যুঁই ফুলের মালা পাওয়া গেল। তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হন এবং গোঁসাঞজীকে ভক্তি করিতে থাকেন।

তিনি মন্দিরের সমীপস্থ চারটি ঘাটের নিকট মাছ ধরিতে বা পাখী মারিতে নিষেধ করিয়া আদেশ জারি করেন।"

(বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ২৮৩)

বেরা উৎসব

মুর্শিদাবাদ সহরের বেরা উৎসব বহুকালের প্রাচীন। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার পর প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার রাত্রিকালে কেল্লা নিজামতের পাশে বর্ষাপ্লাবিত ভাগীরথী বক্ষে আলোক সজ্জিত একটি বৃহৎ কদলীবৃক্ষ নির্মিত বেরা বা তরণী ভাসাইয়া এই উৎসব পালন করা হয়। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-ই বেরা উৎসবের প্রবর্তক এবং পীর খাজা খিজিরের সম্মানার্থে প্রতি বৎসর ভরা গঙ্গা বক্ষে এই আলোক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শিয়া সম্প্রদায় সাধারণতঃ মহরম মাসে উপবাস (রোজা) পালন করেন। যদি কোন বৎসর ভাদ্রের শেষ বৃহস্পতিবার মহরম মাসে পড়ে তবে সেই বৎসর বেরা উৎসব নির্ধারিত শেষ বৃহস্পতিবারে না হইয়া অন্য যে-কোন বৃহস্পতিবারে অনুষ্ঠিত হয়।

মুর্শিদাবাদের নবাব বংশ যে এলাকায় বসবাস করেন সেই প্রাচীর বেষ্টিত অংশের নাম কেল্লা নিজামত। নবাব প্রাসাদ তন্মধ্যে অবস্থিত। কেল্লা নিজামতের উত্তর দিকে প্রকাণ্ড ইমামবারা যাহা ভারতের মধ্যে বৃহত্তর ইমামবারা নামে বিখ্যাত। ইমামবারা ও নবাব প্রাসাদের পশ্চিমে দক্ষিণ বাহিনী ভাগীরথী ভাদ্র মাসে বন্যার জলে দুকুল প্লাবিত করিয়া বহিয়া যায় এবং সেই সময় কেল্লা নিজামতের পাশে খুব স্রোত থাকে। বেরা উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব হইতে রাশি রাশি কদলীবৃক্ষ কাটিয়া আনা হয় এবং ইমামবারার অনতিদূরে বাঁশ ও দড়ির সাহায্যে কলাগাছ-গুলি বাঁধিয়া একটি সুবৃহৎ চতুষ্কোণ বেরা বা তরণী তৈয়ার করা হয়। বেরার উপরিভাগে নানাবিধ রঙিন কাগজ ও অপরাপর জিনিসের সাহায্যে মসজিদ, মিনার, খিলান প্রভৃতি নির্মাণ করা হয় এবং সমস্ত বেরাটি মোমের বাতি দিয়া সাজান হয়। উৎসব দিবসে গ্যাস ও কেরোসিনের অন্যান্য আলোকের সাহায্যে আলোকোজ্জ্বল করিয়া বেরাটিকে শক্তভাবে বাঁধিয়া রাখা হয়। রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময় নবাব প্রাসাদ হইতে হস্তী, অশ্ব, বাদ্যভাণ্ড প্রভৃতি সহ এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত শোভা-যাত্রায় রৌপ্য নির্মিত গোশকট ও লোকের মাথায় করিয়া জলের পীর খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে সিন্নী লইয়া যাওয়া হয় এবং উক্ত সিন্নী বেরার উপর লইয়া গিয়া জনৈক মৌলবী খাজা সাহেবের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।

পূর্ব হইতেই রঙীন ফানুসের মধ্যে শত শত বাতি জ্বালাইয়া নদীতে ভাসাইয়া দেওয়ার ফলে ভাগীরথীর বক্ষে শত শত আলোর কমল ফুটিয়া উঠে। আতসবাজি পোড়ান হয়। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় তোপ-ধ্বনির সংকেত করিয়া বেরা ভাসাবার আদেশ দেওয়া হইলে উক্ত দীপ শোভিত তরণীটি বন্ধন মুক্ত করা হয়। আলোকোদ্ভাসিত বেরা অন্যান্য নৌকার সাহায্যে স্রোত মুখে ভাসিয়া চলে এবং তীরে নানারূপ বাদ্যভাণ্ড বাজিতে থাকে। বেরার উপর হইতে আতস বাজী ছাড়া হয়। নদী তীরে হাজার হাজার নরনারী আসিয়া জমায়েত হয় এবং নিকটবর্তী শহরগুলি হইতে শত শত নৌকা বেরাটিকে ঘিরিয়া ধরে। মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব দেখিবার জন্য বেশীর ভাগই হিন্দু জনতা সমবেত হয়। গ্রামাঞ্চল হইতে বহু মুসলমান নর-নারীও আসে এবং ফিরিবার সময় ছেলেমেয়েদের জন্য রংচঙে চাঁদমালা ও আখ কিনিয়া লইয়া যায়। উৎসবটি মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়। দশ-বারো হাজারেরও অধিক নরনারী এই উৎসব দেখিতে আসে। দুই শতাধিক বৎসর ধরিয়া মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব জেলার সর্বসম্প্রদায়ের লোককে অন্ততঃ একটি রাত্রির জন্য উৎসব আনন্দে মাতাইয়া তুলে। নবাব পরিবার হইতে বেরা উৎসব পালনের জন্য বার্ষিক অর্থ বরাদ্দ আছে।

এই বেরা উৎসব সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক-এ উল্লেখ আছে যে—

Another old ceremony still observed at Murshidabad, which it will not be out of place to mention here, is the Bera or festival of Khwaja Khizr. This is ob.erved by launching tiny light ships on the river, a spectacle which may be seen to great advantage on the Bhagirathi. On certain nights in the rainy

season thousands of little rafts, each with its lamp burning are floated down the stream. Their construction is very simple, for a piece of plantain or bamboo bears a sweet meat or two and the lamp. The festival is celebrated with much magnificence on the last Thursday of the month of Bhadra, (September). A raft is constructed of plantain trees and bamboos and covered with earth. On this is erected a small fortress, bearing fireworks on its walls. At a given signal the raft is launched and floated to the further side of the river, when the fireworks are let off, their reflection on the water producing a picturesque effect.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p liv)

…"প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্রিকালে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ খাজা খিজিরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে আলোকমালায় বিভূষিত করিয়া বাঁশ ও কলাগাছের শত শত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরণী বর্ষাস্ফীত ভাগীরথীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। প্রধান আলোকযান দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথাক্রমে ১২০ ও ৯০ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। মুর্শিদাবাদের গৌরবময় যুগে ইহা আরও অনেক বড় হইত। বহু সংখ্যক কলাগাছ বাঁধিয়া বাঁশ ও বাখারির সাহায্যে রঙীন কাগজ দিয়া নানারকম ঘর বাড়ী ও যুদ্ধের জাহাজ নির্মাণ করিয়া অসংখ্য প্রদীপ দিয়া এগুলিকে সজ্জিত করা হয়। ইহার চতুর্দিকে ছোট ছোট বহু যান ও অগণিত কমল (কর্পূর-পূর্ণ মাটির প্রদীপ) ভাসিতে থাকে। মুর্শিদাবাদের নবাব-বংশীয়গণ জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া জাফরাগঞ্জের নিকট নদী তীরে গিয়া এই উৎসবে যোগদান করেন। কতকগুলি সিপাহীও নিজামতী ব্যাণ্ড খাজা খিজিরের জন্য রুটী, ক্ষীর, পান প্রভৃতি লইয়া প্রধান আলোকযানে আরোহণ করিলে ধীরে ধীরে নদী বক্ষে এই আলোকমালা সঙ্গীতযোগে চলিতে থাকে। নদীবক্ষ ও তীর হইতে নানা বর্ণের সুন্দর সুন্দর আতসবাজি আকাশে উঠিয়া উৎসবের সৌন্দর্য বর্দ্ধন করে। পূর্বে মুর্শিদাবাদের পশ্চিম তীরে রোশনীবাগে বাঁশ দিয়া ত্রিতল গৃহাদি নির্মিত করিয়া আলোকমালায় সজ্জিত করা হইত; নদীবক্ষে প্রতিফলিত হইয়া ইহারা আলোক উৎসবের সৌন্দর্য বহুগুণে বর্ধিত করিত; ইহা হইতেই রোশনীবাগের নামের উৎপত্তি। এক্ষণে রোশনীবাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন। নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর সময় হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে বলিয়া কথিত। ব্যারার জাঁকজমক পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়া যাইলেও ইহা এখনও মুর্শিদাবাদের একটি স্মরণীয় উৎসব এবং বহু স্থান হইতে এই উপলক্ষে জন-সমাগম হয়।

সিরাজ উদ্দৌলা ব্যারার পূর্ব বৃহস্পতিবার নাওয়ারা নামে আর একটি উৎসবের প্রবর্তন করেন বলিয়া কথিত। উক্ত দিবসে বৈকাল বেলায় বহু সুসজ্জিত তরণী লইয়া নদীজলে অগণিত কদম্ব ফুলের মালা ভাসাইয়া নবাব নদীবক্ষে দরবার করিতেন। এই উৎসব বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত পৃঃ ২৮৪—২৮৫)

মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিস্তারিত বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

মুর্শিদাবাদের বেরা উৎসব

সারাদিন দারুণ গুমোটের পর সন্ধ্যের মুখেই একচোট খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাতটা তাই বেশ ঠাণ্ডা। প্রকৃতিও আর কোনও অঘটন ঘটায়নি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আকাশ। শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণাঙ্গী চন্দ্রকলা একবার মাথার ওপরে দেখা দিয়েই কখন উধাও হয়েছে। নক্ষত্র-চর্চিত বিশাল আকাশখানা বর্ষাস্ফীত ভাগীরথীর জলে মুখ দেখবার জন্যে ঝুঁকে পড়লেও আজ রাত্তিরে তার সুন্দর মুখে নয়, আর এক অন্য রূপে ভাগীরথী রূপময়ী হয়ে উঠেছে। বাঁশ আর কলাগাছ দিয়ে তৈরী বিচিত্রগঠন প্রকাণ্ড একটি ভেলা মোমবাতির আলোর গহনা প'রে ভাগীরথীর জলে ভাসছে। বাখারি, চেঁচারির কাঠামোতে রঙিন কাগজে, অভ্রে, রাঙতায় সাজানো তার মিনার, ছত্রি, বারান্দা, তোরণ। তাদের চুড়োয় চুড়োয় নিশান, ময়ূর, আলোর ঝালর। বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনের মত

অভ্রের ঢাকনার ঝোলানো মোমবাতির আলোর কারুকর্মে ভেলার সর্বাঙ্গ ভূষিত। জলের ঢেউ-এ ভেলা দুলছে। সেই দোলাতে চূড়ো থেকে তলা পর্যন্ত বেলোয়ারি আলোর সাজও দুলেছে ঝিলিক তুলে। এই আলোর ভেলা আর তার কম্পমান প্রতিবিম্বিত রূপটিকে বুকে নিয়ে রাতের কালো ভাগীরথী স্বপ্নময় হ'য়ে উঠেছে যেন।

এই ভেলার নাম বেরা বেড়া, ব্যারা, ব্যাড়া—এ-সব নামও বলে কেউ কেউ। প্রতি বছর ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবারের রাত্তিরে মুর্শিদাবাদ শহরে যে বিখ্যাত বেরা উৎসব হয়, সেই উপলক্ষেই ভেলাটি তৈরী হয়। মুসলমানী শাস্ত্রে জলদেবতা বলে কথিত খাজা খিজির নামে এক পীরের উদ্দেশে এই ভেলাটি উৎসর্গ ক'রে ভাগীরথীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়, নবাব নাজিমদের হাজারদুয়ারী প্রাসাদের সামনে তোপখানার ঘাট থেকে। রাত এগারোটার সময় তোপখানার কামান থেকে তোপ দেগে বেরা ভাসানোর লগ্নটি ঘোষিত হবামাত্র ভেলার তীরের সঙ্গে রজ্জুবন্ধনটি কেটে নেওয়া হয়। স্রোতের টানে হেলে দুলে রূপের আলো ছড়িয়ে ভেলা ভেসে চলে দক্ষিণ-বাহিনী ভাগীরথীর বুকে। তাকে ঘিরে অনেক নৌকোও চলে সঙ্গে সঙ্গে, আলো বাজনা-বাদ্যি নিয়ে। বাজি পোড়ানোর ধূমও প'ড়ে যায়।

ময়ূরপঙ্খী নাও

এই উৎসবে ভেলাটিই কিন্তু সর্বস্ব নয়। চেঁচারির কাঠামোতে কালো কাগজ দিয়ে যে চারটি ময়ূরপঙ্খী তৈরী করা হয় আসল উৎসব তাদেরই নিয়ে। ভেলার মাঝখানে থাকে সেই ময়ূরপঙ্খী চারটি। তারা তের হাত লম্বা দেড় হাত চওড়া। ময়ূরপঙ্খী নাম, কিন্তু তাদের সামনের মুখ মকর আর পেছনের মুখ হাতীর মত। এই মকরমুখো নৌকার ওপরে মাঝখানে চৌরি-বাঙলা। রঙ্গিন কাগজের ঝালরে, নিশানে, নানান্ আভরণে, সাজসজ্জায় নৌকোগুলো বিচিত্র রূপ ধারণ করে। খুদু মিঞা নামে এক নিপুণ কারিগর বংশপরম্পরাক্রমে এই কারুকর্মটি ক'রে আসছেন। তিনিই ভেলার সমস্ত আলোর আভরণ, গম্বুজ, মিনার, তোরণ, বারান্দা; ময়ূর, নিশান প্রভৃতি তৈরী করেন।

খাজা খিজিরের নামে সিন্নি

ময়ূরপঙ্খী গুলো ওয়াসিফমঞ্জিলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে নবাববাড়ীর লোকজন মকরের মুখে ফুলের মালা বেঁধে দেন। তারপর খাজা খিজিরের জন্যে সুজির পায়েস, রুটির সিন্নি আর সোনার পিদ্দিম্ নিয়ে বাজনা-বাদ্যি করে মিছিল আসে তোপখানার ঘাটে। ময়ূরপঙ্খী চারটি ভেলার মাঝখানে স্থাপন করা হয়। খাজা খিজিরের নৈবেদ্যও সেখানে রাখা হয়। তারপর খাজা খিজিরের নামে সোনার পিদ্দিম্ আর ভেলার সব মোমবাতি জ্বেলে দেওয়ার রীতি। তোপখানার তোপ দাগার সঙ্গে সঙ্গে ভেলা হয় ভাসিয়ে দেওয়া। এর নাম বেরা কাটা।

বেরা ভাসানো ছাড়া আর একটি অনুষ্ঠান আছে, তার নাম কমল ভাসানো। কলার পেটোর ওপরে মোমভর্তি গেলাস বসিয়ে রঙ্গিন কাগজের ঘেরাটোপে সাজিয়ে সেইগুলি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। ভাগীরথীর বুকে দ্রুত ধাবমান সেই বিপুল সংখ্যক আলোর কমল চোখে যেন বিভ্রম সৃষ্টি করে।

সোদো ভাসানোর সঙ্গে মিল

এটি মুসলমানী উৎসব। ভাদ্র মাসে কলাগাছের পেটোতে কাগজ দিয়ে নৌকো সাজিয়ে, তার ভেতরে এলাচদানা, বাতাসার সিন্নি রেখে, ধূপ চেরাগ জ্বেলে পীরের নামে উৎসর্গ করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়ার প্রথা এক সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কলকাতাতেও গঙ্গায়, পুকুরে মুসলমানদের ঐরকম নৌকা ভাসাতে দেখেছি। বাঙ্গালী হিন্দু মেয়েরাও পৌষ সংক্রান্তিতে ঠিক ঐরকমভাবেই সোদো ব্রত করেন। কলার পেটোয় নৌকো বানিয়ে গাঁদাফুল দিয়ে সাজিয়ে তার ভেতরে বাতাসা রেখে পিদ্দিম্ জ্বালিয়ে নদীতে, পুকুরে ভাসিয়ে দেন তাঁরা। এর নাম সোদো ভাসানো। মুসলমানদের এই বেরা ভাসানোর সঙ্গে হিন্দু মেয়েদের সোদো ভাসানোর বেশ মিল আছে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের বেরা ভাসানোর উৎসবে যে রকম ভীড় আর জাঁকজমক হয়, বাঙলাদেশে এই উৎসবে সেইরকমটি আর কোথাও হয় ব'লে শুনিনি। মুর্শিদাবাদের এই উৎসবটির সূত্রপাতে

নাকি নবাব-নাজিমরাই ছিলেন। এখনও এর সঙ্গে তাঁদের বংশধরদের যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয় নি। তবুও এটি এখন আর সুধু নবাববাড়ীর উৎসব নয়। অগণিত সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে এটি একটি প্রকৃত লোকোৎসবে পরিণত হ'য়েছে। আর শুধু মুসলমান সম্প্রদায়েরই লোক নয়, হিন্দুরাও ওতে দলে দলে যোগ দেয় সমান উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে।

দারুণ ভীড়

এই বিচিত্র লোকোৎসবে যে বৃহৎ জন-সমাগম ঘটে তার পরিচয় পেয়েছি সেদিন মুর্শিদাবাদে যেতে ট্রেণে। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ষ্টেশন থেকেই সেদিন ট্রেণে মুর্শিদাবাদ-যাত্রীদের ভীড় হ'তে সুরু ক'রেছিল। তারপর পলাশী, বেলডাঙ্গা, বহরমপুর প্রভৃতি ষ্টেশনের তো কথাই নেই। ষ্টেশনে ষ্টেশনে দেখেছি, লোক থই থই ক'রছে। মেয়ে-পুরুষ, বুড়ো-বুড়ি,বাচ্চা-কাচ্চার দল গাদাগাদি হ'য়ে ষ্টেশনে ব'সে আছে ট্রেণে চড়ার অপেক্ষায়। উত্তরে লালগোলা, ভগবানগোলা, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি ষ্টেশনেরও ঐ একই অবস্থা। ট্রেণে তিল ধারণের জায়গা মেলে না— ভীড়ের চাপে চিঁড়ে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবার দাখিল। সুধু ট্রেণেই নয়, বহরমপুর, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে দলে দলে লোক এসেছে মুর্শিদাবাদে বাসে, ট্যাক্সিতে, সাইকেলরিক্সায়। পায়ে হাঁটাও বাদ যায় নি। আর নৌকো তো আছেই। জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, বহরমপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে সারাদিন নৌকোবোঝাই লোক এসে নেমেছে মুর্শিদাবাদের ঘাটে ঘাটে। এই সব নৌকোর মধ্যে অনেকে কাগজের মিনারে সেজে এ্যাসিটিলিন গ্যাসের আলোর ঝাড়, গেট নিয়ে এসেছে রাতের বেরা উৎসবের ভেলার সঙ্গে যাবার জন্যে। কোনও কোনও নৌকো আবার ডায়নামো চালিয়ে ইলেকট্রিক রঙ্গিন বাল্ব আর টিউব লাইটের আলোয় সেজে এসেছে।

নিজামত কেল্লার উত্তর দরজা থেকে ওয়াসিফমঞ্জিল পর্যন্ত গঙ্গাতীরবর্তী রাস্তায় খাবার-দাবার, পুতুল-খেলনা, ঘর-গেরস্থালীর জিনিসপত্রের দোকানও ব'সে গেছে। মাত্র একটা রাতের মামলা। তবুও লোক আসার বিরাম নেই। তোপখানার ঘাট থেকে দক্ষিণে বরাবর গঙ্গার ধারে খালি মানুষের মাথা আর মাথা। আর সেই ভীড়ের চাপ সবচেয়ে বেশী হ'ল রাত্রি এগারোটা নাগাদ, যখন নবাব বাড়ী থেকে ময়ূরপঙ্খীর মিছিল এল আর ভাগীরথীকে বেরা কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হ'ল। মুর্শিদাবাদে মহরমেও খুব ভীড় হয় কয়েকদিন ধ'রে। বেরা ভাসানো একটি রাতের উৎসব। তাতে যে ভীড় হয়, তার চাপ বোধহয় মহরমের কদিনের ভীড়কে ডিঙিয়ে যায় সহজে।

নবাব-নাজিমদের আমলে এ-উৎসবের যে জৌলুস ছিল এখন তার হাজার অংশেরও একাংশ নেই। বাঙলা, বিহার, উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন তাঁরা। পরবর্তীকালে অর্থাৎ পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে ক্লাইভ আর তাঁর পরবর্তী ইংরেজ ধুরন্ধরদের প্যাঁচে নবাব-নাজিমদের ঐ গালভরা উপাধিটুকু ছাড়া আর বিশেষ কিছু ক্ষমতা ছিল না। ইংরেজের হাতের পুতুল হ'য়ে তাঁরা মসনদে উঠতেন আর সেখান থেকে নামতেন। ইংরেজের মঞ্জুরকরা নিজামতী বৃত্তি নিয়েই তাঁদের সন্তুষ্ট থাকতে হ'ত। তবুও অনেক লাখ টাকা তাঁদের হাতে আসত। সুতরাং দরাজহাতে আমোদ-আহ্লাদে টাকা খরচের ইতিহাস যে তাঁরা রচনা ক'রে যাবেন তাতে সন্দেহ কী। অবশ্য এঁদের মধ্যে কেউ কেউ প্রজাপুঞ্জের দিকেও কিছু সদয় দৃষ্টিপাতে অর্থব্যয়-ও ক'রে গেছেন। কিন্তু নবাব নাজিমরা বিলাসব্যসনে এমন নাম কিনে গেছেন যে, লোকে আজও কারুর অমিত ব্যয়িতা দেখলে বলে—নবাবী ক'রে টাকা ওড়াচ্ছেন উনি।

এ-উৎসবের প্রবর্তক কে?

মুর্শিদাবাদের বেরা-উৎসবের প্রবর্তক কে এ-নিয়ে নানা মত। মুর্শিদাবাদের ইংরেজ সিভিল সার্জন মেজর জে. এইচ. টাল্ ওয়াল্শ্ তাঁর ১৯০২ সালে রচিত "এ হিষ্ট্রি অফ মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট"-এর ১৩৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, মুর্শিদকুলী খাঁ এই উৎসব করতেন। তিনিই মুর্শিদাবাদে এ-উৎসবের প্রবর্তক কিনা ওয়াল্শ্ কিন্তু সে-কথার উল্লেখ করেন নি প্রাচীন মুসলমান ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর সিয়র-উল্-মুতাখ্ খরীন্ গ্রন্থে লিখেছেন, সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদে এ-উৎসবের সূত্রপাত করেছিলেন। ডক্টর

জেমস্ ওয়াইজ্ও ঐ মুসলমান ঐতিহাসিকের মন্তব্যের জোরে তাঁর রচিত "দি ম্যাহমেডানস্ অফ ইষ্টার্ণ বেঙ্গলের" ৩৯ পৃষ্ঠায় সিরাজকেই মুর্শিদাবাদের বেরাউৎসবের প্রবর্তক বলে উল্লেখ করেছেন। ("জার্ণাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল", তৃতীয় খণ্ড, ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ)। ভোলানাথ চন্দ্র ১৮৪৫ সালে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণের যে বৃত্তান্ত রেখে গেছেন তাঁর "দি ট্র্যাভেলস্ অফ্ এ হিন্দু" নামক গ্রন্থে, তার ৮২ পৃষ্ঠায় তিনি মুর্শিদাবাদের বেরা-উৎসবের বিবরণে বলেছেন, সিরাজই মুর্শিদাবাদে এই উৎসবের প্রবর্তক।

যদি মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে মুর্শিদাবাদে এই উৎসব স্বরু হয়ে থাকে তবে এই উৎসবের বয়স প্রায় আড়াইশো বছর হবে। আর সিরাজের আমলে স্বরু হলে এর বয়স শ-দুয়েক বছর তো হবেই। মুর্শিদকুলী খাঁর আগে মুর্শিদাবাদের নাম যখন মুখসুদাবাদ ছিল, কে জানে, তখন থেকে হয়তো এ-উৎসব চলে আসছে।

সেকালের উৎসবের চেহারা

কিন্তু দুশো-আড়াইশো বছরের মধ্যে এ-উৎসবের জৌলুস অনেক ক'মে গেছে। নবাব-নাজিমদের আমলে লাখ লাখ টাকা খরচ হ'ত এ-উৎসবে। আমির-ওমরাহ, ইয়ার-বক্সিদের নিয়ে তাঁদের খানাপিনা, নাচ-গান হৈ-হুল্লোড়ের আসর জমত। বেরা যখন ভাসিয়ে দেওয়া হ'ত তখন তার সঙ্গে নৌকোয় নৌকোয় চলত বাইজীদের অবিরাম নাচ-গান। নিজামত কেল্লার ঠিক উল্টোদিকে ভাগীরথীর পশ্চিমপারে রোশনীবাগের রোশনাই-এর কথা পুরনো ইতিহাসের কেতাবে লেখা আছে। লক্ষ লক্ষ মোমবাতিতে, সেজের আলোয়, বেলোয়ারি ঝাড়-লণ্ঠনে তৈরী আলোর মিনারে, তোরণে, রোশনীবাগ ঝলমল করে উঠত। সারারাত্রি ধ'রে পোড়ানো আতসবাজির আলোতে উদ্ভাসিত হ'ত রাত্রি। আর তখন কি প্রকাণ্ড ভেলাই না তৈরী হত। ওয়াল্শ্ সাহেব তাঁর মুর্শিদাবাদের ইতিহাসে (১৯০২ সালের কিছু আগে লেখা) যে ভেলাটির কথা লিখেছেন, সেটি ছিল চওড়ায় ১২৫ হাত অর্থাৎ ১৮৭½ ফুট। ওয়াল্শ্ সাহেব যখন মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলেন, তখন নবাব-নাজিমদের একেবারে প'ড়তি দশা। নামকো ওয়াস্তে যেটুকু ক্ষমতা ছিল তাও ইংরেজ শাসকরা কেড়ে নিয়েছেন। ফেরিদুনজাই মুর্শিদাবাদের শেষ নবাব-নাজিম। তারপরে সে উপাধি অদৃশ্য হ'য়ে শুধু "নবাব-বাহাদুরে" এসে ঠেকেছে। সুতরাং উৎসব-বৈভবের মাত্রাও ক'মে গেছে। নবাব-নাজিমদের মধ্যে মীরজাফরের ছেলে মুবারকউদ্দৌলার কথায় ওয়াল্শ্ সাহেব লিখেছেন, তিনি ইদ, বেরা দেওয়ালী প্রভৃতি উৎসবে মুক্তহস্তে অর্থ ব্যয় ক'রতেন। তিনি মসনদে ছিলেন খৃষ্টীয় ১৭৭০ সাল থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত। উইলিয়ম হজেস্ খৃষ্টীয় ১৭৮০ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত ভারত ভ্রমণের যে বিবরণ রেখে গেছেন, তাঁর "ট্র্যাভেলস্ অফ ইণ্ডিয়াতে" তার ৩৫ পৃষ্ঠাতে মুর্শিদাবাদের এই বেরা-উৎসবের বিবরণ আছে। মনে হয় তিনি মুবারকউদ্দৌলার বেরা-উৎসবই দেখেছিলেন।

সেই প্রাচীন বিরাট উৎসবের ভগ্নাংশ এখন কোনও রকমে টিঁকে আছে। নিজামতী ব্যাণ্ডের বদলে এখন আধুনিক ভাড়া করা ব্যাণ্ড পার্টি আসে। নৌকো থেকে লাউডস্পীকারে রেকর্ড সঙ্গীতের কমপিটিসান চলে। খাজা খিজিরের জন্যে সিন্নি নিয়ে চারটি ময়ূরপঙ্খী আজও আসে নবাব-বাড়ী থেকে জুলুস ক'রে। তার জুলুস নামটুকু আছে, কিন্তু আগেকার সেই জৌলুস আর নেই। সোনার পিদ্দিম্ জ্বালানো সম্বন্ধে লোকে এখন ঘোর সন্দিহান। এখন যে বেরাটি ভাসানো হয় আকারেও সেটি অনেক ছোট হ'য়ে এসেছে। এখন লম্বায় আর চওড়ায় দুদিকেই সেটি ৩০ ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে। রোশনীবাগে এখন ইলেকট্রিক আলোর একটা ছোটখাট গেট তৈরী ক'রে তার রোশনাই-এর নামের পিত্তি রক্ষে হ'চ্ছে। আর তোপখানার ঘাটের সামনে যেখানে লোকের ভীড় সবচেয়ে বেশী, সেখানে একটাও আলো থাকে না। অন্য জায়গায় আলোর কথা তো দূরে। বাজীর দফাও এখন রফা হয়েছে। ঘণ্টাখানেকও বাজী পোড়ে কি-না সন্দেহ।

একালের অতিথি আপ্যায়ন

তোপখানা থেকে সিকি মাইল দক্ষিণে ওয়াসিফ মঞ্জিলের সামনে বাঁধানো চাঁদনীতে একালের হোমরা-

চোমরার দল অর্থাৎ কিছু সরকারী অফিসার আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আসেন, ভাড়া করা ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারে বসেন। গাল্‌চে, কার্পেট, পর্দা, ঝালর, সোনা-রূপোর আঁটাসোঁটা আতরদান, পানদান, গেলাস, থালা এখন গরহাজির। কালিয়া, পোলাও, কোপ্তা কাবাবের ২৯ দফার বদলে এখন শুধু কোল্ডড্রিঙ্ক, সিগারেট, পানের খিলি দিয়েই মানরক্ষের ব্যবস্থা।

এ-কালের হোমরাচোমরার দল এই চাঁদনীতেই ব'সে স্রোতের টানে দ্রুত চলমান বেরাটি আর বাজিপোড়ানো দেখেন। নামমাত্র গোটাকতক বাজি। তাও তোপখানার ঘাট থেকে বেরার যাত্রারম্ভে জ্বালানো হয় না। হোমরা-চোমরাদের দেখবার সুবিধের জন্যে বেরা চাঁদনীর কাছা-কাছি ভেসে এলেই তবে সেগুলি জ্বালানো সুরু হয়। এখন মিনিট পনেরোর মধ্যে বেরার গায়ে আঁটা কদমঝাড়, ঝরণা, তুবুড়ি, রংমশাল নিঃশেষ হ'য়ে যায়। কিন্তু এই সব বাজি থেকে উৎসারিত ক্ষণকালীন আলোর ঝরণায় স্নান ক'রতে ক'রতে দীপময় সেই অভিনব আলোকযান যখন অন্ধকার রাত্রে রূপের ঢেউ তুলে স্বপ্ন-লোকবিহারিণী সুন্দরীর মত ভাগীরথীর দ্রুত স্রোতের টানে দক্ষিণমুখে অদৃশ্য হ'য়ে যায়, তখন মানুষ আজও মুগ্ধ না হ'য়ে পারে না।

শেষ পরিণতি

নিজামতী কেল্লা থেকে মাইল দুই-আড়াই দক্ষিণে আমিনাগঞ্জে যখন ভেলাখানি গিয়ে পৌঁছয় তখন তার মোমবাতি নিঃশেষ। অভ্রের ঘেরাটোপগুলো আগুনে পুড়ে কুৎসিৎ রূপ ধ'রেছে। ময়ূরের চূড়ো, ঝালর, নিশান স্খলিত। আর দুপাশ থেকে হিংস্র নেকড়ের মত একদল মানুষ সাঁতরে কিংবা নৌকোয় চ'ড়ে এসে সেই ভেলাতে লুটপাট ক'রে তার অবশিষ্ট যা-কিছু আভরণ উপকরণ থাকে সব খসিয়ে নেয়। কম বাঁশ লাগে না এই ভেলা তৈরীতে সেই বাঁশগুলোও তারা কাড়াকাড়ি ক'রে নিয়ে যায়।

("বাংলার লোক উৎসব ও লোকশিল্প"—বজ্রমিত্র, যুগান্তর, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৬১)

মহোৎসব

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের ২৮শে তারিখে কুমীর-দহ গ্রামের অধিবাসীদের মধ্যে যাঁহারা ঘোষপাড়ার সতী মায়ের ভক্ত তাঁহারা একটি মহোৎসব করিয়া থাকেন। স্থানীয় অধিবাসীদের বেশীর ভাগই মুসলমান এবং তাঁহারা প্রায় সকলেই ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুগামী। স্থানীয় অঞ্চলে ইঁহারা বাউল নামে অভিহিত। এই উৎসবে হিন্দু ও মুসলমান সকলেই যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ ও সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। এই উৎসবে কর্তাভজা ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া স্বীয় ধর্মের মাহাত্ম্য এবং বর্তমান যুগের সহিত মিল রাখিয়া উহার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ মুর্শিদাবাদ

মেলা বিবরণী

বেরা উৎসবের মেলা

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মুর্শিদাবাদ শহরে বেরা উৎসব উপলক্ষে কেল্লা নিজামতের মধ্যে একটি মেলা বসে। এই উৎসব ও মেলাটি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ-র আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উৎসবের দিন মধ্যাহ্ন হইতে রাত্রি এক ঘটিকা পর্যন্ত মেলা চলে।

মেলায় মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট ছাড়া খোলা জায়গায় বহু দোকান-পাট বসে। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মাটির ও কাঠের বাসন-কোসন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির পুতুল, খেলনা প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা বা তোলা আদায় করা হয়।

শিবপূজার মেলা

কুমিরদহ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে শিবপূজা উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল যথা—তেঁতুলিয়া, বোয়ালিয়া, নূতনগ্রাম, পলাশী, গোঁসাইপুর, গুরিয়া, নিত্তা, জিয়াগঞ্জ প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ জিয়াগঞ্জ শহরাঞ্চল হইতে আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, মাটির পুতুল প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রীর পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয় এবং বিভিন্ন বৎসর বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গানের দল আনা হয়।

বাটিগ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথির পরবর্তী দিনে শিবের গাজন উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা দেবোত্তর জমির উপর আটদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং ছয়ঘট, সদরপুর, বড়দহ, কলাডাঙ্গা, হাজীডাঙ্গা, রাণীনগর, রামপুর, পাহাড়পুর, ঘলিসাপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় আড়াই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়; তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটর, রিক্সা এবং গরুর গাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বহরমপুর, ইসলামপুর, চক ইত্যাদি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং চার-পাঁচ জন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, জুতা প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী আমদানী হয়। তাহাছাড়া, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা এবং মাটির হাঁড়িকুড়ির দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ঢালি খেলা, যাত্রাগান, থিয়েটার, কৃষ্ণযাত্রা, ভাসান গান, কবিগান, আলকাপ গান, প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে নিম্নলিখিত বিভিন্ন গায়েনের দল আসেন।

ঢালি খেলার অধিকারী—শ্রীঘায়েরউদ্দিন সর্দার, যাত্রাদলের অধিকারী—শ্রীজীতেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, থিয়েটারের অধিকারী—শ্রীহরেন্দ্রকুমার বিশ্বাস, কবিগানের অধিকারী—শ্রীরাখাল মণ্ডল ও শ্রীত্রৈলক্ষ্য মণ্ডল, কৃষ্ণযাত্রার অধিকারী—শ্রীরঘুনাথ ঘোষ, ভাসান যাত্রার অধিকারী—শ্রীদুলাল চন্দ্র ঘোষ, আলকাপ গানের অধিকারী—শ্রীনরেশ প্রামাণিক।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ নবগ্রাম

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ পাঁচগ্রাম।২৩।২,৭৩৫·৮০।১,০১৫।৫,২০০

(ক) হিন্দু, মুসলমান এবং তপশীল জাতি। গ্রামে আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, ব্যবসায় (কাঁসা ও বাঁশ শিল্পের যথেষ্ট নাম আছে)।

(গ) গ্রামটি মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম সীমান্তে নলহাটি-আজিমগঞ্জ রেলপথে মোরগ্রাম স্টেশন হইতে ছয় মাইল দক্ষিণে এবং বাদশাহ্ হুসেন শাহ্ কর্তৃক নির্মিত সোনারগাঁও-গৌড় সড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। বর্তমানে মোড়গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে এবং পাঁচগ্রাম সড়কের সহিত সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে। আবার পাঁচগ্রাম সড়কের সহিত বহরমপুর এবং লালবাগ রাস্তার সংযোগ ঘটিয়াছে। বহরমপুর হইতে প্রায় আঠার মাইল পশ্চিমদিকে, কান্দি হইতে প্রায় আঠার মাইল উত্তরে এবং রামপুরহাট হইতে প্রায় আঠার মাইল পূর্বদিকে পাঁচগ্রাম গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে গোষ্ঠাষ্টমীপূজা, পৌষে শ্যামসুন্দরজীউর পূজা, চৈত্রে শিবকালীপূজা। পূজাগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গোষ্ঠাষ্টমীর মেলা। কার্তিকে একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরে প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

শ্যামসুন্দরজীউ পূজার মেলা। পৌষে কুড়ি দিনব্যাপী। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে হজরত বাদ্‌শা পীরের একটি দরগা আছে।

এই গ্রামটি অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। গ্রামের ভূগর্ভ হইতে নানাবিধ প্রাচীন জিনিস-পত্রও পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটি কষ্টিপাথরের থাম আছে। থামটির ওজন প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ মণ, লম্বায় প্রায় ছয়-সাত ফুট এবং ইহার গাত্রে বিচিত্র নক্সা কাটা। সাহানাপাড়া নামক স্থানে একটি মসজিদের সামনে আজও থামটি রক্ষিত আছে। বাদ্‌শা পীরের দরগার সামনে আরও একটি কষ্টিপাথর দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে এই স্থানে পাঁচটি ছোট ছোট গ্রাম ছিল; যেমন, মোস্তফাপুর, বলাশপুর, কৃষ্ণগঞ্জ, মনোহরপুর (বর্তমান মোল্লাপাড়া), হাজিপুর। তন্মধ্যে মোস্তফাপুর বিশেষ বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল; নবাবী এবং ইংরেজ শাসনের আমলে মোস্তফাপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষভাগে এই পাঁচটি গ্রাম একত্র হইয়া একটি গ্রামে পরিণত হয়; খুব সম্ভবতঃ এইজন্যই এই গ্রামের নাম "পাঁচগ্রাম" হইয়াছে।

শ্রীমণিরুল ইসলাম, শিক্ষক,
ও
শ্রীঅশ্বিনী কুমার সরকার, কৃষিজীবি,
সভ্য, পাঁচগ্রাম ইউনিয়ন বোর্ড,
গ্রাম ও পোঃ পাঁচগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

Panchgram—"The tomb of Hazarat Badshah at Panchgram (J. L. 23) about eighteen miles from Lalbagh on the Lalbagh-Nabagram-Panchgram road."
(District Handbooks, Murshidabad, 19 1, by A. Mitra, p. 189)

২। গ্রাম ঃ অমরকুণ্ড।৭৯।১,৬৩৩·৩৯।২১৮।১,০৩৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মাল, বাগ্‌দী, কুনাই, কাহার ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ রেলপথে খাগড়াঘাট রোড স্টেশন হইতে রিক্সা বা মোটরযোগে চার মাইল দূরে জীবন্তী আসিয়া গরুর গাড়ীতে পাঁচ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অমরকুণ্ড গ্রামে পৌঁছান যায়। ইহা-ছাড়া, রাধারঘাটের নিকট জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর-

যোগে রাইগ্রা গ্রামে আসিয়া দক্ষিণে দুই মাইল আসিলে অমরকুণ্ড গ্রামে আসা যায়।

(ঘ) শ্রাবণে গঙ্গাদিত্যের অভিষেক উৎসব। উৎসবটি বহু প্রাচীন। আশ্বিনে দুর্গাপূজা। পূর্বে এই গ্রামে একুশখানি দুর্গাপূজা হইত বলিয়া শোনা যায়। ইহাছাড়া, ব্যক্তি-বিশেষের কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, কার্তিক প্রভৃতি পূজাও হইয়া থাকে।

(ঙ) গঙ্গাদিত্যপূজার মেলা। শ্রাবণে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামদেবতা গঙ্গাদেবী ও আদিত্যের মন্দির ব্যতীত একটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরে বাসুদেব, কাত্যায়নী ও নারায়ণের শিলামূর্তি আছে। খুব সম্ভবতঃ পালবংশের রাজত্বকালে এই মূর্তি দুইটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই মন্দিরের উত্তরে আরেকটি ভগ্নপ্রায় মন্দিরে কষ্টিপাথরের শিবলিঙ্গ আছে। পূর্বে এই শিবলিঙ্গের নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছিল, এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে একটি বৃহৎ প্রস্তরখোদিত দ্বারের চতুঃপার্শ্ব বেষ্টিত চৌকাঠ বর্তমান আছে। মন্দিরের বারান্দার মধ্যস্থলে উঠিবার ধাপে একখানি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত আছে। মন্দিরটি গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত। প্রতি বৎসর সারা বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে একটি হরিনাম সংকীর্তনের দল বাহির হইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে। গ্রাম দেবতার নিত্য-সেবার জন্য দেবোত্তর সম্পত্তি আছে।

বহু পুরাকালে অমরকুণ্ড গ্রামের নিকট দিয়া ভাগীরথী প্রবাহিত ছিল। আর্য বৈদিকগণ গঙ্গার পশ্চিম তীরের অদূরে অমরকুণ্ড গ্রামটিকে "পানিকুণ্ড" নামকরণ করিয়া বসতি স্থাপন করেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহাদের উপাস্য আদিত্যদেব (সূর্য) এবং গঙ্গাদেবীর শিলামূর্তি "গঙ্গাদিত্য" নামে এই গ্রামের গ্রামদেবতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গদেশে বর্গীর অত্যাচারের পূর্ব পর্যন্ত এই গ্রাম বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আশ্রম বলিয়াই অভিহিত হইত। মুর্শিদাবাদের নবাব আলিবর্দী খাঁ বর্তমান তেলকের বিলের পশ্চিমতীরে চৈনখাঁ নামক জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষের অধীনে চৈনগড়ে (চয়েননগর) একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া বর্গীর অত্যাচার নিবারণকল্পে একটি ঘাঁটি স্থাপন করেন। কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বর্গীর অত্যাচার হইতে এই গ্রামের অধিবাসীগণ নিষ্কৃতি পায় নাই। গ্রামের নিপীড়িত ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে গিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। কিছুকাল পরে আবার কিছু কিছু ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা আসিয়া এইখানে বসতি স্থাপন করেন।

অমরকুণ্ড গ্রামের নামাকরণ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পুরাকালে রাজা বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া সন্ধ্যার সময় এই গ্রামসমীপে আসিয়া উপনীত হন। সন্ধ্যাকালে আরতি এবং কাঁসার ঘণ্টার শব্দে মুগ্ধ হইয়া গ্রামে রাত্রি যাপন করিবার মানসে জনৈক পণ্ডিতের গৃহে আশ্রয়প্রার্থী হন। নিশাকালে তিনি গ্রামের চৌদ্দটি টোলের সংস্কৃত এবং ধর্মশিক্ষার পদ্ধতি শুনিয়া এবং গ্রামদেবতার বিষয় অবগত হইয়া গ্রামের নাম পানিকুণ্ডের স্থলে "অমরকুণ্ড" করেন এবং গ্রামদেবতার নিত্যসেবার জন্য ভূমিদান করেন।

গ্রামবাসীগণের সম্মতিতে শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের (কবি এবং সাহিত্যিক) ইচ্ছায় পোষ্ট অফিসের নাম অমরকুণ্ড এবং স্থানীয় উচ্চ বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয় "অমরকুণ্ড বিদ্যামন্দির"। এই গ্রামের সমস্ত রাস্তাঘাট সুসজ্জিত ইট দ্বারা বাঁধান ছিল। গরুরগাড়ী যাতায়াতে বর্তমানে রাস্তার অনেকাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে কয়েকটি স্থান পুরাকালের কীর্তির স্বাক্ষর দিতেছে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ চৌধুরী, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক,
অমরকুণ্ড বিদ্যামন্দির, মুর্শিদাবাদ।

Amarkunda (J. L. 79)—This place can be reached from Berhampur by crossing the Bhagirathi at Khagraghat and taking the Berhampur-Nabagram road, from left at

Rainda village. Amarkunda is about three miles from Rainda to the south of Rainda Mouza. This village contains a small brick temple in which are worshipped several stone images of the Pala period. Popular treatises claim that there is an image of the Sun God, mounted on a horse ; but actually it is one of the many images of the Sun God with Aruna and the seven horses curved in a series as a frieze. There is, however, a very big image of Buddha which the local people worship as Raghunath.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951,
by A. Mitra. p. 188)

। গ্রাম ঃ কিরীটেশ্বরী।১০১।৬৭৪·৩১।৮৭।৪৫৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকায ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন লালবাগ কোর্ট রোড। লালবাগ-নবগ্রাম রাস্তার পাশে এবং মুর্শিদাবাদ হইতে ভাগীরথী পার হইয়া সাড়ে তিন মাইল পশ্চিমে গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) পৌষ মাসে কিরীটেশ্বরীপূজা।

(ঙ) কিরীটেশ্বরীপূজার মেলা। পৌষ মাসে আট-দিন ব্যাপী। মেলাটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কিরীটেশ্বরীর মন্দির, শিব ও সিংহ-বাহিনীর মন্দির আছে। তাহাছাড়া, গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
সম্পাদক, মুর্শিদাবাদ সমাচার,
পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : নবগ্রাম

উৎসব বিবরণী

কিরীটেশ্বরীপুজা

কিরীটেশ্বরী একান্নপীঠের অন্যতম। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ একান্ন অংশে বিভক্ত হইয়া ভারতের নানা স্থানে পতিত হয়। কিরীটেশ্বরী পীঠে সতীর কিরীটের কণামাত্র পড়িয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। এই পীঠস্থানের দেবী বিমলা এবং ভৈরব সম্বর্ত্ত নামে খ্যাত।

রিয়াজ-উস্-সালাতিনে কিরীটকণাকে "তিরুথ-কণা" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। পঞ্চাননের কায়স্থচারিকায় লিখিত আছে :

> ডিহি কিরীটেশ্বরী মধ্যে কিরীটেশ্বরী গ্রাম।
> মহাপীঠ হয় সেই মহামায়ার ধাম॥

মুর্শিদাবাদ সুবে বাংলার রাজধানী হইবার পর কিরীটেশ্বরী মহাপীঠও বঙ্গখ্যাত হইয়া উঠে। বঙ্গাধিকারী-গণ যখন ভাগীরথীর অপর তীরে ডাহাপাড়ায় বসবাস করিতেন, তখন তাঁহারা কিরীটেশ্বরীর নিত্যসেবার সুব্যবস্থা করেন। বঙ্গাধিকারীদের পূর্বপুরুষ ভগবান রায় "কানুনগো" পদ লাভ করিয়া দিল্লীর বাদশাহের নিকট হইতে যে জায়গীর পাইয়াছিলেন তাঁহার সনদে কিরীটে-শ্বরীর নাম ভবানীস্থান বলিয়া উল্লেখ ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে মঙ্গল নামে জনৈক বৈষ্ণব দেবীর সেবায়েত ছিলেন বলিয়া অবগত হওয়া যায়। বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণ কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির সংস্কারাদি করিয়া উহার নিকট আরও কয়েকটি নূতন মন্দির স্থাপন করেন এবং "কালীসাগর" নামে এক জলাশয় খনন করাইয়া দেন।

আজ পর্যন্ত প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কিরীটেশ্বরী দেবীর যে বার্ষিক উৎসব ও মেলা হইয়া থাকে বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের সময় হইতে তাহার সূত্রপাত। কিরীটেশ্বরী যাইবার পথের উপর বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের পুত্র শিবনারায়ণ যে একটি বৃহৎ সাঁকো নির্মাণ করাইয়া দেন, সেই সাঁকোটির ভগ্নাবশেষ আজিও বিদ্যমান আছে। প্রখ্যাতনামা রাজা রাজবল্লভ কিরীটেশ্বরীতে তিনটি শিবমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। রাণী ভবানীর সাধকপুত্র রাজা রামকৃষ্ণ প্রায়ই কিরীটেশ্বরীতে আসিতেন এবং সেই কারণে তিনি বড়নগর হইতে কিরীটকণা পর্যন্ত একটি খাল খনন করাইয়াছিলেন। রাজা রামকৃষ্ণও কিরীটেশ্বরী মন্দিরের বহু সংস্কারাদি করাইয়াছিলেন। মহাপীঠের শিবমন্দিরগুলির মধ্যে একটি ১৭৬৫ সালে নির্মিত হয় বলিয়া জানা যায়। দেবী মন্দিরের পশ্চাতে অবস্থিত দুইটি শিবমন্দির রাজা রাজবল্লভ স্থাপন করেন। তন্মধ্যস্থিত একটি শিবলিঙ্গে ফাটল দেখা যায়। লোকমুখে শোনা যায় যে, রাজা রাজবল্লভকে (?) যেদিন নবাব মীর কাশিম গঙ্গায় ডুবাইয়া মারেন, সেই দিনই উক্ত শিবলিঙ্গ ফাটিয়া গিয়াছিল। সয়ের-উল-মুতাক্ষারিণে লেখা আছে যে, কুষ্ঠ রোগগ্রস্ত নবাব মীরজাফরকে মৃত্যুর পূর্বে মহারাজা নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত পান করাইয়াছিলেন। কিরীটেশ্বরী মহাপীঠের মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক প্রমাণ আরও পাওয়া যায়।

বঙ্গাধিকারীগণই কিরীটেশ্বরী মৌজার জায়গীর ভোগ করিতেন। ১৮২০ সালের পুরাতন তায়দাদে লাখেরাজ জমি দাতার নাম না থাকায় অজুহাতে সরকার কিরীটেশ্বরী মৌজার ৭৬০ বিঘা দেবোত্তর লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করেন। তৎকালীন বঙ্গাধিকারী রাজা চন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী রাণী মনোমোহিনী উক্ত বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট হইতে "ইজারা" বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু সরকারের প্রাপ্য টাকা আদায় না হওয়ায় উক্ত সম্পত্তি পুনরায় নীলামে উঠে এবং নিজামতের খোজা সর্দার নবাব বসন্ত আলি খাঁ উক্ত জমি খরিদ করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পাইয়াছিলেন। পরে নবাব বসন্ত আলি খাঁ তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ওয়াকফ্ করেন এবং বহড়ান নিবাসী কৃষ্ণমোহন ঘোষ এই ওয়াকফ্ এস্টেটের দেওয়ান থাকাকালে কিরীটেশ্বরীর সম্পত্তি খরিদ করেন। তদবধি বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির ভোগদখল ও পূজাদি উক্ত ঘোষ জমিদার বংশই চালাইতেন। বর্তমানে কিরীটেশ্বরীর নামে কোন দেবোত্তর সম্পত্তি নাই এবং জমিদারী বিলোপের পর দেবীর সেবাপূজার ব্যবস্থাদি জমিদারেরা করেন না।

বহড়ানের ঘোষ বংশের পরবর্তী দখলীদারগণের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন হইলে কিরীটেশ্বরীর সম্পত্তিরও বণ্টন হইয়া যায় এবং উক্ত সম্পত্তির আট আনা রকম অংশ খাগড়া বাজারের জনৈক স্বর্ণ ব্যবসায়ী খরিদ করিয়া লন। সম্পত্তির দখলীদারগণ এক বংশের লোক না হওয়ায় কিরীটেশ্বরী মহাপীঠের সেবা-পূজার ব্যয় কোন পক্ষই বহন করিতে সম্মত হন না, ফলে প্রাত্যহিক সেবা-পূজা বন্ধ হইবার উপক্রম হয়। বর্তমান সেবায়েত শ্রীখগেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী কোন প্রকারে দেবীর প্রাত্যহিক সেবা চালাইয়া থাকেন। সম্প্রতি কিরীটেশ্বরীর অধিবাসীগণের প্রচেষ্টায় মন্দির সংস্কার ও দেবীর সেবা-পূজার জন্য একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে লালগোলার প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় কিরীটেশ্বরী মন্দিরের যে সংস্কারাদি করেন, তাহার পর অদ্যাবধি আর কোন সংস্কার হয় নাই। যেখানে প্রাত্যহিক সেবা-পূজারই ব্যবস্থা নাই, সেখানে মন্দিরাদির সংস্কারের কথা চিন্তা করা যায় না। তবে কিরীটেশ্বরী সংস্কার কমিটি এই বিষয়ে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তাহা জানা যায় নাই।

"বাংলায় ভ্রমণ" গ্রন্থে কিরীটেশ্বরী সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে :

"লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশন হইতে প্রায় তিনমাইল পশ্চিমে কিরীটকণা একটি বিখ্যাত স্থান। এখানে দেবীর কিরীটের একটি কণা পড়িয়াছিল, দেবীর নাম বিমলা বা কিরীটেশ্বরী, ভৈরব সম্বর্ত্ত কিরীটকণা বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান রূপে সম্মানিত। ইহা পীঠস্থান বলিয়া পূজিত; তবে কাহারও কাহারও মতে এখানে দেবীর অঙ্গ না পড়িয়া কিরীটের অংশ পড়িয়াছিল বলিয়া ইহা একটি উপপীঠ। "তন্ত্রচূড়ামণি" ও "মহানীল তন্ত্র"-এ কিরীটকণার উল্লেখ আছে। পাঠান ও মুঘল যুগে এই স্থানের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক মঙ্গল নামক জনৈক বৈষ্ণবের পূর্বপুরুষগণ কিরীটশ্বরীর সেবক ছিলেন বলিয়া জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর মঙ্গল বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করিয়া বর্ধমান জেলার চাঁদরা গ্রামে গিয়া বাস করেন; তাঁহারই পৌত্র বদনচাঁদ ঠাকুর মনোহর সাহী সঙ্কীর্তন রীতির প্রবর্তক।…কিরীটেশ্বরীর মন্দির পশ্চিমদ্বারী, মন্দির মধ্যে কোন প্রতিমূর্তি নাই। কেবল একটি উচ্চ প্রস্তরবেদী আছে। উচ্চ বেদীর উপর আর একটি ক্ষুদ্র বেদী আছে, উহাই দেবীর কিরীটরূপে পূজিত হয়। মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবার তোরণের দুইদিকে দুইটি শিবমন্দির আছে। উহার মধ্যে দক্ষিণ-দিকের মন্দিরটি রাজা রাজবল্লভের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। নিকটেই আর একটি প্রাচীন মন্দিরে এক বৃহদাকার বিদীর্ণ শিবলিঙ্গ অবস্থিত। উহাও রাজা রাজবল্লভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া। কথিত প্রবাদ যে রাজা রাজবল্লভের পুত্র নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইলে এই শিবলিঙ্গ আপনা হইতেই বিদীর্ণ হইয়া যায়। কিরীটেশ্বরীর ভৈরব বলিয়া যে মূর্তির পূজা করা হয় উহা প্রকৃত পক্ষে একটি বুদ্ধমূর্তি। গ্রামের মধ্যে "গুপ্তমঠ" নামে আর একটি নূতন মন্দিরেও কিরীটেশ্বরীর পূজার ব্যবস্থা আছে। পুরাতন মন্দির হইতে পূজারীরা দেবীর কিরীট এই নূতন মন্দিরে লইয়া আসিয়াছেন; উহা সর্বদা লাল কাপড়ে ঢাকা থাকে এবং দেখিতে নিষেধ।"

(বাংলায় ভ্রমণ: ২য় খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ১১৪-১১৫)

District Handbooks, Murshidabad, 1951 এ কিরীটেশ্বরী সম্পর্কে লেখা হইয়াছে :

"Village in the Lalbagh subdivision, situated to the west of the Bhagirathi, three miles west of Murshidabad. The place derives its name from the temple of Kiriteswari, which marks the spot where the crown (*kirit*) of the Sati fell when she was dismembered by the discus of Vishnu. It is of some antiquity, being mentioned in the Brahmanda section of the *Bhavishyat Purana*, which was probably composed in the fifteenth or sixteenth century A.D. It flourished under the rule of the Nawabs, thus disproving the story that Murshid Kuli Khan had all Hindu temples within four miles of Murshidabad pulled down. According to the *Sair-ul-Mutakharin*, Mir Jafar was persuaded by Nanda Kumar, the Nuncomar of history, to make water in which the sacred emblem of the goddess had been bathed, in the hope that it

wolud be a cure for the malady of which he died. The emblem is a piece of black stone engraved with floral designs. The crown or frontal bone, itself, which is called *guptapit*, is preserved in a pot covered with red silk and is rarely exposed to view. There are several other temples, one of which bears the date 1765, but all are neglected and in need of repair. According to the *Riyazuss-Salatin*, Mir Habib encamped here when making his raid on Murshidabad with the Maratha horse." [p lii]

এই গ্রন্থের অপর এক স্থানে লেখা হইয়াছে :

Kiriteswari can be reached both from Berhampur by crossing the Bhagirathi at Khagraghat or from Lalbag. From Lalbag Kiriteswari is about four miles to the west, on the Lalbag Nabagram Road. Kiriteswari was shown by A. Rennel in his map as Kiritkona. It is claimed as 'pithasthan'. The Debi is called Bimala or Kiriteswari and the Bhairab Sambarta. The date tablet found in one of the Kiriteswari temples has now been deposited in the Archaeological Survey. It runs as 'Sake Satasta Kalendu'. Sri N. Bagchi of Berhampur has kindly given me an interpretation of the date. He says: "Following the dictum 'Ankasya Bamagati' it will read like this :

Indu = moon = 1
Kal = trikal = 3
Asta = 8
Sata = 7

This gives the date 1387. Saka or 1387+78 =1465 A. D". In the 18th century Darpanarayan Roy carried out extensive restoration work of the old temples of Kiriteswari and consecrated several Lingams and excavated a tank called Kalisagar. Over an area of about 88 acres there are ruins of a number of small temples of which a temple to the south of the main temple is said to have been built by Raja Rajballabh. The Kalbhairabh idol is at present with Sri Surendra Narayan Sinha of Nahalia at Jiaganj.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 188-189)

গঙ্গাদিত্যপূজা

অমরকুণ্ড গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার সাড়ম্বরে গঙ্গাদিত্য-এর অভিষেক উৎসব পালিত হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে গঙ্গাদেবী ও আদিত্য (সূর্য) দেবের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই বিগ্রহদ্বয়ই "গঙ্গাদিত্য" নামে খ্যাত। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রত্যেক গৃহস্থ প্রাতঃকালে অন্ততঃ এক কলসী গঙ্গাজল, দুধ এবং পূজার জন্য নানাপ্রকার ফল, আতপ চাউল, চিনি, ঘৃত ইত্যাদির নৈবেদ্য লইয়া মন্দিরে আসেন। বেলা দ্বি প্রহরে শিলামূর্তি দুইটি মন্দিরের বাহিরে বারান্দায় একটি উচ্চ কাষ্ঠাসনে রাখিয়া ঘৃত, চন্দন, কুমকুম প্রভৃতি সুগন্ধ দ্রব্যের দ্বারা মার্জিত করা হয়। তারপর সেবায়েত যথাক্রমে ১০৮ কলসী দুগ্ধ, ১০৮ কলসী গঙ্গাজল এবং অবশেষে ৮ কলসী পুষ্করিণীর জল মূর্তিতে ঢালিয়া অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পরে সূর্যস্তব ও গঙ্গাস্তব পাঠ এবং খিচুড়ী ও পায়সান্ন ভোগ দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা হয়। পূজার সময় বাদ্যকরগণ ঢাক-ঢোল-সানাই বাজাইয়া থাকেন। অপরাহ্ণে গৃহস্থগণ দলে দলে খিচুড়ী এবং পায়সান্ন ভোগ সেবায়েতের নিকট হইতে লইয়া যান। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও দরিদ্র ভোজনের আয়োজন হয়। এই দিন মন্দির প্রাঙ্গণে দুই-চারিটি মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকান বসে। মানত দিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ যে-কোন রবিবারে দুধ, আতপ চাল আনিয়া সেবায়েতের নিকট দিলে সেবায়েত তাহার দ্বারা পায়সান্ন প্রস্তুত করিয়া গঙ্গাদিত্যের নিকট নিবেদন করেন। ইহাই মানত পূরণের পদ্ধতি। বর্তমান সেবায়েত মৈথিলী ব্রাহ্মণ, বংশানুক্রমে ইহারা সেবায়েতের কার্যে নিযুক্ত আছেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যদি কোন বৎসর সময়মত বৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে গ্রামবাসীগণ সেই সময় মাসের শেষ রবিবার ব্যতীত যে-কোন রবিবার গঙ্গাদিত্য-এর বিশেষ পূজা দিয়া থাকেন। পূজার দিন গ্রামের কোন কৃষক জমিতে হালচাষ করেন না। ইহা ব্যতীত, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কের সময় আদিত্যের শিলা মূর্তিটিকে চড়কমণ্ডপে আনিয়া পূজাদি করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

অমরকুণ্ড গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে শিবের সহিত গ্রামদেবতা আদিত্যদেবকে চড়ক-মণ্ডপে আনিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। চড়কপূজার সময় সকলশ্রেণীর ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া নানারূপ কৃচ্ছ্রসাধন ও সংযম পালন করেন। ভক্তদের মধ্যে একজন "দিয়াসী" (সদ্‌গোপ বংশীয়) থাকেন ; তাঁহার নেতৃত্বে শিবের উপাসনা কার্য সম্পন্ন হয়। ঐদিন চড়ক-মণ্ডপের নিকটে অনেক দোকানপাট বসে এবং নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন।

শ্যামসুন্দরজীউর পূজা

পাচগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসের মাঝামাঝি শ্যামচাঁদ বা শ্যামসুন্দরজীউর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। বিগ্রহটি প্রতি বৎসর জঙ্গীপুরের হিলোড়া গ্রাম হইতে আনিয়া পূজা করা হয় এবং পূজা ও উৎসবান্তে উক্ত বিগ্রহটি পুনরায় হিলোড়া গ্রামের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। শ্যামসুন্দরের মূর্তিটি বেলকাঠের তৈয়ারী, উচ্চতায় সাতফুট এবং কালো রঙে চিত্রিত। শ্যামসুন্দর ঠাকুরের সংগে তাঁহার পুরোহিতও আসেন এবং তিনি পূজার্চনা ও প্রসাদ বিতরণ করেন। হিলোড়া গ্রামে শ্যামচাঁদ বা শ্যামসুন্দরদেবের মন্দির আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন গ্রামে এই বিগ্রহ আনিয়া পূজাদি করা হয়। অন্য গ্রামে লইয়া গিয়া পূজা করিবার জন্য শ্যামচাঁদ-জীউর সেবায়েতকে দৈনিক ২৫৲ টাকা জমা দিতে হয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ নবগ্রাম

মেলা বিবরণী

কিরীটেশ্বরীপূজার মেলা

কিরীটেশ্বরী গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার কিরীটেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষে দেবী মন্দিরের সম্মুখে প্রায় সত্তর বিঘা পরিমাণ জমি জুড়িয়া একটি মেলা বসে। পূর্বে মেলার জমিটি লালগোলার রাজাদের অধীনে ছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার মধ্যে ইহা একটি বিখ্যাত মেলা। উৎসবটি চার-পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন হইলেও মেলাটির সূত্রপাত হয় প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে। বঙ্গাধিকারী দর্পনারায়ণের সময় হইতেই এই মেলাটি চলিয়া আসিতেছে। এই জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে এই সময় প্রতিদিন সর্বশ্রেণীর প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, নবগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসিয়া মেলায় দোকানপাট দেন। মিষ্টান্ন ও অন্যান্য খাবার, হাঁড়ি-কলসী, কাপড়-চোপড়, শিল্পসামগ্রী ইত্যাদি জিনিসপত্রসহ মোট প্রায় একশতখানি দোকানপাট বসে ও কিছু সংখ্যক ফেরীওয়ালা থাকেন। এই মেলায় প্রচুর পরিমাণে "বিন্নির খই" আমদানী হয়—সমাগত যাত্রীদের পক্ষে ইহা একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। মেলায় ছাগল ক্রয়-বিক্রয়ও হয়। পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

গোপাষ্টমীর মেলা

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে গোপাষ্টমীর পূজা উপলক্ষে পাঁচগ্রামের অন্তর্ভুক্ত বলালপুরে স্থানীয় পুণ্ডরীক্ষ জাতির উৎসাহে একটি মেলা বসে। গোপাষ্টমী উৎসব ও মেলাটি খুবই প্রাচীন—প্রায় পাঁচ-ছয়শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীর বিশ্বাস। মেলাটি প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য বসে। আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় একহাজার যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় বিভিন্ন স্থান হইতে খাবার, মনিহারী, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, বেতের জিনিসপত্র, জুতা ইত্যাদির প্রায় একশতখানি দোকানপাট আসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সিনেমা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী, যাত্রাগান কবিগান ও কীর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

শ্যামসুন্দরজীউ পূজার মেলা

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে শ্যামচাঁদ বা শ্যামসুন্দর জীউর পূজা উপলক্ষে পাঁচগ্রামে "হাটকৃষ্ণগঞ্জে" প্রায় সাত-আট বিঘা পরিমাণ জমিতে বেশ বড় একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহা কুড়ি দিন যাবত চলে।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় একহাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী এবং মোটরবাসে করিয়া মেলায় আসেন।

লোহাপুর, ভদ্রপুর, ইন্দ্রাণী, বহরমপুর, লালগোলা, সাগরদীঘি, কাঞ্চনতলা, কান্দি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই বিক্রেতারা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে খাবার, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়-চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা প্রভৃতির দোকান দেখা যায়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সিনেমা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারি, যাত্রাগান, কবিগান, কীর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : জলঙ্গী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : খয়রামারি।

৩।৩৩,৮০৩'৪০।১,০৬০।৫,৮৬৯

(ক) গোয়ালা, মুচি, কামার, ব্রাহ্মণ, স্বর্ণকার, বৈষ্ণব এবং মুসলমান। গ্রামে পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহাছাড়া মোটরবাসেও গ্রামে পৌছান যায়। নিকটবর্তী খয়রামারি বিল দিয়া নৌকাযোগে করিমপুর, কৃষ্ণনগর, এমন কি কলিকাতা পর্যন্ত যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) বৈশাখ সংক্রান্তিতে মুচিপাড়ায় একটি শিবপূজা হয় এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে ব্রাহ্মণপাড়ায় শিবপূজা ও চড়ক উৎসব হয়। উৎসব দুইটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। উভয় পূজাতেই বৃষবাহন শিবমূর্তির পূজা করা হয়।

ইহা ব্যতীত, গ্রামে মহামারীর আবির্ভাব হইলে সর্বজনীন রক্ষাকালীপূজা করা হয়। ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। গোয়ালাপাড়ায় প্রতিষ্ঠিত রাধামাধব বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শীতলা দেবীর মূর্তি, শিব ও কালীদেবীর স্থান এবং ছয়টি মসজিদ আছে।

গ্রাম সম্পর্কে স্থানীয় গ্রামবাসীগণের মুখে শুনা যায় যে, পূর্বে গ্রামের এই স্থানটি পদ্মানদীর চরা ছিল এবং গ্রামের নিকট বিলে প্রচুর খয়রা মাছ পাওয়া যাইত বলিয়া গ্রামের নাম খয়রামারি হইয়াছে।

শ্রীপ্রমথ নাথ ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
খয়রামারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
খয়রামারি, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : কুমারপুর (মৌজা : দেবীপুর)।

৪।৪৬,২৬'৪১।১,১৬৭।৬,৪৬১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। বহরমপুর হইতে সাগরপাড়াগামী মোটরবাসে মাটিয়াল-ত্রিমোহিনীতে নামিয়া দক্ষিণদিকে এক মাইল হাটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) মাঘে শিবপূজা। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ঘোষপাড়ায় একটি বটবৃক্ষের নীচে শিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীআবদুর রহিম মিঞা, প্রধান শিক্ষক,
কুমারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নটিয়াল, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : বারমাশিয়া।২১।১,১০১'৫৪।৩৪৮।১,৯০১

(ক) কামার, কুমার, নাপিত, মালাকার, গোয়ালা, বাগ্দী, জেলে, চামার, ছুতার, সাহা ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে বহরমপুর রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা চলে এবং বর্ষাকালে নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রে শিবপূজা ও চড়ক। উৎসব দুইটি সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) একটি বৃহৎ পাকুড় গাছের নীচে শিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে; এইস্থানে প্রতি বৎসর মূর্তি গড়িয়া শিবপূজা হয়।

স্থানীয় গ্রামবাসীর মুখে শুনা যায় যে, এই গ্রামে বারমাসই নানা প্রকার রবিশস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া গ্রামের নাম বারমাশিয়া হইয়াছে।

শ্রীসত্যগোপাল সাহা, শিক্ষক,
বারমাসিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাগরপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : হরেকৃষ্ণপুর। ২৩।৬৫৯.১১।১৩৮।৭৪১

(ক) বৈশ্য, সাহা, ছুতার, নমঃশূদ্র, জেলে, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে আটাশ মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেলস্টেশন এবং দুই মাইল দূরে খয়রামারি বাসস্ট্যাণ্ড। নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখে সর্বজনীন শিব ও কালীপূজা। উৎসবটি দুইদিনব্যাপী চলে এবং চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীসুধীর কুমার সরকার, শিক্ষক,
হরেকৃষ্ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : সাদিখাঁর দিয়াড়।
৩৭।৬৯৬.২১।৩৯০।১,৯২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, গোয়ালা, নমঃশূদ্র, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, যোগী, নাপিত, কামার, ছুতার, মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে আটাশ মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেলস্টেশন। গ্রামের মধ্যেই মোটরবাস স্ট্যাণ্ড আছে।

(ঘ) বৈশাখে রক্ষাকালীপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালী ও কার্তিকপূজা, মাঘে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রে শিবপূজা। সবগুলি পূজাই সর্বজনীন।

(ঙ) রক্ষাকালীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যে কালীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। স্থানীয় জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপাল-এর নিত্য পূজা হয়। মদনগোপালের বিগ্রহটি প্রায় তিন-চারশত বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া শোনা যায়।

মদনগোপালদেবের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, স্থানীয় জমিদার গোস্বামীবাবুরা যখন এখানে আসেন, সেই সময় বন্যার জলে ভাসিয়া মদনগোপালদেব বিগ্রহটি এই গ্রামের একস্থানে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে। পরে গোস্বামীবাবুগণের জনৈক পূর্বপুরুষ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই বিগ্রহটি স্বগৃহে আনাইয়া প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাভিন্ন, গ্রাম্য দেবতা দধিবামন দেবেরও নিত্য সেবা করা হয়।

শ্রীনিতাই পদ দাস, শিক্ষক,
সাদিখাঁর দিয়াড়, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—নরসিংহপুর (মৌজা নং ১৯) গ্রামে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলা বিবরণী দ্রষ্টব্য।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ জলঙ্গী

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা (রক্ষাকালী)

সাদিখাঁর দিয়াড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখের শেষ শনি-মঙ্গলবার গ্রামের কালীতলায় দেবীর বেদীতে ঘট স্থাপন করিয়া কালীপূজা করা হয়।

এই পূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে একবার বন্যায় একটি বটগাছ, (যে গাছতলায় পূজা হয়) ভাসিয়া আসিয়া বর্তমান পূজার স্থানে আটকাইয়া যায়। পরে গ্রামবাসীগণ উক্ত বটগাছটিকে তুলিয়া আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং উহার নীচে একটি বেদী স্থাপন করিয়া কালী পূজার আয়োজন করেন। প্রায় তিন-চারিশত বৎসর যাবত উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং উৎসব উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কালীর নিকট মানত করেন। মানতের পাঁঠা উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উৎসর্গীকৃত পাঁঠা যে-কেহই গ্রহণ করিতে পারেন ; তবে সাধারণতঃ সেবায়েতই গ্রহণ করেন। পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এই পূজায় অহিন্দুরাও অংশ করেন।

শিবপূজা

কুমারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শিবপূজাটি প্রায় দুইশত আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। এই পূজা ও উৎসবের সূত্রপাত সম্বন্ধে শোনা যায় যে, পার্শ্ববর্তী কুতুবপুর গ্রামের শ্রীআত্মারাম মণ্ডল ও শ্রীদুর্গারাম মণ্ডল নামে দুই ব্যক্তি বসবাস করিতেন। তাঁহারা উভয়েই যাদু বা ভেল্কীবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং খুব ধুমধামের সহিত শিবপূজা করিতেন। খুব সম্ভবতঃ মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের সূত্রপাতের সময় তাঁহারা জীবিত ছিলেন। এই শিবপূজা কুতুবপুর গ্রামেই অনুষ্ঠিত হইত, কিন্তু কালক্রমে উক্ত মণ্ডল পরিবারের বিলোপ হইলে মেদিনীপুরের জমিদারগণ কুমারপুর গ্রামের ঘোষ পরিবার অর্থাৎ বর্তমান সেবায়েত শ্রীচারুপদ ঘোষের পূর্বপুরুষকে এই গ্রামে পূজা করিতে নির্দেশ দেন এবং পূজার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করেন। সেই সময় হইতে পূজাটি এই গ্রামেই অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই উৎসবটি কুমারপুর, কুতুবপুর এবং পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামের সর্বজনীন উৎসবরূপে পালন করা হয়।

কুমারপুর গ্রামে ঘোষপাড়ায় বটগাছের তলায় শিবের স্থান আছে। ষাঁড়ের উপর উপবিষ্ট বাঘছাল পরিহিত শিবমূর্তি গড়িয়া পূজা করা হয়। শিবের একহাতে ত্রিশূল, অন্য হাতে বাণ; মাথায় জটাজুট ও ফণাযুক্ত সর্প। পূজা এবং উৎসব মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্যন্ত চলে। উৎসবে অনেকে শিবের ভক্ত হন। পঞ্চমীর দিন ভক্তরা উপবাস করেন এবং শিবমূর্তিটিকে পূজার স্থানে লইয়া আসেন। পঞ্চমীর দিন রাত্রিতে অপর একটি বটতলায় বিশেষ কয়েকজন ভক্ত মিলিত হন। কথিত আছে যে, ঐ রাত্রিতে সিদ্ধপ্রাপ্ত ভক্তের দেহে শিবের ভর হয় এবং সেই সময় তাঁহার মুখ দিয়া নানারূপ ভবিষ্যৎ বার্তা প্রকাশিত হয়। ষষ্ঠীর দিন পুরোহিত যথাবিধি পূজা করেন। এই পূজা সপ্তমী পর্যন্ত চলে। প্রতিদিন বৈকালে গ্রামবাসীগণ শিব-মূর্তি দর্শনের জন্য আসেন। সপ্তমীর দিন একটি বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে শিবকে কৃষক হিসাবে কল্পনা করিয়া "কৃষক শিব" কর্তৃক চাষবাসের কাজটি অভিনয় করা হয়। বিশেষ বিশেষ কয়েকজন ভক্ত এই অনুষ্ঠানে কৃত্রিম ভাবে ধান বোনা, নিড়ান-কাটাই ইত্যাদি কৃষিকার্যের বিভিন্ন বিষয়গুলি অভিনয় করেন। ইহা এই স্থানের শিবপূজার একটি বৈশিষ্ট্য ; ঐ দিন বেলা দুই ঘটিকার পর শিবমূর্তি বিসর্জন দিয়া ভক্তরা উপবাস ভঙ্গ করেন। ষষ্ঠী ও সপ্তমীর দিন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শিবস্থানে কেহ মানত করিলে প্রধানতঃ শিবমূর্তির পাশে অন্য একটি শিবমূর্তি স্থাপন করিয়া মানতকারী তাঁহার পূজা দেন। শিবের পূজারী শ্রীপ্রমথ নাথ ভট্টাচার্য, বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, গোত্র কাশ্যপ।

শিবপূজা উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকানপাট বসে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : জলঙ্গী

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

সাদিখাঁর দিয়াড় গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ শনি-মঙ্গলবার কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং তদুপলক্ষে প্রাচীন কালীতলায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় চার-পাঁচ বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় একহাজার হইতে দেড়হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে দূরবর্তী অঞ্চলের প্রায় চার-পাঁচশত যাত্রী আসেন। মেলায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে; ফেরিওয়ালার সংখ্যাও প্রায় পনর-ষোল জন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, তেলেভাজা প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, কাঠের তৈয়ারী খেলনা, লোহার জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা, বাঁশ ও রঙীন কাগজের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। পূজার ব্যয় নির্বাহের জন্য বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কিছু কিছু দান বা তোলা আদায় করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

বারমাশিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া-দশমীতে দুর্গামণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে একদিনের জন্য একটি ছোট আকারের মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। ইহাতে প্রায় একহাজার যাত্রীর সমাগম হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীগণই সাধারণতঃ খাবার ও মিষ্টির দোকানাদি দিয়া থাকেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং বহু দর্শক ইহাতে যোগদান করেন।

নরসিংহপুর গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে একটি ছোট আকারের মেলা বসে। মেলাটি সাধারণতঃ চারদিনব্যাপী চলে এবং মাত্র চার-পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। যাত্রীগণ প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণ স্থানীয় গ্রামবাসী এবং দোকানপাটের অধিকাংশই খাবার ও মনিহারীর দোকান।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ ভোমকল

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কাশীপুর (মৌজা ঃ জোত কানাই)। ২০।১,৭২০'২৬।৩২৭।১,৬২০

(ক) মুসলমান ও নমঃশূদ্র।

পাড়া তিনটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। গ্রামের মধ্য দিয়া ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। বহরমপুর হইতে খয়রামারি পর্যন্ত মোটর-বাস চলাচল করে। ঐ মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) মাঘ মাসে মাঘোৎসব উপলক্ষে শিবপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পাকুড় গাছের নীচে শিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে নবাবী আমলে কাশীরাম নামে নবাবের জনৈক কর্মচারী এই স্থানে পদ্মার এক বালুচরে বসতি স্থাপন করিয়া এই গ্রামের পত্তন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নাম কাশীপুর হইয়াছে।

শ্রীআবদুল গণি, প্রধান শিক্ষক,
কাশীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খয়রামারি, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ কাটাকোপরা। ৩০।৯৯৫'১৭।১৭৪।৯৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, স্বর্ণকার, গোপ, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী পাকা রাস্তা দিয়া নিয়মিত মোটর-বাস ও অন্যান্য যানবাহন চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব। চড়ক উৎসবটি বহু প্রাচীন উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) একটি শিবমন্দির আছে।

এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য গ্রামগুলি পূর্বে পদ্মার গর্ভে বিলুপ্ত ছিল। পরে পদ্মা পূর্বদিকে সরিয়া যাওয়ায় এইখানে চর পড়ে এবং তাহাতে ক্রমশঃ লোকবসতি গড়িয়া উঠে। এখানকার মাটি খুব উর্বর এবং জলবায়ু স্বাস্থ্যকর বলিয়া পূর্বে এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে রবার্ট ওয়াটসন কর্তৃক একটি নীলকুঠি স্থাপিত হয়। গ্রামের মধ্যে সে সময় এক ঘর বারেন্দ্রশ্রেণীর প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। নীলকুঠির অত্যাচারের ফলে ঐ বংশের ব্রজলাল ব্রহ্মচারীর সহিত কোম্পানীর সংঘর্ষ হয় এবং সেই সংঘর্ষে ব্রহ্মচারী পক্ষই জয়লাভ করেন। কিন্তু ইংরাজ কুঠিয়ালের কূটবুদ্ধি ও শয়তানীর ফলে ক্রমে ক্রমে উক্ত ব্রহ্মচারী বংশের সর্বনাশ সাধিত হয়। তাঁহার বংশধরগণ এখনও এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তাঁহাদের জমির উপর ধ্বংসপ্রাপ্ত নীলকুঠির পাশে স্ট্যানভ্যাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী কর্তৃক বর্তমানে তৈল সন্ধানের কাজ চলিতেছে।

শ্রীকালিদাস মৌলিক, শিক্ষক,
হরিশঙ্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রায়পুর, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে প্রায় একমাসব্যাপী একটি মেলা বসিত। মাত্র কয়েক বৎসর হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এবিষয়ে মেলা বিবরণী অধ্যায় বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হইল।

৩। গ্রাম ঃ ভগীরথপুর।৪৬।১,১২৮'১০।৭৬৯।৪,১১৫

(ক) সাহা, গোয়ালা, হালদার, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, চুনারি, যিতার, মেথর ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। বহরমপুর হইতে কলাডাঙ্গা পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রাম হইতে ছয় মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া কলাডাঙ্গা পৌছান যায়।

(ঘ) আষাঢ়ে রথযাত্রা উৎসব এবং মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীতে শিবপূজা। ইহা ভিন্ন, গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাইষষ্ঠী তিথিতে স্ত্রীলোকেরা "দইমেলা" উৎসব পালন করেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে শিবমূর্তি ও যশাইতলা নামে একটি স্থান আছে।

কথিত আছে যে, পাটলিপুত্র হইতে বল্লালসেন কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া ভগীরথ নামক জনৈক সাহা নৌকাযোগে ভৈরব নদীর তীরস্থ এই স্থানে আসিয়া গ্রাম স্থাপন করেন বলিয়া গ্রামটির নাম ভগীরথপুর হইয়াছে।

শ্রীসুখ কুমার দত্ত, প্রধান শিক্ষক,
ভগীরথপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : চাঁদপুর।৫৮।৭০২'০৬।৩৭০।২,০৯৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট ও বেলডাঙ্গা। গ্রামের মধ্য দিয়া কাঁচা রাস্তায় মোটরবাস নিয়মিত চলাচল করে। গ্রামের পশ্চিমে ভৈরব নদীতে বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা। বহুকালের প্রাচীন উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে স্থানীয় গোয়ালা সম্প্রদায় কর্তৃক নির্মিত একটি শিবমন্দিরে শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীআবদুল করিম, শিক্ষক,
চাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জিতপুর, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : বৈষ্ণব পাড়া (মৌজা : মোমেনপুর)। ৭৯।২,৩০২'৬০।৫৮৫।৩,৪২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, বৈষ্ণব ও মুসলমান।

পাড়া তিনটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় বত্রিশ মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেলস্টেশন। বহরমপুর হইতে গড়াইমারী ও করিমপুর পর্যন্ত পাকা রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামে উক্ত মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের মধ্যে একটি কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে গ্রামের পাশে জলঙ্গী নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা। কার্তিকপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুইটি মাটির দেবালয় আছে। একটি কালী ও একটি শিবের পাকা বেদী আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে বলা হয় যে, বহুদিন পূর্বে এই স্থানে বড় গৌর চন্দ্র দাস নামক একজন বৈষ্ণব সাধক বাস করিতেন। যদিও তিনি সংসার ত্যাগী সাধক ছিলেন তথাপি তাঁহার ঘোড়া ও বেতনভোগী সহিস ইত্যাদি ছিল। একদিন তাঁহার সহিস গ্রামের পশ্চিম পাশে জলঙ্গী নদী তীরে ঘাস তুলিয়া গায়ের আলোয়ানে বাঁধিতেছিল, সেই সময় রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোরের বিখ্যাত রাজা রামকৃষ্ণ নৌকাযোগে এই পথে যাইতেছিলেন। আলোয়ানে ঘাস বাঁধিতে দেখিয়া তিনি কৌতূহলবশতঃ উক্ত সহিসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসাবাদ করায় সহিস তাহার মনিব বড় গৌর দাসের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে রাজাকে জানান। নাটোরের রাজা তখনই বড় গৌর চন্দ্র দাসকে নদী তীরে ডাকাইয়া পাঠান। হাতে মালা, গায়ে নামাবলী, পায়ে খড়ম গৌর চন্দ্র রাজার নিকট উপস্থিত হইলে, রাজা জানিতে

চাহিলেন তিনি বৈষ্ণব হইয়া এইরূপ ঘোড়া ও সহিসের ব্যবস্থা কেন রাখিয়াছেন।

উত্তরে বৈষ্ণব সাধক বলিলেন যে, বিপদাপদে প্রতিবেশীদের সাহায্য করিবার জন্যই অর্থাৎ অসুখ-বিসুখে চিকিৎসককে খবর দেওয়া, মৃত্যুর সংবাদ আত্মীয়-স্বজনকে পৌঁছাইয়া দেওয়া ইত্যাদি জনহিতকর কাজের জন্যই তিনি ঐরূপ ব্যবস্থা রাখিয়াছেন। যাহা হউক, রাজা তাঁহার নিকট গান শুনিতে ইচ্ছা করায় গৌর চন্দ্র একখানি কীর্তন শুনাইলেন। তাঁহার গান শুনিয়া নাটোরের রাজা মুগ্ধ হইয়া পূজা-উৎসবে নাটোরের রাজবাড়ীতে দলবল লইয়া কীর্তন গাইবার জন্য গৌরচন্দ্রকে আমন্ত্রণ জানাইলেন। যথাসময়ে রাজবাড়ীতে বড় গৌর দাস কীর্তন শুনাইলেন, ইহাতে রাজা রামকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইয়া গৌর দাসকে ভূসম্পত্তি উপহার দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি রাজাকে বলিলেন যে, পার্থিব সুখ-সুবিধা বা ভোগ-বিলাসের মধ্যে তিনি আর যাইতে ইচ্ছুক নহেন। তবে রাজার যদি করুণা হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বজাতি বৈষ্ণবদের জন্য কিছু নিষ্কর বা লাখেরাজ সম্পত্তি দান করিতে পারেন। নাটোরের রাজা গৌর চন্দ্র দাসকে বহু নিষ্কর বা লাখরাজ সম্পত্তি দান করেন। সেই জমিতে ক্রমশঃ অনেক বৈষ্ণব স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে শুরু করায় গ্রামের নাম বৈষ্ণব পাড়া হইয়াছে।

শ্রীমতলেব আহম্মদ, শিক্ষক,
বৈষ্ণবপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মোমেনপুর, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : হরিশঙ্করপুর। ৮৭।১,২২৪·৯৬।১৫৯।৮৬৯

(ক) নমঃশূদ্র, মুসলমান ও গোপ।
তিনটি পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের এক মাইল পূর্বে জলঙ্গী নদীতে বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করে। গ্রামের উত্তর সীমায় কাটাকোপরা মৌজায় স্ট্যানভ্যাক পেট্রোলিয়াম কোম্পানী কর্তৃক পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কার্য চলিতেছে এবং এই কারণে গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে এই কোম্পানীর বিমান অবতরণ কেন্দ্র নির্মিত হইয়াছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, পৌষে সর্বজনীন কালীপূজা, মাঘে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন, গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে মদনমোহনদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কয়েক বৎসর হইল উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) ×

(চ) মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালাযুক্ত সাধারণের একটি মন্দিরে মদনমোহন ও গোপালদেব বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

গ্রামের নাম সম্পর্কে স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে জানা যায় যে, এই গ্রামটি পূর্বে পদ্মানদীর গর্ভে ছিল এবং তাহা রাজসাহী জেলার সীমানাধীন ছিল। কালক্রমে পদ্মানদী পূর্বদিকে সরিয়া যাওয়ায় এই স্থানে যে চরের সৃষ্টি হয়, উহাতে পূর্ববঙ্গ হইতে নৌকাযোগে আগত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের কিছু-লোক এখানে আসিয়া চরের খড়-জঙ্গল কাটিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। ক্রমে ক্রমে ইহা স্থায়ী বসতিতে পরিণত হয় এবং উপনিবেশ স্থাপনকারী এই পূর্ববঙ্গাগত নমঃশূদ্রদের হরিশ ও শঙ্কর নামে দুইজন নেতা ছিলেন; তাঁহাদের নামানুসারে গ্রামের নাম হরিশঙ্করপুর হয়। তাঁহাদের বংশধর-গণের কোন কোন ব্যক্তি বর্তমানেও এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

শ্রীকালিদাস মৌলিক, শিক্ষক,
হরিশঙ্করপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রায়পুর, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : শীতলনগর। (রায়পুর মৌজা নং ২৯, খোদর পাড়া মৌজা নং ৮৬ ও হরিশঙ্করপুর মৌজা নং ৮৭—এই তিনটি মৌজার সংযোগস্থলে শীতল-নগর গ্রামটি অবস্থিত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, পাটনী ও মুসলমান।

পাড়া চারিটি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেলস্টেশন। বহরমপুর হইতে গড়াইমারী পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তায় নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রাম হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে কাটাকোপরা হইতে ঐ মোটরবাসে যাতায়াত করা হয়। কাটাকোপরা হইতে গ্রাম পর্যন্ত রাস্তাটি কাঁচা। গ্রামের পূর্বদিকে শিয়ালমারী নামে ছোট একটি মরা নদী প্রবাহিত। পূর্বে এই নদীপথে সারা বৎসর কলিকাতা হইতে মালপত্র আসিত এবং এই অঞ্চলে উৎপন্ন পাট ও কাঠ চালান যাইত, বর্তমানে কেবলমাত্র বর্ষাকালেই যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিনে সর্বজনীন লক্ষ্মীপূজা, অগ্রহায়ণে ব্যক্তি-বিশেষের কালীপূজা। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে মুসলমানদের ধর্মসভায় ফুরফুরার পীর প্রতি বৎসর তাঁহার শিষ্য ও মৌলভীগণসহ যোগদান করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কালী ও লক্ষ্মীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ মজুমদার, প্রধান শিক্ষক,
শীতলনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুপিলা, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—দাসের চক্ (মৌজা নং ২০ জোত কানাই) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মস্তরাম আউলিয়া'র আবির্ভাব উপলক্ষে একটি উৎসব ও মেলা বসে। এবিষয়ে মেলা বিবরণী অধ্যায় দ্রষ্টব্য। সংবাদদাতা শ্রীআবদুল গণি, প্রধান শিক্ষক, কাশীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ

থানা ঃ ডোমকল

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কাটাকোপরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে চড়কপূজা ও তদুপলক্ষে একটি বৃহৎ মেলা বসিত। ইহা এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ উৎসব ও মেলা রূপে পরিগণিত হইত। এই উৎসব ও মেলা যে কত কালের প্রাচীন তাহা সঠিক বলা যায় না, তবে গ্রামে প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট হইতে জানা যায় যে, মোগল বাদশাহের আমলেই ইহার সূত্রপাত হয়। শোনা যায়, বঙ্গদেশে বর্গীর আক্রমণের সময় কয়েক বৎসরের জন্য মেলা বন্ধ ছিল। পরে ঐ মেলা চালু হইলেও কয়েক বৎসর হইল উহা একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

কাটাকোপরা গ্রামের এই প্রাচীন চড়ক উৎসবটির সহিত একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। পূর্বে এই গ্রামে গোপজাতির বসবাস ও বিশেষ প্রাধান্য ছিল। ইহাদের মধ্যে কমল ঘোষ নামক জনৈক গোপ এক দুর্দান্ত দস্যুদলের সর্দার ছিল। ডাকাতি করিয়া তাহার দল যে-সমস্ত ধনরত্ন আনিত, তাহা তাহারা সর্দারের বাড়ী সংলগ্ন একটি পুকুরে ডুবাইয়া রাখিত। পুকুরের পাশেই ছিল শিবমন্দির। ঐ শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। চৈত্রসংক্রান্তিতে এই শিবমন্দিরে শিবপূজা হইত এবং মন্দির প্রাঙ্গণে চড়কপূজা হইত। গোপ সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই উৎসবের ভক্ত হইত। ভক্তদের মধ্যে কেহ কেহ পিঠে বঁড়শি ফুঁড়িয়া চড়কগাছে পাক খাইত। পূজান্তে চড়কগাছটি ঐ পুকুরের জলে ডুবাইয়া রাখা হইত। চড়কগাছটি সম্পর্কে স্থানীয় লোকের বিশ্বাস এই যে, বর্ষার সময় উহা আপনা হইতেই নদীতে চলিয়া যাইত। পূজা ও উৎসবের পূর্বে অর্থাৎ চৈত্র মাসের শেষে ভক্তগণ হবিষ্যান্ন করিয়া ঢাকঢোল বাজাইয়া ঐ পুকুরের পাশে গিয়া চড়কগাছটিকে আহ্বান করিলে সংক্রান্তির পূর্বদিন গাছটি পুকুরে ধারে হাজির হইত এবং বিকালে ঐ স্থান হইতে চড়কগাছ তোলা হইত। শুনা যায় নির্দিষ্ট দিনে নদী হইতে পুকুরে আসিবার পথে একবার চড়ক গাছটি মাঠের ঝোপজঙ্গলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। চৈত্র মাসে সাধারণতঃ রাখাল বালকেরা মাঠের ঝোপজঙ্গলে আগুন ধরাইয়া দেয়। সেইবারও তাহারা ওই মাঠের জঙ্গলে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিল। জঙ্গলের মধ্যে আবদ্ধ থাকা চড়কগাছেও আগুন লাগিয়া যায়। তখন নাকি রাখাল বালকেরা আগুনের মধ্য হইতে "আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও" এইরূপ শব্দ শুনিয়া ছুটিয়া গিয়া চড়কগাছটিকে গড়াগড়ি দিতে দেখে। চৈত্রের শুষ্ক মাঠে জল ছিল না, কিন্তু রাখালদের নিকট দুধ ছিল, সেই দুধ ঢালিয়া তাহারা চড়কগাছের আগুন নিভাইতে সক্ষম হয়।

তাহার পর গ্রামে খবর দিয়া ধরাধরি করিয়া তাহারা চড়কগাছটিকে পূর্বোক্ত ঐ পুকুরে লইয়া আসে। এই ঘটনার পর হইতে বান ফুঁড়িয়া চড়কে পাক খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আগুনে পোড়া এই চড়কগাছটি নাকি এখনও ঐ পুকুরে নিমজ্জিত অবস্থায় আছে। চৈত্র মাসের শেষ দিকে অনেকগুলি মৃন্ময় শিবমূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করা হইত। মেলাস্থানের উত্তরে পৃথক মন্দিরে স্থাপিত বৃহদাকার বুড়াশিবের পূজা করা হইত। এই বুড়াশিব সারা বৎসর ঐ মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত থাকিত। অন্যান্য শিবমূর্তিগুলিকে পূজার তৃতীয় দিনে চড়কগাছের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরের জলে বিসর্জন দেওয়া হইত। পূজা ও উৎসবের সেবায়েত ও ভক্তরা গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত। মেলাটি গ্রামের ব্রহ্মচারী বংশ কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

দইমেলা উৎসব

ভগীরথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের জামাই ষষ্ঠী তিথিতে এই অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ "দইমেলা" নামে একটি উৎসব পালন করেন। উৎসবটি প্রাচীন। উৎসবে যোগদানকারী মহিলারা এই গ্রামের শিবমন্দিরের পাশে একটি পাকুড় গাছের নীচে ষষ্ঠীতলায় চারিদিক ঘেরা স্থানের মধ্যে সমবেত হন। এই ঘেরা স্থানের মধ্যে প্রথম সন্তানসম্ভবা মহিলাগণ বিক্রয়ের জন্য দধির ভাঁড় লইয়া বসিয়া থাকেন। অপরাপর স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের

নিকট হইতে দধি ক্রয় করিয়া থাকেন। বিক্রেতারাই দধির মূল্য নির্ধারণ করিয়া থাকেন। এই দধি ক্রয়-বিক্রয় লইয়া স্ত্রীলোকেরা আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন।

মাঘোৎসব (শিবপূজা)

হরিশঙ্করপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথির পরের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠীতে মাঘোৎসব উপলক্ষে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে শিবের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজাদি করা হয়। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে খুবই আড়ম্বর হইত। রাণী ভবানী কর্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর জমির আয় হইতে এই উৎসবের ব্যয় নির্বাহ করা হইত; কিন্তু বর্তমানে ঐ দেবোত্তর সম্পত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হওয়ায় উৎসবটি কোন ক্রমে অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

ভগীরথপুর গ্রামে মাঘোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথি হইতে তিন-চারদিনব্যাপী শিবপূজা হয়। শিবপূজা সম্পর্কে কিং-বদন্তী আছে যে, একদা এক ভুঁইমালী "মোল্লাদহ" নামক এক গর্তে মাটি খনন করিবার কালে মাটির মধ্যে প্রোথিত এক শিবমূর্তিতে আঘাত করায়, সেই স্থান হইতে রক্তপাত হইতে থাকে। ভুঁইমালী রক্ত দেখিয়া সেখান হইতে পালাইয়া যায়, সে অবশ্য শিবমূর্তি দেখিতে পায় নাই। সেই রাত্রিতেই এই গ্রামের এক কুমার, এক গোয়ালা, এক ব্রাহ্মণ এবং সে নিজে স্বপ্নে শিব কর্তৃক আদিষ্ট হয় যে, তাঁহার মূর্তি যেন নির্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া পূজা করা হয়। সেই সময় হইতেই এই গ্রামে মাঘোৎসব ও শিবপূজা আরম্ভ হইয়াছে এবং এই পূজার যাবতীয় খরচ উক্ত কয়েক সম্প্রদায় বহন করিয়া থাকে। উৎসবটি প্রাচীন।

কাশীপুর (মৌজা—জোত কানাই) গ্রামের নমঃশূদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথি হইতে অষ্টমী তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে মাঘোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের একটি পাকুড় গাছের নীচে শিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে হাতে ত্রিশূল, ডমরু ও শিখাসহ বৃষবাহন শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ষষ্ঠীর দিন ঐ শিবতলায় ঘট স্থাপন করিয়া পূজা ও উৎসব আরম্ভ হয়। পূজার্চ্চনার জন্য কোন ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয় না; নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্য হইতেই একজন পূজাদি করিয়া থাকেন। প্রতিদিন পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি তিন হইতে চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে গ্রামের বাদল নামে এক ব্যক্তির একমাত্র পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে, তিনি শিবের নিকট পুত্রের নিরাময় কামনা করিয়া পূজা মানত করেন এবং পুত্র রোগমুক্ত হইলে তিনি মাঘ মাসের ষষ্ঠী তিথিতে সাড়ম্বরে শিবের পূজা দেন। সেই সময় হইতেই এই গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

যশাইতলার পূজা

ভগীরথপুর গ্রামে একটি তেঁতুল গাছের নীচে যশাইতলা নামে একটি স্থান আছে। স্থানটি সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে। যে পূর্বে এই গাছের নীচে এক সাধু সাধন-ভজন করিতেন এবং রাত্রিতে তিনি ঐ গাছের উপরেই থাকিতেন। তাঁহার তিরোধানের পরও নাকি তাঁহাকে কেহ কেহ ঐ গাছের উপরে দেখিতে পাইয়াছিলেন। সেই হইতে গ্রামের মেয়েরা সময় সময় এই গাছের নীচে পূজা দিয়া থাকেন। এই পূজাটি যশাইতলার পূজা বলিয়া অভিহিত। যশাইতলায় কোনও মন্দির বা মূর্তি নাই।

রথযাত্রা

হরিশঙ্করপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সাড়ম্বরে মদনমোহনদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। কয়েক বৎসর হইল এই উৎসবটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে মদনমোহনদেবের নিত্য সেবা-পূজা হয়। এই গ্রামে রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন সম্পর্কে গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট শোনা যায় যে, এই গ্রাম পত্তন হইবার অনতিকাল পরে জনৈক বৈষ্ণব সাধক এই স্থানে একটি আখড়া স্থাপন করেন এবং ঐ আখড়ায় ধাতু নির্মিত মদনমোহনদেবের

মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রামবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতায় পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন। পরে রাণী ভবানী মদন-মোহনদেবের নামে চব্বিশ-পঁচিশ বিঘা জমি দেবোত্তর-রূপে উৎসর্গ করিলে বেশ ধুমধামের সহিত মদনমোহন-দেবের সেবাপূজা ও উৎসবাদি চলিতে থাকে।

পূর্বে এই আখড়ার সেবায়েত মোহান্তদিগের মধ্যে দার পরিগ্রহ রীতির প্রচলন ছিল না। মোহান্তরা সুলক্ষণযুক্ত কোন বৈষ্ণব বালককে পোষ্য লইয়া তাহাকে ধর্ম ও ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দিতেন এবং ঐ বালক ক্রমশঃ সংযমী ও ধর্মনিষ্ঠ হইয়া উঠিলে তাহাকে দীক্ষা দিয়া আখড়া ও দেবসেবার ভার দেওয়া হইত।

মদনমোহনদেবের আখড়ার সেবায়েতদিগের মধ্যে কাহার কাহার সম্পর্কে অনেক অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। এই আখড়াটিতে একটি প্রাচীন বৃহৎ কুচিলা বৃক্ষ আছে। কথিত আছে, কোন এক সময় জনৈক সন্ন্যাসী কিছুকালের জন্য এই আখড়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি নাকি তাঁহার হাতে যষ্ঠিখানি মাটিতে পুঁতিয়া বলেন যে, সর্বজনের হিতার্থে তিনি একটি কুচিলা বৃক্ষ রোপন করিলেন। কালক্রমে ঐ যষ্ঠী হইতে বাস্তবিকই একটি কুচিলা বৃক্ষ জন্মে। ঐ কুচিলা বৃক্ষে অসংখ্য ফল ধরে এবং ঔষধরূপে সেবনের জন্য বহু লোক উহার বীজ লইয়া যান। ভক্তরা অনেকে ঐ কুচিলা বৃক্ষের মূলে মানত করেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইলে বৃক্ষমূলে পূজাদি দেন। বৃক্ষমূলটি তেল-সিন্দুরে রঞ্জিত।

বর্তমান সেবায়েতের পিতার আমল হইতে মহান্তদের মধ্যে বিবাহ প্রথা চালু হইয়াছে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ ডোমকল

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসবের মেলা
(মস্তরাম আউলিয়া)

দাসের চক্ (মৌজা নং ২০) গ্রামে একটি বড় বট গাছের তলায় "মস্তরামের দাঁড়া" নামে একটি প্রাচীন দাঁড়া আছে। এখানে বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে মেলা বসে। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস "মস্তরাম বাবাজী"র নিকট মানত করিলে বন্ধ্যাত্ব এবং রোগ-ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসে বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার এখানে বহু ভক্তের সমাগম হয়। এই মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া শোনা যায়।

মস্তরাম আউলিয়া এবং মস্তরামের দাঁড়া সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, পদ্মার গতি পরিবর্তনের ফলে পূর্বে এক সময় এই স্থানটি মজিয়া যায় এবং দুইটি বিলের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিল দুইটির মাঝখানে মাটির একটি স্তূপ জমিয়া উঠে। সেই সময়ে এখানে মস্তরাম নামে একজন সিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব হয় এবং তিনি উক্ত স্তূপের উপর আস্তানা স্থাপন করিয়া সাধন-ভজন করিতেন। এই-ভাবে বহুদিন অতিবাহিত হইবার পরও লোকে তাঁহার মহিমা বুঝিতে না পারায়, একদিন রাত্রিতে তিনি এক আশ্চর্য্য ঐশী শক্তির পরিচয় দিয়া অলৌকিক উপায়ে রাতারাতি উক্ত স্তূপের একপাশে একটি ফুলের বাগান সৃষ্টি করেন এবং তাহার পাশ দিয়া খাল কাটিয়া দুইটি বিলের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া তিনি সেই রাত্রিতে নিরুদ্দেশ হইয়া যান। প্রভাতে লোকজন মাঠে আসিয়া ফকিরের অদ্ভুত শক্তির পরিচয় পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হন এবং তাঁহাকে খুঁজিতে থাকেন। কিন্তু তাঁহার কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। অতঃপর তিনি জনসাধারণকে স্বপ্নযোগে নিজের গুণাগুণ প্রকাশ করিয়া জানাইয়া দেন যে, কোন ব্যক্তি যদি দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁহার এই "দাঁড়ায়" কোন কিছু মানত করেন, তবে সেই ব্যক্তির মনোবাসনা নিশ্চয়ই পূরণ হইবে। সেই হইতে ফকির মস্তরামের সাধন স্থলটি "মস্তরামের দাঁড়া" নামে খ্যাত হয়। স্বপ্নাদেশের কথা প্রচারিত হইলে 'মস্তরামের দাঁড়ায়' মানত করিবার জন্য এখানে বহু ভক্তের সমাগম হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে উৎসব পালনের আয়োজন করা হয়।

মস্তরামের দাঁড়ার চারিপাশে স্থানীয় জমিদারের প্রায় চার বিঘা জমির উপর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার মেলাটি বসে। এই জেলার ডোমকল, জলঙ্গী, রাণীনগর এবং নদীয়া জেলার করিমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সব-সম্প্রদায়ের লোকের সমাগম হয়। দেশ-বিভাগের পূর্বে রাজশাহী প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও যাত্রী সমাগম হইত। প্রত্যেক মঙ্গলবার কমপক্ষে তিনি হাজার হইতে পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই ডোমকল, জলঙ্গী ও রাণীনগর বাজার হইতে আসেন। প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি দোকানপাট বসে এবং ফেরিওয়ালা আসেন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, ফলমূল, মনিহারী, বাসনকোসন, কবিরাজী, টোট্‌কা, বই-ছবি, তাঁতের কাপড়চোপড়, বাঁশের তৈয়ারী জিনিস-পত্র, মাটির খেলনা, হাঁড়িকুড়ি, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য জুয়া, লটারী ও কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তবে সাধারণতঃ প্রতি বৎসরই খেমটা গান হয়। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে খেমটা গানের দল আনা হয়। গ্রামেও একটি গানের দল আছে, অধিকারীর নাম, শ্রীসূর্যকান্ত মণ্ডল।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ নওদা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ আলমপুর। ৫।১,৩৪৬'১০।৩৮৯।১,৯৬৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। জেলা-বোর্ডের রাস্তা আছে। নিকটবর্তী পাটিকাবাড়ী গ্রাম হইতে প্রত্যহ বাস ও ভ্যানে যাতায়াত করা যায়। বর্ষাকালে নদীপথে নৌকাযোগে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে শ্যামা ও কার্তিক পূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও চড়কপূজা। উল্লিখিত উৎসবগুলি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন হইবে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) সম্প্রতি গ্রামে নাটমন্দিরসহ একটি পাকা দুর্গা মণ্ডপ নির্মাণ করা হইয়াছে।

শ্রীগোপীনাথ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
আলামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ সবদর নগর,
পোঃ পরেশনাথপুর, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ ত্রিমোহনী (মৌজা ঃ রমনা চাঁদপুর)। ৬।২,৫৭৫'৩৬।১,১৬৭।৬,৩০৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে ছয়টি পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। মোটরে যাতায়াত করা যায়। জলপথে নৌকাযোগে যাতায়াত করিবার ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) মুসলমান সম্প্রদায় চান্দ্রমাস অনুযায়ী ঈদল-ফেতর, ইদুজ্জোহা, মহরম ইত্যাদি পরব পালন করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের স্থানীয় মাদ্রাসার সাহায্যার্থে মাদ্রাসার জমিতে একটি সাপ্তাহিক হাট বসে। এই হাটে প্রায় তিন-চারহাজার লোকের সমাগম হয় এবং প্রায় একশত কুড়িখানা দোকানপাট ও ফেরিওয়ালা বসিয়া থাকে। স্থায়ী দোকানের সংখ্যা বার-তেরখানা। সাপ্তাহিক হাটের দিন যাত্রা থিয়েটার, কবিগান, জলসা, খেলাধুলা ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

পূর্বে ত্রিমোহনী গ্রামের নাম ছিল মনছুর নগর। এই গ্রামের নিকট দুইটি নদী একত্র হইয়া মোহনার সৃষ্টি হওয়ায় ইহার নাম হইয়াছে ত্রিমোহনী।

শ্রীকলিমুদ্দিন মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
ত্রিমোহনী জুনিয়ার মাদ্রাসা (প্রাথমিক বিভাগ),
পোঃ রমনা চাঁদপুর, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম ঃ ঝাউবোনা (মৌজাঃ রমনা চাঁদপুর)। ৬।২,৫৭৫'৩৬।১,১৬৭।৬,৩০৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কর্মকার, নাপিত, ময়রা, হাড়ি, বাগ্‌দী ধোপা, মুচি, শুঁড়ি, কলু ও মুসলমান।
গ্রামে পাড়া চারটি।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। গ্রাম হইতে আট মাইল দূরে একটি পাকা রাস্তা দিয়া স্টেশন পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন, শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে চার-পাঁচ রাত্রি বোলান গান হয়। প্রত্যেকটি উৎসবই বহুকালের

প্রাচীন। মনসাপূজা উপলক্ষে ঝাঁপান এবং দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা ও সরস্বতীপূজা উপলক্ষে থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দির ও তৎসহ ভোগ-মন্দির আছে। মন্দিরের তিন দিক বড় বড় বটগাছ এবং পাকুড় গাছ দ্বারা বেষ্টিত।

পূর্বে এই স্থান ঝাউবনে পরিপূর্ণ ছিল। ঝাউবন কাটিয়া গ্রামে পত্তন হইলে গ্রামের নাম হয় ঝাউবোনা।

শ্রীশ্যামাপদ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
ঝাউবোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রমনা চাঁদপুর, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : বালী।১০।৪,৩০২'২২।১,৩৮২।৮,১১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, ধোপা, কুমার, কামার, মুচি, নমঃশূদ্র, বাগ্দী, যোগী, ছুতার, তিলি, কলু, হাড়ি ও মুসলমান।

গ্রামে মোট সাতটি পাড়া আছে। মাহিষ্য পাড়া, ঘোষপাড়া, ব্রাহ্মণ পাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী। সাহেবনগর হইতে বালী পর্যন্ত জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। মোটর স্ট্যাণ্ড সাহেবনগর। গ্রামের পূর্বদিকে জলঙ্গী নদীতে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ধর্মরাজের প্রতীক একটি শিলাখণ্ড আছে।

শ্রীঅধীর কুমার বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
বালী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বালী—ভায়া-পলাশী, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : গোঘাটা।১২।১,৯৫৫'২৪।৬৭৪।৩,৭৩২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

পাড়া চারিটি।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্যজীবি। গ্রামে প্রায় বার-চৌদ্দ ঘর মুচির বসবাস আছে। তাহারা বেতের ধামা-কুলা, বাঁশের চ্যাঙ্গারী ও ঝুড়ি ইত্যাদি তৈয়ারী করিয়া জীবিকার্জন করে।

(গ) গ্রামের উত্তর দিকে প্রায় দুই মাইল দূরে পাটিকাবাড়ী হইতে মোটরবাসে করিয়া বেলডাঙ্গা রেল-স্টেশনে পৌছান যায়। ইহাভিন্ন, গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল নৌকাযোগে সাহেবনগরে আসিয়া সেখান হইতে আট মাইল মোটরবাসে করিয়া পলাশী রেলস্টেশনেও পৌছান যায়। গ্রামের পূর্ব ও উত্তর দিক দিয়া জেলাবোর্ডের দুইটি রাস্তা আছে। ঐ রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের বকর-ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের একটি যাত্রাদল প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে। এই উৎসবে প্রায় পাঁচ-ছয়শত লোকের সমাগম হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও দুটি পূজামণ্ডপ আছে।

শ্রীসুধীর কুমার রায়, প্রধান শিক্ষক,
গোঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ বালী, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : পরেশনাথপুর।
১৫।১,১৫০'৩০।২২৭।১,২০৯

(ক) মাহিষ্য, ব্রাহ্মণ, কলু ও ঋষিদাস।

পাড়া ছয়টি।

(খ) কৃষিজীবি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা হইতে আমতলা-পাটিকাবাড়ী সড়কের সহিত সংযুক্ত একটি জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

ইহাছাড়া, বহরমপুর হইতে বেলডাঙ্গা হইয়া আমতলা-পাটিকাবাড়ী সড়কে নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। কেবলমাত্র বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখী সংক্রান্তিতে রক্ষাকালীপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা।

দুর্গাপূজাটি ব্যক্তি বিশেষের এবং বাংলা ১২৫১ সন হইতে এই পূজা নিয়মিত চলিয়া আসিতেছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের বৃষারূঢ় মূর্তির পূজা ও তদুপলক্ষে গান, রক্ষাকালীপূজা উপলক্ষে কবিগান, যাত্রাভিনয় ইত্যাদি হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও কালীমন্দির এবং একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

পূর্বে এই অঞ্চলে পরেশ চন্দ্র রায়ের জমিদারী ছিল। সম্ভবতঃ তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম পরেশনাথপুর হইয়াছে।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস, শিক্ষক,
পরেশনাথপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পরেশনাথপুর, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম ঃ কল্যাণপুর (মৌজা ঃ রায়পুর)।
১৭।৩,৪৬২'১৪।৪৮৬।২,৪৬৪

(ক) হিন্দু।

পাড়া তিনটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা এবং মোটরস্ট্যাণ্ড আমতলা। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। কেবলমাত্র বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা। দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা উপলক্ষে যাত্রাভিনয় এবং কবিগান হইয়া থাকে। উল্লিখিত উৎসবগুলি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মন্দির আছে।

শ্রীগনপতি ঘোষাল, শিক্ষক,
গ্রাম ঃ জগাইপুর,
পোঃ আমতলা, মুর্শিদাবাদ

৮। গ্রাম ঃ তোকিয়া (মৌজা ঃ মধুপুর)।
১৮।৪,৪৭২'০৭।১,১১৭।৬,২৩২

(ক) মুসলমান।

পাড়া চারটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। লোকাল বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে জলঙ্গী নদীতে নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) ভোলা ও দেওয়ান পীরের উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে ভোলা ও দেওয়ান পীর দরগাহ আছে।

শ্রীরাম রঞ্জন কর্মকার, প্রধান শিক্ষক,
তোকিয়া-মধুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মধুপুর, মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম ঃ সাকুয়া। ২৮।৮৫৮'২৫।২৪১।১,২৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোপ, কুমার, ময়রা, মালো, বাইতি, মুচি, কামার ইত্যাদি।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটীরশিল্প।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। গ্রামের পশ্চিম দিকে পাকা রাস্তায় মোটরবাসে বেলডাঙ্গা স্টেশন এবং বহরমপুর যাওয়া যায়। গ্রামের উত্তর দিকে জলঙ্গী নদীতে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) বৈশাখে হরিবাসর মহোৎসব, শ্রাবণে মনসা পূজা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতী পূজা ও শিবপূজা এবং ফাল্গুনে দোল।

মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতিথির দুইদিন পরে সপ্তমী তিথিতে শিবপূজা হয়, গাজন উৎসবের ন্যায় অনেকে এই পূজায় শিবের ভক্ত হন এবং ভক্তগণ সঙ্ সাজিয়া গ্রাম পরিক্রমা করেন ও আগুন লইয়া নানাবিধ খেলা দেখান। মনসাপূজার সময় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সাপের ওঝারা সমবেত হইয়া সাপের মন্ত্র পাঠ করিয়া নানা রকম গান করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুর্গার এবং কালীর মন্দির আছে। ইহা-ভিন্ন, ব্যক্তি-বিশেষের যাদবরায় ও মদনমোহন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রায় একশত ত্রিশ বৎসর পূর্বে উক্ত বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নিত্যপূজা ব্যতীত উল্লিখিত বিগ্রহদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময় জন্মাষ্টমী, দোল এবং মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে কীর্তন, যাত্রাভিনয় ও ভোগ বিতরণ করা হয়।

গ্রামের উত্তরে হিন্দু পাড়ায় একটি প্রাচীন নিমগাছ আছে। কথিত আছে বহুকাল পূর্বে ঐ নিম-গাছের নীচে জনৈক সাধু বাস করিতেন এবং তিনি ঐ স্থানেই দেহরক্ষা করেন। এই কারণে অনেকেই ঐ স্থানটিকে পবিত্র জ্ঞান করেন এবং প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামবাসীরা ঐ নিমগাছের নীচে প্রদীপ ও মাটির পুতুল দিয়া পূজা দিয়া থাকেন।

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
সাকুয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আমতলা, মুর্শিদাবাদ।

১০। গ্রাম : বৃন্দাবনপুর (মৌজা : জগাইপুর)।
২৯।১৮,৪৯'৮৫।৪৭৮।২,৫২১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও মুসলমান।
পাড়া তিনটি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। গ্রাম হইতে ষোল মাইল দূরে ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া বেলডাঙ্গা হইয়া পাটিকাবাড়ী পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। ইহাভিন্ন, বর্ষাকালে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে হরিবাসর মহোৎসব, আশ্বিনে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে ব্যক্তি-বিশেষের বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় আঠারো বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে টালির চালাযুক্ত একটি ঘরে বাসন্তীপূজা হয়।

জগাইপুর মৌজায় জলঙ্গী নদীর তীরে মঠবাড়ী আশ্রমে একটি প্রাচীন মন্দির আছে। স্থানীয় গ্রামবাসীর মুখে শুনা যায়, এই মন্দিরটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন এবং পূর্বে এই মঠে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইত। বর্তমানে এই মন্দিরটিকে দুইটি বটগাছ এমন ভাবে আবৃত করিয়াছে যে দূর হইতে কেবলমাত্র বটগাছই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে দেবানন্দ নামক জনৈক সাধু এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে এই আশ্রমে দূর-দূরান্তর হইতে প্রায় দুই-তিন হাজার ভক্তের সমাগম হয়। উৎসবের দিন হরিনাম সংকীর্তন এবং সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। ইহাভিন্ন, প্রতি শনি এবং মঙ্গলবার বহুলোক মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। বর্তমানে গাছটির কিছু অংশ রাস্তার উপর পড়িয়াছে; কিন্তু কেহই গাছটি কাটিতে সাহসী হন নাই, কারণ জনশ্রুতি আছে যে, একবার কোন এক ব্যক্তি উক্ত গাছের ডাল কাটায় তিনি নাকি সপরিবারে ধ্বংস হইয়া যান।

শ্রীভুজঙ্গ ভূষণ ভট্টাচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম : জগাইপুর,
পোঃ আমতলা, মুর্শিদাবাদ।

১১। গ্রাম : পাটিকাবাড়ী।

৩৬।১,৪১৭'৬৬।৮৮৩৩।৪,৩৬২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

পাড়া চৌদ্দটি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী ও বেলডাঙ্গা। বেলডাঙ্গা-রাধানগর ঘাট রোড দিয়া নিয়মিত মোটর-বাস চলাচল করে। গোঘাটা হইতে সাহেবনগর পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আষাঢ়ে রথযাত্রা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, ফাল্গুনে চব্বিশপ্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তন এবং শঙ্কর সোম বাবাজীর তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায় ঈদ, বকর ঈদ প্রভৃতি উৎসব পালন করেন। বকর ঈদে গরু কোরবানি হয়। দুর্গা ও কালী পূজায় পাঠা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ)

(চ)

শ্রী এম. এম. রহমতুল্লা, চাকুরী,

গ্রাম ও পোঃ মহম্মদপুর,

মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : নওদা

উৎসব বিবরণী

আর্বিভাব ও তিরোভাব উৎসব
(ভোলা ও দেওয়ান পীর)

তোকিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে প্রতি বৃহস্পতিবার ভোলা এবং দেওয়ান নামক পীরদ্বয়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে উক্ত পীরদ্বয়ের দরগাহ আছে এবং ঐ দরগাহতেই উৎসব পালন করা হয়। এই পীরদ্বয় সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামে ভোলা ও দেওয়ান নামক দুই মুসলমান ভ্রাতা বাস করিতেন। ভোলা ছিলেন সাধক এবং দেওয়ান ছিলেন অতি সৎ প্রকৃতির ব্যক্তি। তাঁহারা উভয়েই কৃষিকার্যের দ্বারা জীবনধারণ করিতেন। ভোলা দেহরক্ষা করিলে তাঁহাকে এই গ্রামেই কবর দেওয়া হয় এবং পরে দেওয়ান দেহরক্ষা করিলে তাঁহাকেও ভোলার কবরের পাশেই সমাধিস্থ করা হয়। তখন হইতে ঐ স্থানটি "ভোলা-দেওয়ান"-এর দরগাহ নামে পরিচিত হইয়াছে। বর্তমানে ঐ কবর দুইটির উপর একটি পাকা গৃহ নির্মাণ করা হইয়াছে।

ভোলা ও দেওয়ান ভ্রাতৃদ্বয় সম্পর্কে গ্রামে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, ভোলা নাকি গ্রামের পার্শ্ববর্তী জলঙ্গী নদীতে প্রত্যহ স্নান করিবার সময় পেটের ভিতর হইতে নাড়ীভুঁড়ি বাহির করিয়া পরিষ্কার করিতেন। হঠাৎ একদিন কয়েকজন ব্যক্তি উহা দেখিয়া ফেলেন এবং এই কথা প্রচারিত হইলে সকলের বিশ্বাস জন্মে যে, ভোলা একজন শক্তিধর সাধক। তখন হইতে গ্রামবাসী অনেকেই তাঁহাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে থাকেন।

আরো শোনা যায়, একবার দুই ভাই একটি জমিতে গম চাষ করিয়াছিলেন। গম ফলিলেই পাখীরা গম খাইয়া নষ্ট করিত। এই কারণে বড় ভাই দেওয়ান ছোট ভোলাকে পাখী তাড়াইবার জন্য মাঠে পাঠাইতেন। কিন্তু ভোলা পাখী না তাড়াইয়া বরং পাখীদের সুবিধার জন্য ঠোঙ্গায় জল আনিয়া খাওয়াইতেন। ফলে পাখীতে প্রায় সব গম খাইয়া ফেলিল। গম কাটা হইলে উহা ওজন করিয়া মাত্র চারি "মন" হইল। পরে ভোলা সেই গম মাপিতে বসিলে উহা অপ্রত্যাশিতভাবে চারিশত মন হইল, তথাপি গম ফুরাইল না। তখন অবশিষ্ট গম অন্য একজন ব্যক্তি মাপিতে বসিলে উহা চারি মন মাপিতেই শেষ হইয়া গেল। এইরূপ আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়া সকলেই ভোলাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

অগ্রহায়ণ মাসে উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের প্রায় চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু স্ত্রীলোক ভোলা-দেওয়ানের দরগাহে মানত পূজাদি দিতে আসেন এবং এই স্থানে বসিয়া সমবেত ভাবে নিজেরা খাওয়া-দাওয়া করেন। প্রধানতঃ পীরের দরগাহে খাদ্যদ্রব্যই মানত দেওয়া হয়। মানতের ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য পীরের বংশধরেরা উপস্থিত গ্রামের বালক-বালিকাদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন। উৎসবটি প্রাচীন।

(শঙ্কর সোম বাবাজী)

পাটিকাবাড়ী গ্রামে শঙ্কর সোম বাবাজী নামে জনৈক বৈষ্ণব সাধকের তিরোধান উপলক্ষে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে বামন দ্বাদশী তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন। গ্রামে তাঁহার সমাধি স্থানে প্রতি বৎসর উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণবের সমাগম হয় এবং দরিদ্রভোজনের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কল্যাণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে কয়েকজন ভক্ত সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাজনসহ নৃত্য-গীত করিয়া গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ান। চড়ক উপলক্ষে "এঁড়ে পূজা" নামে একটি পূজা হয়। একটি বড় কঞ্চি, দুইটি বেল, একটি নিমগাছের ডাল ও আকন্দফুলের মালা দ্বারা এই পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চড়ক উপলক্ষে ফুলখেলা, বাণফোঁড়া প্রভৃতি

অনুষ্ঠান ও বোলান গান হয়। উৎসবটি ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

ধর্মরাজপূজা

বালী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় সাড়ম্বরে ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন। একটি বৃহৎ সিন্দুর লিপ্ত পাথরখণ্ডকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করা হয়। উৎসব উপলক্ষে পূর্ণিমার পূর্ব দিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে কয়েকজন ভক্ত সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন এবং ধর্মরাজ তলায় শিবলিঙ্গ পূজা করিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া নৃত্য-গীত করিয়া বেড়ান। নৃত্য-গীতকালে গৃহস্থদের বাড়ী হইতে তাঁহারা কিছু কিছু চাউল ও পয়সা আদায় করেন। পূর্ণিমার দিন খুব ধুমধামের সহিত ধর্মরাজের পূজা হয়। যে-কোন ব্যক্তিই ধর্মরাজপূজায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন; তবে এই স্থানে প্রধানতঃ গোয়ালা সম্প্রদায় সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। পূজার প্রধান সেবায়েত বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত, তবে ধর্মরাজেরপূজা করেন রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। পূজারীর পদবী চট্টোপাধ্যায় এবং কাশ্যপ গোত্র।

ধর্মরাজের নিকট মানতের ছাগল-ভেড়াগুলিকে প্রথমে স্নান করাইয়া মেলার দোকানগুলি হইতে ফল-মূল-সন্দেশ খাইয়া পূজা মণ্ডপে লইয়া আসা হয় এবং ধর্মরাজের নামে উৎসর্গ করিয়া ঐসকল পশু গুলিকে বলি দেওয়া হয়।

মহোৎসব

ঝাউবোনা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টমপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয়। এই উৎসবে প্রায় পাঁচহাজার লোকের সমাগম হয়। প্রতি বৎসর গ্রামের পাঁচটি দল ছাড়াও অন্যান্য গ্রাম হইতে প্রায় দশ-বারটি হরিনাম সংকীর্তনের দলকে আমন্ত্রণ করা হয়। ঐ দিন গ্রাম হইতে প্রায় দশ-বার মন চাউলের অন্নভোগ বিতরণ করা হয়।

উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ নওদা

মেলা বিবরণী

দুর্গাপূজার মেলা

আলমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে দেবীর মন্দিরসংলগ্ন প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা পরিমাণ জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী ঝাউবোনা, গোবিন্দপুর, ত্রিমোহিনী ইত্যাদি গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে, সাইকেলে, নৌকায় এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বেলডাঙ্গা, ঝাউবোনা ইত্যাদি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। পঞ্চাশ-ষাটটির মত দোকানপাট বসে। ঐ দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কাপড়-চোপড়, শিল্পসামগ্রী ও কয়েকটি পানবিড়ির দোকানও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, কবিগান, কীর্তন গান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া খেলা চলে। গানের দল সাধারণতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আনা হয়। শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা আনুমানিক পাঁচ সাত শত হইবে।

ধর্মরাজপূজার মেলা

বালী গ্রামে হাটপাড়া নামক স্থানে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ ঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী সাহেবনগর, টুঙ্গি, গোপীনাথপুর, ডাকাতিয়া, মোতা, পাটিকাবাড়ী, চাঁদপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই তিনহাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ সাইকেলে, গরুগাড়ীতে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল যেমন, টুঙ্গি, পাটিকাবাড়ী, গোঘাটা, চাঁদপুর, সাহেবনগর, পাঁচপাড়া, পলাশী ইত্যাদি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্নের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, মনিহারী, বই-ছবি, ঔষধপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী নানা রকম জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি, পুতুল এবং কয়েকটি ফলমূলের দোকানও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় বোলান গানের ব্যবস্থা করা হয়। এই গানের দলগুলি প্রধানতঃ টুঙ্গি, সবাগপুর হইতে আসে। গ্রামেই একটি দল আছে; দুই-তিনটি কীর্তনের দল অন্য গ্রাম হইতে আসে। এই অনুষ্ঠানে বহু শ্রোতার সমাবেশ হয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ হরিহরপাড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : রায়পুর।৯।১,৪৩৭·৮২।৩৩৮।১,৮৬৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের দশ মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেলষ্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটর-বাসে মিঞার বাগানে নামিয়া সেখান হইতে উত্তরে তিন মাইল হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও ফাল্গুনে শিবরাত্রি উৎসব। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ, বকরঈদ ও মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি মসজিদ আছে।

রায়পুর গ্রামের দুই মাইল পূর্বে হোসেনপুর (মৌজাঃ নং ৩৪) গ্রামে একটি প্রাচীন মসজিদ এবং উহার সন্নিকটে একটি শিবমন্দির আছে। প্রতি শুক্রবার আশেপাশের দশ-বারো মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু মুসলমান ঐ মসজিদ্-এ সমবেত হইয়া নমাজ পড়েন। অনেকে মানত হিসাবে মসজিদ-এ সিন্নি ও ছাগ বলি দিয়া থাকেন।

শিবমন্দিরটিতে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে আট-দশটি খাবারের দোকান বসে এবং কবিগানের আয়োজন করা হয়।

শ্রীনরুল হক সরকার, প্রধান শিক্ষক,
রায়পুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বারুই পাড়া, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : নিশ্চিন্তপুর (মৌজাঃ কিসমৎ ইমাদপুর)।১৭।৪,০৬৪·৬৬।১,০৬৫।৫,৬৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈষ্ণব, নাপিত, কামার, ছুতার, ময়রা, স্বর্ণকার ইত্যাদি।

গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট। গ্রাম হইতে এক মাইল উত্তরে বহরমপুর-পাটিকাবাড়ী রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার সর্বজনীন কালীপূজা। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। কালীপূজা উপলক্ষে হরিনাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। জ্যৈষ্ঠে সর্বজনীন সর্বমঙ্গলাপূজা, ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিপদ হইতে শুরু করিয়া ছয়দিন পূজা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আশ্বিনে দুর্গাপূজা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। প্রতি বৎসর ১৫ই মাঘ বৈদ্যনাথ পূজা। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। এই স্থান হইতে বাবা বৈদ্যনাথের নামে শূলের ঔষধ বিতরণ করা হয়। উৎসবের সময় সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা হইয়া থাকে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

সর্বমঙ্গলাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে ছয়দিন-ব্যাপী। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ ও সর্বমঙ্গলার পাকা মন্দির আছে। সর্বমঙ্গলার মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নপ্রায়। একটি বট গাছের নীচে কালীর নির্দিষ্ট বেদী এবং একটি পঞ্চবট মূলে "বাবার" (বৈদ্যনাথ শিবের) স্থান আছে। ইহাভিন্ন, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, শীতলা মনসা প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীহৃষীকেশ মণ্ডল, শিক্ষক,
নিশ্চিন্দপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বারুইপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : রুকুনপুর।৩০।৫,৭৫২'০৩।১,১৩০।৬,৪০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, তাঁতী, কৈবর্ত, নাপিত, মাহিষ্য, চণ্ডাল, হাড়ি, তিলি, হাজরা, মুচি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের বারো মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেলষ্টেশন হইতে মোটরবাসে হরিহরপুর আসিয়া, সেখান হইতে হরিহরপুর প্রতাপপুর ঘাট রোড ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার কালীপূজা, পৌষ মাসে পৌষালী উৎসব এবং চৈত্র মাসে বাসন্তী ও অন্নপূর্ণাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। কালীপূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের এবং বাসন্তীপূজাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। অন্নপূর্ণাপূজাটি মাত্র গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

পৌষালী উৎসবের মেলা। পৌষ মাসে একদিন।

বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

অন্নপূর্ণাপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে কালী ও বাসন্তীদেবীর পাকা মন্দির এবং অন্নপূর্ণাপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। তবে ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলেরা মহামারীতে জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। বর্তমানে আশেপাশের গ্রাম হইতে কিছু কিছু লোক আসিয়া এই গ্রামে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু শেখর বিশ্বাস, শিক্ষক,
শ্রীঅতুল চন্দ্র বিশ্বাস, শিক্ষক,
শ্রীঅরবিন্দ বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম : গুরুদাসপুর, পোঃ বিহারিয়া,
এবং
শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র বসু, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ হরিহরপুর, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : রামকৃষ্ণপুর।৩১।৪৮৪৭০।২০৪।১,১০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, পুণ্ড্রী, জেলে, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ষোল মাইল পশ্চিমে বহরমপুর কোর্ট রেলষ্টেশন। মোটরবাসে ও নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। মাহিষ্য সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বকুল গাছের নীচে কালীর বেদী এবং শিব ও শীতলার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীমহম্মদনসীমুদ্দিন, শিক্ষক,
তেকোনা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ ভবতিপুর, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : স্বরূপপুর।৫৪।৯২৭৭১।৬৯৮।৩,৮০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি, কুরি, নাপিত, মালো, ডোম, বৈরাগী, গোয়ালা, মুচি, ধোপা, কামার, পাটনী, পুণ্ড্রী, স্বর্ণকার, কলু, সর্দার, জোলা ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন বহরমপুর কোর্ট হইতে মোটরবাসে ও সাইকেল রিক্সায় এবং বর্ষাকালে নৌকা-যোগে গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আষাঢ়ে রথযাত্রা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী-পূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে দোলযাত্রা এবং চৈত্রে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। কার্তিকপূজার মেলা। কার্তিক মাসে কুড়ি-দিনব্যাপী। মেলাটি দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটী দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীবংশীবদন বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
আলিলাবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ স্বরূপপুর, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : হরিহরপাড়া

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

রুকুনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার একটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি একশত পঁচিশ হইতে দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। গ্রামের দক্ষিণে একটি পাকা মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তর-খণ্ডকে কালী জ্ঞানে পূজা করা হয়। ইহাভিন্ন, মন্দিরে দেবীর ভৈরব শিবলিঙ্গ এবং মহামায়া, কালিকা, চতুর্ভুজ নারায়ণ ও গণেশের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লিখিত দেবদেবীসহ কালীর নিত্য পূজা হয়। কালীমন্দিরটি একটি সাধারণ ঘর মাত্র। উহার দক্ষিণে প্রবেশ দ্বারা এবং সম্মুখে বারান্দা আছে। মন্দিরটি সংস্কার অভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

বৈশাখ মাসে উৎসবের সময় দেবীর বিশেষ পূজাদি হয় এবং এই সময় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম ও সীমান্তবর্তী বীরভূম ও নদীয়া জেলা হইতে বহু নরনারী মন্দিরে মানত পূজাদি দিতে আসেন। মানত হিসাবে প্রধানতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, টাকা-পয়সা, কাপড়, দুধ ও পাঠা বলি দেওয়া হয়। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ।

দোলযাত্রা

স্বরূপপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্রীমৎ নিত্যানন্দ গোস্বামী ও শ্রীমৎ ভবানন্দ গোস্বামীর পিতামহ মথুরা নাথ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দ, শ্যাম, বলরাম, নারায়ণ ও রাধাবিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত বিগ্রহগুলি নিমকাঠের তৈয়ারী।

উৎসব উপলক্ষে যথারীতি ভোগ-পূজা এবং হরিনাম সংকীর্তন ও ভাগবত চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করা হয়। উৎসবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীগণ ও আশেপাশের গ্রাম হইতে ভক্তদের সমাগম হয়।

পৌষ মাসে গ্রামবাসীরা জমির নূতন ফসল গোবিন্দের নিকট উৎসর্গ করিয়া পরে গ্রামের সকলে মিলিয়া নবান্ন উৎসব পালন করেন।

পৌষালী উৎসব

রুকুনপুর গ্রামে "ন্যাংটাতলা" নামে একটি স্থান আছে। গ্রামবাসীরা ঐ স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া মনে করেন। জানা যায়, প্রায় আড়াইশত হইতে তিনশত বৎসর পূর্বে জনৈক ন্যাংটা অর্থাৎ দিগম্বর সাধু এই স্থানে বাস করিতেন, সেই কারণে স্থানটির নাম হইয়াছে ন্যাংটাতলা। প্রায় তিন বিঘা উঁচু জমির উপর এই স্থানটি অবস্থিত এবং ঐ স্থানে মাটির দেওয়াল এবং খড়ের ছাউনীযুক্ত একটি ঘর ও তৎসংলগ্ন একটি বড় ইন্দারা ও একটি ছোট পুকুরের পাড়ে আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, কুল ইত্যাদি ফল ও কৃষ্ণচূড়া ও অন্যান্য ফুলের গাছ আছে। ইহাভিন্ন, একটি প্রাচীন বৃহৎ বটগাছ আছে—গাছটি ন্যাংটা সাধু রোপন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

ন্যাংটাতলার মাহাত্ম্য সম্পর্কে গ্রামে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। লোকের বিশ্বাস, ন্যাংটাতলার মহান্তের বিনা অনুমতিতে যদি কেহ ঐ স্থানের কোন জিনিস গ্রহণ করেন তবে তাঁহার সমূহ ক্ষতি হয়। শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে ভিন্ন গ্রামের জনৈক গরু বিক্রেতা নিজ গ্রামে ফিরিবার কালে গরু বাছুর লইয়া রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে এই স্থানের একটি গাছতলায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং রান্না করিবার উদ্দেশ্যে ন্যাংটাতলার গাছের শুষ্ক ডাল ভাঙ্গিয়া আগুন জালাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাত অবশ হইয়া যায়। পরে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে এই স্থান মাহাত্ম্যের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার অজ্ঞাত ভুলের জন্য ত্রুটি স্বীকার করেন এবং ভক্তি সংকারে মানত পূজা দিবার কয়েকদিন পর সুস্থ হইয়া উঠেন।

আরো শোনা যায় যে, একবার একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকের হঠাৎ বাক্ রোধ হইয়া যায়। নানাবিধ চিকিৎসায় ব্যর্থ হইবার পর তিনি ন্যাংটাতলায় আসিয়া ধন্না দেন এবং চারদিন পর দৈব শক্তির প্রভাবে পুনরায় বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পান।

এই স্থানের মাহাত্ম্য সম্পর্কে সাধারণ লোকের বিশ্বাস এতই দৃঢ় যে, সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় ত্রাণ বিভাগ কর্তৃক একটি রাস্তা নির্মাণকালে উক্ত ন্যাংটাতলার একটি বটগাছের কয়েকটি ডাল কাটিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু স্থানীয় মজুরেরা ঐ গাছের ডাল কাটিতে অস্বীকার করে।

প্রায় প্রতিদিনই আশেপাশের গ্রাম হইতে ভক্তরা এই স্থানে আসিয়া হরিনাম সংকীর্তন করেন এবং মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। গ্রামবাসী কাহারও নূতন গাছে প্রথম ফল ধরিলে বা কাহারও গরু প্রথম দুধ দিলে তাহা প্রথমে ন্যাংটাতলায় দিয়া পরে ঐ সকল জিনিস নিজেরা গ্রহণ করেন। প্রায় প্রতিদিনই কেহ না কেহ এই স্থানে চাউল-ডাল ইত্যাদি দিয়া যান। ঐ সকল খাদ্যদ্রব্য সারা বৎসর সঞ্চিত করিয়া প্রতি পৌষ মাসে পৌষালী উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবে প্রায় তিন-চারশত লোকের সমাগম হয় এবং নানা স্থান হইতে বহু সাধু-সন্ত আসিয়া নামসংকীর্তন করেন। পরে সর্বজনীন ভোজ হয়।

ন্যাংটা সাধুর দেহরক্ষা করিবার পর হইতে পর পর কয়েকজন সাধু এই স্থানে মহান্তরূপে বাস করেন। বর্তমান মহান্ত জটাধারী নামে জনৈক সাধু। তিনি এই অঞ্চলেরই লোক এবং প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবত এই স্থানে মহান্তরূপে আছেন। মহান্তেরা সাধারণতঃ ভিক্ষাজীবি।

স্বরূপপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষপার্বণ উপলক্ষে বিশেষ আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। উৎসবের দিন নূতন ধানের আতপ চালের গুড়া দিয়া প্রতিটি পরিবার রকমারী পিঠা-পুলি তৈয়ারী করেন। ঐ সকল পিঠা-পুলি প্রথমে পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া পরে নিজেরা গ্রহণ করেন ও আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে বিতরণ করেন। উৎসবের পরের দিন সকালে চাষী ও রাখাল বালকগণ নানারূপ ছড়া কাটিয়া প্রতি বাড়ী হইতে কিছু কিছু চাউল-ডাল ও পিঠা-পুলি সংগ্রহ করিয়া মহাসমারোহে বনভোজন করিয়া থাকেন।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ হরিহরপাড়া

মেলা বিবরণী

অন্নপূর্ণাপূজার মেলা

রুকুনপুর গ্রামে চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজা উপলক্ষে পূজাপ্রাঙ্গণে সাধারণের প্রায় চার কাঠা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পাচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন চারশত যাত্রী দৈনিক আসেন। যাত্রীরা প্রধানতঃ গো মহিষের গাড়ীতে ও হাটিয়া মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বিহারিয়া, মাজ্দপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে দশ-বারটি দোকানপাট ব্যতীত খোলা জায়গায় আরো কতকগুলি ছোট আকারের দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও বাসনকোসন এবং তৈয়ারী জামাকাপড়ের দোকান-পাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাগান, কবিগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই গানের দল আছে।

কালীপূজার মেলা

রামকৃষ্ণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালী-পূজা উপলক্ষে কালীদেবীর নির্দিষ্ট বেদী সংলগ্ন প্রায় পাচ-ছয় বিঘা জমির উপর এক সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ হরিহরপাড়া, ডোমকল, বহরমপুর, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটর গাড়ী, সাইকেল, গরুর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী এবং নৌকাযোগে আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বহরমপুর, কাশিমবাজার, লালবাগ, বেলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। উল্লিখিত দোকান পাটের মধ্যে অধিকাংশই মিষ্টান্ন, মনিহারী, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় ইত্যাদির দোকান। তাহাছাড়া, বই-ছবি এবং শিল্পসামগ্রীর কয়েকটি দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী, জুয়া, কবিগান, আলকাপ গান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ যাত্রাগানের দল হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত বড়ান ও নিশ্চিন্তপুর গ্রাম হইতে এবং কবিগান ও আলকাপ গানের দল কান্দী, জঙ্গীপুর এবং লালবাগ হইতে আনা হয়।

রুকুনপুর গ্রামে কালীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শনি-মঙ্গলবার দেবীর মন্দির সংলগ্ন স্থানে, জেলাবোর্ডের রাস্তার দুই ধারে এবং খাস মহলের জমিতে —মোট প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত হইতে সওয়াশত বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত মেলায় লোক সমাগম হয়।

মেলায় মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানা হইতে, এমন কি নদীয়া ও বীরভূম জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিনহাজার নরনারীর সমাগম হয়। দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটরবাস এবং গরুর গাড়ীতে করিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ মুর্শিদাবাদ ব্যতীত সীমান্তবর্তী অন্যান্য জেলা হইতেও প্রতি বৎসর আসেন। প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং ফেরিওয়ালা আসেন প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড় প্রভৃতির দোকানই

বেশী। তাহাছাড়া, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ও শিল্পসামগ্রীর কয়েকটি দোকানপাটও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

নিশ্চিন্তপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার কালীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন দেবোত্তর জমিতে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে, সাইকেলে এবং হাটিয়া আসেন। মেলায় খাবার, মনিহারী, বই ছবি প্রভৃতির কয়েকটি মাত্র দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় কীর্তন গানের আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে স্বরূপপুর গ্রামের মধ্যস্থলে ভগবতীদেবীর প্রাচীন মন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর রথযাত্রা ও পুনঃযাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের ডাম্পপাড়া, লোচনমাটী, জয়কৃষ্ণপুর, ধারনামপুর, শিবনগর, সুন্দলপুর, রেজলাপাড়া, তরতিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড়হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় অর্ধেক। সাধারণতঃ গরুর গাড়ী এবং সাইকেল করিয়া যাত্রীরা আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ ধরমপুর, হরিহরপাড়া, তরতিপুর, ভগীরথপুর ও সাহাজাদপুর হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং বেশ কিছু সংখ্যক ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, কবিরাজী ঔষধপত্র, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, শোলার তৈয়ারী খেলনা, মাটির পুতুল, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, মাটির হাড়িকুড়ি এবং কাঠের তৈয়ারী নানাপ্রকার জিনিসপত্র ইত্যাদি আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য বেহুলার ভাসান গান, আলকাপ গান, কবি, পাঁচালী ও ছড়াগানের ব্যবস্থা করা হয়। ভাসানগান দলের অধিকারীর নাম—শ্রীগৌর সুন্দর সাহা এবং কৃষ্ণযাত্রাদলের অধিকারীর নাম—শ্রীক্ষেপু সাহা। সকলেই স্বরূপপুর গ্রাম নিবাসী।

বাসন্তীপূজার মেলা

কৃষ্ণপুর গ্রামে চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপের সম্মুখে দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং চারদিনব্যাপী চলে।

মেলায় আশেপাশের কেবলরামপুর, মাগুরা, ঝাঁঝা, মামুদপুর, হুমাইপুর, বিহারিয়া, গুরুদাসপুর, গোবিন্দপুর, কাঞ্চননগর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় এক হাজার যাত্রী আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বেলডাঙ্গা, বিহারিয়া এবং কালীতলা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় খোলা জায়গায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে; এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার, কাঁচ, লোহা ও মাটির জিনিসপত্র, মনিহারী, বই-ছবি ইত্যাদি দোকানের সংখ্যাও অধিক। তাহাছাড়া, অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগানের ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। আশেপাশের গ্রাম হইতে গানের দল আনা হয়। গ্রামেও গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীগোবিন্দ মণ্ডল, গ্রাম : সোনাডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

সর্বমঙ্গলাপূজার মেলা

নিশ্চিন্তপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে সর্বমঙ্গলাদেবীর পূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দুইবিঘা জমির উপর ছয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের বহরমপুর, নওদা, রেজীনগর, ডোমকল, বেলডাঙ্গা ইত্যাদি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রী সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে, সাইকেলে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর প্রধানতঃ বহরমপুর, বেলডাঙ্গা এবং হরিহরপাড়া হইতে আসেন। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। তাহাছাড়া, প্রায় পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড় ইত্যাদির দোকানের সংখ্যাই অধিক।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য বোলান গানের ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীবিরিঞ্চি কুমার মণ্ডল। গ্রাম : নিশ্চিন্তপুর, পোঃ বারুই পাড়া।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ বেলডাঙ্গা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ মহলা।৩।২,৩৫৯·৬৪।৭৩৫।৪,৬২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, গোয়ালা, কামার ও নাপিত।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের ভাবতা এবং পূর্ব ভারতীয় রেলপথে সারগাছি—এই উভয় রেলষ্টেশন হইতেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ১লা জ্যৈষ্ঠ নাম সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা এবং ১লা মাঘ উত্তরায়ণ সংক্রান্তি উপলক্ষে পুণ্য গঙ্গাস্নান। মহোৎসবটি বাংলা ১২৮০-৮২ সনে আরম্ভ হইয়াছিল বলিয়া শুনা যায়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি পঁচিশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রাম সম্পর্কে শোনা যায় যে, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত রাজা বসন্ত রায় কয়েকজন ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও জ্যোতিষীসহ মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি-চাঁদপাড়ার দক্ষিণ-পূর্বে এই স্থানটিতে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। উক্ত বসতি অর্থাৎ বসন্ত রায়-এর মহল্লা হইতে গ্রামটির নাম মহলা হইয়াছে।

গ্রামের নিকট দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত। গঙ্গার ভাঙ্গনে ও বারবার গতি পরিবর্তনের ফলে প্রাচীন মহলা গ্রামের আকৃতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। গ্রামের সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক ঐতিহ্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্বে এই স্থানে পঁচিশ-ত্রিশটি চতুষ্পাঠীতে বহু পণ্ডিত ও ছাত্র সংস্কৃত অধ্যয়ন ও শাস্ত্রালোচনা করিতেন। অনেকে অনুমান করেন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের আমলেই গ্রামটির পত্তন হয়। রাজা শশাঙ্কের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ এই গ্রামের নিকট বর্তমান রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়ায় অবস্থিত।

শ্রীপ্রশান্ত কান্ত সেনগুপ্ত, শিক্ষক,
শ্রীঅহিভূষণ মণ্ডল, শিক্ষক,
রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ সারগাছি, পোঃ মহলা, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ ভাবতা।৭।১,৭৭০·৪৭।৬৭৮।৪,২৮৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বাগ্দী, কুমার, গোয়ালা, ধোপা, স্বর্ণকার ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের একটি ষ্টেশন আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে নাম সংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, গ্রামে গণেশপূজা হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন মেলাটি সাতষট্টি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অচিনেশ্বরী কালী আছে।

শ্রীজগন্নাথ সাহা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ভাবতা,
মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম ঃ নওদা।১৫।১,৪৭৪·০৪।৫৮৯।৩,৭৩২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পাড়া ছয়টি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সারগাছি। জেলাবোর্ডের ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া বাসে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা। রথযাত্রা উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসার স্থান এবং একটি শিবলিঙ্গ ও শিবমূর্তি আছে।

শ্রীমহম্মদ মহসীন, প্রধান শিক্ষক,
দেবপুর নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ পুলিন্দা, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : দলুয়া ।২৭।৬৮৯০২ ।৩০০।১,৮৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, মালি, গন্ধবণিক, নাপিত, বাগ্দী, হাড়ি, যুগী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য এবং পশুপালন।

(গ) বেলডাঙ্গা ও ভাবতা—এই উভয় রেলষ্টেশন হইতেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রাম হইতে এক মাইল পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ-কৃষ্ণনগর রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে সিংহবাহিনীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে যশাইপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কুলাইচণ্ডীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপূজা। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, চেহলাম ও ইদ্-উল-ফেতর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামে একটি বেলগাছের নীচে যশাইদেবীর নির্দিষ্ট বাঁধান স্থান আছে। বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজার পূর্বে যে-কোন শনি কিংবা মঙ্গলবার উক্ত বেলগাছটির মূলে দুধ ও গঙ্গাজল ঢালিয়া দশোপচারে যশাইদেবীর পূজা করা হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মহরমের মেলা। একদিন।

চেহলাম পরবের মেলা। একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সিংহবাহিনীদেবীর মন্দির, ধর্মরাজ-মন্দির, লক্ষ্মীমন্দির, শিবমন্দির এবং মনসামণ্ডপ আছে। ইহা ব্যতীত, যশাইতলা, কুলাইচণ্ডীতলা এবং মহরম পরবের জন্য চরাতলা নামে একটি স্থান আছে।

এই গ্রামে বসবাসকারী সিংহ বংশের পূর্ব-পুরুষগণ গ্রামটির পত্তন করেন। তাঁহারা বাংলার শেষ নবাব সরকারের অধীনে কাজ করিতেন, তৎকালে তাঁহারা জিয়াগঞ্জ থানার বালুচরের থানাই-পাড়া নামক স্থানে বাস করিতেন। পরে কুলদেবী সিংহবাহিনীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া তাঁহারা কতিপয় ব্রাহ্মণ, কর্মকার, নাপিত, গন্ধবণিক, হাড়ি ও মুসলমান পরিবারসহ এই স্থানে আসিয়া গ্রাম পত্তন ও বসবাস আরম্ভ করেন। তখন দলুয়া দেউলখণ্ড নামে পরিচিত ছিল। সিংহবাবুরা তদানীন্তন নবাবের নিকট হইতে দলুয়া, ঝুনকা, রামেশ্বরপুর, নলকুণ্ডা ও খোরদিকাপাড়া —এই পাঁচটি মৌজা দান স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন।

শ্রীআবদুল রহমান,
গ্রামঃ দলুয়া, পোঃ দেবকুণ্ড,
মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : নলকুণ্ড ।২৯।২৩৫০৭।১৭৫।৯৪৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে ভাবতা রেল-স্টেশন এবং এক মাইল দূরে কৃষ্ণনগর-বহরমপুর রোড দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্যে যাতা-য়াতের জন্য জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন। ইহা ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) একটি পাকুর গাছের নীচে শিবের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

দলুয়া গ্রামের সিংহ পরিবার এই গ্রামটি পত্তন করেন। শোনা যায়, গ্রামে বসতি স্থাপনের পূর্বে ঘন নলবনে পরিপূর্ণ ছিল; সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রামটির নাম নলকুণ্ড হইয়াছে।

শ্রীঅজিত কুমার দত্ত রায়, শিক্ষক,
নলকুণ্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রামেশ্বরপুর, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম: বেনাদহ (মৌজা: মাড্ডা)।
৫০।১,৬৪৭·১৯।৫৯৫।৫,০০১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, পশুপালন, কারুশিল্প ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে বেলডাঙ্গা রেলস্টেশন হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে নন্দোৎসব ও জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে লক্ষ্মীপূজা ও পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিব-দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা চৈত্রকাপ বা হোম উৎসব নামে খ্যাত। ইহাভিন্ন, গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় মহরম উৎসব পালন করেন। দুর্গা ও কালীপূজা ব্যতীত উল্লিখিত অন্যান্য উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবের দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শোনা যায় যে, পূর্বে এই স্থানটি গভীর বেনাবনে পরিপূর্ণ ছিল। আশেপাশের অঞ্চলের লোকেরা এই স্থানে বেনা খড় কাটিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ এই স্থানটি বসবাসের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া সপরিবারে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইভাবে গ্রামটির সৃষ্টি হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন দহ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রামটির নাম বেনাদহ হইয়াছে। গ্রামটি বণিক ও শিল্প-ব্যবসায় সমৃদ্ধ।

গঙ্গার একটি শাখা গঙ্গাপুর, ভাবতা ও ভাদু গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বেনাদহ ও হালাইপুরের পূর্ব দিক দিয়া বহিয়া কান্তারদহ বিলে পড়িয়াছে। এই শাখানদীর ধারে বেনাদহের পূর্ব দিকে আইশঘাটিতে একটি বড় গঞ্জ ছিল। পূর্বে এই গঞ্জে ঢাকা, যশোহর প্রভৃতি জেলা হইতে বড় বড় ব্যবসায়ীগণ নৌকাযোগে ধান, নারিকেল, গুড়, সুপারী প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করিতে আসিতেন। বাংলা ১৩০৪ সনের ভূমিকম্পে উক্ত শাখানদীটির গতি পরিবর্তিত হইয়া যাওয়ায় বর্তমানে গঞ্জটির গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। তবে ছোট ছোট নৌকায় এখনও বহু মালপত্র আমদানী-রপ্তানী হইয়া থাকে।

শ্রীঅবনী ভূষণ বিশ্বাস, শিক্ষক,
বেনাদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাড্ডা, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম: বেলডাঙ্গা।৫১।৫৫৩·১২। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু, মুসলমান, জৈন, শিখ প্রভৃতি জাতির বাস।

গ্রামে চ্যাটার্জিপাড়া, ছুতারপাড়া, কামারপাড়া, কাহারপাড়া, গোয়ালাপাড়া, হাড়িপাড়া, ডোমপাড়া, বাগ্দীপাড়া, তাঁতীপাড়া, হাজরাপাড়া, বেনেপাড়া, বাউরীপাড়া, মেছোপাড়া, বোরোপাড়া, চুনারীপাড়া, শাঁখারীপাড়া, তিলিপাড়া প্রভৃতি অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। বেলডাঙ্গা হইতে মোটরবাস যাতায়াত করে। গ্রাম হইতে আড়াই মাইল পশ্চিমে ভাগীরথী নদী দিয়া সারা বৎসর নৌকা এবং বর্ষাকালে স্টীমার যাতায়াত করে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে নামসংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা, আশ্বিনে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা,

কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসব উপলক্ষে মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সত্যনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ, রাধা-গোবিন্দ, শ্যামরায়, বিনোদরায়, রামেশ্বর, যজ্ঞেশ্বর, রাম-সীতা, বুড়ী-মা (কালী) প্রভৃতি দেবদেবীর মন্দির আছে। উল্লিখিত মন্দির ও বিগ্রহাদির কয়েকটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং কয়েকটি সাধারণের।

আদিতে এই স্থানটি জলাভূমি ছিল, সাধারণে ইহাকে "লোকবিল" বলিত। প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে এই স্থান হইতে তিন মাইল পশ্চিমে ভাগীরথী নদীতে বাঁধ দেওয়ায় স্থানটি ক্রমশঃ ভরাট হইয়া ডাঙ্গায় পরিণত হয়। নবাবী আমলের সেট্‌লমেণ্টে ইহা "বিলডাঙ্গা" নামে চিহ্নিত হয়। বর্তমানে ইহা বেলডাঙ্গা নামে পরিচিত।

শ্রীঅনিল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী,
সভাপতি, বেলডাঙ্গা ইউনিয়ন বোর্ড,
ও
শ্রীশিবশঙ্কর দে, প্রধান শিক্ষক,
বেলডাঙ্গা মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বেলডাঙ্গা, মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম ঃ মাণিকনগর।৫৪।৪,৪৩৬'৯৩।৮৩৪।৪,৭৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বেনে, ধোপা, নমঃশূদ্র, কুমার, হাড়ি, বাগ্দী, মুচি, মালো ও নাপিত।

(খ) কৃষিকার্য, মৎস্যশিকার, জাতিব্যবসায় ও চাকুরী। গ্রামটি "ভাণ্ডার দহ" নামে একটি বিলের পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই বিলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। সেই কারণে মাছের ব্যবসা এখানকার অধিবাসীদের একটি প্রধান উপজীবিকা। গ্রামে বহু জেলের বাস আছে।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা, মোটর-ষ্ট্যাণ্ড কালীতলা। গরুর গাড়ীতে এবং নৌকাযোগেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কুলাইচণ্ডীপূজা, চৈত্র সংক্রান্তিতে আদমদেব-বাদমদেবের চড়কপূজা।

(ঙ) চড়কের মেলা, চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ভাণ্ডারদহ বিলের ধারে দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট ও সম্মুখে দালানযুক্ত আদমদেবের পাকা মন্দির এবং কুলাইচণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীত্রিভঙ্গ মুরারী চক্রবর্তী, শিক্ষক,
মানিকনগর জে. এম. বিদ্যালয়,
পোঃ মানিকনগর, মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম ঃ আণ্ডিরণ। ৫৮।৩৭৫ ২৫।৩১২।১,৮২১

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, নমঃশূদ্র, তাঁতী, কুমার, কামার, নাপিত, ডোম, বাগ্দী, বাহেন, বৈরাগী মালাকর, হাড়ি, ধোপা, কলু ও মদক (কুরী)।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। লোকাল বোর্ডের রাস্তা এবং জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত মাড়ুমুণ্ডীদহ দিয়া নৌকাযোগেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নামসংকীর্তন মহোৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা হয়। রথযাত্রার উৎসবে বিশেষ ধুমধাম হয়। এই উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং আতসবাজী পোড়ানো হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে রাধাবল্লভ-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীতারাপদ মণ্ডল, শিক্ষক,
আণ্ডিরণ ফ্রি বোর্ড প্রাইমারী স্কুল,
পোঃ হরেকনগর, মুর্শিদাবাদ।

১০। গ্রাম : মহমপুর।৬১।৫৩৯'০৭।২২৫।১,৪৭১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য এবং কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রামের এক মাইল দূরে বেলডাঙ্গা রেল-স্টেশন। কলিকাতা হইতে লালগোলা ঘাট পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সড়ক ধরিয়া বেলডাঙ্গা চৌরাস্তায় আসিয়া পশ্চিম দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই গ্রামে পৌছান যায়। বর্ষার সময় গ্রামের পশ্চিমদিকে ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) ১লা মাঘ উত্তরায়ণ উৎসব।

(ঙ) উত্তরায়ণ উৎসবের মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীআবুল হোসেন, শিক্ষক,
মহমপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুমারপুর, মুর্শিদাবাদ।

১১। গ্রাম : মির্জাপুর।

৬৪।১,৮৬৪'৯৮।১,৫১৫।৮,৭০৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা; গ্রামের নিকট দিয়া জাতীয় সড়কে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্র মাসে নীলপূজা। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২৫শে হইতে ২৯শে চৈত্র পর্যন্ত প্রত্যহ শিব ও গঙ্গাপূজা হয়। উৎসবটি সবজনীন এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) নীলপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে শিব ও গঙ্গার মূর্তি আছে।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
মির্জাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মির্জাপুর, মুর্শিদাবাদ।

১২। গ্রাম : বাজারসৌ।৭৫।৬৬৩'৮৮।১৫৪।৮১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বণিক, গোয়ালা, সদগোপ, নাপিত, কুমার, গায়েন, বাগ্দী, ডোম, চুনারী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই রেলস্টেশন আছে; জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। বর্ষাকালে নৌকা-যোগে জলপথে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে অরণ্য ষষ্ঠীপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা ও নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ-পাবণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে তিনটি মন্দিরে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। বর্তমানে ইহাদের নিত্য পূজা প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ধর্মরাজের এবং ষষ্ঠীর প্রস্তর মূর্তি এবং মনসাদেবীর দ্বিভুজা মৃন্ময় মূর্তি আছে। উক্ত দেবদেবী গ্রামের সাধারণের।

ইহাভিন্ন, গ্রামে খড়ের চালাযুক্ত একটি মাটির দেবালয়ে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবালয়টি ব্যক্তি-বিশেষের। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে সাড়ম্বরে দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

গ্রামের শেখপাড়ায় জলভাঁড়া (ডকরা) নদীর পশ্চিমে একটি বটগাছের নীচে জঙ্গলী শাহ্ নামে

জনৈক পীরের একটি প্রাচীন মাজাহার আছে। জনৈক মুসলমান খাদেম্ মাজাহার-টি দেখাশুনা করেন। শোনা যায়, উক্ত পীর নবাব মুর্শিদকুলি-খাঁর আমলে পশ্চিম হইতে বাংলা দেশে আসিয়া ছিলেন।

মুসলমানপাড়া খড়ের চালাযুক্ত একটি মসজিদ আছে। স্থানীয় মুসলমানগণ প্রত্যহ এইস্থানে নামাজ পাঠ করিয়া থাকেন।

গ্রামটি পূর্বে "বজ্রাসন" নামে খ্যাত ছিল। বর্তমানে বজ্রাসন হইতে "বাজারসৌ" নামে পরিচিত।

শ্রীআবদুল রহমান সেখ, শিক্ষক,
বাজারসৌ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শক্তিপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৩। গ্রাম : কাদখালি। ১০৩।৫৭৮.৩৮।৪১৯।২,২৩৯

(ক) মুসলমান, স্বর্ণকার, ব্রাহ্মণ, কামার, গোয়ালা কৈবর্ত, নাপিত, তাঁতী, কলু, পাটনী পাড়ুই, জেলে ও রাজোয়ার। গ্রামে মোট আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পলাশী রেলস্টেশন। গ্রামের নিকটে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে প্রবাহিত ভাগীরথী নদীপথে নৌকাযোগে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ১লা মাঘ উত্তরায়ণ স্নান। চৈত্র মাসে চড়ক ও গাজন উৎসব এবং মহরম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) উত্তরায়ণ স্নানের মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

মহরমের মেলা। চান্দ্রমাস হিসাবে একদিন। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে স্থানীয় গোস্বামীদের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ আছে এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব পালনের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীনুরল ইসলাম, শিক্ষক,
কাদিখালি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাচ্‌রা, মুর্শিদাবাদ।

১৪। গ্রাম : রামনগর।১০৪।৯৭৫.৭৫।৩১৬।১,৭৯৪

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। পাশে ভাগীরথী নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষালী উৎসব, চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব; ইহাছাড়া, বাইচ খেলা হইয়া থাকে।

(ঙ) গঙ্গাপূজার মেলা, জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি মনসামন্দির আছে। শিবমন্দিরটিতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীযশোদা কুমার মুখার্জি, প্রধান শিক্ষক,
রামনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাছ্‌রা, মুর্শিদাবাদ।

১৫। গ্রাম : রামপাড়া (মৌজা : রামপাড়া ফরিদপুর)।১১০।১৫৪৭.৩৫ ৫৬৬।৩,০৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তিলি, বণিক, তাঁতী গোয়ালা, সৎচাষী, নাপিত, হাড়ি, মুচি, কুমার, বাগ্দী, বাউরী, রাজোয়ার, রাজবংশী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন রেজিনগর ও বাজারসৌ। নিকটবর্তী জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা; শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে মনসাপূজা; আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও রটন্তীকালী-পূজা, চৈত্র মাসে চড়কপূজা এবং মহরম মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ)

শ্রীগোপাল চন্দ্র মণ্ডল, শিক্ষক,
রামপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রামপাড়া, মুর্শিদাবাদ।

১৬। গ্রামঃ ফরিদপুর (মৌজাঃ রামপাড়া ফরিদপুর) ১১০।১,৫৪৭'৩৫।৫৬৬।৩,০৩০

(ক) বাউরী, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে পাড়া চারটি— মোল্লাপাড়া, সেখপাড়া, কালাসপাড়া, বাউরীপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন রেজিনগর। জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) ফরিদ সাহেবের ও মিরমদনের উরস উৎসব এবং মহরম পরব।

(ঙ) ফরিদ সাহেবের উরস উপলক্ষে মেলা। এক দিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ফরিদ সাহেবের মাজাহার শরীফ আছে।

বহুপূর্বে বর্তমান ফরিদপুর গ্রামবাসীদের পূর্বপুরুষগণ প্রায় এক মাইল দক্ষিণ পূর্বে মাঙ্গনপাড়া নামক গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময় শাহ্ ফরিদ নামক একজন দরবেশ ধর্ম প্রচারের জন্য এখানে আসেন এবং উক্ত পাড়ার এক মাইল দূরে তাঁহার আস্তানা স্থাপন করেন। দীর্ঘদিন ধর্ম প্রচারের প'র তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন তাঁহার আদেশ মত তাঁহাকে ঐ আস্তানার একধারে সমাধিস্থ করা হয়। কালক্রমে মাঙ্গনপাড়া হইতে বহুলোক ফরিদ সাহেবের আস্তানার আশেপাশে (বর্তমান সমাধি হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে) বসতি স্থাপন করিতে থাকেন। ফরিদ সাহেবের নামানুসারেই ঐ বসতিটি ফরিদপুর নামে পরিচিত হইয়া উঠে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার সেনাপতি মীরমদন নিহত হইলে তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকেও ফরিদ সাহেবের মাজাহার-এর পাশে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার সমাধিটি আজিও বিদ্যমান।

শ্রীনিজাবল হোসেন, প্রধান শিক্ষক,
খোল্লা এফ্. পি. প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মিল্কী, মুর্শিদাবাদ।

১৭। গ্রাম ঃ ছাতিয়ানি।১১৯।৯৩৬'১৩।১৮৫।১,১১৫

(ক) গোয়ালা, মালাকার, সৎচাষী, মুচি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। মোটরবাস চলাচলের জন্য পাকা রাস্তা আছে। ভাগীরথী নদীপথে নৌকাযোগেও যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা। পৌষ মাসে মখদুম জাহানীয়া সাহেবের অন্নসত্র উৎসব, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি উৎসব ও অন্নসত্র।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুইটি শিবমন্দির ও দুইটি শীতলা ও দুইটি ষষ্ঠী আছে। একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে মখদুম জাহানীয়া সাহেবের আস্তানা আছে এবং পীরোত্তর কিছু জমির আয় হইতে পৌষ মাসের যে-কোন একদিন অন্নসত্র খোলা হয়।

শ্রীমদন মোহন মালাকার, শিক্ষক,
ছাতিয়ানি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দাদপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৮। গ্রাম ঃ নওপুখুরিয়া। ১২০।২,২৩০'২৬।৭৫৬।৪,১৪০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সৎচাষী, মালাকার, হাড়ি বাগ্দী, কামার, বৈরাগী ও মুসলমান।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের দুই মাইল দূরে বেলডাঙ্গা রেল-স্টেশন হইতে বেলডাঙ্গা-আমতলা সড়ক ধরিয়া হরেকনগর পৌছাইয়া সেখান হইতে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে মা ডুমনী পূজা।

(ঙ) মা-ডুমনী পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) মা-ডুমনীর মন্দির ও নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে শোনা যায় যে, অতীতে কোন এক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি গ্রামবাসীর জলকষ্ট নিবারণের জন্য গ্রামে একটি পুষ্করিণী খনন করেন। এই নূতন পুষ্করিণী হইতে গ্রামের নাম নওপুখুরিয়া হইয়াছে।

শ্রীসুধীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,
কাব্যস্মৃতিতীর্থ, শিক্ষক,
বেলডাঙ্গা গোবিন্দসুন্দরী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ বেগুনবাড়ী, মুর্শিদাবাদ।

১৯। গ্রাম ঃ শুকুরপুকুর। ১৩৭।৫৭৯‧৬৮।১৭০।৮৪৪

(ক) মাহিষ্য, গোয়ালা, কামার, ধাওড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন রেজিনগর।

(ঘ) চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা। উৎসবটি বহু দিনের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। চারদিনব্যাপী পূজাতে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ইহা ভিন্ন গ্রামে চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব হয় এবং কোন কোন বৎসর মনসাপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মহাদেবীর একটি মাটির দেওয়াল ও করগেট টিনের ছাউনিযুক্ত সাধারণের একটি পূজামণ্ডপ আছে।

শ্রীসুধীর কুমার বিশ্বাস, শিক্ষক,
শুকুরপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বাণীপুর, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : বেলডাঙ্গা

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(ফরিদ সাহেব)

ফরিদপুর (মৌজা : রামপাড়া ফরিদপুর) গ্রামে প্রতি বৎসর মহরম মাসের ১০ই তারিখে ফরিদ সাহেব নামক জনৈক দরবেশ এর উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোনাযায়, বহুকাল পূর্বে শাহ ফরিদ সাহেব এই স্থানে ধর্মপ্রচারের জন্য আস্তানা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই গ্রামে চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত ও মধ্যস্থলে গম্বুজযুক্ত তাঁহার একটি মাজারঘর আছে। ইহারই পশ্চিমধারে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে নিহত মীরমদনের প্রাচীর বেষ্টিত পাকা সমাধিসৌধটিও দেখিতে পাওয়া যায়। মীরমদনের শেষ ইচ্ছানুসারেই তাঁহাকে এই স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। মহরম মাসের ১০ই তারিখে সকালে উৎসব উপলক্ষে মিলাদ শরীফপাঠ ও রুটি-সন্দেশ বিতরণ করা হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকেই ফরিদ সাহেবের মাজারঘরে মানত দেন। সাধারণতঃ মোরগই মানত করা হয়। মানত-কারীরা উরস্ উৎসবের দিন স্ব স্ব গৃহে মোরগ জবাই করিয়া আস্তানায় লইয়া আসেন। উরস্ উৎসবে এই অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অনেকেই যোগদান করিয়া থাকেন। ফরিদ সাহেবের উরস্ উৎসব এবং মহরম পরব বহু প্রাচীনকাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে ; তবে মীরমদনের সমাধি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে স্থানটি বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

উল্লিখিত পীর সম্পর্কে ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়।

Alight at Rejinagar R. S. By D. B. Road, 2¼ miles due west towards Saktipur. The mausoleum is on the road about a quarter mile east of the Bhagirathi river. There are two tombs in the enclosure, that of Mirmadan, General of Sirajuddaula, who fell in Plassey and of Farid Saheb Pir. The date of the tomb is 1757.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 184)

কুলাইচণ্ডী পূজা

দলুয়া গ্রামের হিন্দুপাড়ার পূর্বদিকে একটি মাঠে কুলাইচণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। এখানে একটি প্রাচীন কুল গাছ আছে। গাছটির মূল কাণ্ড হইতে ডালপালা বিস্তার লাভ করিয়া প্রায় পঞ্চাশ হাত দূরে উহার একটি শাখা ভূমি স্পর্শ করিয়া পৃথক একটি গাছে পরিণত হইয়াছে। ইহাই কুলাইতলা নামে পরিচিত। পৌষ মাসের যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার এই কুলাইতলায় কুলাইচণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। কুলাইচণ্ডীর কোন মূর্তি বা প্রতিমা নাই। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

মানিকনগর গ্রামে প্রত্যেক বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার কুলাইচণ্ডীর বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। কুলাই-চণ্ডীর কোন মূর্তি নাই। গ্রামের পূর্বদিকে কুলাইচণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থানে যথারীতি পূজা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে আশে-পাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু স্ত্রীলোক এখানে পূজা দিতে আসেন এবং সেই সময় তাঁহারা "মাঠ পাল্নী" নামে একটি উৎসব করিয়া থাকেন। এই সময় কুলাইচণ্ডীর স্থানে তিনদিন প্রত্যহ প্রদীপ, ভাঁটপিঠুলী ও নিমগাছের ডাল দেওয়া হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বেলডাঙ্গায় প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২১শে তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে শিবলিঙ্গ পূজা হয় এবং অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। ২১শে তারিখ হইতে ব্রতগ্রহণকারীরা সংযম পালন ও পূজা-মণ্ডপ প্রাঙ্গণে নানা প্রকার আচার অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। হোমপূজার দিন ঝাঁপবান, পার্শ্ববান, কপালবান ইত্যাদি নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সকল ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পূজামণ্ডপে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভক্তের সমাগম হয়।

ঝাপবান অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বার-চৌদ্দ হাত উচ্চ একটি মঞ্চ তৈয়ারী করা হয়। গাজনের কয়েকজন সন্ন্যাসী ঐ মঞ্চের উপরে উঠেন এবং মঞ্চের নীচে কয়েকজন পরস্পরের হাত ধরিয়া মুখোমুখি দাঁড়ান ইহারপর একে একে ভক্তগণ মঞ্চের উপর হইতে সোজা শায়িত অবস্থায় নীচে দাঁড়ান ভক্তগণের হাতের উপর ঝাপাইয়া পড়েন এবং সেই অবস্থায় তাঁহাদিগকে মণ্ডপের মধ্যে শিবলিঙ্গের নিকট লইয়া যাওয়া হয়।

পাশবান অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাজনে-সন্ন্যাসীদের দুই পাশের পাঁজরার মাংস টানিয়া তাহাতে লোহার বান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং এই বানদ্বয়ের অগ্রভাগ একত্রিত করিয়া উহাতে ঘৃতসিক্ত তুলা ও কাপড় জড়াইয়া অগ্নি সংযোগ করা হয়। ঐরূপ অবস্থায় সন্ন্যাসীরা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে নৃত্য করেন। দর্শকেরা অনেকে ঐ আগুনের মধ্যে ধুনা নিক্ষেপ করেন।

কপালবান অনুষ্ঠান উপলক্ষে গাজন সন্ন্যাসীদের কপালের চামড়া টানিয়া উহাতে ঘৃত মালিশ করিয়া একটি বান ফুঁড়িয়া দেওয়া হয় এবং ঐ বানের অগ্রভাগে রক্ষিত প্রদীপের মত একটি পাত্রে ঘৃত পোড়ানো হয়।

উৎসবে মানত হিসাবে অনেকে গাজন সন্ন্যাসীদের পরিতৃপ্তিসহকারে ভোজন করান। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

আদমদেব ও গাদমদেব মানিকনগর গ্রামের গ্রাম-দেবতা। প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা একটি প্রাচীন শালের কাণ্ডকে আদমদেব এবং অনুরূপ অপর একটি শালের কাণ্ডকে গাদমদেব রূপে পূজা করা হয়। গ্রামের দুধঘাটি দহের জলে উক্ত শালগাছ দুইটি সারা বৎসর ডুবান থাকে। চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসবে গাছ দুইটিকে জল হইতে তুলিয়া আদমদেব স্বরূপ গাছটিকে যথারীতি শিবের ধ্যানে পূজা করা হয় এবং গাদমদেব স্বরূপ গাছটিকে চড়কগাছ হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

গ্রামে ভাণ্ডারদহ বিলের নিকট সম্মুখে বারান্দাযুক্ত দুইটি পাকা ঘর আছে, ইহাই আদমদেবের মন্দির। আদমদেবের বাৎসরিক পূজা ও চড়ক এই মন্দিরেই অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের পঁচিশ তারিখ হইতে বৈশাখ মাসের প্রথম মঙ্গলবার পর্যন্ত আদমদেবের পূজা হয়। ১লা বৈশাখ আদমদেবের নিকট স্থানীয় গ্রামবাসীরা রোগমুক্তি ইত্যাদির প্রার্থনা জানাইয়া মানতের সংকল্প করেন এবং বিগত বৎসরের মানতকারীগণ এই দিন মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন। মানত হিসাবে প্রধানতঃ সোনারূপার গহনা, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি দেওয়া হয়। পূর্বে পাঁঠা বলি দেওয়া হইত; কিন্তু বর্তমানে বলি প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। উৎসবের কয়দিন ঢাক-ঢোলের বাদ্যসহ সাড়ম্বরে আদমদেবের পূজা হয়। মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি আদমদেবের সেবায়েত। পূজারী ব্রাহ্মণ। গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

কাদখালি গ্রামের বোলান বা গাজন উৎসব এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট আঞ্চলিক উৎসব। এই উৎসব অঞ্চল বিশেষে ২৭শে অথবা ২৮শে চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় এবং বর্ধমান জেলায় ইহা ২৭শে চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়; কিন্তু এই অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী নদীয়া জেলায় উৎসবটি ২৮শে চৈত্র অনুষ্ঠিত হয়। বোলান বা গাজন উৎসব সাধারণতঃ রাত্রি বেলা শুরু হয় এবং পর-দিবস সকাল ১০টা পর্যন্ত চলে। বোলান গানই এই উৎসবের প্রধান অঙ্গ।

উৎসবের (২৮শে চৈত্র) দিন দুই-তিন জন শিবের ভক্ত হন এবং ঢাকের বাদ্যসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রাম প্রদক্ষিণের সময় তাঁহারা গাছে ফল সংগ্রহ করে এবং ফলের গাছে ও গৃহস্থদের গোয়ালে ঘোলের জল ছিটাইয়া দেন। বিশ্বাস, ইহাতে গৃহস্থের গাছে প্রচুর ফল ধরে এবং গোয়ালভরা গরু থাকে। সন্ধ্যার পর বিভিন্ন গ্রাম এবং পাড়া হইতে এক এক দল আসিয়া বোলান গান করে। এই সব দল সামান্য কিছু পয়সা দক্ষিণা পাইয়া থাকে। বোলান দুই প্রকার "সার" বোলান এবং "পোড়ো" বোলান। সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া গাওয়া হয় বলিয়া "সার" বা "সারি" বোলান বলা হয়। পক্ষান্তরে মড়ার মাথা মুখে করিয়া মাথা নিচু করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া গাওয়া হয় বলিয়া "পোড়ো" বোলান বলা হয়। পোড়ো বোলান দেখিতে

বীভৎস। কোন স্থানে মড়া পড়িয়া থাকিলে শকুনেরা যে ভাবে ডানা মেলিয়া কাড়াকাড়ি করিয়া মাংস খায় ইহারাও ঠিক সেই ভাবে বসিয়া মাথা নিচু করিয়া মড়ার মাথা মুখে ধরে এবং হাত দুইটি পিছন দিকে শকুনের ডানার মত উঁচু করিয়া তোলে। পোড়ো বোলানের দলকে দক্ষিণা বেশী দিতে হয়—কারণ ইহারা অনেক সময় মড়ার মাথা গানের আসরে ফেলিয়া রাখিয়া যাইবার ভয় দেখায়। "সার" বা "সারি" বোলান দলে অনেকে মেয়ে সাজিয়া নাচগান করে। এই দলে পনর থেকে পচিশ জনের মত লোক এবং একটি হারমোনিয়াম ও ঢোলক থাকে। এক এক দল সাধারণতঃ পনর হইতে ত্রিশ মিনিট পর্যন্ত গান গাহিয়া থাকে। পোড়ো বোলান গানের দলে লোক সংখ্যা কম এবং দলের সংখ্যাও কম।

২৯শে চৈত্র সন্ধ্যায় ভক্তের দল কপালে অথবা পেটে বান ফোঁড়ায় এবং বানের অগ্রভাগে জড়ান তৈলসিক্ত বস্ত্রে আগুন ধরাইয়া নাচিতে নাচিতে ষষ্ঠী তলায় একটি গাছের চারিদিকে সাত পাক ঘোরেন। পর দিবস ৩০শে চৈত্র চড়ক-পূজার পর উৎসব শেষ হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। ইহাতে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহুলোকের সমাগম হয়।

দলুয়া গ্রামে চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিবপূজা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসর ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে দুই কুঠরীযুক্ত একটি পাকা দেবালয়ে শিবমূর্তি তৈয়ারী করিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। সংক্রান্তির পূর্বের দুইদিন বোলান গানের, সঙ্‌ সাজিয়া পালাগানের ও পাঁচালীগানের আসর বসে। এই আসরে বিভিন্ন দলের মধ্যে প্রতিযোগীতা হয় এবং গুণানুসারে প্রত্যেক গানের দলকে আট আনা হইতে দুই টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়। পুরস্কার দেবার জন্য কোন কোন বৎসর ১০০৲ হইতে ১২৫৲ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়। পূজান্তে উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

নলকুণ্ড গ্রামে অতি প্রাচীনকাল হইতে চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে প্রায় দেড় কাঠা পরিমাণ দেবোত্তর জমি আছে। ঐ জমির উপর একটি পাকুড় গাছের নীচে শিবের দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। চৈত্র মাসের ২৮শে তারিখে এই স্থানে বোলান গানের আসর বসে। সংক্রান্তির দিন গাজন উপলক্ষে শিবপূজা এবং নানারূপ আচার-আচরণ অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

চেহলাম পরব

দলুয়া গ্রামে বহুকাল হইতে চেহলাম পরব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। মহরম পরব অনুষ্ঠিত হইবার ঊনচল্লিশ দিন পর অর্থাৎ চল্লিশ দিনের দিন এই পরবটি অনুষ্ঠিত হয়। হজরত ইমাম হোসেনের নিহত হইবার সংবাদ শুনিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হজরত আবু হানিফা সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করেন। কোরাণে উল্লিখিত এই ঘটনার স্মৃতিতেই চেহলাম পরব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের পশ্চিমে "চারাতলা" নামক একটি স্থানে (যেখানে মহরম পরব অনুষ্ঠিত হয়) এই পরব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটিতে আশেপাশের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরা যোগদান করিয়া থাকেন। এই উপলক্ষে একটি ছোট-খাটো মেলা বসে।

ধর্মরাজপূজা

দলুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ববর্তী একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত সাড়ম্বরে ধর্মরাজপূজা হয়। পূজাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে ধর্মরাজের মন্দির আছে। মন্দিরটি পূর্বদ্বারী এবং তিন-দিকে বারান্দাযুক্ত এক কুঠরী বিশিষ্ট একটি পাকা ঘর মাত্র। মন্দিরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত পাথরের শিবলিঙ্গ মূর্তিকেই ধর্মরাজ রূপে পূজা করা হয়। এই পূজাটি প্রধানতঃ দলুয়ার দক্ষিণপাড়ার জনসাধারণের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। একাদশীর দিন হইতে গ্রামের হিন্দুদের মধ্যে হইতে জন-কয়েক ব্যক্তি ভক্ত হন। পূর্ণিমার দিন সকালে ত্রিশ-চল্লিশখানি ঢাক, ঢোল, সানাই, জগঝম্প প্রভৃতি নানাবিধ বাজনা সহ বায়বেশে নৃত্য করিতে করিতে গ্রামের একটি নির্দিষ্ট পুকুরে ভক্তরা শিবকে স্নান করাইতে লইয়া যান।

শিবের স্নান পর্ব শেষ হইলে ভক্তরা প্রত্যেকে জল পূর্ণ মাটির ভাঁড় লইয়া বাজনাসহ নাচিতে নাচিতে শিবের মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় আশেপাশের গ্রামের লোকেরা আসিয়া ধর্মরাজের মাথায় দুধ ও গঙ্গাজল ঢালিতে থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। এইদিন সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা প্রাঙ্গণে আশে-পাশের গ্রামের লোক এবং দশঘরা গ্রামের হিন্দু পাড়ার যুবক সম্প্রদায় নানাপ্রকার সঙ্ সাজিয়া নাচগান করেন। যাঁহারা ভাল সঙ্ সাজেন তাঁহাদিগকে রূপার পদক উপহার দেওয়া হয়। অপরাহ্নে পুনরায় ভক্তরা বাজনাসহ পুকুরে গিয়া স্নান করেন এবং স্নানান্তে জলপূর্ণ মাটির ভাঁড় মাথায় লইয়া তাঁহারা পুনরায় নাচিতে নাচিতে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে ধর্মরাজমন্দিরের প্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসিলে ধর্মরাজের পূজা ও স্নানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ভক্তদের এই স্নান এবং জলপূর্ণ মাটির ভাঁড় লইয়া আসাকে "ভাঁড়ার ভরা" বলে। ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু মানুষের সমাগম হয়।

মা-ডুমনীর পূজা

নতপুকুরিয়া গ্রামে সারা বৎসর প্রতি শনি ও মঙ্গলবার মা ডুমনী বা ডুমনী মায়ের পূজা হয় এবং বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পূজা ও বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। বর্তমান সেবায়েত পরিবার বংশানু-ক্রমে প্রায় চব্বিশ-পঁচিশ পুরুষ ধরিয়া দেবীর সেবা কার্যে নিযুক্ত আছেন।

মা-ডুমনী দেবী সম্বন্ধে এই অঞ্চলে বহুল প্রচারিত একটি কিংবদন্তী আছে। শোনা যায়, বহু কাল পূর্বে জনৈক ভূম্যধি-কারী কোনো কারণে এই অঞ্চল দিয়া যাইবার কালে একটি পরমা সুন্দরী কিশোরীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। বিবাহ শেষে ফিরিবার পথে সন্ধ্যাকালে প্রবল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হয়। বর্তমানে যেখানে ডুমনীদেবীর স্থান ভূম্যধিকারী সদলবলে তথায় অবস্থান করিয়া ঝড়বৃষ্টির দাপট হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। গভীর রাত্রে ঝড়বৃষ্টি থামিলে পর সকলে ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হইয়া রন্ধনের আয়োজন করেন; কিন্তু বৃষ্টির জলে রন্ধনের যাবতীয় উপকরণাদি সিক্ত হইয়া যাওয়ায় অকৃতকার্য হন। তখন ঐ কিশোরী বধূ লোকজনকে নিকটস্থ বাঁশ বন হইতে কাঁচা বাঁশ কাটিয়া আনিতে আদেশ করেন এবং বাঁশ কাটিয়া আনিলে পর তিনি হাঁস্কা ছুরিকা দ্বারা ঐ বাঁশ হইতে পাতি প্রস্তুত করিয়া রন্ধনের জন্য ও শীত নিবারণের জন্য আগুনের ব্যবস্থা করেন। কিশোরী কর্তৃক স্বচ্ছন্দে বাঁশের এই পাতি প্রস্তুত করিবার দক্ষতা দেখিয়া ভূম্যধিকারীর মনে সন্দেহ জাগে যে, এই কিশোরী কোনো নীচ কুলোদ্ভবা ডোম কন্যা হইতে পারেন।

এই সন্দেহের বশবর্তী হইয়া ভূম্যধিকারী সেই কিশোরীকে ঐ শ্বাপদ সংকুল প্রান্তরে অসহায় অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া রাত্রির অন্ধকারে সদলবলে সেই স্থান ত্যাগ করেন। কিশোরী তখন কোনও উপায় না দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বহুদূর অবধি তাঁহাদের অনুসরণ করেন। যতদূর পর্যন্ত কাঁদিতে কাঁদিতে অগ্রসর হন ততদূর পর্যন্ত তাঁহার চোখের জলে একটি দহের সৃষ্টি হয়। এই অঞ্চলে সেই দহ ডুমনীদহ নামে বর্তমানে খ্যাত। ঐ কিশোরী-ই ডুমনী দেবী এবং তিনি বর্তমান সেবায়েত শ্রীরামপদ পাটুনীর পূর্ব পুরুষকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলেন, "আমি ঐ স্থানে প্রস্তরি-ভূত অবস্থায় আছি। আমার মূর্তি উদ্ধার করিয়া পূজার আয়োজন কর।" তখন হইতে উক্ত পাটনীরা বংশানু-ক্রমে দেবীর সেবায়েত বা দেয়াসীন-এর কার্য সম্পাদন করিতেছেন। উৎসবটি সর্বজনীন। সেবায়েতের নিকট হইতে জানা যায় যে, দেশ বিভাগের পূর্বে বহু মুসলমানও এই স্থানে মানত করিতে আসিতেন। এখনও দেবীর নিকট মানত দিবার উদ্দেশ্যে কিছু কিছু মুসলমান আসেন। মুসলমানদের মধ্যেও ডোমন পদবীধারী লোক দেখা যায়। এই ডোমন পদবীধারী লোক মাত্রই (সে হিন্দুই হউক, আর মুসলমানই হউক) ডুমনী মায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত। এই অঞ্চলে ডোমন শেখ নাম ধারী অনেক মুসলমান আছে। জেলার বাহির হইতেও অনেকে আসিয়া থাকেন।

"ডোমের কন্যা" এই অর্থে ডোমনী হইতে "ও" কার ক্রমে "উ" কারে পরিবর্তিত হইয়া দেবী ডুমনী নামে আখ্যায়িতা। দেবী চতুর্ভুজা প্রস্তরময়ী মূর্তি। জনৈক মারাঠী

প্রত্নতাত্ত্বিক এই মূর্তিকে বৌদ্ধতারা মূর্তি বলিয়াছিলেন। স্থানীয় প্রাচীন পণ্ডিত শ্রীঅন্নদা প্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিত তাঁহার এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। দেবীর পৃথক কোন ধ্যান নাই, কেহ কেহ তারা দেবীর ধ্যানে, কেহ কেহ দক্ষিণা কালিকার ধ্যানে দেবীর পূজা সম্পাদন করিয়া থাকেন। মালদহ জেলার অন্তর্গত বুলবুল চণ্ডীর জমিদার পরিবারের গিরিজাসুন্দরী দেবী এবং মুর্শিদাবাদ জেলার লালগোলার মহারাজা যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়-এর অর্থানুকূল্যে দেবীর জন্য একটি ছোট ইষ্টক নির্মিত মন্দির কয়েক বৎসর হইল নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু এই মন্দিরে দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় নাই। স্বপ্নাদেশ অনুসারে বাহিরে একটি অবিশাল প্রাচীন বটগাছের নীচে উঁচু বেদীর উপর ডুমনা দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর কোন ভৈরব নাই।

মা ডুমনা এই অঞ্চলে বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া খ্যাত। মৃত-বৎসা দোষ খণ্ডনের জন্য এবং সন্তান কামনায় এই অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা দেবীর নিকট মানসিক করিয়া থাকেন। কলিকাতা, মালদহ, রাজসাহী, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি দূর-দূরান্ত স্থান হইতেও অনেকে আসেন। দেবীর বেদীর উপর যে বিশাল বটগাছ আছে, তাহার ডালে ছোট ছোট ইঁটের টুকরা বাঁধিয়া দিয়া মানসিকের সংকল্প করা হয়। মানত হিসাবে ষোড়শোপচারে পূজা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। ছাগ ছাড়া অন্য কোন পশু বলি দেওয়া হয় না। মানতকারীরা তাঁহাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের পুরোহিত দ্বারা মানতের পূজা করিয়া থাকেন। দেবীর নিত্য সেবা মাহিষ্য সম্প্রদায়-ভুক্ত সেবায়েতগণ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই অঞ্চলের সাধারণ মাহিষ্যদের সহিত ইঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই এবং ইঁহাদের পদবী পাটুনী।

লক্ষ্মীপূজা

দলুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির পূর্ব দিন গ্রামের হিন্দুগণ সর্বজনীন ভাবে পৌষ লক্ষ্মীর পূজা করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে সাধারণের একটি টালির কাঁচা ঘরে উৎসব উপলক্ষে লক্ষ্মীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। পূজান্তে দেবীর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূর্বে এই পূজায় খুবই ধুমধাম হইত; উৎসবের কয়দিন কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইত। এখনও কোন কোন বৎসর কবিগান ও আলকাপ গানের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ বেলডাঙ্গা

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(ফরিদ সাহেব)

ফরিদপুর (মৌজা ঃ রামপাড়া ফরিদপুর) গ্রামে ফরিদ সাহেবের উরস্ উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন। ১৭৫৭ সালের পর হইতে মীরমদনের উরস উৎসব ইহার সহিত যুক্ত হওয়ায় মেলাটি ক্রমশঃ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। মেলাটি ফরিদ সাহেবের মাজাহার এবং মীরমদনের সমাধির আশেপাশের জমিতে বসে।

প্রধানতঃ বেলডাঙ্গা, নওদা, ভরতপুর এবং নদীয়া জেলার কালিয়াগঞ্জ থানার গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু যাত্রী আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ শান্তিপুর, গরজোয়ার, সোমপাড়া, দাদপুর, রেজীনগর এবং পলাশীর মীরবাজার হইতে আসেন। প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি দোকানপাট বসে; ফেরিওয়ালাও প্রায় দশ-বার জন আসেন। দোকান-পাটের অধিকাংশই মিষ্টান্নের দোকান। তাহাছাড়া, মেলায় মাটির পুতুল, হাড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান বসে। দরিদ্র-দিগকে দান করিবার জন্য মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মহরম পরবের দিনই এই উরস্ উৎসব হয় বলিয়া উক্ত মেলায় লাঠিখেলা হয় এবং কোন কোন বৎসর কবিগানও হইয়া থাকে।

উত্তরায়ণ স্নানের মেলা

মহুমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ উত্তরায়ণ স্নান উপলক্ষে জেলাবোর্ডের রাস্তার দুইধারে, স্থানীয় গ্রামবাসীর জমিতে এবং ভাগীরথী নদীর চরে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের মুজাপুর, দেবকুণ্ড, বেলডাঙ্গা, মানিকনগর, কালীতলা, ত্রিমোহিনী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় চার-পাঁচহাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ মোটরবাস, রিক্সা এবং গরু বা মহিষের গাড়ীতে করিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কাঁয়াগিয়া হইতে আসেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, বই ছবি প্রভৃতির দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন কোন বৎসর দান আদায় করা হয়।

কাদখালি গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ উত্তরায়ণ স্নান উপলক্ষে গ্রামের গোস্বামীদের একবিঘা পরিমাণ জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বাচড়া রামনগর, হজাপুর এবং সোমপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দুই তিনহাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ রামনগর, হজাপুর, বাচড়া এবং সোমপাড়া হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী শিল্পসামগ্রী এবং হজাপুর হইতে আগত চামারদের তৈয়ারী জুতার দোকানপাটই অধিক। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কাদখালির চটিজুতা এককালে এই অঞ্চলে খুবই বিখ্যাত ছিল; বর্তমানে এই শিল্পটি প্রায় লোপ পাইতেছে। তাহাছাড়া, হজাপুরের কারুশিল্পীগণ বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র লইয়া বিক্রয়ার্থে মেলায় আসেন। মেলায় গোস্বামীদের পক্ষ হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

গঙ্গাপুজার মেলা

রামনগর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাপুজা উপলক্ষে ভাগীরথীর তীরে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় সাত-আটশত নরনারীর সমাগম হয়। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং উহার মধ্যে অধিকাংশই মিষ্টান্ন এবং আমের দোকান। তাহাছাড়া, কয়েকটি শিল্পসামগ্রীর দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

নলকুণ্ড গ্রামের গাজন উৎসব উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিবমণ্ডপের সম্মুখে রাস্তার দুইধারে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটিতে সাধারণতঃ বিকালের দিকেই লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়।

মেলায় প্রায় তিনশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রী এবং বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন মেলায় পনর-কুড়িটি দোকানপাটের অধিকাংশ খোলা জায়গায় বসে। তাহাছাড়া, চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের অধিকাংশই ময়রা প্রভৃতি খাবারের দোকান।

মানিকনগর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব উপলক্ষে আদমদেবের মন্দির সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই তিন বিঘা পরিমাণ জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বেলডাঙ্গা, নওদা, হরিহরপাড়া প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ-ছয়হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে, নৌকায়, সাইকেলে এবং হাঁটিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বেলডাঙ্গা এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা ব্যতীত কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্র, ফলমূল, শাকসব্জী প্রভৃতির দোকানও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া এবং যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোন বৎসর ভিন্ন গ্রামের যাত্রাদল আসে। গ্রামের যাত্রাদলের অধিকারীর নাম —শ্রীগৌর চন্দ্র চক্রবর্তী, গ্রাম ও পোঃ মানিকনগর।

মীর্জাপুর গ্রামে চৈত্র মাসের ২৯শে তারিখে নীলপূজা উপলক্ষে শিবমন্দিরের নিকটবর্তী দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে এক সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ ছয় শত যাত্রী বেলডাঙ্গা, নলপুকুর, দাদপুর, আমলাই, রামনগর এবং কান্দী প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। যাত্রীগণ প্রধানতঃ হাঁটিয়া এবং গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং বেলডাঙ্গা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, এবং শিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানী হয়। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য রাধাকৃষ্ণের লীলা গান, রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই গানের দল আছে।

বেনাদহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন "চৈত্রকাপ" উৎসব উপলক্ষে শিব, দুর্গা ও গণেশপূজা হয় এবং পূজামণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় যাত্রীগণ আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ বেলডাঙ্গা, মাড্ডা, দলুয়া, খরদিকিপাড়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটির মত দোকানপাট বসে; ফেরিওয়ালা আসেন পনর-কুড়ি

জন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, লোহার জিনিসপত্রের দোকানই বেশী। তাহাছাড়া, নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পজাত জিনিসপত্রও আসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে যৎসামান্য দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন, কবিগান, আলকাপ গান এবং বোলান গানের ব্যবস্থা করা হয়। জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এই সকল গানের দল আনা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নওদা এবং কানাইনগর গ্রামের মধ্যস্থলে চারিদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমিটি আংশিক দেবোত্তর এবং আংশিক ব্যক্তি-বিশেষের। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ দলুয়া, বেলডাঙ্গা, পুলিন্দা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। খাবার, মনিহারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, বোলান গান, সঙ্‌যাত্রা এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই গানের দল আছে; অধিকারীর নাম—শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, গ্রাম : নওদা, পোঃ পুলিন্দা।

ধর্মরাজপূজার মেলা

রামপাড়া (মৌজা : রামপাড়া-ফরিদপুর) গ্রামের নলহাটী নামক স্থানে জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে গ্রামের রাস্তার দুই ধারে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ রামপাড়া, হাটপাড়া, মুনিয়াপাড়া, ধাওরাপাড়া, ফরিদপুর, মঙ্গলপাড়া, বাউরীপাড়া এবং দাসপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয়শত যাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ শক্তিপুর, নারিকেলবাড়ী, নলহাটী এবং রামপাড়া হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় আসেন। বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় দশ-পনরটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-পমোদের জন্য কবিগান, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে সরস্বতী অপেরা পার্টি নামে একটি যাত্রাদল আছে। অধিকারী—শ্রীহেমন্ত কুমার মজুমদার।

দলুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার পূর্ববর্তী একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ধর্মরাজের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ধর্মরাজমন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল, ধামা-কুলা, ফল-মূলাদি ও লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্রের মোট কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে।

বাসন্তীপূজার মেলা

শুকুরপুকুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

কাশীপুর, আবদুলপাড়া, বাইতিপাড়া, রাধানগর, শ্যামনগর, তুঙ্গি ইত্যাদি স্থান হইতে তিন-চারশত যাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কালীতলা, মীরবাজার এবং রেজীনগর হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালাও আসেন। খাবার ও মনিহারী দোকান ব্যতীত দুই-একটি কাটা কাপড়ের দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা হয়। প্রধানতঃ সর্বাঙ্গপুর ও চাইতিপাড়া হইতে যথাক্রমে

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও শ্রীদুলাল চন্দ্র মণ্ডলের যাত্রাদল আসে।

মহরমের মেলা

দলুয়া গ্রামের পশ্চিমাংশে অবস্থিত "চারাতলা" নামক স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমিতে মহরম উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

স্থানীয় লোকজন ব্যতীত পার্শ্ববর্তী রামেশ্বরপুর, বেনাদহ, ঝাল্কা, খাদিকাপাড়া, নলকুণ্ড ইত্যাদি গ্রামসমূহ হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার যাত্রী আসেন এবং উঁহার অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত।

দলুয়া, রামেশ্বরপুর, কুমারপুর, ঝুনকা ইত্যাদি গ্রাম হইতে বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, শিল্পসামগ্রী, মাটির ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

এই মেলায় বিভিন্ন গ্রাম হইতে এক একটি লাঠি খেলার দল নিজ নিজ ঢক্কা, ঢোল, সানাই প্রভৃতি বাজনাসহ আসিয়া পরস্পরের সহিত লাঠি, ছুরি খেলার প্রতিযোগিতা করেন। দর্শকগণ খেলোয়াড়দিগকে নানা ভাবে পুরস্কৃত করেন।

মহোৎসবের মেলা

বেলডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে নামসংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে স্থানীয় বাজারের নিকটবর্তী রামসীতা মন্দিরের পশ্চাৎভাগে সাধারণের প্রায় সাত-আট বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং প্রজাপুর, ভাবতা, দেবকুণ্ড, চৈতন্যপুর প্রভৃতি গ্রাম বা ইউনিয়ন হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ পুরুষ ও দুই-তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক। যাত্রীগণ প্রধানতঃ ট্রেণে, মোটর-বাসে এবং হাটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। দোকান-পাটের সংখ্যা প্রায় একশত এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় সাতাশ জন। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, লোহা তামা-পিতলের জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহাছাড়া, মেলায় বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, লুঙ্গি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোনও বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রা ও থিয়েটারের দল আনা হয়।

মহুলা গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা জ্যৈষ্ঠ নামসংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে রাজাপুর মহুলা রাস্তার দুই ধারে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুমারপুরে নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐ গ্রামের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়া বাংলা ১৩৮০-৮২ সনে এই উৎসব এবং মেলাটির সূত্রপাত হয়। মেলাটিতে বেলডাঙ্গা, বহরমপুর, হরিহরপাড়া প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রধানতঃ কৃষক সম্প্রদায়ের প্রায় দুইহাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। বহরমপুর এবং বেলডাঙ্গা হইতে মিষ্টান্ন, মনিহারী, মাদুর, বাসনকোসন, মাটির পাত্র, খেলনা, ধামাকুলা, তালপাতার ছাতি, লোহার জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র প্রভৃতির বিক্রেতারা আসেন। মেলায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকানপাট ছাড়া খোলা জায়গায় কয়েকটি দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া খেলা হয়।

ভাবতা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিবাসর উৎসব উপলক্ষে বাংলা ১২৯৮ সন হইতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসিয়া আসিতেছে। এই মেলায় বিভিন্ন জিনিসপত্রের প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

মা-ডুমনীপূজার মেলা

নওপুকুরিয়া গ্রামে মা-ডুমনী বা ডুমনী মায়ের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে বৈশাখ মাসের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার মা-ডুমনী তলায় প্রায় ছয় বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

কলিকাতা, মালদহ, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া প্রভৃতি জেলা হইতে যাত্রীরা এই মেলায় আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই স্ত্রীলোক। স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন হাটিয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীগণ প্রধানতঃ ট্রেনে ও বাসে করিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন। পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের অধিকাংশই মিষ্টান্ন এবং শিল্পজাত দ্রব্যের দোকান।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও বোলান গানের আসর বসে।

রথযাত্রার মেলা

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে নওদা ও কানাইনগর গ্রামের সংযোগস্থলে দেবোত্তর ও ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়; যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। যাত্রীরা সাধারণতঃ সাইকেলে ও হাটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ দলুয়া, সত্তরপুর, বেলডাঙ্গা, পুলিন্দা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি প্রভৃতির দশ-পনরটি দোকান বসে এবং আট দশজন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলার আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, বোলান গান, সভ্যারা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীনিরঞ্জন মণ্ডল, সাং নওদা, পোঃ পুলিন্দা। কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়।
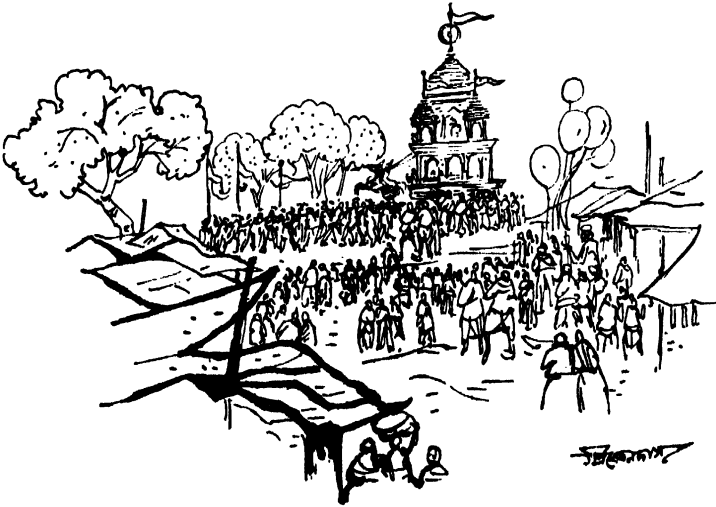
জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ বহরমপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ আন্দারমাণিক।
২১।১,৪১৪·৭১।৪৪০।২,৩১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বাগদী, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, কামার, ছুতার এবং মুসলমান।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে খাগড়াঘাট রোড এবং দুই মাইল দূরে বহরমপুর কোর্ট রেল-স্টেশন। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ রামনগর-ফরাক্কা রোড। গ্রামের উত্তর প্রান্ত দিয়া কান্দী হইতে বহরমপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা গিয়াছে। তাহাছাড়া, সম্বৎসর ভাগীরথী নদীতে নৌ-চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। বৈশাখে এক মাস ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে প্রস্তর নির্মিত শীতলাদেবীর মূর্তি আছে। তাহাছাড়া, গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর ও একটি শীতলা দেবীর মূর্তি আছে।

গ্রামটি অতি প্রাচীন। গ্রামের মৃত্তিকা গর্ভে নিহিত প্রাচীন কালের কূপ, গড় প্রভৃতির নিদর্শন দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্বে এখানে জন-বসতি ছিল।

গ্রামের নাম সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এই জেলার লালবাগ্ মহকুমার অন্তর্গত ভট্টবাটি বা ভটমাটি গ্রামের রাজ-বাটীর জনৈক মহারাজা একদা রাত্রিকালে ভাগীরথী পথে নৌকাযোগে যাইবার সময় জনমানবহীন এই অঞ্চলে কেবল মাত্র একটি কুঠিরে প্রদীপের আলো দেখিতে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্লিত হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন "আঁধারে যেন মাণিক জলছে"। সেই সময় হইতেই নাকি এই স্থানটি "আন্ধারমাণিক" নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

শ্রীবিনয় কুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক,
বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ,
মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম ঃ বাসুদেবখালি।
২২।১০০৬·৪৪।২২২।১,১৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাল, সর্দার, বৈরাগী, কামার এবং মুসলমান।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) হাওড়া-আজিমগঞ্জ লাইনে খাগড়াঘাট রোডের দক্ষিণ পার্শ্বে বাহাদুর হল্ট রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। রামনগর-ফরাক্কা রোড গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে; এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীর একটি পাকা মন্দির আছে।

শ্রীসোহরাব আলী মোল্লা, প্রধান শিক্ষক,
নিশিন্তপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জীবন্তী, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম ঃ জগন্নাথপুর। ২৩।৯৮৮·৭২।১৮০।৯৬৮

(ক) ব্রাহ্মণ, ভুঁইহার, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, চণ্ডাল, বুনা, বৈশ্যবণিক, নাপিত এবং মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) চিরতী বা বাতাকুল হল্ট রেলস্টেশন হইতে হাঁটা পথে অথবা গরুর গাড়ীতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে মাদার পীরের বিবাহ স্মারক উৎসব। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব।

(ঙ) মাদার পীরের উৎসব উপলক্ষে মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং একটি পীরের দরগাহ আছে।

শ্রীরামশরণ মল্লিক, শিক্ষক,
গ্রাম : জগন্নাথপুর,
পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : আরোয়া (মৌজা : আরাজি মধুপুর)। ৩১১,১৪৭১১২৩০১,১১৮

(ক) ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্র, ধাঙর ও তেলি।
গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চিরতী।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে বনকালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বনকালীপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন। মেলাটি গত পাঁচ বৎসরের হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামের মধ্যে জংগলাকীর্ণ স্থানে একটি গাছের নীচে বনকালী ও শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীহরিদাস কালী,
গ্রাম : আরাজি মধুপুর,
পোঃ গোবিন্দপুর, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : কাটালিয়া। ৩৬১১,০০২২৪১২৩১১,৩৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, তেলি, কুমার, বাগ্দী এবং মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামটি চিরতী ও চৌরিগাছা উভয় রেল স্টেশনের মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং গ্রাম হইতে উভয় স্টেশনেরই দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। তাহাছাড়া, বর্ষাকালে ভাগীরথী নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবের গাজনে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। ধর্মরাজপূজাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ এবং শিব ও ধর্মরাজের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅধীর কুমার চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
কাটালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাটুই, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : সুজাই। ৬১১৬৭৬৮৬১১০০১৩৯৮

(ক) বুনা, বাগ্দী, চণ্ডাল, গোয়ালা, ভুঁইহার, ছত্রী ও পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) বহরমপুর কোর্ট রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে অথবা খাগড়াঘাট স্টেশন হইতে রাধাঘাট দিয়া নৌকা যোগে গ্রামে পৌছানো যায়। গ্রামের নিকট দিয়া জেলাবোর্ডের রামনগর-ফরাক্কা রোড গিয়াছে।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎসব।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি রাণী ভবানীর আমলে নির্মিত বলিয়া শোনা যায়।

শ্রীরামশরণ মল্লিক, শিক্ষক,
গ্রাম : জগন্নাথপুর,
পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : শ্রীপুরভাঙ্গা (মৌজা : সুন্দিপুর)।
৬৯।৯৮৯'৯৮।৩১৫।১,৭৭০

(ক) কুমার, কামার, মাহিষ্য, নাপিত, যোগী, বাগ্দী, ছুতার, তেলি, প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সারগাছি ও বহরমপুর কোর্ট। সারগাছি-বাণজেটিয়া রাস্তাটি গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে—এই রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা ও চড়ক। শেষোক্ত তিনটি পূজা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। দুর্গাপূজাটি গত চারি বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ আছে। মণ্ডপটির দেওয়াল মাটির এবং উপরে খড়ের ছাউনি দেওয়া।

শ্রীপুরভাঙ্গা গ্রামের অধিবাসীগণের পূর্ব বসতি ছিল নিকটবর্তী প্রাচীন কয়া গ্রামে। গ্রামখানি ক্রমশঃ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া বসবাসের অযোগ্য হইয়া পড়ায় এবং সাধারণের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায় অনেকে গ্রাম ত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্তী একটি ফাঁকা জায়গায় ঘর বাড়ী তৈয়ারী করিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। নূতন এই গ্রামে গ্রামবাসীদের ক্রমশঃ স্বাস্থ্যের ও সম্পদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় বর্তমান গ্রামের মোড়ল শ্রীনন্দন মণ্ডলের পিতৃদেব ৺কুঞ্জবিহারী মণ্ডল মহাশয় গ্রামের নাম দিয়াছিলেন "শ্রীপুর"। অতঃপর "শ্রীপুর"-এর সহিত "ভাঙ্গা" কথাটি যোগ হইয়া গ্রামের নাম শ্রীপুরভাঙ্গা হইয়াছে। যতদূর জানা যায় এই গ্রামে বাংলা ১৩১৭ সনে সর্বপ্রথম জনবসতি আরম্ভ হয়।

শ্রীগৌরহরি মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : শ্রীপুরভাঙ্গা,
পোঃ বলরামপুর, মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : নওদাপাম্নুর।৭৬।৯৩৭'৯০।২৭৭।১,৫৮৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সংচাষী, কামার, বাগ্দী, মুচি, নাপিত এবং মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন এবং মোটর স্ট্যাণ্ড বহরমপুর কোর্ট। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখ সংক্রান্তিতে নাম সংকীর্তন মহোৎসব ও কালীপূজা, আষাঢ় মাসে মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা, মাঘ মাসে রটন্তী কালীপূজা ও শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী শিবপূজা ও চড়ক। এই গ্রামে পূর্বে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা হইত বর্তমানে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। আষাঢ় মাসে চারিদিনব্যাপী।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় বাহান্ন বৎসরে প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি কালী মন্দির এবং একটি কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীগুরুকুমার রায়চৌধুরী, শিক্ষক,
নওদাপান্নুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বারুইপাড়া,
মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম : ভাকুরী (মৌজা : চালতিয়া)।
৮১।১,২৬৭'৭২।৭৮০।৪,১৬৯

(ক) নমঃশূদ্র, মুসাহর, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) চৈত্রস ক্রান্তিতে সর্বজনীন শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিবের মৃন্ময় মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজাদি করা হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিবপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীবুদ্ধদেব রায়চৌধুরী, শিক্ষক,
ভাকুরী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চালতিয়া, মুর্শিদাবাদ।

১০। গ্রাম ঃ কয়া (মৌজা ঃ বৈরগাছি)। ৮২।১,৩৩২৩৫।৬১৭।২,৭১৩

(ক) মাহিষ্য, উগ্রক্ষত্রিয়, কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সারগাছি। গ্রাম হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের একটি রাস্তা বাহির হইয়া জাতীয় সড়কে মিশিয়াছে। জাতীয় সড়ক দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শেষ মঙ্গলবারে বনকালী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বনকালী দেবীর কোন মূর্তি নাই; গ্রামস্থিত একটি বড় বকুল গাছকেই কালী জ্ঞানে পূজা করা হয়। উৎসবটি সাধারণতঃ দুই-তিন দিন ধরিয়া চলে এবং পূজার শেষ দিনে সর্বজনীন ভোজ দেওয়া হয়। দেবীর নিকট স্বর্ণালঙ্কার মানত করা হয়। তাহাছাড়া, পূজার দিন কালীর নিকট পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। দেবীর প্রধান সেবায়েত ব্রাহ্মণ, পদবী চট্টোপাধ্যায় এবং কাশ্যপ গোত্র।

চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও গাজন। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি গত পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবমণ্ডপে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং একটি বড় বকুল গাছের নীচে বনকালী দেবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, এই গ্রামের সন্নিহিত একটি বিল দিয়া নাকি মঙ্গলকাব্যে উল্লিখিত চাঁদ সদাগর তাহার বজরা লইয়া যাতায়াত করিতেন; তাঁহার নামানুসারেই বিলটি "চাঁদবিল" নামে খ্যাত হইয়াছে। বিলের জলকে গ্রামবাসীরা "কো আয়া" বলেন। খুব সম্ভবতঃ এই গ্রামের "কো আয়া" কথাটি অপভ্রংশ করা হইয়াছে।

শ্রীপ্রশান্তকান্তি সেনগুপ্ত, শিক্ষক,
রামকৃষ্ণ মিশন হাইস্কুল,
সারগাছি, মুর্শিদাবাদ।

১১। গ্রাম ঃ বিষ্ণুপুর ।৯৩।১৬২৩৩ (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র ও শবর।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষি মজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাশিম বাজার। বহরমপুর শহর হইতে একটি পাকা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করুণাময়ীকালীকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বার্ষিক পূজা এবং সারা পৌষ মাস ব্যাপী বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব দুইটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা ভিন্ন, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গা-পূজা ও পুণ্য স্নান উপলক্ষে বহুলোকের সমাগম হয়।

(ঙ) করুণাময়ীকালী পূজার মেলা। পৌষ মাসে একমাসব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে করুণাময়ীকালীর পাকা মন্দির আছে। দেবীর ভৈরব মহাকালের স্থান উক্ত মন্দিরের মধ্যে অবস্থিত।

স্থানীয় গ্রামবাসীর ধারণা যে, কোন এক সময় এই গ্রামে বিষ্ণু উপাসকের প্রাধান্য ছিল বলিয়া গ্রামের নাম বিষ্ণুপুর হইয়াছেল।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার গুপ্ত, সহকারী গ্রন্থাগারিক,
মুর্শিদাবাদ জেলা গ্রন্থাগার,
গোরাবাজার, বহরমপুর,
মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : বহরমপুর

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

আরোয়া গ্রামে একটি গাছের নীচে বনকালী দেবীর মূর্তি ও তাঁহার ভৈরব শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। চক্ষু-কর্ণ-নাসিকা খোদিত একটি প্রস্তর নির্মিত মুখমণ্ডলকেই কালী ধ্যানে এবং একটি অগ্রভাগ সূঁচাল লম্বা একটি পাথর খণ্ডকে শিবের ধ্যানে পূজা করা হয়। কালীপূজাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

সারা বৎসর প্রতি শনি ও মঙ্গলবার বনকালীর স্থানে পূজা হয়। জনৈক পূজারিণী, যাঁহাকে দেয়াসীন বলা হয়, প্রতি শনি-মঙ্গলবারে বনকালীর পূজাদি করিয়া থাকেন। পূজার পর পূজারিণীর উপর দেবীর ভর হয়। ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধপত্রাদি দিয়া থাকেন। শনি-মঙ্গলবারের পূজায় দেবীর নিকট পূজা দিতে এবং ঔষধ প্রাপ্তির আশায় দূরদূরান্ত হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। শুনা যায়, পূজারিণীর নিকট হইতে দেবদত্ত ঔষধ পাইয়া বহুলোক দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। আরোগ্যলাভের পর মানতকারীরা দেবীর নিকট যোড়শোপচারে পূজা ও পাঁঠা বলি দিয়া থাকেন। ভক্তরা অনেকে উক্ত পূজারিণীকেই স্বয়ং কালীমাতা বলিয়া মনে করেন।

প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে শেষ মঙ্গলবার মহাধুমধামের সহিত বনকালী দেবীর বাৎসরিক পূজা হইয়া থাকে। পূজার দিন গ্রামের অধিকাংশ নরনারী পূজা শেষ না হওয়া অবধি উপবাসী থাকেন, এমনকি কোন কোন বাড়ীতে উনান জ্বালান বন্ধ থাকে। প্রাতঃকালে ভক্তরা গঙ্গাস্নান করিয়া প্রত্যেকে এক কলসী করিয়া গঙ্গার জল বনকালীর স্থানে আনিয়া দেন। মধ্যাহ্ন বনকালীর যথারীতি পূজা হয়। এই সময় গৃহস্থদের বাড়ী হইতে লবনহীন ব্যঞ্জন দেবীর ভোগের জন্য নিবেদন করিয়া থাকেন। এই সকল ব্যঞ্জন পূর্ব রাত্রিতেই প্রস্তুত করা হয়। পূজার শেষে ভক্তরা দেবীর প্রসাদ ও ভোগ গ্রহণ করিয়া উপবাস ভঙ্গ করেন। উৎসবের দিন হইতে সাতদিন প্রত্যহ গ্রামের প্রতি বাড়ী হইতে গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনায় কালীর স্থানে একটি করিয়া প্রদীপ জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। উৎসব কালে জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা কালীর পূজা হইয়া থাকে, এই দিন দেবীর পূজারিণী পূজা করেন না। উৎসব উপলক্ষে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নর-নারী দেবীর নিকট পূজা দিতে আসেন। বনকালী দেবীর সেবায়েত তিলি সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহাদের পদবী পাল।

বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত করুণাময়ী কালী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবীর বর্তমান মন্দিরটি ও তৎসংলগ্ন অতিথিশালাটি লালগোলার রাজপরিবার কর্তৃক নির্মিত। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে চার হাত বিশিষ্ট দেবীর অর্ধাঙ্গ মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। মন্দিরের মধ্যেই দেবীর ভৈরব মহাকাল শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

করুণাময়ীকালীর প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, এই গ্রামে কৃষ্ণদাস হোতা নামে জনৈক ব্যক্তি বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ-র অধীনে কাজ করিতেন। তিনি অপুত্রক ছিলেন বটে, তবে তাঁহার একটি পালিত কন্যা ছিল। কন্যাটির নাম করুণাময়ী। শিশুকালে করুণাময়ীকে তিনি পথে ক্রন্দনরতা দেখিয়া লালন-পালনের জন্য গৃহে আনিয়াছিলেন। ক্রমেই করুণাময়ী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল; কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে সমাজে নানাপ্রকার সমালোচনার জন্য কৃষ্ণদাস বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কন্যার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি কন্যাকে লইয়া স্ব-গ্রাম ত্যাগ করিয়া কাশীতে যাইবেন বলিয়া মনস্থির করিলেন। এমন সময়, নবাব আলীবর্দীর সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কম্পানীর ইংরাজদের মনোমালিন্য শুরু হয়। কৃষ্ণদাস হোতা নবাবের বিশ্বস্ত কর্মচারী, তাই নবাব তাঁহার উপর দায়িত্বপূর্ণ রাজ-কার্যের ভার অর্পণ করিলেন; ফলে কৃষ্ণদাসের কাশী

যাওয়া স্থগিত রহিল। একদিন কৃষ্ণদাস রাজকার্যে বাহির হইলে করুণাময়ীও তাঁহার সঙ্গে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল এবং বারবার নিষেধ সত্ত্বেও করুণাময়ী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িল না। কিছুদূর যাইবার পর পথে করুণাময়ী পায়ে আঘাত পাইয়া একাকী গৃহাভিমুখে ফিরিতে বাধ্য হইল। এদিকে কৃষ্ণদাস কাষ শেষে গৃহে ফিরিয়া করুণাময়ীকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়েন এবং চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ বিলের নিকটবর্তী শ্মশানঘাটে আসিয়া উপস্থিত হন। এই সময় তিনি এক দৈববাণীতে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার কন্যারূপী করুণাময়ী স্বয়ং জগন্মাতা কালী এবং তিনি বর্তমানে শশ্মানের নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষের কোটরে অবস্থান করিতেছেন। দৈববাণী অনুসারে তিনি নির্দিষ্ট বৃক্ষকোঠরে চতুর্হস্ত বিশিষ্টা কালীর অর্ধাঙ্গ মূর্তি দেখিতে পান।

করুণাময়ী সম্পর্কে আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, কালাপাহাড় যখন দক্ষিণ ভারতে দেবদেবীর মূর্তি ও মন্দিরগুলি ধ্বংস করিতেছিলেন, তখন জনৈক ব্যক্তি কালাপাহাড়ের হাত হইতে করুণাময়ী কালীমূর্তিটিকে রক্ষা করিবার জন্য উল্লিখিত মূর্তিসহ দক্ষিণ ভারত হইতে যাত্রা করিয়া নানাস্থানে পরিভ্রমণান্তে উড়িষ্যায় আসিয়া হাজির হন এবং পুরী যাইবার পথে মূর্তিটিকে রক্ষা করা আর সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া নদীতে নিক্ষেপ করেন। কালক্রমে নদী বাহিত হইয়া মূর্তিটি মুর্শিদাবাদ জেলার বিষ্ণুপুর শ্মশান ঘাটের নিকট পূর্ব উল্লিখিত বটগাছের কোঠরে আঁটকাইয়া থাকে। কৃষ্ণদাস কন্যার অনুসন্ধান করিতে আসিয়া দৈববাণীতে উক্ত মূর্তির সন্ধান পান। দক্ষিণ-ভারতের ভাস্কর্যের সহিত বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত কালীমূর্তিটির সাদৃশ্য দখিতে পাওয়া যায়।

প্রতি বৎসর পৌষ মাসে প্রতি শনি-মঙ্গল বার করুণাময়ী কালীর ধূমধামের সহিত পূজা হয় এবং রটন্তী চতুর্দশী তিথিতে সর্বাপেক্ষা জাঁকজমকপূর্ণভাবে দেবীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পূজা ও উৎসব নিয়মিতভাবে চলিয়া আসিতেছে। রটন্তীকালী পূজার দিন দেবীর ষোড়শোপচারে পূজা ও শিবাভোগ দেওয়া হয়। এই দিন সমাগত ভক্ত ও যাত্রীরা মন্দিরের আশেপাশে বনভোজনের আয়োজন করেন। ইহা এই উৎসবের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পরের দিন সর্বজনীন অন্নছত্র ও ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সীমান্তবর্তী অন্যান্য জেলা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দশহাজার নর-নারী আসিয়া থাকেন।

দেবীর নিকট মাথার চুল, পাঁঠা ও ভেড়া বলি, সোনার বাটিতে করিয়া বুকের রক্ত, সোনা বা রূপার চোখ, কাপড়, তামা-পিতলের থালা প্রভৃতি মানত করা হয়। নিঃসন্তান স্ত্রীলোকেরা নিকটস্থিত বিলে স্নান করিয়া ভিজা কাপড়ে মন্দির সংলগ্ন বটবৃক্ষে সন্তান কামনা করিয়া ইঁট বা পাথর বাঁধিয়া দেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ হইলে দেবীর নিকট মানসিক পূজা দিয়া যান।

দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হইয়া থাকে :

> শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাং।
> হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপাল কর্তৃকাকরাং॥
> মুক্তকেশং লোলজিহ্বাং পিবন্তিং রুধিরং মুহুঃ।
> চতুর্বাহুযুক্তাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

সুঙ্গাই গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শিবলিঙ্গটি প্রস্তর নির্মিত এবং গৌরীপট্টযুক্ত। শোনা যায়, শিবলিঙ্গ ও মন্দিরটি রাণী ভবাণীর আমলে প্রতিষ্ঠিত এবং তদবধি শিবের পূজা ও উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

চৈত্রসংক্রান্তির সাতদিন পূর্ব হইতে উৎসব সুরু হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সাড়ম্বরে শিবের যথারীতি পূজা, সংক্রান্তির পূর্বদিন নীলপূজা এবং সংক্রান্তি তিথিতে চড়কপূজা হইয়া থাকে। উৎসবে প্রতি বৎসর আট-দশ জন ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়।

শিবের নিত্য সেবা-পূজা হইয়া থাকে।

শীতলাপূজা

আন্দারমানিক গ্রামে একটি বিশাল বটবৃক্ষের নীচে অবস্থিত মন্দিরে শীতলা দেবীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটির উচ্চতা নয় ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাত ইঞ্চি। মূর্তির উভয় পার্শ্বে দুইটি নারী মূর্তি খোদিত আছে। মন্দিরটি পাকা এবং ইহার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে পনের, আট এবং নয় ফুট হইবে।

শোনা যায়, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের কালাচাঁদ মণ্ডল নামে জনৈক ভূত চাষী তাঁহার জমিতে চাষ করিবার সময় ভূগর্ভ হইতে মূর্তিটি পান এবং সেই রাত্রিতেই স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীর পূজাদির ব্যবস্থা করেন। তদবধি দেবীর নিত্য পূজা চলিয়া আসিতেছে। জনৈক ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ দেবীর পূজাদি করেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি শনি মঙ্গলবার দেবী বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৈশাখ মাস পড়িবার প্রায় এক সপ্তাহ পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। বৈশাখ মাসের শনি-মঙ্গলবার প্রত্যহ সকাল হইতে প্রায় রাত্রি আট ঘটিকা পর্যন্ত দেবীর পূজা হয় এবং পূজান্তে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। আন্দারমানিক গ্রামের এই শীতলা বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। উৎসবের সময় মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বীরভূম, নদীয়া ও বর্ধমান জেলা হইতে অনেকে দেবীর নিকট মানত পূজাদি দিতে আসেন। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা, সোনা ও রূপার অলঙ্কার এবং পায়রা মানত করা হয়। নিম্নবর্ণের হিন্দুগণ ও মুসলমান সম্প্রদায় দেবীর নিকট পূজা ও মোরগ মানত করিয়া থাকেন। তাঁহারা গ্রামের উচ্চবর্ণ হিন্দুদের নিকট টাকা-পয়সা অথবা জিনিসপত্র কিনিয়া দিয়া পূজার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসের পূজায় দেবীর নিকট কোনরূপ পশু বলি দেওয়া নিষিদ্ধ। এই কারণে বৈশাখ মাসে মানতের পশু-পক্ষীগুলিকে দেবীর নিকট উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়; বৎসরের অন্যান্য মাসে পশু-পক্ষী বলি দেওয়ায় কোন বাধা নাই।

মুর্শিদাবাদ শহরে আদিনাথ
মন্দিরের প্রবেশদ্বার

আদিনাথ মন্দির
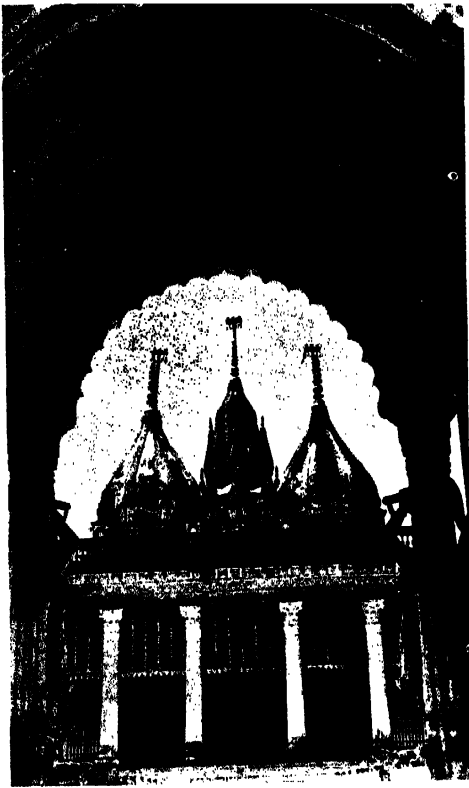
মুর্শিদাবাদ শহরের
চাদনীচকে অবস্থিত
বড় মসজিদ

মুর্শিদাবাদ শহরের উপকণ্ঠে
অবস্থিত রত্নেশ্বর শিবমন্দির এখন
কালের আঘাতে জীর্ণ—পোড়া-
মাটির শিল্পকার্যসমৃদ্ধ মন্দির-
গাত্রে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী
ও রামায়ণ-মহাভারতের বিচিত্র
দৃশ্যাবলী উৎকীর্ণ

মুর্শিদাবাদ শহর
হইতে দুই ক্রোশ
পশ্চিমে
কিরীটেশ্বরীর
প্রাচীন মন্দিরের
ভগ্নস্তূপের মধ্যে
নবনির্মিত বর্তমান
মন্দির

কিরীটেশ্বরীর প্রাচীন
মন্দিরের সন্নিকটে
কয়েকটি পরিত্যক্ত
প্রাচীন মন্দির
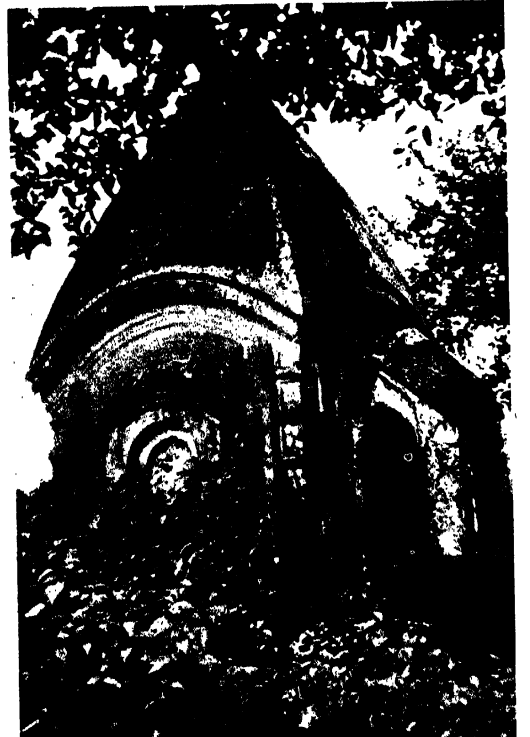
কিরীটেশ্বরী মন্দির-প্রাঙ্গণে কালিসাগর
সরোবরতীরে ভগ্নপ্রায় দেউলটি কালভৈরব
শিবের নামে উৎসর্গীকৃত

মুর্শিদাবাদ জেলার
বড়নগরে নাটোরের
রানী ভবানী
নির্মিত অষ্টকোণাকৃতি
ভবানীশ্বরের মন্দির

মুর্শিদাবাদ শহরের শাহনগর
অঞ্চলে ভাগীরথীকূলে
অবস্থিত জোড়া শিবমন্দির

কান্দী শহরে জেমো
অঞ্চলে অনুষ্ঠিত
রুদ্রদেবের
বাৎসরিক গাজন
উৎসব উপলক্ষে
মন্দির প্রাঙ্গণে
ভক্ত ও দর্শকের ভীড়

রুদ্রদেব মন্দিরের
বহিঃপ্রাঙ্গণে
গাজনোৎসব
উপলক্ষে অনুষ্ঠিত
মেলার একটি দৃশ্য
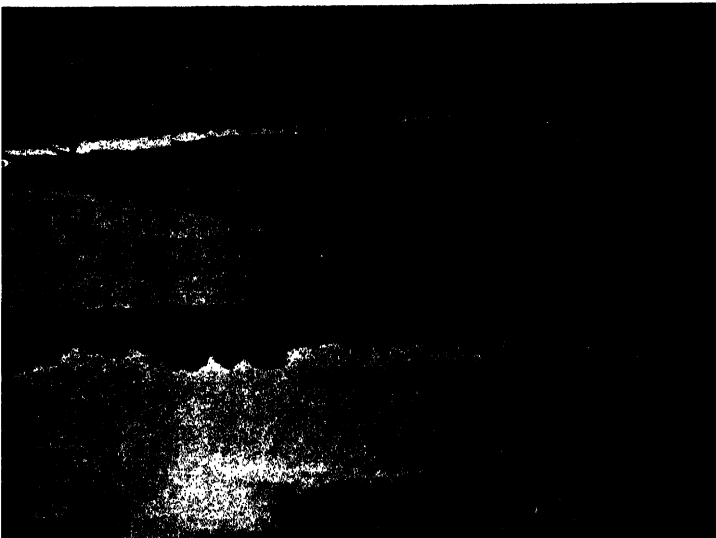
মুর্শিদাবাদ শহরে
বেরা উৎসব
পলক্ষে কিল্লা
নিজামতের সম্মুখে
ভাগীরথীতে
ভাসমান
কলাগাছের ভেলা

মুর্শিদাবাদ ইমামবাড়া
প্রাঙ্গণে রক্ষিত
বাঁশ ও কাগজের
প্রস্তুত বেরা উৎসব
উপলক্ষে নির্মিত
মকরমুখী নৌকা।

মুর্শিদাবাদ জিলার সাগরদীঘি
থানার চন্দনবাটী গ্রামে
নূতন শিবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত
শিবলিঙ্গটি এক দীর্ঘিকা খনন-
খননকালে প্রাপ্ত এবং
পালযুগীয় বলিয়া অনুমিত

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ বহরমপুর

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(মাদার সাহেব)

জগন্নাথপুর গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে মাদার সাহেব নামে জনৈক ফকিরের উৎসব উপলক্ষে প্রায় বার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। উক্ত জমি মাদার সাহেবের নামে উৎসর্গীকৃত।

মেলায় যাত্রী সমাগম ও দোকানপাটের সংখ্যা এই গ্রামে অনুষ্ঠিত শিবরাত্রি মেলার অনুরূপ।

কালীপূজার মেলা

বিষ্ণুপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে করুণাময়ী কালীর বিশেষ পূজা উপলক্ষে কালীমন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপরে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং নদীয়া ও বীরভূম জেলা হইতে প্রতিদিন মেলায় প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা ট্রেনে, মোটরবাসে, এবং ঘোড়ার গাড়ী ও গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মুর্শিদাবাদ, নদীয়া, বীরভূম ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ইহাভিন্ন, বহু ফেরীওয়ালা মেলায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিক্রয় করেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে তেলেভাজা, মিষ্টিখাবার, মনিহারী, মাটির ও প্লাষ্টিকের খেলনা-পুতুল এবং লোহার তৈয়ারী নানারকম জিনিসপত্রের দোকানই বেশী দেখা যায়। ইহাভিন্ন, অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে।

কয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার কালীপূজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত পাঁচ ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। এই গ্রামে একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষের নীচে কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। সীমান্তবর্তী সংগ্রামপুর, শ্রীপুরডাঙ্গা ও কয়া গ্রামের অধিবাসীরা সর্বজনীনভাবে এই উৎসব ও মেলার পরিচালনা করেন। মেলার জমির কিছু অংশ দেবোত্তর এবং কিছু অংশ স্থানীয় গ্রামবাসীর। মেলায় সাধারণতঃ ভাকুড়ী, নওদাপাড়ুর এবং ভাতুর নিশ্চিন্তপুর হইতে প্রায় দেড়-দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ সাইকেলে ও পদব্রজে মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বলরামপুর, বহরমপুর শহর, বাপীনাথপুর, জিতপুর, কালীতলা, মাড্ডা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটির মত দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, বাসনকোসন, কাপড়চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, বই-ছবি, বলরামপুরের কারুশিল্প-জাত জিনিসপত্র এবং ফলমূল, আইসক্রীম, পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় সারাদিনব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন হয় এবং কোন কোন বৎসর বোলান গান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীরাধাগোবিন্দ মণ্ডল, গ্রামঃ শ্রীপুরডাঙ্গা, পোঃ বলরামপুর, মুর্শিদাবাদ। ইহা-ছাড়া, কয়াগ্রামের শ্রীরামপ্রসাদ বিশ্বাস মহাশয়ের একটি যাত্রাগানের দল আছে। এই মেলায় কোন কোন বৎসর কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়। অধিকারীর নাম—শ্রীসতীশ চন্দ্র বিশ্বাস, গ্রামঃ কয়া, পোঃ বলরামপুর।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে নওদাপাড়ুর গ্রামে শিবের গাজন উপলক্ষে শিবমন্দির সংলগ্ন উপাস্য দেবতার

প্রায় দশ কাঠা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় বারো বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ নওদাপাড়ার ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুইশত যাত্রী মেলায় আসেন।

মেলায় স্থানীয় লোকেরাই দোকানপাট দেন এবং বলরামপুর কলোনী হইতে প্রতি বৎসর কয়েকজন বিক্রেতা আসেন। ময়রা ও তেলেভাজার দোকান ব্যতীত অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং দুই চার জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য মনসার ভাসান গান, বোলান ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে তন্দাই গ্রামে শিবের গাজন ও চড়কপূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে; সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়। রাণী ভবানীর আমল হইতেই এই গ্রামে শিবপূজা ও তদুপলক্ষে মেলাটি বসিতেছে। মেলায় সাধারণতঃ গোরাবাজার, বাসুদেবখালি, লোকপুর, জগন্নাথপুর, কলাবেড়ে এবং যদুপুর ইত্যাদি স্থান হইতে প্রায় দুই আড়াইশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে এবং পদব্রজে আসেন।

মেলায় দশ-পনরটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ গোরাবাজার ও বলরামপুর হইতে প্রতি বৎসর আসেন; দোকান-পাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকানপাট থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, যাত্রা-গান, বোলান গান এবং ছ্যাচর প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। জগন্নাথপুর হইতে কোন কোন বৎসর কৃষ্ণযাত্রার দল আসে; অধিকারী শ্রীঅভয় পদ মণ্ডল, গ্রামঃ জগন্নাথপুর, পোঃ বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ।

শিবরাত্রির মেলা

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে জগন্নাথপুর গ্রামে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় একবিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশি-নব্বই বৎসরের প্রাচীন। মেলায় গোরাবাজার, বাসুদেবখালি, লোকপুর, জগন্নাথ-পুর, তন্দাই, কলাবেড়ে, যদুপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই আড়াইশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী ও পদব্রজে আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ গোরাবাজার, বলরাম-পুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন; মেলায় মাত্র দশ-বারটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকান থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়, নাগর-দোলা, ছ্যাচরা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে একটি কৃষ্ণযাত্রার দল আছে; অধিকারীর নাম—শ্রীঅভয় পদ মণ্ডল।

শীতলাপূজার মেলা

আন্ধারমানিক গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলা দেবীর পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন বিরাটকায় একটি বটবৃক্ষের নীচে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় সাত-আট বিঘা পরিমাণ জমির উপর একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রত্যহ পার্শ্ববর্তী গোরাবাজার ক্যান্টনমেণ্ট, কাশিমবাজার, লালবাগ, নশিপুর, জিয়াগঞ্জ, আজিমগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, শক্তিপুর, রাঙ্গামাটি চাঁদপাড়া, চিরটি, সাটুই প্রভৃতি গ্রাম হইতে এবং বীরভূম, বর্ধমান ও নদীয়া হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ভুক্ত পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীগণ প্রধানতঃ মোটর, লরি, ঘোড়াগাড়ী, গরুরগাড়ী, রিকসা ও নৌকাযোগে আসেন।

স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন প্রতি বৎসর মেলায় জিয়াগঞ্জ, জঙ্গীপুর, লালবাগ, বেলডাঙ্গা, ডোমকল, জলঙ্গী, ভগীরথপুর, পাটিকাবাড়া, কান্দী, পাঁচথুপি, পুরন্দরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ আসেন; মেলায় প্রায় আড়াই-শত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, বই-ছবি কারুশিল্প সামগ্রী, কাপড়চোপড়, বাসনকোসন, ঔষধপত্র, ধর্মপুস্তকাদি, কাঁসা বা কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাছাড়া, শাঁখা, শাঁখার কণ্ঠহার, বালা, আংটি, বোতাম, কাচের চুড়ি, অ্যালুমিনিয়মের জিনিসপত্র, মুর্শিদাবাদ হইতে হাতীর দাঁতের বোতাম, চিরুণী, আংটি, বালা, কণ্ঠহার ও নানাজাতীয় সৌখীন পুতুল, সাগরদীঘি, জঙ্গীপুর, কিরিটেশ্বরী হইতে মুসলমান সম্প্রদায়ের তৈয়ারী বাঁশের বাঁশী, ছাতি; কান্দী, হরিহরপাড়া ও ভগীরথপুর হইতে নানাবিধ বেতের জিনিসপত্র, কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মাটির পুতুল ইত্যাদির দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে জমিদারের পক্ষে দান বা তোলা আদায় করা হয় এবং বিক্রেতাগণ পূজার জন্য চাঁদা স্বরূপ টাকা পয়সা দিয়া থাকেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য একমাসব্যাপী নাগর-দোলা ও ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য সিনেমা প্রদর্শনী, বাঁদর-নাচ, সাপখেলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী এবং যাত্রা-থিয়েটার, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যুবকদল কর্তৃক যাত্রা, থিয়েটার অভিনীত হয়। এই মেলায় বিশেষ আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানের স্থানীয় সাঁওতালদিগের নানা প্রকার নৃত্যগীত, মাদল বাজনা, বাঁশের বাঁশী ও মুখোসনৃত্য। তাহাছাড়া, মেলায় পনর-কুড়ি মাইল দূর হইতে কীর্তনীয়ার দল আসিয়া মন্দিরের চতুঃপার্শ্বে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কীর্তনগান করেন এবং পূর্ববঙ্গ হইতে আগত গোয়ালজান কলোনীর উদ্বাস্তুগণ লোকগীতি, লোক-নৃত্য করিয়া থাকেন। গ্রামেও কীর্তনের দল আছে; অধিকারীর নাম—শ্রীসর্বরঞ্জন মণ্ডল। উপরোক্ত অনুষ্ঠানের শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা প্রত্যহ গড়ে প্রায় পাঁচ-সাত শত।

সরস্বতীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে বাসুদেবখালি গ্রামে ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সাধারণতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ রাধারঘাট, রাঙামাটি চাঁদপাড়া, কান্দী, মহালনদী, সোকর্ণ, বীরভূম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় দশ-বার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, মহিষের গাড়ী ও ঘোড়ার গাড়ীতে, ট্রেনে, ঘোড়ায়, সাইকেলে ও নৌকাযোগে আসেন।

স্থানীয় বিক্রেতাগণ ব্যতীত খাগড়া, বহরমপুর শহর, সৈয়দাবাদ, গোরাবাজার, মহালনদী, মুক্তারপুর, ধুলিয়ান, কলাবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরীওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড় এবং বই ছবি প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কাঠের ও মাটির পুতুল খেলনা, শাকসব্জী ইত্যাদির দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং স্থানীয় যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়; অধিকারীর নাম—শ্রীবলরাম মৈত্র, গ্রাম: পাঁচকোট পোঃ বহরমপুর। যাত্রার আসরে প্রায় চার-পাঁচশত শ্রোতার সমাগম হয়। মেলায় লটারী ও জুয়া খেলা চলে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ

থানা : খড়গ্রাম

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : চেঁচুড়িয়া (মৌজাঃ শ্রীপুর)।

৪।৬১১৪৩।৯২।৫৪৫

(ক) সদ্‌গোপ, কুনাই, ডোম, শেট, তিলি, নাপিত ও সাহা।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামপুরহাট হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে নামসংকীর্তন মহোৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা এবং চৈত্রে বানেশ্বর শিবপূজা। দুর্গাপূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের এবং কালীপূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

ইহা ভিন্ন, গ্রামে রথযাত্রা, দোলযাত্রা, নন্দোৎসব, জিতাষ্টমী, গোপাষ্টমী, স্বপূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, শিবরাত্রি, পৌষপার্বণ এবং প্রায় প্রতি ঘরে মনসাপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পাঁচটি শিবলিঙ্গ (তন্মধ্যে একটি পিত্তল নির্মিত), দুর্গাপূজার জন্য একটি মাটির দেবালয় এবং কালী ও গ্রামদেবতার নির্দিষ্ট স্থান আছে। একটি পাকুড় গাছের নীচে রক্ষিত একখণ্ড পাথরকে গ্রাম-দেবতা রূপে পূজা করা হয়।

শ্রীকরালী প্রসাদ ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম : ঘাসপুর, পোঃ কোনাডাঙ্গা,
মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : পলাশী। ২৭।৩৬১'৪৬।১২০ ৭০৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সুবর্ণবণিক, নাপিত, পুণ্ড্রীক, কুড়ী, মাল, কুনাই ও মুচি। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন রামপুরহাট।

(ঘ) বৈশাখে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, চৈত্রে শিবপূজা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিব, ধর্মরাজ ও গ্রামদেবতার প্রস্তর মূর্তি এবং জনৈক মহান্ত ঠাকুরের সমাধিমন্দির আছে। কথিত আছে যে, উক্ত মহান্ত বৈষ্ণব সাধক ছিলেন এবং তাঁহার ইচ্ছানুসারে জীবিত অবস্থায় তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। সময় সময় তাঁহার ভক্তগণ এই মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে সমাধিস্থানে হরিনাম সংকীর্তন করিয়া থাকেন এবং ফলমূল ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি ভোগ দিয়া পূজা করিয়া থাকেন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দত্ত, শিক্ষক,
গ্রাম : পলাশী, পোঃ দেবী পাকুড়িয়া,
মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : জয়পুর। ৩০।১,৩১২'০৯।২৬৫।১,৩০২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, বারুজীবি, সদ্‌গোপ, বৈরাগী, মাহিষ্য, স্বর্ণকার, চুনারী, ছুতার, চামার, কলু, হাড়ী, ডোম, কৈবর্ত, রাজবংশী, শুঁড়ী ও কুনাই।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) পূর্ব-ভারতীয় রেলপথে বীরভূম জেলার রামপুরহাট রেলস্টেশন হইতে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত সাত মাইল রাস্তা মোটরবাসে আসিয়া সেখান হইতে গরুর গাড়ী অথবা হাঁটিয়া পূর্বদিকে চার মাইল রাস্তা অতিক্রম করিলে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি বহুদিনের প্রাচীন।

চৈত্রসংক্রান্তির পাঁচদিন পূর্ব হইতে বুড়াশিবের গাজন উৎসব আরম্ভ হয়। শুনা যায়, বুড়াশিবের প্রতীক শিবলিঙ্গটি বহুকালের প্রাচীন। গাজনের পর ভক্তগণের "দাদরী কাটা" বা সর্বজনীন ভোজ

হয়। সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ভৈরব বুড়াশিব। ইহাভিন্ন, বৈশাখ মাসে অথবা বৎসরের যে কোনদিন মহামারীর আক্রমণ হইতে পরিত্রাণের জন্য বা অবৃষ্টির জন্য গ্রামদেবীর পূজা করা হয়। পূজাটি বেশ প্রাচীন। সাধারণতঃ শনি বা মঙ্গলবারে পূজা দেওয়া হয় এবং দেবীর প্রসাদ সবসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দেবীর নিকট মানত হিসাবে চিড়া ও মিষ্টান্ন দেওয়া হয়।

(ঙ) সিদ্ধেশ্বরী পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সিদ্ধেশ্বরীর একটি পাকা মন্দির ও গ্রামদেবীর একটি টিনের ঘর আছে। ইহাভিন্ন, কালীতলা, মড়কতলা, মাদারতলা, সৌম তলা ও অন্যান্য দেবদেবীর নামে কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামদেবী তলায় অবস্থিত টিনের ঘরে গ্রামদেবীর শিলামূর্তির সহিত "নাককাটা" নামে একটি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরের বিষ্ণুমূর্তি আছে। মূর্তিটির আকৃতি দেখিয়া মনে হয়, ইহা বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্তির অন্যতম উপেন্দ্রমূর্তি। চতুর্হস্ত বিশিষ্ট মূর্তির দক্ষিণের নীচের হস্তে শঙ্খ, উপর হস্তে গদা এবং বামের নীচের হস্তে পদ্ম ও উপর হস্তে চক্র বিদ্যমান। এই মূর্তিটির দক্ষিণে লক্ষ্মীদেবী ও বামে বীণা হস্তে সরস্বতী দেবীর মূর্তি এবং উপরে ও নীচে বিষ্ণুর নানাপ্রকার লীলা দৃশ্য খোদিত আছে। বিগ্রহের নাসিকা ও দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন। তাই মূর্তিটি "নাককাটা" নামে অভিহিত। অনুমান করা হয় কালাপাহাড় দ্বারা বিগ্রহটি এইরূপ ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। মূর্তিটির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; তবে শোনা যায় যে, গ্রামের জমিদার স্বর্গীয় কৃষ্ণ চন্দ্র হোতা কর্তৃক "হোতা দীঘি" খনন কালে এই মূর্তিটি পাওয়া যায় এবং পরে তিনি এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন।

মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিম সীমান্তে এই গ্রামটি অবস্থিত। জয়পুর গ্রামের উত্তর সীমান্তে দ্বারকা নদী। কথিত আছে, আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে এই স্থানে জয়বর্ধন বা জয়রায় নামে এক ছোট জায়গীরদার বাস করিতেন। অনুমান করা হয়, উক্ত জায়গীরদারের নাম হইতেই গ্রামের নাম "জয়পুর" হইয়াছে। বঙ্গদেশে মুর্শিদকুলী খাঁ-র রাজত্বকালে ও তাঁহার পরবর্তী কালেও এই জয়রাজবংশের হলধর রায় ও শ্রীধর রায় নামে দুই ভ্রাতা বাস করিতেন। গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাভিন্ন, গ্রামের পূর্বপ্রান্তে জেলা বোর্ডের রাস্তার উভয় পার্শ্বে "ছোটরায়জী" ও "বড়রায়জী" নামে দুইটি পুষ্করিণী আজিও উভয় ভ্রাতার স্মৃতি বহন করিতেছে। বর্তমানে ইঁহাদের দৌহিত্র বংশ বিদ্যমান।

শ্রীঅন্নদা রঞ্জন দত্ত, ভারতী মন্দির,
পোঃ জয়পুর-ভায়া-খড়গ্রাম,
মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম ঃ ইন্দ্রানী। ৪০।১,১১৩'০৮।৪৬৫।২,৫৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, নাপিত তাঁতী, সুবর্ণবনিক, গন্ধবনিক, চামার, কুনাই, বাগদী, রাজবংশী, ঢুলী, ময়রা, কামার, ধোপা, তেলি, শুঁড়ী এবং মুসলমান।

গ্রামে আটারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) বহরমপুর হইতে কান্দী হইয়া ইন্দ্রানী পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। তাহাছাড়া, দ্বারকা ও ভাগীরথী নদীতে নৌ চলাচলের সুবিধা আছে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, চৈত্র মাসের বাসন্তী নবমীতে সিংহবাহিনী পূজা। উল্লিখিত উৎসব দুইটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে সিংহবাহিনী দেবীর এবং জগন্নাথদেবের মন্দির আছে।

ইন্দ্রানী গ্রামটি বেশ প্রাচীন শোনা যায়, ষোড়শ শতাব্দীতে দিল্লীর বাদশাহ আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত বাংলার নবাব কতলু-খাঁর পুত্র ওসমানের মনসবদার ইন্দ্রের সহিত খড়গ্রাম থানার অধীন আতই এর সন্নিকটে যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ওসমান পরাজিত হন। তখন মনসবদার ইন্দ্র তাঁহার সঙ্গীদের লইয়া এইখানে বসবাস করিতে থাকেন। এই মনসবদারের নামানুসারেই গ্রামের নাম হইয়াছে ইন্দ্রাণী। গ্রামে একটি প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ইন্দ্রানী,
মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : পারুলিয়া।৭৪।১,২৩১ ৮৩।৩৯৮।২,২৫৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, তাঁতী, গন্ধবণিক, সদ্গোপ, তিলি, ছুতার, রাজপুত, স্বর্ণকার, মাল, কুনাই, হাড়ী, ডোম, সেট, মুচি, বৈরাগী, শঙ্খবণিক, নাপিত, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামপুরহাট। গ্রামে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালে কান্দি-পারুলিয়া রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্রে ইন্দ্রপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, মাঘে ব্রহ্মদৈত্যপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুর্গা, শিব, ধর্মরাজ এবং ব্রহ্মদৈত্য—প্রত্যেকের মণ্ডপ আছে। ইন্দ্রের মন্দির আছে। মঙ্গলচণ্ডীর ও শ্যামরায়ের নিত্য পূজা হয়। ধর্মরাজ ও শিবের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি আছে।

শ্রীসঙ্কর্ষণ দে, প্রধান শিক্ষক,
গ্রাম : পারুলিয়া, পোঃ দেবী পারুলিয়া,
মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : মহম্মদপুর।৭৯।১,৩৩৩·৫৫।২৫৩।১,২৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, বনিক, নাপিত, স্বর্ণকার, ছুতার, কুনাই, হাড়ী, মুচি, শুঁড়ী ও মুসলমান। গ্রামের তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন রামপুরহাট। মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত মন্দির আছে।

শ্রীঅর্ধেন্দু শেখর ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
কোনাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : মহম্মদপুর, পোঃ এড়োয়ালী,
মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : মাড়গ্রাম। ৮৮।৪১০·৬২।২৪০।১,৩০৮

(ক) তাঁতী, কুমার, গন্ধবণিক, কামার, বৈরাগী ব্রাহ্মণ, ধোপা, নমঃশূদ্র, তিয়র, মাল, ডোম, ছুতার, নাপিত, স্বর্ণকার ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে দুই মাইল পশ্চিমে বাদশাহী সড়কে মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

গ্রামের একটি মন্দিরে গোপীনাথ বিগ্রহ সহ কৃষ্ণ এবং রাধিকার যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শোনা যায় সনাতন গোস্বামী জয়পুর করৌলি হইতে ঐ বিগ্রহগুলি আনিয়া গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। পূজারী ব্রাহ্মণ। নিত্য পূজায় এগার সের চালের ভোগ, পায়সান্ন, ছানা, মাখন, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দ্বারা অন্নভোগ দেওয়া হয়। এই ভোগ সাধারণের মধ্যে

বিতরণ করা হয়। গোপীনাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দোল, ঝুলনযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, নবান্ন, নন্দোৎসব ইত্যাদি উৎসব পালন করা হয়। প্রতিদিন মন্দিরে হরিনাম সংকীর্তন হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপীনাথ জীউর মন্দির এবং জনৈক পীরের স্থান আছে। পীরের স্থানে প্রত্যহ প্রদীপ এবং প্রতি বৃহস্পতিবারে "সিন্নি" দেওয়া হয়।

শ্রীঅঘোর নাথ দত্ত, শিক্ষক,
মাড়গ্রাম জুনিয়ার হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ),
গ্রাম ও পোঃ মাড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : পার্বতীপুর (মৌজা : জটারপুর)। ১০৯।৩০৪'৫০।২৭০।১,৩৩৩

(ক) বাগ্দী ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কান্দী শহর হইতে মোটরবাসে পশ্চিমাভিমুখে কুলীরঘাটিতে আসিয়া বাস বদল করিয়া উত্তরদিকে খড়গ্রাম থানার নিকটস্থিত চৌমাথায় নামিয়া হাঁটিয়া দুই মাইল পশ্চিমে আসিলে এই গ্রামে পৌঁছান যায়। গ্রাম হইতে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে সাঁইথিয়া রেলস্টেশন।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় বাগ্দী সম্প্রদায়ের ধর্মরাজ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজায় ছাগ ও মেষ বলি দেওয়া হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি গাছের নীচে ধর্মরাজ ঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। তাহাছাড়া, গ্রামে দুইটি মসজিদ আছে।

শ্রীনলিনাক্ষ রায়, প্রধান শিক্ষক,
পার্বতীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ এড়োয়ালী, মুর্শিদাবাদ।

৯ গ্রাম : গুরুলিয়া।১১৪।১,১০২'৯৩।২৯১।১,৬৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, তাঁতী, কামার, নমঃশূদ্র, মুচি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, কুটির শিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে কুলীঘাট মোরগ্রাম রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিনে দুইটি দুর্গাপূজা, চৈত্রে শিবপূজা ও চড়ক। ইহাছাড়া, গৌরাঙ্গ গোপালের নিত্যপূজা, কালীপূজা এবং লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গৌরাঙ্গ গোপালের, ধর্মরাজ এবং কালীরমন্দির আছে। ইহাভিন্ন, দুইটি দুর্গামন্দির ও শিবের নির্দিষ্ট একটি বেদী আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে দুইটি জনশ্রুতি শুনা যায়। পূর্বে এই স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। গ্রামের বর্তমান কায়স্থ জমিদারগণের পূর্বপুরুষ শাটী ঘোষ এই স্থানে জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া প্রথম বসতি স্থাপন করেন। ইঁহারা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। ইঁহাদেরই সাহায্যে নিত্যানন্দ প্রভু মাড়গ্রামে গোপীনাথের মন্দির এবং বিগ্রহ স্থাপন করেন। মন্দিরটি আজও বিদ্যমান। এই কারণে গ্রামটি গৌরাঙ্গের লীলাভূমি বলিয়া গুরুলিয়া নামে প্রচলিত হয়। (প্রাচ্য বিদ্যা মহার্ণব শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু সিদ্ধান্ত বারিধি মহাশয়ের প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস"-এর "রাজন্য কাণ্ড" হইতে গৃহীত)।

আবার কাহারও মতে বঙ্কিম রায় ঠাকুর নামক একজন সাধু পুরুষ এই স্থানে জঙ্গলের মধ্যে সাধনা করিতেন। তাঁহার বহু শিষ্য ও অনুচরবর্গ ছিল। তিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বে তাঁহার শিষ্যদের বলেন যে, "হাম হিয়া পর গোরল্যা।" অর্থাৎ আমি এখানেই সমাধি লইব এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে এই স্থানেই সমাধিস্থ করা হয়। উক্ত মহাপুরুষের সমাধিস্থানে একটি ত্রিশূল এবং চক্র বর্তমান। এই

"গৌরল্যা" শব্দটি ভাঙ্গিয়া "গৌরলিয়া" হয়; পরে রূপান্তরিত হইয়া গুরুলিয়া হইয়াছে।

শ্রীরুদ্রনারায়ণ ধর, প্রধান শিক্ষক,
গুরুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ গুরুলিয়া,
মুর্শিদাবাদ।

১০। গ্রাম : কলগ্রাম।১৩৮।৩৫৪'১৯।১৫৮।৮৬৬

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কুনাই, বাগ্দী, মুচি, হাড়ী, ছুতার, নাপিত, কোটাল ও তিয়র। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে সতের মাইল দূরে রেলস্টেশন চিবৃতী। পুরন্দরপুর হইতে জেলাবোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের পাশ দিয়া গুরুলিয়া পর্যন্ত গিয়াছে। গ্রামের এক মাইল দূর দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখে ধর্মরাজপূজা ও ক্ষেত্রপালপূজা। আশ্বিনে তিনটি দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা এবং চৈত্রে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের মন্দির, দুর্গাপূজার জন্য একটি মাটির ঘর, শিবের একটি পাকা মন্দির এবং একটি মঠ আছে।

শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র রায়, শিক্ষক,
শ্রীব্রজগোপাল রায়, শিক্ষক,
কলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১১। গ্রাম : খড়গ্রাম। ১৩৯।২,৩৮৪'৯১।৯৮০।৪,৯৩১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে চৌদ্দ-পনরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) খাগড়াঘাট রোড ও সাইথিয়া রেলস্টেশন গ্রাম হইতে যথাক্রমে চব্বিশ এবং তেইশ মাইল দূরে অবস্থিত। গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া একটি পাকা রাস্তা মহকুমা শহর কান্দী পর্যন্ত গিয়াছে; এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। ইহাছাড়া, গ্রীষ্মকালে গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, শ্রাবণে মনসা পূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাছাড়া, কিশোর-কিশোরী ও লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিবতলা নামে একটি স্থান এবং বাবাঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাভিন্ন, কয়েকটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির আছে।

শ্রীহাসমত আলী, শিক্ষক,
খড়গ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

Khargram—The Police Station is famous as containing the sites of several important battle fields all of which are on the old Badshahi road from Rajmahal to Burdwan *via* Kalna which passes through the middle of Khargram and along Khargram Police Station. The battlefields are Sherpur Atai, three miles north of Khargram (J. L. 86) and Maricha. The village of Nagar (J.L. 85) containing the *Astna* of Dadapir is also an ancient battle site. There are remains of an old Badshahi bridge at Khansama Danga (J. L. 39), accross the Daraka river."

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 190)

১২। গ্রাম : মহীসার। ১৪৫।১,৫৪৮ ৯৫।৪০৭।২,০৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, নাপিত, কৈবর্ত, বণিক, ময়রা, বাগ্দী, কোড়া, কুনাই, ছুতার, হাড়ী, নমঃশূদ্র, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চিরতী। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখে ধর্মরাজপূজা দুইদিনব্যাপী।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, শীতলা, মনসা, চাঁদরায়, ফটিক-রায়, সিংহবাহিনী, কালী, গণেশ ও মঙ্গলচণ্ডীর স্থান এবং কাঁচা দেওয়াল ও টিনের চালাযুক্ত একটি ঘরে ধর্মরাজের শিলামূর্তি আছে। তাহাছাড়া, গ্রামে পাঁচটি পীরের আস্তানা আছে।

শ্রীজীবন কৃষ্ণ ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ মহীসার,
মুর্শিদাবাদ।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ খড়গ্রাম

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

গুরুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের অমাবস্যা-তিথিতে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এই গ্রামের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পূজা। গ্রামে দেবীর একটি নির্দিষ্ট মন্দির আছে। প্রতি বৎসর কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া এই মন্দিরে পূজা করা হয়। ৺ধরণীধর চক্রবর্তী মহাশয়ের সহধর্মিণী দেবীর পূজাদি সম্পন্ন করেন। তিনি খুব ভক্তিমতী মহিলা এবং সন্ন্যাসিনীদের মত তাহার মাথায় জটা আছে। প্রত্যেক শনি এবং মঙ্গলবার তাহার উপর দেবীর ভর হয়। ইনি স্বপ্নাদিষ্ট ঔষধ ও মাদুলি দিয়া বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় করিতে পারেন বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। কালীদেবীর নিকট অনেকে পাঁঠা মানত করিয়া থাকেন। দেবীর পূজাতে অন্নভোগ দেওয়া হয় এবং অনেক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করা হয়।

ক্ষেত্রপালপূজা

কলগ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে ক্ষেত্রপাল দেবতার পূজা হয়। স্থানীয় লোক ইহাকে "কারিণে" পূজাও বলেন। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর নির্মিত একটি শিবলিঙ্গকে ক্ষেত্রপালরূপে পূজা করা হয়। শিবলিঙ্গটির উপরিভাগ ভগ্ন; অনুমান করা হয়, কালাপাহাড় কর্তৃক শিবমূর্তিটির ঐরূপ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

উৎসবের দিন শিবলিঙ্গের উপর ১০৮ কলসী জল ঢালিয়া অভিষেক ক্রিয়ার পর যথারীতি পূজা, হোম ও চণ্ডীপাঠ করা হয়। মূলতঃ সুবৃষ্টির প্রার্থনায় গ্রামবাসীরা এই উৎসব পালন করিয়া থাকেন। ক্ষেত্রপালের নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়; বলির প্রসাদ গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পাইয়া থাকেন। উৎসবের দিন দরিদ্র-ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর জমির আয় হইতে ক্ষেত্রপালের নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। পূজারী জাতিতে ব্রাহ্মণ। নিম্নলিখিত ধ্যানে ক্ষেত্রপালের পূজা করা হয় ঃ

ভ্রাজচ্চণ্ড জটাধরং ত্রিনয়নং নীলাঞ্জনাদি প্রভং।
দোর্দণ্ডাত্তগদা কপাল-মরুণ স্রগ-গন্ধ বস্ত্রোজ্জলং ॥
ঘণ্টামেখল ঘর্ঘরধ্বনি মিলদ্ঝাঙ্কারভীমং বিভুং।
বন্দেহং সংসিত সর্পকুণ্ডলধরং শ্রীক্ষেত্রপালংসদা ॥

ধর্মরাজপূজা

পলাশী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমার চারদিন পূর্ব হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত ধর্মরাজ-এর যথারীতি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে ধর্মরাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে অনেক ভক্তের আগমন হয়। পূর্ণিমা তিথিতে ভক্তগণ শোভাযাত্রা করিয়া ধর্মরাজঠাকুরকে নিকটবর্তী নদীতে স্নান করাইতে লইয়া যান এবং নদীর ঘাটে স্নানাভিষেক পর্ব শেষ হইলে মূর্তিটিকে মাথায় লইয়া ঢাকঢোল প্রভৃতি বাদ্যসহকারে গ্রাম-প্রদক্ষিণে বাহির হন। পরে মন্দিরে মূর্তি স্থাপন করিয়া হোম-যজ্ঞ করা হয়। উৎসবে সর্বজনীন ভোজ হয়।

এতদিন যাবত পূজার যাবতীয় খরচ কাশিমবাজার মহারাজার প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে নির্বাহ করা হইত, কিন্তু বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার-এর হাতে সম্পত্তি চলিয়া যাওয়ায় কেবলমাত্র গ্রামবাসীর চাঁদায় কোনক্রমে উৎসবটি পালন করা হইতেছে।

মহম্মদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে ধর্মরাজঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে মাটির দেওয়াল এবং টিনের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে ধর্মরাজের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবোত্তর প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির আয় হইতে ধর্মরাজের নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে। ধর্মরাজের পূজারী বন্দোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ এবং প্রধান ভক্ত তপশীলজাতিভুক্ত।

উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন ধর্মরাজ ঠাকুরের নিকট মানতপূজাদি দিতে আসেন। সাধারণতঃ ছাগ, মেষ, পদ্মফুল, ধানের "কুরলী" মানত দেওয়া হয়। দ্বিতীয় দিনে পূজার শেষে মানতের বলি হইয়া থাকে। পূজার শেষ দিন ভক্তগণের ভোজ বা "দাদরঘটা" হয়।

কলগ্রাম এ প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে সাড়ম্বরে ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের চালাযুক্ত একটি দেবালয়ে ধর্মরাজের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের তপশীলজাতিভুক্ত কুনাই পরিবার বংশপরম্পরায় ধর্মরাজের প্রধান ভক্ত বা দেয়াসী-র কাজ করিতেছেন এবং কাশ্যপ গোত্রীয় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ ধর্মরাজের নিত্যপূজাদি করিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে পাঁচদিনব্যাপী উৎসব চলে। উৎসবের প্রস্তুতি অবশ্য কয়েকদিন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রথম দিন প্রধান ভক্ত বা দেয়াসী এক বেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়া ব্রতের সংকল্প করেন। দ্বিতীয় দিন ধর্মরাজপূজার পর দেয়াসী গলায় সাদা অথবা লাল কাপড়ের কাছা, হাতে তামার বালা ও একটি বেতের ছড়ি গ্রহণ করেন। দেয়াসী পূজায় অন্যান্য ভক্তদের পরিচালনা করিয়া থাকেন। তৃতীয় দিনের পূজায় ভক্ত গ্রহণ করা হয়। প্রতি বৎসর ষাট-সত্তর জন ব্যক্তি ভক্ত-ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। যে-কেহ ইচ্ছা করিলেই ভক্ত হইতে পারেন। দেয়াসী-ই ভক্ত নির্বাচন করেন এবং নির্বাচিতদের গলায় কাছা ও হাতে একটি করিয়া বেতের ছড়ি দেন। ব্রত গ্রহণের দিন ভক্তরা সারাদিন উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে কিছু ফলাহার করেন এবং সারারাত্রি-ব্যাপী ধর্মরাজ তলায় ঢাক-ঢোলের বাজনার সঙ্গে বোলান গান ও চামুণ্ডা নৃত্য করিয়া থাকেন। এই দিন রাত্রিতে ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। শেষ রাত্রিতে ভক্তরা মড়ার মাথা লইয়া শবনৃত্য করেন।

চতুর্থ দিন সকালে ধর্মরাজ ঠাকুরের বিগ্রহটিকে একটি সিংহাসনে বসাইয়া ভক্তরা কাঁধে করিয়া ঢাক-ঢোলসহ শোভাযাত্রা করিয়া নিকটবর্তী একটি নির্দিষ্ট পুকুরে "মুক্তিস্নান" করাইতে লইয়া যান। মুক্তিস্নানের পর বিগ্রহটিকে লইয়া একটি বিরাট শোভাযাত্রা গ্রাম পরিক্রমায় বাহির হয়। আশেপাশের গ্রাম হইতে আগত বহু দর্শক এই শোভাযাত্রায় যোগদান করেন। শোভাযাত্রার পুরোভাগে কুম্ভ-হাড়িসহ বানেশ্বর শিব বা বানগোঁসাই-এর দারুমূর্তিটি জনৈক ভক্তের মাথায় থাকে। ইহার পর একটি বাঁশের মাচার উপর চারিটি খাঁড়া সাজাইয়া তাহার উপর একজন ভক্তকে শোয়াইয়া অপর চারজন ভক্ত তাঁহাকে কাঁধে বহন করেন। ইঁহাদের "অসিপত্রব্রতী" ভক্ত বলা হয়। অসিপত্রব্রতী ভক্তদের পর "দাঁড়বানব্রতী" ভক্তরা থাকেন। এই ভক্তদের জিহ্বায় লৌহ শলাকা ফোঁড়ান থাকে। ইঁহাদেরও অন্যান্য ভক্তরা কাঁধে বহন করিয়া লইয়া যান। সবশেষে একটি জল পূর্ণ কলস, একটি কাঠের ঘোড়া এবং ধর্মরাজের বিগ্রহ লইয়া ভক্তরা শোভাযাত্রার অনুসরণ করেন।

শোভাযাত্রাটি গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে প্রায় চারঘণ্টা সময় লাগে। পরিক্রমার পথে নির্দিষ্ট তিনটি বাড়ীতে বিগ্রহ নামাইয়া কিছুক্ষণ করিয়া বিশ্রাম করা হয়। যাঁহাদের বাড়ীতে বিগ্রহ নামান হয়, সেই বাড়ীর গৃহকর্তা প্রতিটি ভক্তের পা ধোয়াইয়া কপালে আবির লেপন করিয়া দেন। বিগ্রহ লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ কালে কাহারো কোন মনস্কামনা থাকিলে তিনি শোভাযাত্রা যাইবার রাস্তার ধারে "কোটক" (লম্বা হইয়া শুইয়া পড়া) দিয়া পড়িয়া থাকেন। পূর্ণকলসধারী ভক্ত সেই ব্যক্তির নিকট গিয়া তাহার মনস্কামনা জানিয়া কলসী হইতে কিছু জল তাঁহার গায়ে ছিটাইয়া দেন।

গ্রাম প্রদক্ষিণের পর বিগ্রহ মন্দিরে আসিলে ধর্মরাজের অভিষেক পূজা এবং হোম-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূজার শেষে গ্রামের সাধারণের পক্ষ হইতে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং তাহার পর ব্যক্তিগত মানতের পশু বলি হয়। সর্বজনীন বলির প্রসাদ কেবল মাত্র গ্রামের ব্রাহ্মণগণ পাইয়া থাকেন। মানতের বলির প্রসাদ মানতকারীরা লইয়া যান।

উৎসবের শেষদিন অর্থাৎ পঞ্চম দিনে ভক্তদের মধ্যে নানারকম খেলাধুলা হয়। খেলার পর তাঁহারা তেল-হলুদ গায়ে মাখিয়া স্নান করেন। এই সময় পূজারী তাঁহাদের গলা হইতে "কাচা" খুলিয়া লন। সন্ধ্যায় মন্দিরের সম্মুখে একটি কুণ্ড তৈয়ারী করিয়া তাহাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করা হয় এবং ঐ অগ্নিকুণ্ডে ভক্তরা পুষ্পাঞ্জলি দিবার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উৎসবকালে ধর্মরাজের নিত্যপূজারী পূজা করেন না—এই কয়দিন পণ্ডিত পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ পূজাদি করিয়া থাকেন। নিত্যপূজারীর নামে কিছু জমি বন্দোবস্ত করা আছে। পূর্বে এই পূজা ও উৎসবের ব্যয় স্থানীয় জমিদার বহন করিতেন, বর্তমানে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া এবং সারা বৎসর গ্রামবাসীদের বিরোধ মীমাংসা করিয়া দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের নিকট হইতে জরিমানা স্বরূপ আদায়কৃত অর্থের দ্বারা পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

সিদ্ধেশ্বরীপূজা

প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে জয়পুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী দেবীর সাড়ম্বরে বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে গঙ্গার তীরবর্তী এই গ্রামে জনৈক তান্ত্রিক তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার ইষ্টদেবী ছিলেন সিদ্ধেশ্বরী কালিকা। বাংলা ১৩২০-২১ সনে এই গ্রামে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামে একজন সন্ন্যাসী আসেন এবং তিনিই সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসবের প্রচলন করেন। তদবধি প্রতি বৎসর দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব পালন করা হইতেছে।

লালগোলার রাজা রায় যোগেন্দ্র নারায়ণ মহাশয়ের অর্থানুকূল্যে এবং গ্রামবাসীদের নিকট হইতে আদায়কৃত চাঁদার অর্থে বাংলা ১৩৩৪ সনে দেবীর একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করা হয়। মন্দির অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত সিঁদুরলিপ্ত বিশেষ চিহ্নযুক্ত একটি প্রস্তরখণ্ডকে সিদ্ধেশ্বরী-রূপে পূজা করা হয়। দক্ষিণাকালীর ধ্যানেই দেবীর পূজা হইয়া থাকে।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং কোন বৎসর তিনদিন, আবার কোন বৎসর পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কয়দিন দেবীর যথারীতি পূজা ও হোম হইয়া থাকে এবং মন্দির প্রাঙ্গণে হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোক এই সময় দেবী দর্শন করিতে এবং মানত পূজাদি দিতে আসেন। পূর্বে পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হইত, বর্তমানে বলি প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মানত হিসাবে দেবীর নিকটে কেবল মাত্র ষোড়শোপচারে পূজা দেওয়া হয়। দেবোত্তর প্রায় কুড়ি বিঘা জমির আয় হইতে দেবীর নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে— ঐ জমি পূজারীর নামে দেওয়া আছে। বর্তমান পূজারী শ্রীহেম চন্দ্র মজুমদার ও শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার।

সিংহবাহিনীপূজা

ইন্দ্রানী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীনবমী তিথিতে সিংহবাহিনী দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে সিংহবাহিনী দেবীর পূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে গ্রামের পূর্বদিকে গভীর বন-জঙ্গল পরিপূর্ণ একটি স্থান ছিল। এই স্থানে একজন সাধু একশত আটটি নরমুণ্ডের উপর একটি বেদী স্থাপন করিয়া তাঁহার ইষ্টদেবী দুর্গা মূর্তির পূজা করিতেন। সাধুর একটি পালিত কন্যা ছিল। সাংপাড়া নিবাসী ভগীরথ রায়ের সহিত কন্যাটির বিবাহ হয়। উক্ত সাধু দেহরক্ষা করিবার কিছুকাল পরে একদিন এই স্থানে আর একজন সাধু আসিয়া ঐ জঙ্গল পরিপূর্ণ বেদীতে রাত্রি যাপন করেন। তাঁহার সহিত অষ্টধাতু নির্মিত একটি মহিষমর্দিনী দুর্গামূর্তি ছিল। যেদিন তিনি এই গ্রামে আসেন সেইদিন রাত্রিতে দেবী দুর্গা উক্ত সাধু ও ভগীরথ রায়কে অষ্টধাতু নির্মিত দুর্গা মূর্তিটি উল্লিখিত বেদীতে স্থাপন করিয়া নিত্য পূজাদি করিতে এবং চৈত্র মাসের বাসন্তীনবমী তিথিতে উৎসব পালন করিতে স্বপ্নাদেশ দেন। সেই অবধি এই গ্রামে সিংহবাহিনী দেবীর নিত্যপূজা ও মহাসমারোহে চৈত্র মাসে বার্ষিক উৎসব পালন করা হইতেছে। বর্তমানে এই স্থানে একটি মন্দিরে দেবীর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবের সময়

বিভিন্ন স্থান হইতে বহু লোকজন দেবী দর্শন করিতে এবং মানত পূজাদি দিতে আসেন। প্রতিদিন পূজার শেষে সমাগত যাত্রীদের মধ্যে দেবীর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সাধারণের বিশ্বাস যে, দেবীর নিকট মানত করিলে মৃতবৎসা বা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক সন্তান লাভ করেন। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, নদীয়া, বীরভূম এমন কি, মালদহ, সাঁওতাল পরগণা, মুঙ্গের প্রভৃতি জেলা হইতে বহু স্ত্রীলোক সিংহবাহিনীর নিকট মানত পূজা দিতে আসেন। সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে অন্নভোগ ও ছাগবলি মানত করা হয়। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয়ঃ

"সিংহস্থা শশিশেখরা মরকত প্রেক্ষা চতুর্ভির্ভুজৈঃ।
শঙ্খ চক্র ধনুঃশরাংশ্চদধতী দধতি নেত্রৈস্ত্রিভি—
শোভিতা আমুক্তা গদহার রণৎকাঞ্চিকণকনূপুরা
দুর্গে দুর্গতি হারিণী ভবতু বো রত্নোল্লসদ্ কুণ্ডলা।"

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : খড়গ্রাম

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

খড়গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে গাজন উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

এই মেলায় আড়াই হইতে তিনশত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি দ্রব্যাদির কয়েকটি দোকানপাট বসে। যাত্রী এবং বিক্রেতা উভয়ই স্থানীয়।

ধর্মরাজপূজার মেলা

শুকুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশেপাশের দুই-চারিটি গ্রাম হইতে মেলায় যাত্রী এবং বিক্রেতারা আসেন। খোলা জায়গায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যাদির পনের-ষোলটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয় জন ফেরিওয়ালা আসেন।

মহম্মদপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন একটি পুষ্করণীর পাড়ে দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশেপাশের কেশিয়াডাঙ্গা, ঘনশ্যামপুর, হাজরাবাটী, সাউঁদী প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

খোলা জায়গায় তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী, টোটকা ঔষধ, ধামা, কুলা, মাটির খেলনা-পুতুল প্রভৃতির দশ-পনেরটি দোকানপাট বসে এবং চার-পাঁচ জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন এবং তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রাদল আসে।

কলগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে ধর্মরাজতলায় সাধারণের প্রায় একবিঘা জমিতে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় বারশত নরনারীর সমাগম হয় এবং যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। যাত্রীগণ হাটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রধানতঃ খাবারের এবং মনিহারী দ্রব্যের পনের-ষোলটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য রাত্রিতে মেলায় কবিগান, বোলান গান, যাত্রাভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর পেশাদার যাত্রাদলও আনা হয়।

মহীসার গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ-পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় একবিঘা জমিতে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলায় সাধারণতঃ বাতুড়, বড়ার এবং কচুয়া গ্রাম হইতে দুইশতাধিক নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড় প্রভৃতির সতের-আঠারোটি দোকানপাট বসে। প্রতি বৎসর কান্দী শহর হইতে বিক্রেতারা আসেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে; অধিকারীর নাম শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র গোস্বামী। তাঁহাছাড়া, কোন কোন বৎসর গ্রামের বাহির হইতেও গানের দল আনা হয়। দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা মোটামুটি প্রায় তিন-চারশত।

রথযাত্রার মেলা

ইন্দ্রাণী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দুই ধারে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় সাধারণতঃ ইন্দ্রা, ডাঙ্গাপাড়া, জুয়ানকান্দি, ঝুলনপুর, বরকান্তপুর, লক্ষ্মণপুর, নূতনগ্রাম, রামচন্দ্রপুর, পুরাডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, শিল্প-সামগ্রী প্রভৃতি জিনিসপত্রের শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ম্যাজিক ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

সিদ্ধেশ্বরী পূজার মেলা

জয়পুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষে দেবীর সেবায়েতের প্রায় দশ-বারো বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। বাং সন ১৩২০-২১ সনে মেলাটির সূচনা হয়।

সাধারণতঃ আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী মেলায় আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন বীরভূম জেলার অন্তর্গত মাড়গ্রাম-এর কতিপয় ব্যবসায়ী প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় দোকান দেন। মোট ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাটের মধ্যে খাবার এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস, সিনেমা এবং আলকাপগান, ঝুমুরগান, কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় জুয়া খেলার দল আসে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ কান্দী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বাহাদুরপুর।৩।৩৫৬।১৯।১১।৯।৫৮৫

(ক) যুগী, ছুতার, নাপিত, মাল, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি ও মুসলমান। পাড়া তিনটি।

(খ) কৃষিকার্য ও শ্রমজীবি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট রোড। গ্রাম হইতে এক মাইল দূর দিয়া জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) পৌষ সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়কপূজা ও শিবের বানব্রত উৎসব। উৎসব দুইটি সর্বজনীন। লক্ষ্মীপূজাটি বাংলা ১২৮১ সনে আরম্ভ হইয়াছিল এবং দুই দিনব্যাপী উৎসব হয়। চড়ক পূজা ও শিবের বানব্রত উৎসবটি গ্রাম পত্তনের সময় হইতে চলিয়া আসিতেছে বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে লক্ষ্মীদেবীর একটি মন্দির ছিল, বর্তমানে উহা ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

বাহাদুরপুর গ্রামটি বহুদিনের প্রাচীন। গ্রামের উত্তর এবং পশ্চিম দিকে মদগোড়া বা মধুগোড়া নামে একটি বড় বিল আছে। এই গ্রামের এক মাইল পশ্চিমে ব্রহ্মাণী নদী দ্বারকা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। বন্যা হইলে ব্রহ্মাণীর জল দুইকূল ছাপাইয়া ঐ বিলে প্রবেশ করিত। ফলে, প্রায় বার মাসই বিলটি জলে পরিপূর্ণ থাকিত এবং উহাতে প্রচুর মাছ পাওয়া যাইত। তাহাছাড়া, ভাদ্র-আশ্বিন মাসে জেলেরা ব্রাহ্মণীতে খাটান খাটাইয়া প্রচুর মাছ ধরিত। অবিক্রীত মাছ রৌদ্রে শুকাইয়া শুঁটকী করিয়াও বিক্রয় করিত। এখানকার মাছের খুব নাম ছিল। বর্তমানে একটি বাঁধ তৈয়ারী হওয়ায় মাছের পরিমাণ কমিয়া গিয়াছে। প্রধানতঃ মাছ ধরা ও মাছের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই এই গ্রামে হাড়ী, বাগ্দী, মাল প্রভৃতি জাতির বসবাস শুরু হয় এবং তাহারাই এখানকার পুরাতন বাসিন্দা।

বাহাদুরপুর গ্রামটি মহারাজ নন্দকুমারের একটি মহল ছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা রাধাচরণ রায় রায়ানকে এই গ্রামখানি যৌতুক স্বরূপ দান করেন।

বাহাদুরপুর এবং তৎসংলগ্ন গোকর্ণ (মৌজা নং ১৯) এবং মহালন্দী (মৌজা নং ২০) এই তিনটি গ্রাম সম্পর্কে স্থানীয় অঞ্চলে নিম্নলিখিত প্রাচীন ছড়াটি প্রচলিত আছে :

> "গোকর্ণের বিটি,
> মহালন্দীর মাটি,
> বাহাদুরপুরের লাঠি।"

"বাহাদুরপুরের লাঠির" খ্যাতি সম্পর্কে যে কিংবদন্তী জড়িত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, পূর্বে এই অঞ্চলে বহু দুর্ধর্ষ দস্যুদলের আড্ডা ছিল। তাহাদের লাঠির দাপটে সকলেই সন্ত্রস্ত থাকিত। বস্তুতঃ মহালন্দী ও বাহাদুরপুরের দস্যুদল এবং অনেক নামকরা দস্যু সম্পর্কে এখনও বহু জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বাহাদুরপুর গ্রামের রাইচরণ মাল, সন্ন্যাসী মাল প্রভৃতি বিখ্যাত লাঠিয়ালদের কথা এখনও লোকের মুখে মুখে শুনা যায়। মহালন্দীর গোলক সর্দারের নামও খুব বিখ্যাত। "গোকর্ণের বিটি" ছড়াটির সঙ্গে গোকর্ণের জনৈক বালিকা বধূর প্রতি তাহার দজ্জাল শাশুড়ীর অত্যাচার এবং অবশেষে বালিকা বধূ কর্তৃক শাশুড়ীর কর্ণছেদনের গল্প প্রচলিত আছে। "মহালন্দীর মাটির" পিছনে এ অঞ্চলের শক্ত মাটির কথাই সম্ভবত বলা হয়। এই মাটির ঘরবাড়ী খুবই মজবুত হয়।

মহালন্দী গ্রামে (মৌজা নং ২০) জীবন্তী-গাতলা রাস্তার উত্তর পার্শ্বে একটি বহুদিনের পুরাতন ভগ্নপ্রায় মসজিদ্ ও রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে একটি পাকা

কবর আছে। এই মসজিদ ও কবরটি পাঁচশত বৎসরের অধিক কালের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়। হজরত পীর সাহেব নামে একজন মুসলমান ফকির এই স্থানে বাস করিতেন এবং এই মসজিদের কিছু উত্তরে ফকির সাহেবের একটি আস্তানা ছিল। এখনও তাহার কিছু কিছু চিহ্ন বর্তমান আছে। ফকির সাহেব দেহরক্ষা করিলে তাঁহাকে মসজিদের নিকট কবর দেওয়া হয়। জনশ্রুতি এই যে, ফকির সাহেব এক রাত্রির মধ্যে এই মসজিদটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহার গঠন-কার্য ও ভগ্নপ্রায় কয়েকটি স্তম্ভ দেখিয়া মনে হয় পূর্বে ইহা একটি সুন্দর ও বৃহৎ মসজিদ ছিল। উহার একটি স্তম্ভের কিয়দংশ মাটিতে প্রোথিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। মসজিদের ছাদ ও থামগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িলেও, দেখা যায় যে উহার ছাদ নির্মাণ কার্যে লোহা বা কাঠের কোন ব্যবহার হয় নাই। সম্প্রতি স্থানীয় কয়েকজন মুসলমান এই মসজিদটির কিছু সংস্কার করিয়া উপাসনার উপযোগী করিয়াছেন।

গল্প আছে, জনৈক হিন্দু পীর সাহেবের নিকট তাহার পিতার পিণ্ড দিবার জন্য গয়া যাইবার অভি-প্রায় প্রকাশ করিলে পীর সাহেব তাহাকে তাঁহার দেহের একটি নির্দিষ্ট স্থানের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে বলেন। লোকটি পীর সাহেবের কথামত নির্দিষ্ট স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া কি দেখিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে পীর সাহেব বলিয়াছিলেন, "বেটা দেখলি, গয়া-গঙ্গা সব এখানেই বর্তমান"। পীর সাহেব দেহ রক্ষা করিলে তাঁহাকে এই স্থানেই সমাধিস্থ করা হয়।

শ্রীরাধামাধব নাথ, শিক্ষক,
বাহাদুরপুর স্পেশ্যাল ক্যাডার বিদ্যালয়,
পোঃ মহালন্দী, মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : গাভলা। ৪।১,০২৯'০২।৩৩৬।১,৮১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বণিক, সদ্গোপ, গোয়ালা, কুমার, তেলী, রাজবংশী, ছুতার, বায়েন, বাগ্দী, হাজরা, নাপিত ও মুসলমান। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মৎস্যজীবি, শ্রমজীবি ও অন্যান্য জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে বার মাইল দূরে খাগড়াঘাট রোড্ রেলস্টেশন। জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে নিকটবর্তী নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। ইহাভিন্ন, ব্যক্তি-বিশেষের গৃহে দোল, ঝুলন প্রভৃতি উৎসব পালিত হয়। গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ১৯শে পৌষ সৈয়দ হুসেন নামে জনৈক পীরের উরস্ পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মাদবরায় ও গোপীনাথদেবের মন্দির এবং সৈয়দ হুসেন পীরের একটি দরগাহ্ আছে।

শ্রীসৈয়দ আবুল ফজল, প্রধান শিক্ষক,
গাভলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গোকর্ন, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : আশুয়া। ২৩।৪৪৯'০২।৮৫।৪০১

(ক) বৈদ্য, নাপিত, ছুতার, মুচি, ডোম, হাড়ী ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগরাঘাট রোড্। এক মাইল দূরে জীবন্তী গ্রাম হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়। নিকটবর্তী গোকর্ন গ্রাম হইতে জেলাবোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া সাগরদীঘি পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পূজা। উৎসবটি সর্ব-জনীন ও বহুকালের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী সরকার।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) পূর্বে গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। বর্তমানে একটি নির্দিষ্ট বেদীতে শিবের পূজাদি হইয়া থাকে।

শ্রীঅভিমন্যু মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
আগুয়া-তেঁতুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : পাতনা,
পোঃ অনন্তপুর,
মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : উগুরা। ২৬।৬৫৭·৯৮।১৩৬।৬৭২
ভাটপাড়া। ২৭।৫৩০·৯৬।১২৫।৫৫৭

(ক) ভাট ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, সদ্গোপ, স্বর্ণবণিক, নাপিত, তেলী, যুগী, রাজবংশী, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি, চাড়াল, সাঁওতাল ও কুর্মী। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও শ্রমজীবি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট রোড। রাধাঘাট-কান্দী রাস্তায় অবস্থিত জীবন্তী হইতে জেলা বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে তিনটি দুর্গাপূজা হয়, উহার দুইটি পূজা ব্যক্তি-বিশেষের এবং একটি সর্বজনীন। কার্তিকে কালীপূজা, কার্তিক সংক্রান্তিতে গণেশজননী (শিবদুর্গা) পূজা এবং পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে গ্রামের মুচিপাড়ায় ও হাড়ীপাড়ায় দুইটি লক্ষ্মীপূজা হইয়া থাকে। এই পূজাদ্বয়ের সেবায়েত যথাক্রমে হাড়ী ও মুচী সম্প্রদায়। ইহাভিন্ন, মাঘে সরস্বতীপূজা ও চৈত্রে বাসন্তীপূজা হয়। বাসন্তী পূজাটি সর্বজনীন এবং গত পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে বহরমপুরের সুনিপুণ মৃৎশিল্পী দ্বারা বাসন্তী দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করান হয় এবং চারদিন-ব্যাপী সাড়ম্বরে যথারীতি পূজা ও উৎসব চলে।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি গত ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ এবং রাধাকান্ত ও মদন-গোপালদেবের বিগ্রহ আছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা হয়। ইহাভিন্ন, তিনটি দুর্গা মণ্ডপ এবং গ্রামের ভাটপাড়ায় একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে কালীর নির্দিষ্ট বাঁধান স্থান আছে। ঐ স্থানে রক্ষিত একটি শিলাখণ্ডকে কালীজ্ঞানে পূজা করা হয়।

শ্রীকিরীটী ভূষণ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
উগুরা-ভাটপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : জিয়াদারা, পোঃ জীবন্তী,
ও
শ্রীমদনমোহন মণ্ডল, শিক্ষক,
পোঃ খাগড়া,
মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : জিয়াদারা। ৩৪।১,১০৫·৭০।২৩৮।১,২৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, সাহা, বাগ্দী, মাল, মুচি, ডোম, সাঁওতাল ও মুসলমান। গ্রামে আটটী পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী খাগড়াঘাট রোড হইতে মোটর-বাসে রাধাঘাট—কান্দি রাস্তায় জীবন্তী গ্রামে নামিয়া সেখান হইতে জাতলা রোড ধরিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইলে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনে সর্বজনীন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সাতপুতুল মূর্তি পূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও গণেশ পূজা, অগ্রহায়ণে নবান্ন উৎসব, পৌষে লক্ষ্মীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চড়ক উপলক্ষে ছাগ বলি দেওয়া হয়। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায় ঈদ্ ও বকর ঈদ্ এবং সাঁওতাল সম্প্রদায় বাঁধনা পরব পালন করেন। বাঁধনা পরব উপলক্ষে সাঁওতাল নরনারীরা পান-ভোজন করিয়া থাকেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তি হইতে তিন দিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবের প্রাচীন পাকা মন্দির, শ্যামরায় ও রাধাকৃষ্ণের পাকা মন্দির এবং দুর্গাপূজার জন্য একটি কাঁচা চণ্ডীমণ্ডপ ও গ্রামদেবীর নির্দিষ্ট বেদী আছে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ রায়, প্রধান শিক্ষক,
জিয়াদারা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জীবন্তী, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : চাঁদনগর। ৫৩২।৬৪·৩৮।১৪৮।৭৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্র, বাউড়ী, রাজবংশী ও মুসলমান। পাড়া নয়টি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে আট মাইল দূরে চৌরীগাছা রেলস্টেশন। তিন মাইল দূরে কান্দী হইতে নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে চৌরীগাছা পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখে গ্রামদেবীপূজা, জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজপূজা, শ্রাবণে মনসাপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুনে শিব-রাত্রির উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনসা ও ধর্মরাজ পূজার সেবায়েত নমঃশূদ্র সম্প্রদায় এবং পূজায় পাঁঠা ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গ্রামদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচ দিন ব্যাপী। মেলাটি পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে গ্রামদেবী, মনসা ও ধর্ম-রাজের পূজা হয়। ইহাভিন্ন, শীতলা ও মনসা আছে।

চাঁদনগর হইতে চৌরীগাছা রেলস্টেশনের মধ্যে তিনটী নদী প্রবাহিতা। অতীতে বর্ষাকালে এই নদী তিনটির জল কূল প্লাবিত করিয়া নিকটস্থ ভূখণ্ডকে প্রায় জলমগ্ন করিত। বর্ষার পরে জল কমিয়া গেলে এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পাওয়া যাইত। সেইজন্য তৎকালীন জমিদারগণ এই সমস্ত স্থানে পাহারা দিবার জন্য কিছু সংখ্যক নমঃশূদ্র কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মৎস্যের ব্যবসায়ে নমঃশূদ্রগণ লাভবান হওয়ায় তাহারা ক্রমশঃ সপরিবারে এইখানে বসবাস আরম্ভ করে এবং এইরূপে গ্রামের পত্তন হয়। ইহা প্রায় চারশত বৎসর পূর্বের কথা। অতীতের চিহ্ন স্বরূপ এখনও "লাঘাটা নালা" ও "ঘাটির বটতলা" নামে দুইটি স্থান পরিচিত হইয়া আছে।

শ্রীগদাধর চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
চাঁদনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রামঃ গোপালপুর,
পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : যশহরি। ৬৭।১,১৫৮·১৬।৫০০।২,৫৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বাগ্দী, মুচি, বৈশ্য ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট হইতে সুলতানপুর রোড দিয়া সাইখিয়াগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে ধর্মরাজপূজা ও চড়ক। গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় চান্দ্রমাস হিসাবে মহরম, ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা, সবেবরাত এবং ফতেহা-ইয়াজ-দাহম উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবতলা নামে একটি স্থান আছে।

শ্রীবামনদেব চক্রবর্তী, শিক্ষক,
যশহরি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : মহাদেববাটী। ৭৫।২৫৮·১০।১০৫।৫২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, কলু, বাগ্দী ও জিতার। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কান্দী হইতে পাচথুপীগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী কালীপূজা, ভাদ্র মাসে শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে গ্রামের "রায় পুষ্করিণী"র ধারে বামনদেবের পূজা, কার্তিকে এবং অগ্রহায়ণে কালী-পূজা, পৌষসংক্রান্তিতে লক্ষ্মীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব।

(ঙ) বামনদেবপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সতেরটি শিবমন্দির, একটি লক্ষ্মীমন্দির, ৬ইটি পঞ্চানন্দ ও একটি জটাধারীতলা নামে স্থান আছে।

মহাদেববাটী একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। অতীতে এই স্থানে সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের বাস ছিল। গ্রামে পাঁচটি টোলে সংস্কৃত চর্চা হইত। ইহাভিন্ন, গ্রামে বহু শিবমন্দির ছিল। এখনও গ্রামের বিভিন্ন স্থানে বহু শিবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামে অনেকগুলি মহাদেব বা শিবের মন্দির থাকায় গ্রামটির নাম মহাদেববাটী হইয়াছে।

শ্রীঅজিত কৃষ্ণ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
মহাদেববাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম : দোহালিয়া। ৮৪।৪৪ ৩৫।৩৮।২৪৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কুমার, বেনে, কলু, মালি, যুগী, বাগ্দী, হাড়ী প্রভৃতি। ইহাভিন্ন, গ্রামে কতিপয় রাজপুত গোয়ালা এবং পাণ্ডা পদবীধারী পশ্চিমা ব্রাহ্মণের বসবাস আছে। গ্রামটি কুম্ভকার প্রধান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন খাগড়াঘাট রোড্। কান্দী-জজান রাস্তা হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের একটি রাস্তা বাহির হইয়া দোহালিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া কান্দী ও পাচথুপী রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। এই রাস্তায় মোটরবাস চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে চতুর্দশী তিথিতে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণা কালীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দক্ষিণা কালীর পাকা মন্দির ও তৎসংলগ্ন ছয়টি শিবমন্দির আছে। ইহাভিন্ন, "হরিহরানন্দ আশ্রম" নামে একটি আশ্রম আছে।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা-১।

১০। গ্রাম : রূপপুর। ৮৫।২৭৭৭৩। (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আচার্য (ব্রাহ্মণ), কৈবর্ত, স্বর্ণবণিক, হাড়ি, ডোম, বাগ্দী, মুচি, গোয়ালা প্রভৃতি।

গ্রামে জেলেপাড়া, স্যাকরাপাড়া, গোয়ালা-পাড়া, ছুতারপাড়া প্রভৃতি অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট রোড হইতে মোটরবাসে কান্দী শহরে নামিয়া দুই মাইল সাইকেল রিক্সায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রুদ্রদেবের শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্রমাসে গাজন বা হোম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সিদ্ধেশ্বরী কালীপূজা হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

গাজন বা হোম উৎসবের মেলা। চৈত্রমাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রুদ্রদেবের পাকা মন্দির, তৎসংলগ্ন চারিটি শিবমন্দির ও একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে সিদ্ধেশ্বরী কালীর নির্দিষ্ট বাঁধান বেদী আছে।

উল্লিখিত চারিটি শিবমন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

রূপপুর একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
পশ্চিমবঙ্গ সেন্সাস দপ্তর,
কলিকাতা-১।

১১। গ্রাম : রসড়া। ৮৯।৬২২৭৪।৯২।৪৭১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, নাপিত, ধোপা, ছুতার, বাউরী, হাড়ি ও বাগ্দী। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কান্দী হইতে সালার রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলপূজা, শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। উৎসব উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির আট দিন পূর্ব হইতে ভক্তগণ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন এবং প্রতি বৎসর প্রায় আড়াই শত ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সংক্রান্তির দিন হোম ও পাঁঠা বলি হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে রামেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীগোপীবল্লভ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
রসড়া-ভাটেরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ রসড়া, মুর্শিদাবাদ।

১২। গ্রাম : আন্দুলিয়া। ৯৭।৬১১৫১।২৪৭।১,২৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদ্গোপ, কোয়ার, নাপিত, গোয়ালা, কুমার, বাউড়ী, রাজবংশী, বায়েন ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চৌরীগাছা। গ্রামে দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা আছে। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় শীতলাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের (যজ্ঞেশ্বর) গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাত দিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি বিশাল তেঁতুল গাছের নীচে শীতলা দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে যজ্ঞেশ্বর ও রাজরাজেশ্বর নামে খ্যাত দুইটি শিবলিঙ্গ আছে।

গ্রাম সম্পর্কে শোনা যায় যে, আন্দুলিয়া গ্রামটি ফতেসিংহ পরগণার অন্তর্গত এবং কান্দী থানার দুই মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই স্থানে ফতেহাড়ি বা হাড়িরাজ নামে খ্যাত জমিদারের বাসস্থান ছিল এবং তাঁহারই নামানুসারে ফতেসিংহ পরগণার সৃষ্টি হয়। কথিত আছে, বর্গীর হাঙ্গামার পূর্বে ভীমরায়, কেশবরায় প্রভৃতি পাঁচবাবুরা ফতেহাড়িকে পরাজিত করিয়া এই পরগণা দখল করেন।

এখানে এখনও বহু প্রাচীন অট্টালিকার ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্গীর ভয়ে পাঁচবাবুরা গ্রামের চতুর্দিকে গড় খনন করেন ; সেই গড় এখন আন্দুলিয়া গড় নামে পরিচিত। এই গড় পরিবেষ্টিত আন্দুলিয়া রাজা সবিতা রায়, হাড়িরাজ এবং বিশেষ করিয়া মুঘল আমলে হিন্দু রাজাদের অভ্যুত্থানের সঙ্গে নিবিড়-ভাবে জড়িত।

শ্রীগোপী মোহন দে, প্রধান শিক্ষক,
আন্দুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ কান্দী

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(সৈয়দ হুসেন পীর)

গাতলা গ্রামে সৈয়দ হুসেন নামে জনৈক পীরের একটি দরগাহ আছে। প্রতি বৎসর ১৯শে পৌষ এই দরগাহে পীরের উরস্ উৎসব পালন করা হয় এবং প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একদিন দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। পীরের বর্তমান বংশধরগণ দরগাহ ও উৎসবের তত্ত্বাবধান করেন।

বহুকাল পূর্বে গাতলা গ্রামের নিকটবর্তী বাগপুর নামক স্থানটি গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের আবাসস্থল ছিল। কথিত আছে, সেই সময় সৈয়দ হুসেন পীর এই স্থানে আসিয়া অলৌকিক শক্তির প্রভাবে বনের হিংস্র জীব-জন্তুগুলিকে চারিদিকে জল বেষ্টিত করিয়া ঘিরিয়া ফেলেন এবং ঐ জঙ্গলের মধ্যে একটি আস্তানা স্থাপন করিয়া সাধন-ভজনে রত হন। পীর সাহেব যে-স্থানে উক্ত জীব-জন্তুগুলিকে ঘিরিয়া রাখেন সেই স্থানটি অদ্যাবধি "বাঘহটা ডাঙ্গা" নামে সাধারণের নিকট পরিচিত।

কালীপূজা

কান্দী থানার অন্তর্গত দোহালিয়া গ্রামের দক্ষিণা কালীতলা একটি সিদ্ধপীঠ বলিয়া খ্যাত। লোকালয় হইতে দূরে চারিদিকে নিমগাছ, বেলগাছ, কল্কে ফুল ও বকুলগাছ প্রভৃতি প্রাচীন বৃক্ষাদির দ্বারা বেষ্টিত কালীতলায় দেবী দক্ষিণা কালীর মন্দিরটি অবস্থিত। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে প্রায় এক মাইল ব্যাপী সম্পূর্ণ উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র দেখিতে পাওয়া যায়। বহুকাল পূর্বে মন্দিরের দক্ষিণ সীমান্ত দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে ময়ূরাক্ষী নদী প্রবাহিত ছিল বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। যদিও আজ ঐ নদীর কোন চিহ্ন বর্তমান নাই, তথাপি এই গ্রামের নিকটবর্তী অঞ্চলে রসড়া, বহড়া, মাড্ডা, সোলাপাড়া, হাপিনে, কুচেমারি প্রভৃতি প্রাচীন দহগুলি ময়ূরাক্ষীর অতীত স্মৃতি বহন করিতেছে। মন্দিরের দক্ষিণে একটি খেজুর গাছ তলায় একটি প্রাচীন ভগ্নস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে উহাকে "ধনডাঙ্গা" বলেন। প্রবাদ আছে, উক্ত স্তূপের মধ্যে বহু ধনরত্ন সঞ্চিত আছে। মঙ্গলকাব্য খ্যাত চাঁদ সওদাগর, ধনপতি সওদাগর প্রভৃতি বণিকেরা যখন ময়ূরাক্ষী নদী দিয়া এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিতে আসিতেন, সেই সময় এই স্থানে সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণের জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করিয়াছিলেন। ধনপতি সওদাগর কর্তৃক উক্ত গৃহ নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া উহা "ধনডাঙ্গা" নামে খ্যাত। এই স্থান হইতে পশ্চিম দিকে নবদুর্গা গোলাহাট গ্রামে তাঁহাদের আর একটি আবাসস্থল ছিল। নবদুর্গা গোলাহাটে অবস্থিত মঙ্গলচণ্ডী সম্পর্কে তথা শ্রীমন্ত সওদাগরের সিংহল যাত্রা কালে কমলে-কামিনী দর্শন প্রভৃতি নানা কাহিনী এই অঞ্চলে লোকের মুখে মুখে শুনা যায়। দোহালিয়া গ্রামের এই সিদ্ধপীঠটি প্রায় আটশত বৎসর পূর্বে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়। সেই সময় বাংলাদেশে মহারাজা লক্ষণ সেন রাজত্ব করিতেন। ছাতিনা কান্দী নিবাসী করাতিয়া ব্যাস সিংহের পুত্র বনমালী সিংহ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। তিনি মধ্যে মধ্যে মহারাজ লক্ষণ সেনের রাজসভায় বৈষ্ণব দর্শন আলোচনার জন্য রাজধানী নবদ্বীপে যাইতেন। মহারাজ লক্ষণ সেন বনমালী সিংহের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া জেমো, কান্দী প্রভৃতি অঞ্চল দান করেন। অবশ্য সেই সময় এই অঞ্চল গভীর বেত্রারণ্যে পরিপূর্ণ ছিল এবং জেমো, কান্দী, বাঘডাঙ্গা প্রভৃতি নামে কোন গ্রামের অস্তিত্ব ছিল না। বনমালী সিংহ এই অঞ্চলের গভীর জঙ্গল কাটিয়া প্রজা বসতি করাইয়াছিলেন, তাই তিনি বনকাটী সিংহ নামেও খ্যাত হন। এই সময় একদিন স্বপ্নাদেশ পাইয়া বনমালী দক্ষিণা কালীতলার বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কালীর একটি ক্ষুদ্র মন্দির নির্মাণ করেন এবং পুরোহিত, সেবাইত, বাজানদার, ঝাড়ুদার প্রভৃতি সকলকে বিভিন্ন গ্রাম হইতে আনিয়া দেব-সেবায়

নিয়োজিত করেন এবং তাহাদের সকলকে দেবোত্তর ভূসম্পত্তি দান করিয়া দোহালিয়া মৌজায় বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বনমালী সিংহের সময় হইতে অদ্যাবধি দেবীর নিত্যপূজাদি নিয়মিত অনুষ্ঠিত হইতেছে। বনমালী সিংহ প্রথমে বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন, পরে কালীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া কিরীটেশ্বরী উপপীঠে জনৈক তান্ত্রিক সাধকের নিকট শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হন বলিয়া জানা যায়।

শুনা যায়, বনমালী সিংহ কর্তৃক কালীমন্দির নির্মাণের বহুকাল পূর্ব হইতে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরবর্তী গভীর অরণ্যের মধ্যে দেবী প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান ছিলেন এবং এই স্থানে বহু কৌলাচারী তান্ত্রিক, কাপালিক প্রভৃতি সাধকেরা তন্ত্রোক্ত পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া গোপনে বামা সাধনা, শব-সাধনা প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থায় সাধন-ভজন করিতেন। এই সিদ্ধপীঠে সর্বপ্রথম কোন সাধক সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে বহু সাধক যে এইস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সে বিষয় কোন সংশয় নাই। কালী মন্দিরের আশেপাশে অনেকগুলি গুপ্ত সিদ্ধাসন আছে; তাহার মধ্যে মাত্র তিনটি ব্যক্ত আসন দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মুখে শুনা যায়, কিছুকাল পূর্বে কালী মন্দিরটি সংস্কার করিবার কালে বেদী খনন করিতে গিয়া উহার দুইপাশে দুইটি বৃহদাকার নরকঙ্কাল, সম্মুখভাগে একটি শিশুর কঙ্কাল এবং কয়েকটি সিন্দুর লিপ্ত নরমুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়।

কিংবদন্তী আছে, বহুকাল পূর্বে যখন দেবী এইস্থানে প্রচ্ছন্নরূপে অবস্থান করিতে ছিলেন, সেই সময় রাজপুত জাতির জনৈক রাখাল ময়ূরাক্ষীর তীরে গরু চরাইতে আসিত। রাখাল প্রতিদিন লক্ষ্য করিত তাহার একটি গাভী প্রত্যহ জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত এবং বেশ কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করিয়া পরে জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া আসিত। কৌতূহলী হইয়া একদিন রাখাল গাভীটির অনুসরণ করিয়া দেখিতে পায় যে, গাভীটি একটি বিল্ববৃক্ষের নীচে গিয়া দাঁড়াইবা মাত্র তাহার বাঁট হইতে আপনা-আপনি দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল; এইরূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখিয়া রাখাল অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে এবং সেইদিন রাত্রিতেই সে স্বপ্নে কালী মূর্তি দেখিতে পায়। ঐ রাখালের বংশধরগণ অদ্যাপিও এই গ্রামে বসবাস করিতেছে।

দেবীর বর্তমান মন্দিরটি সম্মুখে বারান্দাযুক্ত দক্ষিণমুখী একটি পাকা দালান ঘর বিশেষ। মন্দিরের মেঝে মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত। এই ঘরে একটি উচ্চ বেদীর উপর সম্পূর্ণ সিন্দুর রঞ্জিত একটি বৃহৎ কূর্মাকৃতি ব্রহ্মশীলা প্রতিষ্ঠিত আছে। শীলা গাত্রে স্বর্ণ নির্মিত জিহ্বা ও চক্ষু লাগান আছে। উক্ত ব্রহ্মশীলাটিকে দক্ষিণাকালীর ধ্যানে পূজা করা হয়। ইহাভিন্ন, মন্দিরাভ্যন্তরে লক্ষ্মী, চতুর্ভুজ নারায়ণ, মহিষমর্দিনী, সরস্বতী, ধর্মগোসাই ও বাণগোসাই-এর মূর্তি আছে। ধর্মগোসাই ও বাণগোসাই দারুময়। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটি যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে। ঐ যূপকাষ্ঠে দেবীর উদ্দেশ্যে পশু বলি দেওয়া হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বনমালী সিংহ কর্তৃক নির্মিত ক্ষুদ্র মন্দিরটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া তাহার উপর বাংলা ১৩০৪ সনে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়। মন্দির গাত্রের একটি শিলালিপি হইতে নিম্নলিখিত মন্দির নির্মাতাগণের নাম ও সময়কাল সম্পর্কে জানিতে পারা যায়:

শ্রীশ্রীপরমেশ্বর্য্যা ৺দক্ষিণাকালীকায়াশ্চরণ সেবিনা—
স্বর্গীয় ভূপতের্নরেন্দ্র নারায়ণ রায়স্য সহধর্ম্মিণ্যা শ্রীমত্যা
ভবতারিণী দেব্যা তদাতমজৈঃ শ্রীমৎ পূর্ণেন্দু নারায়ণ
শরদেন্দু নারায়ণ বরদেন্দু নারায়ণ রায়ৈশ্চ। তদাশ্রিতস্য
শ্রীকালী প্রসাদ রায়স্য প্রযত্নেন সংস্কৃতমিদং মন্দিরম্।
—শকাব্দ ১৮১৯ সন ১৩০৪ সাল।

কালীমন্দিরের পূর্ব পার্শে অবস্থিত ভোগমন্দিরের গাত্রে একটি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত লিপিতে নিম্নলিখিত মন্দির নির্মাতাদের নাম উৎকীর্ণ আছে:—

শ্রীশ্রী৺কালীমাতার ভোগমন্দির
স্থাপক—৺চন্দ্রকান্ত রায়
১৩০৫
সংস্কারক তস্যপুত্র—শ্রীশ্যামাপদ রায় ও
শ্রীবিষ্ণুপদ রায়, সাং জেমোদুবেপাড়া, ১৩৩৭।

কালীমন্দিরের পশ্চিম দিকে পাঁচটি এবং পূর্ব দিকে দুইটি চারচালা শিবমন্দির আছে। পশ্চিম দিকের মন্দিরগুলিও বাঘডাঙ্গা রাজবাটীর দেওয়ান বিশ্বনাথ রায় এবং পূর্ব দিকে মন্দিরগুলি কান্দী রাজপরিবারের রুদ্রনারায়ণ সিংহ মহাশয় কর্তৃক নির্মিত। পূর্ব দিকে আরও দুইটি শিব মন্দির ছিল; উহা বহুকাল হইল বিনষ্ট হইয়াছে। শিবমন্দিরগুলি খুবই প্রাচীন এবং প্রতিটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির গাত্রে অস্পষ্ট হইলেও সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়।

সমগ্র কালীমন্দির প্রাঙ্গণটি ইট দ্বারা বাঁধান। মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রাচীন বকুল গাছ আছে; কেহ কেহ অনুমান করেন গাছটি আট-নয় শত বৎসরের প্রাচীন হইবে। গাছটির বেড় প্রায় এগার হাত এবং উহার গোড়াটি প্রায় অর্ধহাত সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া গিয়াছে; কেবল মাত্র ছালের উপর নির্ভর করিয়া বৃক্ষটি দাঁড়াইয়া আছে। অধুনা একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ উহার সহিত জড়াইয়া শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়াছে। বাংলা ১৩৪৭ সনে শ্যামানন্দ স্বামী নামে জনৈক সাধু বকুল গাছটির গোড়া গোলাকারে সিমেণ্ট দ্বারা বাঁধাইয়া দিয়াছেন। ইহাকে "ভৈরবতলা" বলা হয়; এই স্থানে একটি ত্রিমুণ্ডি আসন আছে। মন্দিরের পূর্ব দিকে অবস্থিত পঞ্চমুণ্ডি আসনটি নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণ কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া অনেকে মনে করেন। পঞ্চমুণ্ডি আসনের উপর একটি শেওড়াগাছ এবং উহার পাশে একটি মাধবীগাছ আছে। শেওড়াগাছটির নীচে একটি ক্ষুদ্রাকার প্রস্তর নির্মিত বাসুদেব নারায়ণ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গাছটির গোড়ায় গ্রামবাসীগণ ষষ্ঠী পূজা করিয়া থাকেন।

মন্দিরের পশ্চিম দিকে "সন্ন্যাসীতলা" নামে একটি স্থান আছে। এই স্থানে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে গোলাকারে সিমেণ্ট দ্বারা বাঁধান বেদী দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদ আছে, সর্বপ্রথম যে সাধক এই সিদ্ধপীঠে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন, ইহা তাঁহারই সমাধি। প্রবাদ যাহাই হউক, এই স্থানটির অলৌকিক মহিমা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই স্থানে মানত করিলে পুরাতন জ্বরের নিরাময় হয়। বহু নরনারী এই স্থানে চিড়া-দুধ-এর ভোগ দিয়া "সন্ন্যাসী গোঁসাই"-এর উদ্দেশ্যে মানত পূজাদি দিয়া থাকেন।

কালী মন্দিরের পিছনে "ভোগ পুষ্করিণী" নামে একটি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে। এই পুষ্করিণীর জলেই কালীপূজার ভোগ রন্ধন করা হয়। ইহার উত্তর পাড়ে কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী নামে জনৈক সাধু একটি পঞ্চবটী স্থাপন করিয়াছেন। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম দিকে "বাবু সিং" পুষ্করিণীর পাড়ে অদ্যাপি মৃতব্যক্তির মুখাগ্নি কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং উহার পূর্ব দিকে বসবাসকারী কতিপয় গ্রহাচার্যগণ প্রেতাত্মা ও গ্রহদোষ খণ্ডন করিয়া থাকেন। এই কারণে অনেকে অনুমান করেন মন্দির নির্মাণের পূর্বে এই স্থানে একটি মহাশ্মশান ছিল।

দোহালিয়া গ্রামের দক্ষিণাকালী বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবীর মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তী আছে। শুনা যায়, কোন এক ঝড় বৃষ্টির রাত্রিতে জনৈক পথিক ও তাঁহার স্ত্রী নিদারুণ অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া লোকালয়ের অন্বেষণে বনমধ্যে এই কালীমন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন গভীর রাত্রি; সন্ধ্যার পূর্বেই পুরোহিত মন্দিরের দ্বার তালারুদ্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গিয়াছেন। পথভ্রষ্ট উক্ত স্বামী-স্ত্রী মন্দিরটিকে কোন গৃহস্থের বাড়ী ভাবিয়া আশ্রয়ের প্রত্যাশায় মন্দির দ্বারে করাঘাত করিতে থাকিলে পর জনৈকা সধবা স্ত্রীলোক পুরোহিতের স্ত্রী পরিচয় দিয়া মন্দিরের দ্বারা উন্মুক্ত করেন এবং সেই দুর্যোগের রাত্রে তাঁহাদের খাদ্য ও বস্ত্র দিয়া আপ্যায়ন করেন। পরের দিন প্রভাত হইলে আগন্তুকদ্বয় সবিস্ময়ে দেখেন যে, তাঁহারা একটি মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছেন; আশেপাশে কোন লোকালয়ের চিহ্নমাত্র নাই। অতঃপর তাঁহারা স্বগ্রামে আসিয়া দেবীর অপূর্ব মাহাত্ম্যের কথা চারিদিকে প্রচার করেন।

প্রতিদিন বিশেষ করিয়া শনি-মঙ্গলবার দূর-দূরান্ত হইতে বহু পুণ্যকামী ভক্ত মন্দিরে দেবী দর্শন করিতে আসেন এবং মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। মন্দির হইতে স্বপ্নাদ্য চক্ষু রোগের ঔষধ দেওয়া হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, ঐ স্বপ্নাদ্য ঔষধে দুরারোগ্য চক্ষুর ব্যাধি নিরাময় হয়। সাধারণতঃ

যোড়শোপচারে পূজা, ছাগবলি ও স্বর্ণালঙ্কার মানত করা হয়। কেবলমাত্র পুণ্যকামী ভক্তই নয়; শুনা যায় অতীতে বহু ডাকাতের দল তাহাদের কার্য-সিদ্ধির জন্য দেবীর নিকট মানত করিত এবং রাত্রির অন্ধকারে গোপনে ডাকাতের দল স্বর্ণালঙ্কার, অর্থ ও বাসনপত্রাদি মন্দিরে রাখিয়া চলিয়া যাইত। প্রভাতে আসিয়া পূজারীগণ মধ্যে মধ্যে ঐ সকল দ্রব্যাদি পাইতেন। আরও শুনা যায়, পূর্বে মন্দিরে নরবলি হইত; মাত্র শত বৎসর পূর্বে এই মন্দিরে শেষ নরবলি হয় বলিয়া জানা যায়। বর্তমানে পাঁচ পোয়া দুগ্ধ, পাঁচ ছটাক, চিনি ও পাঁচ পোয়া চাউলের নৈবেদ্য এবং পাঁচ ছটাক চাউলের পায়সান্ন দ্বারা কালীর নিত্য ভোগ-পূজাদি হয়। সন্ধ্যারতির সময় কিঞ্চিৎ মিষ্টি দিয়া শীতল পূজা দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের চতুর্দশী তিথিতে সাড়ম্বরে বাৎসরিক পূজা ও অন্নকূট মহোৎসব হইয়া থাকে। উৎসবে বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারী এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসী, কাপালিক আসিয়া থাকেন। এইদিন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি মানতের পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং এই অঞ্চলের প্রায় একশত বাদ্যকর বিনা পারিশ্রমিকে স্বেচ্ছায় মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহাদের বাদ্য-যন্ত্রাদি বাজাইয়া থাকেন। অন্নকূট মহোৎসবের জন্য দোহালিয়া মৌজার অন্তর্গত চাষীরা বিঘা প্রতি চার আঁটি করিয়া ধান দান করেন। এই উৎসব ব্যতীত বৎসরের বিশেষ বিশেষ পর্বগুলিতে কালীর সাড়ম্বরে ভোগ-পূজাদি হইয়া থাকে।

বাঘডাঙ্গা রাজপরিবার এবং জেমো রাজপরিবার দক্ষিণা কালীমন্দিরের সত্ত্বাধিকারী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেবোত্তর ভূসম্পত্তির আয় হইতে দেবীর নিত্য পূজা-অর্চনা অনুষ্ঠিত হয়।

বর্তমানে এগার ঘর ব্রাহ্মণ বংশপরম্পরায় পালাক্রমে সারা বৎসর কালীর সেবা-পরিচর্যা করেন। তাঁহারা মন্দির হইতে প্রণামী ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী পাইয়া থাকেন। ইহাভিন্ন, দেবোত্তর ভূসম্পত্তির কিয়দংশের উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। মন্দিরে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় বাজনা বাজাইবার জন্য কয়েক ঘর বাদ্যকর আছেন এবং মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিবার জন্য একঘর ঝাড়ুদার আছেন। তাঁহাদের নামে কিছু ভূসম্পত্তি বিলি-বন্দোবস্ত করা আছে। ইহাভিন্ন, মন্দিরে যতগুলি ছাগ বলি হয়, উহাদের মুণ্ডগুলি ঝাড়ুদার পাইয়া থাকেন।

দক্ষিণা কালীমন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত দুইটি শিব মন্দিরের পাশে "হরিহরানন্দ আশ্রম" নামে একটি আশ্রম আছে। কৌলাবতার কৈলাসানন্দ স্বামীর শিষ্য হরিহরানন্দ স্বামী কর্তৃক বাংলা ১৩২৫ সনে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ১৩৬১ সনে তাঁহার শিষ্যা ও আশ্রমমাতা কালিকানন্দময়ী দেবী ভক্তবৃন্দের সহায়তায় আশ্রমের পূর্ব নির্মিত আটচালা ঘরটি ভাঙ্গিয়া পাকা দালান ঘর নির্মাণ করেন। এই আশ্রমে "সনাতন গন্থাগার" নামে পরিচিত একটি ধর্মগ্রন্থাগার এবং একটি কক্ষে আশ্রমমাতার অস্থি-সমাধি আছে। আশ্রম সংলগ্ন একটি ফলের বাগানে নানাপ্রকার ফলের গাছ আছে। ইহা ভিন্ন, এই সাধন পীঠে যে সকল সাধক-সাধিকাগণ দেহরক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের অস্থি সমাধি আশ্রম সংলগ্ন একটি উন্মুক্ত মাঠে দেখিতে পাওয়া যায়।

এই আশ্রমে বৎসরে পাঁচটি উৎসব পালন করা হয়। ৫ই ভাদ্র কালিকানন্দময়ীর তিরোভাব উৎসব, আশ্বিন মাসে মহাষ্টমীর দিন কুমারীপূজা, ৯ই পৌষ কুলানন্দমীর তিরোভাব উৎসব, ১৭ই মাঘ হরিহরানন্দ স্বামীর তিরোভাব উৎসব এবং ৩রা চৈত্র শ্যামানন্দ স্বামীর তিরোভাব উৎসব। আশ্রমের নির্দিষ্ট কোন আয় নাই; এখানে আগত যাত্রী ও ভক্তগণের সাহায্যে আশ্রম পরিচালিত হয়।

(উল্লিখিত সিদ্ধপীঠ সম্পর্কে তথ্যবিবরণী অনুসন্ধান কাযে আমারা হরিহরানন্দ আশ্রমের শ্রীজগন্নাথ গিরি মহাশয়ের নিকট কৃতজ্ঞ)।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বাহাদুরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের বানব্রত ও চড়কপূজা উৎসব হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন। সম্ভবতঃ গ্রাম পত্তনের সময় হইতেই সাধারণের ব্যয়ে এই উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। বানব্রত উৎসব চারদিন চলে। উৎসবে ব্রতচারীরা তাঁহাদের নিজ নিজ পেটের মধ্যে বান

ফুঁড়িয়া তাহাতে তৈলসিক্ত কাপড় জড়াইয়া অগ্নি সংযোগ করেন এবং উহাতে গুড়া ধূপ-ধূনা ছিটাইয়া ঢাক-ঢোল বাজনার তালে তালে নৃত্য করিতে থাকেন। সংক্রান্তির পূর্ব দিন মধ্যাহ্নে হোম হয়। পূর্বে এই হোমের সময় পাঁঠা বলি দেওয়া হইত, কিন্তু বর্তমানে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রূপপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মহাধুমধামের সহিত রুদ্রদেবের গাজন বা হোম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মন্দিরে রুদ্রদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি বাংলা ১৩০১ সনে নির্মিত। ইহা দক্ষিণমুখী এবং সম্মুখে বারান্দাযুক্ত একটি সাধারণ পাকা দালান ঘর মাত্র। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি বেদীর উপর প্রায় দেড় ফুট উচ্চ এবং এক ফুট প্রস্থ বিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পাথরে খোদিত ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর বুদ্ধদেব যোগাসনে উপবিষ্ট, মূর্তিটির দক্ষিণ হস্ত নাভিমূলে এবং বাম হস্ত ভূমি স্পর্শিত। এই বুদ্ধ মূর্তিই এইস্থানে রুদ্রদেব নামে খ্যাত এবং শিবের ধ্যানে পূজিত। মন্দিরে রুদ্রদেবের মূর্তি ব্যতীত দারুময় বাণেশ্বর মূর্তি এবং কয়েকটি ছোট ছোট মাটির ঘোড়া আছে।

রুদ্রদেবের মন্দিরের দুই পার্শে পূর্বমুখী দুইটি এবং পশ্চিমমুখী দুইটি— মোট চারটি চারচালার শিবমন্দির আছে। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিকের মন্দিরটিতে পূর্বে রুদ্রদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। চারিটি মন্দিরেই গৌরীপট্টযুক্ত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। যতদূর জানা যায়, দক্ষিণাংশের পূর্বমুখী দুইটি মন্দির এবং উত্তরাংশের পশ্চিমমুখী একটি মন্দির জামুয়ার রাজপরিবার কর্তৃক এবং উত্তরাংশের অপর মন্দিরটি বাঘডাঙ্গার রাজপরিবার কর্তৃক নির্মিত। শিব-মন্দির চারিটি খুবই প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। মন্দির-গুলির শীর্ষে ত্রিশূল প্রোথিত। দক্ষিণ-পূর্বদিকের মন্দিরটির বহির্গাত্রে ও প্রবেশদ্বারের উপরিভাগে লতাপাতা, ফুল, অশ্বারোহী ও থামের আকৃতি এবং অপর তিনটি মন্দিরের বহির্গাত্রে রামায়ণ কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্য সম্বলিত অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়; যদিও কালের প্রভাবে উহার প্রাচীন শিল্প সৌন্দর্য বহুলাংশে ক্ষুণ্ন হইয়া গিয়াছে। মন্দিরগাত্রের একটি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায়, উক্ত মন্দির চতুষ্টয় বাংলা ১৩৩২ সনে সংস্কার করা হইয়াছিল।

রুদ্রদেব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। রুদ্রদেবের মাহাত্ম্য সম্পর্কে লোক মুখে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শোনাযায়। মন্দিরে প্রতিদিন মধ্যাহ্নে পরমান্ন দ্বারা ভোগপূজা ও সন্ধ্যারতি হয় এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে মানত-পূজাদি দিতে লোকজন আসেন। পূজারীগণ অম্লশূল, হাঁপানি প্রভৃতি রোগ-ব্যাধির স্বপ্নাদ্য ঔষধপত্র দিয়া থাকেন। বন্ধ্যা নারীরা সন্তান কামনায় রুদ্রদেবের নিকট মানসিক করেন। প্রধানতঃ ষোড়শো-পচারে পূজা, স্বর্ণালঙ্কার ও পাঁঠা বলি মানত করা হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ও মানসিক করিয়া থাকেন। শোনাযায়, একবার জনৈক মুসলমান রুদ্রদেবের নিকট গো-দুগ্ধ মানত করেন এবং তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইলে গো-দুগ্ধ লইয়া মন্দিরে পূজা দিতে আসেন; কিন্তু তাঁহাকে যবন জানিয়া পূজারী তাঁহার পূজা রুদ্রদেবের নিকট নিবেদন করিতে অসম্মত হন। অগত্যায় সেই ভক্ত মনক্ষুন্ন হইয়া গৃহে ফিরেতেছিলেন। ভক্তের ব্যাথায় ব্যথিত হইয়া পথে রুদ্রদেব ফকিরের বেশ ধারণ করিয়া স্বয়ং যবনের হাত হইতে দুগ্ধ পান করেন। এই অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচারিত হইলে মন্দিরে অ-হিন্দুগণের পূজা দিবার বাধা অপসারিত হয়।

রুদ্রদেবের নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন, ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি এবং চৈত্র মাসে গাজন বা হোম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। মেলায় খাবার, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রীর কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয় শত নর-নারীর সমাগম হয়।

মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণে একটি বৃহৎ প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে সিদ্ধেশ্বরী দেবীর নির্দিষ্ট বাঁধান বেদীর উপর প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া ছাগ বলিসহ সাড়ম্বরে সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলা ১৩৬৫ সনে সিদ্ধেশ্বরীদেবীর বেদীটি সিমেন্ট দ্বারা বাঁধান হয়। পূর্বে

এই স্থানটি শ্মশানক্ষেত্র ছিল এবং শোনাযায়, এই শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া গুরুদাস, রাধাবল্লভ, তারাদাস, দেবেন্দ্রনারায়ণ প্রমুখ তান্ত্রিকগণ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সেই পঞ্চমুণ্ডি আসনের উপরেই বর্তমান সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বেদীটি প্রতিষ্ঠিত। প্রতি রবিবার সিদ্ধেশ্বরী দেবীর বেদী হইতে শৃগাল কুকুর দংশনের স্বপ্নাদ্য ঔষধ দেওয়া হয়। উল্লিখিত মন্দিরাদি সহ চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত রুদ্রদেবের সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণটি প্রায় দুই বিঘা জমির উপর অবস্থিত।

কান্দীর সিংহবংশীয় ত্রয়োদশ পুরুষ রাজা লক্ষ্মীধর সিংহ-র পুত্র রুদ্র সিংহ রূপপুর গ্রামে রুদ্রদেবের প্রতিষ্ঠাতা। খুব সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজা রুদ্র সিংহ রুদ্রদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজাদি ও উৎসবের ব্যবস্থা করেন। মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনাযায় যে, কামদেব ব্রহ্মচারী নামে জনৈক তান্ত্রিক সাধক কান্দী শহরের পশ্চিম প্রান্তে ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে বর্তমান "হোমতলা" নামে খ্যাত গভীর জঙ্গলের মধ্যে তন্ত্র সাধনা করিতেন। তাঁহার সাধনস্থলে একটি বুদ্ধমূর্তি ও কালাগ্নিরুদ্র নামে এক ভৈরব মূর্তি ছিল। মূর্তি দুইটি তিনি নেপাল হইতে আনিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। ব্রহ্মচারীর নিকট হইতে বুদ্ধ মূর্তিটি ভিক্ষা করিয়া রাজা রুদ্রদেব রূপপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার নামানুসারেই মূর্তিটি রুদ্রদেব নামে খ্যাত হয়। শোনাযায় কালাগ্নিরুদ্র মূর্তিটি উদ্ধারনপুরে প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, কামদেব ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত বুদ্ধমূর্তিটি গত ইং ১৯৬১ সালের ১৫ই আগষ্ট মন্দির হইতে অপহৃত হয়। পরে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে ঐ মূর্তির অনুরূপ হুবহু আর একটি মূর্তি নির্মাণ করিয়া মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। বর্তমান এই নূতন মূর্তিটিরই পূজা-অর্চনা হইতেছে। নূতন মূর্তিটি "ক্যালকাটা মডেল এম্পোরিয়াম" কর্তৃক নির্মিত। প্রাচীন মূর্তিটির বিবরণী মুর্শিদাবাদ ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

The temple of Rudradeva in which an old Buddhist image is being worshipped as a Hindu deity. Two single cell Siva temples of the Bengal Hut model of the 16th-17th century flank the passage leading to the more modern shrine where the image is worshipped. The image is one of the typical Buddha figures with the eight great scenes on the life of Buddha exhibited in the style prevalent in the Eastern School of of Culture. As in other examples of this style, the central figure is that of Buddha in Bhumisparsa Mudra or the attitude in which he attained enlightenment. On the proper right the scenes from bottom to top are the bust of Buddha, the design from the thirty-three heavens indicated by the Baradamudra and the first sermon at Saranath ; the corresponding scenes depicted on the proper left are the offering of the cup by the guardians of the four patrons, the subduing of the elephant Nalagiri at Rajgir, and the Sravasti miracle ; while on the top occurs the scenes of Buddha's death. The sculpture can be attributed to the 9th-10th century A.D.

(District Handbooks, Murshidabad, 1951, by A. Mitra, p. 189)

চৈত্রমাসে রুদ্রদেবের হোম উৎসবই সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠান এবং এই উৎসবে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং সীমান্তবর্তী নদীয়া, বীরভূম ও বর্ধমান প্রভৃতি জেলা হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির ১১ দিন পূর্ব হইতে উৎসব শুরু হইয়া ১লা বৈশাখ শেষ হয়। প্রায় মাসাধিককাল পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হইয়া থাকে।

গাজন উৎসবের ন্যায় এই হোম উৎসবেও "ভক্ত" গ্রহণ এবং নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। উৎসব আরম্ভের প্রথম দিনে অর্থাৎ ১৯শে চৈত্র "ভক্ত" বা "সন্ন্যাস" গ্রহণ শুরু হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। বারের ব্রাহ্মণ বা ব্রতচারী ব্রাহ্মণগণকে যৎসামান্য দক্ষিণা দিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণের অনুমতি লইতে হয়। ভক্তরা ইচ্ছানুসারে কেহ এক মাস, কেহ পনের দিন, কেহ এক সপ্তাহ, কেহ বা তিনদিনের জন্য ব্রত পালন করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই

উৎসবে বহু অতীতকাল হইতে গ্রামের কয়েকটি নির্দিষ্ট পরিবারকে বংশানুক্রমে বিশেষ ভক্তব্রত পালন করিতে হয়। যেমন, কেবলমাত্র প্রামাণিক সম্প্রদায় "কালিকাপাতা ভক্ত" হইতে পারেন, "কালিকাপাতা ভক্ত"কে তিনদিন উপবাসী থাকিতে হয়, "গোয়ালা ভক্ত" গোয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত, "জলকুমড়ি ভক্ত" চণ্ডাল সম্প্রদায়ভুক্ত, "লাউসেনপাতা ভক্ত" সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ভুক্ত, "মায়েরপাতা ভক্ত" বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত, "হালসান ভক্ত" জেলে সম্প্রদায়ভুক্ত এবং "ধূপসেনভক্ত" এর পদবী মণ্ডল, সম্ভবতঃ কৈবর্ত সম্প্রদায়ভুক্ত। ভক্তরা ব্রত গ্রহণের দিন ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন করিয়া স্নানান্তে নূতন বস্ত্র পরিধান করেন, তাঁহাদের কণ্ঠে রক্তবর্ণের উত্তরীয় বা কাছা এবং হাতে একটি করিয়া বেতের ছড়ি দেওয়া হয়। সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের দিন হইতে উৎসব সমাপ্তি দিন পর্যন্ত ভক্তরা প্রতিদিন একবেলা হবিষান্ন অথবা ফলমূল খাইয়া রুদ্রদেবের পূজা এবং সংযম পালন করিয়া পবিত্র জীবনযাপন করেন।

২০শে চৈত্র জিরেণ। জিরেণের দিন মন্দির প্রাঙ্গণে সাধারণ ভক্তরা নৃত্য করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উৎসবের দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম দিনে জিরেণ থাকে।

২১শে চৈত্র অপরাহ্নে ভক্তগণ বিভিন্ন স্থান হইতে কাঁটাসহ কুলগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে স্তূপাকৃতি করেন এবং সন্ধ্যায় বারের ব্রাহ্মণদিগের বাড়ী হইতে ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ শোভাযাত্রা করিয়া রুদ্রদেবের জন্য তোষক-বালিশ প্রভৃতি বিছানাপত্র মন্দিরে লইয়া আসেন। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে হাতে জলন্ত মশাল লইয়া জনৈক নির্দিষ্ট মশালদার থাকেন। বর্তমান মশালদার শ্রীশম্ভু হাজরা। ইঁহারা পুরুষানুক্রমে মশালদারের কার্য করিতেছেন। বিছানা আনা হইলে মশালদার বারের ব্রাহ্মণগণকে তাঁহাদের বাড়ী হইতে আপ্যায়ন করিয়া মন্দিরে লইয়া আসেন। ইহার পর মন্দির হইতে রুদ্রদেবের বিগ্রহটিকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া একটি কাষ্ঠাসনের উপর স্থাপন করা হয় এবং তাহার পর উৎসব প্রাঙ্গণে রক্ষিত কুল-কাঁটার উপর ভক্তগণ নৃত্য করিয়া থাকেন। অতঃপর এইস্থানে রুদ্রদেবের পূজা-আরতি শেষ হইলে বিগ্রহটিকে মন্দিরের মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়।

২৩শে চৈত্র, ভক্তদের সিদ্ধি ভাঙ্গা অনুষ্ঠান হয়। এইদিন ভক্তরা নানাস্থান হইতে প্রচুর কাঁচা সিদ্ধিগাছের ডাল ভাঙ্গিয়া আনেন এবং ঐ সিদ্ধি দ্বারা রুদ্রদেবের পূজা হয়। পূজান্তে ভক্ত ও দর্শকগণের মধ্যে সিদ্ধি বিতরণ করা হয়। এইদিনের পূজায় প্রয়োজনীয় পুষ্প ও মালা গ্রামের নির্দিষ্ট মালাকার দিয়া থাকেন। রাত্রিতে ভক্ত নৃত্য হয়।

২৫শে চৈত্র উৎসবের বিশেষ অনুষ্ঠান "গোয়ালা নৃত্য"। এইদিন রাত্রিতে গোয়ালা ভক্তরা মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করিয়া থাকেন।

২৭শে চৈত্র উৎসব উপলক্ষে কালিকাপাতা ভক্তরা মুখে আবির মাখিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করেন।

২৮শে চৈত্র, "চোরা জাগরণ" হয়। এইদিন সকল ভক্তদিগকে রাত্রি জাগরণ এবং প্রহরে প্রহরে মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করিতে হয়। সন্ধ্যার পর জলকুমুড়ী ভক্ত রুদ্রদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দেন এবং প্রায় তিন ঘণ্টাব্যাপী একাকী গোপনে রুদ্রদেবের পূজাদি করেন। তাঁহার পূজার পর মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলে রুদ্রদেবের মূর্তিটিকে বাহিরের বারান্দায় আনিয়া রাখা হয়। ইহার পর মন্দির প্রাঙ্গণে যথাক্রমে দেয়াসীনপাতা ভক্ত, গোয়ালা ভক্ত, কালিকাপাতা ভক্ত, মায়েরপাতা ভক্ত, লাউসেনপাতা ভক্ত, ধূপসেনপাতা ভক্ত এবং অন্যান্য ভক্তব্রতীরা ঢাকঢোল-সানাইয়ের তালে তালে নৃত্য করিয়া থাকেন। নৃত্যকালে কালিকাপাতা ভক্তের মুখে আবির মাখিয়া, মায়েরপাতা ভক্তের মুখে কালীর মুখোস আঁটিয়া, লাউসেনপাতা ভক্ত মাথায় লাউকুমড়া এবং ধূপসেনপাতা ভক্ত হাতে প্রজ্বলিত ধুনার পাত্র লইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন। রাত্রি গভীর হইলে ভক্তরা আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের গৃহস্থদের বাগান হইতে ডাব, ইক্ষু, এঁচোড়, নারিকেল, বেল, কাঁচকলা, পেঁপে, কুমড়া, সজনা ডাঁটা ইত্যাদি নানাপ্রকার ফলমূল সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত করেন।

রাত্রি শেষ প্রহরে কালিকাপাতা ভক্তেরা নিকটবর্তী শ্মশান-মশান হইতে নরমুণ্ড সংগ্রহ করিয়া আনিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে পুনরায় নৃত্য করেন। ভক্তদের নৃত্য প্রত্যক্ষ করিতে সারারাত্রিব্যাপী মন্দিরে বহু দর্শকের সমাগম হয়।

২৯শে চৈত্র, প্রাতঃকালে রুদ্রদেবের বিগ্রহটিকে দোলায় চাপাইয়া ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ ভক্তরা ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে "হোমতলায়" লইয়া যান। অতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি একটি নির্দিষ্ট পথে বিগ্রহ লইয়া হোমতলায় যাতায়াত করা হয়। যাত্রাপথে ভক্তরা রাস্তা হইতে মুঠা মুঠা ধুলা লইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া থাকেন। পথের ধারে প্রতীক্ষারত ব্যক্তিরা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বিগ্রহের উপর ফুল-জল নিক্ষেপ করেন। হোমতলায় যাইবার পথে "বিশ্রামতলা" নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে রুদ্রদেবের বিগ্রহ নামাইয়া ভক্তরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করেন। তারপর হোমতলায় আসিয়া বিগ্রহসহ এইস্থানে অবস্থিত একটি বেদীকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া রুদ্রদেবের মূর্তিটি বেদীর উপর স্থাপন করিলে পর সমাগত দর্শকরা মূর্তিটির উপর কলসী করিয়া গঙ্গার জল ঢালিতে থাকেন। মধ্যাহ্নে হোমতলায় একটি নির্দিষ্ট স্থানে হোম-যজ্ঞাদি হয়। যজ্ঞ শেষ হইলে পর দোলায় করিয়া রুদ্রদেবকে স্নানাভিষেকের জন্য ময়ূরাক্ষী নদীর তীরে লইয়া যাওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানকে "দাতুরঘটা" বলে। দাতুরঘটা উপলক্ষে রুদ্রদেবের মূর্তিটিকে নদীর এক ঘাট হইতে জলে নামাইয়া অপর ঘাট দিয়া তুলিয়া আনা হয়। নদীর ঘাট হইতে হোমতলায় ফিরিবার পথে কান্দী জীবধরপাড়া নিবাসী রুদ্রনারায়ণ সিংহের বর্তমান বংশধরগণ মূর্তিটির সারা অঙ্গে তৈল-হরিদ্রা মাখাইয়া দেন।

এইস্থানে রাত্রিকালে রুদ্রদেবের নিকট ভোগপূজা হইয়া থাকে। ময়ূরাক্ষী নদীর পশ্চিম তীরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে পাটকাটির আগুন জ্বালাইয়া আতপ চাউল, মাষকলাই, চিনি, ঘি, সাদা বেগুন, শাক, আলতাপাতা, আলু প্রভৃতির দ্বারা ভোগ রান্না করা হয়। ভোগ রান্না কালে "হালসানাভক্ত" কয়েকটি শোলমাছ লইয়া ভোগ রান্নার নিকট বসিয়া থাকেন। হালসানাভক্ত ঐ মাছগুলি নদীতে ডুব দিয়া শিকার করেন। ভোগ রান্না শেষ হইবামাত্র ঐ মাছগুলি উনানের আগুনে দগ্ধ করিয়া খিচুড়ীর সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং ঐ খিচুড়ী ৬৪ ভাগ করিয়া ৬৪টি যোগিনীর পূজা করা হয়।

পরদিন প্রাতঃকালে ভক্তরা দোলায় করিয়া রুদ্রদেবকে হোমতলা হইতে রূপপুরের মন্দিরে লইয়া আসেন। ফিরিবার পথে রাস্তার নানাস্থানে প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। মানতকারীরা এই বলি দিয়া থাকেন। রুদ্রদেবের মূর্তি মন্দিরে আসিয়া পৌছাইলে মূর্তিটির উপর নিমপাতা ভিজান জল ঢালা হয় এবং ঐ জল সমবেত ভক্ত ও দর্শকের গায়ে ছিটাইয়া দেওয়া হয়। অপরাহ্নে চড়ক পূজা হয়। পূর্বে চড়ক উপলক্ষে ভক্তরা বাণ ফুঁড়িতেন।

১লা বৈশাখ ভক্তগণ গলা হইতে উত্তরীয় খুলিয়া ফেলেন এবং বেতের ছড়ি পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যান। এইদিন তাঁহাদের গ্রামবাসীর পক্ষ হইতে চব্য-চূষ্য ভোজনে আপ্যায়িত করা হয়।

জেমো রাজপরিবার এবং বাঘডাঙ্গার রাজ পরিবার বর্তমান মন্দিরের স্বত্বাধিকারী উভয় তরফের ব্রাহ্মণগণ বংশানুক্রমে পালা করিয়া রুদ্রদেবের পূজাদি করিয়া থাকেন। দেবোত্তর ভূসম্পত্তির আয় হইতে রুদ্রদেবের পূজা ও উৎসব পালন করা হয়।

দুর্গাপূজা

উগুরা-ভাটপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে তিনটি দুর্গাপূজা হয়। তন্মধ্যে দুইটি পূজা পারিবারিক এবং একটি সর্বজনীন। পারিবারিক পূজা দুইটির সেবায়েত যথাক্রমে শ্রীসুন্দর গোপাল চন্দ্র এবং শ্রীঅশ্বিনী কুমার সাহা। তিনটি প্রতিমাই প্রাচীন ঢঙ-এ নির্মাণ করা হয়। প্রতিমার পিছনে চালাচিত্রে আটটি পুত্তলি থাকে। তিনটি পূজারই নির্দিষ্ট মণ্ডপ আছে। শ্রীসুন্দর গোপাল চন্দ্র মহাশয়ের ঠাকুরবাড়ীটি কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত। পারিবারিক পূজা দুইটির একটি প্রায় দেড়শত বৎসরের এবং অপরটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। সর্বজনীন পূজাটি মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। দুর্গাপূজার চারিদিন গান-বাজনা ও ব্রাহ্মণ ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু-দর্শনার্থী আসিয়া থাকেন।

শীতলাপূজা

আন্দুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। শোনা যায় "পাঁচবাবু"-দের আমলে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া উক্ত শীতলা পূজাটি আরম্ভ হয়। শীতলা দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া স্থানীয় লোকের বিশ্বাস। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি প্রাচীন তেঁতুল গাছের নীচে উচ্চ মাটির বেদীর উপর শীতলা দেবীর পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। দোল পূর্ণিমায় বার্ষিক উৎসবে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী, খড়গ্রাম, ভরতপুর, বড়ঞা বেলডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু নরনারী শীতলা দেবীর নিকট মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। উৎসব উপলক্ষে সাড়ম্বরে যথারীতি পূজা, চব্বিশপ্রহরব্যাপী নামকীর্তন ও অন্নমহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় সাত-আট-দিনব্যাপী চলে। মানসিক হিসাবে তৈজসপত্র, বস্ত্র ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থাও আছে।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : কান্দী

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

দোহালিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের চতুর্দশী তিথিতে দক্ষিণা কালীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে কালীতলায় দেবোত্তর প্রায় সাত বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বীরভূম, নদীয়া প্রভৃতি জেলা হইতে অর্ধ লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পাঁচ শত দোকানপাট বসে এবং প্রায় পঞ্চাশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন থানা হইতে এবং বীরভূম, নদীয়া, বর্ধমান ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের এবং মনিহারী দ্রব্যসামগ্রীর দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি এবং কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কেবলমাত্র নাগরদোলা আসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

আন্দুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তি তিথিতে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত যজ্ঞেশ্বর শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। গ্রামে শীতলা দেবীর নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির উপর মেলার দোকানপাট বসিয়া থাকে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ ভরতপুর, কান্দী, বড়ঞা থানার গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা অধিকাংশই হাঁটিয়া, গরুরগাড়ীতে ও রিক্সায় করিয়া আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ উপরোক্ত গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী এবং মাটির বাসনকোসন প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, স্থানীয় এবং জেমো গ্রাম হইতে মাটির পুতুল এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাটও আসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় এবং আদায়কৃত ঐ অর্থ দোলপূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত অন্নমহোৎসবে ব্যয় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রা, কবিগান, মনসামঙ্গল গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। কোন কোন বৎসর খ্যাতনামা শ্রীঅশ্বিনী ঘোষের কীর্তনীয়ার দল এবং রাঘব ও সেখ গুমানির কবিগানের দল আনা হয়। বিশেষ করিয়া যাত্রায় এবং কবিগানের অনুষ্ঠানে বহুসংখ্যক শ্রোতা ও দর্শকের সমাবেশ হয়।

আগুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর চড়ক উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়; তন্মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

প্রধানতঃ বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রীর কয়েকটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, যাত্রাগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ যাত্রা এবং গানের দল গ্রামের বাহির হইতে আনা হয়।

জিয়াদারা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন চড়কপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন জমিতে তিনদিন-

ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়; অধিকাংশই হাঁটিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরটি দোকানপাট বসে। ঐ দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং কাপড়চোপড়ের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, কয়েকটি বাসন-কোসন ও কবিরাজী ঔষধপত্রের দোকানপাটও বসে। ইহাভিন্ন প্রায় পঞ্চাশজন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান, ম্যাজিক প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রা-থিয়েটারের দল আছে। তাহাছাড়া, ভাটপাড়া গ্রাম হইতেও যাত্রাদল আনা হয়। গ্রামের যাত্রাদলের অধিকারীর নাম শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ। এই আনন্দানুষ্ঠানে বহু দর্শক ও শ্রোতার সমাগম হইতে দেখা যায়।

যশহরি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা এবং ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে স্থানীয় শিবতলায় প্রায় একবিঘা জমির উপর একদিনের জন্য বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের বহুলোক আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় কবিগান ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

রূপপুরের গ্রামে রুদ্রদেবের গাজন বা হোম উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ২৯শে ও ৩০শে চৈত্র "হোমতলায়" প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

জঙ্গীপুর, কান্দী, বহরমপুর, পাঁচথুপী প্রভৃতি থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী এবং বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মোট প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, মনিহারী, কৃষি ও কারিগরীসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী, মাছধরা পোলো, মাটির খেলনা, পুতুল, হাঁড়িকুঁড়ি, কাঠের তৈয়ারী চেয়ার, টেবিল, আলমারী, বারকোস, ত্রিপায়া, পেঁদীপদণ্ড প্রভৃতি দ্রব্য-সামগ্রী আমদানী হয়। উল্লিখিত কারুশিল্পের দোকান-পাটগুলি শিবরামবাটী এবং কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি জঙ্গীপুর হইতে প্রতি বৎসর আসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা আসে।

বামনদেবপূজার মেলা

মহাদেবপাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের শুক্ল-দ্বাদশীতিথিতে বামনদেবের পূজা উপলক্ষে গ্রামের প্রায় পুষ্করিণীর পাড়ে সাধারণের প্রায় দশ বিঘা জমি জুড়িয়া একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং যশহরি, পাঁচথুপি, জজান, এবং আণ্ডা ইউনিয়নের গ্রামাঞ্চল হইতে সবসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-সাতশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ যশহরি, পাঁচথুপি, জুলিয়াডিহি, আণ্ডা প্রভৃতি ইউনিয়নের গ্রামসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে; তন্মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড় ইত্যাদি দোকানের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা নাই।

বাসন্তীপূজার মেলা

উণ্ডরা-ভাটপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা উপলক্ষে গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপের নিকটে রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলায় সাধারণতঃ স্থানীয় এবং কান্দী থানার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার হইতে বারোশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের অধিকাংশই হাঁটিয়া এবং কিছু সংখ্যক যাত্রী গরুরগাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে; তন্মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারা ও পান-বিড়ির দোকানের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতিদিন কবিগান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। তাহাছাড়া, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে। শ্রোতা এবং দর্শকের সংখ্যা প্রায় এক হাজার হয়।

শিবচতুর্দশীর মেলা

চাঁদনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে গ্রাম্যদেবীর স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের জমিতে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বাংলা ১২৯৪ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার যাত্রীর সমাগম হয় এবং যাত্রীদের অধিকাংশই হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কান্দী, দুর্গাপুর এবং গোপালপুর হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ইহাতে মাত্র পনর-ষোলটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি এবং কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান, বাউলগান এবং হরিনাম সংকীর্তন প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম দিন পূজান্তে হরিনাম সংকীর্তন, দ্বিতীয় দিন কবিগান, তৃতীয় দিন বাউল গান, চতুর্থ দিন যাত্রাভিনয় এবং পঞ্চম দিন সংকীর্তন, ধূলোট, অন্নসত্র, বালকভোজন ইত্যাদি হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে; অধিকারীর নাম শ্রীব্রজেশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

এই মেলাটির প্রচলন সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বাংলা ১২৬০ সনে গ্রামে জনৈক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হয় এবং তিনি গ্রাম্যদেবী তলায় বহুদিন অবস্থান করেন। সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়। তিনি প্রত্যহ একপোয়ার মত চাউল ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিতেন এবং তাহার কিছু অংশ ভিখারীদের মধ্যে দান করিবার পর বাকী অংশ নিমপাতার দ্বারা রাঁধিয়া গ্রামের বালক-বালিকাদের ভোজন করাইতেন। অন্নের সঙ্গে নিমপাতা থাকিলেও শিশুদিগের নিকট উহা খুবই উপাদেয় এবং সুস্বাদু হইত। প্রতিদিন বিকালের দিকে তিনি নাকি হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার উপর ঊর্ধ্বপদ হইয়া অনেকক্ষণ যাবৎ দোলা খাইতেন। একবার তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইবেন বলিয়া গ্রামবাসীর সাহায্য প্রার্থনা করেন; কিন্তু গ্রামবাসীগণের নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য পান নাই। পরে হঠাৎ একদিন দেখা গেল যে, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের দূরদূরান্ত হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসী চাল ডাল ও রন্ধনের অন্যান্য উপকরণাদি সহ এইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের আনীত উপকরণাদির দ্বারা অন্নসত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ১২৯৪ ও ১২৯৫ এই দুই সন উপরোক্ত সন্ন্যাসীর পরিচালনায় এই স্থানে পুনরায় উৎসব ও তদুপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। তাহার পর গ্রামবাসীদের উদ্যোগে উক্ত সন্ন্যাসীর স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রতি বৎসর এই মেলা বসিতেছে। এখনও পর্যন্ত এই মেলায় অন্যতম প্রধান অনুষ্ঠান বালক ভোজন। মেলাটি শিব চতুর্দশীর মেলা নামে খ্যাত।

শিবরাত্রির মেলা

রূপপুর গ্রামে প্রতি ফাল্গুন মাসের শিবচতুর্দশী তিথিতে রুদ্রদেবের শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। ইহাতে কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় পাঁচ শত নর-নারীর সমাগম হয়। বিক্রেতা এবং যাত্রীরা প্রধানতঃ কান্দী থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় সাধারণতঃ খাবার, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী আমদানী হয়।

জেলাঃ মুর্শিদাবাদ
থানাঃ বরঞা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ঝিকরহাটী।
১।২.৩৬৮'৮৩।৬৬৫।৩,৩২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, তিলি, গোয়ালা, কলু, স্বর্ণবণিক, কুমার, তাঁতি, শুঁড়ি, ময়রা, কোরা, ডোম, কামার, লেট, বাগ্দী, মুচি, হাড়ি, ছুতার, নরসুন্দর প্রভৃতি। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মল্লারপুর। কান্দী হইতে ঝিকরহাটী পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্য দিয়া জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে; ঐ রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসা মন্দির ব্যতীত দুইটি শিব, তিনটি মনসা ও একটি কালীর স্থান আছে। কালীর স্থানে প্রতি শনি-মঙ্গলবার মানত পূজা হইয়া থাকে। মানত হিসাবে ছাগ বলি দেওয়া হয়।

শ্রীমহাদেব মজুমদার, প্রধান শিক্ষক,
ঝিকরহাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
মুর্শিদাবাদ।

২। গ্রাম : কালিকাপুর। ২।২১৯'৬৮।৩০।১৯১

(ক) তিলি, বৈরাগী, মুচি ও আদিবাসী। দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন কালিকাপুর। চার মাইল দূরে মোটর রাস্তা আছে। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের ইন্দ্র দ্বাদশী তিথিতে সাড়ম্বরে ইন্দ্রপূজা করিয়া থাকেন। উৎসবের দুইদিন পূর্ব হইতেই নাচ-গান ও মদ্যমাংসাদি ভোজনসহ আমোদ প্রমোদ চলে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণচতুর্দশীতিথি হইতে পনর-দিনব্যাপী ব্রহ্মময়ীপূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করেন। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা ও চৈত্র-সংক্রান্তিতে সর্বজনীন শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ব্রহ্মময়ীপূজার মেলা। মাঘ মাসে পনর দিন-ব্যাপী। মেলাটি পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে ব্রহ্মময়ী আশ্রমে ব্রহ্মময়ীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং কালীর স্থান আছে।

শ্রীভূপতি ভূষণ দে মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম : কালিকাপুর, পোঃ ঝিকরহাটী,
মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : শীতলগ্রাম। ৩।৫০৫'৩০।১১৪।৬২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, তাতি, বাগ্দী, মুচি, ময়রা, গন্ধবণিক, নাপিত, ভিল, কলু, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে মোটরবাস যাতায়াত করে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসাপূজা, পূজাটি বহু প্রাচীন। মনসাদেবী স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রবাদ। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসের অমাবস্যা

তিথিতে কালীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে সাতদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মস্তোকপরি সর্পফণাযুক্ত সাতটি মনসার মূর্তি আছে।

শ্রীতারকব্রহ্ম ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
শীতলগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম: শীতলগ্রাম, পো: কল্যাণপুর,
মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম ঃ কুনিয়া। ৪।৮৪৫৯২।২৬৪।১,৪৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, ময়রা, দলুই, বাগ্দী, শুঁড়ি, ছুতার ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাল্লারপুর। মোটর বাস ষ্ট্যাণ্ড কান্দী। কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে কড়িলাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

কড়িলাপূজা উপলক্ষে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবিকা দেবীর মাথায় একশত আট ঘড়া জল ঢালা হয় এবং একশত আটটি পদ্মফুল উৎসর্গ করা হয়। উৎসব উপলক্ষে দেবীর নিকট ছাগ বলি ও একমণ চিড়া, একমণ দধি ও সম পরিমাণ মিষ্টি দিয়া নৈবেদ্য দেওয়া হয়। পূজান্তে ঐ সকল প্রসাদ সাধারণের মধ্যে বিলি করা হয়।

শিবের গাজন উপলক্ষে যথারীতি শিবপূজা হয়। ভক্তরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং মড়ার মাথা লইয়া নাচ ও বোলান গান গাহিয়া থাকেন। সন্ন্যাসব্রত সমাপ্তির পর ভক্তগণ তৈল ও হরিদ্রাদি মাখিয়া স্নান করেন। উৎসবের যাবতীয় ব্যয় স্থানীয় জমিদার বহন করিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিবিকা ঠাকুরাণীর মন্দির আছে। ঐ মন্দিরে ধর্মরাজ ঠাকুরের শিলামূর্তি আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে বহু শিব ও ৬টি শিবমন্দির এবং তিনটি মাঠকালী আছে। মাঠকালীর নিত্য পূজা হয় এবং পৌষ-সংক্রান্তিতে বার্ষিক পূজা হইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রামে ষষ্ঠী পূজা হয়।

দাস পদবীধারী কায়স্থরা কুনিয়া গ্রামের আদিবাসী। এই দাস বংশের আদি পুরুষ রামদাস। তিনি গজদানী রামদাস নামে খ্যাত। কথিত আছে, তিনি নাকি প্রতিদিন তাঁহার গুরুদেবকে একটি সোনার হাতী দান করিয়া তবে জল গ্রহণ করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা আজিও এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীনালকান্ত ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
সিদ্ধেশ্বরী স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: এড়োয়ালী, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম ঃ সিদ্ধেশ্বরী। ৬।৮১৫০৪।১৬৩।৮৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, ময়রা, রাজপুত, নাপিত, কামার, সৎচাষী, ছুতার, মুচি, বাগ্দী ও যুগী। গ্রামে ৫টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কান্দী-মল্লারপুর রোড হইতে একটি রাস্তা বাহির হইয়া কল্যাণপুর হইয়া এই গ্রামের মধ্য দিয়া কুনিয়া পর্যন্ত গিয়াছে। গ্রামের দেড় মাইল দূরে খর্জুনা হইতে মোটরবাসে কান্দী ও সাঁইথিয়া যাওয়া যায়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে ধর্মরাজপূজা, ভাদ্র মাসে মনসা-পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিক-পূজা, মাঘ মাসে কালীপূজা ও সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা ও অন্নপূর্ণাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত পূজা-পার্বণগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। আষাঢ় মাসে সাত-দিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ, বাণেশ্বর শিব ও দক্ষিণা কালীর মন্দির ও মূর্তি আছে। ধর্মরাজের প্রস্তর মূর্তি। উল্লিখিত প্রতিটি মন্দিরই ভগ্নপ্রায়।

সিদ্ধেশ্বরী গ্রামটি বহুকালের প্রাচীন। শুনা যায় যে, প্রাচীন কালে এই গ্রামের চারিধারে বহু দেবদেবীর মন্দির এবং বহু ব্রাহ্মণের বাস ছিল। গ্রামের উত্তর দিকে শীতলাদেবী, দক্ষিণদিকে দক্ষিণা-কালী, পূর্বদিকে সিদ্ধেশ্বরীকালী এবং পশ্চিমদিকে ক্ষেমঙ্করীকালীর ভগ্নপ্রায় মন্দির আছে। অনুমান করা হয় যে, সিদ্ধেশ্বরীকালীর নাম হইতেই গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী হইয়াছে।

শ্রীএস কে. আব্দুস সাত্তার, শিক্ষক,
সিদ্ধেশ্বরী স্পেশাল ক্যাডার প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ এড়োয়ালী, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : কল্যাণপুর। ৮।৬২৫ ৪৬।২০৭।১,০১১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, সদ্‌গোপ, ময়রা, রাজপুত, সংচাষী, ছুতার, বাগ্দী, ডোম, মুচি ইত্যাদি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, জাতিব্যবসায়, চাকুরী।

(গ) গ্রামের পূর্বদিকে খাগরাঘাট রোড্ রেল-স্টেশন। গ্রাম হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া দক্ষিণে একটি পাকা রাস্তার সহিত মিশিয়াছে। উক্ত পাকা রাস্তা দিয়া আন্দী হইতে মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা ও নবান্ন, পৌষসংক্রান্তিতে মাঠকালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে ধর্মরাজ, মাঠকালী ও শিবের শিলামূর্তি আছে। উল্লিখিত উৎসবগুলির মধ্যে সরস্বতী পূজাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের এবং অন্যান্যগুলি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুর্গা ও শিবের মন্দির এবং ধর্মরাজ, কার্তিক, কালী ও সরস্বতীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাব্যতীত, গ্রামে কল্যাণচণ্ডীর শিলামূর্তি ও ব্যক্তি বিশেষের দুইটি নারায়ণ শিলা আছে।

শ্রীকড়ি লাল দাস, প্রধান শিক্ষক,
কল্যাণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : কল্যাণপুর,
পোঃ আন্দী-ভায়া কান্দী, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : বিছুর। ১৪।৫৭৪·৮২।৯৭।৪৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, তিলি, শুঁড়ি ও বাগ্দী। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) সাঁইথিয়া ও মল্লারপুর রেলস্টেশন দুইটি গ্রামের নিকটবর্তী। বহরমপুর হইতে সিউড়ীগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠী পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে কালীপূজা। ধর্মরাজ ও কালীপূজা বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে ষষ্ঠী, শিবিকা ও ধর্মরাজের শিলা মূর্তি আছে।

শ্রীশশধর দাস, হেড্ পণ্ডিত,
বিছুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কুণ্ডল, মুর্শিদাবাদ।

৮। গ্রাম : আন্দী। ১৬।৫৩৭·৫০।৮০।৪৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, মাহিষ্য, বাগ্দী, তিলি, বৈরাগী ও মুচি। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের পশ্চিম দিকে সাঁইথিয়া ও পূর্বদিকে খাগড়াঘাট রোড্ রেলস্টেশন। কান্দী হইতে সাঁইথিয়াগামী মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘ মাসে গ্রামের বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা ও শিব-পূজা সর্বজনীন এবং কালীপূজাটি ব্যক্তি-বিশেষের। কালীপূজা ও শিবপূজা উপলক্ষে ছাগ বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুর্গাপূজার জন্য একটি মাটির ঘর আছে এবং অপর একটি মাটির ঘরে শিবপূজা হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন, একটি বটবৃক্ষের নীচে কালীর বাঁধান নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীসুধাকর ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
আন্দী জুনিয়র হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ),
গ্রাম ও পোঃ আন্দী, মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রাম : হলদী। ২৮।৪৫১'৪৮।১৭।৫১১

(ক) সদগোপ, বাগদী, কামার, তাঁতী ও বৈরাগী। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁইথিয়া। কান্দী হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ, শিব, হলদাইচণ্ডী ও ষষ্ঠীর স্থান আছে। ইঁহাদের কোনও মূর্তি নাই, কতকগুলি পাথর খণ্ডকে দেব-দেবী জ্ঞানে নিত্য পূজা করা হয়। চৈত্রসংক্রান্তিতে শিব পূজায় এবং বিজয়া দশমীর দিন হলদাই চণ্ডীর পূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম : হলদী, পোঃ গুরুলিয়া,
মুর্শিদাবাদ।

১০। গ্রাম : কুলী। ৩৬।৭৫৩'৮৩।২৯০।১,৪২৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মোটরবাসে ফকীরচৌরাস্তা নামক স্থানে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শাহ মহম্মদ আবদুল জব্বার গুলি চিশ্‌তি নিজানী সাহেব নামক জনৈক পীরের স্মৃতি স্মরণ উৎসব হইয়া থাকে। শোনা যায়, উক্ত পীর সাহেব বীরভূম জেলার মৌড়েশ্বর থানার অন্তর্গত মাঝারিপাড়া গ্রাম হইতে ফাল্গুন মাসে এই গ্রামে আসিয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে ধর্মসভা ও সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) বুড়াশিবের পাকা মন্দির এবং দুর্গা ও সরস্বতী পূজার জন্য মাটির ঘর আছে। একটি গ্রাম-দেবতা আছে।

কিংবদন্তী আছে, কুলী গ্রামের পশ্চিমে অবস্থিত মাঠটিতে কলিঙ্গ নগর নামে একটি সমৃদ্ধশালী নগর ছিল। অদ্যাপিও ঐ মাঠে তাহার অনেক স্মৃতি চিহ্ন রহিয়াছে এবং শ্রীমন্ত সদাগরের উপাখ্যানে ইহার বর্ণনা আছে। কোনও কারণবশতঃ উক্ত নগরটি ধ্বংস হইয়া যায় এবং কলিঙ্গ নগরের নামানুসারে গ্রামের নাম কুলী হইয়াছে।

শ্রীআবদুল মজিদ, শিক্ষক,
গ্রাম : কুলী, পোঃ কুলিকান্দী,
মুর্শিদাবাদ

১১। গ্রাম : সাবলদহ। ৪২।৩৭৪'৯২।১৬২।৮০১

(ক) কায়স্থ, সদগোপ, কলু, যুগী, ছুতার, শেট্ বাগদী, ডোম, ধাঙ্গর, কামার ইত্যাদি। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন খাগড়াঘাট রোড্।

(ঘ) চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক। শিবপূজায় হোম ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সর্বমঙ্গলা দেবার নিত্য পূজা হয়।

শ্রীশ্যামাপদ মণ্ডল, হেড্‌পণ্ডিত,
সাবলদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

১২। গ্রাম : বরঞা। ৫৬।১,৯৭০·৯৭।৭৩৫।৩,৪৯৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কৈবর্ত, বাগ্দী, মুচি, ডোম, বৈরাগী, হাড়ি, মেথর, নাপিত, ধোপা, কোনাই ও মুসলমান। গ্রামে মোট আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট রোড হইতে বরঞা পর্যন্ত সরাসরি বাস-রুট আছে। পশ্চিমে সাঁইথিয়া রেলস্টেশন হইতেও মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসের নয়, দশ এবং এগার তারিখে অনুষ্ঠিত বরঞা পীর শাহ আলমগীরের উরস্‌ উৎসব।

(ঙ) পীর শাহ আলমগীরের উরস্‌ উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীআবুল কালাম আজাদ্‌, শিক্ষক,
বরঞা কল্যাণ সমিতির সম্পাদক,
গ্রাম ও পোঃ বরঞা, মুর্শিদাবাদ।

১৩। গ্রাম : সিমুলিয়া। ৫৭।৫৩১·১৫।২৫৩।১,২৬৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, মুসলমান, মুচি ও গড়াই। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁইথিয়া।

(ঘ) আশ্বিন মাসে গ্রামের গড়াইপাড়া ও সদ্‌গোপ-পাড়ায় দুইটি দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন। কালীপূজায় ছাগ বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মাটির দুর্গামণ্ডপ ও কালীর নির্দিষ্ট স্থানে একটি শালা আছে।

শ্রীরমা রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
সিমুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গুরুলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

১৪। গ্রাম : গোলাহাট। ৬৮।৫৬৫·০১।৯৭।৫৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, বায়েন, বৈরাগী, তিলি, নাপিত ও কামার। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট রোড। কান্দী শহর হইতে দুই মাইল মোটরবাসে ও এক মাইল পথ হাঁটিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবারে জয়মঙ্গলা দেবার বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে মঙ্গলা দেবীর শিলা মূর্তি ও তাহার ভৈরব মহেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিগত বাংলা ১৩৫৩ সনের ২০শে জ্যৈষ্ঠ জনৈক গ্রামবাসী শ্রীসরোজাক্ষ অধিকারী মহাশয় নিজ ব্যয়ে মন্দিরটি সংস্কার করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীপ্রাণ কুমার অধিকারী, শিক্ষক,
গ্রাম : গোলাহাট, পোঃ নবগ্রাম,
মুর্শিদাবাদ।

১৫। গ্রাম : কোঁচবাধা। ৭৫।১৯১'০৪।৩৯।১৮৪
বাঁশবেড়ে। ৭৬।৯৮'৭৮।৮।৩৯
ছাপিনা। ৭৭।২১৩'২৪।৩৩।১৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, কুমার, বাগ্দী, মুচি প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় বাইশ মাইল দূরে খাগড়াঘাট রোড্ রেলস্টেশন এবং দেড় মাইল দূরে বরঞা হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা। ধর্মরাজের সেবায়েত জাতিতে সূত্রধর এবং পূজারী নিয়বর্ণের ব্রাহ্মণ। সুবিধা মত বৎসরের যে-কোন সময়ে অহোরাত্র নামসংকীর্তন মহোৎসব। আনুমানিক দেড়শত হইতে দুইশত বৎসর পূর্বে ধ্রুব গোস্বামী নামক এক সাধক এই স্থানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার আবির্ভাব উপলক্ষেই এই অহোরাত্র নামসংকীর্তন হইয়া থাকে।

(ঙ) জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান বসে।

(চ) ×

শ্রীবাণী চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষিকা,
গ্রাম : ছাপিনা, পোঃ বরঞা,
মুর্শিদাবাদ।

১৬। গ্রাম : সাহোড়া। ৯১।৭৯১'৬৭।২৪৫।১,১৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সদ্‌গোপ, কামার, কুমার, তিলি, ডোম, বাগ্দী, বৈরাগী, কেওট, হাড়ি ও কৌয়ার।

গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) কান্দী-পাচুটি রাস্তায় মহুরাকান্দী হইয়া গ্রামে যাইতে হয়। বীরভূম জেলার লাভপুর হইতে গাসুটিয়া পর্যন্ত মোটরবাস চলে। লাভপুরে একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসে সঙ্কটেশ্বরী কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি তেত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

এই গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে এবং চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ময়রা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের কয়েকটি দোকান বসে।

(চ) গ্রামের সঙ্কটেশ্বরী কালী ও তাহার ভৈরব সঙ্কটেশ্বর শিবের মন্দির এবং লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির আছে। ষষ্ঠী ও শীতলার স্থান আছে। ইহাব্যতীত, মহান্তপ্রভু নামে জনৈক ভক্ত সাধক এইস্থানে সাধনা করিয়া দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে উৎসব হয়। উৎসবের সময় ভক্তেরা চিড়া, লুচি ও অন্নভোগ দিয়া পূজা দেন।

এই গ্রামে বা আশেপাশের অঞ্চলে মহামারী দেখা দিলে সঙ্কটেশ্বরী, শীতলা, মহান্তপ্রভু ও সঙ্কটেশ্বর —এই চার দেবদেবীর পূজা দেওয়া হয়। স্থানীয় অধিবাসীদের বিশ্বাস যে, ইহাতে মহামারী ভয় দূর হয়। পূজায় ভোগ ও বলিদান দেওয়া হয়।

সাহোড়া গ্রামটি খুব প্রাচীন। আশেপাশে বিলের মাঠ, শূলিডাঙ্গা, জগডাঙ্গা, হংসতীনে বড়তলা প্রভৃতি স্থানগুলির সহিত বহু কিংবদন্তী জড়িত আছে।

শ্রীআশীষ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ছাত্র,
গ্রাম ও পোঃ সাহোড়া, মুর্শিদাবাদ।

১৭। গ্রাম : মান্দ্রা। ১০৩।৫৩৯'৬৬।১৫১।৭৯২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কৌয়ার, সদ্‌গোপ, কলু ও মুচি।

গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ×

(ঘ) গ্রামে ২৭শে চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত শিবপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী বোলান গান হয়। ইহাভিন্ন, গ্রামে সরস্বতী, অন্নপূর্ণা, বাসন্তী ও কালীপূজা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রমাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব মন্দির ও নারায়ণজীউর একটি পাকা মন্দির আছে। নারায়ণমন্দিরে শালগ্রাম শিলার পূজা হয়।

শ্রীঅর্জুন চন্দ্র রায়, প্রধান শিক্ষক,
মান্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাহোড়া, মুর্শিদাবাদ।

১৮। গ্রাম : ফতেচাঁদপুর (মৌজাঃ কোগ্রাম)। ১০৯।৫৪৩৭৯।১২৪।৬১৮

(ক) সদ্‌গোপ, বৈরাগী ও কোনাই।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে আট মাইল দূর দিয়া বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্য সময়ে মোটরবাস চলাচল করে। বর্ষাকালে নিকটবর্তী ময়রাক্ষী নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে।

(চ) গ্রামের কালীর নির্দিষ্ট বেদী আছে।

শ্রীসৃষ্টিধর ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
ফতেচাঁদপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সাহোড়া, মুর্শিদাবাদ।

১৯। গ্রাম : নন্দীবাণেশ্বর।১২৬।১৬৫৪৮।৯৭।৪৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, মুচি, হাড়ি, ডোম ও ছুতার। গ্রামে মোট নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) কান্দী-পাঁচথুপী পাকারাস্তা হইতে একটি রাস্তা বাহির হইয়া এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে ব্যক্তি-বিশেষের দুইটি দুর্গাপূজা হয়। পূজা দুইটি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ ব্যতীত দক্ষিণ-পূর্ব, দক্ষিণ-পশ্চিম, উত্তর-পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম দিকে চারিটি কালীর স্থান আছে।

গ্রামের জমিদার বাড়ীর দুর্গাপূজা সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, মেঘনাদ ঘোষ নামে জনৈক জমিদার বঙ্গাধিপতি হোসেন শাহের দরবারে চাকুরী করিতেন। তাঁহার (মেঘনাদ ঘোষের) স্ত্রী চণ্ডীব্রত করিতেন এবং এই ব্রতের ঐশ্বরিক ক্ষমতা বলে মেঘনাদ ঘোষ প্রতি দিন রাজধানী গৌড় হইতে আসিয়া এই গ্রামে রাত্রিযাপন করিতেন।

হোসেন শাহ ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে রাত্রিতে রাজধানী ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই আদেশ অমান্য করায় মেঘনাদ ঘোষের শিরশ্ছেদ হয়। কথিত আছে তাঁহার স্ত্রী যখন গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া দেবীর পূজা করিতেছিলেন, মেঘনাদ ঘোষের কাটামুণ্ড অকস্মাৎ তাঁহার ক্রোড়ে পতিত হয়। ইহার পর তাঁহার স্ত্রী সহমরণে যান। মেঘাদীঘির পাড়ে তাঁহাদের অন্তেষ্টিক্রিয়া হয়। এই ঘটনার পর হইতেই এই চণ্ডীমণ্ডপে প্রতি বৎসর মহাধুমধামের সহিত দুর্গাপূজা হইয়া আসিতেছে।

শ্রীনির্মল কুমার চক্রবর্তী, কৃষিকার্য,
নন্দীবাণেশ্বর, পোঃ একমরিয়া,
মুর্শিদাবাদ।

ও

শ্রীসিদ্ধার্থ কুমার সিংহ, ছাত্র,
৬বি, রামনারায়ণ মতিলাল লেন,
কলিকাতা—১৪।

২০। গ্রাম: পাঁচথুপি। ১৪৯।১,৬০৪ ৭৪।৬৭৫।৩,৪৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কুমার, কামার, তাঁতি, ছুতার, ধোপা, নাপিত, মুচি, মেথর, বাগ্দী, ও মুসলমান।

গ্রামে আঠারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, ব্যবসায়, শিল্পকার্য ও মজুরী।

(গ) গ্রামটি কান্দী হইতে আট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সালার। পাঁচথুপি হইতে বহরমপুর, সাঁইথিয়া ও ইন্দ্রানী পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা ও মাঘীপূর্ণিমায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে শিব-পূজা ও চড়ক।

(ঙ) নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্রমাসে।

(চ) গ্রামে সিংহবাহিনীমন্দির, কালীমন্দির, চণ্ডী-মণ্ডপ ও শিবের একটি নবরত্ন মন্দির আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবাঠাকুর ও একটি মনসা আছে।

পাঁচথুপি একটি প্রাচীন, প্রসিদ্ধ ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। এখানে কয়েক ঘর বিখ্যাত জমিদারের বসবাস আছে। গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে "বারকোনার দেউল" নামে একটি ধ্বংসাবশেষ আছে। অনেকের মতে, ইহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাব-শেষ। ইহাতে পাঁচটি স্তুপ ছিল বলিয়া গ্রামের নাম পাঁচথুপি হইয়াছে এইরূপ অনুমান করা হয়।

শ্রীবটকৃষ্ণ পাল, প্রধান শিক্ষক,
পাঁচথুপি শারদা প্রসাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ পাঁচথুপি, মুর্শিদাবাদ।

২১। গ্রাম: মালিয়ান্দি।
১৫১।১,১১২ ৭৭।২৫৪।১,২৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, তাঁতি, কুমার, কামার, স্বর্ণবনিক, গন্ধবনিক, নাপিত, ময়রা, ছুতার, জেলে, কৈবর্ত, গোয়ালা, বৈরাগী, তেলি, কোটাল, বাগ্দী, হাড়ি, কোনাই ও মুচি।

গ্রামে মোট তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট ও রামজীবনপুর। পাঁচথুপি হইতে বহরমপুর, সাঁইথিয়া ও ইন্দ্রানী পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা ও পূর্ণিমায় ধর্মরাজ-পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষসংক্রান্তিতে লক্ষ্মীনারায়ণ পূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উৎসব।

(ঙ) লক্ষ্মীনারায়ণপূজা উপলক্ষে মেলা। পৌষ মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন তামাল বৃক্ষের মূলে বাঁধানো বেদীর উপর গ্রামদেবী মলয়া চণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান ও দেবীর প্রতীক স্বরূপ একটি শিলাখণ্ড আছে। উক্ত শিলাখণ্ডটি আকৃতিতে হাঁটুর উপর অংশের মত দেখিতে। চলতি ভাষা শরীরের ঐ অংশকে মালুয়াচাকী বলে। সম্ভবতঃ এই কারণে দেবী নাম মলয়াচণ্ডী এবং গ্রামের নাম মালিয়ান্দি হইয়াছে। মলয়া চণ্ডীর বেদীর চতুর্দিকে প্রায় তিন-চার ফুট উচ্চ অর্ধ ভগ্ন অনেকগুলি মূর্তি রক্ষিত আছে। উক্ত মূর্তিগুলি বৌদ্ধ দেবদেবী বলিয়া অনুমান করা হয় এবং সম্ভবতঃ কালাপাহাড় কর্তৃক মূর্তিগুলির ক্ষতি সাধন হইয়াছে।

শ্রীতারকব্রহ্ম সরকার, প্রধান শিক্ষক,
মালিয়ান্দি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গড্ডাসিংহারি, মুর্শিদাবাদ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—কেশের পাহাড় (মৌজা নং ১২৬) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব ও তদুপলক্ষে একটি মেলা বসে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণী মেলা বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল। সংবাদদাতা, শ্রীনির্মল কুমার চক্রবর্তী, নন্দীবাণেশ্বর, মুর্শিদাবাদ ও শ্রীসিদ্ধার্থ কুমার সিংহ, ৬বি, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা-১৪।

জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : বরঞা

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(পীর শাহ আলমগীর)

বরঞা গ্রামে ৯ই ফাল্গুন হইতে ১১ই ফাল্গুন পর্যন্ত পীর শাহ আলমগীর সাহেবের উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে যে, বাংলার রাজা হোসেন শাহ তাঁহার রাজ্যের মধ্যে বহু রাস্তাঘাট নির্মাণ করিয়া একদা সেইগুলি পরিদর্শনে বাহির হন। সেই সময়ে বহু পীর, মৌলানা ও গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। পীর শাহ আলমগীর তাঁহাদের মধ্যে একজন। হোসেন শাহ তাঁহার প্রিয় ভক্ত ছিলেন। বাদশাহী সড়কের উভয় পার্শ্বে এক মাইল অন্তর একটি মসজিদ, দীঘি, পান্থশালা এবং বহু অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করা হইয়াছিল।

বাদশাহ-এর সহিত রাস্তা পরিদর্শন কালে পীর সাহেব এই গ্রামটি আল্লার উপাসনার পক্ষে উপযুক্ত স্থান বলিয়া মন্তব্য করায় হোসেন শাহ খুশী হইয়া তাঁহাকে এইস্থানে কিছু জায়গীর দান করেন। এই স্থানে পীর সাহেব আসিয়া সর্বদা ঈশ্বরের চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার ভক্তের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। তিনি সর্বদা তাঁহার ভক্তদের নিকট শান্তি, মৈত্রী ও ধর্মের বাণী প্রচার করিতেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার বহু অনুরাগী ও ভক্ত ছিল। অতঃপর তিনি এই স্থানে দেহরক্ষা করিলে তাঁহার আস্তানার সীমানায় একটি তেঁতুল বৃক্ষ মূলে তাঁহার মরদেহ সমাধিস্থ করা হয় এবং তাঁহার খাদেমগণ প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এইস্থানে স্মৃতি উৎসবের আয়োজন করেন। সেই অবধি পীর সাহেবের স্মৃতি-উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে।

উৎসবের প্রথম দিন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে পরমান্ন বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় দিন এই অঞ্চলের খ্যাতনামা মৌলভী ও মওলানাগণ সকাল দশটা হইতে রাত্রি পর্যন্ত ধর্মালোচনা করেন। তৃতীয় দিন সর্বজনীন ভোজ হয়, ইহাতে সর্বসম্প্রদায়ের লোকই প্রসাদ গ্রহণ করেন। উৎসবে কোন কোন বৎসর সাধু-ফকিরের আগমন হয়। পীরের আস্তানায় মুরগী, খাসি, মিষ্টি, পায়স ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়।

মুসলমানদিগের উৎসব হইলেও ইহাতে হিন্দুরা যোগদান করেন।

কালীপূজা

সাগোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে মহাধুমধামের সহিত দেবী সঙ্কটেশ্বরী কালীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে সঙ্কটেশ্বরী কালীর শিলামূর্তি ও দেবীর ভৈরব সঙ্কটেশ্বর শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসব উপলক্ষে দেবীর যথারীতি পূজাদি হয় এবং আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী দেবী দর্শন করিতে ও পূজা দিতে আসেন। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ ও অন্নসত্র খোলা হয়। ভক্তদের বিশ্বাস সঙ্কটেশ্বরী কালীর নিকট মানত করিলে বা "হত্যা" দিলে স্বপ্নাদেশে বহুপ্রকার দুরারোগ্য ব্যাধির ঔষধপত্র পাওয়া যায়। এই বিশ্বাসে বহুলোক মন্দিরে পূজা ও "হত্যা" দিয়া থাকেন। প্রধানতঃ ছাগ ও মেষ বলি মানত করা হয়।

দেবীর নিত্য পূজা বা গীত প্রতি শনি-মঙ্গলবার বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। এই দুইদিন গ্রামের বাহির হইতে বহু যাত্রী মানত পূজাদি দিতে আসেন। দেবীর সেবায়েতদের পাণ্ডা বলা হয় এবং পাণ্ডাদের মধ্যে যাঁহারা দেবীর নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে দেবর ব্রাহ্মণ বলা হয়। ইঁহাদের পদবী চক্রবর্তী। তবে কোন বিশেষ পূজাপার্বণ উপলক্ষে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণ পূজা করিয়া থাকেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

ফতেচাঁদপুর গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে গ্রাম্যদেবী কালীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন। কালীর একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে, সেখানে প্রতি বৎসর মৃন্ময় কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করা হয়। উৎসব উপলক্ষে ছাগ ও মেষ বলি দেওয়া হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

সাহোড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে শিব ও বানগোসাই-এর হোমপূজাদি হইয়া থাকে। সংক্রান্তির তিন-চার দিন পূর্ব হইতে অনেক ভক্ত গাজনের সন্ন্যাস হইয়া ব্রত পালন করিয়া থাকেন। উৎসবে ছাগ বলি, পুকুরঘাট ঝাঁক দেওয়া এবং গাজনে সন্ন্যাসীদের বানফোঁড়া, নৃত্যাদি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। রাত্রিকালে কবি, বোলান ও পাঁচালীগান এবং যাত্রাভিনয় হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

জয়মঙ্গলা চণ্ডীর পূজা

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতি মঙ্গলবার গোলহাট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত জয়মঙ্গলা (চণ্ডী) দেবীর বিশেষ পূজা এবং শারদীয়া ত্রয়োদশী তিথিতে বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বার্ষিক উৎসবে দেবীর ষোড়শোপচারের পূজা, হোম ও ছাগ বলি হয়। এই সময় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী মানত পূজাদি দিতে আসেন।

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে। দৈনিক পূজায় চিড়ার ভোগ দেওয়া হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন। কিংবদন্তী অনুসারে বলা হয় যে, এই গ্রামে মঙ্গলা দেবীর পূজা প্রচলনের সহিত শ্রীমন্ত সওদাগরের কাহিনীর সহিত যোগ আছে। দেবীর প্রাচীন মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে বিগত বাংলা ১৩৫৩ সনে জনৈক গ্রামবাসী কর্তৃক বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দিরে মঙ্গলা দেবীর শিলাময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হইয়া থাকে :

সিংহস্থা শশী শেখরা মকরত প্রেক্ষা চতুর্ভিভুজৈ।
শঙ্খং চক্রং ধনুঃশরাংশ্চ দধতি নেত্রৈঃ ত্রিভিঃ শোভিতা॥
অমুক্তাঙ্গদহরা কঙ্কণরণৎ কাঞ্চী কনক নূপুরা।
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ভবতু মে রত্নোল্লসৎ কুণ্ডলা॥

ধর্মরাজপূজা

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে মালিয়ান্দি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই গ্রামের উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিক ময়ুরাক্ষী নদী দ্বারা বেষ্টিত। শুনা যায় যে, প্রায় চার শত বৎসর পূর্বে গ্রামের উত্তরে ময়ূরাক্ষী নদীর কোন অস্তিত্ব ছিল না। তখন গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত নদীটি প্রবল ছিল এবং বৈদ্যনাথপুর গ্রামের পূর্বাংশে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উহার একটি শাখা কুয়া নদীতে পড়িয়াছিল ও অপর শাখাটি গড্ডাসিংহারী গ্রামের দক্ষিণদিকে প্রবাহিত ছিল। শেষোক্ত এই শাখাটিকে লোকে শ্বেতগঙ্গা বলিত। কথিত আছে, শ্বেতগঙ্গায় এই গ্রামের জনৈক কৈবর্তের জালে একদা ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রস্তর খোদিত মূর্তিটি উঠিয়াছিল এবং তিনি উক্ত মূর্তিটি এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা চলিয়া আসিতেছে। এই ধর্মরাজ গবীররায় নামে খ্যাত।

প্রতি বৎসর উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা, হোম এবং ছাগ, মেষ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মুক্তিস্নান অনুষ্ঠান। মুক্তিস্নান উপলক্ষে ভক্তরা ধর্মরাজ শিলাটিকে মাথায় করিয়া প্রথমে শ্বেত গঙ্গায় লইয়া যান। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্তমানে শ্বেতগঙ্গা মজিয়া একটি বিলে পরিণত হইয়াছে। শ্বেতগঙ্গার তীরে দুধ মিশ্রিত জলে ধর্মরাজ শিলাটিকে স্নান করান হয়, তাহার পর ভক্তরা ধর্মরাজকে মাথায় লইয়া গ্রামের পশ্চিম দিকে প্রবাহিত নদীতে ধর্মরাজকে স্নান করান এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও স্নান করিয়া থাকেন। এই স্নানকে মুক্তিস্নান বলা হয়। উৎসব কালে আশেপাশের গ্রাম হইতে লোকজন পূজাদি দিতে আসেন। উৎসবটি সর্বজনীন। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী।

ব্রহ্মময়ীপূজা

কালিকাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী হইতে পনর দিন ধরিয়া ব্রহ্মময়ী মাতার বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে শ্রীধরণীধর হাজরা

(গোস্বামী) কর্তৃক স্থাপিত ব্রহ্মময়ী আশ্রমে দেবী ব্রহ্মময়ীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই উৎসবের সময় অনেক সাধু ও ভক্তদের সমাগম ঘটে। পূজার শেষ তিন দিন হরিনাম সংকীর্তন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়। দেবীর সেবায়েত জাতিতে ভূঁইমালী। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয়।

"ওঁ মধ্যে সুধাব্দি মণিমণ্ডপরত্ন বেদী
সিংহাসনো পরিগতাং পরিপীত বর্নাম্
পীতাম্বরা' কনকভূষণ মাল্যে শোভাং
দেবী' ভজামি ধৃত মুদ্গার বৈরি জিহ্বাম্॥"

মনসাপূজা

ঝিকরহাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথি হইতে সপ্তমী তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে মনসা দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে মনসার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

উৎসব উপলক্ষে অমাবস্যার তিথি হইতে মন্দিরে মনসার ভাসান গান আরম্ভ হয়। তৃতীয়া তিথিতে মনসার জন্ম বৃত্তান্ত বিষয় লইয়া গান আরম্ভ হইলে পর মনসা দেবীর জনৈক দেবাংশী মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মনসা পূজা আরম্ভ করেন এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দৈব মহিমায় তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়িলে বাহির হইতে মন্দিরের দ্বার সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়া তাহার উপর এমনভাবে চিক্ ও কাদামাটি দিয়া লেপন করিয়া দেওয়া হয়, যাহাতে বাহির হইতে মন্দিরের ভিতরের কিছুই দৃষ্টিগোচর না হয়। তৃতীয়া ও চতুর্থী তিথিতে এইরূপভাবে মন্দিরে দ্বার বন্ধ থাকে। পঞ্চমী তিথির প্রাতঃকালে যখন মনসার জিয়ান গান আরম্ভ হয়, তখন আপনা হইতেই মন্দিরের দ্বার খুলিয়া যায় এবং ভক্তরা দেবাংশীকে অচৈতন্য অবস্থায় মন্দির হইতে বাহিরে আনিয়া স্নানাদি করান। স্নানাদির পর দেবাংশীর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসে। মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত হইবার পর দেবী নিকট কয়েকটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে যথারীতি পূজা হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু যাত্রী মানত পূজাদি দিতে আসেন। যাত্রীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মনসার নিত্যপূজা হয়। প্রতি শনি-মঙ্গলবার দেবীর বিশেষ পূজা উপলক্ষে মানসিক পূজা দিবার জন্য বহু ভক্ত আসিয়া থাকেন। প্রধানতঃ মানত হিসাবে ষোড়শোপচারে পূজা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। দেবীর সেবায়েত ব্রাহ্মণ। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন।

সিংহবাহিনীপূজা

মালিয়ান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় সাড়ম্বরে সিংহবাহিনী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের (শ্রীতারকব্রহ্ম সরকার মহাশয়ের পারিবারিক বিগ্রহ) হইলে গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। সিংহবাহিনীর মূর্তিটি অষ্টধাতু নির্মিত। দেবী সিংহের উপর দণ্ডায়মানা এবং চতুর্ভূজা। দুই হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ ও পদ্ম এবং অপর দুই হস্তের ত্রিশূল মহিষাসুরের বক্ষ ভেদ করিয়াছে।

প্রতি বৎসর শারদীয়া ষষ্ঠী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত যথারীতি হোমপূজাদি হইয়া থাকে। নবমী পূজার দিন মাছ-মাংস সহ অন্নভোগ ও পায়সান্ন দেওয়া হয়। নূতন মাটির হাঁড়ি করিয়া ভোগ রান্না করা হয়। সন্ধিপূজার দিন সাধারণের মধ্যে দেবীর প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ বরঞা

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(পীর শাহ আলমগীর)

বরঞা গ্রামে ফাল্গুন মাসে পীর শাহ আলমগীর-এর উরস্ উপলক্ষে পীরের সমাধি মন্দিরের দক্ষিণপার্শ্বস্থ উন্মুক্ত জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি সাধারণতঃ মাঘ মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে আরম্ভ হয়। পীর শাহ আলমগীরের উরস্ উৎসবটি খুব প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিলেও মেলাটি মাত্র বার-তের বৎসর হইল বসিতেছে। পীরের জনৈক খাদেম স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই মেলার প্রবর্তন করেন। মেলাটিতে সাধারণতঃ বিকালের দিক হইতে অধিক রাত্রিকাল পর্যন্ত লোক সমাগম বেশী হয়। ইহাতে প্রধানতঃ বরঞা থানার অন্তর্গত নয়টি ইউনিয়ন এবং বীরভূম, বর্ধমান জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত গড়ে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। মেলায় যাত্রীগণ প্রধানতঃ বাসে, সাইকেলে ও গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং পনের যোল জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানগুলির কয়েকটি মাত্র খোলা জায়গায় বসে; বাকি সবগুলিই অস্থায়ী ঘর বাঁধিয়া হয়। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ খাগড়া, বহরমপুর, কান্দী, পাচথুপি, বরঞা, কাঁতুরহাট, কুলিনগর, খড়গ্রাম, মাহখাড়ি এবং আশেপাশের গ্রামসমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী এবং কাপড়চোপড় প্রভৃতি দ্রব্য সামগ্রী আমদানী বেশী হয়। তাহাছাড়া, চা-পান-বিড়ি, বাসনকোসন, বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র ব্যতীত, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, জুতা ও শাকসব্জীর দোকানপাট বসে এবং হাঁস, মুরগী, ছাগল প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা গ্রহণ করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, সিনেমা, লটারী, আলকাপ গান, থিয়েটার, কবিগান এবং জলসার ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল গানের দলগুলিকে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আনা হয়। গ্রামেও একটি যাত্রা এবং থিয়েটারের দল আছে।

(নিত্যানন্দ মহাপ্রভু)

নন্দীবাণেশ্বর এবং পাঁচথুপি গ্রামের সংলগ্ন কেশের পাহাড় নামক স্থানে মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে স্থানীয় জমিদারের প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর প্রায় পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ পাঁচথুপি ইউনিয়নের বল্লভপুর, কামদেববাটী, মহাদেববাটী, শবলপুর, নন্দীবাণেশ্বর, নিবাহাদুরপুর, ফতেপুর এবং অন্যান্য দূরবর্তী স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় আট দশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পাঁচথুপি, কান্দী, জঙ্গীপুর, সালার, কাটোয়া ইত্যাদি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। মোট প্রায় দেড়শতটি দোকান-পাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ফেরিওয়ালা আসেন প্রায় পঞ্চাশ জন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কাপড়চোপড়ের দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহাছাড়া, বাসনকোসন, হাকিমী ঔষধের দোকান, বই, দেবদেবীর ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকানপাটও বসে। পাঁচথুপি হইতে প্রতি বৎসর শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, সিনেমা, কথকথা, যাত্রা, থিয়েটার, কবিগান ও হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে একটি সংকীর্তন ও একটি থিয়েটারের দল আছে।

সংকীর্তন দলের অধিকারীর নাম—শ্রীগোপী নাথ দাস, থিয়েটার দলের অধিকারীর নাম- শ্রীকুমুদ রঞ্জন মুখার্জী।

কালীপূজার মেলা

প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে ফতে চাঁদপুর গ্রামে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের মাড়গ্রাম, ঘোষপাড়া, কোগাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় শতাধিক নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় খাবার ও মনিহারী দ্রব্যের মাত্র দশ-পনেরটি দোকান বসে।

শিমুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে কালীপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে বেলা দশ ঘটিকা হইতে বৈকাল চার ঘটিকা পর্যন্ত একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে বিক্রেতা আসেন। ময়রা তেলেভাজা প্রভৃতি দ্রব্যের কয়েকটি দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য গ্রামের একটি দল যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে। অধিকারীর নাম—শ্রীঅবনী কুমার ঘোষ, গ্রাম: শিমুলিয়া, পোঃ গুরুলিয়া।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কুলী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা উপলক্ষে শিবমন্দিরের নিকটে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী প্রত্যহ বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং রামরামপুর, নবগ্রাম প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ হাঁটিয়াই আসেন।

কান্দী হইতে প্রতি বৎসর কয়েকজন বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালা আসেন। মেলার স্থানে খোলা জায়গায় ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন প্রভৃতি দ্রব্যের কয়েকটি দোকান বসে। মেলায় আমোদপ্রমোদের জন্য নানারকম গানবাজনার ব্যবস্থা থাকে।

মাস্রাগ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক উপলক্ষে শিবমন্দির প্রাঙ্গণে তিনদিনব্যাপী প্রত্যহ বিকালের দিকে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় প্রায় বার শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা অধিকাংশই হাঁটিয়া মেলায় আসেন এবং তাঁহাদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় সমান সমান।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ রামনগর, মানসারা, পাঁচপাড়া, ভাসতোর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। মেলার স্থানে খোলা জায়গায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, খেলনা, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, শিল্প ও কারুশিল্পজাত দ্রব্য এবং বই-ছবি পুস্তিকা প্রভৃতির কুড়ি-পঁচিশটি দোকান-পাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান ও বোলান গানের ব্যবস্থা করা হয়।

সাবলদহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে শিব-পূজা ও চড়ক পূজা উপলক্ষে গ্রামের একটি পুকুর পাড়ে ব্যক্তি-বিশেষের জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বেশ প্রাচীন। মেলায় সাধারণতঃ রুহিনা, কাঁকুর, শ্রীনারায়ণপুর প্রভৃতি গ্রামের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়। মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী ও লোহার জিনিসপত্রের মাত্র দশ-পনেরটি দোকান বসে।

ধর্মরাজপূজার মেলা

সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে আষাঢ় মাসে ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত ধর্মরাজ তলায় দেবোত্তর জমির উপরপ্রায় সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণ দাবী করেন।

মেলায় আশেপাশের কুনিয়া, শীতলগ্রাম, ভাটঘরিয়া, ভবানীনগর, রামচন্দ্রপুর, কল্যাণপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় সহস্রাধিক যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

গয়েশপুর, ভবানীনগর, কান্দরা, শিবনগর, আন্দি, খর্জুনা প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানের মধ্যে মিষ্টান্ন

দ্রব্যের দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, মনিহারী, বাসন-কোসন, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় ও অন্যান্য কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের দোকানও বসে। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস, জুয়া, লটারী, কবিগান, কৃষ্ণযাত্রা, ঝুমুরনাচ, আলকাপ গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

সাহাড়ো গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে ধর্মরাজ তলায় প্রায় একবিঘা পরিমাণ সরকারী জমিতে চার-পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তেত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম এবং বীরভূম জেলার সিউড়ী প্রভৃতি স্থান হইতে মেলায় প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর প্রধানতঃ রামনগর, মালগ্রাম, পাঙ্গটি, মাওগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে আসেন। মেলায় প্রায় দশ-পনেরটি বড় দোকান ও কয়েকটি ছোট দোকানপাট বসে। মিষ্টি, পান-বিড়ি, কাপড়চোপড়, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ও কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, জুয়া, লটারি, যাত্রাগান, বোলান গান, কবি ও পাঁচালী গান ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে। মেদিনীপুর, যুগসরা, মন্থরাকান্দি হইতে যাত্রার দল আসে। আস্তোর হইতে কবিগান এবং রামনগর ডাক বাংলা হইতে বোলান গানের দল আসে। গ্রামে একটি বোলান ও একটি পাঁচালী গানের দল আছে। অধিকারী—শ্রীব্রজগোপাল চক্রবর্তী, গ্রাম ও পোষ্ট সাহোড়া।

ব্রহ্মময়ী পূজার মেলা

কালিকাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ-মাসে ব্রহ্মময়ী পূজা উপলক্ষে প্রায় তিন-চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। প্রধানতঃ এড়োয়ালী, পারুলিয়া, কল্যাণপুর, বিপ্রশিখর, কুলি প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং বীরভূম জেলার কয়েকটি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় পনর জন। সমগ্র দোকান-পাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়-চোপড়, কাঠ ও মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহাছাড়া, বই-ছবি এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে শিল্পসামগ্রী ও কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

গ্রামে ব্রহ্মময়ী মাতার মন্দির নির্মাণার্থে মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে সামান্য দান বা তোলা গ্রহণ করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ভ্রাম্যমান সিনেমা পার্টিকে আনা হয়।

মনসাপূজার মেলা

ঝিকরহাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে পূজাপ্রাঙ্গণে দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ বীরভূম জেলার বুড়িগ্রাম, দক্ষিণগ্রাম, বিষ্ণুপুর, সন্ধ্যাজোল ও বড়মাতগ্রাম এবং মুর্শিদাবাদ জেলার কল্যাণপুর, সাবলদহ, বরঞা, কুলি, পারুলিয়া, এড়োয়ালী প্রভৃতি স্থান হইতে সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় দুই-তিন হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় সত্তরটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় বিক্রেতাগণ ছাড়া বীরভূম জেলা হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও পোষাক পরিচ্ছদের দোকানই বেশী। তাহাছাড়া, কাঁচ ও মাটির জিনিসপত্র, বই-ছবি, শিল্পসামগ্রী, কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র প্রভৃতি আমদানি হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য মনসার ভাসান গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস। গ্রাম ও পোঃ ঝিকরহাটী। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ছয়-সাত শত শ্রোতার সমাগম হয়।

শীতলগ্রাম গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে মনসাদেবীর মণ্ডপ সংলগ্ন জমিতে ও রাস্তার দুইপাশে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। প্রধানতঃ কল্যাণপুর, এড়োয়ালী, পাকুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়াই মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন; মেলায় কুড়ি-বাইশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকান-পাটগুলির মধ্যে খাবার, মনিহারী, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল ইত্যাদি আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ভাসান গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে একটি গানের দল আছে। অধিকারীর নাম—শ্রীগৌরী শঙ্কর সরকার।

লক্ষ্মীনারায়ণপূজার মেলা

মালিয়ান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ-সংক্রান্তিতে লক্ষ্মীনারায়ণপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্তী গ্রামের রাস্তার দুইধারে চারদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলায় বিকালের দিকেই সাধারণতঃ লোক সমাগম হয়। মেলাটি দুইশতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং ভরতপুর থানার অন্তর্গত গড্ডাই ইউনিয়ন, বরঞা থানার পাঁচথুপী ও সুন্দরপুর ইউনিয়ন এবং বরঞা গ্রাম হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় নয়শত লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ সাইকেলে ও হাঁটিয়া আসেন।

মেলায় মাত্র দশ-পনেরটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয়জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মালিয়ান্দি, গড্ডাসিংহারি, মহুরাকান্দি, চৈচুড়ী, সুন্দরপুর, বরঞা ও টগ্‌রা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, মাটির ও কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, রামায়ণগান, কবিগান প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে গানের দল আনা হয়। গ্রামে একটি থিয়েটারের দল আছে। বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় তিন হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

জেলা ঃ মুর্শিদাবাদ
থানা ঃ ভরতপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ গুণানন্দবাটি। ২।২৭৬'৩২।১২২।৬৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র, বাগ্দী ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, কৈবর্তপাড়া, পালপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুসলমানপাড়া ও উত্তরপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খাগড়াঘাট। গ্রামের দুই মাইল দূরে কান্দি শহর হইতে মোটরবাস যাতায়াত করে। গ্রামের মধ্যে জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায় ইদুজ্জোহা, ইদলফেতর, সবেবরাত, মহরম ইত্যাদি পরব পালন করেন।

(ঙ) চৈত্র মাসে চড়ক উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবার ও মনিহারী দ্রব্যাদির দোকান বসে।

(চ) ×

শ্রীআনোয়ার হোসেন, কৃষিজীবি,
গুণানন্দবাটি, পোঃ রসোড়া,
মুর্শিদাবাদ।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত "পুণ্ডরীক কুলকীর্ত্তি পঞ্জিকা"য় (কলিকাতা, ১৩০৭) হাড়িরাজা ও পাঁচবাবু সম্পর্কে নিম্নলিখিত মন্তব্যাদি পাওয়া যায়।

"পাঠান প্রভুত্ব সময়ে এই প্রদেশের বহুলোক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। ফতেসিংহ ও মহলন্দী পরগণায় অনেক গ্রাম মুসলমান প্রধান। অনেক গ্রামে হিন্দুর বসতি নাই বলিলেই হয়।……হাড়িরাজার স্মৃতি এই প্রদেশে এখনও বর্তমান আছে। কিংবদন্তী মতে হাড়িরাজার নাম ফতেসিংহ। তাঁহার রাজধানী ফতেপুর গ্রাম ; কান্দি হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে গমুটিয়া যাইবার পথে, ময়ূরাক্ষী নদীর অদূরে। ফতেপুরের পার্শ্ববর্তী মুণ্ডমালা নামক স্থানে হাড়িবংশের ধ্বংস হয় এইরূপ জনপ্রসিদ্ধি। হাড়িরাজার ধ্বংসের পর সবিতা রায় ফতেসিংহ লাভ করেন।" (পৃঃ ৫০-৫১)

"সবিতা দুই পুত্র ও চারি পৌত্রের সহ রাজা মানসিংহের সহিত বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। রাজা মানসিংহের বঙ্গাগমনের কাল খৃঃ ১৫৯০। …১৬০০ খৃঃ অব্দে ফতেসিংহের উত্তরবর্তী শেরপুর আতাইয়ের যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হয়। সম্ভবতঃ এই সময়ে রাজাধরপুর ও ফতেপুরের হাড়িরাজাকে পরাজিত করিয়া সবিতা রায় মানসিংহের প্রসাদে ফতেসিংহের জমিদারী লাভ করেন।" (পৃঃ ৫৭)

"সবিতা রায় প্রতিষ্ঠিত পুণ্ডরীক বংশের সন্তোষ রায়ের ছয় পুত্র ছিল। ইঁহাদের মধ্যে পাঁচজনকে পঞ্জিকাকার (পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকা) পাঁচবাবু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোন পাঁচ জন তাহা লিখেন নাই। পাঁচবাবুর খ্যাতি ফতেসিংহে বিখ্যাত। সবিতা ও তাঁহার পুত্র পৌত্রাদির নাম পর্য্যন্ত লুপ্ত হইয়াছে ; কিন্তু ফতেসিংহের জমিদার পাঁচবাবুর খ্যাতি সকলেই জানে। সবিতা বংশধরেরা সকলেই পাঁচবাবুর গোষ্ঠী বলিয়া পরিচিত।" (পৃঃ ৬১)।

২। গ্রাম ঃ শক্তিপুর। ৮।৩৯৪'৫০।১৪৯।৮১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ্ ও হাড়ি। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলষ্টেশন খাগড়াঘাট রোড্। কান্দি-জজান রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। কান্দি হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, চৈত্র মাসে চড়ক, বৈশাখ মাসে ক্ষেপাবাবাজীর বাৎসরিক উৎসব।

(ঙ) ক্ষেপাবাবাজীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র সারগেল, শিক্ষক,
শক্তিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জজান, মুর্শিদাবাদ।

৩। গ্রাম : সরডাঙ্গা। ১১।১৮৩৩৯।১৭৮।১০৫৪

(ক) বায়েন, ডোম, মুসলমান প্রভৃতি। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলষ্টেশন সালার হইতে জজান ইউনিয়নের মধ্য দিয়া জেলাবোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। উক্ত রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী মোচল্লী সাহেব নামক জনৈক পীরের উরস্ পালন করা হয়। ইহাভিন্ন, মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর ইদুজ্জোহা ও ইদলফেতর উৎসব পালন করেন।

(ঙ) মোচল্লী পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি কালের।

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ আছে ও মোচল্লী পীরের আস্তানা ও তৎসহ তাঁহার সমাধি আছে।

শ্রীসামসুউদ্দিন আহমদ, শিক্ষক,
সরডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জজান, মুর্শিদাবাদ।

৪। গ্রাম : গুন্দিরিয়া। ১৭।৬৫৩৩৫।২৯২।১,২৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, সৎচাষী, বাগ্দী, হাড়ি, কোটাল ও নাপিত। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন সালার। ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে দুইদিন ব্যাপী ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও উৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে ধর্মরাজ-এর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ব্যতীত গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীশশাঙ্ক শেখর ঘোস, হেডপণ্ডিত,
গুন্দিরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জজান, মুর্শিদাবাদ।

৫। গ্রাম : জাখনী। ৩৬।৩৬০৬৬।৪৯।২৬৪

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে। যেমন—পালপাড়া, মণ্ডলপাড়া, দক্ষিণপাড়া ও হাজরাপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সালার হইতে মোটর বাসে ভরতপুরে নামিয়া পদব্রজে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন যখিন (যখানি-যখিণী ?) চণ্ডীপূজা ও মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক পূজা ও হোম উৎসব।

(ঙ) যখিন চণ্ডীর উৎসব উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন হইতে দুই-তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) যখিন চণ্ডীর মন্দির, শিবমন্দির এবং গ্রাম্য দেবতার মন্দির আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত যখিনচণ্ডী দেবীর নামানুসারেই গ্রামের নাম জাখনী হইয়াছে।

শ্রীগুরুপদ মণ্ডল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ।

৬। গ্রাম : গড্ডা। ৪৪।৭৯৯'৭৭।৩১৯।১,৫৮১

সিংহারি। ৪৫।৫২৭৪°।১২১।৬১০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, নাপিত, কামার, শাঁখারী, সদ্‌গোপ, ময়রা, বাগ্দী, কুনাই, গড়াই, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও কুটীরশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন এ. কে. রেলপথের রামজীবনপুর। পাঁচথুপী হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়। বর্ষাকালে ময়রাক্ষী নদীতে নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হয়। ধর্মরাজ ও কালীপূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

(ঙ) সরস্বতীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথি হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরে প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর ও একটি ষষ্ঠী এবং একটি শিবমন্দির আছে।

গড্ডা ও সিংহারি দুইটি পাশাপাশি গ্রাম। চলতি কথায় লোকে ইহাকে গড্ডাসিংহারি গ্রাম বলেন। গ্রাম দুইটি প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, ইহা প্রাচীনকালে "গাঙ্গ" রাষ্ট্রের অন্তর্গত ছিল। সিংহারি গ্রামটি মহাকবি কালিদাসের জন্মভূমি বলিয়াও অনেকে অনুমান করেন। তাঁহাদের মতে গ্রামে যে হরগৌরী মূর্তি আছে তাহা কালিদাস কর্তৃক আরাধিত। গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, লোকে ইহাকে কালিদাসের মন্দির বলেন। ইহাভিন্ন, গ্রামে জেলাবোর্ডের সাহায্য প্রাপ্ত একটি "কালিদাস চতুষ্পাঠী" আছে।

শ্রীকালীকান্ত ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
গড্ডাসিংহারি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গড্ডাসিংহারি, মুর্শিদাবাদ।

৭। গ্রাম : ভাড়াডাঙ্গা সেরপুর।

৫২।৩৭২'০৪।৩৪৪।১,৪৮৭

(ক) তাঁতি, তেলি, ছুতার, বাগ্দী, কৈবর্ত, মুচি, গন্ধবণিক, শুঁড়ি ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁতশিল্প ও মৎস্যজীবি।

(গ) গ্রামটি সালার রেলস্টেশন হইতে নয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং পাঁচথুপী হইতে চার মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। বহরমপুর হইতে পাঁচথুপী পর্যন্ত মোটরবাস সার্ভিস আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাধাবিনোদ জীউর রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন ও চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের একটি গাছের নীচে ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে রক্ষিত একটি পাথরখণ্ডকে ষষ্ঠীদেবী বলিয়া পূজা করা হয়। সন্ন্যাসী স্থান নামে আরও একটি স্থান আছে।

ভাড়াডাঙ্গা ও সেরপুর গ্রাম সম্পর্কে স্থানীয় অঞ্চলে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। গ্রামের প্রাচীন ব্যক্তিদের নিকট শোনা যায় যে, পূর্বে এই অঞ্চল দিয়া বৃহৎ নদী প্রবাহিত হইত। সেই সময় এই স্থানে জলপথে যাতায়াতের জন্য নৌকা ভাড়া পাওয়া যাইত। পরে এই স্থানে লোকবসতি গড়িয়া উঠিলে গ্রামের নাম ভাড়াডাঙ্গা হয়। আরো শোনা যায়, যে, মনসামঙ্গলে উল্লিখিত চাঁদসওদাগর একবার এই পথে যাইবার কালে এই গ্রামের নিকটবর্তী কোলা নদীতে তাঁহার নৌকাডুবি হয়। মোঘল রাজত্বের শেষভাগে অর্থাৎ বর্গীর হাঙ্গামার পূর্বে পর্যন্ত গ্রামটি বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল ; কিন্তু বর্তমানে গ্রামের অবস্থা খুবই শোচনীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরপুর গ্রামে প্রখ্যাত বৈষ্ণব সাধক ভগবানদাস জন্মগ্রহণ করেন। তিনি

বর্ধমান জেলার কেতুগ্রাম থানার অন্তর্গত কাকটা গ্রামে বৈষ্ণব মহাজন বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের নিকট হইতে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। কাকটা গ্রাম চক্রতীর্থ নামে খ্যাত এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের তীর্থস্থানরূপে পরিগণিত। ইহাভিন্ন, শ্রীচৈতন্য ভাগবত রচয়িতা বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শিষ্য শচিনন্দন ঠাকুর এই গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া জানা যায়। কাকটা গ্রামে ভগবানদাসের গুরুগৃহে প্রতিদিন রাধাবিনোদ বিগ্রহের পূজা হইত। কথিত আছে, ঐ জাগ্রত বিগ্রহ ভগবানদাসের প্রেম-ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার গৃহে সেবা-পূজা পাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভগবানদাস গুরুর অনুমতি লইয়া রাধাবিনোদ বিগ্রহ স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বহস্তে উঁহার পূজার্চনা করিতেন। কিংবদন্তী আছে, এই গ্রামের সীমান্তবর্তী কোপাই নদীর তীরবর্তী জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া প্রতিদিন একটি ব্যাঘ্র ভগবানদাসের নিকট হইতে রাধাবিনোদ পূজার প্রসাদ খাইত। গ্রামের যে-অংশ হইতে ব্যাঘ্রটি আসিত, তাহা সেরপুর নামে খ্যাত হয়।

শ্রীমানবেন্দ্র নাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ স্বর্ণহাটী,
মুর্শিদাবাদ

৮। গ্রাম : স্বর্ণহাটী (মৌজাঃ গুমুটি)।
৫৪।৯১২ ৭৪।২৮১১১,৪২০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, নাপিত, কলু, যুগী, বাগ্দী, ডোম, হাড়ী, মুচি ও মুসলমান। প্রথমে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামটি হাওড়া-আজিমগঞ্জ রেলপথের সালার স্টেশন হইতে প্রায় আট মাইল উত্তর-পশ্চিমে এবং মালিহাটী হল্ট্ স্টেশন হইতে প্রায় ছয় মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

(ঘ) বৈশাখ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে ষষ্ঠীপূজা, ইন্দ্রপূজা এবং ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও শিবপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। পাঁচ বৎসর বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীর মন্দির, সিংহবাহিনীর মন্দির, শিবমন্দির এবং জটাধারী বাবার আশ্রম আছে। স্বর্ণহাটী গ্রামটি অতি প্রাচীন। গ্রামের আশেপাশে মাটির নীচে এখনও পুরানো ইট দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রামটি ফতেসিংহ পরগণার অন্তর্গত ২৫৩।৫১৬ তৌজিভুক্ত এবং নবাবী আমলে গ্রামখানি অতি সমৃদ্ধ ছিল।

শ্রীমধুসূদন রায়, প্রধান শিক্ষক,
স্বর্ণহাটী আটকুলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ স্বর্ণহাটী, মুর্শিদাবাদ।

৯। গ্রামঃ ভরতপুর। ৬৮।২,৫২৫ ৩৮।১,০৬৮।৫,০৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, নাপিত, বাগ্দী, তাঁতি, ছুতার, মালী, কামার, বণিক, হাঁড়ি ও মুসলমান। এই গ্রামে মোট তেইশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পূর্ব রেলপথের সালার স্টেশন হইতে মোটর-বাসে বরাবর গ্রামে পৌছান যায়। ইহাভিন্ন, কান্দি শহর হইতে মোটরবাসে এবং বর্ষাকালে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব। এই মাসের প্রথম পক্ষে উত্তরবাহিনী কালীপূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবের গাজন, হোমপূজা ও চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিবমন্দির, কালীমন্দির এবং রাধারাণী, গোপীনাথ, গোপাল, বাসুদেব প্রভৃতি বিগ্রহ আছে।

কিংবদন্তী আছে যে, বহুকাল পূর্বে এই স্থানে ভরত নামে জনৈক রাজা বসবাস করিতেন এবং তাঁহারই নামানুসারে গ্রামের নাম ভরতপুর হইয়াছে।

শ্রীগুরুপদ মণ্ডল, শিক্ষক,
ভরতপুর ডাঙ্গাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ ভরতপুর, মুর্শিদাবাদ।

১০। গ্রামঃ কড়েয়া। ৭৯।৩৪৪·৬১।১১২।৬৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, তিলি, কলু, নাপিত, হাড়ি ও ডোম। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পূর্ব রেলপথে বাজারসাহু রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কড়েয়া চণ্ডীপূজা, আষাঢ় মাসে ভাঁড়ারপূজা (ধর্মরাজপূজা), অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী-পূজা, মাঘ ও ফাল্গুন মাসে রক্ষাকালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ভাঁড়ার পূজা (ধর্মরাজপূজা) উপলক্ষে মেলা। আষাঢ় পূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি শিবের মন্দির, একটি ধর্মরাজের মন্দির ও রক্ষাকালীর একটি বাঁধানো নির্দিষ্ট বেদী আছে। ইহা ব্যতীত, গ্রামে দুইটি বাবাঠাকুরের মূর্তি আছে।

শ্রীবিজন কুমার অধিকারী, প্রধান শিক্ষক,
কড়েয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সিজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১১। গ্রাম : সিজগ্রাম। ৮১।১,০৩৭·০৯।৪৭২।২,৪১২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে। যেমন—মীরপাড়া, খাঁতোড়পাড়া, মুচিপাড়া, বাঙ্গালপাড়া, গোয়ালপাড়া, চৌধুরীপাড়া, শেখপাড়া, বামুনপাড়া, পাঠানপাড়া, খোন্দকারপাড়া, মোল্লাপাড়া, ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাজারসাহু।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফকির হজরত খোন্দকার মহম্মদ নামে জনৈক ফকিরের উরস বা ইসাল সওয়ার অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ১৭ দিনব্যাপী চলে। দুর্গা-পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। ইহা ব্যতীত, গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মহরম, ইদল ফেতর, ইতুজ্জোহা, সবেবরাত, ফতেহা-দোয়াজ-দাহম প্রভৃতি পরব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) হজরত খোন্দকার মহম্মদ ফকিরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র-বৈশাখ মাসে ফকিরের আস্তানার আশেপাশে মেলাটি বসে।

(চ) একটি শিবমন্দির ও একটি সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে দুইটি বাণলিঙ্গ ও হজরত খোন্দকার মহম্মদ ফকিরের একটি আস্তানা আছে।

শ্রীরওশন আলী, প্রধান শিক্ষক,
সিজগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সিজগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১২। গ্রাম : গোপগ্রাম। ৮৭।৪৭৫·৮১।১৫৩।৭৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, কুমার, ছুতার, গন্ধবণিক, তাঁতি, কামার, বৈরাগী, বাগ্দী, হাজরা ও বায়েন।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাজারসাহু। কান্দি হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, চৈত্রে বাসন্তীপূজা এবং শিবের গাজন ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা-ভিন্ন, গ্রামে ধর্মরাজপূজা হয় এবং তদুপলক্ষে পূজা-প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ, সন্ন্যাসীতলা ও গ্রাম-দেবীর শিলা মূর্তি আছে।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে গ্রামের সন্ন্যাসীতলায় সন্ন্যাসী গোঁসাই-এর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সন্ন্যাসীতলায় একটি নিমগাছের নীচে কয়েকটি শিলামূর্তিসহ একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। সন্ন্যাসী গোঁসাই সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলিয়া এই স্থানে অষ্টমপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন ও সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা করেন। উৎসবে বহু বৈষ্ণব ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

গ্রামের মধ্যস্থলে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গ্রামদেবীর একটি শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটি নিম্নাংশ মাটিতে প্রোথিত। প্রতি বৎসর শারদীয়া শুক্ল চতুর্দশী তিথিতে গ্রামদেবীর বার্ষিক পূজা হয়। পূর্বে স্থানীয় জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর জমির আয় হইতে পূজার ব্যয় নির্বাহ করা হইত; বর্তমানে সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া প্রতি বৎসর পূজা হয়। সাধারণের বিশ্বাস মহামারী হইতে গ্রামদেবী গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন।

শ্রীওরম্বা চন্দ্র ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
গোপগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ প্রসাদপুর, মুর্শিদাবাদ।

১৩। গ্রাম: কাটুন্দী। ৮৮।১২৬৬৭।৬৪।৩৩৯

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, মুচি ও ডোম।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে সালার রেল-স্টেশন।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও নবান্ন উৎসব। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) দুর্গা ও সরস্বতী পূজার জন্য গ্রামে মাটির দেবালয় আছে। ইহাভিন্ন, ব্যক্তি-বিশেষের একটি দেবালয়ে গৌরাঙ্গদেবের দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে—নিত্যপূজা হয়।

শ্রীশক্তিপদ মাঝি, প্রধান শিক্ষক,
কাটুন্দী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সালু, মুর্শিদাবাদ।

১৪। গ্রাম: এড়েরা। ৯৩।৮১৯৯৬।২৮৫।১,৩৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, গন্ধবণিক, ছুতার, হাঁড়ি, মুচি, ডোম, বাউরী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথের ঝামটপুর-বহড়ান স্টেশন এবং এ. কে. রেলপথে পাচুন্দী স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে হরিসভা উৎসব, ১লা বৈশাখ যোগাদ্যাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, মনসাপূজা এবং চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গলবার কালীপূজা হয়। প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায় মহরম, ইদুজ্জোহা প্রভৃতি পরব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) যোগাদ্যাপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে।

কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসের শেষ মঙ্গল-বার হইতে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

মহরমের মেলা।

(চ) গ্রামে যোগাদ্যা ও কালীর নির্দিষ্ট স্থান, দুইটি মসজিদ ও একটি পীরের স্থান আছে। পীরের স্থানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন।

শ্রীঅমরেন্দ্র কুমার পাল, প্রধান শিক্ষক,
এড়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ শিমুলিয়া, মুর্শিদাবাদ।

১৫। গ্রাম ঃ জাউলিয়া। ৯৫।৪৬০.৫৩।১১৫।৬৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তাঁতি, নাপিত, কোটাল, হাঁড়ি ও মুচি। গ্রামে মোট পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গঙ্গাটিকুরী ও পাচুন্দী। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে জঙ্গলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে জঙ্গলেশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে এবং একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীভবানী সদয় পাল, শিক্ষক,
জাউলিয়া সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়,
পোঃ বনয়ারীবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৬। গ্রাম ঃ সোনারুন্দী।
৯৬।২৫১.৮৮।৩৭৭।১,৭৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, তাঁতি, স্বর্ণবণিক, গন্ধবণিক, ধোপা, জেলে, ছুতার, ডোম, হাড়ি, বায়েন, বাগ্দী ও বৈরাগী।

গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, তাঁতশিল্প ও জাতিব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে গঙ্গাটিকুরী এবং এ. কে. রেলপথে পাচুন্দী—এই উভয় রেলস্টেশন হইতেই গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠে ষষ্ঠীপূজা, আষাঢ়ে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, পৌষে পৌষ-সংক্রান্তি উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

ইহাভিন্ন, গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে কুশলা পুষ্করিণীর তীরে বাউল দাসের আশ্রমে সাধক বাউল দাসের স্মৃতি উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও বাউল আসেন এবং সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। সমাগত বাউল বৈরাগীদের মধ্যে গাঁজা বিনিময় এই উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আশ্রমের বর্তমান সেবায়েত স্বামী নকুলানন্দ গিরি।

(ঙ) বাউল দাসের স্মরণোৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘী পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাউল দাসের আশ্রম, শিবমন্দির, ধর্মরাজের মন্দির, বনয়ারিজীউর (রাধাকৃষ্ণ) মন্দির, স্বর্ণচণ্ডী এবং খাঁদেশ্বরীদেবী ও তাঁহার ভৈরব যজ্ঞেশ্বর শিবের মূর্তি আছে। খাঁদেশ্বরী মূর্তিটি বহু কালের প্রাচীন এবং ইঁহাকে অনেকে বৌদ্ধগণ পূজিত কোন দেবী মূর্তি বলিয়া অনুমান করেন।

গ্রাম্যদেবী স্বর্ণচণ্ডী এবং বনয়ারিজীউ (রাধাকৃষ্ণ) মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে গ্রাম-বাসীদের নিকট হইতে দুইটি কিংবদন্তী শোনা যায়।

গ্রাম পত্তনের আদিতে এই স্থানের আশে-পাশে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই জঙ্গলের ধারে গ্রামের রাখাল বালকেরা গরু চরাইত। একদা তাহারা লক্ষ্য করিল একটি গাভী প্রতিদিন জঙ্গলের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আসিয়া দাঁড়াইলে তাহার স্তনাধার হইতে আপনি দুগ্ধ নিঃসৃত হয়। এই কথা ক্রমেই চারিদিকে প্রচারিত হইলে জনৈক গ্রামবাসীর প্রতি চণ্ডীদেবীর স্বপ্নাদেশ হয় যে,—আমি চণ্ডীদেবী, ভূগর্ভে অবস্থান করিতেছি, এই স্থানে আমার মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজার আয়োজন কর। স্বপ্নাদেশ পাইয়া গ্রামবাসীগণ নির্দিষ্ট স্থানটি খনন করিয়া একটি শিলা মূর্তি দেখিতে পান এবং ঐ শিলামূর্তির উপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া চণ্ডীদেবীর পূজার ব্যবস্থা করেন। শিলামূর্তিটি নিম্নাংশ ভূ-প্রোথিত।

বনয়ারি জীউর (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, বনয়ারিবাদ রাজবংশের জনৈক ব্যক্তি একদা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া নদীর চর হইতে

কষ্টি পাথরের কৃষ্ণ মূর্তিটি পান এবং উহার সহিত অষ্ট ধাতুর রাধিকা মূর্তি নির্মাণ করিয়া স্বগৃহে নিত্য-পূজার ব্যবস্থা করেন। বর্তমান তাঁহাদের কোন বংশধর না থাকায় গ্রামবাসীরা উক্ত বিগ্রহের নিত্যপূজাদি করিতেছেন।

শ্রীভৈরব নাথ ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
বনয়ারিবাদ মহারাজ উচ্চ বিদ্যালয়,
পোঃ বনয়ারিবাদ, মুর্শিদাবাদ।

১৭। গ্রাম : কুলুড়ি। ১০০।৪০০'৪১।১৪৭।৬৮২
হরিণ্যা। ১০১।১২৫'৫৯।৪৫।২০৪

(ক) হাজরা, বাগ্দী, সদ্গোপ ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী সালার রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও মনসাপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) হরিণ্যা এবং কুলুড়ি দুইটি পাশাপাশি গ্রাম। ইং ১৯১১-১২ সালের স্টেল্‌মেণ্ট রেকর্ডে এই গ্রাম দুইটির নাম ছিল যথাক্রমে হরিণা ও কোশোরিয়া। গ্রাম দুইটি প্রাচীন। গ্রামের বিদ্যালয়ের সম্মুখে একটি উঁচু ঢিবিতে ছোট একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি একটি নিম ও একটি বটগাছ দ্বারা আচ্ছাদিত। ঢিবিটির সম্মুখে দুইটি পাথর খণ্ড আছে। ইহাছাড়া, গ্রামের নানা জায়গায় মাটি চাপা পড়া পুরাতন ইট বা পাথরে বাঁধান স্থান দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীষড়ানন গাঙ্গুলী, শিক্ষক,
হরিণ্যা-কুলুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ সালার, মুর্শিদাবাদ।

১৮। গ্রাম : কাগ্রাম। ১০৪।২,৭২০ ৯১।:,২৭০।৭,২৬৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কৈবর্ত, সদ্গোপ, ছুতার, কামার, স্বর্ণবণিক, তাঁতি, গন্ধবণিক, শাঁখারী, বাগ্দী, হাঁড়ি, বায়েন, মুচি, কামার ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের তিন মাইল পশ্চিমে সালার রেলস্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, কার্তিকে কালীপূজা, বিশ্বকর্মাপূজা ও রাসযাত্রা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘে সরস্বতী-পূজা ও পূর্ণিমা তিথিতে ধর্মরাজপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি, চৈত্রে অন্নপূর্ণাপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে দুই-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কয়েকটি শিবমন্দির আছে। ইহাদের মধ্যে দুইটি মন্দির প্রাচীনতা ও উহার দেওয়াল গাত্রে কারুকার্যের দিক দিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গ্রামে গোপীনাথ, লক্ষ্মীনারায়ণ, শ্যামসুন্দর, ষষ্ঠী, মনসা, শীতলা, কঙ্কচণ্ডী, তেলাইচণ্ডী, কালই চণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা হয়। সুবৃষ্টির কামনায় বর্ষাকালে প্রতি শনি-মঙ্গলবার তেলাইচণ্ডী ও কলাই-চণ্ডীর পূজা করা হয়।

কাগ্রাম অতি প্রাচীন একটি গ্রাম। কথিত আছে যে গ্রামাদেবী কঙ্কচণ্ডীর নামানুসারে প্রাচীন কালে গ্রামটি কঙ্কগ্রাম নামে পরিচিত ছিল। কালক্রমে লোকমুখে কঙ্কগ্রাম "কাগাঁ" বা "কাগ্রাম" রূপান্তরিত হইয়াছে। গ্রামস্থ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের গৃহে রক্ষিত পুরাতন তালপাতার সংস্কৃতে লিখিত পুঁথিতেও কঙ্কগ্রাম নামটির উল্লেখ আছে বলিয়া জানা যায়। বস্তুতঃ পশ্চিমে ভাগীরথী এবং দক্ষিণে অজয় এই দুইটি নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ প্রাচীন বাংলার কঙ্কগ্রাম নামে অভিহিত হইত বলিয়া মনে হয়। সেনরাজা লক্ষ্মণ সেনের শক্তিপুর তাম্রশাসনে এই ভুক্তির

উল্লেখ আছে—"কঙ্কগ্রাম ভক্ত্যান্তঃ পাতি দক্ষিণ বাঙ্গ্যাং উত্তররাঢ়ায়াং।" প্রাচীন এই কঙ্কগ্রামের সঠিক স্থান নির্দেশ এখনো পর্যন্ত করা সম্ভব হয় নাই। কেহ কেহ মনে করেন রাজমহলের নিকটবর্তী বর্তমান কঙ্কজোল বা কাঁকজোলই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম। আবার অন্যান্যদের মতে কাগ্রামই প্রাচীন কঙ্কগ্রাম। শেষোক্ত মত সত্য হইলে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষাশেষি পর্যন্ত কাগ্রামের ইতিহাস টানা যায়। সপ্তম শতকের চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ বর্ণিত কজঙ্গল সম্বন্ধেও ঐতিহাসিকদের মধ্যে অনুরূপ মত বৈষম্য আছে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত, প্রধান শিক্ষক,
কাগ্রাম প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীসত্যনারায়ণ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
কাগ্রাম বালিকা বিদ্যালয়,
ও
শ্রীসত্যেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক,
কাগ্রাম, হায়ার সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়,
পোঃ কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ।

১৯। গ্রাম : তালিবপুর।

১০৭।৩,৬৭৬৫৮।১,১৪৫।৫,৬৪৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সালার হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বাবলা নদী নামে ময়ূরাক্ষীর একটি শাখা এই গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিয়াছে। বর্ষাকালে বাবলা নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে অষ্টমপ্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিভিন্ন পাড়ায় কয়েকটি দুর্গাপূজা, চৈত্র-সংক্রান্তিতে শিবপূজা ও চড়ক এবং ফাল্গুন মাসে পীর গদাই বাদশাহ রহমতুল্লা আলাহের উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত, গ্রামের বাউড়ী পাড়ায় মহাধুমধামের সহিত মনসা ও চণ্ডীপূজা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব হয়।

(ঙ) পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মাঝপাড়ায় একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং বাউড়ীপাড়ায় চণ্ডী ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহা ব্যতীত, রহমতুল্লা আলাহ পীরের মাজাহর এবং গ্রামের দক্ষিণ দিকে সালার জং (বুড়াপীর) নামে অপর একজন পীরের আস্তানা আছে।

তালিবপুর গ্রামটি প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, এই গ্রামে সুন্দর রাজা নামে জনৈক রাজার বাসস্থান ছিল। এই গ্রামের একটি দীঘিকে লোকে আজও রাজার মায়ের দীঘি বলেন।

শ্রীগোলাম মহবুব, সভাপতি,
তালিবপুর ইউনিয়ন বোর্ড,
পোঃ তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ।

২০। গ্রাম : মালিহাটী। ১১৩।৬৫০৩৮।২৫০।১,১৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, তাঁতি, কুমার, নাপিত, হাড়ি, বাগদী, ডোম, মালাকার ও মুচি।

গ্রামে তেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরি ও জাতিব্যবসায়।

(গ) ব্যাণ্ডেল—আজিমগঞ্জ লুপ্ রেলপথে এই গ্রামে একটি হল্ট স্টেশন আছে। গ্রামের মধ্য দিয়া কান্দী—সালার জাতীয় সড়কে মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসা-পূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিক-

পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে সাড়ম্বরে বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব পালন করা হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামে নন্দোৎসব, চৈত্র মাসে ধর্মরাজপূজা ও শিবের গাজন এবং গোপাল গিরিধারী জীউর নিত্য-পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাধামোহন গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে রামনবমী তিথি হইতে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

ইহা ব্যতীত, রথ, দোল, ধর্মরাজপূজা ও শিবের গাজন উপলক্ষে প্রতিটি পূজা প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর কয়েকটি দোকানপাট বসিয়া থাকে এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে লোকজনের সমাগম হয়।

(চ) গ্রামে তিনটি মন্দির, একটি পূজামণ্ডপ এবং কালীর ও ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

মালিহাটী একটি পাচীন গ্রাম। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের মধ্যকাল হইতে এই গ্রামের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। বৈদ্যবংশোদ্ভূত ভরদ্বাজ গোত্রীয় রায় পরমানন্দ চৌধুরী (চতুর্ধারী) সম্ভবতঃ ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধেই এই গ্রামটির পত্তন করেন। ইনি পাঠান সুলতান দাউদ খাঁ-র অধীনে বিশিষ্ট রাজকর্মচারী ছিলেন। পরমানন্দ চৌধুরীর সহিত ফতেসিংহ-এর হৃদ্যতা ও যোগাযোগ ছিল বলিয়া শোনা যায়, তবে এই ফতেসিংহ-এর সঠিক কোন পরিচয় জানা যায় না। ফতেসিংহ-এর নামানুসারে ফতেপুর নামে একটি পরগণার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন বীরভূমের অন্তর্গত রাজনগরের অধিপতি বীর সিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এই ফতেসিংহ। তিনি যে অঞ্চলের শাসন-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন উত্তরকালে তাহা ফতেসিংহ পরগণা নামে পরিচিত হইয়াছিল। আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় তাঁহার "পুণ্ডরীক-কুলকীর্তি পঞ্জিকা" নামক গ্রন্থে ফতেসিংহ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। অনেকে আবার মনে করেন যে, ফতেসিংহ আসলে একজন "হড্ডিল ভূপতি" বা "হাড়ী রাজা" ছিলেন। তাঁহার নামানুসারে তাঁহার বাসভূমি ফতেপুর নামে খ্যাত হইয়াছিল। ফতে-সিংহের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায় রায় পরমানন্দ তাঁহার নিকট হইতে বহু ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করেন এবং এই ভূসম্পত্তি লাভ করিয়াই তিনি মালিহাটী গ্রামটির পত্তন করেন।

মালিহাটী নামটিও ফতেসিংহের নামের সহিত জড়িত বলিয়া অনেকে মনে করেন। "হড্ডিল" বা হাড়ী জাতি স্থান বিশেষে—ভূঁইমালী মালী বলিয়া পরিচিত।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রণীত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে উল্লেখিত ভূঁইমালী বংশের বিখ্যাত ভক্ত ঝড়ুঠাকুরকে বহু বৈষ্ণব পণ্ডিত ও ভাষ্যকার হাড়ী বংশোদ্ভূত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। যাঁহার নিকট হইতে রায় পরমানন্দ বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তির অধিকার লাভ করিয়াছিলেন সেই "হড্ডিল ভূপতি" বা হাড়ী রাজার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের স্বাভাবিক ইচ্ছা হইতেই হয়তো তিনি "মালী" শব্দের সহিত হট্টি বা হাটী অর্থাৎ হাট শব্দ যোগ করিয়া এই গ্রামের নামকরণ করিয়া ছিলেন।

রায় পরমানন্দের বংশধরগণ এই গ্রামের প্রাচীন অধিবাসী। এখনও তাঁহারাই এই গ্রামে বিশেষ সম্মান ও প্রতিষ্ঠার অধিকারী। শ্রীসরোজ কুমার রায় চৌধুরী এই বংশেরই একজন খ্যাতনামা সাহিত্যিক।

১৫৭২ খৃষ্টাব্দে দাউদ খাঁর সহিত মুঘলদের একটি সংঘর্ষ হয়, রায় পরমানন্দ সম্ভবতঃ তখন দাউদ খাঁর একজন সচিবের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খাঁ তোডর মল্লের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। রায় পরমানন্দ মুঘল দরবারে আহূত হন। কথিত আছে যে,

অপমান আশঙ্কায় তিনি অঙ্গুরীস্থিত হীরকাঙ্গুরীয় লেহন করিয়া আত্মহত্যা করেন।

শ্রীজগন্নাথ দাস, প্রধান শিক্ষক,
মালিহাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মালিহাটী, মুর্শিদাবাদ।

২১। গ্রাম : উজুনিয়া শিশুয়া।
১১৬।৬০২'৫৬।২৬৭।১,২৯৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কুমার, কামার, তাঁতি বৈরাগী, নাপিত, হাজরা ও বাগ্দী।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে সালার রেলস্টেশন। সালার-ভরতপুর রোডে মোটরবাস চলে। মাঠের উপর দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে নীলপূজা।

(ঙ) শিবরাত্রি মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

নীলপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

(চ) গ্রাম শিশুয়েশ্বর শিবের মন্দির আছে।

জনশ্রুতি আছে যে, বহুকাল পূর্বে পার্শ্ববর্তী ঘনশ্যামপুর গ্রামের নফর চন্দ্র পাল নামে এক ব্যক্তি শৈশবকালে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এক জঙ্গলের মধ্য হইতে এই শিবলিঙ্গটি উদ্ধার করেন। শৈশব অবস্থায় তিনি উহা উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া উহার নাম হয় শিশু ঈশ্বর এবং শিশু ঈশ্বর হইতেই গ্রামের নাম হয় শিশুয়া।

শ্রীবিজয় কান্ত পাল, প্রধান শিক্ষক,
উজুনিয়া দত্তপুকুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : কাচুন্দী, পোঃ সালু,
মুর্শিদাবাদ।

২২। গ্রাম : সালিন্দা।১২২।১,৬০১'৫৫।২৯০।১৫৮৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, তাঁতি, গোয়ালা, কুমার কোটাল, ক্ষত্রিয়, কামার, ছুতার, কলু, মুচি, হাঁড়ি, বাগ্দী ও মুসলমান। গ্রামে মোট আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) সালার অথবা মালিহাটী হল্টস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। নিকটবর্তী জেলাবোর্ডের সালার-ভরতপুর রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ়সংক্রান্তিতে ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কার্তিকাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা। ইহা ছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, সবেবরাত, ফাতেহা-দোয়াজ-দাহম, ফতেয়া-ইয়াজ-দাহাম, ঈদল-ফেত্তর প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির ও একটি ধর্মরাজের মন্দির আছে।

শ্রীতারা প্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম: সালিন্দা, পোঃ মালিহাটী,
মুর্শিদাবাদ।

২৩। গ্রাম : কাঞ্চন গড়িয়া।১২৭।২০৩'২১।৪৯।২৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, বাগ্দী ও কোনাই গ্রামে মোট চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে বাজারসাহু রেলষ্টেশন অবস্থিত। জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) মাঘ মাসে রাধামোহনজীউর বাৎসরিক উৎসব।

(ঙ) রাধামোহনজীউর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘী পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধামোহনজীউর মন্দির আছে।

প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যে কাঞ্চনগড়িয়া গ্রামের উল্লেখ আছে। শ্রীচৈতন্যদেবের পরমভক্ত হরিদাস আচার্য এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি দেহরক্ষা করিলে সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাস আচার্য্য এই গ্রামে আসিয়া একটি উৎসবের আয়োজন করেন।

শ্রীসত্যনারায়ণ পাল, প্রধান শিক্ষক,
আমলাই ভালুইপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ আমলাই, মুর্শিদাবাদ।

২৪। গ্রাম: বৈদ্যপুর (মৌজা: বড় বৈদ্যপুর)।
১৩৬।৮৯৫৯৭।৩:৯।১,৪৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, বণিক, সদ্‌গোপ, রাজবংশী, কুমার, তাঁতি, স্বর্ণবণিক, ছুতার, বায়েন, হাঁড়ি, বাগ্দী ও মুচি।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাজারসাহু হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের পূর্বদিক দিয়া প্রবাহিত বাবলা নদী প্রায় তিন মাইল দূরে কল্যাণপুরের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিশিয়াছে। সুতরাং নৌকায়ও গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা। ইহাভিন্ন, মদনমোহনজীউর পূজা ও শিবদুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। বৈশাখী পূর্ণিমায় একদিন।

(চ) গ্রামে একটি গাছের নীচে পঞ্চাননতলা নামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ছোট-বড় নানা আকারের কয়েকটি বিচিত্র পাথরে মূর্তি ও শীলাখণ্ড আছে। উহার মধ্যে পিছনে চালচিত্র সহ একটি নারীমূর্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল মূর্তি ও শীলাখণ্ডগুলিকে অরণ্য ষষ্ঠীরূপে পূজা করা হয়। ইহাভিন্ন, বুড়াশিবরূপে পূজিত একটি প্রস্তরখণ্ড এবং রাণী ভবাণী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্মশান কালী আছে।

বৈদ্য বংশীয় জিরেরাম সেনগুপ্ত নামে জনৈক চিকিৎসক প্রথমে এই গ্রামটি পত্তন করেন বলিয়া গ্রামটির নাম হয় বৈদ্যপুর। উক্ত বৈদ্য পরিবার এখনও গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

শ্রীসুখেন্দু কুমার সেনগুপ্ত, সহকারী প্রধান শিক্ষক,
বৈদ্যপুর জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়,
ও
শ্রীরামগুরু দণ্ডী, হেড্ পেণ্ডিত,
বৈদ্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ চৈয়া, মুর্শিদাবাদ।

জেলা : মুর্শিদাবাদ

থানা : ভরতপুর

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব

(গদাধর গোস্বামী)

গদাধর পণ্ডিত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত মাধব মিশ্রের পুত্র। তাঁহার মাতা রত্নাবতী। ১৪০৯ শকাব্দে (খৃঃ ১৪৮৭) বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে নবদ্বীপের চাপাহাটি গ্রামে গদাধর জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে তিনি অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন ও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ভক্তিশাস্ত্রে ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য থাকায় উত্তরকালে বৈষ্ণব সমাজ ইঁহাকে পণ্ডিত গোস্বামী আখ্যা দেন। পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাল্য সহচর এবং একজন পরম ভক্ত ছিলেন। শচীমাতাও গদাধরকে প্রাণতুল্য ভালবাসিতেন। একদিন মহাপ্রভু গদাধরকে আলিঙ্গন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"প্রভু বলে গদাধর তুমি সুকৃতি
শিশু হ'তে কৃষ্ণেতে করিলে দৃঢ়মতি।"

(শ্রীচৈতন্যভাগবত, ১ম অঃ)

পণ্ডিত গোস্বামী বৈষ্ণব প্রবর মহাত্মা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়, মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণকালেও পণ্ডিত গোস্বামী তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। অনেকের মতে আচার্য প্রভু ১৪৫৫ শকাব্দের মাঘী শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে প্রথমবার শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় কিছুদিন অবস্থানের পর গ্রন্থ লইতে শ্রীখণ্ডে আসেন। পুনরায় যখন তিনি শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন তখন পথিমধ্যে পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব বার্তা শ্রবণ করেন।

ভরতপুরের গোস্বামীগণ জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে তাঁহাদের পূর্বপুরুষ মহাত্মা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব মহোৎসব পালন করিয়া থাকেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, ১৪৫৬ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসেই তিনি দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কাশীনাথ মিশ্রের পুত্র নয়নানন্দ মিশ্রও একজন বৈষ্ণব পদকর্তা ছিলেন। ইনি স্বরচিত একটি পদে নিজের পরিচয় দিয়াছেন :

মাধবের বংশধর মোর প্রভু গদাধর
শ্রীগৌরাঙ্গ যা'র কেনা ধন।
সেই বংশে জনামিয়া আছ মুঁই পাশরিয়া
ধিক বহু এ মিশ্র নয়ন॥

এই নয়নানন্দের বংশধরগণই এক্ষণে পণ্ডিত গোস্বামীর শ্রীপাট ভরতপুরে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হইতে শুনা যায় যে, গদাধরের পিতা মাধব মিশ্রের সুররাজ নামে এক ক্ষত্রিয় শিষ্য ছিলেন। এই শিষ্য এক সময়ে গুরু মিশ্রঠাকুরকে এই গ্রামে বাস করিবার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে তিনি গঙ্গাতীর পরিত্যাগে অসম্মত হওয়ায় সুররাজ গদাধর ও কাশীনাথকে এই গ্রামে লইয়া আসেন। তাঁহারা সুররাজের সাহায্যে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীনাথ বিগ্রহ সেবার দায়িত্ব লইয়া এখানে বাস করিতে থাকেন এবং গদাধর পণ্ডিত মাঝে মাঝে এখানে আসিতেন। কাটোয়ার কেশব ভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণান্তে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বক্রেশ্বর তীর্থ গমন পূর্বক বঙ্গদেশের রাঢ় অঞ্চল পবিত্র করেন, সেই সময় প্রিয় সহচর গদাধর পণ্ডিতও তাঁহার সঙ্গে ছিলেন ;

"নিত্যানন্দ গদাধর মুকুন্দ সংহতি,
গোবিন্দ পশ্চাতে আর কেশব ভারতী॥"

কাঞ্চন গড়িয়া ও ভরতপুর হইয়া তাঁহারা আলুগ্রাম বিশ্রামতলায় বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এই সময়ে একদিন মহাপ্রভু একখানি গীতা দেখিতে দেখিতে তাঁহার উপর নিম্নলিখিত শ্লোকটি স্বহস্তে লিখিয়া দেন। এখনও ভরতপুরে গোস্বামীদিগের গৃহে সেই হস্তাক্ষর সযত্নে রক্ষিত আছে। শ্লোকটি :

ষট্‌শতানি সংবিশালি শ্লোকানামাহ কেশবঃ
অর্জ্জুন সপ্তপঞ্চাশৎ সপ্তসষ্টীঞ্চ সঞ্জয়ঃ।
ধৃতরাষ্ট্র শ্লোকমেকং গীতায়া ফলমুচ্যতে॥

এই শ্লোকটি গীতার শ্লোকসমষ্টির পরিমাণসূচক। ভরতপুরের গোস্বামীগণ বলেন, মহাপ্রভু পণ্ডিত গোস্বামীকে

যে বাসুদেব মূর্তি প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এখন তাঁহাদের গৃহে আছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

উৎসবটি ভরতপুর নিবাসী গোস্বামীগণের পারিবারিক উৎসব হইলেও তাঁহাদের বহু শিষ্যবর্গ ও দেশবিদেশের বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। গ্রামে গোস্বামীদের একটি মন্দিরে রাধারাণী, গোপীনাথ, গোপাল ও বাসুদেব বিগ্রহসহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি সুন্দর কারুকার্যখচিত। মন্দিরের সম্মুখে অনেকখানি জায়গাও আছে। উৎসবটি নির্দিষ্ট দিনের দুই-তিনদিন পূর্ব হইতেই সুরু হয় এবং চার-পাঁচদিন ধরিয়া চলে; ইহার প্রস্তুতি এক-দেড়মাস পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। প্রতিদিন দিবা ভাগে সাড়ে পাঁচ সের হইতে ছয় সের আতপান্নের সহিত ডাল, তরকারী, ভাজাভুজি সহ পায়সান্ন ভোগ এবং রাত্রিতে লুচির ভোগ দেওয়া হয়। উৎসবের সময় সর্বজনীন ভোজ, অন্নসত্র ও প্রসাদ বিতরণের জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আয়োজন করা হয়। উৎসবটি হিন্দুদিগের হইলেও ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকজন ইহাতে যোগদান করিয়া থাকেন। এই উৎসবে মহাপ্রভুর স্বহস্তে লিখিত পূর্ব উল্লখিত শ্লোকটি দেখিতে বহু ভক্ত ও সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

(রাধামোহন গোস্বামী)

মালিহাটী গ্রামের প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের রামনবমী তিথিতে বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণব জগতে প্রসিদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্য-এর বংশে ইহার জন্ম— ইনি শ্রীনিবাস আচার্য হইতে অধস্তন পঞ্চম পুরুষ। নরহরি চক্রবর্তী ঠাকুর প্রণীত "শ্রীনরোত্তম বিলাস" ও শ্রীযদুনন্দন দাস ঠাকুরের "শ্রীকর্ণানন্দ" গ্রন্থদ্বয়ে মালিহাটীর এই বিখ্যাত আচার্যবংশের উল্লেখ রহিয়াছে। রাধা মোহন গোস্বামীর অষ্টাদশ শতকে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক দৃঢ়তায় তিনি সমসাময়িক কালে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত রূপে খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার রচিত "পদামৃতসিন্ধু" বৈষ্ণব সাহিত্যে একটি উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। কথিত আছে যে, শাস্ত্রযুক্তি ও তর্কযুদ্ধে ইনি জয়পুররাজ জয়সিংহের সভাপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণদেব ভট্টকে পরাজিত করিয়া "পরকীয়া মতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব জাফর খাঁর উদ্যোগে ও প্রচেষ্টাতেই নাকি এই তর্কযুদ্ধের আয়োজন করা হইয়াছিল। ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত "নবাবী আমল" গ্রন্থ এবং পানিহাটির বিখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত শ্রীগিরীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "রাধামোহন চরিত" গ্রন্থে এই তর্ক যুদ্ধের উল্লেখ রহিয়াছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমার রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন এবং তিনি মালিহাটিতে গুরুর স্মৃতি রক্ষার্থ "রাধাসাগর" নামে একটি দীঘি খনন করাইয়াছিলেন। রাধামোহন ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষ করিয়া রামনবমী তিথিতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবে আশেপাশের বহু গ্রাম হইতে লোকজন যোগদান করেন।

উৎসবে চিড়া ও অন্ন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাগত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই অঞ্চলে বৈষ্ণবদের ইহা একটি স্মরণীয় উৎসব। রাধামোহন ঠাকুরের ভ্রাতা শ্রীমদনমোহন ও শ্রীভুবনমোহন-এর বংশ-ধরেরা এখনও এই গ্রামে বাস করেন এবং এই উৎসবের যাবতীয় কাজকর্ম তাঁহারাই পরিচালনা করেন। রাধামোহন ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত গোপালগিরিধারী মন্দিরেই এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা রাধামোহন ঠাকুরের শ্রীপাটবাড়ী বলিয়াও পরিচিত। তাঁহারই বংশধরগণ ইহার সেবায়েত। দেবোত্তর ভূসম্পত্তির আয় হইতে পূজার খরচ নির্বাহ করা হয়। বর্তমান পূজারী কেচুনিয়া নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীরামরঞ্জন ঘটক। উৎসবে বহু বৈষ্ণব ভক্তের আগমন হয়।

(মোছল্লী পীর)

সরডাঙ্গা গ্রামে চৈত্র মাসে মোছল্লী সাহেব নামে জনৈক পীরের উরস্ উৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। গ্রামে পীরের একটি আস্তানা ও তাঁহার কবর আছে। উৎসবে বহু নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন। মানত-কারীরা এই দিনে পীরের নিকট মোরগ জবাই করিয়া

মানসিক পূরণ করেন। উৎসব উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে পায়সান্ন বিতরণ করা হয় এবং এই উৎসবকে কেন্দ্র করিয়া পীরের আস্তানার আশেপাশে দুই-তিন দিনের জন্য কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(হজরত পীর)

তালিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১০ই ফাল্গুন হজরত পীর গদাই বাদশাহ্ রহমাতুল্লা আলাইহে-র সমাধির সম্মুখে পীরের বাৎসরিক উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শোনাযায়, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামে উক্ত পীরের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে অনেককে নিরাময় করিয়াছিলেন। স্থানীয় হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরাই হজরত গদাই পীরের নামে মানত করিয়া থাকেন। ভক্তরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার পীরের আস্তানায় মিষ্টান্ন, হালুয়া রুটি ইত্যাদি উৎসর্গ করিয়া দরিদ্রগণের মধ্যে বিতরণ করিয়া থাকেন। ফাল্গুন মাসের উরস্ উৎসবটিকে কেন্দ্র করিয়া প্রায় সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামে সালার জং (বুড়াপীর) নামে আরেকজন পীরের আস্তানা আছে ; এখানেও গ্রামবাসী মানত করেন।

কালীপূজা

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পক্ষে ভরতপুর গ্রামে মহা আড়ম্বরে উত্তরবাহিনী কালীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে দুই প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি কালীমন্দির আছে। মন্দিরের মেঝে পাকা, দেওয়াল মাটির এবং উপরে টিনের ছাউনী। এই মন্দিরের দক্ষিণ দিকের ঘরে প্রস্তরময়ী কালীমূর্তি এবং বামদিকের ঘরে দেবীর ভৈরব শিব প্রতিষ্ঠিত। প্রায় আড়াইশত বৎসর ধরিয়া উত্তরবাহিনী কালীর পূজা ও উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

ভরতপুর গ্রামের দক্ষিণ দিকে সালার রেলস্টেশন যাইবার পথে বামপার্শ্বে একটি ছোট পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে যে, স্বপ্নাদেশ পাইয়া বাঘডাঙ্গার রাজা লোকজনের সাহায্যে ঐ পুষ্করিণী হইতে মূর্তিটি তুলিয়া গ্রামের মধ্যে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া উত্তর বাহিনী কালী প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেবীর সেবায়েত নিযুক্ত ও নিত্য সেবার জন্য কয়েক বিঘা জমি দান করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম পক্ষে দেবীর বাৎসরিক অভিষেক উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে একটি মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। ইহার পূর্বে সারা বৈশাখ মাস ধরিয়া প্রতিদিন নামসংকীর্তন করা হয়। এই গ্রামের উত্তরবাহিনী কালী বিশেষ জাগ্রত দেবীরূপে খ্যাত। এই অঞ্চলের সকল সম্প্রদায় কালীর নিকট মানসিক করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ভোগ, ছাগ বলি ও বাদ্য মানত দেওয়া হয়। যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার অথবা অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে এই মানসিক পূজা হইয়া থাকে।

এড়েরা গ্রামে কালীদেবীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। চৈত্র মাসের শেষে দুই দিন মহাধুমধামের সহিত এই স্থানে কালীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবের দিন আশেপাশের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে অবস্থিত গ্রামসমূহ হইতে বহু লোকজন কালীর স্থানে মানত-পূজাদি দিতে আসেন। কালীপূজার দিন গ্রামে একটি মেলা বসে এবং বোলান গানের ব্যবস্থা করা হয়।

কড়েয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ অথবা ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে রক্ষাকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে রক্ষাকালীপূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে কলেরা মহামারীর প্রকোপে এই গ্রামের বহু লোকের মৃত্যু হয়। তখন জনৈক সাধুর উপদেশে রক্ষাকালীপূজার আয়োজন করা হয়। সেই সময় হইতে গ্রামে "যিত্তারপুকুর" নামে একটি পুকুরের পাড়ে নির্দিষ্ট একটি বাঁধানো বেদী উপর প্রতি বৎসর সর্বজনীন রক্ষাকালীপূজা হইতেছে। পূজার কয়েকদিন পূর্ব হইতে গ্রামবাসীদের নিকট হইতে চাল-ডাল ও চাঁদা বাবদ অর্থ আদায় করা হয়। নির্দিষ্ট দিনে রক্ষাকালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্যন্ত যথারীতি ব্রাহ্মণ দ্বারা রক্ষাকালীর পূজা হয়। পূজান্তে ঐ রাত্রিতেই

দেবীর প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়। এই দিন বহু নরনারী দেবী দর্শন করিতে ও পূজা দিতে আসেন। সমবেত ভক্ত ও দর্শকদিগের মধ্যে বলির মাংস সহ প্রতি বৎসর প্রায় তের-চৌদ্দ মণ চাউলের খিচুড়ী ভোগ বিতরণ করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

জাউলিয়া গ্রামে জঙ্গলেশ্বর নামে খ্যাত একটি শিব-লিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

প্রায় চারশত বর্গ হাত পাকা ভিতের উপর ইষ্টক নির্মিত একটি মন্দিরে তিন হাত উচ্চ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে—ইহাই জঙ্গলেশ্বর শিব নামে খ্যাত।

২৩শে চৈত্র গাজন উৎসব আরম্ভ হয়; এই দিনের পূজাকে "শিব উঠা" পূজা বলা হয়। ২৪শে ও ২৫শে চৈত্র সাড়ম্বরে যথারীতি শিবের পূজা হয়। ২৬শে চৈত্র শিবপূজার পর ভক্তরা দল বাঁধিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। ২৭শে চৈত্র শিবমন্দির প্রাঙ্গণে সারা রাত্রিব্যাপী বোলান গানের আসর বসে। এই দিন ভক্তদের রাত্রি জাগরণ করিতে হয়। ২৮শে চৈত্র শিবের স্নানাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৯শে চৈত্র শিবতলায় মহাসমারোহে হোম-যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে। এই দিনের পূজায় শিবের নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজার কয়দিন ভক্তরা শুদ্ধাচারে ও কঠোর নিয়ম-নিষ্ঠার সহিত শিবপূজা ও শিব বন্দনা করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন। সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

কড়েয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে চৈত্র হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব পালন করা হয়। প্রায় আড়াই ফুট দৈর্ঘ্য এবং আড়াই ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট লম্বা কাঠের উপরিভাগে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ খোদিত একটি মূর্তিকে উৎসব উপলক্ষে বাণেশ্বর শিবরূপে পূজা করা হয়। উৎসবের দিন অনেকে শিবের ভক্ত হন বা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীরা প্রথম দিনে নাপিত দ্বারা নিজ নিজ ক্ষৌর কার্য ও গঙ্গায় স্নান করিয়া ব্রত গ্রহণ করেন এবং উৎসবের কয়দিন সংযম পালন ও নিষ্ঠার সহিত শিবের আরাধনা করিয়া থাকেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভক্তরা ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ বাণেশ্বর শিবকে কাঁধে লইয়া নাচিতে নাচিতে মুখে "শিব বল মহাদেব" ধ্বনি দিয়া গ্রামের একটি নির্দিষ্ট পুকুরে শিবকে স্নান করাইতে লইয়া যান এবং পুকুরে ঘাটে শিবের স্নানাভিষেকের পর ঐ ভাবেই মূর্তিসহ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন।

সংক্রান্তির পূর্ব দিন সাড়ম্বরে শিবপূজা ও ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং রাত্রিতে মন্দির প্রাঙ্গণে সারা রাত্রিব্যাপী বোলান গানের আসর বসে। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজন ও গায়কের দল যোগদান করিয়া থাকেন। রাত্রি শেষ প্রহরে সন্ন্যাসব্রতীরা মড়ার মাথা লইয়া নৃত্য গীত করেন। পরের দিন চড়ক পূজা উপলক্ষে গ্রামের জঙ্গলাকীর্ণ একটি নির্দিষ্ট স্থানে বাণেশ্বর মূর্তিটিকে লইয়া গিয়া তথায় যথারীতি পূজা হয়। এই স্থানে পূজা শেষ হইলে পর মূর্তিটিকে কাঁধে করিয়া ঢাক ঢোলের বাজনাসহ ভক্তরা গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান এবং গৃহস্থেরা তাঁহাদিগকে কিছু কিছু চাউল-পয়সা ইত্যাদি দেন। উৎসব সমাপ্তির পর গ্রামের প্রধানেরা ভক্তদের একদিন পরিতৃপ্ত সহকারে ভোজন করান।

ভরতপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে মহা-ধুমধামের সহিত শিবপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। জনশ্রুতি আছে, বহুকাল পূর্বে বাঘডাঙ্গার রাজা স্বপ্নাদেশ পাইয়া শিবলিঙ্গটিকে ভরতপুর গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে প্রবাহিত ময়ূরাক্ষী নদী হইতে উদ্ধার করেন এবং নিকটবর্তী বোল্লা গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করেন। পরে ভরতপুরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহাতে শিবলিঙ্গটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাঘডাঙ্গার রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে শিবের নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। ঐ জমি সেবায়েত,

বাজনদার ও নাপিতদিগের মধ্যে বণ্টন করা আছে। ইহা ভিন্ন, মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার হইতে এই উৎসব বাবদ অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা আছে। এখানকার শিব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস এবং ইহার মাহাত্ম্য সম্পর্কে এই অঞ্চলে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়।

চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বদিন মহাসমারোহে শিবপূজা ও হোম হইয়া থাকে এবং সংক্রান্তির দিন চড়ক পূজা হয়। প্রতিদিন আতপ চাউলের অন্ন-ব্যঞ্জন দিয়া শিবের ভোগ ও পূজা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ। উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা

গোপগ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিন-ব্যাপী মহাসমারোহে শিবের গাজন ও চড়ক পূজা হইয়া থাকে। গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের গৃহে প্রতিষ্ঠিত একটি শিব-লিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে শিবলিঙ্গটিকে পূজারীর গৃহ হইতে আনিয়া গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত একটি মন্দিরে সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের তৃতীয় দিনে হোম যজ্ঞ হয় এবং মন্দির প্রাঙ্গণে বোলান গানের আসর বসে। পরের দিন ভক্তরা শিবলিঙ্গটিকে গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান এবং সেখানে শিবের স্নানাভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। উৎসবে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। পূজায় কুমড়া ও ছাগ বলি দেওয়া হয় এবং বহু লোকের সমাগম হয়।

বাগ্রামে প্রতি বৎসর ২৮শে চৈত্র হইতে সংক্রান্তির তিথি পর্যন্ত শিবপূজা ও গাজন উৎসব পালন করা হয়। গ্রামে সাধারণের একটি শিবমণ্ডপে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রাচীন। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্বদিন হোম হয়। হোম পূজার আগের দিন শিবলিঙ্গটিকে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে ডুবাইয়া রাখা হয় এবং হোম পূজার দিন ভক্তরা ঢাক-ঢোলের বাজনা সং মহাসমারোহে শিবলিঙ্গটিকে পুকুর হইতে তুলিয়া আনিয়া মণ্ডপে স্থাপন করেন এবং তাহার পর যথারীতি শিবের হোম পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবে বহু লোকের সমাগম হয়।

জালিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে মহাধুমধামের সহিত শিবপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবমূর্তিটি গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণ সেবায়েতের বাড়ীতে থাকে। দৈনন্দিন পূজা তাঁহার বাড়ীতেই হয়। চৈত্রসংক্রান্তির সপ্তাহকাল পূর্বে উক্ত শিবমূর্তিটিকে গ্রামের মাঝপাড়ায় অবস্থিত একটি মন্দিরে স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। জাগরণের রাত্রে সারারাত্রি ধরিয়া বোলান গান হইয়া থাকে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু বোলান গানের দল আসে।

চণ্ডীপূজা

কড়েয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাড়ম্বরে কড়েয়া চণ্ডীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে রক্ষিত একটি গোলাকার কালো পাথরকে চণ্ডীরূপে পূজা করা হয়। পাথরটির ওজন প্রায় পাঁচ হইতে সাত সের হইবে এবং উহার উপরিভাগ চ্যাপ্টা। সাধারণের বিশ্বাস চণ্ডী দেবীর নিকট মানত-পূজাদি দিলে গ্রামে মহামারীর ভয় থাকে না। বৈশাখ মাসে পূজা ব্যতীত বৎসরের অন্যান্য সময়েও ভক্তরা দেবীর নিকট মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন। মানত হিসাবে প্রধানতঃ ছাগ বলি দেওয়া হয়। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ।

জাখনী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তিতে যখিন চণ্ডীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে যখিন চণ্ডীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সংক্রান্তির দিন মহাসমারোহে এই মন্দিরে যখিন চণ্ডীর পূজা হইয়া থাকে। সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। উৎসবের দিন আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী দেবী দর্শন করিতে ও মানত-পূজাদি দিতে আসেন। প্রধানতঃ ছাগ বলি, অন্নভোগ, ঢাক-ঢোলের বাজনা মানত করা হয়। উৎসবে

কিছু কিছু সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয় এবং সমাগত যাত্রীদের মধ্যে অন্নভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

প্রতিদিন পাঁচ ছটাক পরিমাণ মিষ্টি ও পাঁচ পো চালের অন্নভোগ দিয়া দেবীর পূজা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ।

জগদ্ধাত্রীপূজা

কাগ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে খুব ধুমধামের সহিত জগদ্ধাত্রী দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে সাধারণের একটি পূজামণ্ডপে প্রতি বৎসর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। পূজার প্রথম দিনে ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি বলি দেওয়া হয়। স্থানীয় অহিন্দুরাও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

ধর্মরাজপূজা

কড়েয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে খুব ধুমধামের সহিত ধর্মরাজপূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোকে ইহাকে "ভাণ্ডার পূজা" বলেন। উপরিভাগ চ্যাপ্টা গোলাকৃতি একটি কালো পাথরকে ধর্মরাজ-রূপে পূজা করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আষাঢ়ী পূর্ণিমার তিন চার দিন পূর্বে উৎসব উপলক্ষে অনেকে ভক্তব্রত গ্রহণ করেন। ভক্তরা এই কয়দিন প্রত্যহ এক বেলা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন এবং প্রধান ভক্ত বা দেয়াসীর নির্দেশে নানারূপ আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন।

উৎসবের দিন বিকালে দেয়াসী একটি মাটির হাঁড়ির মধ্যে কিছু পচাই মদের খাদ্য (বাখর দেওয়া পচা ভাত) ভরিয়া তাহার সহিত কিছু পুকুরের জল মিশাইয়া হাঁড়িটিকে ফুল, চন্দন ও মালা দিয়া সাজাইয়া উহাকে মাথায় করিয়া সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। গ্রাম প্রদক্ষিণ কালে একদল বাদ্যকার ঢাক-ঢোল বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার অনুসরণ করেন। গ্রাম প্রদক্ষিণের পর দেয়াসী পূজামণ্ডপে আসিয়া পৌঁছাইলে অন্যান্য ভক্তরা সযত্নে তাঁহার মাথা হইতে হাঁড়িটি নামাইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে দেয়াসী মূর্ছিত হইয়া পড়েন। সাধারণের বিশ্বাস, এ সময় দেয়াসীর উপর দেব ভর হয় এবং ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি গ্রামবাসীর আশু মঙ্গল-অমঙ্গলের বিষয় ব্যক্ত করিয়া থাকেন।

ইহার পর যথারীতি ধর্মরাজের পূজা হয়। পূজান্তে ছাগ বলি দেওয়া হয়। বলি শেষ হইলে পর ভক্তরা পূজা প্রাঙ্গণে নৃত্য করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার পরে মল্লযুদ্ধের আয়োজন করা হয়। মল্লযুদ্ধে বিভিন্ন গ্রাম হইতে কুস্তিগীরেরা আসেন এবং বিজয়ী কুস্তিগীরকে সোনার পদক ও অন্যান্য জিনিসপত্র দিয়া সম্মানিত করা হয়।

সন্ধ্যায় সং নাচের ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকটি ছোট ছোট দল এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন এবং পূজা প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে।

বৈদ্যপুর গ্রামের প্রধান উৎসব হইল বৈশাখী পূর্ণিমায় বা বুদ্ধ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত ধর্মরাজপূজা। এই পূজা কতকালের প্রাচীন তাহা সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে সাধারণের ধারণা এই যে, গ্রাম পত্তনের সময় হইতেই ধর্মরাজপূজা চলিয়া আসিতেছে। এ সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, ধর্মদাস পাল নামে জনৈক কুম্ভকার সর্বপ্রথম স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ধর্মরাজ ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ধর্মদাস পাল নদী হইতে একটি, নিজের চাষ ক্ষেত হইতে একটি এবং অপর স্থান হইতে আরও দুইটি ধর্মশিলা প্রাপ্ত হন। ধর্মরাজের মন্দিরে এই চারটি বিগ্রহই প্রতিষ্ঠিত আছে এবং পূজার দিনে এ বিগ্রহকেই সমান মর্যাদার সহিত পূজা [illegible] ঠাকুর চারিটি হইল: (১) [illegible] আকার ঢিবি বা স্তূপাকৃতি; চারিটি ঠাকুরের মধ্যে ইহার আকারই বৃহত্তম; (২) ধর্মরাজ ঠাকুর, (৩) [illegible] গোলাকৃতি এবং আকৃতিতে একটু ছোট, (৪) [illegible] চ্যাপ্টা আকৃতি। ধর্মরাজ ঠাকুরের সেবায়েৎ জাতিতে কুম্ভকার। বৈদ্যপুর গ্রামের কুম্ভকারদের মধ্যে যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তিনিই দেয়াসীর পদাধিকারী হন। পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী।

সুউচ্চ একতলা খিলানযুক্ত বারান্দাওয়ালা পাকা মন্দিরে ধর্মরাজ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন মন্দিরের সম্মুখেই বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণ নদী পর্যন্ত প্রসারিত। পূজারীর মতানুসারে জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মার ধ্যানেই ধর্মরাজের পূজা করেন। তাঁহার মুখ হইতে উচ্চারিত ধ্যানটি এইরূপ :

> যস্যান্থানাদি রূপং নচকরচরণং।
> নাস্তিকায়া নিনদঃ নাকারণাদিরূপং।
> নচভয় মরণং নাস্তি জন্ম বয়সং।
> যোগেন্দ্র গমনঃ গম্য সকল জনা গতৌ।
> সব সংকল্পহীনং তত্র কোপ নিরঞ্জনং ॥

গ্রামের সবশ্রেণীর লোকের সাহায্য ও সহযোগিতায় এই পূজা ও উৎসব সম্পন্ন হইলেও, শূদ্রশ্রেণীর লোকই সাধারণতঃ ভক্ত হন। মানত হিসাবে দুই-একটি ছাগল বলি দেওয়া হয়। এই পূজায় এবং উৎসবে অহিন্দুরা তেমন যোগদান করেন না; তবে কিছুকাল আগে মূর্চ্ছারোগাক্রান্ত জনৈক মুসলমান রমণী ধর্মরাজের পূজা দিয়া রোগমুক্তি লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

বৈশাখী পূর্ণিমার দিন ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হইলেও বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী হইতেই এই পূজার প্রস্তুতি শুরু হয়। এই সময় দেয়াসী (তাহাকে অবশ্যই কুম্ভকার বংশের হইতে হইবে) যথাবিধি ক্ষৌরকর্ম করিয়া জলপূর্ণ ঘট স্থাপন করেন। ইহার পর বিগ্রহে গালা লেপন করা হয়। এইদিন হইতে প্রাত্যহিক পূজাপদ্ধতির সঙ্গে ধর্ম-রাজের পূজার কিছু পার্থক্য লক্ষিত হয়।

ধর্মরাজের এই উৎসবে সাধারণতঃ সদ্গোপ, রাজবংশী প্রভৃতি জাতির লোকেরাই ভক্ত হন। পূজার সাতদিন আগে ক্ষৌরকর্মাদি সমাপনান্তে কণ্ঠে উপবীত আকারে ক্ষুদ্র সূত্রখণ্ড বা উত্তরীয় ধারণ করিয়া ভক্ত হইতে হয়। ভক্তদের হাতে বেত্রদণ্ড এবং কোমরে বেত্রবলয় থাকে, তাঁহারা সাদা কাপড় পরিধান করেন এবং গায়ে নূতন রঙীন গামছা দেন—ইহাই হইল ভক্তদের সজ্জা। ভক্ত ব্রত গ্রহণের পর মাথায় তেল মাখা নিষেধ। ঐরূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া তৈলহীন রুক্ষ মুখ-চোখ লইয়া ইঁহারা যখন দলবদ্ধভাবে মুখে "বল্‌লো" ধ্বনি দিয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান, তখন স্বভাবতঃই গ্রামে একটি নূতন পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

শুক্লা একাদশীতে কয়েকজন ভক্ত সহ দেয়াসীর মাথায় বাণেশ্বর (ধর্মরাজের স্থানান্তরযোগ্য কল্পমূর্তি) লইয়া গ্রামের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত গ্রামগুলিতে ভিক্ষার্থে বাহির হন। এই সময় তাঁহাদের সংগে ঢাক, কাঁসি প্রভৃতি বাজনা থাকে এবং হাড়ীসম্প্রদায়ভুক্ত একজন ব্যক্তি বাণেশ্বর বিগ্রহের মাথায় দীর্ঘ ছত্র ধরিয়া থাকেন। সারাদিন ভিক্ষা সংগ্রহের পর অপরাহ্নে বিশেষ ধূমধাম সহকারে ধর্মঠাকুর লইয়া গ্রামের প্রান্তে ভক্তেরা আসিয়া উপস্থিত হন এবং একটি নির্দিষ্ট স্থান হইতে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার পরদিন অনুরূপভাবে গ্রামের পশ্চিম দিকে অবস্থিত গ্রামগুলিতে এবং তাহার পরদিন পূর্বদিকে অবস্থিত গ্রামগুলিতে ভিক্ষার্থে পরিক্রমাপর্ব চলে।

এইভাবে পূর্ণিমা যতই আসন্ন হইতে থাকে, ততই প্রতিদিন ভক্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে; এবং শেষ পর্যন্ত প্রায় একশত হইতে দেড়শত জন ব্যক্তি ধর্মঠাকুরের ভক্ত হন। সেইসঙ্গে ঢাক ও কাঁসির সংখ্যা অনুরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। পূর্বে এই উৎসবে প্রায় একশত আটটি পর্যন্ত ঢাক আসিত। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রধান রাস্তাটির দুই পাশের বাড়ি-ঘর, বারান্দা, দোকানপসার প্রভৃতি আলোক মালায় সজ্জিত করা হয়, ফলে সন্ধ্যার পরে গ্রামটির এই অংশ অপূর্ব শোভা ধারণ করে।

ত্রয়োদশী ও চতুর্দশীর রাত্রে ভক্তগণ মন্দির প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধ ভাবে শুইয়া "পাতাপাটা" নামে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে যোগদানকারী ভক্তদের তালবদ্ধ নৃত্যের পদক্ষেপে, বীভৎস ভাবে মাথা-নাড়ার ভঙ্গিমায়, সমবেতকণ্ঠে উচ্চারিত জয়ধ্বনিতে এবং প্রায় আশি-নব্বুইটি ঢাকের একযোগে একটি বিশেষ ধরণের বোল বাজানোর রবে এই সময় উৎসব প্রাঙ্গণের চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠে। ঢাকের আওয়াজে দূর-দূরান্তের অধিবাসীরাও ক্রমে ক্রমে আসিয়া সমবেত হন। এই দুই দিন রাত্রিতে প্রতি বৎসরই গ্রামে নাম করা পেশাদারী যাত্রাদলের যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

পরদিন পূর্ণিমা তিথিতে দলে দলে লোক ধর্মরাজের মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। একটু বেলা হইলে মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুর পাড়ে ঘট পূজা করিয়া আসিয়া দেয়াসী পল্লীর প্রধানগণের অনুমতি লইয়া পূজারীকে ধর্মরাজের মাথায় ফুল চাপাইতে নির্দেশ দেন। শুধু মনোহররায় এর মাথাতেই ফুল চাপান হয়। তিনবার ফুল দেওয়া হয় এবং তিনবার আপনা হইতেই তাহা পড়িয়া যায়। ইহার পর সেই স্খলিত ফুল লইয়া দেয়াসী উপরিউক্ত পুকুর পাড়ে আবার ফিরিয়া যান। এইবার বাণেশ্বর বিগ্রহ লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ শুরু হয়। এই গ্রাম প্রদক্ষিণ "ভাঁড়ার ফেরা" নামে স্থানীয় অঞ্চলে অভিহিত। "ভাঁড়ার ফেরা"-র সময় দেয়াসীর মাথায় কিঞ্চিৎ মদ্যপূর্ণ একটি ভাঁড় এবং মনোহররায়-এর মাথা হইতে তিনবার স্খলিত ঐ ফুলগুলিও থাকে। ধর্মরাজকে লইয়া গ্রাম প্রদক্ষিণের সময়ে অর্থাৎ ভাঁড়ার ফেরা-র সময়ে যে দীর্ঘ অথচ ভাবগম্ভীর শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহা এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। ভক্তদের মাথার উপরে বৈশাখের খররৌদ্র থাকিলেও গ্রামের মহিলাগণ অনবরত ঘড়া ঘড়া জল ঢালিয়া শোভাযাত্রার পথটিকে শীতল রাখিবার চেষ্টা করেন। কোন কোন ভক্ত মানত রক্ষার উদ্দেশ্যে জিহ্বায়, কপালে অথবা বক্ষ পাঞ্জরে বাণবিদ্ধ করিয়া তাহার অগ্রভাগে ঘৃতসিক্ত বস্ত্র খণ্ড ও ধূপ সহযোগে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া শোভাযাত্রায় অনুগমন করেন। "ভাঁড়ার ফেরা"-কালে পূজারী অন্যান্য সহকারীদের সাহায্যে হোম ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং "ভাঁড়ার ফেরা"-র কিছুক্ষণ পরেই দেয়াসীর উপস্থিতিতে একটি কিম্বা দুইটি ছাগ বলিদান করা হয়। এই উৎসবে জাতিগত কোন ভেদাভেদ মানা হয় না। উৎসব কালে প্রসাদ বিতরণ করা হয় এবং জলসত্র খোলা হয়।

।

এড়েরা গ্রামে প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন একটি যোগাদ্যাদেবী প্রতিষ্ঠিত আছেন। স্থানীয় কোন জমিদার বংশের পূর্ব পুরুষদের দ্বারা এই দেবী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শোনা যায়। গ্রামবাসীরা দেবীর নিত্যপূজা করেন। তবে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ বিশেষ ধুমসহিত যোগাদ্যাদেবীর বার্ষিক পূজা অর্চনা করা হয়। গ্রামের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড তমাল গাছের নীচে যোগাদ্যাদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। পূজার দিন এই স্থানে একটি ছোট মেলা বসে।

রাধামোহন জীউর পূজা

কাঞ্চগড়িয়া গ্রামে রাধামোহন জীউর বাৎসরিক উৎসব মাঘী কৃষ্ণা একাদশী হইতে চতুর্দশী পর্যন্ত—এই চারদিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, পূর্বে এই গ্রামে পরম বৈষ্ণব দ্বিজহরি ঠাকুরের পাটবাড়ী ছিল; বর্গী হাঙ্গামার সময় ঐ পাটবাড়ী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। বাংলা ১৩১৭ সনে দ্বারিকানাথ সাধুবাবা নামে জনৈক সাধু এখানে রাধামোহন জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। সেই হইতে এই উৎসবটি পালন করা হইতেছে। উৎসবের চারদিন আড়ম্বরপূর্ণভাবে ভোগপূজাদির ব্যবস্থা করা হয়।

সমাগত যাত্রী ও ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষে আমলাই, সিজগ্রাম, আলুগ্রাম, টেঁয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে, এমন কি দক্ষিণ খণ্ড, কলেশ্বর, মটুকেশ্বর, নবদ্বীপ প্রভৃতি দূরবর্তী স্থান সমূহ হইতেও বহু বৈষ্ণব ও ভক্তের সমাগম হয়। যাত্রীরা ফলমূল, দুধ, চিনি ইত্যাদি মানত দেন। উৎসবের চারদিন হরিনাম সংকীর্তন, রামায়ণ পাঠ, কথকথা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

শিবরাত্রি

শক্তিপুর গ্রামের বিখ্যাত কপিলেশ্বর শিবের মন্দির ও পূজা সম্পর্কে আচার্য রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত "পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকা" গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়।

"জেমোকান্দি হইতে অগ্নিকোণে প্রায় ছয় ক্রোশ ব্যবধানে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে শক্তিপুর গ্রাম। শক্তিপুরের সন্নিহিত গ্রাম গৌরীপুর, মহতা প্রভৃতি। গঙ্গার অপর পারে বেলডাঙ্গা, দাদপুর, রমনা প্রভৃতি গ্রাম। শক্তিপুরের পূর্বে ভাগীরথী ও পশ্চিমে দ্বারকানদী।

দ্বারকা এখানে দক্ষিণ বাহিনী; দ্বারকার এই অংশকে বাবলা বলে। দ্বারকা হইতে গঙ্গা পর্যন্ত একটা নালা আছে, ঐ নালাকে চাকরা বলে। চাকরা বর্ষাকালে জলপূর্ণ হয়। ঐ নালার দক্ষিণে শক্তিপুর গ্রাম ও উত্তরে কপিলেশ্বর মন্দির।

কপিলেশ্বর ফতেসিংহের রাজা সবিতা রায়ের প্রপৌত্র জয়রাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকার বিবরণ দেখিলে এ বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। কপিলেশ্বর মন্দিরের, তৎসংলগ্ন বাগানের, দেব সেবার বন্দোবস্তের এবং মেলার বিস্তৃত বিবরণ পঞ্জিকায় বর্ণিত হইয়াছে……।

কপিলেশ্বর দেবের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে শক্তিপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীন চন্দ্র সাহার সঙ্কলিত বিবরণের মর্ম নিম্নে দেওয়া গেল;

কপিলেশ্বর মন্দির শক্তিপুরের উত্তরপূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। শক্তিপুর পূর্বে পলাশী পরগণার অন্তর্গত ও কৃষ্ণনগরাধিপের অধিকারভুক্ত ছিল, এক্ষণে পলাশী হইতে খারিজ হইয়াছে; নাম 'পরগনা পলাশীর খারিজা'। শক্তিপুরের উত্তরাংশ কপিলেশ্বরের সম্পত্তি খেরাজি দেবোত্তর; এই অংশের নাম শিবপুর। এক্ষণে শিবপুর অর্থাৎ শক্তিপুরের দেবোত্তর অংশ নদীয়া রাজের অধিকারে আছে……।

কপিলেশ্বরের বর্তমান মন্দিরের পূর্বে প্রায় একরশি দূরে ভাগীরথী, বর্ষাকালে গঙ্গার জল মন্দিরের পূর্বপার্শ্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মন্দিরের বাহিরে প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে দ্বারকা বা বাবলা নদী। উভয় নদী একটি নালা দ্বারা সংযুক্ত; ঐ নালার নাম চাকরা…।

কপিলেশ্বরের বর্তমান মন্দির ইষ্টকনির্মিত ও দক্ষিণ-দ্বারী; দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮ হাত, প্রস্থ ১৮ হাত, উচ্চতা প্রায় ৪০ হাত। মহতা গ্রামবাসী ৺জগন্মোহন মহতা মহাশয় বর্তমান মন্দির নির্মাণ করেন। মন্দিরের সম্মুখে একখানি প্রস্তরফলকে খোদিত আছে—

ভক্তিহীন শ্রীজগন্মোহন মহতা
১২৪১ সন।

জনশ্রুতি আছে পূর্বে প্রস্তর নির্মিত মন্দির ছিল, উহা গঙ্গা গর্ভস্থ হইয়াছে। সেই মন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রস্তরখণ্ড স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্ত আছে।

মন্দিরের পশ্চিমে কিছু দূরে ইষ্টকনির্মিত সোপানাবলী আছে; কিন্তু সে সোপানে কোথায় নামিতে হইত বলা যায় না।

বর্তমান মন্দিরের পশ্চাতে উত্তরে একটি কাঁঠাল গাছ ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সাতটি আমগাছ ও চারিটি বেল-গাছ আছে। আরও দক্ষিণ পশ্চিমে আন্দাজ চারিরশি দূরে একটি আম বাগান আছে; ঐ আম বাগানও দেবসম্পত্তি।

মন্দিরের নিকটে দক্ষিণ পূর্বে চন্দ্রেশ্বর শিবের মন্দির। এই মন্দির প্রায় ১ হাত দীর্ঘ ও ১০ হাত প্রস্থ ও ২০ হাত উচ্চ। বাঘডাঙ্গার রাণী শ্রীযুক্তা মুক্তকেশী দেবীর পিতামহ শম্ভুনাথবাবু এই মন্দির নির্মাণ করিয়া শিব স্থাপন করেন। পুরাতন মূর্তি ভগ্ন হইলে রাণী মহাশয়া নূতন লিঙ্গের স্থাপনা করেন। চন্দ্রেশ্বরের সেবার্থ ফতেসিংহ-মধ্যে নিষ্কর ভূমি নির্দিষ্ট আছে। দক্ষিণে একখানা ভগ্ন ইষ্টক নির্মিত গৃহে মৃন্ময়ী মূর্তির নির্মাণ দ্বারা বৎসর বৎসর শিবোত্তর সম্পত্তির ব্যয়ে শ্যামাপূজা হইয়া থাকে।

শিবোত্তর সম্পত্তি শিবপুর হইতেই দেবসেবা নির্বাহিত হয়। তদ্ভিন্ন ফতেসিংহের (জেমো ও বাঘডাঙ্গার) প্রদত্ত পৃথক নিষ্কর ভূমি হইতেও দেব সেবার সাহায্য হয়। বর্তমান সেবায়েত কৃষ্ণনগরাধিপ। দর্শক-গণের প্রণামী হইতেও সামান্য আয় আছে।

শিব চতুর্দশীর দিন শিবের অভিষেক ও পূজা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে কৃষ্ণনগরের মহারাজের, পরে জেমো বাঘডাঙ্গার ও তৎপরে শক্তিপুরের জমিদারের পূজা হয়। ঐ দিন হইতে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার অবস্থা পূর্বের অপেক্ষা মন্দ। কপিলেশ্বরের বাগানে ও শক্তিপুরের অধিকারের মধ্যে মেলার স্থান। জমিদার ও পুলিশের পক্ষ হইতে মেলার তত্ত্বাবধান হয়।

কয়েক বৎসর হইতে মেলা উপলক্ষে কালীপূজা ও যাত্রাগান প্রভৃতি হইতেছে। চতুর্দ্দশীর চিড়ামহোৎসব

ও পরদিন অন্নমহোৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণব ও দরিদ্রগণকে ভোজন করান হয়।" (পৃঃ ৫১-৫৪)

"পুণ্ডরীক কুলকীর্তি পঞ্জিকায়" কপিলেশ্বর শিব সম্পর্কে সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে শ্লোকগুলি রহিয়াছে, আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী কর্তৃক তাহার বঙ্গানুবাদ নিচে দেওয়া হইল :

"কপিলেশ্বরের পরিখাযুক্ত বাটী, ডাকরা (দ্বারকা) নদী অবতরণের দ্বারে বেদী, কৈলাস শৃঙ্গের ন্যায় ধবল প্রাচীরাবৃত মণ্ডপ, ইষ্টক রচিত অন্তর্বেদী চারটি বেটা; এই সকল আপনার কীর্তি।

কপিলেশ্বর মন্দিরের দ্বারে দুই বকুল গাছ, তাহার নিম্নে পরিষ্কৃত ভূমিতে সন্ন্যাসী ব্রজবাসী বৈষ্ণব প্রভৃতি সর্বদা ভিক্ষার জন্য আসিয়া অবস্থান করে। অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণেরা কেহ চণ্ডী পাঠে, কেহ শিব পূজায়, কেহ ভাগবত পাঠে, কেহ মহাভারত পাঠে সর্বদা নিযুক্ত আছেন।

প্রাতঃকালে গঙ্গাজলে স্নানের পর শিবার্চনা হয়। মধ্যাহ্নে পঞ্চামৃতে স্নানের পর ষোড়শোপচারে পূজা হয়। সন্ধ্যাকালে পুষ্পমালা দ্বারা অদ্ভুত বেশ বিধানের পর ধূপ দীপ জপ স্তুতি ও শঙ্খাদি বাদ্যোৎসবের দ্বারা অর্চনা হইয়া থাকে।

ভীমরায় দ্বাদশলক্ষ শিবপূজা করিয়াছিলেন; তাঁহার পুত্র মাঙ্গলিক উপাচার দ্বারা তাঁহার দ্বিগুণ সংখ্যক শিবপূজা করেন। ভীমরায় পূর্বে সঙ্কল্প করিয়া অযুত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়াছিলেন; পরে সন্তোষ রায় তাঁহার দ্বিগুণ ব্রাহ্মণের ভোজন সম্পাদন করেন।

শিব মন্দির সংলগ্ন উপবন নারিকেল, রসাল, পনস, পুগ, বিল্ব, চম্পক, দাড়িম্ব, বদর, জম্বু, রম্ভা, শিবা, কদম্ব, বট, পিপ্পল, বকুল, তাল ও বংশবৃক্ষে আচ্ছন্ন ছিল।

শিবের পুষ্পবাটিতে জবা, ওগড়, মল্লিকা, তুরগ, শক্র, শেফালিকা, অগস্ত্য, বক, যুথিকা, কণক, কুন্দ, মন্দার, কুরনট, নবমালিকা, তুলসী, কাঞ্চন, জাতি ও কেতকী প্রভৃতি নানাফুলের গাছ ছিল।

শিবের নিকট ক্রোশার্দ্ধ দূরে গঙ্গা ছিলেন; দ্বারের নিকট দ্বারিকা নদীতে মিলিত নদীসমূহ ছিল; এই মিলিত নদী সমুদয়ও গঙ্গাতুল্য। এখানে স্বয়ম্ভু শম্ভু অবস্থিত ছিলেন ও পূজোপবাসাদি দ্বারা শিবরাত্রি উৎসব ঘটিত। এই জন্য এই দেশও অতি পুণ্যফলপ্রদ হইয়াছিল।

গঙ্গা হইতে শিবমন্দির পর্যন্ত মনুষ্য সমশ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকিত; সুন্দরী স্ত্রীগণের গতাগত সংঘর্ষে সেই মনুষ্য-শ্রেণী আকুলিত হইত; মনুষ্যগণ গঙ্গার ঘাট হইতে আসিয়া দ্বারের নিকট উপস্থিত হইলে কোলাহল উপস্থিত হইত ও পরে তাহারা মন্দির প্রাঙ্গণে ছড়াইয়া পড়িত।

দিনের বেলায় সকলে শিবদর্শনাকাঙ্ক্ষায় পূজার সামগ্রী হস্তে উপস্থিত হইলে দ্বারস্থ দ্বিজগণের সংঘটে সেই সকল সামগ্রী আচ্ছাদন করিয়া রক্ষা করিতে হইত। রাত্রিকালে প্রাঙ্গণ দীপান্বিতা ও স্ত্রীগণ পূর্ণ হইত। এইরূপে প্রতি প্রহরে নানা উৎসব সহকারে বিধিপূর্বক পূজা হইত।

স্বদেশীয় ও বৈদেশিক নানালোকের মিশ্রণে কোলাহল উৎপন্ন হইত; বাদ্যসংকারে নানা মাঙ্গলিক কৌতুক ঘটিত, নানা সামগ্রী ক্রয়বিক্রয়ার্থ সমাগত বণিকদিগের দীপালোকিত দোকান বসিত। এইরূপে কপিলেশ্বরের বাটী শোভা ধারণ করিত ও লোকে আনন্দে জাগরণ করিত।

কেহ বর্ণখচিত চিত্র, কেহ সোনার মাথা কেহ রূপার ফুল দেওয়া চন্দ্রাতপ, কেহ চাদর, কেহ পুষ্প, কেহ মালা, কেহ সুন্দর চন্দ্র, কেহ বা ধূপ দীপ দিয়া হরপার্বতীর স্তব করিত।" (পৃঃ ১৩ ১৭)

শিতুয়া গ্রামের প্রধান উৎসব হইল দুইটি—শিবরাত্রি এবং নীলপূজা বা হোমসংক্রান্তি। দুইটি উৎসবই সর্বজনীন এবং প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন। বর্তমানে উৎসব দুইটি "শিতুয়েশ্বর মন্দির সংস্কার সমিতি" কর্তৃক পরিচালিত হয়। "শিতুয়েশ্বর শিব" অনাদিলিঙ্গ—দুই খণ্ড চৌপল প্রস্তর মূর্তিই ইঁহার স্বরূপ। শিবের পাকা মন্দির আছে এবং উপরি উক্ত মন্দির সংস্কার সমিতি সম্প্রতি একটি নাট মন্দির তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন। শিতুয়েশ্বর শিবের বর্তমান সেবায়েত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পূজারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী। শিব-রাত্রির উৎসবের দিন দিনে একবার এবং রাত্রে চার প্রহরে

চারবার শিশুয়েশ্বর শিবের পূজা হয়। অন্যান্য সময়ে দ্বি-প্রহরে পূজা এবং সন্ধ্যায় শীতল হয়। সাধারণতঃ শনি, মঙ্গলবার এবং পূর্ণিমা তিথিতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মানত হিসাবে ছাগ ও গরু দান করিতে দেখা যায়। চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব দিবসে নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাকে হোমসংক্রান্তিও বলা হয়। পূজা এবং হোম সমাপনান্তে দুইটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসব দুইটিই একদিন করিয়া স্থায়ী হয়।

সরস্বতীপূজা

গড্ডা-সিংহারি গ্রামের প্রধান উৎসব সরস্বতীপূজা মাঘী পঞ্চমীতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পূজাটি মহাকবি কালিদাসের স্মৃতির সহিত জড়িত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কালিদাসের স্মৃতিরক্ষার্থে এই পূজাটি প্রবর্তিত হয়। দেবীর মন্দিরটি বর্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। পূর্বে এই সরস্বতীপূজা আশেপাশের বহু গ্রামের সর্বজনীন উৎসব বলিয়াই পরিগণিত হইত। পূজা এবং উৎসব উপলক্ষে এবং বিশেষ করিয়া কবি কালিদাসের স্মৃতির সহিত জড়িত বলিয়া এই সময় গ্রামে একটি সাহিত্য সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হইত। এই সম্মেলনে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু জ্ঞানী ও সুধীজনের সমাবেশ হইত। বর্তমানে এই উৎসবটির সেইরূপ কোন জাঁকজমক নাই। উৎসবটি চারদিন ধরিয়া চলে। প্রত্যহ পূজা, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। চতুর্থ দিনে সরস্বতী মূর্তিটি বিসর্জন দেওয়া হয়। পঞ্চকাল পূর্ব হইতেই পূজা এবং উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। ভগ্নাবশিষ্ট মন্দিরের স্থানে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈয়ার করিয়া পূজার আয়োজন করা হয়। উৎসবটিতে স্থানীয় অহিন্দুরাও যোগদান করেন।
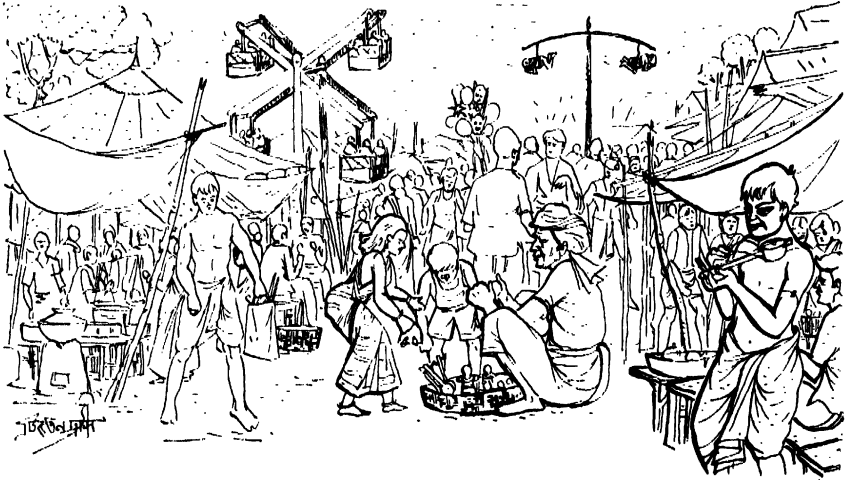
জেলা : মুর্শিদাবাদ
থানা : ভরতপুর

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(গদাধর পণ্ডিত)

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব উপলক্ষে ভরতপুরে শিবমণ্ডপ তলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে; মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকেই ইহাতে বেশী লোক সমাগম হয়। মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচ-ছয় শত যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। ইহা ভিন্ন, কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মোট প্রায় সতের-আঠারটি দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহাছাড়া, বই-ছবি ও কারুশিল্পজাত দ্রব্যের কয়েকটি দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতিযোগীতামূলক খেলাধূলা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি গানের দল আছে।

(বাউল দাস)

সোনারুন্দী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় জনৈক সাধক বাউল দাসের স্মৃতিতে উৎসব ও তদুপলক্ষে বাউল দাসের আশ্রম সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। এই উৎসব ও মেলাটি বেশ প্রাচীন।

আশেপাশের প্রায় কুড়ি মাইলের মধ্যবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বশ্রেণীর নরনারী, বিশেষতঃ বৈরাগী, সাধু-সন্ন্যাসীগণ হাটিয়া এই মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন; মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কুড়ি পাঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, বাসনকোসন, লোহা ও কাঁচের জিনিসপত্র, বই-ছবি, কৃষি সংক্রান্ত জিনিসপত্র, কারুশিল্পজাত দ্রব্য, বাঁশের তৈয়ারী নানাবিধ জিনিসপত্র, মাটির খেলনা ইত্যাদির দোকানপাটও বসে। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, কীর্তন, রামায়ণ পাঠ এবং কোন কোন বৎসর কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়। শ্রোতা ও দর্শকের সংখ্যা প্রায় এক হাজার।

(মোছল্লী পীর)

চৈত্র মাসে পীর মোছল্লী সাহেবের উরস্ উৎসব উপলক্ষে সরডাঙ্গা গ্রামে দুইদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। উৎসবটির মত মেলাটি খুব বেশী দিনের প্রাচীন নয়। আশেপাশের গ্রাম হইতে সাধারণতঃ কৃষক শ্রেণীই এই মেলাতে আসেন। মেলায় মাত্র কয়েক খানি দোকানপাট বসে এবং উহার অধিকাংশ খাবারের দোকান। তাহাছাড়া, কাটাকাপড়, মাটির হাঁড়িকুড়ি, ধামা-কুলা এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দুই-একটি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা ও জলসা অনুষ্ঠিত হয়।

(রাধামোহন ঠাকুর)

মালিহাটি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের রাম নবমী তিথিতে বৈষ্ণব সাধক রাধামোহন গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে প্রায় কুড়ি বিঘা জমি জুড়িয়া দুইদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ টেনিয়া, তালিবপুর, সালার, প্রসাদপুর, শালিন্দা প্রভৃতি আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

উপরোক্ত গ্রামাঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মোট চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খাবারের দোকান। ইহাভিন্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, গামছা, কৃষি যন্ত্রপাতি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল ও কাঠের পুতুল, বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্রামে শ্রীগোপাল দাস রায়ের যাত্রাদল এবং শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র পাল ও শ্রীঅনুকূল সাহার দুইটি কীর্তনের দল আছে।

(হজরত পীর)

প্রতি বৎসর ১০ই ফাল্গুন হজরত পীর গদাই বাদশাহ রহমতুল্লা আলাহহে-এর বাৎসরিক উরস্ উৎসব উপলক্ষে তালিবপুর গ্রামে পীরের সমাধি সংলগ্ন প্রায় দশ বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ তালিবপুর, কাগ্রাম, সালার, মালিহাটি, টেনিয়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রধানতঃ মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী করিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটখানি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, তেলেভাজা, তাঁতের শাড়ী, গামছা প্রভৃতি মেলায় বিক্রয় হয়।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা, থিয়েটার, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।

কালীপূজার মেলা

এড়েরা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের যে-কোন মঙ্গলবার কালীপূজা উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন স্থানে দুইদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে দশ-বার শত যাত্রীর সমাগম হয় এবং মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের মাত্র দশ-পনরটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়. তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় বোলান গানের আসর বসে। স্থানীয় একটি দল বোলান গান করিয়া থাকেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

প্রতি বৎসর চৈত্রমাসে জঙ্গলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে জাউলিয়া গ্রামে জঙ্গলেশ্বর শিবমন্দির চত্বরে ও তৎসংলগ্ন তিন-চার বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। জমির কিয়দংশ দেবোত্তর এবং কিয়দংশ ব্যক্তি-বিশেষের। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ সোনরুন্দী, লোহারুন্দী, কন্দনাগ শিবপাড়া, এড়েরা, শিমুলিয়া, দক্ষিণখণ্ড, পুনাসী, জলসুতি, শুরুন্দী, বালুটিয়া প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ-ছয় শত নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ প্রতি বৎসর কাটোয়া ও নবদ্বীপ হইতে আসেন।

মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ছুরি-কাঁচি, বই-ছবি, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা প্রভৃতির দোকানপাট ও দুই-চারিটি পান-বিড়ি-সিগারেটের দোকান বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী, জুয়া, যাত্রাভিনয় ও কীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে, অধিকারীর নাম—শ্রীরতি কান্ত পাল। কীর্তনের দল দক্ষিণ খণ্ড গ্রাম হইতে আসে, মূল গায়েনের নাম শ্রীযামিনী মুখোপাধ্যায়, পোঃ দক্ষিণ খণ্ড।

চণ্ডীপূজার মেলা

জাখনী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে যখিন চণ্ডীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে পূজা

প্রাঙ্গণে দুই-তিনদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের দুই-চারিটি গ্রাম হইতে প্রায় তিন শত নরনারী আসেন এবং খাবার, মনিহারী ও কারুশিল্পজাত দ্রব্যের মাত্র দশ-পনরটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য হরিনাম সংকীর্তন ও কবি গানের আয়োজন করা হয়। গ্রামেই একটি কীর্তনের দল আছে।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা

প্রতি-বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা উপলক্ষে কাগ্রামে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে পার্শ্ববর্তী সালার, তালিবপুর, মৌগ্রাম, গঙ্গাটিকুরী প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ হাঁটিয়া, ট্রেণে, নৌকায় ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়। দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, কাপড়-গামছা, বই-ছবি, কবিরাজী-হাকিমী ও টোট্‌কা ঔষধপত্র এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী, যাত্রাগান, থিয়েটার, কবিগান, জলসা, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেরই যাত্রা ও থিয়েটারের দল আছে।

ধর্মরাজপূজার মেলা

কড়েয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে কড়েয়াচণ্ডীতলা সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা পরিমাণ জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

সিজগ্রাম, আমলাই, আস্‌লা প্রভৃতি নিকটবর্তী গ্রামগুলি হইতে মেলায় চার-পাঁচশত নরনারী এবং বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় পনর-কুড়িটি দোকান বসে এবং দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুঁড়ি এবং বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর গ্রামবাসী নিজেরাই থিয়েটার বা যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন।

গুন্দিরিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। খাবার, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের মাত্র পনর-ষোলটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়। দোকানদারগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

এই মেলায় কোনরূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা নাই।

পুরগ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজপূজা উপলক্ষে ধর্মরাজ মন্দির প্রাঙ্গণে এবং জেলাবোর্ডের রাস্তার দুইধারে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

আশেপাশের দশ-বারো মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমান।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ আশেপাশের শহরাঞ্চল ও বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, তামা, লোহা, কাঁচ, পিতল ও এ্যালুমিনিয়ামের বাসনকোসন, কাপড়চোপড়,

লুঙ্গি, গামছা, সতরঞ্চি, কৃষি যন্ত্রপাতি, বই-ছবি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী দ্রব্য সামগ্রী, হুকা এবং ওল, কাঁকুর, ফুটি প্রভৃতি ফলমূল আমদানী হইয়া থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় ও জুয়া খেলা হয়। কোন কোন বৎসর কবিগান, বাউল গান ও বোলানগানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামের একটি দল যাত্রাভিনয় করে। ইহাভিন্ন, কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আনা হয়।

মহোৎসবের মেলা

স্বর্ণহাটী গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অষ্টমপ্রহর নামসংকীর্তন মহোৎসব উপলক্ষে বারোয়ারী তলায় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। মেলায় সাধারণতঃ তালগ্রাম, গড্ডা, মালিহাটী ও বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানা হইতে বহু নরনারী ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকজন আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় খাবার, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের পনর-ষোলটি দোকান বসে এবং ছয়-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

রাধামোহন জীউ পূজার মেলা

কাঞ্চন গড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে রাধামোহন জীউর বাৎসরিক পূজা উপলক্ষে রাধামোহন মন্দিরের দক্ষিণাংশে দেবোত্তর প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। শোনা যায়, পরম বৈষ্ণব দ্বিজহরি ঠাকুর মেলাটি প্রবর্তন করেন; তবে বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামার ফলে মাঝে কিছুকালের জন্য ইহা বন্ধ হইয়া যায়। গত বাইত্রিশ বৎসর পূর্বে ইহার পুনঃপ্রবর্তন করা হইয়াছে এবং সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর নিয়মিত মেলা বসিতেছে। মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার নরনারী আসেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ধামা-কুলা, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়িকুড়ির মোট প্রায় ত্রিশখানি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ, কান্দী, বেলডাঙ্গা, শক্তিপুর, আমলাই প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে কোন তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং লটারী ও জুয়া খেলা হয়।

শিবরাত্রির মেলা

শিশুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে শিশুয়েশ্বর শিবমন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মালিহাটি, মাঘার, গঙ্গাটিকুরী, কাগ্রাম, তালিবপুর, সিমুলিয়া, তালগ্রাম এবং বহরমপুর হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামগুলি হইতে এবং বহরমপুর হইতে প্রতি বৎসর আসেন। খাবার ও মনিহারী দ্রব্যই মেলায় বেশী আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং রামায়ণ গান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রসাদপুর নিবাসী শ্রীব্যোমকেশ গাঙ্গুলী মহাশয় রামায়ণ গান করিয়া থাকেন এবং গ্রামেরই একটি যাত্রাদল যাত্রাভিনয় করেন।

শিশুয়েশ্বর মন্দির সংস্কার সমিতি কর্তৃক মেলাটি পরিচালিত হয় এবং উক্ত সমিতির পক্ষ হইতে মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

সরস্বতীপুজার মেলা

গড্ডা-সিংহারি গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর চারদিন ব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

মালিয়ান্দি, তারাপুর, সোনাভারাই, বৈদ্যনাথপুর, শ্যামপুর, চাঁদোয়া, কাশীপুর, শুকদানপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রতিদিন প্রায় চারিশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবার ও মনিহারী দ্রব্যের মাত্র দশ-পনরটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

।। নদীয়া ।।

মানচিত্রে
নদীয়া জিলার
পুজা-পার্বণ ও মেলা

পূজা পার্বণের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, গন্ধেশ্বরী, গৌরী প্রভৃতি … … … …

শিব, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি … … … … … …

ধর্মরাজ-গাজন প্রভৃতি … … … … … … …

বিশালাক্ষী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চণ্ডী, মনসা, (বিষহরি) শীতলা, ষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী
গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি … … … … … … …

কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি … … … …

রাস, দোল, ঝুলন, পঞ্চমদোল, গোপাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ফুলদোল, স্নানযাত্রা প্রভৃতি … …

স্নানাদি — বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, উত্তরায়ণ, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি … …

অনন্তচতুর্দশী, অক্ষয়তৃতীয়া, নববর্ষ, বৈশাখীপূর্ণিমা, ভীমএকাদশী
জামাইষষ্ঠী, অম্বুবাচী প্রভৃতি … … … … … … …

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি … … … … … …

আদিবাসীদের উৎসবাদি — বাঁধনা, করমপূজা, মারাংবুরু প্রভৃতি … … … …

পীরের উরস … … … … … … … …

সাধুসন্তদের আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসবাদি … … … … … …

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি … … … … … … …

জৈনদের যাবতীয় উৎসবাদি … … … … … … …

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি … … … … … … …

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, মহামায়া, গন্ধেশ্বরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, যুগাদ্যা, গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি ... ...

চড়ক, গাজন, গম্ভীরা ... ...

শিব, শিবরাত্রি, ব্রহ্মা, কার্তিক, গণেশ, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি ... ...

রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, গোষ্ঠাষ্টমী, রামনবমী, মহোৎসব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি ...

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

পৌষসংক্রান্তি, পৌষপার্বণ, মাঘীপূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অম্বুবাচী, বৈশাখীপূর্ণিমা, নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া, অনন্ত চতুর্দশী, উত্তরায়ণ স্নান প্রভৃতি ... ...

আদিবাসীদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

ধর্মরাজের গাজন ... ...

সাধু-সন্ত ও পীরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব ... ...

বিবিধ পূজা ও উৎসব ... ...

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট ...

১,০০০ পর্যন্ত ... ...

১,০০১ — ২,৫০০ ...

২,৫০১ — ৫,০০০ ...

৫,০০১ — ১৫,০০০ ...

১৫,০০১ — ২৫,০০০ ...

২৫,০০১ এবং ঊর্ধ্বে ...

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

মাস	প্রতীক
বৈশাখ	①
জ্যৈষ্ঠ	②
আষাঢ়	③
শ্রাবণ	④
ভাদ্র	⑤
আশ্বিন	⑥
কার্তিক	⑦
অগ্রহায়ণ	⑧
পৌষ	⑨
মাঘ	⑩
ফাল্গুন	⑪
চৈত্র	⑫
চান্দ্রমাস	●
মাস অনির্দিষ্ট	◉

মেলার মাসপঞ্জী
জিলা নদীয়া
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা
জিলার ,,
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে
প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। প্রকাশক।

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি ... ...

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি ... ...

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ... ...

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা ... ...

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধিমন্দির ... ...

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল ... ...

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল .. ..

প্রতীকগোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস
জিলা নদীয়া
উত্তর
সাংকেতিক
আন্তর্জাতিক সীমানা ...
জিলার ,, ...
মহকুমার ,, ...
থানার ,, ...
মৌজার অবস্থিতি ০
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক।
যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা ভক্ত সমাগম হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

জেলা : নদীয়া
থানা : কৃষ্ণনগর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সাধনপাড়া। ৩।৬০০·৯৫।৩৫৯।১,৯৯৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কাঁসারী, গোয়ালা, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, কুনো ও মুচি।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যথা, কাঁসারী-পাড়া, কুমারপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বুনোপাড়া ও মুচিপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুড়াগাছা হইতে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গুড়গুড়িয়া নদীর উপর সাঁকো পার হইয়া এই গ্রামে পৌছান যায়। কেবল মাত্র বর্ষাকালে গুড়গুড়িয়া নদীতে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে নাম-কীর্তন মহোৎসব, দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

সরস্বতীপূজা উপলক্ষে থিয়েটার ও যাত্রা-ভিনয়, মহোৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন ও সর্বজনীন ভোজ এবং দোল উৎসব উপলক্ষে মাটির পুতুলের মাধ্যমে একটি প্রদর্শনী খোলা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীবক্রেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
সাধনপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বহিরগাছি, নদীয়া।

২। গ্রাম : সোনাডাঙ্গা।১১।১,৪৪৮·৫১।৭৪৯।৪,২৫১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধুবুলিয়া। নবনির্মিত মায়াপুর-ধুবুলিয়া জাতীয় সড়ক দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং চান্দ্র মাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব। মহরম উৎসবটি এই গ্রামের এবং আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের সর্বজনীন উৎসব। মহরম মাসের ৭ই হইতে ৯ই তারিখ পর্যন্ত গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় লাঠি খেলা হয় এবং ১০ই তারিখে গ্রামের মানিকপীর তলায় লাঠি খেলিতে ও খেলা দেখিতে বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকের সমাগম হয়। এই গ্রামে মহরমের লাঠি খেলা প্রসিদ্ধ। মহরম উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসর এবং দুর্গাপূজাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মহরমের মেলা। মহরম মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সর্বসাধারণের একটি শিব মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে; শিবের নিত্যপূজা হয়। ইহাছাড়া, মানিকপীরের স্থান আছে।

গ্রামটি বহু কালের প্রাচীন। গঙ্গা নদীতে চড়া পড়িয়া সৃষ্ট এই ভূখণ্ডে ভাল ফসলাদি হইত বলিয়া সম্ভবতঃ পূর্বে লোকে এই স্থানটিকে সোনাডাঙ্গা, বলিতেন। সোনাডাঙ্গা বর্তমানে সোনডাঙ্গায় পরিণত হইয়াছে।

শ্রীনির্মল কুমার মুখোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
সোনাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নদীয়া।

৩। গ্রাম : চুয়াখালি। ২৩।৪৪৯·২৫।১২২।৬৯৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, কামার, কুমার, ধোপা, কলু, বাগ্দী, গন্ধবণিক, মুচি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধুবুলিয়া ও মোটরবাস ষ্ট্যাণ্ড সিংহাটী। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা

রাস্তা আছে। গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জলঙ্গী নদীতে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) গ্রামে অগ্রহায়ণ মাসে বাগ্দীপাড়ায়, কামার পাড়ায় ও গোপপাড়ায় তিনটি জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। ইহাছাড়া, অগ্রহায়ণ মাসের যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার একযোগে বাস্তুকালী ও রূপাইচণ্ডী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মাঘ মাসে গোপপাড়ায় অষ্টমপ্রহরব্যাপী নাম-কীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন গ্রাম হইতে কীর্তনীয়ার দল আসেন এবং "অন্নদামঙ্গল"—কাব্যে উল্লিখিত বড়গাছি গ্রামের বাবাজী শালগ্রামশিলাসহ উৎসবে যোগদান করেন।

চৈত্র মাসে নীলপূজা ও চড়ক পূজা হয়। চড়ক উপলক্ষে চৈত্র মাসের দশ-বার দিন পাড়ায় পাড়ায় সঙ্ বাহির হয় এবং সংক্রান্তির দিন শিবপূজা, সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীগণ কর্তৃক বাণফোঁড়া, আগুনঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ এবং বোলান গান ও নৃত্যগীত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন ও প্রাচীন।

ইহাছাড়া, গ্রামের বাগ্দীপাড়ায় কালীপূজা ও মনসাপূজা উপলক্ষে তরজা ও কবিগান হইয়া থাকে।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রূপদহ, নদীয়া।

৪। গ্রাম : রূপদহ। ২৪।৫৭৮'৯৩।১৩৫।৭৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, কায়স্থ, কামার, মালো, বাগ্দী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে গোয়ালাপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মালোপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন ধুবুলিয়া নিকটবর্তী কৃষ্ণনগর-মুর্শিদাবাদ রোড দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গ্রাম্যকালী ও রূপাইকালীর পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন। দুর্গাপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা ব্যক্তি-বিশেষের এবং যথাক্রমে পঁচিশ ও পনর বৎসরের প্রাচীন অন্যান্য পূজাগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) কালী (রূপাই কালী) পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে। মেলাটি প্রায় পনর বৎসরের প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রূপাইকালী ও গ্রাম্যকালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামের নাম রূপদহ। রূপাই বিলের পাশে অবস্থিত বলিয়া গ্রামের নাম রূপদহ হইয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, রূপদহ গ্রামের অদূরবর্তী সাহেব-তলা গ্রামে কাটারী ফকির সাহেব নামে একজন মুসলমান ফকিরের আস্তানা ছিল। উক্ত পীর সাহেব অনুমান সাত-আট শত বৎসর পূর্বে উল্লিখিত আস্তানায় সাধন-ভজনে সিদ্ধিলাভ করেন এবং ঐ স্থানেই দেহরক্ষা করেন।

অদ্যাবধি তাঁহার আস্তানায় সময় সময়ে উৎসব উপলক্ষে বহু লোক সমাগম হয় ও মেলা বসে। পীরের নিকট মানত করিলে গৃহপালিত গো-মহিষাদি ও পশুপক্ষীর সর্বপ্রকার ব্যাধির নিরাময় হয় বলিয়া স্থানীয় অধিবাসীগণের বিশ্বাস। এইরূপ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করিয়া আজিও এই অঞ্চলের গৃহস্থেরা গৃহপালিত জীবজন্তুর কোন প্রকার রোগ-ব্যাধি দেখা দিলে উক্ত কাটারী পীরের আস্তানায়

মানসিক করিয়া থাকেন। শুনা যায়, উক্ত পীরের একটি স্বর্ণনির্মিত ও একটি রৌপ্যনির্মিত বৃষ ছিল। কোন কারণে উহাদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে তাহাদের খুরের আঘাতে সাতটি দহের অর্থাৎ গভীর জলাশয়ের সৃষ্টি হয়। দহগুলির নাম,—কালীয়াদহ, বেলিয়াদহ, আমলাদহ, গোবিন্দদহ, রূপারদহ, পাথরদহ, ও সোনাদহ। দহগুলি আজও বিদ্যমান। রূপারদহের পাশে বহু প্রাচীন হিজলী বৃক্ষের নীচে আজও রূপাই-কালীর পূজা হইয়া থাকে। ইতিহাস বর্ণিত শালীগ্রাম (মহারাজ শালীবাহনের আবাসভূমি বলিয়া খ্যাত) হইতে কয়েক ঘর গোপজাতীয় গৃহস্থ সর্বপ্রথম এই স্থানে বসতি স্থাপন করিয়া গ্রামের পত্তন করেন।

শ্রীমতী আনন্দময়ী দেবী,
শ্রীযামিনী কান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
শ্রীঅমল বন্দ্যোপাধ্যায়,
গ্রাম ও পোঃ রূপদহ, নদীয়া।

৬। গ্রাম : স্বুবর্ণ বেহার।

৫৪।৩,১২২ ৪৯।১,১৩১।৪,৭৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, গোয়ালা, যুগি, কাপালী, জেলে, বাগ্দী ও নমঃশূদ্র।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে; যেমন, ঘোষ-পাড়া, বাগ্দীপাড়া, গোয়ালাপাড়া, কাপালীপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আমঘাটা। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া পাকারাস্তা চলিয়া গিয়াছে। ঐ রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। কৃষ্ণনগরের মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় বাইশ বিঘা দেবোত্তর জমির আয় হইতে শিবের পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) কথিত আছে এই গ্রামে বহু প্রাচীনকালে স্বর্ণ সেন নামক জনৈক রাজা বসবাস করিতেন বলিয়া গ্রামের নাম স্বুবর্ণবেহার হইয়াছে। উক্ত রাজার ভগ্ন রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে একটি মন্দিরে বর্তমানে গৌরনিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মায়াপুর গৌড়ীয় মঠের ব্যবস্থাপনায় উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা হয়।

গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের জগবন্ধু, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহ আছে।

শ্রীলালমোহন নাথ, শিক্ষক,
গ্রাম : স্বুবর্ণ বেহার,
পোঃ মহেশগঞ্জ, নদীয়া।

Subarnabehar (J.L. 54)—About 3 miles south-west of Krishnagar town is the ruin of an old temple, known as the Nrisinhadeba temple. The image of Nrisinhadeba, now housed in a recent temple, is supposed to be an ancient image of black alabaster, and is a fine example of carving. There are other extensive ruins in this village, covering about half an acre of land and 12 feet in height. This mound is supposed to be the ruin of an old Buddhist Bihara founded by the Pala Kings.

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. 169)

"আমঘাটা স্টেশনের নিকটে প্রাচীন স্বুবর্ণ বিহারের ধ্বংসাবশেষ অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বে এই স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পাল রাজবংশ কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বুবর্ণ বিহার নামটিই এই মতের সর্বাপেক্ষা প্রধান পোষক। এই ধ্বংসাবশেষ প্রায় দুই বিঘা জমি লইয়া বিস্তৃত এবং প্রায় ১০ হাত উচ্চ। ইহা ইষ্টক ও প্রস্তর খণ্ডের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। এই স্তূপ হইতে বহু ইষ্টকাদি লইয়া

স্থানীয় অধিবাসিগণ গৃহ নির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যে লাগাইয়াছে।

প্রবাদ যে, প্রাচীন কালে এখানে সুবর্ণ নামে একজন কুম্ভকার জাতীয় রাজা বাস করিতেন। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি সপরিবারে মৃত্তিকা নিম্নস্থ নিরাপদ গৃহে প্রবেশ করেন এবং পরে দৈব দুর্ঘটনা বশতঃ নির্গমনের পথ না পাইয়া সেখানেই চিরদিনের জন্য সপরিবারে সমাহিত হন।

বর্ত্তমানে সুবর্ণ বিহারের ধ্বংস স্তূপের উপর গৌড়ীয় মঠ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক একটি মন্দির নির্মিত হইয়া উহার মধ্যে রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ নিত্য সেবা প্রাপ্ত হইতেছেন।"

(বাংলায় ভ্রমণ: ২য় খণ্ড পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার কর্তৃক ১৩৪০ সাল প্রকাশিত, পৃঃ ২৫৭)

৭। গ্রাম: হরিশপুর (মৌজাঃ সুবর্ণ বেহার)।

৫৪।৩,১২২।৪৯।১,১৩১।৪,৭৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, ছুতার, বুনা, নাপিত ও বাগ্দী।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইলের মধ্যে কৃষ্ণনগর রোড রেলস্টেশন। কৃষ্ণনগর শহর হইতে একটি পাকা রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া নবদ্বীপ পর্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তায় নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রাম হইতে প্রায় আধ মাইল দূরে জলঙ্গী নদী প্রবাহিত থাকায় নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে একযোগে পঞ্চানন্দ ও রক্ষাকালীপূজা, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীতে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে শিবপূজা এবং শীতলা, মনসা ইত্যাদি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মাঘ মাসে পঞ্চানন্দ ও রক্ষাকালী পূজাটি এই গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন সর্বজনীন উৎসব। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের যে-কোন মঙ্গলবার সাড়ম্বরে এই পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন দেবতার স্থানে ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজাটি একদিনের বটে, তবে তিন-চারদিনব্যাপী উৎসব স্থায়ী হয়। উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন ভোজ ও কবিগানের আয়োজন করা হয়। সেবায়েত জনৈক বর্গক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।

(ঙ) পঞ্চানন্দপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিন-চার-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীঅদ্বৈত নাথ নাথ, প্রধান শিক্ষক,
হরিশপুর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

৮। গ্রাম: দেপাড়া (মৌজাঃ সুবর্ণ বেহার)।

৫৪।৩,১২২।৪৯।১,১৩১।৪,৭৪৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে কৃষ্ণনগর সিটি এবং তিন মাইল দূরে কৃষ্ণনগর রোড রেলস্টেশন। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া কৃষ্ণনগর হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে নৃসিংহদেবের বার্ষিক পূজা ও উৎসব। উৎসবটি প্রায় আড়াই-তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) নৃসিংহদেব পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুই আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে নৃসিংহদেবের মন্দির ও একটি পঞ্চানন ঠাকুর আছে। নৃসিংহদেবের বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত থাকায় গ্রামটি পূর্বে দেবপাড়া নামে খ্যাত ছিল। বর্তমানে দেবপাড়া অপভ্রংশে দেপাড়া হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত নাথ নাথ, প্রধান শিক্ষক,
হরিশপুর বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

"কৃষ্ণনগর হইতে তিন মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে দেবপল্লী বা দেপাড়া নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে। এই স্থানে নৃসিংহদেবের একটি অতি প্রাচীন বিগ্রহ আছে। এতদঞ্চলে এই নৃসিংহের মাহাত্ম্য খুব বেশী। ইঁহার প্রসাদী অন্নের দ্বারা স্থানীয় নবজাত শিশুর অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে। নদীয়া রাজ বংশের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় হইতে এই দেববিগ্রহের নিত্যসেবা হয়। এই বিগ্রহ কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত তাহা জানা যায় নাই। স্থানীয় লোকে ইঁহাকে অনাদি বা স্বয়ং-প্রকাশ বলিয়া বিশ্বাস করেন। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এখানে উৎসব হইয়া থাকে।

পথের পার্শ্বে একটি জঙ্গলাবৃত উচ্চ ভূখণ্ডের একাংশে নৃসিংহদেবের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটিও অতি প্রাচীন। মন্দির প্রাঙ্গনটির ইতস্ততঃ ভগ্ন প্রস্তর ও ইষ্টক পড়িয়া আছে। অনুমান হয়, বহু পূর্বে এই দেবতার মন্দির হয়ত খুবই বড় ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষের উপরই বর্তমান মন্দির নির্মিত হইয়াছে। প্রাঙ্গনের একদিকে কয়েক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ বেলে পাথর পড়িয়া আছে; ইষ্টকস্তূপের মধ্যে নানা মাপের ইট দেখিতে পাওয়া যায়, উহাদের মধ্যে কতকগুলি আবার অতি প্রাচীন ও কারুকার্য্যখচিত।

নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি এক বৃহৎ কষ্টি পাথরের উপর খোদিত। ইহার উচ্চতা প্রায় চারি ফুট; পদতলে প্রহ্লাদ ও অঙ্কে হিরণ্যকশিপু অবস্থিত। বহু স্থানেই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি ঘটিয়াছে। সাধারণতঃ অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা হয় না, কিন্তু লোকে এই বিগ্রহকে "অনাদি" বলিয়া বিশ্বাস করে বলিয়া ইহার পূজা যথা নিয়মে চলিয়া আসিতেছে। জনশ্রুতি যে এই মূর্ত্তির অঙ্গে একখানি পরশ পাথর ছিল, জনৈক লোভী সন্ন্যাসী উহা অপহরণ করিবার জন্যই মূর্ত্তিটির অঙ্গহানি ঘটাইয়াছে।

দেপাড়া গ্রামটি একটি প্রকাণ্ড বিলের পার্শ্বে অবস্থিত। এই বিলের একাংশের নাম চামটার বিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এই বিল হইতে একটি ব্রোঞ্জ ধাতু নির্মিত অতি সুন্দর উগ্রতারা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। অনেকে অনুমান করেন যে চাম্‌টার বিল কথাটি সম্ভবতঃ চামুণ্ডার বিল কথার অপভ্রংশ। এককালে হয়ত এই বিলের নিকটে কোন স্থানে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির ছিল।"

(বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ২৫১-২৫২)

শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় মহাশয়ের রচিত "আমাদের গ্রাম" পুস্তিকা হইতে "দেপাড়া" সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী উদ্ধৃত করা হইল :—

"দেবপল্লী বা দেপাড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। কৃষ্ণনগর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল দূরে এই প্রাচীন গ্রামটি অবস্থিত। বহু আগে এখানে লোকের বসবাস ছিল বলে মনে হয়। কারণ অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ উঁচু উঁচু ভিটা এখনও দেখতে পাওয়া যায়।……

গ্রাম হিসাবে দেপাড়া যে খুব নামকরা বড় গ্রাম ছিল তা মনে হয় না—এখানকার নৃসিংহদেবের মন্দিরই স্থানটির প্রাচীনত্ব, ইতিহাস এবং গ্রামের নাম শুধু যে বজায় রেখেছে তা নয়, লোক চক্ষের সম্মুখে তুলে ধরে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। চিরস্মরণীয় করে রেখেছে গ্রামটিকে। দেবপল্লী বা দেপাড়া মানেই নৃসিংহদেবের মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি সম্বন্ধে বহু প্রবাদ, বহু কথা এতদঞ্চলে প্রচারিত আছে।

লোকে বলে এই মূর্ত্তি বা বিগ্রহ অনাদি বা স্বয়ং প্রকাশ। এই প্রসঙ্গে এক প্রচলিত কাহিনী আজও এসব জায়গায় চলে আসছে যে বহুদিন আগে গোয়ালাদের একটি গরুর দুধ কম হচ্ছে দেখে গোয়ালা গরুটির প্রতি নজর রাখতে শুরু করে। গরু পালে চড়'তে চড়'তে হঠাৎ কোথায় চলে যায় আর একটু পরেই ফিরে আসে। কয়েকদিন লক্ষ্য করে

গরুটির পিছু পিছু গোয়ালা গিয়ে দেখে যে একটি জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে গরুটি গিয়ে একটি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায় দাঁড়ায় এবং গরুর বাঁট হ'তে আপনা আপনি দুধ সেই উঁচু স্থানটির ওপর পড়ছে। কয়েকদিন লক্ষ্য করার পর গরুর মালিক সেই স্থানটি খনন করে নৃসিংহদেবের এই বিগ্রহ বা মূর্তিটি পান। তারপর সেই মূর্তির পূজা সেই হতে আজও হ'য়ে আসছে সমানে। এই নৃসিংহদেবের মাহাত্ম্য এতদ্অঞ্চলে খুব বেশী। কবে যে এই বিগ্রহ কার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তা জানা যায় নি। তবে নদীয়ার রাজবংশের প্রদত্ত ভূসম্পত্তির আয় হ'তে এই দেব বিগ্রহের নিত্য সেবা হয়ে থাকে। মন্দির গৃহটি পুরাতন বটে তবে খুব প্রাচীন নয়। বর্তমান মন্দির গৃহের পাদদেশে লিপিবদ্ধ আছে—

শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবো জয়তি।
নাগেন্দুগজ ভূশাকে শ্রীনৃসিংহ পদাশ্রিতঃ।
শ্রীক্ষিতীশো নৃসিংহস্য সংশ্চক্রে মন্দিরং নৃপ ॥
শকাব্দাঃ ১৮১৮।
—Repaired in 1896"

৯। গ্রাম ঃ আনন্দবাস (মৌজা ঃ ভালুকা)।

৬৮।২,৪৬৩'৩৭।৮৫৭।৫,৩৮১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে স্বরূপগঞ্জ রেলস্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে এবং স্বরূপগঞ্জ হইতে আনন্দবাস পর্যন্ত দুইটি জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে। গ্রাম হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে ভালুকা গ্রাম হইতে মোটরবাস পাওয়া যায়। গঙ্গা নদী সন্নিকটে থাকায় মালবাহী নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরার স্নান, পৌষসংক্রান্তিতে উত্তরায়ণের স্নান, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চান্দ্র মাসানুযায়ী মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দশহরা স্নানের মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) ×

শ্রীমনোমোহন ভট্টাচার্য্য, প্রধান শিক্ষক,
আনন্দবাস প্রাথমিক বিদ্যালয়, নদীয়া।

১০। গ্রাম ঃ ভালুকা।

৬৮।২,৪৬৩'৩৭।৮৫৭।৫,৩৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, গোয়ালা, কামার, কুমার, জেলে, মালো, ছুতার, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন, বৈষ্ণবপাড়া, মালোপাড়া, গোয়ালাপাড়া, কামারপাড়া, কুমার পাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আমঘাটা। কৃষ্ণনগর হইতে ভালুকা পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। গোয়ারী হইতে ভালুকা পর্যন্ত প্রত্যহ মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) পয়লা বৈশাখ নববর্ষ উপলক্ষে ভগবতী যাত্রা, হরগৌরীপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে কালাচাঁদের দোল, চৈত্র মাসে শিবের গাজন এবং চান্দ্র মাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা উৎসটি ব্যক্তি বিশেষের এবং গত পাঁচ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য উৎসবগুলি সর্বজনীন। ভগবতী পূজাটি বহুকালের প্রাচীন এবং কালাচাঁদের দোল উৎসবটি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বদান্যতায় আরম্ভ হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি গত প্রায় চার-পাঁচ বৎসর আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীরাধাশ্যাম কর্মকার, প্রধান শিক্ষক,
ভালুকা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ জোয়ানীয়া ভালুকা, নদীয়া।

১১। গ্রাম : কৃষ্ণনগর।

৯২।৪,৮৫৪'৯৬।৪৩।২,৩৫৪

(ক) হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর সিটি।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলপূর্ণিমার পরবর্তী শুক্লা একাদশীতিথিতে বারদোল উৎসব হয়। উৎসবটি এতদঞ্চলে একটি বিশেষ উৎসব এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বারদোলের মেলা। চৈত্র মাসে একমাস ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

কৃষ্ণনগরের পূর্বনাম ছিল রেউই। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বতন পুরুষ মহারাজ রুদ্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামানুসারে রেউইয়ের নাম কৃষ্ণনগর রাখেন। নদীয়ার রাজারা আদিশূর আনীত পঞ্চব্রাহ্মণের নেতা কাণ্যকুব্জ প্রদেশের শিতীশ নামক রাজাপুর ভট্টনারায়ণের বংশজ-এর একাদশ পুরুষ পর্যন্ত সম্পত্তি ভোগ দখল মোট তিনশত বাইশ বৎসর। এই একাদশ পুরুষে কামদেবের জন্ম হয়। কামদেবের পুত্র ছিলেন বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথের পর রাজা কাশীনাথ ঘাতকের হাতে নিহত হইলে তাঁহার স্ত্রীকে বাগোয়ান পরগণায় জমিদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয় এবং সেখানে তাঁর পুত্র রামচন্দ্রের জন্ম হয়। হরেকৃষ্ণ সমাদ্দার নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া তাঁর সকল সম্পত্তি রামচন্দ্র লাভ করেন। রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গাদাস। এই দুর্গাদাসই ভবানন্দ মজুমদার নামে পরবর্তীকালে খ্যাত হন। ভবানন্দ জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহকে বাংলার শেষ স্বাধীন রাজা প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাহায্য করিয়া কয়েকটি পরগণা লাভ করেন। ভবানন্দের পর গোপাল এবং গোপালের পর রাঘব রাজ্যলাভ করেন।

রাঘব মাটিয়ারী হইতে রেউইয়ে রাজধানী স্থানান্তর করেন এবং রাঘবের পুত্র রুদ্র রেউইয়ের নাম পরিবর্তন করিয়া কৃষ্ণনগর করেন।

শ্রীনির্মল দত্ত,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

কৃষ্ণনগর শহরে বারদোল উৎসব ব্যতীত নির্দিষ্ট তিথিতে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, বিশ্বকর্মাপূজা, সরস্বতীপূজা, দোল, শিবরাত্রি, জগদ্ধাত্রীপূজা প্রভৃতি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

কৃষ্ণনগরের বারদোল উৎসব সম্পর্কে আনন্দ-বাজার পত্রিকা হইতে ও জগদ্ধাত্রী পূজা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য বিবরণী উৎসব বিবরণী অধ্যায় লিপিবদ্ধ করা হইল।

Krishnagar—Head-quarters of the district, situated in 23°24′ N. and 88°31′ E., on the left bank of the Jalangi, about 9 miles above its junction with the Bhāgirathi.

The town covers an area of about 6½ square miles, and its population was 50,042 in 1951, as compared with 25,550 in 1891 and 26,750 in 1872.

The original name of Krighnagar is believed to have been Reui. In this village a palace was erected by Mahārājā Rāghab, whose son Rudrā Rai changed the name to Krishnagar or Krishnanagar, in honour of Krishna. Since then the town has remained, almost continuously, the residence of the Mahārājā of Nadia. A Municipality was constituted in 1864 with 21 Municipal Commissioners, two-thirds of whom are elected and the remainder nominated.

Up till 1898 the town was without the benefit of a railway service, and the nearest railway station was Bagula, on the Eastern Bengal State Railway, with which it was connected by a metalled road about 11 miles in length, broken at Hānskhāli by the Churni river, which was unbridged and

had to be crossed in open ferry boats. In 1898 a light 2½ feet gauge railway was constructed from Krishnagar *via* Santipur to Aistolā Ghāt, on the right bank of the Churni, near Rānāghāt, and the Eastern Bengal State Railway ran a siding down to the opposite bank from Rānāghāt station. Finally in 1906 the Rānāghāt-Lalgola branch of the Eastern Bengal State Railway, with a station at Krishnagar, was opened, and the town was at last placed in direct railway communication with Calcutta.

Krishnagar contains the usual public offices. In addition to these buildings, there is a Government College affiliated to the Calcutta university. Attached to the college is a Collegiate school. The attendance at both these institutions has shown a steady increase since 1881.

The town is a Centre of Christian evangelistic enterprise: it is the head-quarters of a diocese of the Roman Catholic Church, and an important station of the Church Missionary Society, each of these bodies having its own church and schools. The Church of England Zenānā Mission also maintains here two dispensaries, a hospital and two schools.

The great Hindu swinging festival (Barādol) is celebrated in Krishnagar annually in March or April, when 12 idols, belonging to the Maharaja of Krishnagar and representing Sri Krishna in twelve different personalities, are brought together to the Rājbāri from different parts of the district and worshipped. Many thousand pilgrims assemble every year for this festival, and a fair lasting for three days is held simultaneously.

The town suffered some what severely in the great earthquake of 1897: some masonary buildings were destroyed and many were seriously damaged, including the Collectorate office, the main entrance of which collapsed.

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p xlvi—xlvii)

১২। গ্রাম : ঘূর্নী। ৯৫।৩১৯ ৭৮।৫৬।২৬১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে গোয়ালাপাড়া, বুনোপাড়া, মুচিপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কুমারপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া ইত্যাদি কতকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, শিল্প, চাকুরী ও ব্যবসায়।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই স্থানের পাল গোষ্ঠীর মৃৎশিল্প ব্যবসায় যথেষ্ট সুনাম আছে।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর সিটি। গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে। প্রকৃতপক্ষে ইহা কৃষ্ণনগর পৌর এলাকাভুক্ত। তাহাছাড়া, নদী পথে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে জলেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব (পেত্নী পুকুরের চড়ক নামে খ্যাত) ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাছাড়া স্বর্ণকার পাড়ায় ধর্মরাজতলায় ধর্মঠাকুরের পূজা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। দুর্গাপূজা ও কালীপূজা প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের এবং শিবরাত্রি উৎসব ও ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে।

ধর্মরাজপূজার মেলা।

(চ) গ্রামে জলেশ্বর শিবের মন্দির আছে। ইহাছাড়া, একটি প্রাচীন বৃহৎ নিমগাছের নীচে পীরের স্থান আছে। নিমগাছটির পাতা ও শাখা কেহ কদাপি ভাঙ্গেন না।

অধ্যাপক সন্তোষ কুমার রায়,
কৃষ্ণনগর কলেজ, নদীয়া।

Ghurni—The north-eastern suburb of the town of Krishnagar, famous for the manufacture of clay figures and models of remarkable excellence. The industry is carried on by a few men of Kumār or potter caste, and specimens of their work have received medals at the London and and Paris exhibitions. Ghurni is said to have been the birthplace of Gopāl Bhār, the celebrated jester of the court of Mahārājā Krishna Chandra."

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. xliv)

১৩। গ্রাম : আশাননগর।

১২৬।১,৯১৪।৬৭।৭৮৬।৪,৩৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, বৈদ্য, বৈশ্য, কপালী, মাহিষ্য, কুমার, কামার, ময়রা, তিলি, নাপিত, গোয়ালা, ছুতার, বাগ্দী, দুলে, বেহারা, পাটনী, বুনো, গড়াই, মুচি, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, সাঁওতাল ও মুসলমান।

গ্রামে সতের-আঠেরটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও কুটিরশিল্প।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় সাত মাইল দূরে মাজদিয়া এবং প্রায় নয় মাইল দূরে কৃষ্ণনগর সিটি রেলস্টেশন। নিকটবর্তী পি, ডব্লিউ, ডি-র রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে বিভিন্নপাড়ায় ছয়টি স্থানে সরস্বতীপূজা এবং গ্রামের নওদা পাড়ায় দোলপূর্ণিমার পরবর্তী দশমী তিথি হইতে আরম্ভ হইয়া এক সপ্তাহকালব্যাপী দশম দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাছাড়া, প্রতি বৎসর বসন্ত কালে নূতন বাজার কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে অষ্টমপ্রহর ব্যাপী হরিনাম যজ্ঞ মহোৎসব হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) অম্বুবাচীর মেলা। আষাঢ় মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে। মেলাটি গত ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

উল্লিখিত দুইটি ধর্মীয় মেলা ব্যতীত গত ১৯৫৬ খৃঃ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে এই গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী মেলা বসিতেছে।

(চ) গ্রামে সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ী এবং নূতন বাজার ও কর্মকারপাড়ায় আরো দুইটি কালীবাড়ী আছে। কর্মকারপাড়ায় কালীবাড়ীর সেবায়িনী শ্রীমতী রাধারাণী কর্মকার।

ইহাছাড়া, গ্রামে পঞ্চানন্দ তলায়, মনসাতলা, বুড়াশিবতলা, ষষ্ঠীতলা প্রভৃতি কয়েকটি দেবদেবীর স্থান ও ঘোড়াপীরের স্থান আছে। পীরের স্থানে প্রতি শনি-মঙ্গলবার অনেকে দুধ, বাতাসা ইত্যাদি দিয়া থাকেন। শোনা যায়, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে জনৈক পীর এই স্থানে দেহরক্ষা করিলে তাঁহাকে এখানেই সমাহিত করা হয়। তাঁহার সমাধির পাশে তাঁহার পত্নীকেও সমাহিত করা হয়। গ্রামের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মস্‌জিদ ও ঈদ্ উৎসবের সময় নামাজ পড়িবার জন্য একটি ঈদগাহ্ আছে।

শ্রীঅশ্বিনী কুমার মুখার্জী, শিক্ষক,
আশাননগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আশাননগর, নদীয়া।

জেলা ঃ নদীয়া

থানা ঃ কৃষ্ণনগর

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

রূপদহ গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের কোন এক মঙ্গলবারে গ্রামে অবস্থিত গ্রাম্য কালীর পূজা হয়। কালীর কোন মূর্তি নাই। নির্দিষ্ট স্থানে রক্ষিত একটি শিলাখণ্ডকে দক্ষিণাকালীর ধ্যানে যথারীতি পূজা করা হয়। পূজার দিন সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। ইহাছাড়া, মানতকারী অনেকেই ছাগ বলি দিয়া থাকেন। পূজারী, ব্রাহ্মণ। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

কালীপূজা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, প্রথম যখন এই গ্রামে বসতি আরম্ভ হয়, সেই সময় নবাগত গ্রামবাসীগণ একদিন জঙ্গলের মধ্যে একটি বিল্ব বৃক্ষের নীচে সদ্যপূজার নির্মাল্যাদি সহ একটি শিলাখণ্ড দেখিতে পান। কাহার দেবতা অনুসন্ধানে ব্যর্থ হইয়া গ্রামবাসীগণ নিজেরাই উক্ত শিলাখণ্ডকে দক্ষিণা কালী জ্ঞানে পূজা আরম্ভ করেন। বৈশাখ মাসে উৎসবের দিন রূপাই কালীরও পূজা হয়। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের কোন এক মঙ্গলবার গ্রামের সকল নরনারী ও শিশুগণ ঐ স্থানে সমবেত ভাবে ফলাহার করিয়া উৎসব পালন করেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

রূপদহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আছে। তৎসহ উৎসব কালে শিবের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজাদি হয়। উৎসবের সাতদিন পূর্ব হইতে গ্রামের কেহ কেহ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া সংযম পালন করেন। উৎসবের প্রথম দিন ভক্তরা নৃত্য-গীত ও বাদ্য সহকারে শিবলিঙ্গ মাথায় লইয়া এই গ্রাম ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়ান। দ্বিতীয় দিনে গাজন তলায় শিবের পূজা, নীলপূজা এবং পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া ভক্তরা আগুন ঝাঁপ ও দেহের বিভিন্ন স্থানে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া নানারূপ কৃচ্ছ সাধনা করিয়া থাকেন। তৃতীয় দিবসে চড়ক পূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

১লা বৈশাখ অন্নসত্রের এবং সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। প্রতি বৎসর উৎসব উপলক্ষে গোয়ালা সম্প্রদায় হইতে সেবায়েত নির্বাচন করা হয়।

চুয়াখালি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক পূজা এবং নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে সর্বসম্প্রদায়ের লোক যোগদান করেন। গাজনে সন্ন্যাসীর কেহ কেহ বানবিদ্ধ অবস্থায় কপালের উপর আগুন রাখিয়া কাঁটার খেলা দেখান। আবার কেহ কেহ সঙ্ সাজিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ কালে ঢাক-ঢোলের বাজনার সহিত বোলান গান করেন। উৎসব কালে খেলা বা গানের পর দশ-বার দিন যাবত চলে। শিবপূজায় অনেকে ভক্তদের ভোজন করান। মুসলমানরা চড়কের সময় হিন্দুদের পার্বণী দেন।

জগদ্ধাত্রীপূজা (কৃষ্ণনগর)

পশ্চিমবঙ্গে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা বলতে গেলে প্রথমেই কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের কথা উল্লেখ করতে হয়। কলিকাতায় এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার কোন কোন স্থানে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় বটে, তবে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এবং হুগলী জেলার চন্দননগরের মত এমন স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজনীন উৎসব বাংলাদেশের আর অন্য কোথায়ও দেখা যায় না। কৃষ্ণনগর এবং চন্দননগরের এই উৎসব আজ বাংলা দেশের একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক লোক উৎসবরূপে পরিগণিত।

বাংলাদেশে কৃষ্ণনগর জগদ্ধাত্রী পূজার আদি পীঠস্থান ব'লে কথিত। তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশে পূর্বে ব্যাপকভাবে এই পূজার কথা শুনা যায় না। অনেকের মতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এই

পূজার প্রথম প্রবর্তন করেন। এই সম্পর্কে বলা হয় যে, বকেয়া রাজস্বের দায়ে কোন এক সময় নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে বাংলাদেশের তৎকালীন নবাব আলিবর্দী খাঁ মুর্শিদাবাদে তলব করেন। রাজকার্য সেরে স্বদেশে ফেরার পথে স্বপ্নাদিষ্ট হ'য়ে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কৃষ্ণনগরের রাজবাটিতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক এই পূজা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। সে যাই হোক, তবে কৃষ্ণনগর থেকে ক্রমেই যে এই পূজা বাংলা-দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়, এ বিষয়ে অনেকেই একমত। সেই হিসাবে বিচার করলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাচীনত্ব আড়াই'শ থেকে তিন'শ বৎসরের বেশী হয় না।

চন্দননগরের তুলনায় কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার সংখ্যা অনেক বেশী। এখানে প্রায় প্রতিটি পল্লীতে ছোট বড় বহু পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে কতকগুলি যেমন পারিবারিক পূজা আছে, তেমন অনেকগুলি সর্বজনীন পূজাও আছে। রাজবাড়ী, মালোপাড়া, চাষীপাড়া, বালকেশ্বরী, তেই বাজার প্রভৃতি অঞ্চলের পূজাগুলি প্রাচীন এবং উল্লেখযোগ্য। চাষীপাড়ায় দেবীর পূজার নির্দিষ্ট মন্দির ও পাকা মণ্ডপ আছে এবং এ বৎসরের মূর্তিটি বৃহৎ ও ডাকের সাজের গহণায় সজ্জিত করা হ'য়েছিল। কৃষ্ণনগর হাইষ্ট্রীট, তেমাথায়, উকিলপাড়ায়, আমীন বাজারে, দত্ত কোম্পানাতে এবং পাত্রবাজারে এ বৎসর বিশেষ আড়ম্বরের সহিত জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সকল পূজাগুলিও কমপক্ষে একশত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন বলে জানলাম। এ ছাড়া কৃষ্ণনগরে এ বৎসর আট-দশটি নূতন বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় লোকের ধারণা—এ বৎসরের পূজার আড়ম্বর এবং জনসমাগম হয়েছে প্রচুর।

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রীপূজা মাত্র একদিনের। প্রতি বৎসর শারদীয়া নবমীর পরবর্তী শুক্লা নবমীতিথিতে দেবীর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীকল্পাদি পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরের দিন দশমী পূজার শেষে সাড়ম্বরে প্রতিমা বিসর্জন উৎসব পালিত হয়। বিজয়ার দিন প্রতিমা বিসর্জন দেখবার জন্য আশেপাশের গ্রাম ও নিকটবর্তী জেলা থেকে বহু লোকজন আসেন। এ বৎসরেও বিকালে রাস্তার দু'ধারে বহু নরনারীর সমাগম হয় এবং মনোমোহন ঘোষ রোড ও হাইষ্ট্রীটের সংযোগস্থল থেকে রাস্তার দু'ধারে খাবার, মনিহারী, প্লাস্টিকের খেলনা, বাঁশের বাঁশী প্রভৃতির কতকগুলি দোকানপাট বসে। গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই বিজয়া উৎসব চলে। জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে স্থানীয় বিদ্যালয়গুলি এমনকি অফিস আদালতও বন্ধ থাকে।

কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজা দেখতে গিয়ে প্রথমেই যে বস্তুর উপর লক্ষ্য পড়ে তা' হচ্ছে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে দেবীর বিভিন্ন রূপ মূর্তি। দেবী অবশ্য সর্বস্থানেই চতুর্ভুজা, তবে কোন স্থলে দেবীর বাহন সিংহের পদতলে হস্তী, কোন স্থলে কেবলমাত্রই সিংহ, আবার কোন স্থলে দেবী প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান এবং তাঁহার দুই ধারে দুইটি সিংহ মূর্তি। কোন স্থানে দেবী সিংহের গায়ে হেলান দিয়ে দণ্ডায়মান। স্টেশন থেকে আসার পথে একটি পূজামণ্ডপে দেখলাম দেবীর অসুর বিনাশী মূর্তি।

বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ঘুরতে ঘুরতে একসময় এসে দাঁড়ালাম কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীর গেটে। এখানে একটা কথা অকপটে স্বীকার করছি, আশা করি কেউ ত্রুটি গ্রহণ করবেন না। কেন জানিনা, রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী পূজা-উৎসব সম্পর্কে আমার ধারণাটা ছিল একটু অন্য রকম। উৎসবের সঙ্গে "রাজবাড়ী" কথাটার যোগ থাকার জন্যই বোধ হয় ভেবে ছিলাম উৎসব এবং উৎসব প্রাঙ্গণ একটু রাজসিক আড়ম্বর কিছু দেখতে পাবো। কিন্তু সেরকম কিছু দেখতে পেলাম না। সুবিশাল ইষ্টক নির্মিত চণ্ডীমণ্ডপের শেষপ্রান্তে একটি ছোট মূর্তি বসানো। সামনে প্রতিষ্ঠিত একটি ঘটের চারপাশে কতকগুলি ফুল-বিল্বপত্র ছড়ানো, আর কাঠের বারকোসে সামান্য কিছু নৈবেদ্য সাজান। পূজার বিরাট প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, জনশূন্য। মণ্ডপের একধারে একটি ছোট ন্যাংটা শিশু ঘুমুচ্ছে আর তারই পাশে বসে দু'তিনটে ছোট ছেলে মেয়ে খেলা করছে। অপরাহ্নে শীতের রোদ এসে পড়েছে ছেলেমেয়েগুলির গায়ে। নিরালঙ্কার দেবী, অনাড়ম্বর পূজার আয়োজন। সেকথা যাক, রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী মূর্তিটির কিন্তু একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম।

জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী নন, শ্বেতঅশ্ববাহিনী। দেবী ঘোড়ার উপর আড়াআড়িভাবে বসেননি, সোজাসুজি ঘোড়সওয়ারের মত বসেছেন। দেবীর চার হাতে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, তীর ও ধনুক। রাজবাড়ীর মূর্তি নির্মাণে এই চিরাচরিত রীতি। স্বপ্নে ঠিক এমনটি দেখেছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। তাই কৃষ্ণনগরের বিভিন্ন পল্লীতে জগদ্ধাত্রী মূর্তির রূপান্তর ঘটলেও, রাজবাড়ীর মূর্তির কোন রূপান্তর ঘটেনি। শুনলাম, রাজবাড়ীতে নাকি হাতীর দাঁতে নির্মিত দেবী মূর্তির একটি মডেল রক্ষিত আছে। এই মডেল দেখেই প্রতি বৎসর রাজবাড়ীর জগদ্ধাত্রী মূর্তি নির্মাণ করা হয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ঢাকা থেকে শিল্পী আনিয়ে নির্মাণ করিয়েছিলেন স্বপ্নাদিষ্ট দেবীমূর্তির মডেলে।......

(জগদ্ধাত্রীপূজা—কৃষ্ণনগর ও চন্দননগর, অরুণ কুমার রায়, মাসিক বসুমতী অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮।)

দুর্গাপূজা

"নদীয়া জেলার গাছা আদিবাসী আদর্শ পল্লীতে শঙ্কর মিশনের সহযোগিতায় গ্রামবাসীদের প্রচেষ্টায় গাছা আদিবাসী পল্লী সার্বজনীন দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতিদিন জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মহাষ্টমীর দিন ভোগডাঙ্গা গ্রামের আদিবাসী সম্প্রদায় সমস্ত রাত্রিব্যাপী কীর্তন গান করিয়া সকলকে আনন্দ প্রদান করে। মহানবমীর দিন এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শ্রীশিবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সভাপতি এবং শ্রীসি, পি, মুখার্জি প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভার পর দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা হয়।"

("আনন্দ বাজার পত্রিকা," ২০শে আশ্বিন, ১৩৬৭)

২৫শে আশ্বিন, ১৩৬৭ সনে 'যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত অপর একটি সংবাদে জানা যায়:

কৃষ্ণনগর, ৭ই অকটোবর—....................গাছা আদিবাসী সর্বজনীন দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রসাদ বিতরণ, কীর্তনাদি সভা ও দরিদ্র নারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। দরিদ্র নারায়ণ সেবা উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী প্রায় ৭৮ খানি গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ প্রসাদ গ্রহণ করেন।

নৃসিংহদেবপূজা

দেপাড়া গ্রামের এক প্রান্তে বড় রাস্তার ধারে বহু প্রাচীন নৃসিংহদেবের মন্দির। মন্দিরটি বারান্দাযুক্ত এবং দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২৪′ × ১৮′ ফুট। বর্তমান মন্দিরের অবস্থা খুবই জীর্ণ। মন্দিরের পাশেই একটি বৃহৎ দীঘি ও আশেপাশে কয়েকটি বৃহদাকার প্রাচীন বৃক্ষ আছে। মন্দির অভ্যন্তরে কালো পাথরে খোদিত চতুর্ভুজ নৃসিংহ-দেবের মূর্তি ও তৎসহ প্রার্থনারত প্রহ্লাদের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটির নানা স্থানে ভগ্ন। কিংবদন্তী কালাপাহাড়ের অত্যাচারের ফলেই দেব মূর্তির এইরূপ দুর্দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। মূর্তিটি ভূ-প্রথিত। জনশ্রুতি যে, ভূ-গর্ভে ১৮ হাত পর্যন্ত খনন করিয়াও মূর্তিটি তলদেশ পাওয়া যায় নাই। লোকের বিশ্বাস নৃসিংহদেব স্বয়ম্ভু। অনুমান করা হয়, ৭০০—১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন হিন্দু রাজা কর্তৃক এই মূর্তি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তারপর প্রায় দুই শত বৎসর পূর্বে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা মহারাজ শিবচন্দ্র রায় উক্ত মন্দিরের সংস্কার ও বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য পূজাদির জন্য কিছু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাপিও নৃসিংহদেবের যথারীতি নিত্য পূজা এবং প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাড়ম্বরে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবটি সর্বজনীন। উৎসব কালে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে মানসিক পূজাদি দিবার জন্য বহু যাত্রী আসেন। নৃসিংহদেবের নিকট কোনরূপ পশু বলি মানত দেওয়া চলে না। প্রধানতঃ ফল-মূল ও ভোগ মানত জানান হয়। নৃসিংহদেবের ধ্যান:

মানিকাদ্রি সমপ্রভং নিজরুচা সংত্রস্ত রক্ষোগণং
জানুন্যস্ত করাম্বুজং ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ ভূষণং।
বাহুভ্যাং ধৃত শঙ্খচক্র মনিশং
দংষ্ট্রোগ্রবক্তোল্লসজ্জ্বালাজিহ্ব মদান্ধ্র কেশনিচয়ং
বন্দ্যে নৃসিংহংবিভুম॥

(তন্ত্রসার)

স্থানীয় বিষ্ণুপুর গ্রামের মুখোপাধ্যায় ও বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীধারী ব্রাহ্মণগণ বংশানুক্রমে পালাক্রমে দেবতার প্রাত্যহিক পূজার্চনাদি করিয়া থাকেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে ভোগ আরতি এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি হয়। বার্ষিক উৎসব ভিন্ন প্রতি বৎসর "পৌষালী" অনুষ্ঠানে দূর-দূরান্ত হইতে বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন এবং ফাল্গুন মাসে মহোৎসব ও সর্বজনীন ভোগ হয়। কথিত আছে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পরিক্রমায় বাহির হইয়া (১৫২৫-১৫৩৩ খৃঃ মধ্যে) একবার নৃসিংহ মূর্তি দর্শনে আসিয়াছিলেন। সেই কারণে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মায়াপুর গৌড়ীয় মঠ হইতে একটি বিরাট বৈষ্ণব মিছিল নৃসিংহদেবের মন্দিরের পাদমূলে ছাউনি ফেলিয়া মহোৎসব ও ভোগ বিতরণ করেন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সংস্কার অভাবে মন্দিরটি জীর্ণ। সর্বশেষে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি সংস্কার করা হইয়াছিল।

পঞ্চানন্দ পূজা

হরিশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের মধ্যে যে-কোন এক মঙ্গলবার মহাসমারোহের সহিত পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত দিনে বহু সংখ্যক মানতের ছাগ বা পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে পূজা হয় একদিন এবং পূজা উপলক্ষে উৎসব চলে আরও তিন-চারিদিনব্যাপী। পূজান্তে সর্বজনীন ভোজের পর পরদিবস গান বাজনার অনুষ্ঠান হয়। ঐ একই দিনে ও রক্ষাকালীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চানন্দ ঠাকুরের সেবায়েত ব্যগ্র ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক স্থানীয় গ্রামবাসী।

বারদোল উৎসব

কৃষ্ণনগরের বার দোল উৎসবটি একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ উৎসব। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার পর শুক্লা একাদশী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী এই উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি নদীয়া রাজ পরিবারের প্রবর্তিত নিজস্ব উৎসব হইলেও বর্তমানে ইহা সর্বজনীন বলা যাইতে পারে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। উৎসব আরম্ভ হইবার প্রায় এক মাস পূর্ব হইতেই ইহার প্রস্তুতি শুরু হয়। নদীয়া মহারাজের কুলদেবতা "বড় নারায়ণ" বিগ্রহ উৎসবের দিন অর্থাৎ দোলপূর্ণিমার পর শুক্লা একাদশী তিথিতে উঠেন বলরাম, শ্রীগোপীমোহন, লক্ষ্মীকান্ত, ছোটনারায়ণ ব্রহ্মণ্যদেব, গড়ের গোপাল, গোপীনাথ, নদীয়া গোপাল, কৃষ্ণরায়, কৃষ্ণচন্দ্র শ্রীগোবিন্দদেব ও মদনগোপালাদি দ্বাদশটি বিগ্রহসহ দোলমঞ্চে আসিয়া উঠেন। এই সকল বিগ্রহগুলিও নদীয়া মহারাজের এবং নদীয়া জেলার বিরহী, শান্তিপুর, অগ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, বাহিরগাছি, তেহট্ট প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে থাকিয়া সারা বৎসর যথারীতি পূজার্চনা ও নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে।

উৎসবের দিনে সুসজ্জিত বারোটি পৃথক পৃথক মঞ্চে উক্ত বিগ্রহগুলিকে স্থাপন করিয়া তিনদিন ব্যাপী সাড়ম্বরে পূজাদি করা হয়। প্রথম দিন বিগ্রহগুলিকে মূল্যবান স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা রাজবেশে সজ্জিত করা হয়, দ্বিতীয় দিনে সুগন্ধ পুষ্প-মাল্য দ্বারা ফুল বেশে সজ্জিত করা হয় এবং তৃতীয় দিনে বিগ্রহগুলি দরিদ্র রাখাল বেশে সজ্জিত করা হয়। উৎসব শেষে বিগ্রহগুলিকে কৃষ্ণনগর ঠাকুরবাড়ীতে বড় নারায়ণ-এর সহিত উল্লিখিত অন্যান্য বিগ্রহগুলিকে একমাস একসাথে রাখিয়া নিত্য পূজাদি করা হয়। ইহার পর বিগ্রহগুলি স্ব স্ব মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করে।

উৎসবটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

কৃষ্ণনগরের বারদোল উৎসব

বারদোল। কৃষ্ণনগরের বারদোল বাংলা দেশের মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ মেলা। কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলার ঐতিহ্য আছে এবং ঐ মেলা প্রাচীনত্বেরও দাবী রাখে।

বহুদিন আগের কথা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই এই মেলা সুরু হয়। এই মেলার সঙ্গে নদীয়ার রাজবংশের যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। নদীয়ার রাজবাড়ীর ইতিহাস এই মেলার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত।

তখন এই স্থানের নাম ছিল রেউই, সেই নাম থেকে ক্রমশঃ কৃষ্ণনগরের নামের উৎপত্তি। মহারাজ রুদ্রের

সময়ে কৃষ্ণনগরের নাম সুরু হয় বলে জানা গেছে। তারপর কেটে যায় কয়েকজন রাজার রাজত্বের আমল। অতঃপর আসেন নদীয়াধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র। এই সময়েই নদীয়া রাজবংশের প্রতিপত্তি, সুনাম, অর্থ, যশ সবদিক দিয়াই সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে তদানীন্তন কৃষ্ণনগরীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ধর্ম সারা বাংলার পথ প্রদর্শক ছিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়েই নদীয়ার রাজ পরিবারের ও দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। সেই থেকে আজও বারদোলের মেলা নদীয়ার রাজপ্রাসাদের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বসে আসছে। সেকালে নদীয়ার রাজপ্রাসাদের চারিদিকে পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। আজকাল শুষ্ক পরিখা অতীতের সাক্ষ্যস্বরূপ পড়ে আছে; তাতে একফোঁটাও জল নেই, প্রাণ নেই তার বুকে। বিস্তৃত প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসরই মেলা বসে মহাধূমধামে। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন দোকান এসে বসে এই মেলায়—প্রায় একমাস চলে এই মেলা। পূর্বে আরও ধূমধাম হত, আরও দোকানপাট বসত, আরও লোকসমাগম হত।

চৈত্র মাসের শুক্লা একাদশীতে এই দোল সুরু হয়। তিনদিন ঠাকুর দোলে থাকেন তারপর ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুর উঠে যান। প্রথম তিনদিন এই দোল দেখবার জন্য দেশ-দেশান্তর থেকে প্রচুর লোক সমাগম হয়। দৃশ্যটিও দেখবার মত। সুবৃহৎ চাঁদনীর একাংশ পর পর ১৩টি বিগ্রহ দোলায় দুলতে থাকেন। ১৩টি বিগ্রহ থাকলেও নাম কিন্তু বারদোল। অনেকের মনে এই দোল শাস্ত্রসম্মত কিনা, এরূপ সংশয় জাগলেও হরিভক্তিবিলাসঃ নামক গ্রন্থে আমরা এই দোলের কথা জানতে পারি। কাজেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র অশাস্ত্রীয় কিছু করে যাননি তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি। হরিভক্তিবিলাসঃ গ্রন্থে দেখা যায়:

> চৈত্রে সিতৈকাদশ্যাঞ্চ দক্ষিণাভিমুখং প্রভুম্।
> দোলয়া দোলনং কুর্যাদ্গীতনৃত্যাদিণোৎসবম্॥
> তথা চ গরুড়ে—
> চৈত্রে মাসি সিতে পক্ষে দক্ষিণাভিমুখং হরিম্।
> দোলারূঢ়ং সমভ্যর্চ্য মাসমান্দোলয়েৎ কলৌ॥

অর্থাৎ—চৈত্র মাসে শুক্লা একাদশীতিথিতে গীত নৃত্যাদি উৎসব সহকারে দেবদেবীকে দক্ষিণ মুখ করিয়া দোলা দ্বারা দোলাতে হয়। গরুড় পুরাণেও ঐ বিষয়ে লিখিত আছে যে, কলিকালে চৈত্র শুক্লপক্ষে দক্ষিণ্যাস্য জনার্দনকে পূজা করে একমাস দোলনে দোলাতে হয়।

এ সব মেলার মধ্যে কেবল যে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাঙ্গালীকে আকৃষ্ট করেছে তা নয়, সমাজ জীবনের পারস্পারিক আনন্দ বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবেও মেলার বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। এ ছাড়া এই মেলাকে বাঙালী সংস্কৃতির একটা মনোরম বিকাশও বলা যেতে পারে। এই সব মেলা ও পার্বণ উপলক্ষে আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব একত্রিত হন, তাঁদের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হয়। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে এই সব মেলার একটি বিশেষ মূল্য আছে। পল্লী অঞ্চলের লোকেরা বিশেষ কোন আনন্দ উপভোগ করতে পায় না। সহরে সিনেমা, থিয়েটার এবং নানান ধরণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে এইসব মেলাই একমাত্র ভরসা। সারা বৎসর সারা এলাকার লোকেরা এইসব মেলার প্রতীক্ষায় থাকে। আত্মীয়স্বজনরা, বন্ধুবান্ধবরা, গাঁয়ের বধূরা মেয়েরা সব গ্রামে ফিরে আসে এইসব মেলাকে উপলক্ষ করে। কৃষ্ণনগরের এই বারদোল নদীয়ার প্রাণস্বরূপ।

রাজবাড়ীর বিগ্রহ, রাজবাড়ীর মেলা হলেও এই মেলা সার্বজনীন উৎসব। সারা নদীয়ার লোকজন একত্রিত হয় এই মেলাকে কেন্দ্র করে। বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নানাধরণের দোকানপাট আসে, লোকজনও আসে বিভিন্ন স্থান হতে। বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এই মেলা বসে —এক এক সারে এক এক ধরণের দোকান বসে। প্রথম তিন দিন অসম্ভব লোক সমাগম হয়—বিশেষ করে মৃৎশিল্পির দোকানগুলিকে কেন্দ্র করে ভীষণ ভীড় জমে যায়। নানাধরণের জিনিসপত্রের দোকান ছাড়াও সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা প্রভৃতি মেলায় লোকজনের মধ্যে তুমুল আলোড়ন এনে দেয়। নদীয়ার মহারাজার তত্ত্বাবধানে এবং জনসাধারণের সমবেত চেষ্টায় মেলার সুব্যবস্থা করা হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থাও করা হয়। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পুলিশ আপ্রাণ চেষ্টা করে। বিগ্রহ ও মেলা দেখার জন্য প্রচুর লোক সমাগম

হয় সত্যি, কিন্তু পূর্বের সেই আনন্দ সেই হাসি আর দেখা দেখা যায় না। তবুও লোক আসে, ভীড় জমায় মেলায়—ঘুরে ফিরে ঠাকুর দেখে চলে যায় অধিকাংশই।

অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে পড়ে জিনিষপত্র কেনার ব্যাপারে লোকের আর অবস্থায় কুলায় না—যা কিছু কেনে ছেলেপিলেরাই; আর মেয়েরা কোন সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজনীয় জিনিষ। স্থানীয় দোকানে হয়ত সেসব পাওয়া যায়, কিন্তু তবুও তারা প্রতীক্ষায় থাকে এই বারদোলের মেলায় জিনিসপত্র কেনবার জন্য। অর্থনৈতিক দুরবস্থার চাপে মানুষ ব্যতিব্যস্ত হলেও এই মেলার অপেক্ষায় থাকে। তবুও হাসি আনন্দে কাটে কয়েকদিন।

এই বারদোলের ১৩টি বিগ্রহ নদীয়ার রাজার বিভিন্ন এলাকা হতে এখানে এসে সমবেত হয় এই উপলক্ষে।……
…………………

(আনন্দবাজার পত্রিকা—৫ই বৈশাখ, ১৩৬৬, নিজস্ব প্রতিনিধি।)

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ কৃষ্ণনগর

মেলা বিবরণী

অম্বুবাচীর মেলা

আশাননগর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী দিন হইতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় দোকানপাটগুলি গ্রামের মধ্যে পি ডাব্লু ডি-র রাস্তা দুই-ধারে বসিয়া থাকে। ইহা প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের দুই-চারিটি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় লোকজন ও বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান ও বাসনপত্রের দোকান বসিয়া থাকে।

কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

আশাননগর গ্রামের বাজার পাড়ায় প্রতি বৎসর কৃষি-শিল্প-স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। প্রদর্শনীটি ইং ১৯৫৬ সাল হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতা ও স্থায়ী বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মহাশয়ের প্রচেষ্টায় আয়োজিত হইতেছে এবং এই প্রদর্শনী উপলক্ষে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বাসন-কোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, মাটির পুতুল ও বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলা ইত্যাদি দ্রব্যাদির মোট প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে ও কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর আশেপাশের গ্রাম হইতে এবং কৃষ্ণনগর হইতে আসিয়া থাকেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, লটারী খেলা ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

চুয়াখালি গ্রামে চড়ক পূজা উপলক্ষে চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং ইহাতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত যাত্রী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী। ভক্তরা মেলার খাবারের দোকানগুলি হইতে মুড়ি, মুড়কি ও মিষ্টান্ন ইত্যাদি যাহা তোলা বাবদ আদায় করেন সে সমস্ত দ্রব্য শিবের পূজায় উৎসর্গ করিয়া দেন।

মেলাতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। তন্মধ্যে বেশীর ভাগ দোকানই খাবারের। তাহাছাড়া কয়েকটি বাসনকোসনের দোকান, কয়েকটি মনিহারী দ্রব্যের দোকান, আবার কয়েকটি গ্রামে তৈরী ধামা কুলা, মাটির পুতুল, খেলনা ইত্যাদির দোকানও থাকে। মেলাতে সিদ্ধির সরবত ও সিদ্ধির কচুরী বিক্রয় হয়।

মেলা উপলক্ষে নাচ, গান, তরজা, যাত্রা, লাঠিখেলা, বোলান গান, কবিগান ইত্যাদি আমোদ প্রমোদের বন্দোবস্ত থাকে। যাত্রাদলের অধিকারী শ্রীগোপাল চন্দ্র দাস, চুয়াখালি, পোঃ রূপদহ। কবিগান রচনা করেন, শ্রীরাখাল চন্দ্র বাগ, গ্রাম ও পোঃ রূপদহ। কবিগান, পাঁচালী গান ও পালা বাঁধিয়া দেন শ্রীঅনুকূল চক্রবর্তী, গ্রাম ও পোঃ রূপদহ।

চুয়াখালি গ্রামে চড়কের মেলাতে আমোদ-প্রমোদের আসরে যে সমস্ত কবিগান ও পাঁচালী গান ..ত হয় হয় তাহার কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"তুমি দিগ্বিজয়ী রাবণ রাজা হে, একথা রাষ্ট্র জগতেও হায় আমি মধু দৈত্য নামটি ধরি সর্বদা আপন কার্যেরই এমন পরতো নাই, তোমার মামাত বোন পরম সুন্দরী সুন্দরী সে নারী ভার্য্যা হয় আমারও হায়—নাকি কেঞ্চেকে এক বাঁদর এসে তোমার সম্মুখে বসে হে কাটরা পেতে মতেছে, এনাম জানতে তাই তোমার কাছে সম্বন্ধী—তোমার এই লঙ্কাতে কি বিপদ ঘটেছে! আবার বার তীর্থের জল বলে তাই তোমায় খাইয়ে দিয়েছে ও হায়"—

কবির বন্দনা গীত

(১)

ন' পাড়ায় নবগোরা আছেন যতনে।
রূপদহেতে যাবি সে রূপের সন্ধান পাবি
চুয়াখালি গেলে খালি হবিরে প্রাণে॥

চেত্তনা চাত্‌নী নেকী, আসল তোর হবে মেকী
ধুবুলে বা তব্বলে হরবে তোর প্রাণে ॥
চেত্তনা পিংহীটা আসল তোর হবে মাটি
আড়মেরে কাটা কাটি বাঁচবে না প্রাণে
বল মন কালী কালী, ঘুচিবে মনের কালী
ভুলে যাও দলাদলি অনুকূল ভনে।

(২)

মনের ঘরে লাগাও চাবি, কানে লাগাও তালা,
জিবেতে দাও জল বিছুটী, শুনবে গানের পালা
রাখাল দাদা মনটি সাদা, সকালে খায় লবন আদা
বুদ্ধি বেজায় যেমন গাধা, পেটটী মদের জালা
মনের ঘরে লাগাও চাবি, কানে লাগাও তালা।
মা বড় কি বড় বাবা, ভাল করে বুঝাইবা—
তোর বাবা মোর মায়ের চাকর সবাই মারে চ্যালা
তোর বাবা যা উপায় করে, আমার মাকে স্থান সব ধরে
মায়ের বাক্সে চাবি মেরে খুঁটে রিং ওয়ালা—

কথা

ওরে দেখ দেখ তোর বাবা আমার মায়ের মুটে
সারাটি দিন আসে খেটে খুটে,
আমার মা ঘরে চুপ করে বসে থাকে আর
তোর বাবাকে হুকুম যা যা করে না করলে
সে দিন ভাত বন্ধ জানিস।

উত্তর

বেশ বলেছ ভাবের কথা মিথ্যা কিছুই নয়
মা বড় কি বাবা বড় বলছি এ সভায়।
তোর মা-টী যখন ছোট থাকে
আমার বাবা বিয়ে করে তাকে
(তোর মা-র) মুখ দেখা যায় ঘোমটার ফাঁকে
প্রাণে সদাই ভয়।
তোর মায়ের হাতটি ধরে
আনলে বাবা বিয়ে করে
করলে বাড়ীর বাঁদী তাকে
সব ঘরে যা হয়।

কথা

ওরে তোর মাকে আমার বাবা বিয়ে করে—
চাকরাণী নিয়ে আসে, তোর মা উঠতে বললে ওঠে
বসতে বললে বসে। একটু ভাত দিতে দেরী করলে

তোর মায়ের পিঠের আর চামড়া
থাকে না আমার বাবার হাতের লাঠির চোটে।
সেই মায়ের আবার অহঙ্কার ইত্যাদি··· · ···

মামা ভাগ্‌নে পালা কবিগান

(অভিমন্যু সপ্তরথী যখন ঘিরেছে তখন বলছে তার মামা কৃষ্ণকে)

(গীত)

বড় কঠোর কেষ্ট মামা বলি তোমার কাছে
তুমি আমাকে না বাঁচালে, ব্রহ্মশাপ আছে বলে
ও ঢ্যাম্না ছেলে।
ওগো আমার মাকে বা পালিতে জগতে আর কে আছে।
ইত্যাদি·········

উত্তরে কৃষ্ণ

কেঁদনা কেঁদনা ভাগ্নে সকলের হবে মরণ।
মরলে রণে মোক্ষ পাবে ভাব আমার শ্রীচরণ ॥
জীব জগতের কেউ রবেনা, সবাই করে আনাগোনা।
রণে শত্রু কর নিপাত বৃথা করনা ক্রন্দন ॥

বাদা বাদি পাঁচালী গান

(১)

কোথাকার বেলেল্লা দিতে আসে পাল্লা।
জানে না আপন ছিদ্র পরের করে বদগেল্লা ॥
কাটোয়ার পটল দেখে বলে সব তিতপল্লা।
বিলাতী আলু দেখে বলে এ সব গোল্লা ॥

ঘরেতে নাইকো দুয়ার পিঁপড়ে লাগায় জানালা।
এক থাল মুড়কী দেখে বলে এ সব বোল্লা ॥
চৈত মাসে চড়ক দেখে বলে এ দাঁড়পাল্লা।
অনুকূল ভেব্বা জানে কষ্টে কোথায় হে আল্লা ॥

(২)

উত্তর

আমি তো বেলেল্লা তুমি তো বিসমিল্লা।
জানি যে হরকল্লা বাড়াতে বাদকুল্লা ॥
নামাজে ইলেল্লা পরনে আলখাল্লা।
গানে ত্যাল্লা ব্যাল্লা কেবল কর হল্লা ॥
বিয়েতে চাই ছানলা, গানেতে চাই গল্পা।
পোষাকে চাই ধল্লা, ঝাঁটাতে চাই শন্‌ল্লা ॥

পরন

ওরে পাল্লাদার ভাই তোমার তো কিছুই নাই
তোমার ভূতের রূপের দৈতো বাহার দেখে আমি মরে যাই।
ঢুলী দাদা বাজায় খাসা তুমি তো কর হল্লা
অনুকূল কর গানের সভার কর না ত্যাল্লা ব্যাল্লা।

হালচাল কবিগান

ও ভাই নষ্ট করে কষ্ট দিলে কোম্পানীই
যার ভয়েতে এ ভারতে এল নাকো জার্মানী।
ভবে এক টাকা চালের কাঠা গেরস্তর কপাল ফাটা
তাই লেগেছে ল্যাঠা
যত সংগৃহস্থ শশব্যস্ত দিনে করে চালপানি।
এবার কাপড় যাতে হয় সস্তা করব তাহার ব্যবস্থা
কিনে দেব সব ফস্তা (লাল পাড় শাড়ী)
এবার মেয়েরা সব যাবে হাটে মিন্‌সে মরবে ধান ভানি।
কহে দীন অনুকূল, কত দেখব একালে
নলচে হুকো সব অকেজো বেড়ায় সব বিড়িটানি
সবার সকালে চাই চা নইলে জীবন বাঁচে না
ভোটে যারে কর রাজা বেড়ায় নিজের ঝোলটানি।
তাই করছি আজ মন, আমি যাব বৃন্দাবন
ঘরে বসে উপোস করে থাকবো কতক্ষণ
আঁচলা ঝোলা সার করিল পরিধানে কৌপিন।

বাংলা ডোবা কবির গান (বাংলা ১৩৪৫ সাল)

এবার বানে বাংলা মুলুক গেল গো রসাতলে
২৮ জেলা খেয়ে ঠ্যালা ডুবছে গো পলে পলে ॥
উত্তর বঙ্গ মুর্শিদাবাদ ডুবে গেল সব আবাদ
ন'দে জেলা গেল না বাদ পড়লো বানের কবলে ॥
দেখে এলাম কালান্তরে গাছের উপর কাছিম চড়ে
ভাঙ্গা ডহর নদী ঘোল স্রোত চলে যায় কল কোলে ॥
পাথরাদ পোয়ালে পাড়া, ডেকে নাহি পেলাম সাড়া
রূপদহের ঐ বাসিন্দারা পড়ছে চাপা দেওয়ালে—
চকের মাঠের ঘোস কোম্পানী দিনে রাতে খাচ্ছে পানি
ডুবলো ছুঁচো পাড়াখানি স্রোত চলে যায় দলাদলে
কালীনগর সোনাতলা, ঘোল একটি বিরাট জলা
নারী কাঁদে ছেড়ে গলা; আল্লা এ কী করিলে !
ভেবে অনুকূল কয় যদি এখন মরণ হয় খাবি খেতে খেতে
আমি পড়িব বানের জলে।

রূপদহ গ্রামে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় নওপাড়া, চুয়াখালি, পাথরদহ প্রভৃতি গ্রাম হইতে মোট প্রায় দুই হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। ইহাতে পুরুষ অপেক্ষা নারী ও শিশুগণের ভীড় বেশী হয়।

মেলায় গ্রামের রাস্তার দুই ধারে এবং নদীর ঘাটে খোলা জায়গায় দোকানপাটগুলি বসে। সোনাতলা, নওপাড়া, ধুবুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় মোট ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি ও খেলনার দোকান, মনিহারী দোকান ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদির দুই-চারিটি দোকানপাটও বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর তরজা, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দশহরার মেলা

আনন্দবাস গ্রামে প্রতি বৎসর দশহরার স্নান উপলক্ষে জ্যৈষ্ঠ মাসে পুণ্য সলিলা গঙ্গাতীরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আনুমানিক দশ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন। নিকটবর্তী গ্রাম ও ইউনিয়নগুলি হইতে প্রায় দুই-তিন হাজারের মত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীরা বেশীর ভাগ হাঁটিয়া অথবা গরুর গাড়ীতে আসেন।

মেলাতে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি দোকান বসে। দোকানদারদের নিকট হইতে কোন রকম তোলা আদায় করা হয় না। দোকানগুলির মধ্যে খাবারের ও মিষ্টান্নের দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, মনিহারী দোকান, বইছবির দোকান এবং কিছু ধামা, কুলা, পুতুল ইত্যাদির দোকানও থাকে।

নৃসিংহদেবের উৎসব উপলক্ষে মেলা

দেপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে নৃসিংহদেবের বার্ষিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে নৃসিংহদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি দুই হইতে আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলাতে ভালুকা, স্বরূপগঞ্জ, দোগাছি, বাহাদুরপুর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, রানাঘাট, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও চব্বিশ পরগণা জেলা হইতে প্রতি বৎসর হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কয়েক সহস্র যাত্রী ও ব্যবসায়ী আসিয়া থাকেন। যাত্রীরা প্রধানতঃ মোটরবাসে, রিক্সায়, গরুর গাড়ীতে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় খোলা জায়গায় অনধিক একশত দোকান বসে ও বহু ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন রকম খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ব্যতীত, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান লোহার বাসনকোসনের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, কবিরাজী ঔষধপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদি দ্রব্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, লটারী, নানা প্রকার হাস্য-কৌতুকের অনুষ্ঠান এবং ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করা হয়।

পঞ্চানন্দপূজার মেলা

হরিশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে গ্রামের পঞ্চানন্দতলায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর তিন-চারদিনব্যাপী প্রত্যহ বিকালে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন প্রতি বৎসর নবদ্বীপ হইতে বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে পঞ্চানন্দ পূজার জন্য তোলা আদায় করা হয়। মেলায় খাবারের দোকান এবং কাপড়চোপড়ের দোকানই বেশী। তাহাছাড়া, মনিহারী দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, খেলনা ও মাটির পুতুলের দোকান ও অন্যান্য শিল্প সামগ্রীর দোকানও বসে। সমস্ত দোকানগুলি খোলা যায়গাতেই বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য বর্দ্ধমান হইতে নামকরা কবিয়াল আনা হয়। গ্রামের একটি যাত্রাদল যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে। অধিকারীর নাম শ্রীসুধাংশু প্রকাশ ঘোষ।

মহরমের মেলা

সোনাডাঙ্গা গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মাণিকপীরতলা নামক স্থানে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রামের সাত-আট মাইল এলাকার মধ্যে অবস্থিত গ্রামগুলি হইতে প্রায় তিন-চারি হাজার লোক এই মেলাতে আসেন। যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই মুসলমান।

মেলাতে শতাধিক দোকানপাট বসে এবং প্রায় পঞ্চাশ জনের মত ফেরিওয়ালাও আসেন। দোকানগুলির মধ্যে বেশীর ভাগ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান। ইহাছাড়া, লোহার জিনিসের দোকান, কাঁচের বাসন-কোসনের দোকান, পুতুলের দোকান, বই-ছবির দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, হাঁড়িকুড়ির দোকান এবং ধামা কুলা প্রভৃতির দোকানও কিছু কিছু থাকে।

মেলাতে আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, পালাকীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। এই সকল আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে দুই হইতে তিন হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

ভালুকা গ্রামের প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের রথতলায় বিকালের দিকে একটি ছোট মেলা বসে। আশেপাশের দুই-চারিটি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত নরনারী আসিয়া থাকেন এবং খাবার, মনিহারী দ্রব্য, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল এবং বই-ছবির মাত্র পনের-কুড়িটি দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর মেলায় তরজা গানের আয়োজন করা হয়।

জেলা : নদীয়া
থানা : নবদ্বীপ

শ্রীধাম নবদ্বীপ

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলাক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপ হিন্দু তথা বৈষ্ণবদিগের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান। এই স্থানে অবস্থিত শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীগণের বহু দেবালয়ে, মন্দিরে ও আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহাদি এবং সাধক-ভক্তদের কেন্দ্র করিয়া সারা বৎসর বিভিন্ন পর্বে নানারূপ উৎসব-পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবদ্বীপে অনুষ্ঠিত উৎসব-পার্বণ ও মেলা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তথ্যাদি শ্রীজিতেন্দ্রিয় দত্ত ও শ্রীফণিভূষণ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত "নবদ্বীপ মহিমা" (২য় সংস্করণ), শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক প্রণীত "নদীয়া কাহিনী" এবং পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" (২য় খণ্ড) গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত।

বর্তমান নবদ্বীপ নগরী ২৩°২৮′ উত্তর অক্ষাংশ, ৮৮°২৩′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। ইহা একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। এই নগরের নিম্নে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই নগরের নামানুসারে সমস্ত জেলার নাম নদীয়া হইয়াছে। পূর্ব রেলপথে নবদ্বীপে একটি রেলস্টেশন আছে।

নবদ্বীপ বাংলার শ্রেষ্ঠ গৌরবের স্থান, কিন্তু ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে তাদৃশ প্রমাণাদি নাই। পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতিতে ইহার উল্লেখ নাই। খ্রীষ্টীয় একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে সেনরাজগণের গঙ্গাবাস স্থান স্বরূপ নবদ্বীপের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার নামকরণ সম্বন্ধেও নানা মত প্রচলিত আছে। কেহ বলেন গঙ্গার গর্ভ হইতে নূতন উত্থিত হওয়ায় ইহার নাম হয় নূতন বা নবদ্বীপ; কাহারও কাহারও মতে জনৈক তান্ত্রিক সন্ন্যাসী এই দ্বীপে রাত্রিকালে নয়টি আলোক জ্বালিয়া যোগসাধনা করিতেন বলিয়া ইহাকে "নবদীপ" বা "নদীয়া" বলা হইত। অধিকাংশের মতে গঙ্গা গর্ভোত্থিত এই পবিত্র ভূমি নয়টি দ্বীপের সমষ্টি লইয়া গঠিত বলিয়া ইহার নাম হয় নবদ্বীপ। নবদ্বীপের উপর যাঁহাদের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সেই বৈষ্ণবগণ এই শেষোক্ত মতই গ্রহণ করিয়াছেন। "নবদ্বীপ পরিক্রমা" প্রণেতা শ্রীনরহরি চক্রবর্তী লিখিয়াছেন :

"নদীয়া পৃথক গ্রাম নয়।
নবদ্বীপে নবদ্বীপ বেষ্টিত যে হয়॥"

এই নয়টি দ্বীপের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন—

গঙ্গা পূর্ব্ব পশ্চিম তীরেতে দ্বীপ নয়।
পূর্বে অন্তর্দ্বীপ শ্রীসীমন্ত দ্বীপ চতুষ্টয়।
কোলদ্বীপ ঋতু জহ্নু মোদদ্রুম আর।
রুদ্রদ্বীপ এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার॥"

বর্তমান নবদ্বীপের আশেপাশে ও গঙ্গার পূর্ব্বতীরে অবস্থিত কতিপয় গ্রামকে প্রাচীন নয়টি দ্বীপের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয় এবং এই সকল স্থান প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্ত বৈষ্ণবগণ "নবদ্বীপ পরিক্রমা" উৎসব সম্পন্ন করেন।

সেন রাজগণের সময় হইতেই নবদ্বীপ একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত হয় এবং এখানকার ব্রাহ্মণগণের পাণ্ডিত্য খ্যাতি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব কালে নবদ্বীপ অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। চৈতন্য ভাগবতকার বৃন্দাবন দাস লিখিয়াছেন—

"নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।
যঁহি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোঁসাই॥

নবদ্বীপের ঐশ্বর্য্য কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ্য লোক স্নান করে॥"

বাসুদেব সার্বভৌম, রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, স্মার্ত্ত রঘুনন্দন, রামভদ্র সার্বভৌম, ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, জগদীশ তর্কালঙ্কার, রঘুদেব ন্যায়ালঙ্কার, রামভদ্র ন্যায়ালঙ্কার, রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ প্রভৃতি ন্যায়, স্মৃতি পঞ্চতন্ত্র শাস্ত্রজ্ঞ জগজ্জয়ী পণ্ডিতগণের অধ্যাপনা ও জ্ঞান চর্চ্চার জন্য নবদ্বীপের খ্যাতি উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুদূর দেশ হইতে ছাত্রগণ জ্ঞান লাভের জন্য নবদ্বীপে আসিত। এই সকল বিখ্যাত পণ্ডিতগণের অসাধারণ শক্তি সম্বন্ধে নানারূপ কাহিনী আছে।

নবদ্বীপে বহুকাল হইতে জ্যোতিঃশাস্ত্রেরও বিশেষ চর্চ্চা আছে। "জ্যোতিঃসার সংগ্রহ" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রণেতা জ্যোতিষী হৃদয়ানন্দ বিদ্যার্ণব, তৎকালের নবদ্বীপের পঞ্জিকাকার রামচন্দ্র বিদ্যানিধি, রামজয় শিরোমণি, শতানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, কমলাকর জ্যোতিষী, গণিতাচার্য্য বংশীয় বিশ্বেশ্বর বাচস্পতি, হারাধন বিদ্যাভরণ, নানা শাস্ত্রবিদ রাজীবলোচন বিদ্যাসাগর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নামে একজন বিশিষ্ট সাধক ও মহাপুরুষ ছিলেন; তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রে পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি আগমবাগীশ নামে পরিচিত হয়। তিনি তন্ত্রশাস্ত্রের দেবী মূর্ত্তির সাকার পূজাবিধির প্রচলন করেন। আধুনিক কালে কালী বা শ্যামা মূর্ত্তি কৃষ্ণানন্দের উদ্ভাবিত বলিয়া কথিত। "তন্ত্রসার" নামক তাঁহার গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

আজিও নবদ্বীপের পণ্ডিতগণের "বঙ্গবিবুধ জননী সভা" যাহা পূর্ব্বে "বিদগ্ধ জননী সভা" নামে খ্যাত ছিল ও "নবদ্বীপ সমাজ" নামে দুইটি সুপরিচিত প্রতিষ্ঠান আছে।

নানা শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিতগণের নিবাসভূমি এই নবদ্বীপের সর্ব্বপ্রধান গৌরব ইহা শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব ভূমি বলিয়া। এই জন্যই ইহার তীর্থ গৌরব, এই জন্যই ইহার "শ্রীধাম" আখ্যা, এই জন্যই ইহা বাংলার "বৃন্দাবন" রূপে সম্মানিত।

শ্রীচৈতন্যদেবের পিতা জগন্নাথ মিশ্র ও মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহামারী ও দুর্ভিক্ষের জন্য তাঁহাদের আদি বাসস্থান শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিয়া পরিজনগণসহ নবদ্বীপে আসিয়া বসবাস করেন। ইঁহারা পাশ্চাত্য বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

১৪০৭ শকে (১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে) বাসন্তী সন্ধ্যার ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তদীয় জননী শচীদেবীর আটটি সন্তানের অকাল মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার জন্ম সময়ে তদীয় অগ্রজ বিশ্বরূপ কিশোরবয়স্ক বালক ছিলেন। বিশ্বরূপ পরে ষোল বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়েন। জগন্নাথ মিশ্র নবজাত পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন বিশ্বম্ভর,— অকাল মৃত্যুর হাত হইতে সন্তানকে বাঁচাইবার জন্য পুরস্ত্রীগণের পরামর্শ মত শচীদেবী পুত্রের নাম রাখেন নিমাই। নিমাই-এর গায়ের রং অতি উজ্জ্বল গৌরবর্ণ ছিল বলিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে গৌরাঙ্গ বা গৌর বলিতেন। ষোল বৎসর বয়সে পড়াশুনা শেষ করিয়া নিমাই "পণ্ডিত" নামে প্রসিদ্ধ হন এবং নবদ্বীপবাসী মুকুন্দ সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল খুলিয়া অধ্যাপক হইয়া বসেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁহার প্রতিবেশী বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীদেবীকে বিবাহ করেন। নিমাই পণ্ডিত পূর্ববঙ্গ ভ্রমণে বাহির হইলে সর্পদংশনে লক্ষ্মীদেবীর লোকান্তর ঘটে। গৃহে প্রত্যাগমন করিবার পর তিনি রাজপণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ করেন। অধ্যাপক হিসাবে অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহার বিপুল খ্যাতি হয় এবং দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে জয় করিয়া নবদ্বীপের অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

গয়াধামে পিতার পিণ্ডদান করিতে গিয়া গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনে তাঁহার মনে অভূতপূর্ব ভাবের সঞ্চার হয় এবং সেই স্থানেই তিনি ভক্তিপন্থী সন্ন্যাসী ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহার অসংখ্য ভক্ত পরিকরের সহিত তাঁহার মিলন

ঘটে। নবদ্বীপে বিখ্যাত পাষণ্ড জগাই ও মাধাইকে তিনি প্রেমের দ্বারা বশীভূত করেন এবং সর্বত্রই তাঁহার অসাধারণ প্রেমভক্তির খ্যাতি বিস্তৃত হয়। গয়া হইতে ফিরিবার তিন বৎসর পরে ১৪৩১ শকে (১৫০৯ খৃষ্টাব্দে) উত্তরায়ণের দিন কাটোয়ায় মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য কেশব ভারতীর আশ্রমে গমন করিয়া তিনি সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নব নামকরণ হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তিনি যৎকালে সংকীর্ত্তন রসে মগ্ন ছিলেন, সেই সময়ে বৈষ্ণব প্রধান নিত্যানন্দের সহিত তাঁহার মিলন হয়। নবদ্বীপবাসীগণ ক্রমে চৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণের ও নিত্যানন্দকে বলরামের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকেন। অতঃপর চৈতন্যদেব বহু তীর্থ পর্যটন করিয়া বহু স্থানে প্রেমধর্ম প্রচার করেন। ১৪৫৫ শকের (১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে) আষাঢ় মাসে তিনি এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করেন। মাত্র ৪৮ বৎসর এই জগতে থাকিয়া তিনি যে প্রেমধর্মের প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ভারতের ভাবধারায় উহা বাঙালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দান। তাঁহার মহান্ জীবন অবলম্বন করিয়া যে বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, বাংলা ভাষার তাহা অপূর্ব সম্পদ। তাঁহার পুণ্যপদস্পর্শে বাংলা ও ওড়িশার বহু অখ্যাত স্থান তীর্থের গৌরব অর্জ্জন করিয়াছে। বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবান জ্ঞানে অর্চ্চনা করেন এবং অপরাপর ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেমিক মহাপুরুষ জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন।

বাংলার বৃন্দাবন নবদ্বীপে দেখিবার বস্তু আছে অনেক। তন্মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। যে মন্দিরে এই বিগ্রহের পূজা হয় উহা "মহাপ্রভু বাটী" নামে পরিচিত। নবদ্বীপের অধিষ্ঠাত্রীদেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়া-মা তলা, বুড়া শিবের মন্দির, পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী, আগমেশ্বরী তলা, সোনার গৌরাঙ্গ, বড় আখড়া বা শ্যামসুন্দর মন্দির, অদ্বৈত প্রভুর ঠাকুরবাটী, নিত্যানন্দ মন্দির, ষড়ভুজ গৌরাঙ্গ মন্দির, শ্রীবাস অঙ্গন, মণিপুর রাজের স্বর্ণচূড় মন্দির, কাচকামিনীর মন্দির, চরণদাস বাবাজীর সমাজ-বাগ, মাধাই-এর ঘাট প্রভৃতি তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণকারী মাত্রেরই দ্রষ্টব্য।

পোড়া মা তলা বা জগন্মাতা দেবীর ঘট বুদ্ধমন্থ নামে এক সিদ্ধ সন্ন্যাসী কর্তৃক স্থাপিত বলিয়া কথিত। সাধকের তপস্যায় প্রীত হইয়া দেবী প্রত্যহদুই দণ্ডকাল নবদ্বীপে অধিষ্ঠান করিতে প্রতিশ্রুত হন। বাসুদেব সার্বভৌম চতুষ্পাঠী স্থাপন করিয়া দেবীর ঘটটিকে গ্রামের মধ্যে আনিয়া বর্তমান বটবৃক্ষের ছায়ায় স্থাপন করেন; একবার গাছটি পুড়িয়া গেলে দেবী বিদগ্ধজননী বা পোড়ামা নামে আখ্যাত হন।

নবদ্বীপের পল্লীমাতা বা পাড়ার মা সিদ্ধেশ্বরী কালী এখানকার সর্বাপেক্ষা পুরাতন দেবতা। কথিত আছে একজন সিদ্ধপুরুষ ইঁহার প্রতিষ্ঠা করেন এবং বহু সাধক এই স্থানে সাধনা করিয়া সিদ্ধ হন। ইনি বিশেষ জাগ্রত বলিয়া খ্যাত।

কাশী, বৃন্দাবনের ন্যায় নবদ্বীপে নিত্যই মহোৎসব লাগিয়া আছে। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এখানকার দেব-মন্দিরগুলিতে কীর্তন, পাঠ ও কথকতা প্রভৃতি হয়। নবদ্বীপের উৎসবের মধ্যে বৈশাখে চন্দন যাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী, কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা, মাঘে ধুলোট ও ফাল্গুনে গৌর পূর্ণিমা বা দোলযাত্রা বিশেষ বিখ্যাত। মাঘী শুক্ল একাদশী হইতে ১২ দিন ধরিয়া ধুলোট মেলায় বাংলার সমস্ত প্রসিদ্ধ কীর্তনিয়াগণ সদলবলে মিলিত হন। গৌর বা ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাছাড়া প্রধান বৈষ্ণব মহান্তগণের মৃত্যু তিথিতে এবং গ্রহণ প্রভৃতি গঙ্গাস্নানের যোগে নবদ্বীপে দেশ-বিদেশ হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। কার্তিকী পূর্ণিমায় বৃহৎ কালী মূর্তি গড়িয়া পূজা ও দুইদিনব্যাপী মেলা হয়। ইহা পট পূর্ণিমার মেলা নামে খ্যাত।

নবদ্বীপে যাত্রিগণের থাকিবার জন্য বহু ধর্মশালা, যাত্রীনিবাস ও আখড়া আছে।

নবদ্বীপের সহজে পাড়ায় সহজিয়া সম্প্রদায়ের একটি কেন্দ্র আছে। এই সম্প্রদায় বাউল সম্প্রদায়ের প্রকার ভেদ।

বর্তমানকালে নবদ্বীপ নগর ও তৎসন্নিহিত স্থানগুলি হিন্দু প্রধান। ইহা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এখানে অনেক

দেবদেবীর মন্দির আছে; কিন্তু নিরীক্ষণ পূর্বক দেখিলে এই সকল দেবমূর্তির অনেকগুলিকেই বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এখানকার অনেক ষষ্ঠী, শীতলা, শিব, মনসা ও মঙ্গলচণ্ডী প্রভৃতি দেবদেবী বৌদ্ধস্তূপ চৈত্যাদির নামান্তর মাত্র।

নবদ্বীপে প্রাপ্ত প্রাচীন মূর্তিগুলির মধ্যে পাড়ডাঙ্গার শিব, যুগনাথ, মালোদের শিবের নিকটস্থ ষষ্ঠীঠাকুরানী, ও দণ্ডপাণি বৌদ্ধভাবাপন্ন।

পাড়ডাঙ্গার শিব—ইহা এক হস্তপদহীন কূর্মাকৃতি প্রস্তর খণ্ড। এই শ্রেণীর মূর্তিগুলি শূন্য-জ্ঞাপক ও অতি প্রাচীন। এই প্রকারের মূর্তি ঐতিহাসিকগণের মতে মহারাজ অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই প্রস্তরখণ্ড নবদ্বীপের নিকটবর্তী পাড়ডাঙ্গা বা পাহাড়পুরে বারুজীবিগণ অন্যন ২০০ বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত হন। পাড়ডাঙ্গার নামানুসারে শিবটিকে "পাড়ডাঙ্গার শিব" বলা হয়। ইঁহাকে যুগনাথ শিবমন্দিরে রাখা হইয়াছে এবং এখানেই তিনি পূজা প্রাপ্ত হন।

যুগনাথ—এক প্রকাণ্ড লোড়াকৃতি প্রস্তরখণ্ড। এই শ্রেণীর মূর্তিগুলি অতি প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ এগুলি মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।

পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি—যুগনাথ শিবের মন্দিরে একটি ধাতু-নির্মিত পদ্মপাণি বুদ্ধমূর্তি পূজিত হইতেছিলেন। এই শ্রেণীর মূর্তি বঙ্গদেশে ৫০টার অধিক পাওয়া যায় নাই। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ২২শে মার্চ্চ তারিখে বঙ্গদেশীয় আর্কিও-লজিক্যাল ডিপার্টমেন্টের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কে. এন. দীক্ষিত মহাশয় এই বুদ্ধমূর্তিটিকে পরীক্ষার্থে লইয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠীঠাকুরানী—একখানি বৃহৎ উপলখণ্ডে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি স্পষ্ট খোদিত আছে। করদ্বয় জানুপরি সংস্থাপিত। পদদ্বয়ের নিম্নভাগ হইতে কিছু অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই মূর্তির দুই পার্শ্বে দুইটী সিংহ-মুখের ন্যায় অঙ্কিত আছে। এই দুইটী পঞ্জর চিহ্ন। এই প্রস্তরখণ্ডের অনুরূপ আর একখানি প্রস্তর দণ্ডপাণি মন্দির মধ্যে জয়দুর্গা নামে পূজিত হইতেছেন। জয়দুর্গা নামে আর একটী দেবী মিউনিসিপাল রোডের পার্শ্বে অশ্বত্থ তরুতলে অবস্থিত আছেন। তাহা একটী ভগ্ন প্রস্তর-স্তম্ভ মাত্র। সম্ভবতঃ এই স্তম্ভটী পাহাড়পুরের ভগ্ন বিহার হইতে আনীত।

দণ্ডপাণি—একখানি বৃহৎপ্রস্তর-গাত্রে একটী হেঁটমুণ্ড দণ্ডধারী পুরুষ বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। দেখিলে বৌদ্ধশ্রমণমূর্তি বলিয়া বোধ হয়। মহাদেবের নামের পর্য্যায়ে দণ্ডপাণি নাম দেখা যায় না। কাশীধামে দণ্ডপাণি নামে একটী শিব আছেন। তাঁহার আকৃতিও ঐরূপ। কাশীধামে মহাদেবের দণ্ডপাণি নামধারণ সম্বন্ধে কাশীখণ্ডে এক উপাখ্যান আছে। কিন্তু কাশীখণ্ড বৌদ্ধধর্মের অনতিকালে রচিত বলিয়া পণ্ডিতদিগের বিশ্বাস। দণ্ডপাণি শব্দের প্রধান অর্থ যম বা ধর্মরাজ অর্থাৎ বুদ্ধ। এই সকল কারণে ইঁহাকেও বৌদ্ধমূর্তি বলিয়া আমাদের ধারণা। (এই মূর্তিটী ১৩৩৮ সনের চৈত্র মাসে গাজনের সময় অঙ্গহীন হওয়ায় তদনুরূপ অন্য একটি মূর্তি পূজিত হইতেছে।

এতদ্ব্যতীত নবদ্বীপে যে সকল প্রাচীন শিবমূর্তি আছেন, তাঁহাদের কোনটাই লিঙ্গমূর্তি নহেন। অধিকাংশই লোড়াকৃতি প্রস্তর মাত্র। সেই প্রস্তর গাত্রে লাক্ষাদ্বারা চক্ষু-মুখাদি অঙ্কিত করা হইয়াছে। এগুলিও হয় কোন বৌদ্ধ-মূর্তি বা বিহারের ভগ্নাবিশিষ্ট প্রস্তর খণ্ড মাত্র।

এই সকল শিবের প্রধান পর্ব্ব "গাজন" চৈত্রসংক্রান্তির পূর্বে সম্পন্ন হয়।

পাড়ডাঙ্গা—পাড়ডাঙ্গা নামে বর্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে এক অতিশয় উচ্চ ও ইষ্টকময় ভূমি আছে। কিংবদন্তী আছে, পাড়ডাঙ্গার বৌদ্ধস্তূপ বা পাহাড় ছিল। বিহার শব্দের অপভ্রংশে পাহাড় শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। আমরা চৈতন্যভাগবতাদি প্রাচীন গ্রন্থে নবদ্বীপের নিকটে পাড়ডাঙ্গা অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারি। আবার কোন কোন গ্রন্থে পাড়ডাঙ্গা পাহাড়পুর নামে উল্লিখিত হইয়াছে। পাহাড়পুর নামে দিনাজপুর ও রাজসাহী জিলাতেও দুইটী প্রাচীন স্থান আছে। সেই স্থানদ্বয়েও বৌদ্ধস্তূপ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বৌদ্ধস্তূপ বা পাহাড় থাকিবার জন্য ঐ স্থানগুলির পাহাড়পুর নামকরণ হইয়াছে। ১৮৫৪ খৃঃ অব্দের সহর-নদীয়ার সার্ভে

ম্যাপেও (Survey Map) পাড়ডাঙ্গার অবস্থান চিহ্নিত আছে।

নবদ্বীপে যে সকল বৌদ্ধপ্রভাব বিশিষ্ট মূর্তি ও ভগ্ন প্রস্তর স্তম্ভাদি দেখিতে পাওয়া যায়, সেগুলি এই পাহাড়পুর বা পাড়ডাঙ্গার বিহারের মধ্যে বিরাজিত ছিল। কালের বিধ্বংসী প্রভাববশে সেগুলি স্থানচ্যুত ও বিক্ষিপ্ত হইলে, লোকে আনিয়া তাহাদিগকে ইতস্ততঃ স্থাপিত করিয়াছে।

এই পাড়ডাঙ্গার প্রায় দুই মাইল দূরে, প্রাচীন গঙ্গাখাতের পশ্চিম তীরে কোবলা গ্রামে দুই খণ্ড প্রস্তর বাগ্দেবী নামে পূজিত হইয়া থাকে; এবং প্রতি বৎসর অম্বুবাচীতে সেই স্থানে একটী মেলা হয়। উহাদের মধ্যে ক্ষুদ্রতর প্রস্তরখানি উজ্জল কৃষ্ণবর্ণ ও মসৃণ—তাহার শিরোদেশে সামান্য কারু খচিত, অপরখানি পিঙ্গলাভ ভগ্ন স্তম্ভখণ্ড মাত্র। বোধহয়, এই উপলখণ্ডদ্বয় পাড়ডাঙ্গা ভগ্ন বিহার হইতে নীত হইয়া থাকিবে।

নবদ্বীপের নিকটবর্তী জহ্নু নগরে পূর্বে প্রতি বৎসর ভাদ্রীয় সংক্রান্তিতে একটি বৃহতী মেলা হইত। এখনও উহা গাছপূজা নামে প্রচলিত এবং প্রতি বৎসর ঐ দিনেই হইয়া থাকে। (কবি কঙ্কণচণ্ডীতে ইহা ব্রাহ্মণী পূজা বলিয়া উল্লিখিত আছে। কথিত আছে এই স্থানেই জহ্নুমুনি এক গণ্ডুষে গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। এখানে গৃহস্থের বাটীতে কামধেনু ছিল এবং বহুলোক উহার পূজা করিত। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দেও এখানে অন্যূন ৩০টী সুন্দর শ্রীমন্দির ও একশত সংস্কৃত টোল বিদ্যমান ছিল। এক্ষণে মন্দিরের সংখ্যাও অতি অল্প এবং টোলের সংখ্যা মাত্র পঞ্চদশ।

উল্লিখিত ব্রাহ্মণী পূজা সম্পর্কে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থ হইতে দুইটি সংবাদ নীচে উদ্ধৃত করা হইল।

(১৪ আগষ্ট ১৮১৯। ৩১ শ্রাবণ ১২২৬)

"চান্দ সওদাগরের ইতিহাস অনেকে জ্ঞাত আছেন সেই চান্দ সওদাগরের স্থাপিত ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতি বৎসর নবদ্বীপের পশ্চিম মোং জান নগর গ্রামে হইয়া থাকে তাহাতে অনুমান লক্ষ লোক জমা হয় ঐ দিনে সে প্রদেশের সকল ভদ্র লোক ও আর সকল ইতর লোকেরাও পূজা দেয় বলিদান অনেক হয় এবং তদ্দেশীয় অধ্যাপকেরা আপন ছাত্র সঙ্গে করিয়া সেখানে যান ও অধ্যাপকে২ ও ছাত্রে২ বিচার হইয়া জয় পরাজয় নিশ্চয় হয়। সংপ্রতি সে পূজা আগামি রবিবারে হইবেক।"

(২৭ নবেম্বর ১৮১৯। ১৩ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

"মোং নবদ্বীপের পশ্চিম এক ক্রোশ ও পূর্বস্থালীর দক্ষিণ এক ক্রোশ ব্রহ্মাণীতলা নামে এক প্রসিদ্ধ স্থান আছে সে স্থান কোন গ্রামের মধ্যে নহে ও গ্রামহইতে বিস্তর দূর নহে চারি দিকে মাঠ মধ্যে পাঁচ ছয়টা বট বৃক্ষ আছে তাহার মধ্যে এক ইষ্টকময় মঞ্চ ঐ মঞ্চের উপরে ব্রহ্মাণীর ঘট স্থাপন আছে তাহাতে ব্রহ্মাণীর পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং প্রতিবৎসর সেখানে শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বড় মেলা হইয়া থাকে তাহা পূর্বে ছাপান গিয়াছে।

সম্প্রতি ২৯ কার্তিক ১৩ নবেম্বর শনিবার রাত্রি যোগে ঐ ব্রহ্মাণীতলায় অত্যাশ্চর্য্য রূপ পূজা হইয়াছে তাহার বিবরণ এই অষ্টোত্তর শত ছাগ ও দ্বাদশ মহিষ বলিদান ও চেলির শাড়ী ও তসরের শাড়ী বিশ পঁচিশখান ও প্রধান নৈবেদ্য আটখান তাহার প্রত্যেক নৈবেদ্য অনুমান দুই২ মোন আতপ তণ্ডুল ও তদুপযুক্ত উপকরণাদি। এই ২ সকল সামগ্রী দিয়া গুপ্তরূপে পূজা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সে রাত্রিতে কেহই তাহার অনুসন্ধান পায় নাই পর দিনে প্রাতঃকালে নিকটস্থ গ্রামের লোকেরা গিয়া দেখিল যে সেই২ নৈবেদ্য ও শাড়ী ও অষ্টোত্তর শত ছাগ মুণ্ড ও দ্বাদশ মহিষ মুণ্ড ইত্যাদি অবিকৃত আছে। এবং ছাগ ও মহিষের শরীর নাই কেবল বেদীর উপরে মুণ্ড মাত্র এবং হাড়ি না পুছিয়া এই সকল বৃহৎ মহিষাদি বলিদান করিয়াছে। এই আশ্চর্য যে এত বৃহৎ কর্ম্ম এক রাত্রিতে নিষ্পন্ন করিয়াছে ইহা কেহ জানিতে পারে নাই। এবং ভাগ্যবান লোক ব্যতিরেকে এমত পূজা দিতে অন্যে পারে না এবং সে ভাগ্যবান ব্যক্তি কি নিমিত্ত অপ্রকাশ রূপে এমত মহাপূজা করিয়াছেন তাহার কারণ জানা যায় নাই। কিন্তু ওই বিষয় মোং পূর্বস্থলীর দারোগা এইমাত্র সন্ধান করিল যে সেই শনিবার অধিক রাত্রির সময়ে এক ব্যক্তি এক মুদীর দোকান হইতে লণ্ঠন

জ্বালাইয়া লইয়া গিয়াছিল আর কিছু কেহ কহিতে পারিল না।"

ইহাভিন্ন নবদ্বীপের বিভিন্ন পল্লীতে বৎসরের বিভিন্ন সময় সর্বজনীন ও ব্যক্তি-বিশেষের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, রাসযাত্রা, কার্তিকপূজা, শিবের গাজন প্রভৃতি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নবদ্বীপে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য আখড়া

তোতা রামদাস বাবাজি—নবদ্বীপের বৈষ্ণব সাধুদিগের বিষয় যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাঁহার মধ্যে তোতা রামদাস বাবাজি প্রধান। তাঁহার কার্য-দক্ষতা, পাণ্ডিত্য ও বৈরাগ্য অতুলনীয় ছিল। শুনা যায় তিনি দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার নাম রামদাস মিশ্র ছিল। তিনি প্রথম যৌবনে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিবার জন্য নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন, কিন্তু পাঠ শেষ করিবার পূর্বেই প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায়, বৃন্দাবন চলিয়া যান। সেই স্থানে বহু দিন ভজন করিবার পর, মহাপ্রভু স্বপ্নে তাঁহাকে নবদ্বীপ আসিয়া স্বীয় সেবা পর্যবেক্ষণ করিতে আদেশ করেন। ষড়্‌দর্শনে তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য দেখিয়া মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে "তোতা" উপাধি দেন। তখন হইতে তিনি তোতা রামদাস নামে প্রসিদ্ধ হন।

রামদাস গিরিধারীর সেবা করিতেন। ঐ ঠাকুর তাঁহার নিকট গাছ তলাতেই থাকিতেন। মহারাজের সহিত কয়েকবার আলাপের পর মহারাজ (কৃষ্ণচন্দ্র) তাঁহার ঠাকুরের আশ্রম নির্মাণের জন্য ঐ গাছ তলার পার্শ্ববর্তী ৬/০ বিঘা জমি নিষ্কর দান করেন। ঐ জমির উপর তোতা রামদাস আখড়া করিয়া ঠাকুর সেবা করিতে থাকেন। ঐ আখড়ার নাম বড় আখড়া। উহা এখনও তোতা রামদাসের শিষ্য পরম্পরা ভোগ করিয়া আসিতেছে।

তোতা রামদাসের যত্নে মহাপ্রভুর বর্তমান অঙ্গনের জমি ও পুরাতন মন্দির নির্মিত হয়। ঐ স্থানে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া নিত্য সেবার ব্যবস্থা হয়।

কয়েকজন নবদ্বীপবাসী একদা তোতারামদাস কি করেন দেখিবার উদ্দেশ্যে বড় আখড়ায় একখানি কালী মূর্তি ফেলিয়া দেন। তোতা রামদাস মূর্তি পাইয়া কালী-পূজার দিন অতি ভক্তিভরে পূজা করেন। মহারাজ ইহা শুনিয়া প্রীতিভরে প্রতি বর্ষে কালীপূজার ব্যয় রাজসরকার হইতে প্রদত্ত হইবে স্থির করিয়া দেন। রাজসরকারের একখানি দলিল হইতে জানা যায়, তোতা রামদাস ১২০০ সালে বর্তমান ছিলেন।

মাধব চন্দ্র দত্ত—বড় আখড়ার সম্মুখেই প্রকাণ্ড নাটমন্দির আছে। প্রাচীন নাটমন্দির নষ্ট হইয়া যাওয়ায়, রাজেন্দ্র কুমার রায় নামক এক ব্যক্তি অল্প দিন হইল বর্তমান নাটমন্দির করিয়া দিয়াছেন। প্রাচীন নাট-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত ধনী, মাধব বাবুর বাজারের প্রতিষ্ঠাতা মাধব চন্দ্র দত্ত। এই মাধববাবুই নবদ্বীপে গান মেলার প্রতিষ্ঠাতা, বড় আখড়াই এই মেলার আদি স্থান। কলিযুগাদ্যা মাঘী পূর্ণিমায় পুণ্য তিথির স্মরণ উপলক্ষেই ইহা সূচিত হইয়াছিল। নগর-কীর্তন কালে মাধব দুই হাতে করিয়া ভক্তগণের উপর রজ নিক্ষেপ করিতে থাকেন। এই ঘটনা হইতে এই পর্বের নাম ধূলোট হইয়াছে। ১২৫০ সালে ধূলোট পর্বের আরম্ভ।

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ ও তাঁহার মন্দির—লর্ড হেষ্টিংসের দেওয়ান কান্দি রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ শেষ বয়সে নবদ্বীপে আসিয়া বাস করেন। তিনি পরম বৈষ্ণব ও শ্রীচৈতন্যদেবের পরম ভক্ত ছিলেন। স্বীয় পৌত্র লালাবাবুকে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া তিনি দুই-তিন শত বৈরাগীসহ নবদ্বীপ আগমন করেন, এবং গৌরগৃহ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হন। তখন নবদ্বীপে গৌরাঙ্গের গৃহ দেখিয়াছিলেন এমন অনেক লোক বর্তমান ছিলেন। তিনি তাহাদের মুখে শুনিয়া এবং প্রমাণাদি দ্বারা গৌর গৃহের স্থান নিরূপণ করেন। নবদ্বীপের নিকটবর্তী ঐ স্থানকে তখন রামচন্দ্রপুর বলিত। তিনি সেই স্থানে ১১৯৯ সালের (১৭৯২ খৃঃ) ১লা অগ্রহায়ণ ৬০ ফুট হইতেও উচ্চ এক সুন্দর মন্দির নির্মাণ পূর্বক, তথায় শ্রীগোবিন্দ, গোপীনাথ, কৃষ্ণজী এবং মদনমোহনজীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাদের সেবার জন্য বহু দেবোত্তর সম্পত্তি নির্দেশ করিয়া যান।

এই মন্দিরটি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দেও বর্তমান ছিল, এবং ১৮২১ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাগর্ভে পতিত হয়।

মণিপুর রাজবাটী—মণিপুরবাসীগণ চৈতন্য মহাপ্রভুর উপাসক। তাহারা পরম বৈষ্ণব এবং নরোত্তমদাস ঠাকুরের পরিবার। মণিপুরাধিপতি মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র সিংহ বৃদ্ধ বয়সে নবদ্বীপে বাস করিবার অভিলাষে স্বীয় কন্যা "লাইরোইবী"-র সহিত এখানে আগমন করেন, এবং নবদ্বীপস্থ তেনর মৌজায় বাসস্থান নির্মাণ করিয়া মহাপ্রভুর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। লাইরোইবী দেবী এই বিগ্রহ সেবার ভার গ্রহণ করেন। তিনি মহাপ্রভুকে "অনুপা" নামে সম্বোধন করিতেন। ইঁহারা বংশ পরম্পরা এই দেবসেবা চালাইয়া আসিতেছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র মণিপুরাধিপতির অধ্যুষিত স্থানের নাম "মণিপুর" রাখেন।

সিদ্ধ চৈতন্য দাস—বিগত খৃষ্টীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে যে সকল বৈষ্ণব মহাত্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন, চৈতন্যদাস তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁহার পূর্বাশ্রম কোথায় ছিল, তাহা সঠিক জানা যায় না। তিনি প্রথম যৌবনে নবদ্বীপে আসেন। চৈতন্যদাস জীয়ড় নৃসিংহের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গোপীভাবে ভজনা আরম্ভ করেন। এবং কিছুদিন পর তিনি শ্রীখণ্ডে ও বৃন্দাবনে যাইয়া কঠোর ভজনা করেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। কিন্তু তাঁহার গৌরাগত চিত্ত কোথাও শান্তি না পাওয়ায়, তিনি নবদ্বীপে চলিয়া আসেন এবং শ্রীগৌরাঙ্গের মন্দিরেই বাস করিতে থাকেন। তিনি নিজেকে গৌরাঙ্গের নাগরী বলিয়া অভিমান করিতেন এবং সেই আবেশে নারীবেশ ধারণ করিয়া তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের বামপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন। সেই সময়ে এদেশের সকলেই বাবাজীকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার ন্যায় পণ্ডিত তৎকালে বৈষ্ণব সমাজে কেহ ছিল কিনা সন্দেহ। অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার ভজনের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে এবং বহু দূর দেশ হইতে বহু ভক্ত তাঁহার সঙ্গ করিতে নবদ্বীপে আসিতে থাকেন। নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার বিনয় ও পাণ্ডিত্যে আকৃষ্ট হইয়া সকলেই তাঁহার সঙ্গে মিশিতেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ এবং মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নবদ্বীপে আসেন। চৈতন্যদাস সর্বদাই "গোরা গোরা" নাম জপ করিতেন। এমনকি নিদ্রাকালেও শ্বাস-প্রশ্বাসে গোরা গোরা ধ্বনি উত্থিত হইত। দিবসের অধিকাংশ সময়েই তাঁহার আবেশে কাটিয়া যাইত। শেষ জীবনে তাঁহার আবেশ এত প্রগাঢ় হইয়া পড়িল যে কদাচিৎ তাঁহার বাহ্যস্ফূর্তি হইত। এই অবস্থায় একদিন আবেশে নাগরীবেশে তাঁহার প্রাণেশ্বর গৌরাঙ্গ প্রভুর বামে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘোমটার ভিতর দিয়া আড় নয়নে গৌরাঙ্গের মুখচন্দ্রের সুধা পান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মত্ততা আসিয়া পড়িল—লজ্জা সঙ্কোচ দূর হইয়া গেল; তিনি তাঁহার প্রাণের কথা—

"আমার ভজন হলো সারা, আমার পূজন হলো সারা।
শ্রীগৌরাঙ্গের কান্তা আমি, কান্ত আমার গোরা।।"

গৌরাঙ্গ প্রাঙ্গনে তাঁহার পুণ্য সমাধি আছে। সে স্থানে তাঁহার শিষ্য কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয় বহু দিন সেবা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার প্রশিষ্যেরা সেবা করেন।

সিদ্ধ জগন্নাথদাস বাবাজী—ইনি নবদ্বীপের আর একটি সিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা। জগন্নাথদাস বাবাজী শৃঙ্গার-বটের গোস্বামীদের মন্ত্র শিষ্য ছিলেন। লালাবাবুর ভেকদাতা গোবর্দ্ধনবাসী সিদ্ধ কৃষ্ণদাস বাবাজীর শিষ্য সূর্য্যকুণ্ডবাসী মধুসূদন দাস বাবাজী তাঁহার ভেক গুরু। জগন্নাথদাসের ব্রত পালনে অত্যন্ত নিষ্ঠা ছিল। তিনি ৩১ বৎসর বৃন্দাবনে সূর্য্যকুণ্ডে বাস করিয়া কঠোর ভজনা করেন এবং ভারতের সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। অতঃপর নবদ্বীপ আসিয়া বর্তমানে যেখানে ভজন কুটীর আছে, সেই স্থানে মাধব দত্ত প্রদত্ত দশ কাঠা জমিতে স্বীয় আশ্রম স্থাপন করেন। তিনি বলিতেন—ন'দেয় অপরাধ নাই এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহামন্ত্রেরও কোন অপরাধের বিচার নাই।

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
শ্রীঅদ্বৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ।।"

ইহাই মহাপ্রভুর মহামন্ত্র। জগন্নাথদাস ১৪৯ বৎসর বয়সে নবদ্বীপে দেহরক্ষা করেন।

নবদ্বীপে বর্তমান যে কয়টি আখড়া দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মধ্যে অনেকগুলিই ভোতা রামদাস বাবাজীর প্রশিষ্য দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে। ভোতা রামদাসের শিষ্য রঘুরামদাস বড় আখড়ার অধিকারী হন। ইঁহার অপর শিষ্য লছমনদাস পুরাণগঞ্জে রাধাকলুর পোঁতায় শ্রীবাসাঙ্গণ স্থাপন করেন। ঐ অঙ্গন গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে, বর্তমান স্থানে (১২৭৮ সন) শ্রীবাসাঙ্গণ স্থাপিত হয়। লছমনদাসের শিষ্য রামদাস ও তৎ শিষ্য হরিদাস বাবাজীর হস্ত হইতে শ্রীবাসাঙ্গণ নিত্যানন্দ বংশীয় নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামীর হস্তে যায়।

রঘুনাথদাসের শিষ্য রতনদাস নৃসিংহদেবের আখড়া স্থাপন করেন। কৃষ্ণদাস মোহান্ত নূতন আখড়া স্থাপন করেন। এই আখড়া স্থাপনে তিনি কলিকাতার মাধববাবু ও সোনামুখির রাজাদের নিকট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন। গোরাচাঁদদাস বাবাজী গোরাচাঁদের আখড়া স্থাপন করেন। সিদ্ধেশ্বরদাস বাবাজী সিদ্ধেশ্বরের আখড়া স্থাপন করেন। এই সকল আখড়ার অনেকগুলিই এখন বিগতশ্রী এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠাতার বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না।

"নিতাই গৌর রাধে শ্যাম" নামের প্রচারক রাধারমন-চরণদাস বাবাজী "নসী বাবুর বৈঠকখানা" ক্রয় করিয়া মঠ স্থাপন করেন। ঐ মঠে অদ্যাপি দেবসেবাদি চলিতেছে।

এখানে বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে বনচারী ও নিত্যানন্দ দাস প্রভৃতি বহু সিদ্ধ মহাত্মা ছিলেন। তাহাদের কথা বিশেষ কিছু জানা যায় না।

শ্রীনবদ্বীপধাম শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা স্থান বলিয়া যেমন বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীবৃন্দাবন তুল্য মান্য, তেমনি আবার ইহা শ্রীমহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কাহারও কাহারও জন্মস্থান বা আবাস ভূমি বলিয়া বৈষ্ণবগণ সকাশে শ্রীপাট বলিয়াও খ্যাত। এই নবদ্বীপ ব্যতীত আধুনিক নদীয়া জেলার মধ্যে আরো কতিপয় গ্রামে ঐরূপ শ্রীপাট বলিয়া বৈষ্ণবগণের নিকট মান্য। বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেমন শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার ভেদ তেমনি তাঁহার শ্রীচৈতন্য লীলার পার্ষদ গোপাল, উপগোপাল এবং মোহান্তগণও শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব লীলারই অভেদ সঙ্গী। তাহাদের মতানুযায়ী মহাপুরুষগণের নাম ও শ্রীপাট স্থান এইরূপ নির্দিষ্ট হয়।

শ্রীচৈতন্যদেবের সংখ্যাতীত ভক্তগণের মধ্যে কেবল মাত্র নবদ্বীপে কতিপয় প্রধানের পাট নীচে লিপিবদ্ধ করা হইল :

শ্রীধর (খোলা বেচা), মুকুন্দানন্দ পণ্ডিত, শ্রীবাস, মুরারী গুপ্ত পুরন্দর পণ্ডিত, গোবিন্দানন্দ, রামচন্দ্রপুরী, গোপীনাথাচার্য্য, আচার্য্যরত্ন, বনমালী, স্বরূপ দামোদর, বলভদ্র ভট্টাচার্য, নন্দন ব্রহ্মচারী, জগদানন্দ পণ্ডিত, মাধবাচার্য্য।

আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব (বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী)

শ্রীধাম নবদ্বীপে ধামেশ্বর শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর শুভ আবির্ভাব তিথি স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমাধবাচার্য গোস্বামী বংশীয় গোস্বামীগণ পরিচালিত উক্ত মন্দিরে গত ২০শে জানুয়ারী একটি স্মরণ সভার অনুষ্ঠান হয়। উক্ত সভায় পৌরোহিত করেন প্রভুপাদ শ্রীগৌরগোপাল গোস্বামী।

উৎসবটি সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলেন কলিকাতার আমড়াতলার ব্যবসায়ী সমাজ।

২২শে জানুয়ারী বিরাট অন্নমহোৎসব হয়। প্রায় একশত মণ চাউল ও ডাইল পাক করিয়া ভোগ নিবেদনান্তে জনসাধারণকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। নবদ্বীপ তাঁত হাটের যুবক কর্মিগণ উক্ত প্রসাদ বিতরণে বিশেষ সাহায্য করেন। ("যুগান্তর", ১৫ই মাঘ, ১৩৬৭)

কালীপূজা

নবদ্বীপ, ২০শে জানুয়ারী—স্থানীয় তন্তুবায়গণের প্রস্তুত পাঁচ হইতে ছয় লক্ষ টাকার কাপড় প্রতি সপ্তাহে এখানকার তাঁত-কাপড়ের হাটে বিক্রয় হয়। তন্তুবায়গণের মিলিত উদ্যোগে এবং হাটের পরিচালকদের আয়োজনে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও সমারোহে কালীপূজা এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ সম্পন্ন হইয়াছে।

এই উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী লোকশিক্ষামূলক উৎসবের প্রথম দুইদিন পণ্ডিত শ্রীআনন্দ গোপাল গোস্বামী ভাগবত পাঠ করেন ও সোদপুরের অনাথ বালক-বালিকাদিগের আশ্রম কর্তৃক সংগঠিত 'মিলন সংঘে'-র বালিকাগণ কৃষ্ণলীলা অভিনয় করেন। ইঁহার পর কবিয়াল শ্রীনকুল চন্দ্র সরকার এবং শ্রীনিশিকান্ত সরকারের দলের কবিগান হয় দুইদিন। নবদ্বীপ সমাজ কর্তৃক 'ভক্ত হরিদাস' ও 'নদের নিমাই' পালা দুইটির দুইদিন অভিনয়ের পর শেষ দিনে অগণিত জনসাধারণের মধ্যে পরিতৃপ্তি সংকারে প্রসাদ বিতরণের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এই বিরাট উৎসবে প্রতিদিন বহু সহস্র নরনারী যোগদান করিয়াছে এবং শৃঙ্খলার সহিত সমগ্র উৎসবটি সম্পন্ন হইয়াছে। ("যুগান্তর",১০ই মাঘ, ১৩৬৭)

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

"যুগান্তর" পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক "বাংলার লোক উৎসব ও লোক শিল্প" পর্যায়ে ধারাবাহিক ভাবে উক্ত পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহার মধ্যে ২২শে বৈশাখ, ১৩৬৭ সনে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ হইতে নবদ্বীপে "শিবের গাজন" বিষয়ক বিবরণীটি নীচে উদ্ধৃত করা হইল।

বাঙলাদেশের গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে শিব ঠাকুরকে নিয়ে সকলে গাজনে মাতে। নবদ্বীপের গাজনেও তেমনই মাতুনা। অন্যান্য জায়গার মত এখানকার গাজনেরও চেহারাটা মোটামুটি একই রকমের। এখানেও সমাজের উঁচু থাকের চাইতে বেশী করে তলার থাকের মানুষই সক্রিয় অংশ নেয়। গেরুয়াটারা গলায় কুশের সঙ্গে পাটা অর্থাৎ সূত্রগুচ্ছ ধারণ করা, হবিষ্যান্ন করা, শিবের পুজো করা, ফুলকাড়ানোর, শরীরের নানা স্থানে বাণ ফোঁড়া, কাঁটাতে, বঁটিতে, আগুনে ঝাঁপ খাওয়া, এ সমস্ত পরিচিত আচার অনুষ্ঠান তো আছেই। কিন্তু এখানকার গাজনে শিব ঠাকুরদের মন্দির থেকে বার ক'রে তাঁদের মাথায় ক'রে নিয়ে যে নাচের মিছিল বার হয়, সেটিই এখানকার সবচেয়ে বেশী দর্শনীয়। বাঙলা-দেশের আরও কয়েকটি গাঁয়ে শিবের কিংবা ধর্মের গাজনে ঠাকুরদের তামার পাত্র, পিঁড়ি কিংবা পাল্কিতে চাপিয়ে ভক্তদের নিয়ে যেতে দেখেছি, কখনও কখনও ভক্তদের নাচতেও দেখেছি। কিন্তু নবদ্বীপের নিশীথ রাত্রে শিবকে নিয়ে যে-রকম ধুম ক'রে সুসজ্জিত চতুর্দোলায় চড়িয়ে চতুর্দোলাশুদ্ধ নাচানো হয় ঢাক, কাঁসী, ডগরের সাথেসঙ্গেতে, আর সেই নটরাজ শিবের নাচের তালে তাল মিলিয়ে ভক্তরা যেমন ভাবে নাচে এমনটি আর কোথাও চোখে পড়েনি। নবদ্বীপের লোক বলে, "এ গাজন মানুষের নাচ নয়, শিবের নাচ। বাবা কৈলাসপতি বিশ্বম্ভরকে কি কেউ নাচাতে পারে? বাবা যে নিজেই নাটের রঙ্গে নাচছেন, আর সবাইকে নাচাচ্ছেন।" গাজনের এই শিব নাচ দেখবার জন্য সেখানে প'ড়ে যায় লোকের হুড়োহুড়ি, রাস্তার দু'ধারে কাতারে কাতারে লোক জমে। ঐ নাচে কেবল গাজনের সন্ন্যাসীরা নয়, যারা সন্ন্যাস নেয়নি এমন শত শত মানুষ এসে নাচে। গভীর বিশ্বাস নিয়ে, তাদের বলতে শুনেছি, "গাজনে সন্ন্যাস নাও না-নাও, তাঁর গাজনে তাঁর সঙ্গে যদি নাচ তবে দেহান্তে শিব ভক্তরূপে কৈলাসে তোমার অনন্তকাল স্থিতি।"

প্রাচীন শিবলিঙ্গ—নবদ্বীপে একটি আধটি শিব নয়, অনেকগুলি আছেন। "বুড়োশিব", "যোগনাথ শিব" "পাড়ডাঙ্গার শিব", "মালোদের শিব", "দণ্ডপাণি", "বালকনাথ", "এলানে", "পলকনাথ" প্রভৃতি। এই সমস্ত শিবের অধিকাংশেরই খুব প্রাচীনতার প্রসিদ্ধি। অনেক পুরনো কিংবদন্তী এঁদের সঙ্গে জড়ানো, এঁদের কারুর আকৃতি লম্বা নোড়ার মত, কারুর আকৃতি গোলাকার মসৃণ প্রস্তরস্তূপের মত, কারুর বা এব্ড়ো থেব্ড়ো চাঙ্গড়ের মত। লম্বা নোড়ার মত দেখতে যাঁদের গালা দিয়ে তাঁদের চোখ, মুখ, গোঁফ তৈরী করা। এই রকম কোনও লিঙ্গকে খাঁজকাটা পাথরের থামের ভগ্নাবশেষের মত দেখতে। কেউ কেউ অনুমান করেছেন, নবদ্বীপের এই রকম লিঙ্গমূর্তিগুলি প্রাচীন গৃহ-মন্দিরাদির ভগ্নাংশ। নবদ্বীপের পশ্চিমাংশে পাড়ডাঙ্গা, দক্ষিণ-পূর্বে পানশিলা ভালুকাবিল, নবদ্বীপ থেকে কিছু দূরে অবস্থিত স্বরূপগঞ্জের পথে সুবর্ণবিহার প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ ধর্মসাধনাকেন্দ্র, স্তূপ, বিহার প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা অনুমান ক'রে

চিন্তা ক'রতে চান, এগুলি ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধবিহার, মন্দির প্রভৃতি থেকে সংগৃহীত অংশ। বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসপ্রাপ্তির পর এগুলি প্রচ্ছন্ন "ধর্মের" রূপ নিয়েছিল। সেন-আমলে নব ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুজ্জীবনে সেই "ধর্ম" শিবে পরিণত হ'য়েছেন। বাঙলার গ্রামে গ্রামে অনেক প্রাচীন লিঙ্গ সম্বন্ধে নব যুগের এমন বিচারের কথা শোনা যায়। নবদ্বীপের ওপরে কালে কালে বৌদ্ধ, তান্ত্রিক, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্মমতের যে উত্তাল তরঙ্গ বয়ে গেছে, তার কথা বিচার ক'রলে এই রূপান্তরের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করা শক্ত।

নবদ্বীপের গাজন চৈত্রসংক্রান্তির ঠিক পাঁচ দিন আগে থেকে সুরু হয়। প্রতিদিনের নির্দিষ্ট অনুষ্ঠান অনুসারে ঐ পাঁচটি দিন ক্রমান্বয়ে পাঁচটি নামে অভিহিত; যথা "সাতগাজন", "ফুল", "ফল", "নীল" ও "চড়ক"।

সাতগাজন—"সাতগাজন" নবদ্বীপের সাতটি শিবের স্নানোৎসব। শুধু সাতটি শিবই নন, তাঁদের প্রত্যেকের মন্দিরে আর অন্যান্য যে সমস্ত লিঙ্গ এবং তাঁদের বাহন ষাঁড় আছেন তারাও স্নান করতে যান। এই স্নানযাত্রা বিকেল বেলায় হয়। গাজনের সন্ন্যাসীরা মাথায় নূতন গামছা পেতে তার ওপরে ঠাকুরদের নিয়ে মন্দির থেকে নাচতে নাচতে বেরোন। আর স্নান শেষে নাচতে নাচতে ঠাকুরদের নিয়ে মন্দিরে ফেরেন। সঙ্গে ঢাক আর কাঁসী বাজে তালে তালে। এ-নাচটির একটি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমে এক পা ফেলে সামনে এগুতে হবে, আবার এক পা ফেলে পিছনে যেতে হবে। এই ভাবে সন্ন্যাসীরা সাতটি মন্দির থেকে শিব ঠাকুরদের মাথায় ক'রে নিয়ে পোড়ামাতলায় এসে হাজির হন। পথে একবারও নাচ থামবে না। পোড়ামাতলাতে এসেও তাঁরা চক্রাকারে ঘুরবেন। এখানে সেখানে বহু দোকানপাট বসে গেছে বলে স্থান সংকুলান হয় না। আগের মত বিরাট চক্রাকারে নাচের রূপটি আর তেমন খুলছে না, সংকীর্ণ জায়গায় নাচের সময় সকলে যেন জট পাকিয়ে যান।

এখান থেকে সন্ন্যাসীরা নাচতে নাচতে গঙ্গার ঘাটে যাবেন, শিব ঠাকুরদের গঙ্গায় ডুবিয়ে স্নান করাবেন, তারপর ঘাটের ওপরে স্থাপন ক'রে আবার ডাবের জল, দুধ, গঙ্গাজল ঢেলে স্নান করাবেন, পুজো করবেন।

যোগনাথ কেবল সাত গাজনেই নয়, এর আগের দিনটিতে এবং গাজনের মধ্যে আরও কয়েক দিন এইভাবে স্নান করতে যান।

এই দিন রাত্তিরে প্রতি মন্দিরের সামনে আর এক দফা নাচ আর তার সঙ্গে লাঠি খেলা হয়। আগে বেশ ভালো ভালো লাঠিয়াল ছিলেন। কৈবর্ত, বাগ্দী প্রভৃতি বাঙলার বিখ্যাত বীর সম্প্রদায়ের লাঠিয়ালরা এসে এতে নামতেন। শুধু তাঁরাই নন, নবদ্বীপের কুলশীল-মর্যাদা-সম্পন্ন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সন্তান এসে এতে যোগ দিতেন। এখন এতে আগেকার দিনের স্পোর্টসম্যান স্পিরিট আর নেই। পারস্পারিক রেষারেষি, ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা গ্রহণের বাসনায় নবদ্বীপের গাজনের লাঠি-খেলা এখন কলঙ্কর, ভীতিপ্রদ মারপিটের রূপ নিচ্ছে—প্রাচীনদের মুখে এই অভিযোগ আমি শুনেছি।

নিশীথ রাত্রির নৃত্যোৎসব—"ফুলের" দিনেই নবদ্বীপের প্রধান গাজন। শিবের মাথায় ফুল কাড়ানো, কাঁটাঝাঁপ প্রভৃতি এ-সমস্ত অনুষ্ঠান তো আছেই, নিশীথ রাত্রির নৃত্যোৎসব, মশাল পোড়ানো, "শ্মশান"-নাচানোই এই দিনের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান।

"বুড়োশিব", "যোগনাথ", "এলানে" প্রভৃতি শিবকে রূপোর মুখ পরিয়ে অলঙ্কারে সাজিয়ে সুসজ্জিত আলাদা আলাদা চতুর্দোলায় তুলে নিশীথ রাত্রির নৃত্যোৎসব সুরু হয়। সবচেয়ে উঁচু আর বাহারে দেখতে হয় যোগনাথের "নবরত্ন" চতুর্দোলটি। তার ন'টি চূড়ো। রাংতা, শোলা, রঙীন কাপড়, পটুয়াদের আঁকা পট দিয়ে সাজানো এই বিশাল বিচিত্র চতুর্দোলা গ্যাসের আলোর ঝাড়ে ঝলমল করে। বুনো বাউরীর দল এসে চতুর্দোলাগুলি বয়ে নিয়ে যায়। ঢাকের তালে তালে তারা নাচে আর শিবশুদ্ধ চতুর্দোলাকে নাচিয়ে নাচিয়ে মিছিল চলে। নবদ্বীপের বুড়োশিব প্রভৃতিকে এই গাজন আর শিবের বিয়ের সময় ছাড়া আর কোনও সময় অব্রাহ্মণে ছুঁতে পারে না। গাজনের সময় কিন্তু তিনি নাচবেন ছত্রিশ জাতের সঙ্গে। তাই ব্রাহ্মণ থেকে সুরু ক'রে সমাজের একেবারে নীচু

জাতেরও মানুষ এসে এই উৎসবে যোগ দেবে, চতুর্দোলা বইবে, লাঠি খেলবে, দেবতার জয়ধ্বনি দেবে। শিবের তখন সত্যিকারের গণদেবতার রূপ ফুটে ওঠে।

এই নৃত্যোৎসবে রাস্তার চারধারে জ্বালান হয় বিরাট মশাল। দশ বারো হাত লম্বা বাঁশের গায়ে আইবি কাঠ অর্থাৎ শুকনো অড়হর গাছের বিরাট স্তূপ আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে এই মশাল তৈরী করা হয়। এই মশালে আগুন ধরিয়ে টানতে টানতে নিয়ে যাওয়া হয় মিছিলের সঙ্গে। এক জায়গায় থামিয়ে রেখে এই মশাল পোড়ানো নিয়ম বিরুদ্ধ।

শ্মশান নাচ—আর এই সঙ্গে নাচবে "শ্মশান" অর্থাৎ একটি মৃতদেহ। শ্মশান চণ্ডাল শ্মশান থেকে আনবে সে মৃতদেহ। যদি আস্ত মৃতদেহ না মেলে তবে শ্মশান থেকে অন্ততঃ একটি কঙ্কালও সে সংগ্রহ করে আনবে। এই বছরের গাজনে আনা হয়েছিল অর্ধ গলিত একটি শব। এই শবকে পূজো ক'রে সিঁদুর মাখিয়ে, ধুনো জ্বালিয়ে আগে যোগনাথের মন্দিরের সামনে আনা হয়। শ্মশান চণ্ডাল এই শবদেহকে দুহাতে তুলে ধ'রে নাচায় ঢাকের তালে তালে। এই-ই "শ্মশান"-নাচ। এই শ্মশান ছাড়া যোগনাথ "পঙ্করত্নে" উঠবেন না, নৃত্যোৎসবে যাবেন না।

নবদ্বীপের নিশীথরাত্রির এই নৃত্যোৎসবে মিছিল এগোয় পোড়ামাতলার দিকে। চারধারে নাচে বিশালকায় মশালের তপ্ত অগ্নিশিখা, নাচে শ্মশানচণ্ডালের হাতে বীভৎস শব। লাঠি হাতে লাঠিয়াল নাচে, ঢাক কাঁধে ঢাকী, কাঁসী হাতে কাঁসাই। আর এদের সঙ্গে বাহকদের কাঁধে নাচে শিবের চতুর্দোলা। ডগর আর ঢাকের গুরু গুরু আওয়াজ ওঠে—কখনও ধীরমন্থর গতিতে কখনও খুব জলদে। সবারই নাচের তাল যেন ঢাকের তালেরই সঙ্গে বাঁধা। শিবের জয়ধ্বনিতে, লাঠিয়ালদের কোলাহলে, বোমপটকার বিস্ফোরণে এই মিছিল ভয়ঙ্কর হয়ে উঠে।

কালার্করুদ্রের পূজা—নবদ্বীপে বুড়োশিবের নীল পূজাও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। সেখানকার রাধিকা চতুষ্পাঠীর আচার্য শ্রীরামপ্রসাদ পঞ্চতীর্থ গোস্বামী মহাশয়ের মুখে শুনেছি, সেখানে গৃহস্থবাড়ী থেকে বুড়োশিবের মন্দিরে নীলপুজো পাঠানোর পর্ব দিনের বেলায় মধ্যেই সেরে ফেলা হয় এবং পুরোহিত প্রচলিত সাধারণ শিবমন্ত্রেই সে-পুজো করেন। কিন্তু এইদিন রাত্রে বুড়োশিবের মন্দিরে যে আর একটা নীলপুজো হয় সেটা সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। গৃহস্থদের পুজোর সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। আভিচারিক ক্রিয়াকর্মে পটু ব্রাহ্মণেরই ওপর রাত্রির এই পুজোর ভার দেওয়া হয়। তখন শিবকে মন্দিরের ভেতরে নয়, বাইরে চাতালের ওপরে এনে পুজো করা হয়। কালার্করুদ্রদেবের ধ্যানে শিবের ভৈরবরূপের পুজো তখন চলবে। ঐ ধ্যানের মন্ত্র :

ওঁ উদ্যন্মার্তণ্ড কোটি প্রতিমতনুরুচিং সোম সূর্যাগ্নিনেত্রম্।
বিদ্যুজ্জালাকলাপোজ্জ্বলবিপুলজটাজুট বদ্ধেন্দুখণ্ডম্॥
ঘণ্টাষ্টিকাভয়েষ্টাঙ্গপিনিজকভুজৈবিভ্রতং ভীষনাঙ্গম্।
শ্রীমকোলার্করুদ্রং প্রণতভয়হরং সাট্টহাসং ভজামঃ॥

বরাহপুরাণ থেকে এই ধ্যানমন্ত্র গৃহীত। এর অর্থ—"উদীয়মান কোটি সূর্যের মত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ দেহ কালার্করুদ্রদেবের। তাঁর তিনটি নয়নে চাঁদ, সূর্য আর আগুন জ্বলছে। বিদ্যুৎশিখার মত দীপ্ত তাঁর বিরাট জটাভার, তাতে চন্দ্রকলা সংলগ্ন। তাঁর চার হাতে ঘণ্টা, কুঠার, বর আর অভয়মুদ্রা। তিনি অট্টহাস্য ক'রছেন।" যম, সূর্য, রুদ্র এই তিন ভীষনোজ্জ্বল দেবতার নাম আর ভাবকল্পনায় কালার্করুদ্রের অর্চনা হোম প্রভৃতি অনুষ্ঠান পরিকল্পিত। এই পুজোতে পশুবলিদানের বিধি, তাই বুড়োশিবের এই নীলপুজোতে আগে ছাগ বলিদান হত। বছর ১৪।১৫ এই বলিদান বন্ধ আছে।

এই নীলপুজোর রাত্রে নবদ্বীপের বাজারের মৎসজীবী সম্প্রদায় যাঁরা "তুরো" নামে পরিচিত, তাঁদের কাছ থেকে বুড়োশিবের কাছে পুজো আসে ফলমূল, মিষ্টান্ন, পুষ্পোচার প্রভৃতির মাটির শরায় রেখে, শরাগুলি বাঁশের লম্বা মই-এর ওপরে থরে থরে সাজিয়ে তুরোরা ঢাক বাজাতে বাজাতে সেই মই কাঁধে করে বুড়োশিবের মন্দিরে নিয়ে আসেন। নিশীথরাত্রে শবের পুজো, শব ও শিব নিয়ে নৃত্যোৎসব, নীলপুজোর রাত্রে কালার্করুদ্রের আরাধনা—এ সমস্ত তন্ত্রাচারেরই লক্ষণ।

রথযাত্রা

নবদ্বীপে রথযাত্রা উৎসব নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হয়। এই উপলক্ষে পোড়ামাতলায় মাটির বিভিন্ন ধরণের পুতুলের অনেক দোকান বসে।

("আনন্দবাজার পত্রিকা", ২৪শে আষাঢ়, ১৩৬৭)

রাসযাত্রা

নবদ্বীপের রাস উৎসব সম্পর্কে ১৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৬৫ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

"নবদ্বীপ, ৩০শে নভেম্বর—পশ্চিম বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব—নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমার উৎসব গত বুধবার সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। পূজার দিন সকাল হইতেই বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে দর্শনার্থীর ও বহিরাগত যাত্রীদের ভীড় জমিতে থাকে। সন্ধ্যার পর ভীড়ের চাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। অতিরিক্ত চাপের জন্য স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা সন্ধ্যার পর হইতেই কয়েকবার বন্ধ হইয়া যায়। ফলে পূজার মণ্ডপে ও রাস্তায় জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয় এবং ভীড়ের মধ্যে বহুলোক হারাইয়া যায়। সারারাত্রিব্যাপী অসংখ্য নরনারী প্রতিমা দেখিয়া বেড়ায়।

পরদিবস প্রতিমা নিরঞ্জন বেলা ১২টা হইতে শুরু করিয়া মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলে। বড় প্রতিমাগুলি উচ্চতায় ২০ ফুট হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত হইয়া থাকে। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাড়ীর ছাদগুলিতে অগণিত নরনারীতে ভর্ত্তি হইয়া যায়। এক বিরাট পুলিশ বাহিনী বিসর্জন শোভাযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করেন। খাদি ও গ্রাম সেবা সঙ্ঘ, শক্তি সমিতি, বয়েজ ইউনিয়ন ক্লাব এবং আরো কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান উভয় দিনই যাত্রী ও জনসাধারণের সুবিধার দিকে নজর রাখিয়াছিলেন।

মঙ্গলবার রাত্রিতে বাসে করিয়া ধাত্রীগ্রাম হইতে নবদ্বীপে রাস দেখিতে আসার সময় একটি লরীর ধাক্কায় ৩০ বৎসর বয়স্কা জনৈক মহিলার ডান হাতে অত্যন্ত আঘাত লাগে। তৎক্ষণাৎ নবদ্বীপ হাসপাতালে তাঁহাকে আনা হয় এবং ডান হাতখানি অস্ত্রপচার করিয়া বাদ দিতে হয়।"

নবদ্বীপের রাসযাত্রা উপলক্ষে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সেবা ব্যবস্থা সম্পর্কে ৫ই কার্তিক, ১৩৬৭ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকা" প্রকাশিত একটি সংবাদ :

"৩রা নভেম্বর হইতে নবদ্বীপে রাসযাত্রা উপলক্ষে যাত্রী সমাগমে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ হইতে সেবাকার্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। সঙ্ঘের প্রেমচাঁদ সুভদ্রামণী যাত্রী-নিবাসে প্রায় এক হাজার যাত্রীকে স্থান দেওয়া এবং সর্বত-ভাবে তাহাদের সহায়তা করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ও খোলা হইয়াছে। সঙ্ঘের যুগ্ম-সম্পাদক স্বামী যোগানন্দজী নবদ্বীপে উপস্থিত থাকিয়া সেবাকার্য পরিচালনা করিবেন। কোন প্রকার বিপন্ন বোধ করিলে সঙ্ঘের স্থানীয় শাখা মিউনিসিপ্যাল রোডে স্বামীজী অথবা সঙ্ঘের ভ্রামামান বাজধারী সেচ্ছাসেবককে তথ্য জানাইতে অনুরোধ জানান হইতেছে। যাঁহারা সঙ্ঘের যাত্রীনিবাসে স্থান পাইতে ইচ্ছুক তাঁহাদেরও স্বামীজীর সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিতে অনুরোধ জানান হইতেছে।

নবদ্বীপ, ৩০শে অক্টোবর—শ্রীধাম নবদ্বীপের ঐতিহাসিক রাসপূজা উপলক্ষে ইতিমধ্যেই নবদ্বীপে বেশ সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নবদ্বীপের রাস উপলক্ষে বহু দূর দূরান্ত হইতে অগণিত জনসমাগম হইয়া থাকে। এমন বাড়ী থাকে না যেখানে কোন না কোন আত্মীয়ের আবির্ভাব হয় না। তাই বিশেষ করিয়া বৎসরের এই বিশেষ দিনটির জন্য নবদ্বীপের গৃহস্থ সাধারণ বাড়ীতে খরচের জন্য প্রস্তুত হইয়াই থাকেন। নবদ্বীপবাসী যাঁহারা বাহিরে থাকেন তাঁহারা এই দিনটিতে নবদ্বীপে আসিবেনই।

এত বিরাটকায় মূর্তি তৈয়ারী করিয়া নিখুঁত সাজসজ্জার সমাবেশে একটি মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টির কলাকৌশল জানা আছে নবদ্বীপের শিল্পীবৃন্দের। বিশিষ্ট শিল্পীদের মধ্যে ধর্ম পাল, অনিল পাল, কানাই পাল, বলাই পাল, হাবুল পাল, রমেশ পাল, রমেন পাল ও জগদীশ বিশ্বাস প্রভৃতিদের নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রাচীন পূজানুষ্ঠানগুলির মধ্যে চারিচরাপাড়ার ভদ্রকালী, ব্যাদরাপাড়ার শবশিবা, আমড়াতলার মহিষ-মর্দিনী, মহাপ্রভুপাড়ার গোঁসাইগঙ্গা, যোগনঅতলার গৌরাঙ্গিণী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া বাগচীপাড়ার নৃত্যকালী, গানতলা রোডের মকরবাহিনী গঙ্গা, হরিসভাপাড়ার ভদ্রকালী, বুড়াশিবতলার বিন্ধ্য-বাসিনী, পোড়ামাতলা রোডের রণকালী, ফাঁসিতলা ঘাটের কৃষ্ণকালী, বঙ্গপাড়ার কালী, বাজার সমিতির কালী, আলোছাড়ার নিকটস্থ গঙ্গা, পাঁচমাথার রণচণ্ডী, অভয়া-মাতলার মহিষমর্দিনী, রামসীতাপাড়ার নয়নাভিরাম মহিষমর্দিনী ও বামাকালী, নন্দীপাড়ার মহিষমর্দিনী, তেঘরীপাড়ার বড়শ্যামা প্রভৃতি খুব উল্লেখযোগ্য।

দণ্ডপাণিতলার এলোকেশী, চেয়ারাপাড়ার এলানে কালী, রাধাপ্রেমের পাশের যোদ্ধবেশে শ্রীকৃষ্ণ, পোড়া-মাতলা রোডের বনকালী প্রভৃতি বেশ মনোরম। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

নবদ্বীপে রাসোৎসব সম্পর্কে বাংলা ১৩৬৭ সনের ২২শে, কার্তিক "যুগান্তর পত্রিকায়" প্রকাশিত একটি সংবাদ :

"নবদ্বীপ, ৪ঠা নভেম্বর—রাসযাত্রা উপলক্ষে এবার নবদ্বীপ সহরে অভূতপর্ব দর্শনার্থীর সমাগম পরিলক্ষিত হয়। এই রাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানে এই উপলক্ষে বিভিন্ন দেবদেবীর বিভিন্ন আকার ও প্রকারের অসংখ্য মূর্তি তৈয়ারী হয়। ত্রিতল সমান উচ্চ অথচ মনোরম গঠন নৈপুণ্য সম্পন্ন বিরাট বিরাট মূর্তিগুলি শিল্পনৈপুণ্যের দিক হইতে সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে অনন্য।

শুধু শিল্পনৈপুণ্যের জন্যই নয় রাসমেলায় আরও অনেক অনেক দর্শনীয় বস্তুর সন্ধান মিলে। বহুজনের মিলনের ক্ষেত্রও বটে। অল্প খরচে একটা অবসর বিনোদন ও আনন্দলাভের ক্ষেত্র হিসাবে ইহা তাই বড় জনপ্রিয়। বাংলাদেশের সকল স্থান হইতেই অগণিত নর-নারী এইদিন এখানে আসিয়া সমবেত হয়।

রাসমেলার অর্থনৈতিক দিকটাও বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। অসংখ্য মূর্তি তৈয়ারীর জন্য প্রয়োজন হয় অসংখ্য শিল্পীর। আবার আনুষঙ্গিক শ্রমশিল্পীরাও অনেক শ্রমদান করিয়া তবে মূর্তিগুলি সম্পূর্ণ করিয়া তুলেন। তাছাড়া অসংখ্য স্বল্প মূলধন সম্পন্ন ব্যবসায়ীর দল, হকারের দল বিভিন্ন প্রকারের ব্যবসায়ের মাধ্যমে বেশ কিছু লাভ করিয়া থাকেন। নবদ্বীপের ছোট-বড় সর্বপ্রকার ব্যবসায়ী সমিতি বৎসরের এই বিশেষ দিনটির জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকেন। বিগত কয়েক বছরের অস্বাভাবিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা প্রভৃতির পরে এবারের রাসমেলায় তাই যেন, তোড়জোড় হাঁকডাক এত বেশী হইয়াছে। ঢাক, ঢোল, শানাই, ব্যাণ্ডপার্টি প্রভৃতি বাদকের দলও প্রচুর অর্থ পাইয়া থাকে।

নবদ্বীপের এই রাসমেলা এবং অন্যান্য বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে দর্শনার্থীদের সমাগমের জন্য রেল কোম্পানী প্রচুর লাভবান হইয়া থাকেন। তাছাড়া ক্রমবর্ধমান নবদ্বীপ সহরের লোকসংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ। বহিরাগত এবং সহরের অধিবাসীদের সুবিধার্থে নবদ্বীপের জন্য কয়েকটি লোকাল ট্রেন অনতিবিলম্বে চালু হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া রাস মেলায় পর্যাপ্ত সংখ্যক স্পেশাল ট্রেনের অভাবে যাত্রীসাধারণের হয়রানি চরম সীমায় পৌঁছে।

প্রত্যেক তীর্থস্থানেই নদীতটে বা উপযুক্ত কোন কোন স্থানে তীর্থযাত্রীদের জন্য অনেকগুলি পায়খানা ও প্রস্রাবের জায়গা থাকে। কিন্তু নবদ্বীপে সেরূপ একটিও নাই। তাহার ফলে নবদ্বীপের গঙ্গাতট নর বিষ্টায় নরককুণ্ডে পরিণত হইয়া যায়।

পুলিশী ব্যবস্থা সত্ত্বেও অশ্লীলতা অব্যাহত।

শুক্রবার দিনআড়ং-এর সময় প্রচুর পুলিশের আনা-গোনা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ করিলাম যে, দর্শকবৃন্দের মধ্যে যথেষ্ট সমাজ-বিরোধী ব্যক্তির সমাবেশ হইয়াছে। মহিলাবৃন্দের পক্ষে দুর্বৃত্তেদের ব্যূহ ভেদ করিয়া যাওয়া এক প্রকার দুঃসাধ্য এবং মহিলাবৃন্দের যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার জন্যও কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই। ফলে মহিলাবৃন্দ শালীনতা বজায় রাখিয়া রাস্তায় চলিতে পারেন নাই এবং অসহায় ভাবে ইতস্ততঃ চলাফেরা করিয়াছেন।

রাসমেলা উপলক্ষে নবদ্বীপস্থ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, বয়েজ ইউনিয়ন ক্লাব, অরবিন্দ ক্লাব, শক্তি সমিতি প্রভৃতি অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে সেবাকার্য চালাইয়াছে।

শ্রীধাম মায়াপুর

মায়াপুর গঙ্গার পূর্বতীরে অবস্থিত। নবদ্বীপঘাট হইতে নৌকাযোগে জলঙ্গী বা খড়িয়া নদী পার হইয়া পদব্রজে বা গরু গাড়ীতে করিয়া মায়াপুরে যাইতে হয়। ইহাকে স্থানীয় কেহ কেহ মিঞাপুর বলিয়া থাকেন। স্টেশন হইতে মায়াপুরের দূরত্ব প্রায় দুই মাইল। নবদ্বীপ ঘাটের ঠিক পূর্ববর্তী স্টেশন মহেশগঞ্জে নামিয়াও পদব্রজে মায়াপুরে যাওয়া যায়। এই পথের দূরত্ব এক মাইলের কিছু বেশী।

বহু পণ্ডিত, ভক্ত ও পুরাতত্ত্ববিদের মতে মায়াপুরই প্রাচীন নবদ্বীপ এবং এই স্থানই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মস্থান। প্রাচীন ইতিহাস ও বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে যে নবদ্বীপ গঙ্গার পূর্বতটে অবস্থিত। গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত শহর নবদ্বীপকে তাঁহারা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের অন্তর্গত কোলদ্বীপ বা কুলিয়া-পাহাড়পুর হইতে অভিন্ন মনে করেন। তাঁহাদের মতে প্রাচীন নবদ্বীপ নগর গঙ্গার ভাঙ্গনে নদীসাৎ হইবার উপক্রম হইলে এই স্থানের অধিবাসিগণ পশ্চিমপারস্থিত কুলিয়ার চরে গিয়া বসবাস করেন এবং সেই স্থানেই কালক্রমে বর্তমান নবদ্বীপ শহর গড়িয়া উঠে। তাঁহারা আরও বলেন, যে সেনবংশীয় নৃপতি বল্লাল নবদ্বীপ বা নদীয়ায় গঙ্গাবাসের জন্য যে একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন ইহা অবিসম্বাদী ঐতিহাসিক সত্য। বল্লালের প্রসাদের ধ্বংসাবশেষ আজিও গঙ্গার পূর্বতীরে মায়াপুর হইতে অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর গ্রামে বিদ্যমান আছে। প্রাচীন নবদ্বীপের অন্ততঃ একাংশ যে এই স্থানে অবস্থিত ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত ও চৈতন্য মঙ্গল প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থে নবদ্বীপই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত আছে, উহাতে মায়াপুরের কোন উল্লেখ নাই। তবে প্রাচীন নবদ্বীপ যে বিভিন্ন নামে পরিচিত বহু পল্লীতে বিভক্ত ছিল তাহার উল্লেখ আছে। নরহরি চক্রবর্তী (বৈষ্ণব নাম ঘনশ্যাম দাস) প্রণীত "ভক্তি রত্নাকর" নামক গ্রন্থে নবদ্বীপ মধ্যবর্তী মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"নবদ্বীপ মধ্যে মায়াপুর নামে স্থান।
যথা জন্মিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥
যৈছে বৃন্দাবনে যোগপীঠ সুমধুর।
তৈছে নবদ্বীপে যোগপীঠ মায়াপুর॥"

শাস্ত্রমতে ভগবানের আবির্ভাব স্থানকে যোগপীঠ বলা হয়। সুতরাং নরহরি চক্রবর্তীর মতে মায়াপুরই শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান। "ভক্তি রত্নাকর" গ্রন্থে বর্ণিত ঘটনাবলীর ঐতিহাসিকতা বৈষ্ণব ও পণ্ডিত সমাজের বিশেষ অনুমোদিত। শ্রীচৈতন্যদেবের সামসাময়িক কাশীর দণ্ডী সমাজের নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী (শ্রীচৈতন্য কর্তৃক প্রদত্ত নবনাম প্রবোধানন্দ সরস্বতী) প্রণীত "নবদ্বীপ শতক" ও জগদানন্দের "প্রেম বিবর্ত্ত" নামক গ্রন্থে মায়াপুরের সবিশেষ উল্লেখ আছে। ১২৫১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "কায়স্থ কৌস্তুভ" নামক পুস্তকে "উর্দ্ধাম্নায় তন্ত্র" হইতে ধৃত একটি বচনে মায়াপুরই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, যথা "মায়াপুরে মহেশানি বারমেকং শচীসুতঃ।" "নদীয়াকাহিনী" নামক ঐতিহাসিক পুস্তকে ও "বিশ্বকোষ" অভিধানে মায়াপুরকেই শ্রীচৈতন্য-দেবের জন্মস্থানরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীন নবদ্বীপের অন্তর্গত মায়াপুর পল্লীই যে শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান সে সম্বন্ধে আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে বর্তমান মায়াপুর যে প্রাচীন মায়াপুর এবিষয়ে তথা প্রাচীন নবদ্বীপের প্রকৃত অবস্থান লইয়া মত বিরোধের অবসান আজিও হয় নাই।

সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মহাত্মা জগন্নাথদাস বাবাজী সর্ব-প্রথম বর্তমান মায়াপুরের প্রকাশ করেন। তাঁহার প্রশিষ্য ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সময়ই মায়াপুরের সমধিক প্রচার হয় এবং এখানে মঠ মন্দিরাদির প্রতিষ্ঠা হইতে থাকে। বর্তমানে মায়াপুর ক্রমশ একটি সুন্দর শহরে পরিণত হইতেছে এবং এখানে বহু দেবায়তন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আজকাল নবদ্বীপ ধামের যাত্রিগণের মধ্যে অনেকেই শহর নবদ্বীপ ও মায়াপুর এই উভয় স্থানই দর্শন করিয়া থাকেন। নিম্নে মায়াপুরের প্রধান দ্রষ্টব্য গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :

(ক) শ্রীশ্রীযোগপীঠ মন্দির বা শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মস্থান—এই মন্দির খুব উচ্চ ও দেখিতে অতি সুন্দর। রাত্রিকালে ইহার চূড়াসকল বিচিত্রবর্ণ বিদ্যুৎ আলোকের দ্বারা উদ্ভাসিত করা হয় এবং বহু দূর হইতে ইহা দৃষ্টিপথে পড়ে। বাংলাদেশের আর কোথাও সারা বছর ধরিয়া মন্দির চূড়ায় এই ভাবে আলোক সজ্জার ব্যবস্থা নাই। এই মন্দিরের মধ্যে শ্রীশ্রীগৌর-রাধামাধব, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মী প্রিয়া দেবী ও পঞ্চতত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাচার্য, গদাধর পণ্ডিত ও শ্রীবাস আচার্যের বিগ্রহ বিরাজমান। মন্দির প্রাঙ্গনের উত্তর পার্শ্বে ক্ষেত্রপাল নামক শিবের মন্দির অবস্থিত ও তৎপার্শ্বে নিম্ববৃক্ষতলে শচীমাতার সূতিকা গৃহে শয়ান শিশু নিমাই, নিকটে শচীমাতা ও জগন্নাথ মিশ্র উপবিষ্ট; ইহাই চৈতন্যদেবের জন্মস্থান বলিয়া এখানে পূজিত হয়। যোগপীঠ মন্দিরের পূর্বদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির ও দক্ষিণদিকে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ইন্‌স্টিট্যুট্ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন দ্বিতল ছাত্রাবাস অবস্থিত।

(খ) যোগপীঠ মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" বা শ্রীবাস অঙ্গন অবস্থিত। এখানে ভক্তগণ সহ সংকীর্তনরত গৌর-নিতাই ও অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। প্রবাদ, এই স্থানে কাজী সংকীর্তন দলের মৃদঙ্গ বা খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম "খোলভাঙ্গার ডাঙ্গা" হয়।

(গ) শ্রীবাস অঙ্গন হইতে পাকা রাস্তা ধরিয়া কিঞ্চিৎ উত্তরমুখে গেলে পথিপার্শ্বে "ঠাকুর ভক্তিবিনোদ রিসার্চ্চ ইন্‌স্টিট্যুট" নামক বৈষ্ণব গবেষণাগার ও অদ্বৈত ভবন দেখিতে পাওয়া যায়।

(ঘ) পূর্বোক্ত পথে উত্তরদিকে আর একটু অগ্রসর হইলে গৌড়ীয়-মঠের পূর্বাচার্য্য সরস্বতী মহারাজের ভজনস্থলী "ভক্তি-বিজয় ভবন" ও তাঁহার সমাধি দৃষ্ট হয়। ইহার নিকটেই এক উচ্চ ভূখণ্ডের উপর শ্রীচৈতন্য মঠ অবস্থিত। এই মঠটির শিল্প-নৈপুণ্যে বিশেষ প্রশংসনীয়। ইহার মোট উনত্রিশটি চূড়া আছে। মধ্যস্থলের গোলাকৃতি চূড়াটি ও তদুপরি স্থাপিত বিষ্ণুধ্বজ বহু দূর হইতে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মঠের মধ্যে গৌরাঙ্গদেব ও রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি নিত্য পূজিত হন। ইহার সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে প্রত্যহ অপরাহ্নে শাস্ত্র গ্রন্থাদি পাঠ হয়। এই মঠের চারিদিককার চারিটি কক্ষে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য-চতুষ্টয় যথা, মধ্বাচার্য, বিষ্ণুস্বামী, নিম্বার্ক ও রামানুজের প্রস্তর নির্মিত মূর্তি সংস্থাপিত আছে। ইহার পার্শ্বেই দক্ষিণদিকে বল্লাল দীঘির লুপ্তপ্রায় খাত দৃষ্ট হয়। এই দীঘির দক্ষিণ-পূর্ব তীরে মুরারি গুপ্তের ভবন অবস্থিত। এখানকার মন্দির মধ্যে রামসীতার বিগ্রহ স্থাপিত আছেন। চৈতন্য মঠের নিকটে গৌরকিশোর দাস বাবাজীর সমাধি মন্দির অবস্থিত। শেষোক্ত মন্দির মধ্যে চন্দ্রশেখর আচার্য্য ও তাঁহার পত্নীর মূর্তি আছে।

(ঙ) চাঁদকাজীর সমাধি—মায়াপুর হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল উত্তরে বামনপুকুর নামক গ্রামে চাঁদকাজীর সমাধি ও মহারাজ বল্লাল সেনের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বল্লাল ঢিবি দৃষ্ট হয়। চাঁদকাজীর প্রকৃত নাম মৌলানা সিরাজুদ্দিন। কথিত আছে, তিনি গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের শিক্ষক ছিলেন। এই কাজী প্রথমে শ্রীচৈতন্যদেবের সংকীর্ত্তনে বাধা দেন ও একবার সংকীর্তনকারিগণের খোল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা আদেশে নগর মধ্যে সংকীর্ত্তন রহিত হইলে, শ্রীচৈতন্যদেব ঐ আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া এক বিরাট সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রার সহিত কাজীর ভবনে গিয়া উপস্থিত হন এবং যুক্তি তর্কের দ্বারা তাঁহাকে স্বমতে আনয়ন করেন। কাজীর সমাধির উপর প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন একটি শাখা-প্রশাখা বিশিষ্ট গোলক-চাঁপা ফুলের গাছ আছে। এত বড় ও এত প্রাচীন গোলক চাঁপা গাছ বড় একটা দেখা যায় না। একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানের মধ্যে এই সমাধিটি অবস্থিত। ভক্ত বৈষ্ণবগণ এই সমাধিকে প্রণাম, অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। নিকটেই কাজীর প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি কারুকার্য্য খচিত প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

পূর্ব্ব বর্ণিত দ্রষ্টব্যগুলি ছাড়া মায়াপুরে গৌরকুণ্ড, নিতাইকুণ্ড শ্রীধর অঙ্গন, মহাপ্রভুরঘাট, মাধাইয়েরঘাট, বারকোণা ঘাট, নাগরিয়া ঘাট, জয়দেবের পাট, শিবের ডোবা প্রভৃতি আরও বহু দ্রষ্টব্য স্থান আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্মতিথি ফাল্গুনী পূর্ণিমা (দোল পূর্ণিমা) উপলক্ষে গৌড়ীয় মঠের তত্ত্বাবধানে শ্রীধাম নবদ্বীপ বা প্রাচীন নবদ্বীপ মণ্ডলের নয়টি দ্বীপ পরিক্রমার ব্যবস্থা করা হয় এবং ঐ পরিক্রমায় বহু ভক্ত যোগদান করেন। সমস্ত বৈষ্ণবপর্বই এখানে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

[পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ইং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" ১ম খণ্ড হইতে গৃহীত।]

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর জন্মোৎসব

নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে নব শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও দশদিন-ব্যাপী গৌরাঙ্গ জন্মোৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে ২৯শে ফাল্গুন ১৩৬৭ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত একটি সংবাদ :

"নবদ্বীপ ৭ই মার্চ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতি পরিব্রাজকাচার্য বিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের অধ্যক্ষতায় ১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা নবচূড়াবিশিষ্ট সুবিশাল শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীগৌরাবির্ভাব মহোৎসব উপলক্ষে দশদিনব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠান নবদ্বীপধামান্তর্গত শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১০ই ফাল্গুন হইতে ১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার পর্যন্ত সম্পন্ন হইয়াছে।

১২ই ফাল্গুন শুক্রবার—নবচূড়া বিশিষ্ট সুবিশাল শ্রীমন্দির ও উহার শীর্ষ চূড়ায় ধ্বজা ও চক্র প্রতিষ্ঠা কার্য এবং শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহগণের নব শ্রীমন্দিরে শুভ বিজয় অনুষ্ঠান, নাম সংকীর্তন, যজ্ঞ, অভিষেক, পূজা ও মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সহযোগে সম্পন্ন হয়।

১৮ই ফাল্গুন বৃহস্পতিবার—শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিবাসরে অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় বিশেষ ধর্ম সভার অধিবেশনে ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

১৯শে ফাল্গুন শুক্রবার—শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে বহু সহস্র নর-নারী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।"

জেলা : নদীয়া
থানা : চাপড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : হাতীশালা।১।২,১১১'৯৩।৫১১।৩,০৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোপ, জেলে, মালো, ধোপা, নাপিত, ডোম, বাগদী, পাটনী, ছত্রী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী। কৃষ্ণনগর-করিমপুর বর্ডার রোড হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিতে হয়। গ্রামের উত্তর দিকে প্রবাহিত জলঙ্গী নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও রাস উৎসব, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রে বাসন্তীপূজা।

রাস উৎসবটি প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের একাদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্যন্ত চারদিন-ব্যাপী চলে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। বারোয়ারী পূজা মণ্ডপে রাধা কৃষ্ণের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। স্বর্গীয় গগণ চন্দ্র সরকার ও স্বর্গীয় পাঁচু হালসানা এই গ্রামে রাস উৎসব প্রচলন করেন।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কাঁচা চালাঘরযুক্ত বারোয়ারী পূজা মণ্ডপ আছে। এই পূজামণ্ডপে গ্রামের যাবতীয় বারোয়ারী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। একটি বিরাট বট বৃক্ষের নীচে কালীদেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যায় এই স্থানেই কালীপূজা হয় এবং চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে গাজন উপলক্ষে এই স্থানে পূজা ও ছাগ বলি দেওয়া হয়।

প্রবাদ আছে, এই গ্রামে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের হাতীশালা ছিল; এই কারণেই নাকি গ্রামের নাম "হাতীশালা" হইয়াছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
হাতীশালা, নদীয়া।

২। গ্রাম : কল্যাণদহ। ৪৩।৫৭৭'৯০।২০০।১,০৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, কায়স্থ ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পনর মাইল দূরে কৃষ্ণনগর-সিটি রেলস্টেশন এবং দুই মাইল দূরে চাপড়া হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা এবং চৈত্র মাসে নীলপূজা ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহু কালের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি মাত্র দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীসহদেব চন্দ্র পাল, প্রধান শিক্ষক,
কল্যাণদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কল্যাণদহ, নদীয়া।

৩। গ্রাম : জলকর মথুরাপুর।
৭১।২৫৫'৬৭।১৪৫।৬৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গোয়ালা, নমঃশূদ্র ও নাপিত।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যথা—বৈষ্ণব পাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, ঘোষপাড়া এবং হালদার পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর সিটি এবং বাসষ্ট্যাণ্ড দৈয়ের বাজার।

(ঘ) পয়লা বৈশাখ ব্রহ্মাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে মনসাপূজা এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবপূজা।

এই গ্রামে এবং পাশের গ্রামে পর পর কয়েক বৎসর অগ্নিকাণ্ড ঘটিবার পর এই গ্রামে প্রথম ব্রহ্মা পূজার প্রচলন করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। পয়লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

শিবপূজার মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহব্যাপী।

(চ) গ্রামে একটি মনসাতলা, একটি কালীতলা, একটি ষষ্ঠীতলা ও একটি জহরাতলা এবং একটি শিবমন্দির আছে।

শ্রীঅজিত কুমার অধিকারী, শিক্ষক,
গ্রাম : জলকর মথুরপুর,
পোঃ আসাননগর, নদীয়া।

৪। গ্রাম : মহেশপুর। ৭৯।১,২৯২ ৪৯।২২৫।১,১৫৫

(ক) মাহিষ্য, বাগদী, নমঃশূদ্র ও গোপ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাজদিয়া। গ্রাম হইতে কিছু দূরে ভাসপুর নামক স্থানে মোটর-বাস পাওয়া যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে স্থানীয় হরিমন্দিরে অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। ইহাভিন্ন আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। উৎসবটি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি হরিমন্দির আছে; মন্দিরে কোন বিগ্রহ নাই।

শ্রীগৌর চন্দ্র ঘোষ, প্রধান শিক্ষক,
শিমুলিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : মহেশপুর,
পোঃ শিমুলিয়া, নদীয়া।

৫। গ্রাম : দৈয়ের বাজার (মৌজা: মহৎপুর)। ১০০।৭,৭৯৬ ১৫।১,৪৮২।৮,৫৪৬

(ক) মাহিষ্য, জেলে, কুমার, কামার, ছুতার, বৈরাগী ও গোয়ালা। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর সিটি। কৃষ্ণনগর-করিমপুর পাকা রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। উক্ত রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে পরিক্ষিৎ অধিকারী বাবার তিরোভাব উৎসব।

(ঙ) অধিকারী বাবার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পরিক্ষিৎ অধিকারী বাবার সমাধি মন্দির আছে; ইহা 'পরিক্ষিৎতলা' নামে এতদঞ্চলে খ্যাত।

শ্রীরামপদ বিশ্বাস, চাকুরী,
গ্রাম : দৈয়ের বাজার,
পোঃ মহৎপুর, নদীয়া।

জেলা : নদীয়া
থানা : চাপড়া

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব
(পরিক্ষিৎ অধিকারী)

দৈয়ের বাজার গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নবমী তিথিতে পরিক্ষিৎ অধিকারী নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণবের স্মৃতি স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিক্ষিৎ অধিকারী জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন; স্থানীয় গ্রামবাসী তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেন। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে পরিক্ষিৎ বাবা এই স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে গ্রামবাসীগণ তাঁহার মরদেহ গ্রামের উত্তর প্রান্তে সমাধিস্থ করেন এবং তাঁহার সমাধিস্থলে একটি ছোট আকারের মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানটি পরিক্ষিৎতলা নামে পরিচিত হয়। আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতেও বহু অনুরাগী ভক্তের দল এই উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবটি এতদঞ্চলের সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। সমাধিক্ষেত্রে উক্ত মহাপুরুষের উদ্দেশ্যে মালসা ভোগ ও ফলমূল মানত করা হয়। বর্তমান সেবায়েত শ্রীজয়কৃষ্ণ মহান্ত নামক জনৈক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তি।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কল্যাণদহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে নীলপূজা ও চড়ক উৎসব জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রাচীন। পূর্ব হইতে অর্থাৎ চৈত্রসংক্রান্তির সাতদিন উৎসব উপলক্ষে পূর্বে গ্রামবাসীর মধ্যে অনেকে সন্ন্যাস ব্রত পালন করেন। এই সময় তাঁহারা একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন এবং পবিত্রভাবে জীবন যাপন করেন। সন্ন্যাসীদের হাতে একটি করিয়া বেত্রদণ্ড থাকে। উৎসবের প্রথম দিন যথারীতি শিবের পূজা, দ্বিতীয় দিনে হোম পূজা হয়। দ্বিতীয় দিনের পূজায় সন্ন্যাসীগণ কপাল ফোঁড়ান এবং ভোর রাত্রিতে আগুনের মধ্যে নৃত্য (ফুলখেলা), কণ্টক নৃত্য ইত্যাদি বিবিধ আচার অনুষ্ঠান পালন করেন। উৎসবের তৃতীয় দিনে শিবপূজা ও দেবতার আশীষ গ্রহণ এবং চতুর্থ দিনে অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন ভুঁই বুনন ও চড়ক গাছে পাক খাইয়া উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। চড়ক পূজার দিন পিঠে বাণ বিদ্ধ করিয়া সন্ন্যাসীদের চড়ক গাছে পাক খাওয়া দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাগম হয়।

মনসাপূজা

জলকর মথুরাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহু কালের প্রাচীন। এই গ্রামে কয়েকটি পাথর খণ্ডকে মনসার ধ্যানে পূজা করা হয়। পূর্বে এই গ্রামে মনসা পূজা উৎসবটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইত। দশহরার দিন সকালে স্থানীয় গ্রামবাসী এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে যাত্রীরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া মনসার প্রতীক পাথরখণ্ডগুলিকে মাথায় লইয়া নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রা সহকারে নিকটবর্তী জলাঙ্গী নদীর শাখানদী কলিঙ্গতে স্নান করাইতে লইয়া যাইতেন এবং ঐ সময় কলিঙ্গ নদীতে দেবীসহ নৌকা বাইচখেলা হইত। কিন্তু এক্ষণে এই উৎসবের আড়ম্বর বহুলাংশে ম্লান হইয়া গিয়াছে।

শুনা যায় প্রায় দুই-তিন শত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের কতিপয় জেলে চাপড়া থানার অন্তর্গত বাগবাড়িয়া ইউনিয়নের ভাতিদালা গ্রামের মল্লিক পামের (মুসলমানদের পীরস্থান) পুকুরে মৎস্য শিকার করিতে যাইয়া জাগ দেওয়া ঘাটের উপর তেল সিন্দুর রঞ্জিত সাতটি পাথরখণ্ডকে খেলা করিতে দেখিয়া কৌতূহল-বশতঃ ঐগুলিকে জালে আবদ্ধ করেন এবং এই গ্রামে মঙ্গলানন্দ মণ্ডল নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে আনেন। মঙ্গলানন্দ মহাশয় ঐ রাত্রে স্বপ্নে জানিতে পারেন যে, পাথরখণ্ডগুলি মনসার প্রতীক। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় মঙ্গলানন্দের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তিনি মহারাজার অনুমতি ক্রমে মথুরাপুর গ্রামে অবস্থিত মহারাজের একটি আবাস গৃহে উক্ত পাথরখণ্ডগুলিকে

প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিত্য সেবা, ভোগ ও আরতির ব্যবস্থা করেন।

কোন এক বৎসর দশহরার দিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় পাশের গ্রাম মথুরাপুরে যাইয়া মনসাদেবীর উৎসবাদি করিতে গ্রামের জনসাধারণ বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় তাহারা মথুরাপুর রাজকুঠি হইতে মনসা দেবীকে এই জলকর মথুরাপুর গ্রামে আনিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। সেই অবধি এই গ্রামেই মনসার পূজাদি হইতেছে।

গ্রামের জনৈক ব্যক্তি মনসাদেবীর মন্দির নির্মাণের জন্য কিছু জমি দান করেন এবং মঙ্গলানন্দ মহাশয় ঐস্থানে দেবীর জন্য একটি খড়েরচালাযুক্ত ঘর নির্মাণ করেন। বর্তমানে ঐ ঘর নষ্ট হইয়া যাওয়ায় মনসাদেবীকে গ্রামের শিবমন্দিরের মধ্যে রাখিয়া নিত্যসেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। দেবীর পূর্বগৃহকে অদ্যাপিও লোকে "মনসার ভিটা" বলে। মনসার নিত্যপূজা ও উৎসবের ব্যয়ের জন্য কিছু দেবোত্তর জমি ছিল; বর্তমানে উহা হস্তান্তর হইয়া গিয়াছে। এখন গ্রামে প্রতি গৃহস্থ বাড়ীর কাহারও বিবাহ হইলে সেই পরিবারের নিকট হইতে মনসার নামে সংগৃহীত অর্থ হইতে দেবীর নিত্যপূজাদির ব্যয়-ভার বহন করা হয়।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ চাপড়া

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান মেলা
(পরিক্ষিৎ অধিকারী)

দৈয়ের বাজার গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের নবমী তিথিতে পরিক্ষিৎ অধিকারী নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির স্মরণ উৎসব উপলক্ষে তাঁহার সমাধি মন্দির সংলগ্ন জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলার জমি অধিকারী বাবার নামে উৎসর্গীকৃত। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় কলিদা, চাপড়া, ভাণ্ডারখোলা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট বসে; উহার অধিকাংশই ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারীর দোকানপাট।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কল্যাণদহ গ্রামে গত দশ বৎসর যাবত স্থানীয় উদ্বাস্তুগণের উদ্যোগে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে নীল পূজা ও চড়ক উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসিতেছে।

লক্ষ্মীপুর, গোয়ালডাঙ্গা, চাপড়া প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ হইতে প্রায় পাঁচ-সাত শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয় জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ স্থানীয়। তবে লক্ষ্মীপুর গ্রামের কুমারগণ হাঁড়িকুড়ি লইয়া প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, মনিহারী, চুড়ি-ঘুন্সী এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাই অধিক। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

জলকর মথুরাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবপূজা উপলক্ষে মহানটী জমিদারের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে।

কলিঙ্গ ও ভীমপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, সাইকেল এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বহিরগাছি, বাগমারা, লক্ষ্মীপুর, কৃষ্ণপুর, দৈয়ের বাজার প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় চল্লিশখানি দোকান-পাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। তাহাছাড়া, মেলায় প্রায় পনর-ষোলজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে খাবারের, মাটির পুতুলের এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, লোহার জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতি দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী, ভাসান গান এবং কবি গানের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই কবিগান ও ভাসান গানের দল আছে।

দুর্গাপূজার মেলা

মহেশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দশ কাঠা জমির উপর বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি-পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ গোবিন্দপুর ইউনিয়নের গ্রামসমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং ভীমপুর, শিমুলিয়া, কুলতলা প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, কাপড়চোপড়, বই-ছবি এবং কারুশিল্পজাত

দ্রব্যাদির মোট পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

হাতীশালা গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

শিবপুর, চাঁদেরঘাট, পুটিমারী, সোনপুকুর, মহেশনগর, ধর্মদহ, মুড়াগাছা প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়নগুলি হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মেলায় আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন এবং স্থানীয় ডোম সম্প্রদায়ের তৈয়ারী ধামাকুলা ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান এবং এই গ্রামের একটি দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়। কোন কোন বৎসর গ্রামের বাহির হইতে যাত্রার দল আনা হয়।

জেলা : নদীয়া
থানা : কৃষ্ণগঞ্জ
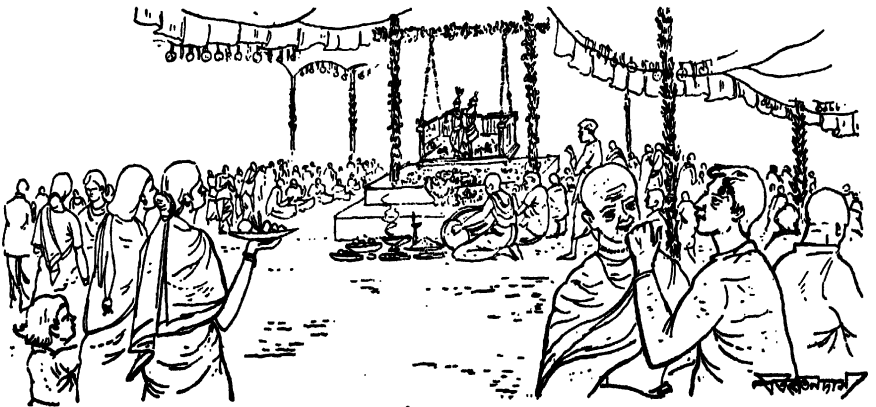
গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দিগাম্বরপুর। ২।১,১২৩'৭১।১৪৮।৮০৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, কুমার, তাঁতী, মালী, মুচি, বায়তি ও মুসলমান। গ্রামে কুমারপাড়া, দাসপাড়া, মুসলমানপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বানপুর হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। কেবলমাত্র শীতকালে কৃষ্ণনগর হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা ও সরস্বতীপূজা সর্বজনীন এবং এই দুইটি উৎসব উপলক্ষে যাত্রাভিনয়, জলসা ইত্যাদি আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয়। জন্মাষ্টমী ও দোল উৎসব ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাবল্লভ জীউর একটি পাকা মন্দির ও পঞ্চবটী বন আছে। রাধাবল্লভ জীউর মন্দিরের পশ্চিম দিকে একটি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

শ্রীগৌরীশঙ্কর বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
খালবোয়ালিয়া জি. এস্. প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীআনন্দ ভট্টাচার্য,
গ্রাম: দিগাম্বরপুর, পোঃ খালবোয়ালিয়া,
নদীয়া।

২। গ্রাম : বিষ্ণুপুর। ৩।১৮৫'৮১।১৭৫।৮৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, গোয়ালা, কুমার বাগ্দী, মালো, ময়রা, নাপিত, রাজবংশী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে মাহিষ্যপাড়া, কায়স্থপাড়া, সর্দারপাড়া, কুমারপাড়া, গোয়ালাপাড়া, মালোপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে আট-নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বানপুর। কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ পর্যন্ত বর্ষাকাল ব্যতীত বৎসরের অন্য সময় মোটরবাস চলাচল করে। কৃষ্ণগঞ্জ হইতে কাঁচা রাস্তায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী-পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে হরিপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। দুর্গাপূজাটি বহু বৎসরের প্রাচীন, তবে বাংলা ১৩১৪ সনে হইতে বিশেষ জাঁকজমকের সহিত উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামদেবতা হরিঠাকুরের উৎসবটি অতি প্রাচীন। দুর্গাপূজা, সরস্বতীপূজা ও কালীপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের পশ্চিমদিকে মোকামতলার মাঠে অনন্তদেবের মন্দির আছে। বর্তমানে যে-স্থানে মন্দিরটি অবস্থিত পূর্বে সেই স্থানে একটি ঝোপ ছিল। গত বাংলা ১৩৩০ সনে গ্রামের বীরভদ্র ঘোষ নামে একব্যক্তি ঐ ঝোপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্রাকৃতি ধাতু-নির্মিত দেবমূর্তি আবিষ্কার করেন। তারপর উহাকে অনন্তদেব নামে অভিহিত করিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে একটি মাটির বেদীর উপর স্থাপনের পর নিত্য পূজাদির ব্যবস্থা করা হয় এবং বীরভদ্র ঘোষ মহাশয়ই সর্বসম্মতিক্রমে অনন্তদেবের প্রথম সেবায়েত নির্বাচিত হন। রোগ-ব্যাধি মুক্তির আশায় প্রতি মঙ্গলবার আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী অনন্তদেবের নিকট মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন।

বাংলা ১৩৪৫ সনে উক্ত বেদীর উপর একটি সুন্দর ছোট মন্দির নির্মাণ করিয়া অনন্তদেবের পাশে

একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। মন্দির গাত্রে নিম্নলিখিত কথা কয়টি খোদিত আছে—

"ওঁ জগতধারায় জগতরূপায় পরম পদাম্বুজয়ে নমঃ"।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে অনন্তদেবের মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে। অবশ্য অদ্যাপিও ঐ শূন্য মন্দিরে অনন্তদেবের নিত্যপূজাদি হয়। বর্তমানে মৃত বীরভদ্রের কন্যা যুগলবালা ঘোষ নিত্য পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। প্রতি মঙ্গলবার অনন্তদেবের মন্দিরে বহুলোক সমাগম হয় বলিয়া এই স্থানে মঙ্গলবারে একটি হাট বসে। নিত্য-পূজাদির জন্য হাটের বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

গ্রামে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে হরিঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
খালবোয়ালিয়া জি. এস. প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খালবোয়ালিয়া, নদীয়া।

৩। গ্রাম : কৃষ্ণগঞ্জ। ৩১।৩০২'৭৮।২৬২।১,৩৭৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে গন্ধ-বণিকের সংখ্যাই বেশী। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যথা—গন্ধবণিকপাড়া, ময়রাপাড়া, নিকিরিপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে মাজদিয়া রেল-স্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে কৃষ্ণগঞ্জ পর্যন্ত মোটর বাস যাতায়াত করে। চূর্ণী নদী দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গন্ধেশ্বরীপূজা, শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, এবং চৈত্রমাসের শেষ তিনদিন একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে কাঠের আসনের উপর সাড়ম্বরে চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গন্ধেশ্বরী ও চড়ক পূজাটি বহুকালের প্রাচীন। গন্ধেশ্বরী ব্যতীত অন্যান্য পূজা-পার্বণগুলি সর্বজনীন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, প্রতি বৎসর চড়ক ও মনসাপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি ময়রা ও তেলেভাজার দোকান বসে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চড়ক ও মনসাপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র কর্মকার, শিক্ষক,
কৃষ্ণগঞ্জ প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়,
পোঃ কৃষ্ণগঞ্জ, নদীয়া।

৪। গ্রাম : মালীঘাটা। ৪৭।৮৭'৬৩।৫৫।৩৬০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, হালদার, কামার, গড়াই, নাপিত ইত্যাদি।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বানপুর হইতে মাজদিয়া পর্যন্ত একটি জেলবোর্ডের রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। মাজদিয়া হইতে মোটরবাস যাতায়াত করে। ইহাছাড়া, গ্রামের পশ্চিম দিকে মাথাভাঙ্গা (চূর্ণী) নদী দিয়া মালবাহী নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ১৫ই তারিখ হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত পনরদিনব্যাপী চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের লোকজন এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) ×

শ্রীমহীতোষ কুমার বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম : বিজয়পুর,
পোঃ বানপুর, নদীয়া।

৫। গ্রাম : টুঙ্গী। ৫৫।৯৫৬.২১।৪৬৫।২,৫২১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কায়স্থ, মাহিষ্য, গোয়ালা, জেলে, মালো, বাগ্দী, হাড়ি, মুচি, কামার ও ছুতার। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যথা—দাসপাড়া, গোয়ালা-পাড়া, মালোপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাজদিয়া। গ্রামের সন্নিহিত জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে পঞ্চম দোল এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্রসংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি বহু কালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বলাই চন্দ্র গুঁই নামক জনৈক ব্যক্তির বাড়ীতে বাবা পাঁচঠাকুরের (পঞ্চানন্দ) আবির্ভাব হয় বলিয়া ভক্তদের বিশ্বাস। পাঁচঠাকুর অন্যের অলক্ষ্যে থাকিয়া মানসিককারীদের নানারূপ ঔষধপত্রের বিধান দিয়া থাকেন। ঔষধ প্রাপ্তির আশায় দূর-দূরান্ত গ্রাম হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ অর্থ বিছানা-পত্র ইত্যাদি বাবা পাঁচ ঠাকুরের নামে মানসিক করা হয়। ইহছাড়া, গ্রামে একটি শিব মন্দির আছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই অঞ্চল জলাভূমি ছিল। প্রথমে কয়েক ঘর লোক এখানে ‘টোং” বাঁধিয়া বসবাস আরম্ভ করায় পরে গ্রামের নাম টুঙ্গী হইয়াছে।

শ্রীশ্যামা চরণ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
টুঙ্গী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাজদিয়া, নদীয়া।

৬। গ্রাম : খাটুরা। ৫৮।১,১৬৬.০২।২১৬।৯৫২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, গোয়ালা, কামার, কুমার, জোলা, মুচি, মুসলমান ও আদিবাসী। গ্রামে জেলেপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাজদিয়া। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। কেবলমাত্র বর্ষাকালে ইচ্ছামতী নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে তিনটি দুর্গাপূজা এবং মাঘ মাসে দুইটি সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে। ইহাছাড়া, প্রতি বৎসর তেঁতুল পীরের দরগায় আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে মানসিক পূজাদি হয়। লোকের বিশ্বাস, পীরের দরগায় মানত করিলে রোগ-ব্যাধি নিরাময় হয়। প্রধানতঃ সিন্নি মানত জানান হয়। পূর্বে প্রতি শুক্রবার পীরের স্থানে মেলা বসিত।

(ঙ) অম্বুবাচীর মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে তেঁতুল পীরের দরগা ভিন্ন একটি “শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রম” আছে। এই আশ্রমে প্রতি পূর্ণিমায় সাধন পীঠে এবং প্রতি অমাবস্যায় মহাপীঠে যথারীতি পূজার্চ্চনা ও উপনিষদ পাঠ হইয়া থাকে।

ইচ্ছামতী নদী খাড়ুর (মেয়েদের লোহার বালা) ন্যায় এই গ্রামকে বেষ্টন করিয়া থাকায় ইহার নাম খাড়ুয়া অপভ্রংশ খাটুয়া হইয়াছে।

শ্রীঅনাদি কুমার বিশ্বাস, শিক্ষক,
খাটুরা আশ্রম,
পোঃ গজনা, নদীয়া।

৭। গ্রাম : মাঝদিয়া কুঠীপাড়া (মৌজাঃ মাঝদিয়া)। ৫৯।১,০১৬.২৯।৬৩২।৩,২৯০

(ক) অধিকাংশ সাঁওতাল জাতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে মাজদিয়া রেলস্টেশন হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক। উৎসবগুলি

প্রাচীন। চড়ক পূজায় সাধারণত চৈত্র মাসের শেষ সাতদিন কয়েকজন লোক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া শিবের নামগান করিয়া বেড়ান। সংক্রান্তির দিন যথারীতি শিবপূজার পর উৎসবের সমাপ্তি হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চড়ক পূজা উপলক্ষে পূজার প্রাঙ্গণে ময়রা-তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার জিনিসের কতকগুলি দোকান বসে।

(ঙ) ×

(চ) নীল চাষের জন্য নীলকর সাহেবেরা এইস্থানে কুঠী নির্মাণ করায় গ্রামের নাম মাজদিয়া কুঠীপাড়া হইয়াছে।

শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ব্যানার্জি, চাকুরী,
গ্রাম : নাঘাটা,
পোঃ মাঝদিয়া, নদীয়া।

৮। গ্রাম : ননাগঞ্জ। ৬৪।১০৮'৬২।৮২।৪৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, ময়রা, স্বর্ণকার, সর্দার, ধোপা, নিকিরি ও নমঃশূদ্র।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাঝদিয়া। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও চৈত্র মাসে চড়ক পূজা। উৎসব দুইটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে বুড়ো সাহেব পীরের একটি স্থান আছে।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম : ননাগঞ্জ,
পোঃ ভাজনঘাট, নদীয়া।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত শিবনিবাস একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এ সম্পর্কে শ্রীকুমুদ রঞ্জন মল্লিক মহাশয়ের "নদীয়া কাহিনী" এবং ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল—

শিবনিবাসের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র নসর খাঁ নামক একজন দুর্দান্ত দস্যুকে তাঁহার রাজ্যের মধ্যে উৎপাত করিতে দেখিয়া চূর্নী নদীর পূর্ব্ব কূলে এক গভীর অরণ্যে তাহার আস্তানার সন্ধান পাইয়া তাহাকে শাসনার্থ উপযুক্ত সজ্জায় আসিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করেন। দস্যু দমন করিয়া তিনি এক রাত্রি তথায় বাস করেন। পরদিন প্রাতঃকালে তিনি যখন নদীকূলে বসিয়া মুখ প্রাক্ষলন করিতে ছিলেন তখন একটি রোহিৎ মৎস জল হইতে লাফাইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হয়। আন্দুলিয়া নিবাসী কৃপারাম রায় নামক জনৈক রাজজ্ঞাতি এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া কহিলেন, "মহারাজ এস্থান অতি রমণীয়, রাজভোগ সামগ্রী আপনা হইতে আসিয়া আপনার নজররূপে উপস্থিত হইল। এখানে বাস করিলে আপনি সুখী হইবেন।" রাজাও তখন বর্গীর উৎপাত হইতে আত্মরক্ষার্থ এইরূপ একটি নিরাপদ স্থান অনুসন্ধান করিতে ছিলেন। এক্ষণে এই স্থানটি সকলে মনোনীত করিলে তিনি উক্ত স্থানটিকে কঙ্কনাকারে নদী বেষ্টিত করিয়া স্বীয় দেওয়ান রঘুনন্দনের মতানুযায়ী এক সুন্দর পুরী নির্ম্মাণ করিলেন ও আপনার বাসভবন ও দুইটি সুবৃহৎ শিবমন্দির স্থাপন করিয়া দুইটি দুর্জ্জয় শিবলিঙ্গ ও অপর মন্দিরে রাম-সীতা স্থাপন করিলেন এবং শিবের নামে গ্রামের শিবনিবাস নামকরণ করিলেন। এই কঙ্কণাবেষ্টিত শিবনিবাসেই তিনি মহাসমারোহে অগ্নিহোত্র রাজপেয়ী যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। এরূপ সমৃদ্ধ যজ্ঞ কলিতে এই শেষ। এতদুপলক্ষে কাশী, কাঞ্চী প্রভৃতি স্থান হইতে সমাগত পণ্ডিত মণ্ডলী তাঁহাকে অগ্নিহোত্রী রাজপেয়ী আখ্যা প্রদান করেন। কালের ক্রীড়ায় এই শিবনিবাস এখন বনাকীর্ণ হইয়া ব্যাঘ্র শার্দ্দুলাদির নিবাসরূপে পরিণত হইয়াছে। প্রসাদ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং মন্দির কয়েকটিও সংস্কারাভাবে দিন দিন হতশ্রী হইতেছে।

এই শিবনিবাস তৎকালে কাশীতুল্য স্থান বলিয়া খ্যাত হয়। যথা প্রবাদ বাক্য—

শিবনিবাস তুল্য কাশী ধন্য কঙ্কণা।
উপরে বাজে দেব ঘড়ি নীচে বাজে ঠঙনা॥

Sibnibas—A village on the bank of the river Churni, nearly due east of Krishnagar, in thana Krishnaganj of the Headquarters

subdivision : the name of this village has been changed for the station Majhdia upon the main line of the Eastern Railway.

Sibnibās was established as a country seat in the first half of the 18th century by the great Mahārāja of Nadiā, Krishna Chandra. Two accounts are given of the reason why he selected the place. The first is that, while out hunting, he casually came upon it and was so struck with its beauty and pleasant situation on the banks of the Churni, that he built a palace there for his occasional residence. According to the second account, the place was selected because it was surrounded on three sides by the Churni and thus afforded a comparatively safe and easily defended retreat from the incursions of the Mahrattas who were giving much trouble in those days. It is said that through the bounty of the Mahārājā no less than 108 temples were constructed in the place. Sibnibās was deserted by Mahārāja Shiv Chandra, son of Krishna Chandra, and now only five temples survive in a more or less dilapidated condition. Of these three are of fair size, standing about 60 feet in height ; two contain images of Siva, 9 feet and 7½ feet high, and the third contains an image of Rāmchandra, about 4 feet high. A fair is held here on the Bhumi Ekadashi day, and is visited by about 15,000 persons. The village was purchased in 1860 by one Swarup Chandra Sarkār Chaudhuri, whose son, Brindāban Sarkār Chaudhuri, is said to have done much to improve its material condition.

In 1824, Sibnibās was visited by Bishop Heber on his way by boat to Dacca and the following account is taken from his Journal (London, 1828). The gentleman with whom he had an interview may have been a descendant of Krishna Chandra but he was certainly not the then Mahārājā of Nadia—

"We landed with the intention of walking to some pagodas whose high angular domes were seen above the trees of a thick wood, at some small distance, which wood, however, as we approached it, we found to be full of ruins, apparently of an interesting description .....As we advanced along the shore, the appearance of the ruins in the jungle became more unequivocal, and two very fine intelligent looking boys, whom we met, told me, in answer to my enquiries that the place was really Sibnibashi, that it was very large and very old, and there were good paths through the ruins ... .We found four pagodas, not large but of good architecture, and very picturesque ....The first (temple) which we visited was evidently the most modern, being, as the officiating Brahmin told us, only fifty-seven years old. In England we should have thought it at least 200, but in this climate a building soon assumes, without constant care, all the venerable tokens of antiquity. It was very clean however, and of good architecture, a square tower, surmounted by a pyramidal roof, with a high cloister of pointed arches surrounding it externally to within ten feet of the springing of the vault. The cloister was also vaulted, so that, as the Brahmin made us observe with visible pride, the whole roof was "pucka" or brick, and "belathee" or foreign. A very handsome gothic arch with an arabesque border, opened on the south side, and showed within the statue of Rama, seated on a lotus, with a gilt but tarnished umbrella over his head, and his wife, the earth-born Seeta, beside him. Form hence we went to two of the other temples, which were both octagonal, with domes not unlike those of glass-houses. They were both dedicated to Siva and contained nothing but the symbol of the Deity, of black marble......... Meantime the priest of Rama, who had received his fee before, and was well satisfied, came up with several of the villagers to ask if I would see the Rajah's palace. On my assenting they led us to a really noble gothic gateway, overgrown with beautiful broad-leaved ivy, but in good

preservation, and decidedly handsomer, though in pretty much the same style with the "Holy Gate" of the Kremlin in Moscow. Within this, which had apparently been the entrance into the city, extended a broken, but still stately, avenue of tall trees and on either side a wilderness of ruined buildings, overgrown with trees and brush-wood. I asked who had destroyed the place and was told Serajah Dowla, an answer which (as it was evidently a Hindoo ruin) fortunately suggested to me the name of the Rājā Kissen Chand. On asking whether this had been his residence, one of the peasants answered in the affirmative, adding that the Rājā's grand children yet lived hard-by............ Our guide meantime turned short to the right, and led us into what were evidently the ruins of a very extensive palace. Some parts of it reminded me of Conway Castel, and others of Bolton Abbey. It had towers like the former, though of less stately height, and had also long and striking cloisters of Gothic arches, but all overgrown with ivy and jungle, roofless and desolate. Here, however, in a court, whose gateway had still its old folding doors on their hinges, the two boys whom we had seen on the beach came forward to meet us, were announced to us as the great-grand-sons of Rājā Kissen Chand, and invited us very courteously in Persian to enter their father's dewlling.

(District Handbook, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. li—lii).

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ কৃষ্ণগঞ্জ

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

টুঙ্গী গ্রামে বিগ্রহহীন একটি শিব মন্দিরে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে নীলপূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির দুইদিন পূর্ব হইতে উৎসব শুরু হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

শোনা যায়, প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে এই গ্রাম নিবাসী শম্ভুনাথ বিশ্বাস নামে জনৈক ব্যক্তি কাশী হইতে একটি শিবলিঙ্গ আনেন এবং পরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে শিবলিঙ্গটিকে প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে একদিন রাত্রে বিশ্বাস মহাশয়ের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, শিবলিঙ্গটিকে আদিত্যপুরের মল্লিক মহাশয়দিগের বাড়ীতে প্রতিষ্ঠা করিয়া সেইস্থানে যথারীতি পূজাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। অতঃপর সেই সময় হইতে আদিত্যপুরের মল্লিক বাড়ীতেই শিবের নিত্যপূজাদি সারা বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়। কেবলমাত্র সংক্রান্তির কয়েকদিন পূর্বে এই গ্রামে উক্ত পরিত্যক্ত শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গটিকে আনিয়া উৎসব পালন করা হয় এবং উৎসবের শেষে শিবলিঙ্গটিকে পুনরায় মল্লিকবাড়ী রাখিয়া আসা হয়।

উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা, সর্বজনীন ভোজ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী মৌলী।

দোলযাত্রা

দিগাম্বরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাবল্লভ জীউর দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাধাবল্লভ বিগ্রহ গ্রামের জনৈক ব্যক্তি-বিশেষের গৃহদেবতা। একটি পাকা মন্দিরের অভ্যন্তরে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান কৃষ্ণের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত—ইহাই রাধাবল্লভ নামে খ্যাত। কৃষ্ণ মূর্তিটির হাতে মোহন বাঁশী এবং অঙ্গে নানা অলঙ্কার শোভিত। তবে মন্দিরটির অবস্থা জীর্ণ। পূর্বে দোল উৎসব উপলক্ষে মহাসমারোহ হইত, বর্তমানে সে সমারোহ আর নাই। উৎসবের দিন যথারীতি পূজা ও প্রসাদ বিতরণ হয়। রাধাবল্লভ জীউর, নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও এই গ্রামের এবং আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের লোকজন উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। সেবায়েত স্বয়ং বিগ্রহের পূজাদি করিয়া থাকেন। তিনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী রায়। উক্ত মন্দিরে রাধাবল্লভ জীউর বিগ্রহ ব্যতীত একটি দুই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ ও আরও কয়েকটি ছোট আকারের শিবলিঙ্গ এবং জয়দুর্গা, লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীর মূর্তি আছে। দোল উৎসব ভিন্ন প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে রাধাবল্লভ জীউর জন্মাষ্টমী উৎসব পালন করা হয়। এই উৎসবটিও বহু কালের প্রাচীন।

(পঞ্চমদোল)

টুঙ্গী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চমদোল অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি অশ্বত্থ গাছের শাখায় সিংহাসন ঝুলাইয়া তাহাতে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজাদি করা হয়। উৎসবান্তে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ গ্রামের শ্রীশম্ভুনাথ মুখার্জীর গৃহে লইয়া যাওয়া হয় এবং সারা বৎসর এইস্থানেই নিত্য সেবাদি হয়।

হরিপূজা

বিষ্ণুপুর গ্রামে হরিপূজা একটি প্রাচীন ও সর্বজনীন উৎসব। হরিঠাকুরের কোন মন্দির নাই, গ্রামের প্রান্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে হরিঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের যে-কোন মঙ্গলবারে হরিতলায় খেজুর পাতার দ্বারা মণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে মাটির বেদীর উপরে হরিঠাকুরের মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। হরিঠাকুরের মূর্তি অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চাবুক এবং বাম হস্তে লাগাম আছে। এই মূর্তি প্রতি বৎসরই নির্মাণ করা হয়।

পূজার প্রায় এক মাস পূর্ব হইতেই গ্রামের একটি কীর্তনের দল প্রতি সন্ধ্যায় মৃদঙ্গ ও করতাল লইয়া গ্রামের প্রত্যেকটি বাড়ী ঘুরিয়া হরিনাম সংকীর্তন করিয়া অবশেষে হরিতলায় গিয়া কীর্তন শেষ করেন। প্রতি সন্ধ্যায় অন্ততঃ একটি বাড়ীতে হরির লুঠ দেওয়া হয়। পূজার দিন সকাল নয়টা-দশটার সময় ধূলোট মহোৎসব আরম্ভ হয় এবং ইহাতে কীর্তনের দলের সঙ্গে গ্রামেবাসীরাও যোগ দেন। পরে কীর্তনের দলটি প্রতিটি গৃহে উপস্থিত হইয়া কিছুক্ষণ কীর্তন করেন। এই সময়ে গৃহস্থেরা ধূপধুনা জ্বালিয়া দেন ও শঙ্খধ্বনি করিতে থাকেন এবং মুড়ি মোয়া বা বাতাসা হরির লুঠ দেন। এইরূপে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়া অবশেষে কীর্তনীয়াগণ হরিতলায় আসিয়া কীর্তন শেষ করিলে জনৈক পুরোহিত বেদীর উপর স্থাপিত হরিঠাকুরের পূজা আরম্ভ করেন। হরিপূজার ধ্যানটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উন্মত্তবেশং করপঙ্কজভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুকপালম্।
আঘূর্ণিত নেত্রং স্ফুরিত সুকান্তং ভজে সুবৃত্তং
হরিপাললাখ্যম্॥

পূজার সময় আবার হরিসংকীর্তন আরম্ভ হয় এবং যতক্ষণ নামকীর্তন চলে, সেখানেও মুড়ির মোয়া, গুড়ের পাটালী, বাতাসা প্রভৃতি হরির লুঠ দেওয়া হয়। এই সময়ে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মণ্ডপে উপস্থিত হন এবং পূজা শেষে প্রসাদ গ্রহণ করেন।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ কৃষ্ণগঞ্জ

মেলা বিবরণী

অম্বুবাচীর মেলা

খাটুবা গ্রামে প্রতি বৎসর অম্বুবাচীর তিথিতে তেঁতুল পীরের দরগাতলায় ব্যক্তি-বিশেষের দুই-তিন বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দেড় হাজার যাত্রী পদব্রজে এবং গরুর গাড়ীতে মেলায় আসেন।

মেলাতে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি সরঞ্জাম এবং গ্রাম্য শিল্প সামগ্রীর অনেকগুলি দোকানপাট বসে ও বহু ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলি খোলা জায়গাতেই বসে এবং বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

চড়ক গাজন ও নীলপূজার মেলা

টুঙ্গী গ্রামে চড়ক উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির দিন বিকালে শিবমন্দিরের সন্নিকটে দেবোত্তর প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দেড় হাজারের মত যাত্রী আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ হাটিয়া, গরুর গাড়ীতে অথবা ঘোড়ার গাড়ীতে করিয়া মেলায় উপস্থিত হন।

মেলায় প্রায় ষাট-পঁয়ষট্টি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতে আসিয়া থাকেন। সমস্ত দোকানপাটগুলি খোলা জায়গাতেই বসে। উহার মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দ্রব্যাদির দোকান, কবিরাজী ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকান, গামছা, লুঙ্গি, তাঁতের কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি সরঞ্জামের দোকান এবং কয়েকটি বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারী, কুলোর দোকান এবং মাটির পুতুলের দোকানও থাকে। শিবপূজার জন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান গ্রহণ করা হয়। মেলাতে আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্রামের শ্রীমন্মথ নাথ বর্দ্ধন মহাশয়ের যাত্রাদলই অভিনয় করিয়া থাকেন। ইহাছাড়া, লটারী খেলা হয়। প্রায় চার-পাঁচ শত লোক যাত্রা দেখিতে আসেন।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে মাটিয়াঘাটা গ্রামে চড়ক উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের দুই চারিটি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ ছয় শত নর-নারীর সমাগম হয়। বিক্রেতারা স্থানীয়। প্রধানতঃ ইহাতে ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দ্রব্যাদির দোকানপাটই বসে।

দুর্গাপূজার মেলা

ননাগঞ্জ গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দ্রব্যের কয়েকটি দোকানপাট বসে। এবং রাত্রিকালে তরজা গান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। এই গ্রামেরই একটি যাত্রাদল যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন। যাত্রা ও তরজার আসরে প্রায় পাঁচ-সাত শত লোক জমায়েত হন।

কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে বিজয়া দশমী দিন অপরাহ্ণে মাথাভাঙ্গা নদীর উভয় তীরে একটি মেলা বসে। বিজয়া দশমীর দিন আশেপাশের প্রায় দশ পনরখানি গ্রাম হইতে দুর্গা প্রতিমা এই স্থানে আনিয়া মাথাভাঙ্গা নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই কারণে বিজয়া দশমীর দিন এই স্থানে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। প্রতিমা বিসর্জন দর্শনের জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে ঐ দিন প্রায় দশ-পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতা-গণ স্থানীয় এবং আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে আসেন। সমস্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ইত্যাদি

খাবারের দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, মনিহারী ও আতস বাজী ইত্যাদির দোকানপাটও বসে।

দোলযাত্রার মেলা

দিগাম্বরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাবল্লভ জীউর দোল উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর জমিতে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা বসিত। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। আশেপাশের গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় বারশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খোলা জায়গায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমস্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলে-ভাজার দোকান, মনিহারী দোকান এবং মাটির খেলনা, পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকান বসে। ইহাছাড়া অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর কয়েকটি দোকানপাট দেখিতে পাওয়া যায়।

জেলা : নদীয়া
থানা : নাকাসীপাড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : আকন্দডাঙ্গা। ১৪।৭৯২।২২৬।১,২৬৬

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, ভড়, মুচি, বাগ্‌দী ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে সাত মাইল পূর্বে বেথুয়াডহরী এবং ছয় মাইল উত্তর-পশ্চিমে দেবগ্রাম রেলস্টেশন। উভয় স্টেশন হইতেই কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামের আধ মাইল পশ্চিমে খোলসাপুর খেয়াঘাট হইতে নৌকাযোগে দাঁইহাট ও কাটোয়া সহর পর্যন্ত যাতায়াত করা যায় এবং স্টীমারযোগে পাটুলী, পূর্বস্থলী, নবদ্বীপ ও কলিকাতায় মালপত্র যাতায়াত করে।

(ঘ) কালীপূজা—বৎসরের মধ্যে একবার কোন অমাবস্যা তিথিতে বিশেষ ধূমধামের সহিত কালী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মধ্যে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে কালীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর এই স্থানেই দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি একদিনের এবং অমাবস্যার পরের দিন দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। ইহা গ্রামের হিন্দুদের সর্বজনীন উৎসব। পূজার দিন মানসিক ছাগ বলি হয়। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর বিভিন্ন সময়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, ঈদ ও বকর ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহরমের মেলা। চান্দ্রমাস অনুযায়ী দুই-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে কালীর পাকা বাঁধানো স্থান আছে।

আকন্দডাঙ্গা গ্রামটি নদীয়া জেলার একেবারে শেষ প্রান্তে বর্দ্ধমান জেলার সীমান্তে অবস্থিত। ইহার পশ্চিম দিকে আধ মাইলের মধ্যে ভাগীরথী নদী প্রবাহিত। পূর্বে এই গ্রামের দক্ষিণ দিক দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত ছিল। কিন্তু উহা গতি পরিবর্তন করিয়া পশ্চিম দিকে সরিয়া যাওয়ায় গ্রামের দক্ষিণে এক বিরাট চর পড়িয়াছে।

ভাগীরথী নদীর তীরে বর্তমানে যে স্থানে গ্রামটি অবস্থিত শোনা যায় পূর্বে এই স্থানটিতে আকন্দ গাছের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। আকন্দ গাছ কাটিয়া গ্রাম পত্তন হওয়ায় গ্রামের নাম আকন্দডাঙ্গা হইয়াছে। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে গ্রামটি বেশ বর্দ্ধিষ্ণু ও ঘন বসতিপূর্ণ ছিল, কিন্তু কালক্রমে ভাগীরথীর ভাঙ্গন আরম্ভ হওয়ায় বহু লোক গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যান, ফলে গ্রামটি শ্রীহীন হইয়া পড়ে। গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাই অধিক।

শ্রীমহম্মদ জকরিয়া মল্লিক, প্রধান শিক্ষক,
আকন্দডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মাঝেরগ্রাম, নদীয়া।

২। গ্রাম : জগদানন্দপুর। ৪৬।৯৭১।৮৯৯।৪,৭৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক, গোয়ালা, সাহা, ধোপা, নাপিত, কামার, নমঃশূদ্র, মুসলমান ও সাঁওতাল। গ্রাম পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী। গ্রামের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ রোড নামে জাতীয় সড়ক, পশ্চিমে নাকাসীপাড়া রোড এবং দক্ষিণ দিয়া পূর্ব দিকে পাটিকাবাড়ী হইয়া পেটোডাঙ্গা পর্যন্ত প্রশস্ত তিনটি রাস্তা আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামের মধ্যে যাতায়াতের আরও তিনটি রাস্তা আছে। এই সকল রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে। কৃষ্ণনগর হইতে বহরমপুর এবং কালীগঞ্জ পর্যন্ত বাসরুট এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে চারটি সর্বজনীন ও চারটি ব্যক্তি-বিশেষের দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালীপূজা এবং ভাদ্রসংক্রান্তিতে গ্রামের প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি পরিবারে মনসাপূজা হইয়া থাকে। কালীপূজাটি বহুকালের প্রাচীন। শোনা যায়, ইহা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রচলিত হইয়াছিল। পূর্বে কৃষ্ণনগরের রাজবংশের নামে পূজাটি সংকল্প করা হইত; বর্তমানে রাষ্ট্রের নামে সংকল্প করা হয়। কালীপূজার একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে। উক্ত বেদীর উপর কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া প্রতি বৎসর যথারীতি পূজা করা হয় এবং পূজান্তে পরের দিন মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়।

ইহাভিন্ন, গত তিন-চার বৎসর হইল এই গ্রামে একটি গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই মঠে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হইতেছে। মঠে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবের দারুময় মূর্তি এবং প্রস্তর নির্মিত পাথরে গোপাল ও রাধারাণী মূর্তির নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি গৌড়ীয় মঠ এবং কালীপূজার নির্দিষ্ট বাঁধান বেদী আছে।

এই স্থানে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রিয় পার্ষদ জগদানন্দ গোঁসাই-এর বাসস্থান অবস্থিত থাকায় এই গ্রামের নাম জগদানন্দপুর হইয়াছে।

শ্রীমহাদেব চন্দ্র সরকার, প্রধান শিক্ষক,
শ্রীকানাই লাল রায়, শিক্ষক,
জগদানন্দপুর নেতাজী বিদ্যাপীঠ,
পোঃ বেথুয়াডহরী, নদীয়া।

৩। গ্রাম: বিল্বগ্রাম। ৫২।১,৫২৩।৭২।৩৬৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও হরিজন।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে তিন মাইল দূরে বেথুয়াডহরী রেলস্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে মদনমোহনদেব নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাসপূর্ণিমার দিন রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মন্দির হইতে বাহিরে আনিয়া একটি রাসমঞ্চে স্থাপন করিয়া তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে যথারীতি পূজা এবং মন্দির প্রাঙ্গণে কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রায় দুইশত বৎসর পূবে এই গ্রাম নিবাসী কালিদাস সিদ্ধান্ত মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তাঁহার বংশধরগণ উল্লিখিত উৎসবাদি পালন করিতেছেন। মদনমোহনদেবের নিত্যপূজা ও উৎসবাদির জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে।

ইহাভিন্ন, গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বিলেশ্বরী দেবীর পূজা এবং মাঘ মাস হইতে চৈত্র মাসের মধ্যে কালীমূর্তি তৈয়ারী করিয়া শুক্ল পক্ষের যে-কোন মঙ্গলবারে যথারীতি পূজা সম্পন্ন হয়। বিষ্ণুঠাকুর নামে জনৈক সিদ্ধপুরুষ কর্তৃক এই পূজা প্রথম আরম্ভ হয়। সেই হইতে অদ্যাবধি পূজা চলিয়া আসিতেছে। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা ক্ষেপা-মাতার পূজা নামে খ্যাত।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মদনমোহনদেবের মন্দির ও বিলেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে। ইহাভিন্ন, একটি শিবলিঙ্গ, বৃক্ষতলে ষষ্ঠীর নির্দিষ্ট স্থান এবং বিলেশ্বরী মন্দিরে পাথরের একটি শীতলা মূর্তি আছে।

ইংরাজী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই গ্রামের পাশ দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এখন গঙ্গা নদী গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ঐ সময় বিল্বগ্রামে একটি ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করিতেন। উক্ত ব্রাহ্মণ পরিবারের একটি কন্যার সহিত বিষ্ণুঠাকুর নামে একজন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর ঘটনা চক্রে বিবাহ হইয়া যায়। তাঁহার

বংশধরগণই বিল্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধি করেন। তৎকালীন নবদ্বীপের সহিত তুলনায় বিল্বগ্রাম নাকি শোভা-সৌন্দর্যে ও পাণ্ডিত্যে কোন অংশে কম ছিল না। স্থানীয় পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদিগকে বহু ভূসম্পত্তি প্রদান করেন। এই স্থানের ঠাকুরদের ব্রহ্মত্র সম্পত্তির খতিয়ান সমূহে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বিল্বগ্রাম, বিল্বপুষ্করিণী (বেলপুকুর) এবং নবদ্বীপ তৎকালে পাণ্ডিত্যের জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পৈত্রিক বাস্তুভিটার এক প্রান্তে অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ বাস করিতেছেন। এই স্থানের প্রাচীন মন্দির ও বিগ্রহগুলি ঐতিহ্যের চিহ্ন স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। বর্তমানে বিল্বগ্রামের সেই পূর্বশ্রী আর নাই।

শ্রীপরিমল কুমার ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
বিল্বগ্রাম উদ্বাস্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নদীয়া।

৪। গ্রাম : ব্রহ্মাণীতলা (মৌজাঃ রাজাপুর)। ৫৩।৬৩৭।১৭০।৯০০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। পূর্বে এই গ্রামে বহু মুচির বাস ছিল। দেশ বিভাগের পর কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তু পরিবার এই স্থানে বসবাস আরম্ভ করিয়াছেন। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে বেথুয়াডহরী রেলস্টেশন। মোটরবাসে এবং বর্ষাকালে গঙ্গা দিয়া নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণসংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী দেবীর পূজা। উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ব্রহ্মাণীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর শ্রাবণ-সংক্রান্তি হইতে ছয়-সাত দিন। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বিরাট অশ্বত্থ গাছের নীচে ব্রহ্মাণী দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। নাকাসীপাড়ার স্বর্গতঃ জমিদার ডোমন চন্দ্র সিংহ রায় মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই গ্রামে ব্রহ্মাণী পূজা আরম্ভ করেন। উত্তরকালে দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম ব্রহ্মাণীতলা হইয়াছে।

শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায়, ব্যবসায়ী,
পোঃ কৃষ্ণনগর, শিবালয়, নদীয়া,
শ্রীঅতুল কুমার মৌলিক, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
গ্রামঃ পলাশডাঙ্গা, পোঃ নাকাসীপাড়া, নদীয়া,
ও
শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দে, শিক্ষক,
পোঃ বেথুয়াডহরী, নদীয়া।

৫। গ্রাম : নাকাসীপাড়া। ৫৪।১৩২।৫৮।২৭৯

বেথুয়াডহরী রেলস্টেশন হতে জেলা বোর্ডের একটি কাঁচা রাস্তা ধরে সোজা তিন মাইল গেলেই নাকাসীপাড়া গ্রাম। রাস্তাটি ধূল-ধূসর হলেও বেশ প্রশস্ত তবে বর্ষাকালে একেবারে দুর্গম হ'য়ে উঠে। তখন মহিষের গাড়ী ছাড়া আর অন্য কোন যান-বাহন একেবারে অচল। গ্রামটি খুব প্রাচীন। পূর্বে এর নাম ছিল "নাগরকিপাড়া" পরে এর নাম নাকাসীপাড়া হয়। গ্রামখানি ছোট হলেও এর প্রাচীনত্ব, ঐতিহ্য, ইতিহাস ছিল। পূর্বে কাটোয়া মহকুমার অধীন অগ্রদ্বীপ থানার অন্তর্গত ছিল নাকাসীপাড়া। পরে কৃষ্ণনগর মহকুমার অন্তর্গত হ'য়ে নিজ নাকাসীপাড়াতেই থানা সংস্থাপিত হয়। আরও পরে ১৯২০ সালে এপ্রিল মাসে যাতায়াতের অসুবিধার জন্য রেলওয়ে স্টেশনের সন্নিকটে থানা উঠিয়া আসিলেও নাম নাকাসীপাড়া থানাই থাকিয়া যায়।

নাকাসীপাড়া গ্রামের ঠিক নীচ দিয়াই একটি খাল—খালটি দেখে মনে হয় বহু পূর্বে এখানে কোন নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে কোন কোন সময়ে

বর্ষাকালে জল আসে এই খালে—তা ছাড়া খালের বুকে চাষ চলছে পুরাদমে। খালটির নাম 'হোল'। গ্রামটিতে লোকসংখ্যা কম হলেও গ্রামে দিঘী, পুকুর, নলকূপ, কূপ, বিদ্যালয়, পোষ্ট অফিস, দাতব্য চিকিৎসালয় কোন কিছুরই অভাব নেই। সম্প্রতি বুনিয়াদী শিক্ষা বিদ্যালয়ও একটি স্থাপিত হয়েছে এই গ্রামে। গ্রামের প্রাচীন শিবমন্দিরের কারুকার্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের বুক চিরে জেলা বোর্ডের যে রাস্তা চলে গেছে তারই পাশে খালের ধারে পাশাপাশি তিনটি মন্দির এখনও অতীতের সাক্ষী স্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে। দেবাদিদেব মহাদেবের সাদা ও কালো মূর্তি এই মন্দিরের মধ্যে বহুদিন পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গাজনের সময় ও শিবচতুর্দশীর দিন বৎসরে দু'বার লোক সমাগমে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠে। মন্দিরের তারিখ সময় না জানা গেলেও মন্দিরের গঠন প্রণালী ও কারুকার্যই এর প্রাচীনত্ব দাবী করতে পারে। শিবচতুর্দশী উপলক্ষে নাকাসীপাড়ার প্রাচীন শিব-মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসবার চেষ্টা হ'য়েছিল কিন্তু কয়েক বৎসর চলার পর তা বন্ধ হ'য়ে গেছে।

[শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় কর্তৃক লিখিত "আমাদের গ্রাম" নামক পুস্তিকা হইতে গৃহীত।]

৬। গ্রাম : গোটপাড়া। ৫৮।১,৬৬২।৪০২।২,২২২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নাপিত, নমঃশূদ্র, গোপ্, বাগ্দী, বণিক, মুচি, তাঁতী, কুমার, মুসলমান। গ্রামে মোট নয়টি পাড়া আছে। যেমন—হালদার পাড়া, কুমারপাড়া, গোয়ালপাড়া, রায়পাড়া, মুচিপাড়া, মুসলমা-পাড়া, বাগ্দীপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটস্থ রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা হইতে সাতদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে শিবলিঙ্গ সহ একটি শিব মন্দির আছে। প্রায় তিনশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে গোবিন্দদেব রায় নামে এক ব্যক্তি বাংলার সুবাদারের নিকট হইতে বাগোয়ান, পলাশী ও ঘাটোয়াল পরগণার কতকাংশ সম্পত্তি লাভ করেন। তিনি উক্ত সম্পত্তি লাভ করিয়া কলিকাতা হইতে ভাগীরথী নদী দিয়া বজ্‌রাযোগে কাটোয়া যাইতে ছিলেন। পথিমধ্যে বর্তমান গোটপাড়া নামক স্থানে বজ্‌রা নঙ্গর করেন। এই স্থানে তখন কোন লোকালয় ছিল না। গঙ্গার তীরে শুষ্ক ময়দান ও গোচারণ ভূমি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। অতঃপর তিনি গোটপাড়ায় স্থায়ী ভাবে বাস করিতে মনস্থ করেন এবং তাঁহার জমিদারীর অন্তর্গত নানা স্থান হইতে নানা জাতি আনাইয়া তাহাদের বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

শ্রীদাশরথি মজুমদার, প্রধান শিক্ষক,
ধর্মদাস বুনিয়াদী বিদ্যাপীঠ,
পোঃ নাকাসীপাড়া, নদীয়া,
ও
শ্রীঅতুল কুমার মৌলিক, চাকুরী,
গ্রামঃ পলাশডাঙ্গা,
পোঃ নাকাসীপাড়া, নদীয়া।

৭। গ্রাম : ভেবুয়াডাঙ্গা গঙ্গার ঘাট (মৌজাঃ কড়কড়িয়া)। ৬৫।৯১১।২০২।১,১৪৯

(ক) কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, মুচি, বাগ্দী, মালাকার। গ্রামে ঘোষপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, বাগ্দীপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কাঁসাশিল্পের ও দুধের ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত মুড়াগাছা রেলস্টেশন হইতে হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। নদী পথে ও নৌকায় যাতায়াত চলে।

(ঘ) মকর স্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ প্রাতঃকালে পুণ্যকামী স্নানার্থী দল সমবেত হন এবং নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটে পুণ্যস্নানাদি করিয়া থাকেন। গত একুশ বৎসর যাবত উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মকরস্নানের মেলা। ১লা মাঘ। একুশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীনব কুমার দে, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলফমেণ্ট অফিস,
গ্রাম ও পোঃ ধর্মদা, নদীয়া।

৮। গ্রাম: নাজলা। ৭৬।৩৩৩।২৮।১৭৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুড়াগাছা হইতে প্রথমে জাতীয় সড়ক এবং পরে কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পৌঁছানো যায়। জাতীয় সড়ক দিয়া মোটর-বাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে এবং মাঘী পূর্ণিমায় সাহেবধনী সম্প্রদায়ের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে একটি মেলা এবং মাঘী পূর্ণিমায় উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

(চ) গ্রামে কাটাপীর সাহব নামে জনৈক ফকিরের একটি খড়ের ঘর আছে।

শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাস, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলফমেণ্ট অফিস,
গ্রাম: দোগাছিয়া,
পোঃ মালিগ্রাম, নদীয়া।

৯। গ্রাম: বেকোয়াইল। ৭৯।৪৭১।১৮।১০২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বাগ্দী, মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যথা—হিন্দুপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, পশুপালন ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে দেড় মাইল দূরে বেথুয়াডহরী রেলস্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) পঞ্চানন্দপূজা। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

শ্রীআমীরচাঁদ সেখ, শিক্ষক,
পাটিকাবাড়ী নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
গ্রাম: বেকোয়াইল,
পোঃ বেথুয়াডহরী, নদীয়া।

১০। গ্রাম: ধনঞ্জয়পুর। ৮২।২,২৯৩।৪৭৪।২,৫৬৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চার-পাঁচটি পাড়া আছে। বর্তমানে এই স্থানে কিছু সংখ্যক উদ্বাস্তুপরিবার বসবাস আরম্ভ করায় গ্রামের জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্য ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী হইতে মোটরবাসে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চান্দ্রমাস অনুসারে ধনঞ্জয়পুর ইউনিয়ন ও পার্শ্ববর্তী বিলকুমারী ইউনিয়নের মুসলমান সম্প্রদায়গণ সমবেত ভাবে মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। মহরম উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে তাজিয়াসহ সমবেত মুসলমানগণ এই গ্রাম ও আশেপাশের গ্রামগুলি প্রদক্ষিণ করেন। মহরম উৎসবে লাঠি খেলা এবং গাজীপীরের জারী গান হয়।

(ঙ) মহরমের মেলা। চান্দ্রমাস অনুসারে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীযশশেখর কুণ্ডু, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলফমেণ্ট অফিস,
গ্রামঃ ধনঞ্জয়পুর,
পোঃ শিবপুর, নদীয়া।

১১। গ্রাম ঃ বড়গাছি। ৯১।১,২৭০।১১৯।৭৪৬

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী, গন্ধবণিক, নাপিত, বাগ্দী, গোপ, গড়াই, মুসলমান এবং ওঁরাও আদিবাসী।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেথুয়াডহরী হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ইহাভিন্ন, গ্রামের পূর্বদিকে নদীঘাট পার হইয়া তিন মাইল দূরে মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার গ্রামের বাগ্দী সম্প্রদায় মৃন্ময়ী কালীমূর্তি নির্মাণ করিয়া পূজা করেন। পূজা শেষে মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। কালীর নিকট মানতরূপে পাঁঠা বলি দেওয়া হয়।

প্রতি বৎসর বসন্ত অথবা গ্রীষ্ম ঋতুতে এই গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি বৈষ্ণব আখড়ায় অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আখড়ায় নিত্যানন্দ সহ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহের নিত্য পূজাদি হয়। ইহাভিন্ন, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কালীর নির্দিষ্ট স্থান এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি আখড়া আছে।

গ্রামটি বহু প্রাচীন এবং ইহার পূর্বদিকে মাথাভাঙ্গা নামে একটি বিল আছে। বিলের পূর্বদিকে অদূরে জলঙ্গী নদী। গ্রামের পশ্চিম দিকে একটি পুরাতন গড়ের ভগ্নাবশেষ আছে। ইহার চারিদিকে গড়খাই কাটার চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান। কথিত আছে, অন্নদামঙ্গলে উল্লিখিত হরি হোড় নামে জনৈক ধনবান ব্যক্তি ঐ স্থানে বসবাস করিতেন। হরি হোড়ের পিতার নাম বিষ্ণুদাস হোড়। হরি হোড় প্রথম অবস্থায় খুবই দরিদ্র ছিলেন; অন্নপূর্ণার কৃপায় তাঁহার অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছিল। গ্রামের পূর্বদিকে লক্ষীজোলা নামে একটি খাল আছে। বলা হয় ঐ খাল দিয়াই ঈশ্বর পাটনী অন্নপূর্ণা দেবীকে জলঙ্গী নদী পার করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীমহম্মদ ইসমাইল সেখ, শিক্ষক,
গ্রামঃ বড়গাছি,
পোঃ বীরপুর, নদীয়া।

১২। গ্রাম ঃ দোগাছিয়া। ৯৭।১,৬৭২।৩৭০।২,৩২৫

(ক) কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, গোয়ালা, নাপিত, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে মণ্ডলপাড়া, সর্দারপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুড়াগাছা।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে ও মাঘী পূর্ণিমাতে মূলীচাঁদের-এর স্মরণোৎসব এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমোক্ত উৎসবটি প্রায় পাঁচশত (?) বৎসরের এবং দ্বিতীয়োক্ত উৎসবটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা যায়। চড়ক উৎসবটি ও প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মূলীচাঁদের মন্দির আছে।

গ্রামের নাম সম্পর্কে শুনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামটি দুইটি পাড়ায় বিভক্ত ছিল এবং দুই পাড়াতে সতন্ত্রভাবে দুইটি চড়ক পূজা হইত। চড়ক পূজার আড়ম্বর ও দুই দলের সং-এর মধ্যে যথেষ্ট প্রতিযোগীতা হইত। প্রায় মাসাধিক কাল যাবত সং বাহির হইত। বহু দূরবর্তী স্থানের লোক এই উৎসব দেখিতে আসিতেন। লোকে বলিত

দোগাছা চড়ক। সেই হইতে গ্রামের নাম প্রথমে দোগাছা এবং বর্তমানে দোগাছিয়া হইয়াছে।

শ্রীবিভূ প্রসাদ বিশ্বাস, চাকুরী,
গ্রাম: কালাবাগা দোগাছিয়া,
পোঃ শালিগ্রাম, নদীয়া।

"কৃষ্ণনগরের দুই মাইল দক্ষিণে দোগাছিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে মূলার উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা হয়। এই সময় বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর একটি পাগড়ী প্রদর্শিত হয়।"

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃ: ২৫:)

১৩। গ্রাম ঃ মুড়াগাছা। ১০২।৬৯৬।৮৮।৩,১৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, ময়রা, গোয়ালা, ধোপা, নাপিত, কামার, কুমার, স্বর্ণকার, মালাকার, ছুতার, সদ্গোপ, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, গড়াই, নমঃশূদ্র, মুচি, বারুইজীবি, নাথ, মুসলমান ও ডোম। গ্রামে প্রায় এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, শ্রমজীবি ও জাতিব্যবসায়।

(গ) এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সর্বমঙ্গলা দেবীর অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) সর্বমঙ্গলা দেবীর উৎসব উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে পনরদিনব্যাপী। বাংলা ১১৯৭ সন হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দির আছে। তাহাছাড়া গ্রামে চৌদ্দটি পঞ্চানন্দ, মনসা ও শীতলা আছে।

আনুমানিক ১১০০ বঙ্গাব্দে রাঘবরাম দেব বিশ্বাস নামে জনৈক তহশীলদার বর্তমান মুড়াগাছা মৌজার অন্তর্গত রাঘবপুর গ্রামের কাছারিবাড়ীতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে এই অঞ্চল যশোহর জিলার দিগম্বরপুরের মহাশয়দিগের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং রাঘবরাম বিশ্বাস উক্ত জমিদারের তহশীলদার ছিলেন। তিনি নিজে কায়স্থ ছিলেন এবং এই অঞ্চলে কোন ব্রাহ্মণের বাস না থাকায় তিনি তাঁহার ব্রাহ্মণ মনিবকে অনুরোধ করিয়া এই গ্রামে কয়েক ঘর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। প্রাচীন রাঘবপুর গ্রামই মুড়াগাছা গ্রাম নামে পরিচিত।

গ্রামের নাম সম্পর্কে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে প্রাচীন রাঘবপুর গ্রামে একবার একটি বড় রকমের অগ্নিকাণ্ড হয় এবং তার ফলে বহু বাড়ীঘর এবং বৃক্ষলতা পর্যন্ত পুড়িয়া মুড়া হইয়া যায়। সেই সময় একদিন কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র গোপাল ভাঁড়কে সঙ্গে লইয়া গুড়গুড়িয়া নদী পথে বাহিরগাছি গ্রামে তাঁহার গুরু বাড়ী যাইতেছিলেন। মুড়াগাছার নিকট দিয়া যাইবার সময় মহারাজা গোপাল ভাঁড়কে গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করায় গোপাল ভাঁড় অগ্নি দগ্ধ গ্রামের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ রসিকতার সহিত উত্তর দেন—"মহারাজ গ্রামের নাম মুড়াগাছা।" মহারাজের নিকট এই গ্রামকে মুড়াগাছা নামে উল্লেখ করায় তখন হইতে সরকারী নথিপত্রে এই গ্রাম মুড়াগাছা নামে পরিচিত হয়। এখনও অগ্নিকাণ্ডের চিহ্ন স্বরূপ গ্রামের কিছু অংশ "পোড়া ভিটা" নামে পরিচিত আছে।

ডাঃ শান্তিরাম মুখোপাধ্যায়,
গ্রাম ও পোঃ মুড়াগাছা, নদীয়া।

Muragachha—Village in the Nakāsipārā thana of the headquarters subdivision, about 12 miles north-west of Krishnagar. It is now a station on the Rānāghāt-Lalgola branch of the Eastern Bengal State Railway. The village has two temples, one dedicated to the god Siva, and the other to the goddess Sarvāmangalā; the latter is said to have been built in 1870 by Devi Dās Mukhopādhyāy, a salt Dewān of Hijli, who also established a High English School in the village. A fair is held in honour of the

goddess on the day of the full moon in Baisākh ; it lasts for three days, and is attended by one to two thousand pilgrims. The importance of the village dates from the time of Dewān Devi Dās, whose family, known as the Dewan family of Murāgāchhā, is still one of the most respected in the district."

(District Census Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. xlviii).

"**মুড়াগাছা**—কলিকাতা হইতে ৭৩ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। সুপ্রসিদ্ধ রস-সাহিত্যিক ৺ললিত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্থানের অধিবাসী ছিলেন। এই স্থানে সর্বমঙ্গলা দেবীর একটি মন্দির আছে।"

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ২৫৯)

জেলা : নদীয়া

থানা : নাকাসীপাড়া

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব

(মুলীচাঁদ পাল)

দোগাছিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা ও মাঘী পূর্ণিমা এই দুই তিথিতে মুলীচাঁদ পালের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। এই স্থানে একটি মন্দিরে মুলীচাঁদের ব্যবহৃত পাদুকা, খড়ম ও হুঁকা রক্ষিত আছে। এই মন্দিরে উৎসব উপলক্ষে ভজন-পূজনাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তই এক সাথে বসিয়া আহার ও আনন্দোৎসব করেন। উৎসবে উপলক্ষে মুলীচাঁদ পালের ভক্ত, শিষ্য এবং ফকির ও সাধুর সমাগম হয়। ভক্তদের বিশ্বাস, প্রতি বৃহস্পতিবার মানত করিলে এবং উক্ত মন্দির সংলগ্ন স্থানের মাটি গায়ে মাখিলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয়। সাধারণতঃ ফল ও অর্থাদি মানত করা হয়। বর্তমান সেবায়েত গোয়ালা সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি। তাঁহার বর্ণ শূদ্র, গোত্র কাশ্যপ এবং পদবী পাল।

মুলীচাঁদ পাল সম্পর্কে শুনা যায় যে, তিনি প্রথম জীবনে একজন গোয়ালা ছিলেন। একদিন মাঠে গরু চরাইবার কালে হঠাৎ একজন সন্ন্যাসী আসিয়া তাঁহার নিকট একটু দুধ প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার গরুর পালে কোন দুগ্ধবতী গাভী না থাকায় খুবই বিব্রত হন। তখন উক্ত সন্ন্যাসী তাঁহাকে একটি বগনা গরু দেখাইয়া তাহার দুধ দোহন করিতে বলেন এবং হাতের নিকট দুধ দোহন করিবার কোন পাত্র না থাকায় গামছায় করিয়া দুধ দোহন করিয়া তাঁহাকে দিতে বলেন। দুধ দোহন করিবার পর মুলীচাঁদ দেখেন যে, সন্ন্যাসী ইতিমধ্যে বহুদুর চলিয়া গিয়াছেন। তখন তিনি কোন-ক্রমে সেই সন্ন্যাসীকে ধরিয়া তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়েন। সন্ন্যাসী তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন এবং সাধনা করিতে নির্দেশ দেন। সন্ন্যাসীর নির্দেশক্রমে সাধনা করিয়া মুলীচাঁদ সিদ্ধিলাভ করেন। তাঁহার ভক্তদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন আছেন।

(কাটাপীর—সাহেবধনী সম্প্রদায়)

নাঙ্গলা গ্রামে সাহেবধনী সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক কাটাপীর সাহেবের নামে একটি খড়ের চালাযুক্ত আস্তানা আছে। ঐ আস্তানায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের সাড়ম্বরে বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উৎসবটি দুইদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত হয় এবং শেষদিন জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই পীরের সিন্নি গ্রহণ করেন এবং পীরের নিকট মনস্কামনা জানাইয়া মানত দিয়া থাকেন। পীরের আস্তানার নিকট অবস্থিত একটি প্রাচীন বৃক্ষের (কি বৃক্ষ বলা যায় না) নীচে পীরের নামে মানত জানান হয়। প্রধানতঃ মাটির ঘোড়া, পুতুল, দুধ, সিন্নী ইত্যাদি মানত করা হয়। মানত দেওয়া এইরূপ মাটির ঘোড়া ও পুতুল উক্ত বৃক্ষের নীচে রাশিকৃতভাবে জমা হইয়া আছে। কেবলমাত্র মানুষেরই রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য নহে, গৃহপালিত পশু-পক্ষীর ব্যাধি নিরাময়ের জন্যও পীরের নিকট মানত দেওয়া হয়। পীরের বর্তমান খাদেম জনৈক মুসলমান। উৎসব ব্যতীত প্রতি বৃহস্পতিবারে পীরের নিকট সিন্নী মানত দেওয়া হইয়া থাকে। অম্বুবাচী তিথিতে বাৎসরিক উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমাতে এই স্থানে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(সাহেবধনী সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয়ের "নদীয়ার কাহিনী" গ্রন্থে এবং শ্রীঅক্ষয় কুমার দত্ত মহাশয়ের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়।)

সাহেবধনী সম্প্রদায় সম্পর্কে শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক মহাশয় "নদীয়া কাহিনী"তে লিখিয়াছেন—"নদীয়া জেলার দোগাছিয়া গ্রামের দুঃখীরাম পাল ও বাগাড়ে নিবাসী রঘুনাথ দাস প্রভৃতি কয়েকজন হিন্দু ও একজন মুসলমান

সাহেবধনী নামক এক উদাসীনের নিকট মন্ত্রোপদেশ পাইয়া এই ধর্মমত প্রবর্তন করেন, ইহা কর্তাভজারই শাখাবিশেষ। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। এই আসন একখানি চৌকি বিশেষ। প্রতি বৃহস্পতিবার এই আসন সন্নিধানে সকলে সমবেত হইয়া সাধনা করেন। উহাদের দলে হিন্দু ও মুসলমান সকল সম্প্রদায়েরই প্রবেশ অধিকার আছে। দুঃখীরাম পালের পুত্র চরণ পাল এ সম্পদায়ের অনেক উন্নতি করিয়া যান। এই স্থানেও ঘোষ পাড়ার মত বহু রোগীতাপীর নিরাময় হইবার আশায় সমাগম হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ সংগৃহীত হয় এবং ঐ অর্থে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে অগ্রদ্বীপে ইহাদের একটি মহোৎসব হইয়া থাকে। ধর্মের জন্য না হউক ব্যাধি নিরাময়ের বা ব্যাধি বিদূরিত করিতে নীচ জাতিগণের মধ্যে এ সম্প্রদায়ের প্রসার বেশী আছে, কিন্তু ইহাদের সাম্প্রদায়িক লোকসংখ্যা দিন দিন যেরূপ হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে আর কিছুদিনে ইহাদের নিদর্শন থাকিবে না সন্দেহ হয়।" ("নদীয়া কাহিনী" প্রথম সংস্করণ, রানাঘাট ১৩১৯, পৃঃ ২৭১)।

"—ইহারা কোন বিগ্রহের উপাসনা করে না, বরং বিগ্রহ ও মন্ত্রদাতা গুরুর প্রতি বিদ্বেষই প্রকাশ করে। ইহাদের উপাসনার স্থানের নাম আসন। ঐ আসন একখানি চৌকি মাত্র। ঐ চৌকিতে পুষ্পমাল্য দেওয়া থাকে। প্রতি বৃহস্পতিবারে ঐ সম্প্রদায়ের অনেক লোক ঐ আসন স্থানে সমাগত হইয়া পরমার্থ সাধন করে। তথায় তাহারা আপনাদের প্রস্তুত করা পরমান্ন এবং যবনাদি নানাজাতি প্রদত্ত মানসিক ভোগের সামগ্রী আসনের নিকটে নিবেদন করিয়া নিবেদিত দ্রব্য পরস্পরের মুখে অর্পণ করে। ইহাকেই পরমার্থ সাধন কহে। অধিক রাত্রি হইলে ঐ সকল দ্রব্য সকলে মিলিয়া ভক্ষণ করে এবং আপনাদের মতানুযায়ী সঙ্গীতাদি করিয়া উপাসনা করে।

ইহারা জাতিভেদ স্বীকার করে না; কি হিন্দু কি মুসলমান সকল জাতিকেই স্ব-সম্প্রদায়ের নিবিষ্ট করে। হিন্দুদিগকে "ক্লীং দীননাথ দীনবন্ধু" এবং মুসলমানদিগকে "দীনদয়াল দীনবন্ধু" এই মন্ত্রে উপদেশ দিয়া থাকেন।

কিছুদিন হইল চরণ পালের মৃত্যু হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার পুত্র তদীয় আসনের অধিকারী।

("ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়", পৃঃ ২৩১)

পঞ্চানন্দ পূজা

বেকোয়াইল গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে সাড়ম্বরে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা ও বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। পঞ্চানন্দের কোন মূর্তি নাই, নির্দিষ্ট স্থানে একটি তমাল বৃক্ষকে পঞ্চানন্দ জ্ঞানে পূজা করা হয়। দশহরার দিন ভোর পাঁচটা হইতে রাত্রি দুই ঘটিকা পর্যন্ত যথারীতি পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে এই উৎসব খুব জাঁকজমকের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানে সেইরূপ জাঁকজমক নাই। পঞ্চানন্দের নিকট সাধারণতঃ ষোড়শোপচারে পূজা ও পাঁঠা মানত করা হয়। পূজার শেষে উৎসর্গকৃত পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। উৎসবে কিছু কিছু অহিন্দুও যোগদান করেন। বর্তমান পূজারী রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ গোত্র, পদবী চট্টোপাধ্যায়।

এই উৎসবের সহিত একটি কিংবদন্তী জড়িত আছে। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে একদিন প্রবল বন্যায় একটি শ্বেত শিমুল কাঠ বর্তমান পঞ্চানন্দ তলায় ভাসিয়া আসে। গ্রামবাসী জনৈক বাগ্‌দী ঐ কাঠটি তুলিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হন এবং সেই দিন রাত্রিতেই তাহার প্রতি উক্তকাষ্ঠ খণ্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করিতে স্বপ্নাদেশ হয় এবং স্বপ্নাদেশে আরও জানা যায় যে, এই স্থানে একটির পর একটি বৃক্ষ জন্মাইবে। প্রথমে যে শিমুল গাছটি ছিল তাহা নষ্ট হইবার পর বর্তমান তমাল গাছটি সৃষ্টি হইয়াছে। প্রথমে পূজাটি উক্ত বাগ্‌দী পরিবারের নিজস্ব ছিল এবং বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বহু জাঁকজমক করিত। উৎসবের দিন বহু শূকর বলি দেওয়া হইত। পরে উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ পূজাটির ভার গ্রহণ করেন এবং শূকর বলি বন্ধ করিয়া তাহার পরিবর্তে পাঁঠা বলির বিধান দেন।

বিলেশ্বরীদেবীর পূজা

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজার দিন গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিলেশ্বরীর তিনদিনব্যাপী বার্ষিক পূজা

অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে প্রসাদ বিতরণ এবং কোন কোন বৎসর অন্নমহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে দেবীর প্রস্তরময়ী দুর্গা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, ইনিই বিলেশ্বরী দেবী নামে খ্যাত। উৎসবটিও সর্বজনীন। দেবীর পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চট্টোপাধ্যায়। বিলেশ্বরীর নিকট মানসিক হিসাবে কেহ কেহ ছাগ বলি দিয়া থাকেন। বৎসরের যে-কোন সময়ে এই মানসিক পূজা দেওয়া চলে। দেবীর নিত্য পূজার জন্য কিছু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। জন্মাষ্টমীর দিন এই মন্দিরে বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়।

ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজা

ব্রহ্মাণীতলা গ্রামে ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং নাকাসী-পাড়ার তদানিন্তন জমিদার স্বর্গত ডোমন সিংহ রায় মহাশয় কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাণীর পূজা সুরু হয়।

দেবীর কোন মন্দির বা মূর্তি নাই। গ্রামে একটি বিরাট অশ্বত্থ গাছের নীচে একটি বাঁধানো বেদীর উপর ঘট স্থাপন করিয়া মনসার ধ্যানে ব্রহ্মাণীপূজা হয়। ব্রহ্মাণীতলায় মূল অশ্বত্থ গাছটি হইতে বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তারিত হইয়া পূজার স্থানটীকে ছায়াসুশীতল ও মনোরম করিয়া রখিয়াছে। এই পূজার জন্যই জায়গাটির নাম ব্রহ্মাণীতলা হইয়াছে। পূজার সময় ভক্তেরা কেহ কেহ এই স্থানে মনসামূর্তি বা ঘট দিয়া থাকেন। প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বাৎসরিক পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, পূজার দিন অর্থাৎ সংক্রান্তি তিথিতে গ্রামে অরন্ধন পালন করা হয়। অনেক মুসলমানও এই উৎসবে যোগদান করেন এবং মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। এমন কি হিন্দুদের মত পূজার দিন তাঁহারাও অরন্ধন পালন করেন। মানসিক স্বরূপ বেশীভাগ ক্ষেত্রেই পাঁঠা, ভেড়া, শূকর ইত্যাদি পশু বলি মানত করা হয়। শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এইরূপ বলি প্রচুর হইয়া থাকে। পূর্বে এই স্থানে মহিষ বলি দেওয়া হইত। আদিতে এই পূজা ব্যক্তি-বিশেষের থাকিলেও বর্তমানে ইহা সর্বসাধারণের পূজা ও উৎসব বলিয়া গণ্য। তবে প্রথমে জমিদার অর্থাৎ ডোমন বাবুদের বাড়ীর পূজা ও বলিদানের পর হিন্দু ও অহিন্দু নির্বিশেষে সর্বজনীন পূজা ও বলি হইয়া থাকে। স্থানীয় জনৈক ব্রাহ্মণ দেবীর নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন। শ্রাবণ সংক্রান্তি ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া নবমী তিথিতে ধুমধামের সহিত ব্রহ্মাণীদেবীর পূজা হইয়া থাকে।

এই গ্রামে ব্রহ্মাণী দেবীর পূজার প্রচলন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি পশ্চিমবঙ্গের আরও দু-এক স্থানে শুনা যায়। অর্থাৎ দেবীর জমিদার কন্যা পরিচয়ে নির্জন স্থানে শাঁখারীর নিকট হইতে শাঁখা গ্রহণ এবং শাঁখারীকে মূল্য আনিতে জমিদারের নিকট প্রেরণ, পরিণতিতে দেবীর নিদর্শন প্রকাশ ও জমিদারের প্রতি স্বপ্নাদেশে দেবীর পূজা প্রচলন ইত্যাদি।

(ব্রাহ্মণীপূজা সম্পর্কে গ্রন্থের ২৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

মহরম

প্রতি বৎসর চান্দ্রমাস অনুযায়ী গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়গণ সাড়ম্বরে মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। মহরম মাসের ১লা হইতে ১০ই তারিখ পর্যন্ত এই উৎসব স্থায়ী হয়। উৎসব উপলক্ষে তাজিয়া বাহির হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গ্রামের "দরগা তলায়" বহু মুসলমান উপস্থিত হন এবং ঢাক ঢোল বাজাইয়া লাঠিখেলা প্রভৃতি নানারূপ ক্রীড়াদির মাধ্যমে উৎসব পালন করেন। উৎসব উপলক্ষে ভেড়া, মোরগ ইত্যাদি বলি হয়। মহরম ব্যতীত প্রতি বৎসর চান্দ্রমাস অনুযায়ী গ্রামের মুসলমানগণ ঈদ্ ও বকর ঈদ্ উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

মহোৎসব

বড়গাছি গ্রামে অবস্থিত একটি বৈষ্ণব আখড়ায় প্রতি বৎসর বসন্ত অথবা গ্রীষ্ম ঋতুতে আখড়ার সেবাইত ও গ্রামবাসীর অর্থানুকুল্যে অষ্টম প্রহরব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত গৌর-নিতাই মহাপ্রভুর যথারীতি পূজা ও সর্বজনীন ভোজ দেওয়া হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করিয়া থাকেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গ্রামের মধ্যে "স্রোতগঙ্গা" নামে খ্যাত একটি পুষ্করিণী আছে। কিংবদন্তী আছে যে উক্ত পুষ্করিণীটি কোনও এক সময় আখড়ায় মহোৎসব উপলক্ষে বহু নেড়া-নেড়ী সম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণবের সমাগম হইয়াছিল, তাঁহারা তাঁহাদের ব্যবহার্য চিমটার আঘাতে নাকি এই পুষ্করিণী খনন করেন। এখন পর্যন্ত স্থানীয় হিন্দুরা এই পুষ্করিণীটি পবিত্র জ্ঞান করেন।

জনৈক বৈষ্ণব সেবায়েত কর্তৃক উল্লিখিত বিগ্রহাদির প্রত্যহ ভোগ পূজাদি হইয়া থাকে।

স্নানযাত্রা

গোটপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে গোপীনাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হয়। গোপীনাথ বিগ্রহ দ্বিভূজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণমূর্তি। এই বিগ্রহ কৃষ্ণনগর রাজবাড়ীতে সারা বৎসর রক্ষিত থাকে এবং সেইস্থানে নিত্যপূজাদি হয়। উৎসবের পূর্বদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে উক্ত বিগ্রহকে গোটপাড়ায় আনা হয় এবং পাঁচ-ছয়দিনব্যাপী এই স্থানে সাড়ম্বরে ভোগপূজা অনুষ্ঠিত হইবার পর পুনরায় কৃষ্ণনগরে বিগ্রহ ফেরত লইয়া যাওয়া হয়। উৎসবে সর্ব সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করেন। প্রধানতঃ ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য দিয়া মানত পূজা দেওয়া হয়। কাহারো গাছে ফল ধরিতে বিলম্ব হইলে তাহারা গোপীনাথের নিকট ফল মানত করিয়া থাকেন। পূজারী ব্রাহ্মণ, কৃষ্ণনগর মহারাজার বেতনভোগী। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

কথিত আছে, অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ বিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শ্রীচৈতন্যদেব যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পরিক্রমায় বাহির হন তখন তাঁহার অন্যান্য ভক্তগণের সহিত গোবিন্দ ঘোষও তাঁহাকে অনুসরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে অগ্রদ্বীপে কোন কারণে মহাপ্রভু গোবিন্দ ঘোষের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিতে আদেশ দেন।

কিন্তু তাঁহার কাতর অনুনয়ে বিচলিত হইয়া শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে অগ্রদ্বীপে গঙ্গার তীরে কুটীর নির্মাণ করিয়া একমনে ভগবত সাধনায় দিন যাপন করিতে বলেন এবং আরও বলেন যে, গঙ্গায় কোন আশ্চর্য্য বস্তু ভাসিয়া যাইতে দেখিলে তিনি যেন উহা ধরিয়া রাখেন। তাহা হইলে পুনরায় চৈতন্যদেবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে। গোবিন্দ ঘোষকে ত্যাগ করিয়া মহাপ্রভু অন্যান্য শিষ্যগণ সহ মালদহের গৌড়নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। পথে কেতুরে তাঁহার একজন প্রধান শিষ্য (বোধ-হয় নরোত্তম ঠাকুর) দেহ ত্যাগ করেন। অদ্যাবধি কেতুরে এই কারণে মহামেলা হয়। মহাপ্রভু গৌড় নগরে আসিয়া তৎকালীন বাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ মহাসমারোহে তাঁহাকে আপ্যায়ন করেন এবং তাঁহাকে বাদশাহের নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু সংসারত্যাগী মহাপুরুষ কি গ্রহণ করিবেন! অবশেষে বাদশাহের পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তিনি বাদশাহের প্রাসাদগাত্রে গ্রথিত কেবলমাত্র একটি পাথর গ্রহণ করেন এবং অন্যের অলক্ষ্যে উক্ত পাথরটিকে গঙ্গায় ভাসাইয়া দেন।

এদিকে গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর নির্দেশ মত প্রতিদিন গঙ্গার দিকে তাকাইয়া থাকেন; কিন্তু সাধারণ বস্তু ব্যতীত অসাধারণ কোন বস্তু ভাসিয়া যাইতে তাঁহার চক্ষে পড়ে না। ইহার পর একদিন প্রত্যুষে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, একখণ্ড কালো পাথর গঙ্গা বক্ষে ভাসিয়া যাইতেছে। জলে শীলা ভাসিতেছে, ইহা অপেক্ষা আর কি আশ্চর্য্য থাকিতে পারে এইরূপ চিন্তা করিয়া ভক্তবর গোবিন্দ ঘোষ পাথরখানি জল হইতে তুলিয়া নিজের নিকট রাখেন। ইহার কিছু দিন পর মহাপ্রভু নানাতীর্থ পর্য্যটন করিয়া অগ্রদ্বীপে গোবিন্দ ঘোষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারই আদেশে দাঁইহাটা হইতে ভাস্কর আনাইয়া উক্ত পাথর খণ্ডের দ্বারা দ্বিভূজ মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্মাণ করেন এবং মহাসমারোহে অগ্রদ্বীপে ঐ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন ও ভক্ত গোবিন্দ ঘোষের উপর নিত্য পূজাদির ভার অর্পণ করেন। অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ঐ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ গোপীনাথ নামে খ্যাত। গোবিন্দ ঘোষ দেহরক্ষা করিলে অগ্রদ্বীপে বারুণী উপলক্ষে মহামেলা আরম্ভ হয়। এই সময় অগ্রদ্বীপ বর্ধমান মহা-রাজার জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। শোনা যায়, একবার

এই মহামেলায় কোন কারণে দাঙ্গা বাঁধে এবং ফলে কয়েকজন হতাহত হন। সেই সময় মুর্শিদাবাদের নবাব সরফ রাজ খাঁ। তিনি নাকি স্বয়ং এই ব্যাপার তদন্ত করিতে এই মহামেলায় আসেন এবং এই বিরাট মেলা প্রত্যক্ষ করেন। সেই সময়ে তাঁহার আদেশে বর্ধমান মহারাজার তৌজি হইতে উক্ত জমিদারী বিচ্ছিন্ন করিয়া ঘাটোয়ালী জমিদারী বলিয়া তৌজিভুক্ত করা হয়।

সেই অবধি অগ্রদ্বীপ গোটপাড়ার মহাশয়দের ঘাটোয়ালী সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয়। গোপীনাথদেব পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গোটপাড়ার মহাশয়দের ছিল। পলাশীর যুদ্ধের পর ঘাটোয়ালী সম্পত্তির সঙ্গে সঙ্গে গোপীনাথদেবও কৃষ্ণনগরের মহারাজার বিগ্রহরূপে গণ্য হয়। তবে কৃষ্ণনগরের মহারাজা কখনও গোটপাড়ার স্নানযাত্রা উৎসব বন্ধ করেন নাই; কেবল মহারাজ ক্ষৌনীশ চন্দ্র কোন কারণে পাঁচ-ছয় বৎসর গোটপাড়ার স্নানযাত্রা উৎসব বন্ধ করিয়াছিলেন। নাকাসীপাড়ার জমিদার শিবেন্দ্র নাথ সিংহ রায় ও শচীন্দ্র নাথ সিংহ রায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং গোটপাড়ার মহাশয়দের পুরোহিত বংশের সহযোগিতায় পুনরায় গোটপাড়ায় গোপীনাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব আরম্ভ হয় এবং অদ্যাবধি উহা চলিয়া আসিতেছে।

সর্বমঙ্গলাদেবীর অভিষেক উৎসব

মুড়াগাছা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী মহাসমারোহে সর্বমঙ্গলাদেবীর বার্ষিক অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

এই গ্রামে সর্বমঙ্গলাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও তাঁহার পূজা প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, এই গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় রামকিশোর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অন্যতম পৌত্র দেওয়ান স্বর্গীয় দেবীদাস মুখোপাধ্যায় একদা স্বপ্নাদেশে জানিতে পারেন যে, গুড়গুড়িয়া নদীর নাপিতঘাটের নিকট সর্বমঙ্গলাদেবীর প্রতীক স্বরূপ একটি শিলাখণ্ড রক্ষিত আছে। তিনি যেন উক্ত শিলাখণ্ডটির নিত্য-পূজাদির ব্যবস্থা করেন। এই স্বপ্নাদেশ অনুসারে দেবীদাস মহাশয় নাপিতঘাট হইতে শিলাখণ্ডটিকে আনিয়া প্রথমে গ্রামের বাজারের নিকট মনসাতলায় স্থাপন করেন এবং পরে আনুমানিক বাংলা ১২৯৭ সনের বৈশাখ সংক্রান্তি তিথিতে একটি নব নির্মিত পাকা মন্দিরে উক্ত শিলাখণ্ডটি সহ একটি মৃন্ময়ী চণ্ডী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে অদ্যাবধি দেবীর নিত্যপূজা ও বৈশাখ মাসে বার্ষিক অভিষেক উৎসব পালন করা হইতেছে।

দেবীর বর্তমান মন্দিরটি পশ্চিম দুয়ারী ও সম্মুখে বারান্দাযুক্ত। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরে দেয়াল গাত্রে সুন্দর কারুকার্য খোদিত।

উৎসবের প্রথম দিনে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক দেবীর অভিষেক ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পর যথারীতি পূজা আরম্ভ হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে প্রথম দিনের প্রথম পূজার নৈবেদ্য স্বর্গীয় দেবীদাস মহাশয়ের তৃতীয় কন্যা সাধনপাড়া নিবাসিনী শ্রীমতি অন্নপূর্ণা দেবীর বাটী হইতে আসিয়া থাকে। এই নৈবেদ্য আনয়নের মধ্যেও একটি বৈশিষ্ট্য আছে। আতপ চাউল, নানাপ্রকার মিষ্টি খাবার ও ফল দ্বারা প্রায় সত্তর হইতে একশতটি নৈবেদ্য কাঠের বারকোষ, পিতলের থালা ও বাঁশের তৈয়ারী ডালায় সাজাইয়া গ্রামের হিন্দু বালক-বালিকাদিগের মাথায় চাপাইয়া মন্দিরে প্রেরণ করা হয়। নৈবেদ্যের সারির প্রথমে মঙ্গলঘট, ডাব, দেবীর শাড়ী, শাঁখা, সিন্দুর ও ধূপ-ধূনাদি থাকে। মিছিলের প্রথমে ব্যাণ্ড, ব্যাগপাইপ বাজনা ও "রাইবেঁশে" নাচের আয়োজন থাকে এবং পশ্চাতে কীর্তনগানের ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপে মিছিলটি প্রথমে সমগ্র গ্রামটি প্রদক্ষিণ করিয়া স্বর্গীয় দেবীদাস মহাশয়ের বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং সেখান হইতে সর্বমঙ্গলা দেবীর মন্দিরে আসিলে নৈবেদ্যের ডালাগুলি সাজাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর স্বর্গীয় দেবীদাস ও স্বর্গীয় রাঘবরাম বিশ্বাস মহাশয়ের বাড়ী হইতে পূজার নিমিত্তে নৈবেদ্য আসিয়া থাকে।

পূজার দ্বিতীয় দিনে ধর্মদহ নিবাসী শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটী হইতে মিছিল করিয়া পূজার নৈবেদ্য আসিয়া থাকে। মন্দিরে নৈবেদ্য আসিয়া

পৌঁছাইলে পর মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। এইদিন মালোপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া ও গোয়ালাপাড়া হইতেও পূজার নৈবেদ্য আসে।

পূজার তৃতীয় দিনে রাখালগাছি, বামুনপাড়া, কামারহাটি, ঘাটিশ্বর ও এই গ্রামের হরিজনপাড়া হইতে মহা সমারোহে পূজার নৈবেদ্য আসে।

দেবীর ভৈরব মহাদেব। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়:

যেষা ললিত কান্তাখ্যাদেবী মঙ্গল চণ্ডিকা।
বরদাভয় হস্তাচ দ্বিভুজা গৌর দেহিকা
রক্তপদ্মাসবস্থা চ মুকুটোজ্জ্বল মণ্ডিতা
রক্তকৌষের বস্ত্রী চ স্মিত রক্তা শুভাননা
নবযৌবনসম্পন্না চার্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে দেবীর বার্ষিক উৎসব ও নিত্যপূজাদি হইয়া থাকে। দেবীর সেবায়েতগণ উৎসবাদি পরিচালনা করিয়া থাকেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও এই গ্রামের ও আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এমনকি নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরাও এই উৎসবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মানসিক পূজা দিবার জন্য প্রতিদিন আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু ভক্ত আসিয়া থাকেন। মানসিক স্বরূপ ষোড়শোপচারে পূজা এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য অলঙ্কার দেওয়া হয়।

জেলা ঃ নদীয়া

থানা ঃ নাকাসীপাড়া

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব মেলা
(কাটাপীর)

নাঙ্গলা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অম্বুবাচী তিথিতে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সাহেবতলা নামক স্থানে পীরোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রী প্রধানতঃ নাকাসীপাড়া, চাপড়া, কালীগঞ্জ, তেহট্ট, করিমপুর, রাণাঘাট, প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। ইহা-ছাড়া, নদীয়া জেলার বাহির হইতেও কিছুসংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকেন।

মেলায় পঞ্চাশ হইতে ষাটটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মুড়াগাছা, বেথুয়াডহরী, ধর্মদহ, বীরপুর, সোনাতলা, হুদা, দীঘা, প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মোট দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, প্রভৃতি খাবারের দোকান, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান এবং ধামা-কুলার দোকান, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকানপাট বসিয়া থাকে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

দোগাছিয়া গ্রামের কলাবাগান ও করালীপাড়ার মধ্যে স্থলে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়কপূজা উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় মুড়াগাছা, বীরপুর, চাপড়া প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় খোলা জায়গায় প্রায় সত্তরটি দোকানপাট বসে ও প্রায় ত্রিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাট-গুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, মাটির তৈয়ারী তৈজসপত্র ও পুতুলের দোকান এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, কাপড়চোপড়ের দোকান, তামা, পিতল ও কাঁচের বাসন পত্রের দোকান,কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান, বই-ছবির দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা ইত্যাদি দ্রব্যাদি আমদানী হয়। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন প্রতি বৎসর মেলায় বর্ধমান ও নবদ্বীপ হইতে বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও যাত্রা-ভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া খেলা হয়। গ্রামে শ্রীঅনুকুল চন্দ্র মণ্ডলের একটি যাত্রাদল আছে। এই দলই যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন।

পৌষ সংক্রান্তির মেলা

ভেবুয়াডাঙ্গা (গঙ্গার ঘাট) গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির স্নান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একুশ বৎসরের প্রাচীন। দোগাছিয়া ধুবুলিয়া, মুড়াগাছা, ধর্মদহ, সাধনপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ইহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক।

মেলায় খোলা জায়গায় মোট প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতা-গণ মুড়াগাছা, ধর্মদাহ, বেথুয়াডহরী ও ধুবুলিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, প্রভৃতি খাবারের দোকানই বেশী। ইহাছাড়া মনিহারী দোকান, তাঁতের কাপড়-চোপড়ের দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারীর দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান, শিল্পসামগ্রীর দোকান এবং বই-ছবি ইত্যাদি দোকানপাট বসে।

ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজার মেলা

ব্রহ্মাণীতলা গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণী (মনসা) পূজা উপলক্ষে পূজার নির্দিষ্ট স্থানের আশে-পাশে প্রায় ষোল-সতের বিঘা পরিমাণ ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি ছয়-সাত দিন ব্যাপী চলে।

মেলায় নাকাসীপাড়া, কালীগঞ্জ, কৃষ্ণনগর, তেহট্ট, চাপড়া প্রভৃতি থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে দৈনিক গড়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বর্ষাকালে গ্রামের কর্দমাক্ত রাস্তায় অন্য কোন যানবাহনের সুবিধা না থাকায় অধিকাংশ যাত্রীই গরুর গাড়ীতে আসেন।

মেলায় মোট প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যাও খুব কম নহে। নিকটবর্তী গ্রাম নাকাসীপাড়া, গোটপাড়া, মুড়াগাছা, বেথুয়াডহরী, দেবগ্রাম, আড়পাড়া, কাশিয়াডাঙ্গা, বেলডাঙ্গা, কৃষ্ণনগর হইতে এবং কলিকাতা, ২৪-পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমানের পাটুলী হইতে প্রধানতঃ প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলার সুব্যবস্থার জন্য ও মেলার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের জন্য দোকানদারদের নিকট হইতে কিছু তোলা আদায় করা হয়। মেলায় কাঠের জিনিস যেমন, তক্তা, বেঞ্চি, সিন্দুক, চৌকি, চেয়ার ইত্যাদি এবং গাছের চারা খুব বেশী বিক্রয় হয়। ইহাভিন্ন ময়রা তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসন-কোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, গোটপাড়া ও রাজপুর গ্রামের কুমারদের এবং নাকাসীপাড়ার ডোমদের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদি বেত ও বাঁশের জিনিসপত্র এবং মাটির তৈয়ারী পুতুল, হাঁড়িকুড়ি ইত্যাদির দোকান, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, বই-ছবি ও টোট্‌কা ঔষধপত্রের দোকান বসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কবিগান, মনসার গান এবং কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়েরও ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল আমোদ-প্রমোদে প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারী অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

পরিশেষে ব্রহ্মাণী পূজার মেলা উপলক্ষে গ্রাম্য কবির রচিত একটি গানের কিছু অংশ নীচে উদ্ধৃত করা হইল :

শ্রাবণের সংক্রান্তিতে ব্রহ্মাণীতলায়।
ব্রাহ্মণীদেবীর পূজা বিখ্যাত তথায়॥

* * * *

ময়রা, কাঁসারী, মুদি কত মনিহারী।
সারি সারি সাজান দোকান মনোহারী॥
কুম্ভকার বিস্তর বিক্রয় করে হাঁড়ি।
প্রেমানন্দে দেহতত্ত্ব গায় নেড়া-নেড়ী॥

মহরমের মেলা

ধনঞ্জয়পুর গ্রামে প্রতি বৎসর চান্দ্রমাসানুসারে মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব উপলক্ষে গ্রামের হাটতলার সন্নিকটস্থ মাঠে প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। উৎসব উপলক্ষে দুই-তিন দিন পূর্ব হইতেই মেলার দোকানপাট বসিলেও কেবলমাত্র উৎসবের শেষ দিনই পূর্ণভাবে মেলা বসে বলা যায়। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় মোট প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। প্রধানতঃ ধনঞ্জয়পুর, বিলকুমারী, ছোটশিমলা, বড়শিমলা প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত গ্রাম হইতে মেলায় লোকজন আসিয়া থাকেন।

মেলায় শতাধিক দোকানপাটের মধ্যে বেশীর ভাগ দোকানই খোলা জায়গায় বসে। প্রধানতঃ বেথুয়াডহরী, পলাশী, দেবগ্রাম ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন। এই সকল দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান এবং মনিহারী দোকানপাটই বেশী। ইহাছাড়া শিল্প-সামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান এবং শাকসজী ও মাছের বাজার বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য লাঠিখেলা ও জারীগানের আয়োজন করা হয়।

আকন্দডাঙ্গা গ্রামে মহরম উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে

ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। ইহা প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। অগ্রদ্বীপ, খোসালপুর, ডেঙ্গাপাড়া, মাঝেরগ্রাম, মদনডাঙ্গা, কেলেপোতা প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় তিন হাজার নরনারী মেলায় আসেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ সাইকেলে ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাগণ স্থানীয়। মেলায় মাটির হাঁড়ি, কলসী, পুতুল প্রভৃতির দোকানই বেশী বসে। ইহাছাড়া, ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী প্রভৃতির কয়েকটি দোকানপাট বসিয়া থাকে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য লাঠিখেলা, শোকনামা ও জারীগানের ব্যবস্থা থাকে।

স্নানযাত্রার মেলা

প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে গোপীনাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষে গোটপাড়া গ্রামের বাজার সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় চল্লিশ বিঘা জমির উপর সাতদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। পূর্বে এই মেলা প্রায় চৌদ্দ-পনর দিন স্থায়ী হইত।

নাকাসীপাড়া থানার অন্তর্গত প্রায় সকল ইউনিয়ন হইতে কৃষ্ণনগর ও চাপরা থানার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং বর্ধমান জেলা হইতেও লোকজন এই মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় পনর-ষোল হাজার নর-নারীর সমাগম হয় এবং যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। সাধারণতঃ পূর্ণিমার দিনই অধিকসংখ্যক লোক সমাগম হয়। মেলায় ষাট হইতে সত্তরটি দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকান, তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়ের দোকান, মাটির পুতুল, হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতির দোকান, বেতের ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলা, ডালা, চ্যাঙারী প্রভৃতির দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাছাড়া কাঁচের চুড়ি, আয়না, সিঁদুর, শাখা প্রভৃতির দোকানও বসিয়া থাকে।

মেলা উপলক্ষে এখানে নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস প্রভৃতির দল আসে বটে কিন্তু নিয়মিত নয়। এই সকল আমোদ-প্রমোদের আসরে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় পূর্বে যেমন জাঁকজমক হইত বর্তমানে সেইরূপ আড়ম্বর নাই বলিয়াই মনে হয়।

সর্বমঙ্গলাদেবীর পূজা উপলক্ষে মেলা

মুড়াগাছা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তি তিথিতে সর্বমঙ্গলাদেবীর বার্ষিক অভিষেক উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় সাত বিঘা জমির উপর পনেরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি কিয়দংশ দেবোত্তর এবং কিয়দংশ ব্যক্তি-বিশেষের। মেলাটি বাংলা ১১৯৭ সন হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

ধর্মদহ, পাটিকাবাড়ী, দোগাছিয়া, সাধনপাড়া, বোল-পুকুর নপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভূত বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং রাণাঘাট, কৃষ্ণনগর, ধুবুলিয়া, দেবগ্রাম, পলাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যহ গড়ে প্রায় দুই হাজার নরনারী ট্রেনে, গরুরগাড়ীতে, সাইকেলে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় দেড়শত দোকানপাট বসে। বীরনগরের উলাইচণ্ডীর পূজার মেলায় এবং কৃষ্ণনগরের বারদোলের মেলায় আগত বিক্রেতারা উল্লিখিত উভয় স্থানের মেলা ভাঙ্গিয়া গেলে এই স্থানের মেলায় আসিয়া হাজির হন। দোকানপত্রের মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন তেলেভাজা, ময়রা প্রভৃতি খাবারের দোকান, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির তৈয়ারী বাসনপত্রের দোকান, জুতার দোকান, মিল ও তাঁতের কাপড়-চোপড়ের দোকান, কৃষি-যন্ত্রপাতির দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসিয়া থাকে।

মেলা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, তর্জা, পালাকীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। এই মেলায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত ব্যক্তি বা দল

তর্জাগান ও যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন। যেমন, কলিকাতার নট্ট অপেরা, আর্য্য অপেরা, রঞ্জন অপেরা, গণেশ অপেরা, নবদ্বীপের সাগরদল ও শ্রীধর্মদাস রায়, বাণাঘাটের গোপাল ওস্তাদ, কলিকাতার শ্রীসত্যশ্বর চট্টোপাধ্যায় ও কার্তিক কুরী, হাওড়া শিবপুর সমাজের শ্রীগৌড়গরিমা দাস, মুড়াগাছার সর্বমঙ্গলা অপেরা ও সর্বশ্রী শশী অধিকারী, নীলমনি বিশ্বাস, ত্রৈলক্য তারিণী, মতি রায়, ব্রজ রায়, রঘুনাথ প্রভৃতি আরো অনেকে।

জেলা : নদীয়া
থানা : কালীগঞ্জ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : পলাশী। ৪।২,৫০৮।১,২৬৭।৭,৬৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, ছুতার, কামার, কলু, ধোপা, নাপিত, হাড়ী, বৈশ্য ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলষ্টেশন পলাশী। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। কেবলমাত্র বর্ষাকালে নিকটবর্তী ভাগীরথী নদী দিয়া মালবাহী নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, ভাদ্র মাসে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত লক্ষীনারায়ণজীউর মহাষ্টমী উৎসব ও ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং রাধারাণী জীউর আখড়ায় রাধাষ্টমী ও গুরু নানকের আবির্ভাব উৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) স্নানযাত্রার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন।

(চ) লক্ষীনারায়ণ জীউর একটি মন্দির, রাধারাণীর আখড়া এবং শাহ মনোহর পীর সাহেবের একটি সমাধি স্থান আছে। পীর সাহেবের সমাধিটি বহু কালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। শুনা যায়, প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে পেশোয়ার হইতে তিন ভ্রাতা ভারতে আসেন। তাঁহাদের মধ্যে শাহ মনোহর পীরই জ্যেষ্ঠ ছিলেন। পীর সাহেব অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর তাঁহাকে এই গ্রামে সমাধিস্থ করা হয়। তাঁহার সমাধি স্থানে অনেকে মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন।

শ্রীলক্ষীনারায়ণ সাহা, প্রধান শিক্ষক,
পলাশী উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পো: পলাশী, নদীয়া।

"**পলাশী**—কলিকাতা হইতে ৯৩ মাইল দূর। এ লাইনে ইহাই নদীয়া জেলার শেষ স্টেশন। স্টেশন হইতে প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে ইতিহাস-বিশ্রুত পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র অবস্থিত। কথিত আছে, পূর্বে এই অঞ্চলে বহু পলাশ বৃক্ষ থাকায় এই স্থানের নাম হয় পলাশী, কিন্তু বহুকাল হইতে ইহাদের কোন চিহ্নই নাই। ১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩এ জুন বৃহস্পতিবার এই স্থানে বাংলার শেষ স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌলার সেনাবাহিনীর সহিত ক্লাইভের অধিনায়কতায় ইংরেজ সৈন্যের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে জয়লাভ করিয়া ইংরেজ কার্য্যত: বাংলার আধিপত্য লাভ করেন।......

ভাগীরথীর গতি পরিবর্ত্তনের ফলে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রের অধিকাংশ স্থান নদীসাৎ হইয়া এখন চরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষিণে এখন তেজনগর বা নূতন পলাশী গ্রাম বসিয়াছে। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে ভ্রমণকারী ভ্যালেন্টিন পলাশীর বিখ্যাত আম্রকুঞ্জ দেখিয়াছিলেন; বাগানের শেষ আম্রকুঞ্জটি শুষ্ক হওয়ায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাহার মূলদেশ উৎপাটিত করিয়া পলাশী বিজয়ের স্মৃতিস্বরূপ বিলাতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। পুরাতন আমগাছের আর কোন চিহ্নই নাই। পলাশী পরগণার কিছু অংশ রাণী ভবানীর জমিদারীর অন্তর্গত ছিল। কথিত আছে, তিনি এখানে একলাখ আমগাছের বাগান করিয়াছিলেন। এই জন্য এই স্থান লাখবাগ নামেও অভিহিত হয়। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বাংলা সরকার কর্ত্তৃক পলাশীর মাঠে শেষ আম্রবৃক্ষটির ৬০।৭০ হাত দক্ষিণ-পূর্ব কোণে গ্রেনাইট প্রস্তরনির্মিত একটি ক্ষুদ্র বিজয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জ্জন উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তৎস্থলে একটি অপেক্ষাকৃত বড় স্তম্ভ ও তাহার নিকটে দর্শকগণের বিশ্রামের জন্য একটি ডাকবাংলা নির্ম্মাণ করেন।"

(বাংলায় ভ্রমণ: ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সনে প্রকাশিত পৃ: নং ২৬০—২৬২)

২। গ্রাম : হাটগোবিন্দা (মৌজা : চক গোবিন্দপুর)। ২৯।৫১৪।১৮৫।১,১৩০

(ক) মুসলমান, নাপিত, কামার ও হাড়ি। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী ও পাগলাচণ্ডী এবং বাসষ্ট্যাণ্ড পাঁচপেলা ও গোবিন্দপুর। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা আছে।

(ঘ) বৎসরের বিভিন্ন সময়ে গ্রামের মুসলমানগণ ঈদলফেতর, ইদুজ্জোহা, সবেবরাত ইত্যাদি উৎসব পালন করেন। উৎসবগুলি গ্রামে বহুকাল যাবত অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বড়পীরের একটি আস্তানা আছে। পীরোত্তর কিছু জমির আয় হইতে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে পীরের স্থানে "খানা" দেওয়া হয় এবং দান-খয়রাত করা হয়।

শ্রীতামেজুদ্দিন আহমদ, প্রধান শিক্ষক,
হাটগোবিন্দা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড়চাঁদঘর (পলাশী), নদীয়া।

৩। গ্রাম : হাটগাছা। ৩৭।১৪,৯৮।১১৩।৫৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, কামার, বাগ্দী, মুচি, সাহা, মুসলমান ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুচিপাড়া, গোয়ালা-পাড়া, হালদারপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, চৈত্র মাসে শিবের গাজন এবং চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

রথযাত্রা উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে রাধাকৃষ্ণ ও বালগোপাল বিগ্রহ এবং চারিটি নারায়ণশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর এই দেববিগ্রহগুলিকে কেন্দ্র করিয়া জন্মাষ্টমী ও দোলযাত্রা উৎসব হয়। উৎসব দুইটি বহুকালের প্রাচীন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে ৺শিবদেব বাচস্পতি মহাশয় এই উৎসবের প্রচলন করিয়াছিলেন।

গ্রামে একটি অশ্বত্থমূলে প্রতিষ্ঠিত চারিটি শিলাকে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে ভদ্রকালীর ধ্যানে যথারীতি পূজা করা। উক্ত শিলা কয়টি প্রায় তিন-চারিশত বৎসর পূর্ব হইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া দাবী করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। জগদ্ধাত্রী পূজাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

শিবের গাজন উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে উৎসব আরম্ভ হয় এবং সারামাস ব্যাপী চলে। সংক্রান্তির দিন বিশেষ পূজা ও হোম হয়। শিবমূর্তিটি সারা বৎসর গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে থাকে, উৎসবের সময় পূজা মণ্ডপে আনিয়া পূজা ও উৎসব পালন করা হয়।

মহরম মাসের ১লা হইতে ১১ই তারিখ পর্যন্ত আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় মিলিত হইয়া মহরম উৎসব পালন করেন। উৎসবের শেষদিনে হাটগাছার ফরিদতলা ময়দানে মুসলমানগণ সমবেত হইয়া নামাজ পড়েন ও শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে। বহুকালের প্রাচীন।

মহরমের মেলা। একদিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে কালীর একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং ফরিদতলায় ফরিদশাহ নামে জনৈক ফকিরের একটি নকল কবর আছে। এই কবরে অনেকে মানসিক করিয়া থাকেন।

শ্রীগোলাম জিলানী, শিক্ষক,
গ্রাম : কমরা,
পোঃ কালীগঞ্জ, নদীয়া।

৪। গ্রাম : হিজুলী। ৫৩।৫৪৪।৫২।৭৭৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সৎচাষী, গন্ধবণিক, নাপিত, বাগ্দী, রাজওয়ার, মুচি, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন দেবগ্রাম হইতে হিজুলী হইয়া কাটোয়া পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের অদূরে গঙ্গা প্রবাহিত থাকায় নৌকা চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, ফাল্গুন মাসে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চমদোল। ইহা ছাড়া, গ্রামের মুসলমানগণ চান্দ্রমাস অনুসারে মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। দোল উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে রসিকরায় (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহ আছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে যাবতীয় সর্বজনীন উৎসবাদি অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণের চৌচালাযুক্ত একটি মাটির দেবালয় আছে।

শ্রীমোহিনী মোহন শিকদার, প্রধান শিক্ষক,
হিজুলী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কালীগঞ্জ, নদীয়া।

৫। গ্রাম : দেবগ্রাম। ৬০।৪,৯০৯।১,৪৯৯।৮,৪৩৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গন্ধবণিক, কলু, ধোপা, বাগ্দী, ময়রা, স্বর্ণবণিক, নাপিত, রাজবংশী ও হাড়ী।

গ্রামে চট্টোপাধ্যায়পাড়া, মুখোপাধ্যায়পাড়া, ঘটকপাড়া, দত্তপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুচীপাড়া ইত্যাদি অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। গ্রামের মধ্যে জেলাবোর্ডের রাস্তা এবং গ্রামের পূর্বদিক দিয়া মিলিটারী হাইরোড চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে পাঁচ-ছয়টি বিশ্বকর্মাপূজা, আশ্বিন মাসে ছয়টি দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে পাঁচ-ছয়টি কালীপূজা ও পাঁচ-ছয়টি কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা ও মাঘ মাসে আট-দশটি সরস্বতীপূজা হয়। সমগ্র পূজা-পার্বণগুলির মধ্যে কেবল মাত্র একটি দুর্গাপূজা ব্যক্তি-বিশেষের এবং অন্যান্য সমস্ত পূজাই সর্বজনীন। উৎসব উপলক্ষে থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে বাগ্দী পাড়ায় একটি মনসা পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে কুলাইচণ্ডী প্রতিষ্ঠিত আছেন। দুর্গার ধ্যানে ইঁহার পূজা হয়।

শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ দেবগ্রাম, নদীয়া।

Debagram (J. L. 60)—Alight at Debagram, 87 miles from Calcutta on the Calcutta-Bhagawangola line. A few ruins and high mounds can be seen in this Village. Historians suppose that this was a cantonment of the Sena Kings.

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. 169)

"**দেবগ্রাম**—কলিকাতা হইতে ৮৭ মাইল দূর। ইহা একটি প্রাচীন পল্লী। এই স্থানে কয়েকটি ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন ও উচ্চ ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে সেন রাজগণের সময়ে এখানে একটি জয়-স্কন্ধাবার বা সেনানিবাস ছিল। পূর্বে এই স্থান সংস্কৃত চর্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র ছিল। স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ চক্রবর্তী দেবগ্রামের অধিবাসী ছিলেন।"

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত; পৃঃ ২৫৯-২৬০)

৬। গ্রাম : বসন্তপুর। ৮৭।১,০৯২।২১৮।১,০৮৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বুনো, মুচি, বাগ্দী ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন কাটোয়া হইতে দেবগ্রামগামী মোটরবাস গ্রামের মধ্য দিয়া যাতায়াত করে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কালীপূজা, ভাদ্র মাসে মনসা পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে শিবপূজা ও শীতলাপূজা। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে উল্লিখিত প্রত্যেকটি দেবদেবীর মন্দির আছে।

শ্রীনরেন্দ্র নাথ সাহা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বল্লভপাড়া, নদীয়া।

৭। গ্রাম : কামদেবপুর। ৯২।৩৫৬।৫৭।২৯০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র ও মাঝি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাটোয়া।

(ঘ) ভাদ্র মাসে মনসাপূজা, চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজন। মনসা পূজাটি প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের ২৮শে তারিখে আরম্ভ হইয়া ১লা আশ্বিনে শেষ হয়। ভাদ্রসংক্রান্তিতে উৎসব উপলক্ষে ছাগ বলি হয়।

এই গ্রামের শ্মশানঘাটে প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২৩।২৪ তারিখ হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। শিবের নিত্য পূজা হয়।

(ঙ) শিবের গাজনের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) এই স্থানে প্রথম বসতি স্থাপনকারী কামদেব নামক জনৈক ব্যক্তির নামানুসারে গ্রামের নাম হইয়াছে কামদেবপুর।

শ্রীকালীকিঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষক,
পোঃ মাটিয়ারী, নদীয়া।

৮। গ্রাম : মহুরাপুর (মৌজা : রাজারামপুর)।
১০৫।৭৩৬।২২০।১,১৩৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, গোয়ালা, স্বর্ণকার, কামার, কুমার, মাহিষ্য, সাহা, খাটোয়াল, মোদক, ধোপা, মুচি, হাড়ী ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দেবগ্রাম অথবা অগ্রদ্বীপ রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। ভাগীরথী নদীতে নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক। গ্রামে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌরাঙ্গদেবের নিত্য পূজা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে পর্ব ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, এই গ্রামে শ্রীনিবাস আচার্য্যের আবির্ভাব উৎসব এবং একটি ব্রহ্মাণী পূজা হয়।

(ঙ) স্নানযাত্রা উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন মেলাটি দশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির এবং মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালাযুক্ত একটি মসজিদ ঘর আছে।

শ্রীনিরঞ্জন আচার্য্য, চাকুরী,
গ্রাম : মহুরাপুর,
পোঃ ঘোড়াইক্ষেত্র, নদীয়া।

৯। গ্রাম : বড়চাঁদঘর।১২৩।৩,০৪৮·৭৪।৮৭০।৪,৫৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বারুই, সাহা, রাজবংশী, নমঃশূদ্র, ধোপা, হাড়ী, মুচি ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী। পলাশী-বেতাই জাতীয় সড়ক দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। ঐ মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(খ) বৈশাখ মাসে যশদায়িনী পূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং শিব ও কালী পূজা হয়। ইহাছাড়া, প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীর দিনে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) যশদায়িনীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে। মেলাটি প্রায় একশত পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে।

হরিঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি মাত্র চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীযতীন্দ্র নাথ বৈদ্য, প্রধান শিক্ষক,
বড় চাঁদঘর জি, এস্, প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড়চাঁদঘর, নদীয়া।

জেলা : নদীয়া
থানা : কালীগঞ্জ

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব ('হরিঠাকুর')

বড়চাঁদঘর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত চার বৎসর পূর্বে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য শ্রীমহানন্দ হালদার মহাশয় এই গ্রামে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসবটি প্রচলন করেন। উৎসবটি সর্বজনীন হইলেও বিশেষ করিয়া হরিঠাকুরের মাতুয়া নামে খ্যাত শিষ্যগণ দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। উৎসবের তিনদিন যথারীতি ভোগ-পূজাদি হয় এবং সর্বজনীন ভোজের আয়োজন করা হয়।

হরিঠাকুরের জীবনী সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলায় গোপালগঞ্জ মহকুমার অধীনে উড়াকান্দি গ্রামে বাংলা ১২১৮ সনে ফাল্গুনী মধু ত্রয়োদশী তিথিতে এক নমঃশূদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ধর্মপরায়ণ ছিলেন এবং পরবর্তী জীবনে তিনি তাঁহার সাধনা লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা সহজ ধর্ম প্রচার করিয়া যান। তিনি অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বীয় ঐশী শক্তি দ্বারা বহুলোকের দুরারোগ্য ব্যাধি ইত্যাদি নিরাময় করিতেন। ভক্তেরা তাঁহাকে অবতার জ্ঞানে ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের ধর্মমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ববঙ্গে তাঁহার বহু শিষ্য-প্রশিষ্য ও অনুরাগীমণ্ডলী ছিলেন ও আছেন। তিনি সমাজে শিক্ষা-দীক্ষাহীন কুসংস্কার নিপীড়িত নিম্নশ্রেণী লোকদের আত্মিক মুক্তি কল্পে বিশেষ ভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দেশবিভাগের ফলে হরিঠাকুরের শিষ্যগণের এক বিরাট অংশ পশ্চিমবঙ্গের এমন কি পশ্চিমবঙ্গের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়েন। তাঁহার প্রচলিত ধর্মের উত্তর সাধক ও প্রচারক হিসাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরও খ্যাতি সম্পন্ন হন। হরিঠাকুরের প্রপৌত্র অধুনা বিধানসভার সদস্য শ্রীপ্রমথ রঞ্জন ঠাকুর বর্তমান হরিঠাকুরের মাতুয়া নামক শিষ্য-মণ্ডলীর পরিচালনা করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ২৪-পরগণা জেলার ঠাকুর নগর কলোনীতে হরিঠাকুরের মন্দিরে প্রতি বৎসর বারুণী তিথিতে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উপলক্ষে একটি মেলার প্রচলন করেন। ৺তারক চন্দ্র সরকার নামে জনৈক ভক্ত হরিঠাকুরের জীবনী সম্বলিত কবিতা ছন্দে "শ্রীশ্রীহরিলীলামৃত" নামক একটি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে বহু বিশিষ্ট ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ হরিঠাকুরের প্রচারিত সহজধর্মের পৃষ্ট-পোষকতা করিতেছেন।

যশদায়িনী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব

বড়চাঁদঘর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের প্রতি মঙ্গলবার যশদায়িনী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় একশত পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে যশদায়িনী দেবীর মূর্তি আছে, তবে কোন মন্দির নাই। একটি বৃক্ষমূলে বাঁধানো স্থানে রক্ষিত দেবীর মূর্তি নিত্য পূজা হয়। যশদায়িনীর নিকট প্রধানতঃ ফলমূল, মিষ্টি ও ছাগ বলি মানসিক করা হয়। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতেও লোক সমাগম হয়। বর্তমান সেবায়েত জনৈক বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পদবী ঢোল।

কথিত আছে, প্রায় একশত পঁচাত্তর বৎসর পূর্বে ছোট চাঁদঘাট নিবাসী তান্ত্রিক কমল লোচন ঢোল মহাশয় এই গ্রামের পূর্বপ্রান্তে গভীর জঙ্গলের মধ্যে তন্ত্র সাধনা করিতেন। একদা তিনি স্বপ্নাদেশ অনুসারে নিকটবর্তী একটি পুষ্করিণী হইতে যশদায়িনীর মূর্তি পান এবং ঐ জঙ্গলে এক বৃক্ষমূলে উক্ত মূর্তি স্থাপন করিয়া প্রতিদিন নিয়মিতভাবে পূজাদি করিতেন। স্থানীয় লোক প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ঐ স্থানে পূজা দিতে আসিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দেবীর সেবায়েত নিযুক্ত হন। এই সময় সোনাডাঙ্গা নিবাসী জমিদার সুরেন্দ্র নাথ সিংহ রায় মহাশয় বৃক্ষমূলে দেবীর স্থানটি বাঁধাইয়া দেন এবং সারা বৈশাখ মাস ব্যাপী দেবীর স্থানে উৎসবের

আয়োজন করেন। বর্তমানে কেবল মাত্র বৈশাখ মাসের প্রতিটি মঙ্গলবার উৎসব হয়।

রাধাষ্টমী

পলাশী গ্রামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি আখড়ায় প্রতিবৎসর রাধাষ্টমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, বহুকাল পূর্বে জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এই গ্রামের রম্য পরিবেশে মুগ্ধ হইয়া গ্রামের এক প্রান্তে একটি স্থান নির্বাচন করিয়া সাধন-ভজন করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐস্থানে আখড়া স্থাপন করা হয়। উক্ত আখড়ায় একটি মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ ও গৌরীপট্ট সহ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে পূজা ও ভোগ এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভোগ দেওয়া হয়।

লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর পূজা

পলাশী গ্রামে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলাসহ আটটি শালগ্রাম শিলা, পিতল নির্মিত গণেশ, গৌরাঙ্গ, কৃষ্ণ ও গোপালমূর্তি, একটি শিব, রৌপ্য পাত্রে অঙ্কিত রাম-লক্ষ্মণ, তাম্র-পাত্রে অঙ্কিত হনুমানজী প্রভৃতি বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শোনাযায়, বহুকাল পূর্বে এই গ্রামে জনৈক সাধু আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার নিত্যসেবাপূজা করিতেন। কিংবদন্তী আছে দরিদ্র সাধু লক্ষ্মীনারায়ণ শিলার নিত্য ভোগপূজাদির জন্য উপাচার সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িলে লক্ষ্মীনারায়ণ শিলা হইতে প্রতিদিন একখণ্ড করিয়া স্বর্ণ পাওয়া যাইত এবং সাধু উক্ত স্বর্ণখণ্ডের দ্বারা নিত্যপূজার ও উৎসবাদির ব্যয় বহন করিতেন। তিনি দেহরক্ষা করিলে মধ্যপ্রদেশের বৈশ্য শ্রেণীভুক্ত জনৈক ব্যক্তি লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরের সেবায়েত নিযুক্ত হন।

বর্তমানে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী এবং ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসব দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

জেলা : নদীয়া
থানা : কালীগঞ্জ

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধানের মেলা

(হরিঠাকুর)

বড় চাঁদঘর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে হরিঠাকুরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে হরিঠাকুরের মন্দিরের সন্নিকটে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় এক বিঘা জমির উপর গত চার বৎসর যাবত একটি মেলা বসিতেছে। মেলাটি একদিনই স্থায়ী হয় এবং ইহাতে প্রায় তিন-চার হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। এই সকল যাত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত। নদীয়া, ২৪-পরগণা, বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলা হইতে ভক্তসম্প্রদায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং পনর-ষোলজন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল, বেত এবং বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি দোকানপাট বসে।

চড়ক-গাজন ও নীলপুজার মেলা

কামদেবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া থাকেন। খাবার, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের কয়েকটি মাত্র দোকানপাট বসে।

শিবপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর বোলান গানের ব্যবস্থা করা হয়।

মহরমের মেলা

হাটগাছা গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট পুষ্করিণীর পাড়ে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর মহরম উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই হইতে তিন হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন হইতে আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রতি বৎসর দেবগ্রাম, কালীগঞ্জ, কুঠুরিয়া, পানিঘাটা, কামারী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে তেলেভাজা ও ময়রার দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, মাটির, কাঁচের ও লোহার বাসনপত্রের, মনিহারী দ্রব্যের, কাটাকাপড়ের, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকানপাট বসে। বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান প্রধানতঃ কালীগঞ্জ, হরিনাথপুর, হাটগাছা প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, লাঠিখেলা ও পাঁচালী গানের আয়োজন করা হয়। কামারী, সাহাপুর, অনন্তপুর ও শেওড়াতলা হইতে পাঁচালী গানের দল আনা হয়। প্রায় দেড় হাজার নর-নারী এই সকল আমোদ-প্রমোদ উপভোগ গ্রহণ করে। মেলায় লটারী ও জুয়া খেলা হয়।

যশদায়িনী পূজার মেলা

বড় চাঁদঘর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে যশদায়িনী পূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন। সাহেবনগর, পানিঘাটা, পলাশী, কালীপুর, প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রতি বৎসর পাঁচশত হইতে এক হাজার নর নারীর সমাগম হয়।

মেলায় মোট ত্রিশ হইতে চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং পনের-ষোল জন ফেরিওয়ালা আসেন। মিরাবাজার, বেথুয়াডহরী প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। এই সকল দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন ও কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামে একটি যাত্রাদল আছে।

স্নানযাত্রার মেলা

মন্থরা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভাগীরথী নদীতে পূণ্য স্নান উপলক্ষে নদীর তীরে প্রায় পাঁচ-ছয় কাঠা জমির উপর একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি সকাল হইতে বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহা গত দশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় দুই হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর কয়েকটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

পলাশী গ্রামে ভাগীরথী নদীতে পূণ্যস্নান উপলক্ষে প্রতি বৎসর ভাগীরথীর তীরে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। তাহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। আশেপাশের প্রায় কুড়ি মাইলের মধ্যবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় লোকজন আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান এবং মনিহারী দোকানপাট বসিয়া থাকে। ইহাছাড়া, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা, চ্যাঙ্গারীর দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুল ইত্যাদি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

জেলা ঃ নদীয়া

থানা ঃ তেহট্ট

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ধাওয়াপাড়া।৭।১,৭৯৮ ৩১।৩৭৬।২,০৯৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাগলাচণ্ডী। কুল-পাঙ্গী হইয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহাভিন্ন, পাগলাচণ্ডীর দহ হইতে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসের ২৫শে তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত পাঁচ দিন যথা-রীতি পূজা এবং সংক্রান্তির দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) শুনা যায় পূর্বে এই গ্রামের নাম কৃষ্ণচন্দ্রপুর ছিল। প্রতি বৎসর বন্যার জলে এই গ্রাম ধুইয়া যাইত বলিয়া পরে গ্রামের নাম "ধাওয়াপাড়া" হইয়াছে।

শ্রীরাজকুমার বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রামঃ ধাওয়াপাড়া,
পোঃ পালমুণ্ডা, নদীয়া।

২। গ্রাম ঃ সাহেবনগর।

১৮।১,৬৯৬ ২০।৩২৯।১,৯১০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোপ, কামার, কুমার, তিলি, যুগী, নাপিত, মুচি, বৈরাগী এবং পাটুনী। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী হইতে গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে। নৌকাযোগেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই উৎসব-গুলি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। গ্রামে বলরাম দাস বাবাজী নামে জনৈক বৈষ্ণবের আখড়ায় ত্রৈমাসিক মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন, রামায়ণ গান ও ধর্মালোচনা হয়। এই সময় আখড়ায় বহু বৈষ্ণব ভক্তের আগমন হয় এবং দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করা হয়। আখড়ায় বলরাম দাস বাবাজীর একটি পাকা মন্দির আছে। মহোৎসবটি প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ বৃহস্পতিবার এই গ্রামে দরগাহ তলায় "মাঠ পালনী" নামে একটি উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে একটি ছোটখাট মেলাও বসে। এই উৎসব এবং মেলাতে নিকটবর্তী গ্রামের বহু লোকজন যোগদান করেন। প্রতি মঙ্গলবার "রায়দেয়াশিনীর ভর" হয়। ব্যাধি মুক্তির জন্য ঔষধ প্রাপ্তির আশায় বহু দূরবর্তী গ্রাম হইতে নরনারীরা আসেন। জন্মাষ্টমী ও বৈশাখী পূর্ণিমাতে এই কারণে মহোৎসব হয়। এই উৎসব প্রায় পনের-ষোল বৎসর যাবত হইতেছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শিব ও গোপীনাথ জীউর নিত্য পূজা হয়।

শ্রীসুধীর কুমার চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
সাহেবনগর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ সাহেবনগর, নদীয়া।

৩। গ্রাম ঃ বাওর। ২১।৩৫৩ ৯৬।৩২০।১,৫৭০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে নিকারীপাড়া, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি নামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী।

(ঘ) পৌষ মাসে পৌষপার্বণ উৎসব। উৎসবটি প্রায় ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায় চান্দ্র মাস অনুসারে প্রতি বৎসর মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি গত চৌদ্দ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) পৌষপার্বণের মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীসদানন্দ ঝা, প্রধান শিক্ষক,
বাগের প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পলাশী, নদীয়া।

৪। গ্রাম : চান্দের ঘাট।

৩০।২,৩৩২'১২।৬৫৫।৪,০৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, গোয়ালা, কামার, কুমার, জেলে, কলু, নাপিত, মালো, হাড়ী, বাগ্দী, মুচি ও বুনো। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পলাশী। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে বালিউড়া পর্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়। ইহাছাড়া, জলঙ্গী নদী পথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে সারামাসব্যাপী প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি দশ ঘটিকা পর্যন্ত পল্লীর পথে পথে হরিনাম সংকীর্তন করা হয় এবং পূর্ণিমা তিথিতে সত্যনারায়ণের পূজানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসে জামাই ষষ্ঠী, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের তিনটি পাড়ায় ক্ষুদ্রাকারের তিনটি মেলা বসে এবং ইহাতে যুবকদিগের মধ্যে কুস্তি প্রতিযোগীতার (মালাম খেলা) আয়োজন করা হয়। আষাঢ় মাসে হরিদাস বাবাজীর মহোৎসব হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে গ্রামের তিনটি পাড়ায় তিনটি সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কার্তিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের মঙ্গলবারে সর্বজনীন কালীপূজা এবং তাহার পর দিবস ব্রহ্মানীপূজা হইয়া থাকে। অগ্রহায়ণ মাসে গ্রামের উত্তরপাড়ায় একটি নির্দিষ্ট গাছের তলায় বুনো সম্প্রদায় সাড়ম্বরে সিদ্ধেশ্বরীর পূজা করিয়া থাকেন। পৌষ মাসে পৌষ-সংক্রান্তির সময় গ্রামের সমুদয় লোক বিভিন্ন স্থানে শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বনভোজন উৎসব পালন করেন এবং এই উপলক্ষে নাচগানের মাধ্যমে আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। মাঘ মাসে গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় কয়েকটি সর্বজনীন সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে সাড়ম্বরে শোভাযাত্রা সহকারে প্রতিমা বিসর্জন এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। চৈত্র মাসে সর্বজনীন বাসন্তীপূজা ও চড়কপূজা হইয়া থাকে। ইহাছাড়া, অনেক গৃহস্থের ঘরেই গৌরাঙ্গ বিগ্রহ আছে। তাঁহারা বৎসরের বিভিন্ন সময়ে নানারূপে উৎসবাদি করিয়া থাকেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মঠে হরিদাস বাবাজীর সমাধি এবং একটি পাকা মন্দিরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। সাধারণের দানকৃত সম্পত্তির আয় হইতে উক্ত বিগ্রহাদির সেবা-কার্য নিষ্পন্ন হয়। বর্তমান সেবায়েত শ্রীব্রজেন্দ্র কিশোর চক্রবর্তী। উক্ত চক্রবর্তী পরিবার পুরুষানুক্রমে সেবায়েত কার্যে নিযুক্ত আছেন। ইহা ছাড়া, গ্রামের উত্তরপাড়া ও মধ্যপাড়াতে দুইটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বেদী নির্মাণ করিয়া প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে যথাক্রমে বাস্তুকালী ও রক্ষাকালী পূজা হয়। এই দুই স্থানে দুইজন ভৈরবী আছেন। প্রতি মঙ্গলবার তাঁহারা এই বেদীতে পূজা করেন। পূজার পর তাঁহাদের উপর দেবীর "ভর" হয়। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের আশায় দেবীর প্রত্যাদেশিত ঔষধ ও মাদুলী সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বহু লোকজন আসেন। বেদীমূলে কেহ কেহ মানসিক পাঁঠা বলি দিয়া থাকেন এবং অর্থ ও বস্ত্রাদি দিয়া পূজা দেন।

শ্রীশিব প্রসাদ মণ্ডল, প্রধান শিক্ষক,
চান্দের ঘাট সাউথ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ চান্দের ঘাট, নদীয়া।

৫। গ্রাম : ইলশামারী (মৌজা : মোবারকপুর)।
৭৬।১,৪৬৬·৭২।৪৫৪।২,১৩৮

(ক) নমঃশূদ্র প্রধান গ্রাম; বর্তমানে পূর্ব-পাকিস্থান হইতে আগত কিছু সংখ্যক কায়স্থ পরিবার এই গ্রামে বাস করিতেছেন।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পঁচিশ মাইল দূরে রেলস্টেশন এবং পশ্চিম দিকে দেড় মাইল দূরে মোটর-বাস চলাচল করে। নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী-পূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উৎসব। উৎসবগুলি আধুনিককালের এবং সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুইদিন-ব্যাপী। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামটি ভৈরব নদীতীরে অবস্থিত ছিল। বর্তমানে নদী ভরাট হইয়া গিয়াছে, এই নদীতে প্রচুর ইলিশ মাছ পাওয়া যাইত বলিয়া গ্রামটির নাম ইলশামারী হইয়াছে।

শ্রীনিশিকান্ত বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম: ইলশামারী,
পোঃ শ্যামনগর, নদীয়া।

৬। গ্রাম : তেহট্ট। ১০১।২,৭০৮·০৪।১,২৫০।৬,৭২৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চৌদ্দ-পনেরটি পাড়া আছে। যেমন—ঠাকুরপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, দত্তপাড়া, জেলেপাড়া, মুচিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, পাঠানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, মৎস্যজীবি ও ব্যবসায়ী।

(গ) পূর্বে বেথুয়াডহরী রেলস্টেশন হইতে গরুর গাড়ী যোগে যাতায়াত চলিত। সম্প্রতি গ্রামের পূর্বপ্রান্ত দিয়া "কৃষ্ণনগর—শিকারপুর রোড" নির্মিত হওয়ায় কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে ব্যক্তি-বিশেষের একটি এবং দুই-তিনটি সর্বজনীন দুর্গাপূজা হয়। সর্বজনীন দুর্গাপূজাগুলি সতের-আঠের বৎসরের এবং ব্যক্তি-বিশেষের পূজাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী-পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুন মাসে ব্যক্তি-বিশেষের শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া, গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণরায় জীউর রথযাত্রা, নন্দোৎসব এবং ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণরায় জীউ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া উল্লিখিত উৎসবগুলি বহু কাল যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কৃষ্ণরায় জীউর একটি প্রাচীন মন্দির আছে এবং কালীর একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো বেদী আছে। শোনা যায়, উক্ত বেদীতে জনৈক শক্তি সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবারে ঐ স্থানে দক্ষিণা কালীর পূজা হয়। দেবীর কোন মূর্তি নাই। গাছতলায় বহুকালের পুরাতন একটি খড়্গকে দক্ষিণাকালী জ্ঞানে যথারীতি পূজা করা হয়। গ্রামের নওদা পাড়ায় একটি বড় পীরের দরগাহ্ আছে। দরগাহটি বহু প্রাচীন এবং সাধারণে এই স্থানে সিন্নি মানসিক করিয়া থাকেন। গ্রামে একটি বারোয়ারী পূজার মণ্ডপ আছে।

গ্রামটি জলঙ্গী নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত।

(এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, কৃষ্ণরায় জীউকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ১লা মাঘ "উত্তরায়ণ মেলা" নামে এই গ্রামে একটি মেলা বসিত। বহুকালের প্রাচীন এই মেলাটি গত চার-পাঁচ বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই বিষয়ে বিশদ বিবরণী মেলা বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।)

শ্রীশ্যামপদ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক,
তেহট্ট উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ তেহট্ট, নদীয়া।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ তেহট্ট

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব
(হরিদাস বাবাজী)

চান্দের ঘাট গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে হরিদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব ভক্তের স্মৃতি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মঠে হরিদাস বাবাজীর সমাধিক্ষেত্র আছে। জনসাধারণের অর্থানুকুল্যে ও মঠাধ্যক্ষ গোবিন্দদাস বৈরাগীর তত্বাবধানে এই উৎসব পরিচালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রায় তিন-চার শত বৈষ্ণব ও বহু ভক্তবৃন্দের সমাগম হয়। উৎসবে নামকীর্তন, ধর্ম্মালোচনা হইয়া থাকে এবং অন্নসত্রেরও আয়োজন করা হয়। ইহা প্রায় শত বৎসরের প্রাচীন।

কিংবদন্তী আছে প্রায় একশত বৎসর পূর্বে হরিদাস বাবাজী এই গ্রামের কোন গৃহস্থ বাড়ীতে সামান্য রাখালের কাজ করিবার সময় ঐশী শক্তির প্রভাবে অন্যের অগোচরে মাঠের মধ্যে ক্ষুদ্র জলাশয় সৃষ্টি করিয়া গো-পালের পিপাসা নিবৃত্তি করাইতেন। তাঁহার এই কার্য লোক চক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইলে তিনি অন্তর্হিত হন এবং গৃহস্থকে (যে বাড়ী গরু চরাইতেন) স্বপ্নাদেশ করেন— "আমি চলিয়া গেলাম, মাঠ হইতে আমার মরদেহ লইয়া সমাধি মন্দির নির্মাণ করিবে ; এবং যখন জলের আবশ্যক হইবে সেই সময় বৈষ্ণবাদি নিমন্ত্রণ করিয়া আমার সমাধি স্থলে হরিনাম যজ্ঞ করিবে ; তাহা হইলেই আবশ্যক মত বৃষ্টি হইবে।"

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

চান্দের ঘাট গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির দিন গ্রামের সর্বত্র বোলান গান ও এক বিশেষ ধরণের নৃত্যগীত হইয়া থাকে। সংক্রান্তির পরের দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখ স্থানীয় মরাগাব্নী নামক বিলে মৎস্য শিকার উৎসব হয়। ইহা এই অঞ্চলে "ভগবতী যাত্রা" নামে খ্যাত এবং চড়ক উৎসবের একটি অঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও বলা যাইতে পারে। মৎস্য শিকারে আশেপাশের প্রায় আশী হইতে নব্বইটি গ্রামের লোকজন যোগদান করেন। মৎস্য শিকার প্রত্যক্ষ করিবার জন্য উক্ত বিলের চারিদিকে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। বাস্তবিকই ইহা একটি উপভোগ্য অনুষ্ঠান।

দোলযাত্রা

তেহট্ট গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে কৃষ্ণরায়জীউ নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। বর্তমানে সংস্কার অভাবে মন্দিরটির অবস্থা খুবই জীর্ণ। তবে মন্দির গাত্রে খোদিত সুন্দর কারুকার্যগুলি অদ্যাপি দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দির সংলগ্ন সুবৃহৎ প্রাঙ্গণে একটি জলপূর্ণ ইন্দারা আছে। মন্দিরের দক্ষিণ দেওয়ালে খোদিত একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, বাসদেব মহান্ত নামে জনৈক ভক্ত তাঁহার লক্ষ্মী নাম্নী বালবিধবা কন্যার উপাসনার নিমিত্তে ১৬০০ শকাব্দে উক্ত দেব মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ্মীদেবী পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহটিকে পতিজ্ঞানে পূজার্চ্চনা করিতেন। সুপ্রসিদ্ধ "ভক্তমাল" গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। বর্তমানে এই মন্দির ও বিগ্রহ নদীয়া রাজবংশের অধীন এবং নদীয়া রাজ কর্তৃক প্রদত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতেই বিগ্রহের নিত্য পূজা ও পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই মন্দির ও বিগ্রহ কোন সময়ে নদীয়া রাজবংশের তত্বাবধানে আসে তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমার পরের দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে এই মন্দিরে কৃষ্ণরায় জীউ-র দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের পূর্বদিন অধিবাস এবং পরের দিন যথারীতি দেবদোল ও পূজাদি হয়। উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে অষ্টম প্রহর ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবটি মন্দির প্রতিষ্ঠার পর হইতেই চলিয়া আসিতেছে। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামে লোক উৎসবে যোগদান করেন।

উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত এই মন্দিরে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও ভাদ্র মাসে নন্দোৎসব এবং প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে কৃষ্ণরায় জীউর সাড়ম্বরে বার্ষিক উৎসব পালিত হয়। বর্তমান পূজারী শ্রীকৃষ্ণপদ চক্রবর্তী, কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয়ের "নদীয়া কাহিনী" গ্রন্থে উল্লিখিত কৃষ্ণরায় বিগ্রহ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়—

"....................................পৌষ সংক্রান্তিতে তিন দিবস ব্যাপী মেলা বসিয়া থাকে, ইহা কৃষ্ণরায়ের মেলা নামে খ্যাত। এই কৃষ্ণরায়জী নদীয়া রাজার বিগ্রহ। কৃষ্ণরায়জী বিগ্রহের বাম পার্শ্বে শ্রীমতি রাধিকার মূর্তি নাই। কৃষ্ণরায়জী একক। কথিত আছে কোন সময়ে ঠাকুরাণীর গাত্র হইতে যবন জাতীয় চোর কর্তৃক অলঙ্কার অপহৃত হইলে পূজারী তাঁহাকে মন্দিরের সন্নিহিত দীর্ঘিকায় বিসর্জন দেন। তদাবধি ঠাকুরের অদৃষ্টে আর দেবী মিলে নাই। এই মেলায় প্রায় সহস্র লোক সমাগম হইয়া থাকে। এই মেলার পর দিবস এতদঞ্চলের যাবতীয় গৃহস্থ তাহাদের গৃহজাত উৎকৃষ্ট সর্ববিধ ফল কৃষ্ণরায়জীকে উপহার দেয়। সেই সকল উৎকৃষ্ট ফলরাশি দেখিয়া ইহাকে কৃষি প্রদর্শনী বলিয়া মনে হয়।"

জেলা : নদীয়া
থানা : তেহট্ট

মেলা বিবরণী

উত্তরায়ণের মেলা

কৃষ্ণরায় জীউর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তেহট্ট গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ হইতে এক মাস ব্যাপী স্থানীয় বাজারের উত্তর দিকে জলঙ্গী নদীর তীরে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় বার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসিত মেলাটি এতদঞ্চলের উত্তরায়ণ মেলা নামে খ্যাত। গত চার-পাঁচ বৎসর হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

মেলায় নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং সন্নিহিত অন্যান্য জেলা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের দৈনিক গড়ে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হইত। যাত্রীরা প্রধানতঃ ট্রেনে, মোটরবাসে, গরুরগাড়ীতে ও নৌকায় করিয়া মেলায় আসিতেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কলিকাতা, বহরমপুর, শান্তিপুর, রাণাঘাট, তেহট্ট, করিমপুর, চাপড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসিতেন। প্রায় আশি পঁচাশিটি দোকানপাট বসিত। তন্মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, ঔষধ-পত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড় এবং কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি প্রভৃতির দোকান বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হইত। অনেকে জুয়া ও লটারী খেলিত।

দুর্গাপূজার মেলা

ইলশামারী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে বিজয়া দশমীর দিন প্রতিমা বিসর্জন উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমিতে দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় দশ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা, চ্যাঙ্গারীর দোকান, মাটির খেলনা ও হাঁড়িকুড়ির দোকান এবং টোটকা ঔষধপত্র ও সস্তার বই ছবির দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয় এবং কোন কোন বৎসর জলসার আয়োজন করা হয়।

পৌষপার্বণের মেলা

বাওর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষপার্বণ উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে নারী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যাই বেশী। যাত্রীরা প্রধানতঃ পলাশীপাড়া, পাঁচদাঁড়, বিজয়নগর, সাটীখাল, পলগুস্তা, বারুইপাড়া, প্রভৃতি গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন।

মেলায় কুড়ি-পচিশটি বড় দোকান ব্যতীত ছোট দোকান ও ফেরিওয়ালা লইয়া মোট পঞ্চাশ হইতে ষাটটি দোকানপাট বসে। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, কাঁচের বাসন ও পুতুলের দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারীর দোকান, মাটির খেলনার দোকান এবং কয়েকটি বই-ছবির দোকান বসে। ধামা, কুলা ইত্যাদির দোকান গোপীনাথপুর হইতে ও পলাশী পাড়া হইতে তাঁতের কাপড়, মশারী, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদির দোকানগুলি আসে। ইহা ভিন্ন এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী পাঁচদাড় গ্রামের কতিপয় ব্যবসায়ী প্রতি বৎসর মেলায় শাকসব্জী ও ময়রার দোকান দেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য বাউল সঙ্গীত ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। অধিকারী শ্রীজামুরুদ্দিন আমেদ।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ করিমপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ ধোড়াদহ। ২।১৪৫'৯১।৫৪৫।৩,০১৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, মালী, কুমার, কামার, স্বর্ণকার, গোয়ালা, বৈশ্য, সাহা, নাপিত, কুরী, ধোপা, দাত্রী, তিওর, যুগী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সাহাপাড়া, গোয়ালাপাড়া, তিওরপাড়া, মুসলমানপাডা প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বহরমপুর কোর্ট হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামটি জলঙ্গী নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত বলিয়া নৌকাপথেও গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা,আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে নবান্ন, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে চড়ক ও ভৈরবপূজা এব' রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রামনবমী ব্যতীত অন্যান্য উৎসবগুলি গ্রামে সর্বজনীন এবং প্রাচীন। রামনবমী উৎসবটি ব্যক্তি বিশেষের এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। এগারদিনব্যাপী উৎসবে রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও মহাবীর মূর্তির যথারীতি পূজা করা হয়।

(ঙ) রামনবমীর মেলা। চৈত্র মাসে এগার দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির এবং একটি রাম-সীতার মন্দির আছে। মন্দির দুইটি ব্যক্তি-বিশেষের।

শ্রীঅশোক বাগচী, প্রধান শিক্ষক,
ধোড়াদহ নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ ধোড়াদহ, নদীয়া।

২। গ্রাম ঃ করিমপুর। ৬।৪০০'১৭।৬১৮।২,৩৯০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বৈশ্য সাহা, কামার, চামার, ছুতার, ধোপা, নমঃশূদ্র ও নাপিত। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় উনপঞ্চাশ মাইল দূরে কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন। কৃষ্ণনগর হইতে করিমপুর হইয়া শিকারপুর পর্যন্ত মোটরবাস সার্ভিস আছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, চৈত্রে বাসন্তীপূজা এবং শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেকটি উৎসবই সর্বজনীন। পুরাণপাড়ায় দুর্গা পূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বাসন্তীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে চারদিন ব্যাপী।

(চ) গ্রামে জলঙ্গী নদীর তীরে একটি প্রাচীন কালী মন্দির, পুরাণপাড়া নামক স্থানে একটি শিব মন্দির, স্থানীয় বাজারে একটি মাতৃমন্দির এবং পালপাড়ায় একটি আনন্দ মঠ আছে।

করিমগাজী নামে জনৈক মুসলমান গাজীর নামানুসারে গ্রামের নাম করিমপুর হইয়াছে বলিয়া শোনা যায়।

শ্রীবিভা দত্ত, চাকুরী,
গ্রামঃ শিকারপুর, নদীয়া।

৩। গ্রাম ঃ নতিডাঙ্গা (মৌজা ঃ শোভারাজপুর)। ১২।৭৯৮'৮১।১৮১।৯৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, গোয়ালা, কামার, চামার, স্বর্ণকার ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বেলডাঙ্গা। করিমপুর-নতিডাঙ্গা ও নাজিরপুর-নতিডাঙ্গা—এই দুইটি জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে একটি কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে কালীপূজার জন্য একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে এবং বেদীমূলে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত

আছে। বেদীটি রানীভবানী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং নদীয়া জেলার মহেশগঞ্জের জমিদারগণের ব্যয়ে বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইত। বাংলা ১৩৬২ সন হইতে উক্ত জমিদারী হইতে বার্ষিক পূজার ব্যয় বন্ধ করায় বর্তমানে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট হইতে আদায়-কৃত চাঁদার অর্থে পূজাক্রিয়া সম্পন্ন হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেবীর নিকট মানসিক করেন এবং পজা ও বলি দেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি কালী বেদী আছে।

শ্রীতারাপদ সান্যাল, প্রধান শিক্ষক,
নতিডাঙ্গা বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ নতিডাঙ্গা, নদীয়া।

৪। গ্রাম : ফাজিলনগর।

১৯১২,৩৮৬৯১।৭০৩ ৩,৯৬৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা। গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দক্ষিণে কৃষ্ণনগর-শিকারপুর এবং প্রায় দুই মাইল পশ্চিমে বেলডাঙ্গা-আমতলা মোটরবাস যাতায়াত করে। গ্রামের নিকট দিয়া জলঙ্গী নদী প্রবাহিত থাকায় বর্ষাকালে নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখে জলাঙ্গী নদীর তীরে গঙ্গাপূজা, জ্যৈষ্ঠে জামাই ষষ্ঠী বা গাছপূজা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, পৌষে নবান্ন এবং চৈত্রে শিবপূজা। ইহাভিন্ন, সারা বৈশাখ মাসব্যাপী নামকীর্তন হয়। জামাই ষষ্ঠী উপলক্ষে একটি অশ্বত্থ, একটি বেল ও একটি বকুল গাছ পূজা করা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসা আছে এবং একটি কাঁচা দুর্গা মণ্ডপ ও একটি পাকা কালীমন্দির আছে।

শ্রীসেফাতুল্লাহ বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ ফাজিলনগর,
নদীয়া।

৫। গ্রাম : থানাপাড়া।

৩৭।২,৮১৬ ৪৬।৪৮৮।২,৫৮৮

(ক) মাহিষ্য, গোয়ালা, কুমার, মুচি, ধোপা বেনিয়া, রাজপুত ও মুসলমান।
গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় বাইশ মাইল দূরে মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা এবং পঞ্চান্ন মাইল দূরে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন। কৃষ্ণনগর হইয়া নাজিরপুর-থানারপাড়া ও করিমপুর হইয়া নতিডাঙ্গা-থানারপাড়া এই দুইটি রাস্তা গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ। গ্রাম হইতে প্রায় আট মাইল দূরে কৃষ্ণনগর-শিকারপুর রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) পৌষ সংক্রান্তিতে জঙ্গলী পীরের উরস্ উৎসব।

(ঙ) জঙ্গলী পীরের মেলা। পৌষ মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জঙ্গলী পীরের দরগাহ আছে। নবাবী আমলে এখানে একটি চৌকী বা থানা ছিল। তদানুযায়ী এই গ্রামের নাম হয় থানাপাড়া।

শ্রীদেবদর্শন চৌধুরী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ নতিডাঙ্গা,
শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ অমিয় নারায়ণপুর,
ও
চরণ দাস, গ্রাম সেবক,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
পোঃ নতিডাঙ্গা, নদীয়া।

৬। গ্রাম : মুরুটিয়া। ৪৯।১,৭৬০'১৫।৩৩৩।১,৫৮২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সুবর্ণবণিক, গোয়ালা, নাপিত, কুমার, ধাত্রী, ডোম, মুচি, ছুতার, পাটনী, নমঃশূদ্র, বাউরী, খৃষ্টান ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, পোদ্দার পাড়া, মুচিপাড়া, কুমারপাড়া, গোয়ালাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, শঙ্খ ও মৎস্য ব্যবসায় ও কুটির শিল্প।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর। গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে মোটরবাস চলাচল করে। জেলাবোর্ডের ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে। যাতায়াত চলে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং পনর দিনব্যাপী চলে। তিন কামরা বিশিষ্ট বারান্দাসহ একটি মন্দিরে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসব উপলক্ষে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে বহু লোক সমাগম হয়। পূর্বে স্থানীয় জমিদার নিত্য-সেবার ব্যয় বহন করিতেন; বর্তমানে সাধারণের অর্থ সাহায্যে নিত্যপূজাদি সম্পন্ন হয়। বর্তমান পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী বন্দোপাধ্যায়।

আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে পনর দিন ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির আছে। এই স্থানে কালীপূজা ও শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীবটকৃষ্ণ পাল, শিক্ষক,
গ্রাম: মুরুটিয়া, পো: বালিয়াডাঙ্গা,
ও
শ্রীগোবিন্দ চরণ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
বাঁশবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম: নাটনা, পো: বাগচী যমশেরপুর,
নদীয়া।

৭। গ্রাম : শিকারপুর (মৌজা : বারুইপাড়া)। ১১৯।২,১৩৬'৩৬।৯৩৬।৫,০৮৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কুমার, কামার, ধোপা, নাপিত, মালী, ভূঁইমালী, জেলে, চামার, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

গ্রামে প্রায় আট-দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর হইতে শিকারপুর পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রে সাড়ম্বরে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহাছাড়া, অদ্বৈতবংশসম্ভূত সাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরে শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উৎসব হয়। উৎসবগুলি প্রাচীন।

(ঙ) বাসন্তী পূজার মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি গত পনর-ষোল বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) কেহ কেহ বলেন, পূর্বে এই স্থানে ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় শিকারীর দল হিংস্র জন্তু শিকার করিতে আসিতেন। পরে ঐ জঙ্গল কাটিয়া গ্রাম পত্তন হইলে গ্রামের নাম হয় শিকারপুর।

শ্রীগজেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, শিক্ষক,
ও
শ্রীকালী পদ বিশ্বাস, শিক্ষক,
শিকারপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
শিকারপুর, নদীয়া।

৮। গ্রাম : কুলখালি। ১২৩।০৮৮'১২।১৪৪।৭৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ভূঁইমালী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে। যথা— হালদারপাড়া, ভূঁইমালীপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও পান চাষ।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পঞ্চান্ন মাইল দূরে কৃষ্ণনগর রেলস্টেশন। শিকারপুর হইতে গ্রামের মধ্য দিয়া কৃষ্ণনগর পর্যন্ত পাকা রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিনে লক্ষ্মীপূজা মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে গঙ্গাপূজা এবং ইতুপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাপূজাটি প্রাচীন এবং সপ্তাহকালব্যাপী চলে। তাহাছাড়া, চান্দ্রমাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহকাল-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) কেহ কেহ বলেন যে,পূর্বে এই গ্রামটি মুসলমান প্রধান ছিল এবং তাঁহারা ফুলখেলায় (হাডুডু খেলা) পারদর্শী ছিলেন বলিয়া এই গ্রামের নাম ফুলখালি হয়। আবার কেহ কেহ অন্য মত পোষণ করেন।

শ্রীঅন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়, গ্রাম সেবিকা,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
শিকারপুর, নদীয়া।

৯। গ্রাম : সুন্দলপুর। ১২৯।১,৬৯৬·০৭।৩৮৫।২,০৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কৃষ্ণনগর। হইতে গ্রাম মধ্যস্থিত কৃষ্ণনগর-গোপালপুর ঘাট জাতীয় সড়ক দিয়া মোটরবাসে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও ফাল্গুন মাসে স্থানীয় জমিদার সরকার মহাশয়দের প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবন বিহারী বিগ্রহের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবন বিহারী বিগ্রহের সহিত গৌর-নিতাই ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মৈত্র বংশের প্রতিষ্ঠিত একটি জোড়া শিবমন্দির এবং রায়বাবুদের প্রতিষ্ঠিত একটি বুড়ি-মায়ের মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটি শিবমন্দির আছে। বুড়িমায়ের মন্দিরে কোন মূর্তি নাই।

শ্রীঅন্নপূর্ণা মুখোপাধ্যায়, গ্রাম সেবিকা,
ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস,
শিকারপুর, নদীয়া।

জেলা : নদীয়া
থানা : করিমপুর

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব
(জঙ্গলী পীর)

থানাপাড়া গ্রামে জঙ্গলী পীর নামক জনৈক পীরের একটি দরগাহ আছে। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে ঐ দরগাহে জঙ্গলী পীরের উরস্ উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং পীরের জনৈক খাদেম উৎসব পরিচালনা করিয়া থাকেন। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু নর-নারী পীরের দরগাহে মানত পূজাদি দিতে আসেন। প্রধানতঃ বাতের ব্যাধি হইতে নিরাময়ের জন্যই পীরের নিকট সিন্নি, খিচুড়ী, মোরগ ও মাটির ঘোড়া মানত করা হয়। ইহাভিন্ন, বহু ফকির উৎসবে যোগদান করেন। প্রতি বৎসর সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়।

যতদূর জানা যায়, প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্বে জনৈক মুসলমান ফকির থানাপাড়া গ্রামের এক প্রান্তে জঙ্গলের মধ্যে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে বসিয়া সাধন-ভজন করিতেন। অলৌকিক শক্তির বলে তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিতে পারিতেন। এই কারণে ক্রমেই তাঁহার নিকট বহু ব্যক্তির সমাগম হইত থাকে এবং কালক্রমে তিনি পীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। এই পীরের প্রকৃত নাম ও পরিচয় কেহই জানেন না। তবে তিনি জঙ্গলের মধ্যে বাস করিতেন বলিয়া সাধারণের নিকট তিনি জঙ্গলী পীর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বর্তমানে প্রাচীন অশ্বত্থ গাছটির কোন চিহ্নই দেখিতে পাওয়া যায় না।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ করিমপুর

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধানের মেলা
(জঙ্গলী পীর)

থানাপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন হইতে জঙ্গলী পীরের উৎসব উপলক্ষে পীরের দরগাহের আশেপাশের ব্যক্তি-বিশেষের পনর-ষোল বিঘা জমিতে সাতদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

করিমপুর, ধোড়াদহ, শিকারপুর, নন্দনপুর, রহমতপুর, নারায়ণপুর, হরেকৃষ্ণপুর, হোগলাবাড়ীয়া, মুরুটিয়া, দিঘলকান্দী, যমশেরপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় মোট প্রায় তিন শত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ নদীয়া জেলার বিভিন্ন থানা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর থানা হইতেও কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। পূর্বে কলিকাতা হইতে মনিহারী দ্রব্য লইয়া বহু বিক্রেতা আসিতেন; কিন্তু বর্তমানে আর তেমন দেখা যায় না। প্রতি বৎসর মেলার "ডাক-বিলির" প্রচলন থাকায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, তাঁতের কাপড় ও গামছার দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুড়ির দোকান, ঔষধ পত্র এবং বই-ছবির দোকানপাট বসে। এই মেলায় ভুট্টার খই সর্বাপেক্ষা বেশী বেচা-কেনা হয়। এত অধিক পরিমাণে ভুট্টার খই বিক্রয় হইতে সচরাচর অন্যত্র বড় একটা দেখা যায় না। খই বিক্রেতাগণ প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ মাইল দূরবর্তী অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস, জুয়া, লটারী এবং আলকাপ গান ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা করা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

সুন্দলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবন বিহারীজীউর দোল উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি তিনদিন ব্যাপী চলে এবং প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন। মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দুইশত যাত্রীর সমাগম হয় এবং মাত্র পনর-কুড়িটি মিষ্টান্ন, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের দোকান বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য থিয়েটারের ও যাত্রাভিনয় হয়।

বাসন্তীপূজার মেলা

করিমপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে তিন-চারদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহাতে খাবার ও মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যের মাত্র কয়েকটি দোকানপাট বসে। গ্রামের একটি যাত্রাদল মেলায় যাত্রাভিনয় করে।

শিকারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বাসন্তীপূজা উপলক্ষে প্রায় সাত-আট বিঘা জমির উপর সপ্তাহকাল ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত পনর-ষোল বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় চৌদ্দ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের এবং মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রাভিনয়, কবিগান, ভাসানগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

বারুণী স্নানের মেলা

ফুলখালি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী স্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে হরিদাস মহান্ত মহাশয়ের প্রায় ছয় বিঘা পরিমাণ জমিতে সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

আরবপুর, যমশেরপুর, শিকারপুর, কেচুয়াডাঙ্গা, করিমপুর প্রভৃতি স্থান হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে, বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা প্রভৃতি মেলায় আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য কবিগান, গুনাই যাত্রা, ভাসান, আলকাপ গান, থিয়েটার এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থান হইতে গানের দল আনা হয়। মেলায় জুয়া খেলা হয়।

মুরুটিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন স্থানীয় গ্রামবাসীর প্রায় বার বিঘা জমির উপর পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়-দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং দীঘলকান্দী, যমশেরপুর, শিকারপুর, করিমপুর, ধোড়াদহ, নারায়ণপুর, রহমৎপুর, নন্দনপুর, নতিডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক হইতে দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নদীয়া জেলার বিভিন্ন থানা এবং মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে আসেন, তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, বই-ছবি প্রভৃতির আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মেলার জাঁকজমক কমিয়া গিয়াছে।

রামনবমীর মেলা

ধোড়াদহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর জমিতে এগারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়।

ধোড়াদহ, করিমপুর, দোগাছি, নতিডাঙ্গা, শিকারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মেলায় সকল সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, কাটাকাপড়, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদির দোকান এবং ধামা-কুলা ও মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকানপাট বসে। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, যাত্রাভিনয় ও জলসার ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে। কোন কোন বৎসর অভয়পুর হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে।

জেলা : নদীয়া
থানা : রানাঘাট

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : তাহেরপুর।

৪।১,৪৬৭১।১ ৩৯।৬৩৪

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি ইং ১৯৫২ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কালীপূজা উপলক্ষে গান-বাজনার আয়োজন করা হয়।

ইহাভিন্ন, গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের দুর্গাপূজা, কালীপূজা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা এবং বৎসরের যে-কোন সময় শীতলাপূজা হয়।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে। মেলাটি মাত্র গত দশ-বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) শীতলা ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান এবং কতিপয় গৃহস্থের বাড়ীতে দুই-একটি স্থায়ী মন্দির আছে। দুর্গাপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গত ইং ১৯৫১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাইত্রিশ শত উদ্বাস্তু পরিবারকে পূর্ণ বসতি দিয়া প্রথম এই উপনগরী স্থাপন করেন। বর্তমানে এই উপনগরীটি মোট ছয়টি ব্লকে বিভক্ত।

শ্রীহরিপদ চৌধুরী, প্রধান শিক্ষক,
ভরাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পো: তাহেরপুর, নদীয়া।

২। গ্রাম : উলাবীরনগর (মৌজা : বীরনগর)।

১৯।২,২০০৩।১৯২।৯৫৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, তাঁতী, কামার, ধোপা ও মুসলমান। গ্রামে মোট আটটি পাড়া আছে। যথা—মুস্তাফীপাড়া, পালিতপাড়া, খাঁ-পাড়া, দুলেপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। যাতায়াতের প্রধান পথ বহরমপুর রোড। চূর্ণী নদী পথে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাইচণ্ডীর যাত উৎসব পালিত হয়। ইহাভিন্ন, এই সময় গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মহিষমর্দিনীপূজা ও উত্তরপাড়ায় বিন্দুবাসিনীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত দুইটি পূজা উপলক্ষে চারদিনব্যাপী নাচগান, কীর্তন, তর্জা ও যাত্রাভিনয় হয়।

(ঙ) উলাইচণ্ডীর যাত উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী মেলা। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামের পূর্ব প্রান্তে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে উলাইচণ্ডী দেবীর নির্দিষ্ট স্থান আছে। গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দতলা আছে।

শ্রীনির্মল দত্ত, সভাপতি
নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন্,
কৃষ্ণনগর।

ও

শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায়,
ভাইস্ চেয়ারম্যান নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট্ বোর্ড,
কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

উলাবীরনগর গ্রাম সম্পর্কে ১৯৫১ সালে নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ড বুকে নিম্নলিখিত বিবরণ পাওয়া যায় :

Birnagar—The ancient name of this small town was Ulā. It is in the Rānāghāt Subdivision about five miles from Rānāghāt and 13 from krishnagar, and is situated in 23°15′N. and 88°34′E. The town was constituted a Municipality in 1869, with 12 Commissioners, 8 of whom are elected and the remainder nominated. The Subdivisional

Officer of Rānāghāt was *ex-officio* Chairman until 1901, but since that year there has been a non-official Chairman The public buildings are (1) the Municipal Office, (2) the Municipal Charitable Dispensary and (3) the Municipal Market.

One of the earliest traditions connected with this town is that it was once visited by Srimanta Saudāgar, the mythical Hindu merchant-prince. At that time the Ganges flowed past the place, and as Srimanta was sailing up to it, a terrific storm came on. In response to divine inspiration he called upon Ulai Chāndi, one of the wives of Siva, the destroyer, to help him. She answered his prayer and protected his fleet; whereupon he instituted a special worship of her in this place, which has been carried on to the present day. The Ulai Chāndi festival is celebrated here annually in the month of Baisākh, and is attended by many pilgrims, who, it is said, are housed and fed by the residents.

According to tradition the present name of Birnagar (*anglice*, town of heroes) was conferred upon the town in recognition of the bravery of its inhabitants in capturing noted dacoits on two occasions. The first capture was that of a notorious bandit, who was known as Shena Shani, a native of Sāntipur, and a Goālā by caste: it is said to have been effected by Anādi Nāth Mustafi, of the Mustafi family of Ula. The second capture was that of the gang of dacoits who were headed by Baidya Nāth and Biswa Nāth, and ravaged the district during the latter part of the eighteenth century. Sri Mahādeb Mukhapādhyāy is said to have effected this capture, though this is somewhat at variance with the account of destruction of the gang which has been given by Sri William Hunter.......

Birnagar was once a large and prosperous town, but the epidemic of malarious fever in 1857 caused great ravages in the place, and it has been steadily declining ever since.

The following account of the place is taken from an article by Revd. J. Long which appeared in the *Calcutta Review* in 1846. "Not far from Ranaghat is Ula, so called from Uli, a goddess whose festival is held here, when many presents are made to her by thousands of people who come from various parts. There are a thousand families of Brahmans, many temples and rich men living in it. As Guptapara is noted for its monkeys, Halishar for Its drunkards, so is Ula for fools, as one man is said to become a fool every year at the *mela*. The Baruari Puja is celebrated with great pomp; the headman of the town have passed a bye-law that any man who, on this occasion refuses to entertain guests, shall be considered infamous, and, shall be excluded from society. Saran Siddhanta of Ula had two daughters, who studied Sanskrit grammar and became very learned. In 1834 the Babus of Ula raised a large subscription and gave it to the authorities to make pukka road through the town"

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. xliii—xliv)

"**বীরনগর**—কলিকাতা হইতে ৫১ মাইল দূর। চূর্ণীনদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত ইহা একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার পুরাতন নাম উলা। প্রবাদ উলুবনের জঙ্গল কাটিয়া গ্রামটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম হইয়াছিল উলা। কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানী অর্থে ইরাণীয় শব্দ আউল হইতে উলা হইয়াছে। অপর মতে আরব্য শব্দ "উলা" অর্থাৎ সর্বপ্রধান হইতে উলা নামের উৎপত্তি; পুরাকালে এই সমৃদ্ধ গ্রামটির প্রাধান্য নাম হইতে সূচিত হয়। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

এতদঞ্চলে ডাকাতের অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। উলার অধিবাসিগণ কয়েকবার ডাকাতের দল ধরিয়া প্রভূত সাহসের পরিচয় দেন বলিয়া তদানীন্তন কলিকাতা কোর্ট্ অফ্ সার্কিটের জজ্ সাহেবের প্রস্তাবে সরকার কর্তৃক গ্রামটিকে বীরনগর আখ্যা প্রদত্ত হয়।

অতীত সমৃদ্ধির চিহ্ন স্বরূপ বড় বড় বাড়ী, দীঘি, প্রাচীন গড়ের খাত ও ভগ্নাবশেষ প্রভৃতি আজিও এখানে দৃষ্ট হয়। বীরনগরের পুরাতন খ্যাতি ও বনিয়াদী কুলমর্যাদা এ অঞ্চলে প্রচলিত গ্রাম্য ছড়াতে স্থান পাইয়াছে, যথা—

উলার মেয়ে কুলকুন্টি,* নদের মেয়ের খোপা,
শান্তিপুরে নথ নাড়া দেয়, গুপ্তি পাড়ার চোপা।

*কুলকুন্টি—কুলগর্ব্বিতা

(নদীয়া-কাহিনী, কুমুদ নাথ মল্লিক)

উলায় পূর্বে কয়েকটি টোল বা চতুষ্পাটী ছিল। এখানকার প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের মধ্যে চতুর্ভুজ ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণরাম ন্যায়পঞ্চানন, সদাশিব তর্কালঙ্কার, শিবশিব তর্করত্ন, ভবানীচরণ ন্যায়ভূষণ, মুকুন্দমোহন ন্যায়রত্ন ও কবি দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অত্রত্য সারণ সিদ্ধান্তের দুইটি কন্যা সংস্কৃতে গভীর জ্ঞানের জন্য সেকালে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে পাণ্ডিত্য ও কৌলীন্য গৌরবের জন্য উলা প্রসিদ্ধ ছিল।

এখানকার দ্রষ্টব্যের মধ্যে বটবৃক্ষতলে প্রাচীন উলাইচণ্ডী দেবী, দ্বাদশ মন্দির, মুস্তৌফিদের জোড় বাংলা, ভক্তিবিনোদ কেদার নাথ দত্ত মহাশয়ের জন্মভিটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। উলাই চণ্ডীর পুরাতন পূজাপদ্ধতি যথা, হাড়ীজাতীয় ব্যক্তি দ্বারা চণ্ডীর প্রথম পূজা এবং শূকর বলিদান প্রভৃতির প্রবাদ হইতে অনেকে মনে করেন এই মূর্তি বৌদ্ধ যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় উলাই চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে তিন দিন ব্যাপী মেলা হয় এবং এই সময়ে বিন্ধ্যবাসিনী ও মহিষ-মর্দ্দিনী মূর্তির বারোয়ারী পূজা হয়। রোগ শান্তি ও মনস্কামনা পূর্ণ হইবে এই বিশ্বাসে উলাই চণ্ডীর বট বৃক্ষের শিকড়ে লোকে ইঁট বাঁধিয়া পূজা দিয়া থাকে।

এক সময়ে ভাগীরথী বীরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্তমান বীরনগর গ্রামের পূর্ব ও দক্ষিণ ভাগ দিয়া ডাকাতের খাল ও বারমেসে খাল বলিয়া যে অতি প্রাচীন এক গভীর জলাভূমি দেখা যায় অনেকে অনুমান করেন যে উহাই ভাগীরথীর প্রাচীন খাল। কবিকঙ্কণের চণ্ডী গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে শ্রীমন্ত সদাগর যখন সিংহলে যাইতেছিলেন তখন উলার নীচে গঙ্গার দহে ভীষণ ঝড় উঠায় তিনি জাহাজ নোঙ্গর করিয়া বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে উলাই চণ্ডী দেবীর পূজা করিয়া নৌবহর সমেত রক্ষা পাইয়াছিলেন।"

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ব বঙ্গের রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ইং ১৯৪০ সালে প্রকাশিত পৃঃ ২৪৭-২৪৮।)

৩। গ্রাম : মুগ্‌রাইল। ২৯।২১২'৭২।৪৮।২৬৪

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাদকুল্লা। গ্রামের উত্তর দিক দিয়া অঞ্জনা নদী প্রবাহিত। কেবল মাত্র বর্ষাকালে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে দুই-তিন দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি হরিসভা আছে, প্রতি বুধবারে হরিসভায় ধর্মালোচনা হয়। ইহাভিন্ন, একটি দুর্গা মণ্ডপ আছে।

শ্রীহরবিন্দু মৈত্র,
গ্রামঃ মুগরাইল,
পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া।

৪। গ্রাম : বাহিরগাছি। ৩৯।১,৩৯৩·৮৪।৪৭৩।২৭৬৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, মাহিষ্য ও মুচি। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আড়ংঘাটা।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে নীলপূজা। উৎসবগুলি সম্প্রতি কালের এবং সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে।

(চ) ×

শ্রীভজহরি কুণ্ডু, প্রধান শিক্ষক,
বাহিরগাছি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ হাট বাহিরগাছি, নদীয়া।

৫। গ্রাম : আড়ংঘাটা
(মৌজা : আড়ংঘাটা নারায়ণপুর)।
৪৯।২,৭৪৬·১৬।৭,৭৬৯।১,৪০০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আড়ংঘাটা। গ্রামটি চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত বলিয়া নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) যুগলকিশোরের উৎসব—প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা তারিখ হইতে সারামাস ব্যাপী উৎসব। উৎসবটি প্রায় দুই শত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) যুগলকিশোরের উৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর সারা জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুই শত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি যুগলকিশোরের এবং একটি গোপীনাথ জীউর সুপ্রাচীন মন্দির আছে।

শ্রীনির্মল দত্ত,
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

নদীয়া জেলার ডিষ্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুকে আড়ংঘাটা গ্রাম সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :

Aranghata—Village situated in the Rānāghāt thāna about 6 miles north of Rānāghāt. It lies on the main line of the Eastern Railway and has a station called after its name. The river Churni passes by the village and on its bank is the Hindu temple of Jugal Kishor, which is believed to have been constructed about 1728 A. D., and which contains the images of Krishna and Rādhā. According to tradition the former was brought from Brindāban and first installed at Samudraghar (near Nabadwip), whence it was transferred to Aranghātā by Gangā Rām Dās, the first *mahanth* of the temple. The image of Rādhā is said to have been brought from the palace of Krishna Chandra, the famous Mahārājā of Nadiā, who made a grand of 125 bighas of rent-free land for the support of the temple. A big fair is held here annually throughout the month of Jaista, and is attended by pilgrims from all parts of Bengal, among the visitors females predominate, owing to the belief that any woman who visits the temple will escape widowhood, or, if she be already a widow, will be spared from that fate in her next birth. To the south of this temple there is another, and a more ancient one, containing the idol of Gopi Nāth, but this possesses no special fame or sanctity.

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. xiii)

আড়ংঘাটা—কলিকাতা হইতে ৫৬ মাইল দূরে চূর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত। রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতা "দেবতার গ্রাসে" চূর্ণী নদী অমর হইয়া আছে।

.........এখানে চূর্ণী নদীর তীরে যুগলকিশোর বিগ্রহের একটি মন্দির আছে। কথিত আছে,

গঙ্গারাম দাস নামক জনৈক বৈষ্ণব বৃন্দাবন হইতে একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ আনিয়া প্রথমে নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগড়ে স্থাপন করেন। বর্গীর উপদ্রবের সময় গঙ্গারাম বিগ্রহটিকে লইয়া আড়ংঘাটায় চলিয়া আসেন। এখানে তাঁহার স্বদেশবাসী জনৈক বণিক তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করেন। যুগলকিশোরের মন্দিরটি আনুমানিক ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। প্রথমে শুধু শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহেরই পূজা হইত। কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি রাধিকামূর্তি শ্রীকৃষ্ণের বামপার্শ্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া উভয় বিগ্রহের "যুগলকিশোর" নাম প্রদান করেন। যুগলকিশোরের সেবা নির্বাহের জন্য তিনি বহু নিষ্কর ভূমিও দান করেন। কথিত আছে, একবার যুগল কিশোরের ধানের গোলা আগুনে পুড়িয়া গেলে রানাঘাটের পালচৌধুরী বংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণপান্তি অতি সামান্য মূল্যে ঐ গোলা ক্রয় করেন। কৃষ্ণপান্তির সৌভাগ্যবশতঃ গোলার ধান উপরের দিকেই সামান্যমাত্র পুড়িয়াছিল, কিন্তু নীচেকার ধান বেশ ভালই ছিল। ঐ ধান বিক্রয় করিয়া কৃষ্ণপান্তি বিপুল অর্থলাভ করেন এবং উহা হইতেই তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্যের সূত্রপাত হয়। প্রতি বৎসর সমস্ত জ্যৈষ্ঠ মাস ধরিয়া আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের মেলা হয়। মেলায় যাত্রিগণের মধ্যে মহিলার সংখ্যাই অধিক। মহিলাদের মধ্যে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোরকে দর্শন করিলে ইহ বা পরজন্মে বৈধব্য ভোগ করিতে হয় না। যুগলকিশোরের মন্দিরের দক্ষিণে অপর একটি মন্দিরে গোপীনাথ জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রবাদ, আড়ংঘাটায় যুগলকিশোরের স্থাপনার পূর্ব হইতেই এই বিগ্রহ এখানে বর্তমান।"

("বাংলায় ভ্রমণ", ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ১০২-১০৩)

৬। গ্রাম : পাঁচবাড়িয়া। ৬১।৫৮৯৭৯।২৯৫।১,৪৫৮

(ক) কায়স্থ, বারুই, কলু, দুলে, মুচি, সর্দার ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আড়ংঘাটা। রাণাঘাট হইতে আড়ংঘাটা পর্যন্ত জেলাবোর্ডের রাস্তায় রাজপুর গেট হইতে গ্রামে যাইবার রাস্তা আছে।

(ঘ) এই গ্রামের ঘোষপাড়ায় ও উদ্বাস্তপাড়ায় যথাক্রমে আশ্বিনে দুর্গাপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, এবং চৈত্র মাসে রক্ষাকালীপূজা ও নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঘোষপাড়ার উৎসবগুলি প্রাচীন, উদ্বাস্ত উপনগরীর উৎসবগুলি ছয়-সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন গ্রামে গৌরাঙ্গ দেবের উৎসব ও বৎসরে দুইবার শীতলাপূজা এবং মনসাপূজা হয়। কেবল মাত্র মনসাপূজা গ্রামের বারুইজীবি সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব, অন্যান্যগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি দুর্গামণ্ডপ ও কালীমন্দির আছে।

শ্রীযামিনী কুমার ভট্ট, প্রধান শিক্ষক,
পাঁচবাড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নদীয়া।

৭। গ্রাম : শ্রীরামপুর। ৮২।৫০৩২৫।১২৫।৭২২

(ক) কায়স্থ, বাগ্দী, সর্দার ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, বাগ্দীপাড়া, সর্দারপাড়া ও মুসলমান পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আড়ংঘাটা হইতে গ্রামে যাতায়াতের রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র-সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা। পূজাগুলি সর্বজনীন। গ্রামের বাগ্দী পাড়ায় বৎসরে একবার সাড়ম্বরে মনসা পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) গ্রামে একটি মনসামন্দির আছে।

শ্রীনলিনী রঞ্জন বসু, প্রধান শিক্ষক,
শ্রীরামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দত্তপুলিয়া, নদীয়া।

৮। গ্রাম : কালুপুর। ৮৩।১,১৪১৮৪।৯৯।৬১০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আড়ংঘাটা। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরে দত্তপুলিয়া পর্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ইদলফেতর, ইদুজ্জোহা, সবেবরাত এবং মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) সম্প্রতি গ্রামের মধ্যস্থলে মুসলমানগণ একটি নূতন মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়াছেন।

শ্রীঅনিল কৃষ্ণ বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
কালুপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ দত্তপুলিয়া, নদীয়া।

৯। গ্রাম : আইসমালী।
৯৪।১,৫৭২৪৫।৩১৩।১,৬৬১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, কামার, কলু, মুচি, সর্দার ও মুসলমান। গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, ঘোষপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, কামার পাড়া, কলুপাড়া, মুচিপাড়া, সর্দারপাডা ও মুসলমান পাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গাংনাপুর। গ্রামের মধ্য দিয়া জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তায় মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা ও রাসোৎসব। কালীপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। শ্রীকৃষ্ণের রাসোৎসবটি ছয়-সাত বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। রাসোৎসব উপলক্ষে অষ্টসখী সহ রাধাকৃষ্ণ, ব্রহ্মা, নারায়ণ ইত্যাদি দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তি পূজা হয়। গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়ীতে দেব বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং চার-পাঁচ দিন ধরিয়া চলে। আশেপাশের ছয়-সাতটি ইউনিয়নের লোকজন উৎসবে যোগদান করেন। মাঘ মাসে সরস্বতীপূজাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন। ইহাভিন্ন, ফাল্গুন মাসে দোল যাত্রা উৎসব ও মনসাপূজা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে চার-পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইতেছে।

(চ) গ্রামে কারুকার্য মণ্ডিত একটি জীর্ণ শিবমন্দির আছে।

শ্রীব্রজেন্দ্র মোহন দাস, প্রধান শিক্ষক,
আইসমালী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রামঃ একলী পোঃ আইসমালী, নদীয়া।

১০। গ্রাম : ঘোলা। ১০৬।৪৩৩৪২।৯২।৪২৮

(ক) কায়স্থ, মোদক, বর্ণক্ষত্রিয়, মালী, নমঃশূদ্র। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গাংনাপুর। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে মহোৎসব উপলক্ষে অষ্টম প্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন উৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও কার্তিকে কালীপূজা। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং মাত্র গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে। মেলাটি গত পাঁচ-ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীরথীন্দ্র নাথ বসু, শিক্ষক,
গ্রামঃ ঘোলা, পোঃ গাংনাপুর, নদীয়া।

১১। গ্রাম : হবিবপুর। ১১৬।৩৪৪৩২।৬৩৫।৩,৪৬৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে বারটি পাড়া

আছে। যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, ঘোষপাড়া, নাথপাড়া, তাঁতীপাড়া, দুলেপাড়া, জেলেপাড়া, মালোপাড়া, সাহাপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। গ্রামে যাইবার প্রধান পথ বহরমপুর রোড।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা, ফাল্গুন মাসে মদনগোপাল দেবের দোল উৎসব ও শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। জগদ্ধাত্রী পূজাটি মাত্র সাত-আট বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাভিন্ন, এই গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে এ্যালা উৎসব (মীর মহম্মদ নামে জনৈক পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে) এবং আত্মারাম বাবাজী নামে জনৈক বৈষ্ণব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর আখড়ায় ফাল্গুন মাসে পঞ্চমদোল ও নবম দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং প্রতি বৎসর ২৩শে জানুয়ারী নেতাজী জন্মোৎসব পালন করা হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে।

এ্যালার উৎসবের মেলা। মাঘ মাসে।

পঞ্চমদোলের মেলা। ফাল্গুন মাসে।

শীতলাপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে।

নেতাজী জন্মোৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে।

(চ) গ্রামে একটি বৈষ্ণব আখড়া, একটি মস্‌জিদ এবং শীতলা, দুর্গা, কালী ও জগদ্ধাত্রীর পূজার জন্য সাধারণের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শুনা যায় যে, গ্রাম পত্তন হইবার পূর্বে এই স্থানটি গঙ্গানদীর মধ্যবর্তী একটি চরাভূমি ছিল। এক শ্রেণীর গোপেরা প্রথমে এই চরটিকে বাত্তান ভূমি রূপে ব্যবহার করিত এবং এই বাত্তান ভূমিতে প্রায় আড়াই হইতে তিন হাজার গরু পালন করিত। গরুর দুধ হইতে দৈ, ঘি, ছানা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া বিক্রয়ের জন্য নদীপথে বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করা হইত। হিন্দিতে ঘি শব্দের অর্থ হব্বি। হব্বি হইতে এই স্থানের নাম হয় হব্বিগঞ্জ এবং পরে হব্বিগঞ্জ হইতে গ্রামের নাম হবিবপুর হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্র নাথ শী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ হবিবপুর, নদীয়া।

১২। গ্রামঃ গাজিপুর।

১১৮।১,৩৬৮·০৩।২৩৬।১,৭৭৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে মোট ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হবিবপুর হইতে শান্তিপুরগামী মোটরবাসে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের দুই মাইল দূরে প্রবাহিত গঙ্গা দিয়া নৌকা যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, এবং মাঘে সরস্বতীপূজা ও প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে ৩০শে মাঘ পর্যন্ত সারা মাস ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন বা হরিবাসর মহোৎসব হইয়া থাকে।

ইহাছাড়া, গ্রামের মনসাতলায় বাগ্দী সম্প্রদায় প্রতি বৎসর মনসাপূজা করিয়া থাকেন। মনসা-পূজাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মনসাতলা ও একটি গাজীর স্থান আছে। গাজীর স্থানে প্রত্যহ ধূপ-দীপ দেওয়া হয়। বর্তমান খাদেম শ্রীকরিম সেখ্।

প্রায় আড়াইশত-তিনশত বৎসর পূর্বে জনৈক গাজী সাহেব কর্তৃক এই গ্রামের পত্তন হয় বলিয়া গ্রামের নাম গাজিপুর হইয়াছে।

শ্রীকালিদাস সরকার, প্রধান শিক্ষক,
গাজিপুর প্রাথমিক বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
গ্রামঃ গাজিপুর, পোঃ হবিবপুর, নদীয়া।

১৩। গ্রাম : মাজদিয়া।

১২৫।১,২৬৩·৪৬।২০২।১,১৬২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যথা—দাসপাড়া, মুসলমানপাড়া, নিকিরী-পাড়া, পাঠানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রানাঘাট হইতে হবিবপুর হইয়া মোটরবাস, রিক্সা অথবা চূর্ণী নদী পথে নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গোরা শহীদ পীর সাহেবের উরস্ মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) গোরা শহীদ পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে একদিন। দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোরা শহীদ পীর সাহেবের একটি আস্তানা আছে।

শ্রীবিভূপদ ভট্টাচার্য, প্রধান শিক্ষক,
মাজদিয়া প্রাথমিক নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
গ্রাম : মাজদিয়া, পোঃ আবুলিয়া, নদীয়া।

১৪। গ্রাম : কামারগড়িয়া।

১৮২।৭৫০·২৩।২৪৭।১,১৯৯

(ক) মাহিষ্য, নমঃশূদ্র ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গাংনাপুর হইতে এক মাইল পথ মোটরবাসে আসিয়া বাকী দেড় মাইল পথ গরুর গাড়ী অথবা হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের ১৩ই তারিখে পীরের উরস্।

(ঙ) পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পাকা মসজিদ আছে, প্রতি শুক্রবার স্থানীয় মুসলমানেরা মসজিদে নামাজ পড়েন। মসজিদের তত্ত্বাবধানকারী দুইজন মুসলমান মৌলভী আছেন।

শ্রীকিশোরী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
কামারগড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : হুমনিয়া পোতা, নদীয়া।

জেলা : নদীয়া
থানা : রানাঘাট

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(গোরা শহীদ পীর)

মাজদিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে গোরা শহীদ পীর সাহেবের উরস্ মোবারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি বটগাছের নীচে পীরের স্থান আছে। এই স্থানে রক্ষিত মাটির ঘোড়াই পীরের প্রতীক। গোরা শহীদ পীরের জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তিনি ইস্লাম ধর্মের প্রচারক ছিলেন বলিয়া শুনা যায়। গোরা শহীদ পীরকে কেহ কেহ ঘোড়া-ষষ্ঠী বা ষষ্ঠী সাহেব পীর বলেন। শুনা যায়, প্রতি বৃহস্পতিবার পীর সাহেব ঘোড়সওয়ার হইয়া এই স্থানে তাঁহার খাদেমগণের নিকট আবির্ভূত হইতেন। সেই হেতু তিনি ঘোড়া শহীদ পীর নামেও খ্যাত।

উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই উৎসবে যোগদান করেন এবং পীরের নিকট মানত ও সিন্নি দিয়া থাকেন। উৎসবের দিন সকালে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া পীরের নির্দিষ্ট স্থানে উৎসব শুরু হয়। সাধারণতঃ পীরের স্থানে ফুল-সিন্নি, মাটি বা সোনা-রূপার ঘোড়া মানসিক করা হয়। সোনা-রূপার ঘোড়াগুলি খাদেমের নিকট জমা থাকে। পীর সম্বন্ধে সাধারণের বিশ্বাস যে, তাঁহার নিকট মানসিক করিলে খোঁড়া, অন্ধ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পান এবং বহু রোগের নিরাময় হয়। উৎসবটি মাজদিয়া গ্রামাঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব। উৎসব উপলক্ষে হিন্দু সাধু ও মুসলমান ফকিরের আগমন হয়। পীরের বর্তমান খাদেম জনাব সোরমান খাঁ, জাতিতে পাঠান।

(পীর সাহেব)

কামারগড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ১৩ই শ্রাবণ জনৈক পীরের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে শোনা যায় যে, প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে এই গ্রামের জনৈক বৃদ্ধ মুসলমান ১৩ই শ্রাবণ তারিখে স্বপ্নে কোন একজন পীরের দর্শন পান। উক্ত পীর তাঁহাকে একটি নির্দিষ্ট স্থান দেখাইয়া বলেন যে, ঐ স্থানের ধূলামাটি গায়ে মাখিলে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হইবে। সেই অবধি ঐ স্থানের ধূলামাটি গ্রহণের জন্য বহু লোক এই গ্রামে আসিয়া থাকেন। শোনা যায়, অনেকেই ইহাতে সুফল পাইয়াছে। এই কারণে প্রতি বৎসর ১৩ই শ্রাবণ উক্ত পীরের স্মরণে উৎসব পালন করা হয়। উৎসবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী যোগদান করেন। পীরের জনৈক মুসলমান খাদেম ও কিছু পীরোত্তর জমি আছে।

(মীর মহম্মদ ফকির)

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে হবিবপুরে "এ্যালা" নামে একটি উৎসব হয়। আসলে ইহা জনৈক ফকিরের তিরোভাব উৎসব। তবে এই উৎসবের সহিত 'এ্যালা" নামটি কিরূপে যুক্ত হইল তাহা বলা কঠিন। গ্রামে লোকমুখ হইতে জানা যায় যে, মীর মহম্মদ নামে জনৈক মুসলমান ফকির এই গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি নিজেকে পয়গম্বর বলিয়া প্রচার করিতেন ও অলৌকিক শক্তির প্রভাবে তিনি বহু দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময় করিতে পারিতেন। হিন্দু মুসলমান জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু নরনারী তাঁহার নিকট উপকৃত হইতেন। উক্ত পীর দেহত্যাগ করিলে পর গ্রামবাসীর সহযোগিতায় তাঁহার বংশধরগণ পীরের সমাধির উপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। ফকির সাহেব মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। উৎসবে এই অঞ্চলের সকল শ্রেণীর লোকই যোগদান করেন। ফকিরের স্থানে মানসিক করিলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। উৎসবের দিন মুরগী. পাঁঠা, মাটির ঘোড়া অথবা চিনি-সন্দেশ দিয়া ফকিরের নামে পূজা দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

উলাই চণ্ডীর যাত

উলাবীরনগর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি হইতে তিন-চারদিনব্যাপী সাড়ম্বরে উলাই চণ্ডীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের পূর্ব প্রান্তে একটি অতি প্রাচীন বটগাছের নীচে ইট দিয়া বাঁধান বেদীর উপর রক্ষিত সিঁদুর রঞ্জিত একটি পাথরখণ্ডকে চণ্ডীর ধ্যানে পূজা করা হয়। পাথরখণ্ডটিই উলাইচণ্ডী দেবীর প্রতীক।

এই গ্রামে উলাই চণ্ডী দেবীর প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচলন সম্পর্কে দুইটি প্রবাদ আছে। কাহারও কাহারও মতে কবিকঙ্কন চণ্ডী খ্যাত শ্রীমন্ত সদাগর গঙ্গাপথে সিংহল যাত্রাকালে প্রবল ঝড়ের সম্মুখীন হন এবং এই স্থানে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে চণ্ডী পূজা করিয়া সে যাত্রায় রক্ষা পান। আবার কেহ কেহ বলেন শ্রীমন্ত সদাগর গঙ্গাপথে সিংহল যাত্রাকালে তাঁহার নৌকায় একটী ভাসমান পাথর খণ্ড আসিয়া লাগে এবং তিনি চণ্ডী কর্তৃক ঐ পাথর খণ্ডকে পূজা করিতে আদিষ্ট হন। যাহাই হউক, উৎসবটী যে বহু কালের প্রাচীন সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বৈশাখী পূর্ণিমায় মহাসমারোহে দেবীর সর্বজনীন পূজা ও উৎসব হয়। পূর্বে প্রাচীন রীতি অনুসারে উৎসবের দিন অতি প্রত্যুষে প্রথমে হাড়ী সম্প্রদায়ের পূজা হইত। তাহার পর যথাক্রমে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ীর পূজা, এই গ্রামের মুস্তৌফি পরিবারের পূজা এবং তাহার পর সর্বসাধারণের পূজা অনুষ্ঠিত হইত। অবশ্য বর্তমানে এইরূপ কোন ধরাবাঁধা রীতি পালন করা হয় না। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, উলাই চণ্ডীর পূজা উপলক্ষে বৈশাখী পূর্ণিমাতে এই গ্রামের দক্ষিণপাড়ায় মহিষমর্দিনী এবং উত্তরপাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা হইয়া থাকে। ইহা এই উৎসবের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। উৎসব উপলক্ষে তিন-চারদিনব্যাপী নাচ-গান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলা হইতে যাত্রীরা আসিতেন এবং সারা বাংলাদেশ হইতে পূজার জন্য চাঁদা আদায় করা হইত। এই সম্পর্কে একটি প্রবাদ আছে যে, একবার বাংলার গভর্নর লর্ড হেষ্টিংস্-এর প্রতাপশালী দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ কার্যোপলক্ষে এই অঞ্চল দিয়া যাইবার কালে শান্তিপুরের ঘাটে কয়েক দিনের জন্য বজরায় অবস্থান করেন। খবর পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে চাঁদা আদায়ের উদ্দেশ্যে পূজার উদ্যোক্তাদের মধ্যে কয়েকজন ব্রাহ্মণ এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে একগাছি করিয়া দড়ি লইয়া শান্তিপুরের ঘাটে আসিয়া হাজির হন এবং "বেটা সিংহ কোথা"—বলিয়া চীৎকার করিতে থাকেন। ব্রাহ্মণদের চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ বজরার বাহিরে আসিলে পর একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলেন—"বেটা সিংহ, দেবী মহামায়ার সিংহের পায়ে ব্যাথা হয়েছে। কাল রাত্রে দেবী আমাদের আদেশ দিয়েছেন তাঁর সিংহের স্থলে আপনাকে নিয়ে যেতে। মায়ের ইচ্ছা এবার তিনি আপনার কাঁধে চেপেই আসেন। তাই আমরা আপনাকে বেঁধে নিয়ে যাবার জন্য দড়ি-লাঠি নিয়ে হাজির হয়েছি।" দেওয়ান মহাশয় ব্রাহ্মণদের রসিকতা বুঝিতে পারিয়া সানন্দে সেই বৎসরের পূজার যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করেন।

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে উলা নিবাসী কবি দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী" গ্রন্থে উলাই চণ্ডীর মেলা সম্বন্ধে একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। আমরা নীচে তাহার লিপিবদ্ধ করিলাম।

"অম্বিকা পশ্চিম পারে   শান্তিপুর পূর্ব ধারে,
রাখিয়া দক্ষিণে গুপ্তিপাড়া।
উল্লাসে উলায় গতি   বট মূলে ভগবতী,
যেথায় পাতকী নহে ছাড়া॥
বৈশাখেতে যাত্রা হয়,   লক্ষ লোক লক্ষ্য হয়,
পূর্ণিমা তিথিতে পুণ্যচয়।
নৃত্য গীত নানা নাট   দ্বিজ করে চণ্ডী পাঠ,
মানে যে মানসা সিদ্ধি হয়॥"

২৭শে বৈশাখ, ১২২৬ সন (ইং ৮মে, ১৮১৯) উলা গ্রামে উলাই চণ্ডীর বার্ষিক পূজা সম্বন্ধে তৎকালীন একটি সংবাদ পত্রে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

"পূজা।—২৮শে বৈশাখ ৯ মে রবিবারে বৈশাখী পূর্ণিমাতে মোং উলাগ্রামে উলাইচণ্ডীতলানামে একস্থানে বার্ষিক চণ্ডীপূজা হইবেক। এবং ঐ দিনে ঐ গ্রামের তিন পাড়ায় বারয়ারি তিন পূজা হইবেক। দক্ষিণ পাড়ায় মহিষমর্দ্দিনী পূজা ও মধ্য পাড়ায় বিন্ধ্যবাসিনী পূজা ও উত্তর পাড়ায় গণেশজননী পূজা। ইহাতে ঐ তিন পাড়ার লোকেরা পরস্পর জিগীষাপ্রযুক্ত আপন আপন পাড়ার পূজার ঘটা করিতে সাধ্যপর্যন্ত কেহই কসুর করে না তৎপ্রযুক্ত সমারোহ অতিশয় হয়। নিকটস্থ ও দূরস্থ অনেক লোক তামাসা দেখিতে আইসে এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক দোকানি পসারি আসিয়া ক্রয় বিক্রয় করে ও অনেক অনেক ভাগ্যবান লোকেদের সমাগম হয় এবং গান ও বাদ্য ও আর আর প্রকার তামাসা অনেক হয়। তিন চার দিন পর্য্যন্ত সমান লোকযাত্রা থাকে। অনেক অনেক স্থানে বারয়ারি পূজা হইয়া থাকে কিন্তু এইক্ষণে উলার তুল্য কোথাও হয় না।"

(সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ দে সম্পাদিত)

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকায়" উলাই চণ্ডীর উৎসব সম্পর্কে নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয়।

বীরনগর (নদীয়া) ২৫শে মে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন হইতে ১৪ই মে এই চার দিবস ব্যাপী শ্রীমন্ত সদাগর প্রতিষ্ঠিত উলা বীরনগরে নদীয়ার প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺উলাচণ্ডীর পূজা ও মেলা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী বেশ আনন্দপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রতি বৎসরের তুলনায় এইবার মেলায় প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। চণ্ডীতলার মেলা ছাড়া ঐ চণ্ডীপূজাকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসরের ন্যায় দক্ষিণ পাড়ায় শ্রীশ্রী৺মহিষমর্দিনী মাতা এবং উত্তর পাড়ায় শ্রীশ্রী৺বিন্ধ্য-বাসিনী মাতার পূজা ও মেলা হয়। এই পূজা ও মেলা উপলক্ষে দুই পাড়ায় বারোয়ারী তলার চাঁদনীতে দিবা-রাত্র নানারূপ আমোদ-প্রমোদও অনুষ্ঠিত হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

শ্রীরামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে নিম কাঠের তৈয়ারী একটি শিবের আসন আছে। উৎসব উপলক্ষে চৈত্র মাসের প্রথম হইতেই সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণকারী ভক্তরা ঐ আসনটি মাথায় লইয়া প্রতিদিন গৃহস্থদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া শিব পূজার জন্য অর্থাদি আদায় করেন এবং চৈত্র-সংক্রান্তির দিন আদায়ীকৃত অর্থের দ্বারা ষোড়শোপচারে শিব ও চড়ক গাছের পূজা করিয়া থাকেন। চড়ক গাছটি সারা বৎসর একটি পুকুরের জলে ডুবানো থাকে; সংক্রান্তির দিন তোলা হয়। এই দিন ভক্তসন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে পাক খাইয়া থাকেন।

আইসমালী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত শিবলিঙ্গ-কে কেন্দ্র করিয়াই গাজন ও চড়ক উৎসব পালিত হয়। এই গ্রামের মুখোপাধ্যায় পরিবারের জনৈক ব্যক্তি ১৭৫৯ শকাব্দে ৩১শে বৈশাখ এই মন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। শিবের নিত্য পূজা ও উৎসবাদির জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র শতাধিক বিঘা জমি শিবের নামে উৎসর্গ করিয়া দেন। উক্ত দেবোত্তর সম্পত্তি নানাকারণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; বর্তমানে মাত্র পাঁচ একর জমি দেবোত্তর আছে। উৎসবটি বহু প্রাচীন ও সর্বজনীন। পূর্বের তুলনায় বর্তমানে উৎসবটি আড়ম্বরহীন হইয়া পড়িয়াছে।

দোলযাত্রা

হবিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় মদন-গোপালের দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন, বাংলাদেশে বর্গী হাঙ্গামার পর হইতে উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে বলিয়া শুনা যায়। গ্রামে মদনগোপালের মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে মদনগোপাল নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মদনগোপাল বিগ্রহ ও

মন্দিরটি যশোহরের চাঁদ রায়-কেদার রায়ের বংশধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস। এই সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, বাংলাদেশে বর্গী অত্যাচারের সময় রাজা চাঁদরায়-কেদার রায়ের জনৈক বংশধর জলপথে যশোহর গ্রাম ত্যাগ করেন এবং ছয়দিন ক্রমান্বয়ে নৌকা বাহিয়া হবিগঞ্জ বা হবিবপুরের গঙ্গার চড়া ভূমিতে বসতি স্থাপন মানসে নৌকা নোঙ্গর করেন। তিনি ঐ দিন রাত্রেই স্বপ্ন দেখেন যে, তাঁহাদের যশোহর গ্রামের গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহটী যেন বলিতেছে—"ওরে তোরা আমায় গঙ্গায় ভাসিয়ে কোথায় গেলি। আমি যে আজ সাতদিন অনাহারে রয়েছি।"

পরের দিন প্রভাতে তথা কথিত রায় মহাশয় স্নান করিতে যাইয়া গঙ্গার ঘাটে বর্তমান বিগ্রহটি দেখিতে পান এবং গ্রামে মন্দির নির্মাণ করিয়া বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে মদনগোপালের দোল উৎসবটি রায়দের পারিবারিক উৎসব ছিল কিন্তু বর্তমানে এই গ্রামে উক্ত রায় বংশের কেহ না থাকায় বিগ্রহ ও উৎসবটি সাধারণের হইয়াছে। পূর্ণিমার দিন সকাল হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত মদন-গোপালের যথারীতি পূজা ও উৎসব চলে। এই উপলক্ষে অষ্টম প্রহর ব্যাপী অখণ্ড নাম কীর্তন ও পরের দিন ধূলট উৎসব ও সর্বজনীন অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমান সেবায়েত রায়বংশীয় আত্মীয়গণ।

হবিবপুর গ্রামে মহাপ্রভুর আখড়ায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমার পাঁচদিন পরে পঞ্চমদোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আত্মারাম বাবাজী নামক জনৈক পূর্ববঙ্গীয় বৈষ্ণব ভক্ত এই গ্রামে মহাপ্রভুর আখড়াটি স্থাপন করেন। আখড়ায় প্রতিষ্ঠিত নিতাই-গৌরের মূর্তি ও মন্দিরটি নির্মাণ করেন হবিবপুরের জমিদার দত্তরা। আখড়ায় আর একটি মন্দিরে ব্রজগোপাল নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। এই মন্দির ও বিগ্রহটি প্রতিষ্ঠা করেন শান্তদাস মোহান্ত ও উষা ঘোষ নামে দুইজন ভক্ত। আত্মারাম বাবাজী দেহরক্ষা করিলে তাঁহার অস্থি সমাধির উপর একটি মন্দির নির্মাণ করা হয়।

মহাপ্রভুর আখড়ায় পূর্ণিমার চারদিন পূর্ব হইতে নয়-দিন ব্যাপী সাড়ম্বরে পঞ্চমদোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আখড়ায় এই নয়দিন ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন ও নবরাত্র যজ্ঞ হয়। যজ্ঞস্থানে একটি ধূনি জ্বালা হয়। যজ্ঞে প্রতিদিন প্রচুর ঘি, বিল্বপত্র ইত্যাদি আহুতি দেওয়া হয়। পঞ্চম দোলের দিন রাত্রি প্রভাতের পর হরিনাম সংকীর্তন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে যজ্ঞাহুতিও শেষ হয়। তারপর হরিনাম সংকীর্তনকারীদলগুলি গ্রামের বিভিন্ন পাড়া পরিক্রমায় বাহির হন। পরিক্রমা শেষে আবার সকলে আখড়ায় ফিরিয়া আসিলে ধূলট উৎসব হয়। অবশেষে সর্বজনীন আঞ্চলিক অন্নসত্রের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে গ্রামের সকল শ্রেণীর লোক যোগদান করিয়া থাকেন। জনৈক বৈষ্ণব আখড়ার বর্তমান সেবায়েত।

যুগলকিশোরের উৎসব

আড়ংঘাটা গ্রামে যুগলকিশোর দেবের উৎসবটি একটি প্রাচীন ও প্রধান উৎসব। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের ১লা তারিখ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত এক মাস ব্যাপী যুগলকিশোর দেবের বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যুগল কিশোরের পাকা মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে রাধা-কৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবার ব্যবস্থা আছে। উৎসবটি প্রায় দুইশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

মোহান্তদের দ্বারা পরিচালিত হইলেও ইহা সমগ্র জেলার সর্বজনীন উৎসবরূপে পরিগণিত। উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। প্রবাদ আছে, যুগলকিশোরকে দর্শন করিলে ইহজন্মে বা পরজন্মে স্ত্রীলোকের আর বৈধব্য ভোগ করিতে হয় না। এই কারণে উৎসব উপলক্ষে বহু স্ত্রীলোকের সমাগম হয়। বর্তমান সেবায়েতের পদবী দাস, ইনি মোহান্ত দলভুক্ত।

যুগলকিশোরের এই প্রসিদ্ধ মন্দিরটি ইং ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। শোনা যায় যে, গঙ্গারাম দাস নামে জনৈক অবাঙালী মোহান্ত বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটি কিশোর মূর্তি আনিয়া নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগড়ে স্থাপন করিয়া যথারীতি সেবা ও পূজা অর্চনার প্রচলন করেন। ঐ সময়

নদীয়া জেলায় বর্গীর উপদ্রব আরম্ভ হইলে গঙ্গারাম আত্মরক্ষার জন্য কিশোর মূর্তিটি সঙ্গে লইয়া আড়ংঘাটায় চলিয়া আসেন এবং তাঁহার স্বদেশবাসী রামপ্রসাদ পাড়ে নামক জনৈক বণিকের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের গোপীনাথ নামে একটি বিগ্রহ ছিল। গোপীনাথ জীউর মন্দিরের পাশেই অপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া কিশোর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও নিত্য সেবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথমে কেবলমাত্র উক্ত কিশোর বিগ্রহই পূজা করা হইত। ইহার পর কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভূগর্ভ হইতে একটি শ্রীরাধিকামূর্তি পাইয়া আড়ংঘাটায় উক্ত কিশোর মূর্তির বামপাশে স্থাপন করেন এবং উভয় বিগ্রহের যুগলকিশোর নামকরণ করেন। সেই হইতেই এই বিগ্রহদ্বয় যুগলকিশোর নামে খ্যাত। যুগলকিশোর মন্দিরের দক্ষিণদিকে আজিও গোপীনাথ জীউর সুপ্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র যুগলকিশোরের নিত্যসেবার জন্য একশত পঁচিশ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন।

[যুগলকিশোর দেবের উৎসব ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য-বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল।]

নদীয়া জেলার রানাঘাট থানার অন্তর্গত আড়ংঘাটা একটি প্রাচীন ও বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। রানাঘাট হইতে আড়ংঘাটার দূরত্ব প্রায় ছয় মাইল। পূর্ব রেলপথে শিয়ালদহ বিভাগে এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। স্টেশন হইতে একটি পাকা রাস্তা ধরিয়া পশ্চিম দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে যুগলকিশোর দেবের মন্দিরে পৌঁছান যায়।

যুগলকিশোরের মন্দিরটি একটি পূর্বমুখী সাধারণ দালান ঘর মাত্র। ইহার সম্মুখ ভাগে চণ্ডীমণ্ডপ আকারের থামযুক্ত প্রশস্ত বারান্দার পরে পর পর পাঁচটি প্রকোষ্ঠের মধ্যটিতে কাঠের বেদীর উপর রাধিকাসহ যুগলকিশোর-এর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। রাধিকা ধাতুময়ী, শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহটি প্রস্তর নির্মিত। ইহার বামদিকের দুইটি প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে কালাচাঁদ ও শ্যামচাঁদ বিগ্রহ এবং দক্ষিণ দিকের দুইটি প্রকোষ্ঠে যথাক্রমে রাধাবল্লভ ও গোপীবল্লভ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইঁহাদের মধ্যে কোনমাত্র রাধারমণ বিগ্রহ একক— রাধিকা মূর্তি নাই। এই সকল প্রকোষ্ঠে শালগ্রাম শিলা, বালগোপাল প্রভৃতি বিগ্রহাদি আছে। ইহাভিন্ন মন্দির সংলগ্ন দক্ষিণমুখী ভিন্ন একটি প্রকোষ্ঠে বলরাম ও রেবতীর মৃন্ময় মূর্তি, শালগ্রাম শিলা, ধাতুনির্মিত সাক্ষীগোপাল, চতুর্ভুজ গোপাল, বালগোপাল, গণেশ বিগ্রহাদি এবং যুগলকিশোর মন্দিরের পূর্ববর্তী মোহান্তদিগের ব্যবহৃত কাষ্ঠ পাদুকা রক্ষিত আছে। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি প্রাচীন বকুলবৃক্ষ মূলে বাঁধান বেদীর উপর ষষ্ঠীস্বরূপ কয়েকটি পাথরখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। বকুল বৃক্ষের ডালে সূতায় ইটের টুকরা বাঁধিয়া ভক্তরা ষষ্ঠীর নিকট মানত জানাইয়া যান। মন্দিরের চারিপাশ ঘিরিয়া পর পর কয়েকটি দালানঘর আছে। উহার কয়েকটি কক্ষে মন্দিরের মোহান্ত ও কর্মচারীগণ বাস করেন এবং অপর কয়েকটি কক্ষ ভাণ্ডার ও ভোগ রন্ধনাদি কার্যে ব্যবহৃত হয়।

১৭২৮ খৃষ্টাব্দে যুগলকিশোর দেবের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া জানা যায়। বাংলা ১৩১৭ সনে শ্রীমতি শান্তমণি দাসী নামে জনৈক ভক্তিমতী মহিলা মন্দিরের মেঝে পাথর দ্বারা বাঁধাইয়া দেন। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনা যায় যে, গঙ্গারাম নামে জনৈক মোহান্ত বৃন্দাবন হইতে শ্রীকৃষ্ণের একটি বিগ্রহ আনিয়া নবদ্বীপের নিকটবর্তী সমুদ্রগড়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি পূজার্চনা করিতেন। ইহার কিছুকাল পরে বঙ্গে বর্গীর অত্যাচারে ভীত হইয়া গঙ্গারাম উক্ত বিগ্রহসহ আড়ংঘাটা নিবাসী তাঁহার পরিচিত রামপ্রসাদ পাঁড়ে নামক জনৈক সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং এই স্থানে কিশোর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিত্য পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন। রামপ্রসাদ পাঁড়ে গোপীনাথ বিগ্রহের সেবা করিতেন। যুগলকিশোর মন্দিরে তাঁহার আরাধ্য গোপীনাথ বিগ্রহের অদ্যাপি সেবাপূজা হইতেছে।

আড়ংঘাটার যুগলকিশোর দেব বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া ভক্তগণের বিশ্বাস। যুগলকিশোরের মাহাত্ম্য সম্পর্কে এই অঞ্চলে নানারূপ কিংবদন্তী শোনা যায়।

প্রবাদ আছে, একদা যুগলকিশোর দেব তাঁহার সেবায়েত গঙ্গারামকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন যে, "আমার রাধিকা নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রাসাদে অবস্থান করিতেছে, তুমি শীঘ্রই সেই রাধিকা মূর্তি আনিয়া মন্দিরে আমাদের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠা কর।" এই স্বপ্নাদেশের কথা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট জানাইলে তিনি খুবই বিস্মিত হন এবং জানান যে, তাঁহার প্রাসাদে কোন স্বতন্ত্র রাধিকা বিগ্রহ নাই। কিন্তু এই সময় এক রাত্রিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদেশে একটি রাধিকা মূর্তি পাইয়া উহাকে সাড়ম্বরে আড়ংঘাটার যুগলকিশোর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্য সেবা-পূজার জন্য ১২৫ বিঘা নিষ্কর জমি যুগলকিশোরের নামে দেবোত্তর করিয়া দেন। ইহাভিন্ন, বহু ভক্ত যুগলকিশোরদেবের নামে বহু ধনসম্পত্তি দান করিয়াছেন। ঐ সকল ভূসম্পত্তির আয় হইতে যুগলকিশোর দেব ও উক্ত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য দেববিগ্রহাদির নিত্যপূজা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

প্রতিদিন প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় যুগলকিশোর দেবের যথারীতি ভোগ-পূজা ও আরতি হয় এবং সপ্তাহের প্রতিদিন যুগলকিশোর দেবের বেশভূষা পরিবর্তন করা হয়। যেমন, রবিবার রাজবেশ, সোমবার গোপবেশ, বুধবার নটবরবেশ, বৃহস্পতিবার সুবলবেশ, শনিবার রাখালবেশ ইত্যাদি।

প্রতি বৎসর ১লা জ্যৈষ্ঠ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত সারা মাস ব্যাপী যুগলকিশোরদেবের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। উৎসব উপলক্ষে যুগলকিশোর বিগ্রহ দর্শন ও মন্দিরে পূজা দিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিদিন বহু নরনারীর সমাগম হয়। ইহা ভিন্ন উৎসবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সাধু-সন্ন্যাসী আসেন। প্রবাদ আছে, জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোর দর্শন করিলে ইহজন্মে বা পরজন্মে স্ত্রীলোকের বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। এই বিশ্বাসে জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসবে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সমাগম বেশী হয়। মাস ব্যাপী উৎসব উপলক্ষে যুগলকিশোর দেবের সাড়ম্বরে ভোগ-পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে ভাগবত পাঠ ও কীর্তনাদি গানের আয়োজন করা হয়। ভক্তরা অনেকে নানারূপ মনস্কামনা জানাইয়া যুগলকিশোর দেবের নিকট প্রধানতঃ অর্থ, বস্ত্র, অলঙ্কার ও ফলাদি মানত দিয়া থাকেন। যুগলকিশোর মন্দিরের বর্তমান মোহান্ত শ্রীসনকাদিক দাস এবং পূজারী শ্রীঅনিরুদ্ধ দাস। বাংলা ১৩০৯ সনে বর্তমান মোহান্ত নির্বাচিত হন।

জ্যৈষ্ঠ মাসের উৎসব ব্যতীত বৎসরের বিভিন্ন পর্ব উপলক্ষে যুগলকিশোর দেবের সহিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিগ্রহাদির বিশেষ পূজাপাঠ হইয়া থাকে। এই সকল পর্বের মধ্যে বৈশাখে জানকী নবমী ও নৃসিংহ চতুর্দশী, জ্যৈষ্ঠে দশহরা, আষাঢ়ে রথযাত্রা, শ্রাবণে ঝুলন, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ও রাধাষ্টমী, আশ্বিনে শরৎ পূর্ণিমা উৎসব, কার্তিকে গোবর্ধন অন্নকূট, রাসযাত্রা, পৌষে তিল সংক্রান্তি পর্ব, মাঘে বসন্ত পঞ্চমী উৎসব, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে রামনবমী ও মহাবিষুব সংক্রান্তি ইত্যাদি।

যুগলকিশোর মন্দিরের পশ্চাতে পশ্চিম দিকে চূর্ণী নদী প্রবাহিত। বিভিন্ন যোগ উপলক্ষে ভক্তরা চূর্ণী নদীতে স্নান-তর্পণাদি করিয়া থাকেন। নদীর ঘাটটি পাকা সিড়ি বাঁধানো—কলিকাতার বাগবাজার নিবাসিনী শ্রীমতি কুসুম কুমারী সাধুর্খা নামে জনৈক মহিলা বাংলা ১৩০০ সনে এই ঘাটটি নির্মাণ করিয়া দেন। এই ঘাটের উপর উত্তরমুখী একটি মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। পরমেশ্বর দাস ব্রজবাসী নামে জনৈক সাধু বাংলা ১৩৩২-৩৪ সনে মন্দিরটি নির্মাণ করেন। ইহাভিন্ন এই শিবমন্দিরের নিকট অতিথি-অভ্যাগতদের থাকিবার জন্য একটি বড় আটচালা ঘর আছে।

যুগলকিশোর বিগ্রহ সম্পর্কে শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক তাঁহার "নদীয়া কাহিনী" গ্রন্থে (১ম সংস্করণে)-এ লিখিয়াছেন :

"প্রতি বৎসর সমগ্র জ্যৈষ্ঠ মাস ব্যাপী এখানকার শ্রীবিগ্রহ যুগলকিশোর দেবের এক মেলা বসিয়া থাকে। এই যুগল কিশোরদেব বহুকাল হইতে এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই ঠাকুরের গৃহ প্রাঙ্গণস্থিত ধান্যগোলা হইতে রানাঘাটের সুপ্রসিদ্ধ জমিদার 'কৃষ্ণপান্তীর' প্রথম সৌভাগ্য সূচিত হয়। পূর্বে এই স্থানে বহু নাগা সন্ন্যাসীর বাস ছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এখানকার তদানীন্তন মোহান্ত

কর্তৃক এই বর্তমান মেলাটি স্থাপিত হয়। প্রবাদ আছে জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলরূপ দর্শন করিলে স্ত্রীলোকের আর বৈধব্য সঙ্ঘটিত হয় না। তাই এই একমাস ধরিয়া অন্যূন একলক্ষ স্ত্রীলোক এই স্থানে আসিয়া দেব দর্শন করিয়া থাকেন।"

জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোর উৎসব উপলক্ষে মন্দিরের আশেপাশে দেবোত্তর জমির উপর এক মাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি উৎসবের মতই প্রাচীন। মেলায় নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং চব্বিশ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা, হাওড়া ও হুগলী হইতে পচিশ হইতে ত্রিশ হাজার যাত্রী ও বহু বিক্রেতা প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, লোহার বাসনপত্র ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রীর দোকান, বই-ছবি ও আম-কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের দোকান বসে। স্থানীয় অধিবাসীদের মতে পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মেলায় যাত্রী ও দোকানপাটের সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে।

শীতলাপূজা

হবিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের যে-কোন শনি বা মঙ্গলবার সাড়ম্বরে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, চাঁদ সদাগরের জনৈক বংশধর একদা গঙ্গানদী দিয়া সিংহলে বাণিজ্য যাত্রার প্রাক্কালে হবিবপুর গ্রামের নিকট শীতলাদেবী কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই স্থানে শীতলা-পূজা করিয়াছিলেন। গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করেন, সেই সময় হইতে এই পূজাটি চলিয়া আসিতেছে।

শীতলার কোন মূর্তি নাই। গ্রামে একটি নিম্ গাছের নীচে বাঁধান একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘটে শীতলা দেবীর পূজাদি হইয়া থাকে। পূর্বে শীতলার স্থানে একটি প্রাচীন বটগাছ ছিল, উক্ত গাছটি নষ্ট হইয়া যাওয়ায় তাহার স্থানে নিম্‌গাছটি রোপন করা হইয়াছে।

নির্দিষ্ট দিনে প্রাতঃকাল হইতে যথারীতি পূজা আরম্ভ হয় এবং অপরাহ্ণে পূজা শেষ হইলে এই গ্রামের সকল হিন্দুপরিবারের স্ত্রীলোকেরা পূজার স্থানে বসিয়া একত্রে দৈ-চিড়ার দ্বারা "ফলার" গ্রহণ করেন।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ রানাঘাট

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(গোরা শহীদ পীর)

মাজদিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে গোরা শহীদ সাহেব পীরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে চুর্ণী নদীর তীরে প্রায় আট বিঘা পীরোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় আমুলিয়া, নপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়নসমূহ এবং শান্তিপুর থানার অন্তর্গত গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। সাধারণতঃ ট্রেন, গরুর গাড়ী, নৌকা, রিক্সা, মোটরবাস প্রভৃতি যানবাহনে যাত্রীরা মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনের জন ফেরিওয়ালা আসেন। উক্ত দোকান-পাটের মধ্যে খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া বই-ছবি, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, মাটির হাড়িকুঁড়ি প্রভৃতি দোকান-পাট ও বসে। বাঁশ ও মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রধানতঃ কায়েতপাড়া ও রানাঘাট হইতে আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য লাঠিখেলা এবং এই গ্রামের শ্রীননীগোপাল ঘোষ ও শ্রীঅজিত কুমার ঘোষের দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে জনৈক পীর সাহেবের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে কামাবাড়িয়া গ্রামের উত্তর প্রান্তে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ বৃক্ষ তলায় পীরের স্থান সংলগ্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলার জমিটির কিয়দংশ পীরোত্তর এবং কিয়দংশ গ্রামবাসীর। মেলাটি সাধারণতঃ সকালে বসে এবং রাত্রি আট-নয় ঘটিকা পর্যন্ত স্থায়ী হয়। ইহা প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা প্রধানতঃ গরুর গাড়ীতে ও হাটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ রানাঘাট, গাংনাপুর, মাঝের গ্রাম, হুমনিয়া পোতা, দুবলী ও দেবগ্রাম প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জাগগায় বসে। প্রায় কুড়ি-পচিশ জন ফেরিওয়ালাও আসেন। এই মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী কাপড়চোপড়ের ও শিল্পসামগ্রীজাত জিনিসপত্রের বেশী আমদানী হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

তাহেরপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন নেতাজী পার্ক সংলগ্ন প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি গত ইং ১৯৫২ সাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহাতে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশহাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় অধিক লোক আসিয়া থাকেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় অঞ্চল হইতে আসেন। মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। উল্লিখিত দোকানগুলির মধ্যে খাবার, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড় ও শিল্পসামগ্রী প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

বাহিরগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা

উপলক্ষে বিজয়া দশমী তিথিতে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে।

মেলায় নিকটবর্তী কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আড়ংঘাটা, বগুলা, রানাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় বহু দোকানপাট বসে এবং প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। উল্লিখিত দোকানের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাসনকোসন, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহাছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, লটারী, ম্যাজিক এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রা ও থিয়েটারের দল আছে।

ঘোলা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজামণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর গত পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত একটি মেলা বসিতেছে।

মেলায় আশেপাশের গ্রাম এবং রানাঘাট, গাংনাপুর, শ্রীধরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় চার-পাঁচশত নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। মেলার যাত্রী সাধারণতঃ গরুর ও ঘোড়ার গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

গাংনাপুর, শ্রীধরপুর, রানাঘাট, প্রভৃতি স্থান হইতে মিষ্টান্ন, পুতুল, খেলনা, ধামা-কুলা এবং মনিহারী দ্রব্যাদি লইয়া প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গ্রামের যুবকেরা থিয়েটার করিয়া থাকেন।

মুগরাইল গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দুইদিন ব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। অবশ্য মেলাটি প্রাচীন।

মেলায় মোট প্রায় দুইশত নর-নারী এবং মাত্র দশ-পনরটি দোকানপাট ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। যাত্রী এবং ব্যবসায়ী উভয়ই স্থানীয়। দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার, আতস বাজী, বেলুন ও চা-পান-বিড়ির দোকান দেখিতে পাওয়া যায়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য গান-বাজনা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্রামের শ্রীফকির চাঁদ বিশ্বাসের দল যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন।

দোলযাত্রার মেলা

হবিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মদন-গোপালের দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে মেলায় যাত্রীরা আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল প্রভৃতি দোকানই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা হইয়া থাকে।

যুগলকিশোরের মেলা

আড়ংঘাটায় প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে যুগলকিশোর দেবের বার্ষিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় দশ-বারো বিঘা জমির উপর এক মাস ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং চব্বিশ-পরগণা জেলা ও কলিকাতা হইতে ট্রেনে, গরুর গাড়ীতে, নৌকায় এবং হাঁটিয়া প্রতি বৎসর বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন।

মেলায় দুই শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। উল্লিখিত দোকানের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান এবং শিল্পসামগ্রীর দোকান বসিয়া থাকে। ইহাভিন্ন, অন্যান্য জিনিসপত্রেরও কয়েকটি দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সার্কাস, সিনেমা ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

জেলা : নদীয়া
থানা : চাকদহ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম: গঙ্গাপ্রসাদপুর (মৌজা: বলাগরি চর)। ২।১,৭৬৩·১৭।৩৫৩।২,১৭৪

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ হইতে মোটর-বাসযোগে গ্রামে পৌছান যায়। তাহাছাড়া, গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত গঙ্গানদী পথে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) চৈত্র মাসে বুড়াশিবের গাজন উৎসব। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতি বৎসর ২৫শে চৈত্র আরম্ভ হইয়া চৈত্র সংক্রান্তিতে শেষ হয়। উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ মাথা মুণ্ডন করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বুড়াশিবের একটি প্রস্তর মূর্তি আছে।

গঙ্গার চরাভূমি হইতে গ্রামটির সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামের নাম হইয়াছে গঙ্গাপ্রসাদপুর।

শ্রীমতিলাল ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম: গঙ্গাপ্রসাদপুর,
পো: চাকদহ, নদীয়া।

২। গ্রাম: কামালপুর। ১৫।২৩১·৩৯।১৮১।১,০১৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, গোয়ালা, বারুজীবি, কামার, কুমার, ছুতার, দুলে, নাপিত, বুনা ও নমঃশূদ্র।

গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণ-পাড়া, কায়স্থপাড়া, কুমারপাড়া, দুলেপাড়া, বুনা-পাড়া, বারুইপাড়া, গোয়ালাপাড়া, নাপিতপাড়া ও নমঃশূদ্রপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, কুটিরশিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ। গ্রামের সন্নিহিত চাকদহ-বনগ্রাম রোডে মোটর-বাস চলাচল করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে একাধিক সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাজন ব্যতীত অন্যান্য উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে কয়েকটি শিবমন্দির আছে; তন্মধ্যে দুইটি জোড়া শিবমন্দির। স্থানীয় পাঠশালার পশ্চিমে অবস্থিত জোড়ামন্দিরটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হয়। উক্ত মন্দিরদ্বয় ক্ষুদ্রাকৃতি ইষ্টক দ্বারা নির্মিত এবং মন্দিরের সম্মুখভাগের দেওয়াল গাত্রে পোড়ামাটির সুন্দর কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরের দেওয়াল গাত্রের একস্থানে একটি অস্পষ্ট লিপি উৎকীর্ণ আছে। সম্ভবতঃ উহাতে প্রতিষ্ঠাতার নাম ও সময়কালের উল্লেখ ছিল। কিন্তু তাহা এতই অস্পষ্ট যে, পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। মন্দিরটি বর্তমানে এক বিরাট বটবৃক্ষের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং মন্দিরের বিগ্রহ ভগ্ন।

রেল লাইনের পশ্চিম পার্শ্বে উপরোক্ত জোড়া মন্দিরের অনুরূপ বৃহত্তর আকারের আর একটি শিবমন্দির দেখা যায়। এই মন্দিরটি জনৈক ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং স্থানীয় গ্রামবাসীগণ অনুমান করেন যে, উহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

ইহাছাড়া, গ্রামে আরও কয়েকটি শিবমন্দির এবং একটি শীতলা, একটি ষষ্ঠী ও কয়েকটি মনসার স্থান আছে।

পুরাতন কাগজপত্র হইতে জানা যায় যে, গ্রামের পূর্ব নাম ছিল জীতারপুর। পূর্বকালে এই গ্রামে কেবলমাত্র শূদ্রজাতীয় কৃষকেরা বাস করিতেন। পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলাস্থিত অজয় নদীর তীরস্থ কয়েকঘর ব্রাহ্মণ এই গ্রামে আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎকালে ভাগীরথী

নদী চাকদহ শহরের পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইত এবং উহার দুইটি শাখা "গোমতী" ও "গাঙ্গীনী" (গাবড়া) এই গ্রামের যথাক্রমে পশ্চিম-দক্ষিণ ও উত্তর-পূর্ব দিক দিয়া পূর্বাভিমুখে প্রবাহিত ছিল এবং তৎকালে এই নদীপথে নৌ-চলাচল করিত বলিয়া শোনা যায়। বর্তমানে উক্ত নদী দুইটি মজিয়া গিয়া স্থানে স্থানে বিল ও কৃষিক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে।

বর্ধমান জেলা হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (গাঙ্গুলী) নবাবী শাসন আমলে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া একজন উচ্চ পদস্থ রাজকর্মচারী হন। তাঁহারই নামানুসারে জীতারপুর গ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া কামালপুর করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রাহ্মণ প্রধান এই গ্রামটির মুসলমানী নামকরণের জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকেরা ইহাকে "ভট্টাচার্য কামালপুর" নামে অভিহিত করিতেন। আবার কাহারও কাহারও মতে, কাসিন্দী সর্দার নামে জনৈক কার্তরীর নাম অনুসারে গ্রামের নাম এইরূপ হইয়াছে।

শ্রীবীরেশ্বর ভৌমিক, গ্রামসেবক,
অতলা ইউনিয়ন, চাকদহ,
ও
শ্রীহরিপদ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
কামালপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নদীয়া।

শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক মহাশয়ের "নদীয়া কাহিনী"-তে কামালপুর গ্রাম সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :

"ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের চাকদহ ষ্টেশন হইতে তিন ক্রোশ পূর্ব্বমুখে যাইলে কামালপুর নামে একখানি গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রাম প্রাচীন নদীয়ার মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। বহু ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত এখানে বাস করিতেন; সেজন্য অনেকে এখনও ইহাকে ভট্টাচার্য্য কামালপুরও বলিয়া থাকেন। সুপ্রসিদ্ধ বনমালী বিদ্যাসাগর মহাশয় এই স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ক্ষুদ্র গ্রামখানি পশ্চাতে রাখিয়া আরও কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে স্বচ্ছসলিল খলসিয়ার বিল দৃষ্টিপথে পতিত হয়; এই বিলের নিকট সরাবপুর নামক একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান আছে। এই গ্রামের মধ্যস্থিত ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরের অভ্যন্তরে যে মৃত্তিকা প্রথিত হস্ত পরিমিত লিঙ্গমূর্তি দৃষ্ট হয়, উহাই সাধারণতঃ পোড়া মহেশ্বর নামে খ্যাত। ভগ্নাবশেষ মন্দিরের ভিত্তি ও উহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা স্তূপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উহা যে পূর্ব্বে ইষ্টক নির্মিত বহু গৃহ প্রাঙ্গণ ও চত্বর বেষ্টিত সমৃদ্ধশালী দেবালয় ছিল, তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হয়। সেই স্তূপ সকল এক্ষণে জঙ্গলাকীর্ণ ও শ্বাপদসঙ্কুল হইয়া পড়িয়াছে। কথিত আছে, ঐ স্থানের অবস্থা হীন হইয়া পড়িলে একদা এক লোভী সন্ন্যাসী ঐ পাষাণময় লিঙ্গমূর্তির মস্তকদেশে একখানি স্পর্শমণি লুক্কায়িত আছে জানিতে পারিয়া ঐ শিবমন্দিরে আসিয়া বাস করিতে থাকে। একদিন ঐ কপটচারী ভাবিল যদি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া ঐ লিঙ্গমূর্তি উত্তপ্ত করা যায়, তবে ঐ মণি মস্তক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে; কিন্তু পাছে দগ্ধ করিলে গ্রামবাসীগণকে মন্দির রক্ষার্থে আহ্বান করেন সেই আশঙ্কায় এক চাতুরী অবলম্বন করিল। সে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ মন্দিরে সঞ্চয় করিল এবং উপর্য্যুপরি কয়েক রাত্রি ভীষণ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া স্বয়ং ঐ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে উপবেশন পূর্ব্বক "কে কোথায় আছ, গ্রামবাসী! দেখ পামর সন্ন্যাসী আমায় দগ্ধ করিতেছে" ইত্যাদি আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। গ্রামবাসীগণ প্রথম প্রথম কয়েক রাত্রি ঐ ভয়ঙ্কর চিৎকারে আকৃষ্ট হইয়া মন্দিরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু প্রত্যহ সন্ন্যাসীকে এইরূপ চিৎকার করিতে শুনিয়া শেষে তাহাকে উন্মাদ-গ্রস্থ স্থির করিয়া আর কেহ সে বিষয়ে মনোযোগ করিত না। একদিন ঐ সন্ন্যাসী লিঙ্গমূর্ত্তির চতুর্দ্দিকে স্তূপাকার কাষ্ঠ সজ্জিত করিয়া অগ্নি প্রদান করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে যখন অগ্নি ভীষণাকার ধারণ করিল তখন লিঙ্গমূর্ত্তি হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু গ্রামবাসীগণ উহা উন্মাদগ্রস্থ সন্ন্যাসীরই কার্য বিবেচনায় সে কথা কেহ শুনিয়াও শুনিল না, সন্ন্যাসীর এই পৈশাচিক কার্যে বাধা দিতে কেহই অগ্রসর হইল না। দেখিতে দেখিতে সেই উজ্জ্বল মণি পাষাণ মূর্ত্তি হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দূরে নিপাতিত হইল। এতদিনে সন্ন্যাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইল। সেই অমূল্য নিধি ঝুলির মধ্যে লুক্কায়িত রাখিয়া রাত্রি থাকিতে থাকিতে সন্ন্যাসী তথা হইতে প্রস্থান করিয়া দেবগ্রামে উপস্থিত হইল। তখন দেবগ্রামে বহু কুম্ভকারের বাস ছিল। সন্ন্যাসী ঐ গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেবপাল নামক একজন কুম্ভকারের গৃহে অতিথি হইল এবং ঝুলিটি ঐ কুম্ভকারের কুটীর প্রান্তে ঝুলাইয়া রাখিয়া স্নানার্থে গমন করিল।

তখন বর্ষাকাল—হঠাৎ এক পশলা বৃষ্টিপাত হওয়ায় কুম্ভকারের জীর্ণ চাল হইতে জল পড়িয়া ঐ ঝুলিটি সিক্ত হইতে লাগিল এবং স্পর্শমণি সংস্পর্শে ঐ জলধারা অপূর্ব্ব গুণ প্রাপ্ত হইয়া গৃহস্থিত যে কোন ধাতব পদার্থের সংস্পর্শে আসিতে লাগিল তাহাই স্বর্ণ প্রাপ্ত হইল। এই অত্যদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শন করিয়া কুম্ভকার যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হইল এবং সাগ্রহে সন্ন্যাসীর অসাক্ষাতেই তাহার ঝুলিটি অনুসন্ধান করায় সেই অমূল্যনিধি প্রাপ্ত হইল এবং এক নিভৃত স্থানে উহা লুক্কায়িত রাখিয়া পুনরায় স্বকার্যে মনোনিবেশ করিল। সন্ন্যাসী স্নানান্তে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখিল যে তাহার এত কষ্টের এত সাধনার ধন অপহৃত হইয়াছে। এখন সে আকুল প্রাণে দেবপালের শরণাপন্ন হইয়া মণি প্রত্যার্পণের নিমিত্ত সকাতরে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিল কিন্তু তাহাতে বিফল মনোরথ হইয়া এক বৃহৎ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া এই বলিয়া পূর্ণাহুতি দিল 'যেন এই মহামণিই দেবপালের সর্ব্বনাশের মূল হয়—আর যেন অচিরাৎ সে নির্বংশ হয় ও সেই গ্রামে যেন কখনও কোন কুম্ভকার আসিয়া বাস না করে—করিলে সেও যেন সবংশে নির্বংশ হয়।' দেবপাল সেই স্পর্শমণির গুণে ক্রমে কুবের সদৃশ ধনশালী হইয়া উঠিলেন এবং নিজবাসগ্রাম অধিকার করিয়া ইন্দ্রপুরী সদৃশ প্রাসাদ ও মন্দিরাদি নির্মাণ এবং সুবৃহৎ সরোবরাদি খনন করাইয়া স্বীয় নামে ঐ গ্রামের 'দেবগ্রাম' নামকরণ করিলেন। ক্রমে ঐ ক্ষুদ্র গ্রাম নগরের আকার ধারণ করিল এবং দেবপাল একজন ক্ষমতাশালী ভূম্যধিকারী হইয়া উঠিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন।"

৩। গ্রাম: চাকদহ (মৌজাঃ কাঁঠালপুলি)। ২২।২৮৭৬৪ (শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) কায়স্থ, বৈদ্য, বারুজীবি, মাহিষ্য, নমঃশূদ্র, কামার, কুমার ও আদিবাসী।

(খ) কৃষিকার্য, ব্যবসায় ও চাকুরী।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। চাকদহ-বনগ্রাম রোডে মোটরবাস চলে।

(ঘ) মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে গণেশজননী পূজা। পূজাটী প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) গণেশজননী পূজার মেলা। মাঘ মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গণেশজননীর পূজামণ্ডপ এবং দুইটী পঞ্চানন্দ-তলা ও দুইটী কালীতলা আছে।

সরকারী নথিপত্রে চাকদহ নামে কোন স্থান নাই। যে স্থানটীকে চাকদহ বলা হয়, তাহা ভাগীরথী নদীর তীরে কাঁঠালপুলি নামক মৌজার অন্তর্ভুক্ত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঐ জায়গায় জলপথের একটী উন্নত বন্দর ছিল এবং বহুদিন হইতে ঐ স্থানে একটী বাজার আছে। উল্লিখিত স্থানের নাম আনন্দগঞ্জ - যাহা পুরাতন চাকদহ নামে বর্তমানে পরিচিত। যে সময়ে এই স্থান সমৃদ্ধশালী ছিল তখন আনন্দগঞ্জের নীচ দিয়া ভাগীরথী নদী প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে উহা প্রায় দেড় মাইল পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। চাকদহ বহু দিনের

প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

প্রবাদ আছে যে, ভগীরথ যখন স্বর্গ হইতে গঙ্গাদেবীকে মর্ত্যে আনয়ন করেন তখন এখানে তাঁহার রথের চাকা প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল—তাই এখানকার নাম চক্রদহ। পরে চক্রদহ অপভ্রংশে "চাকদহ" হইয়াছে।

৺দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় প্রণীত "সুরধুনী" কাব্যের অষ্টম সর্গে চাকদহ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত বর্ণনা পাওয়া যায়:

"চূর্ণী মৌনা হোলো গঙ্গা চলিতে লাগিল,
স্রোতভরে চক্রদহে আসি উত্তরিল।
ভগীরথ রথচক্র বালুকায় পশী,
অচল হইয়ে রহে চক্রদহে বসি,
সেই হেতু এই স্থানের চক্রদহ নাম,
গণনীয় জন মাঝে ভোগ মোক্ষধাম॥"

শ্রীঅমর লাহিড়ী, ব্যবসায়ী,
চাকদহ, নদীয়া।

Chakdah—A town in the Rānāghāt Subdivision on the main line of the Eastern Bengal State Railway, situated in 23°6′ N. and 88°33′ E., not far from the left bank of the Hooghly river. Tradition says that Bhāgirath, when bringing the Ganges from Himālaya to Gānga Sagar to water his forefathers' bones, left the traces of his chariot wheel (*Chakra*) here; hence the name. Not much appears to be known of the ancient history of the town, but it is believed that the army of General Mān Singh was weatherbound here for some days, on its way to the subjugation of Pratāpāditya at the close of the sixteenth century. Chākdah, as well as Bānsbaria and Gānga Sāgar, was once notorious for human sacrifices by drowning. In Hamilton's "Description of Hindostan", London, 1820, it is stated that "this town was formerly noted for voluntary drownings by the Hindoos, which however latterly have become a mere ceremony of immersion without any fatal result". Stavorinus, 1785, writes, "The village of Chagda, which gives its name to the channel, stands a little inland, and there is a great weekly market or bazar here: the channel terminates about three Dutch miles inland, and on its right has many woods in which are tigers and other wild beasts."

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. xliv)

চাকদহ—কলিকাতা হইতে ৩৮ মাইল দূর। এই স্থানের প্রাচীন নাম চক্রদ্বীপ বা চক্রদহ। প্রবাদ, গঙ্গা আনয়নের সময় ভগীরথের রথের চক্র এখানে একটি গভীর খাত খনন করিয়া গিয়াছিল, গঙ্গাজলে পূর্ণ হইয়া উহার নাম হয় চক্রদহ বা চাকদহ।

এই স্থান বিশেষ পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। রেল খুলিবার পূর্ব্বে যশোহর ও খুলনা অঞ্চলের বহুলোক চাকদহে গঙ্গাস্নান করিতে আসিতেন। চাকদহ হইতে বনগ্রাম হইয়া যশোহর পর্যন্ত একটি পাকা রাস্তা আছে। এখনও বহু দূর হইতে লোকে এখানে শবদাহ করিতে আসে।

বর্ত্তমানে চাকদহ হইতে গঙ্গা প্রায় দেড় মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। চাকদহ গ্রামের নিম্নে গঙ্গার পুরাতন খাত এখনও বর্ত্তমান আছে। প্রাচীনকালে গঙ্গাসাগরের ন্যায় এই স্থানেও লোকে শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিত ও অনেকে মুক্তি প্রাপ্তির আশায় চক্রদহের জলে ডুবিয়া প্রাণ বিসর্জন দিত। কথিত আছে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহারাজ মানসিংহ যখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিবার জন্য বাংলায় আগমন করেন তখন তাঁহার সৈন্যদলকে ঝড়বৃষ্টির জন্য কয়েকদিন এই স্থানে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। চাকদহ স্টেশন হইতে

মাত্র সাত-আট মিনিটের পথ কাঁঠালপুলি নামক পল্লীতে দ্বাদশ গোপালের অন্যতম মহেশ পণ্ডিতের ফুলসমাজ বেদী ও শ্রীপাট অবস্থিত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথিতে মহেশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে এখানে বৈষ্ণবদিগের একটি মহোৎসব হয়। যশোড়ার জগদীশ পণ্ডিত এই মহেশ পণ্ডিতের ভ্রাতা ছিলেন। চাকদহ যে এক-কালে একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল তাহা ইহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। বহু অট্টালিকা ও দেবায়তনের ধ্বংসাবশেষ গভীর অরণ্য সমাচ্ছন্ন হইয়া এই গ্রামখানিকে এক অপরূপ নীরবতা ও গাম্ভীর্য্য প্রদান করিয়াছে। এখানে এখনও একটি মিউনিসিপ্যালিটি আছে। চাকদহের আনন্দগঞ্জ বাজারে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে মহাধুম-ধামের সহিত গণেশজননী মূর্ত্তির পূজা হয় এবং প্রায় পক্ষকাল স্থায়ী একটি বিরাট মেলা বসে।

চাকদহের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রামে হিন্দু আমলে নির্ম্মিত একটী প্রাচীন মন্দির আছে। শিমুরালি ও চাকদহের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত এই মন্দিরটী রেলগাড়ীতে বসিয়াই দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটী যে স্থানে অবস্থিত উহা চতুর্দ্দিকের ভূমি হইতে অনেক উচ্চ। এই মন্দিরের ছাদ চৌচালার আকারে নির্মিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাল ইটের দ্বারা গঠিত ও অপূর্ব কারুকার্যময় এই মন্দিরটি বর্ত্তমানে সরকারী “রক্ষিত-কীর্তির” অন্তর্গত। কবে কাহার দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণীত হয় নাই। ইহা অন্ততঃ ৫০০ শত বৎসরের পুরাতন হইবে। মন্দিরের নিকটে প্রত্যুম্ন সরোবর নামে একটী পুরাতন দীঘি আছে। জমিদারগণের প্রাচীন দলিলাদিতে প্রত্যুম্ন হ্রদ ও প্রত্যুম্ননগরের উল্লেখ আছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মুক্তবেণীর স্থান নির্দেশ করিতে গিয়া প্রত্যুম্ননগরের নাম করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে অতি প্রাচীনকালে চাকদহ প্রত্যুম্ননগর নামে একটী বিশাল নগরের অন্তর্গত ছিল। জনশ্রুতি যে শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রত্যুম্ন চক্রতীর্থে সিদ্ধিলাভ করিয়া এই স্থানে স্বীয় নামে একটি নগর স্থাপন করেন। আবার কাহারও কাহারও মতে প্রত্যুম্ন রায় নামক জনৈক হিন্দু নরপতি এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। শিমুরালি হইতে চাকদহ পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে বহু উচ্চ ভিটা ও পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। এই সকল স্থান খনন করিলে বহু পুরাতন কীর্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া অনেকের অভিমত।

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত পৃঃ ৮৪—৮৬)

৪। গ্রাম : যশড়া। ২৪।৪০৪'৬০।
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, জেলে, মালো, নাপিত, নমঃশূদ্র, বাগ্দী, তাঁতি, মাহিষ্য ও ছুতার।

গ্রামে আটটী পাড়া আছে। যেমন—জেলেপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, বাগ্দীপাড়া, কুমারপাড়া, তাঁতিপাড়া, কায়স্থপাড়া ও বামনপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, কুটীরশিল্প, চাকুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বনগ্রাম সহর হইতে একটি পাকা সড়ক চাকদহ হইয়া যশড়া মেইন রোড নামে হুগলী জেলার জিরাট ঘাট পর্যন্ত গিয়াছে। চাকদহ-সুখসাগর রোড ও যশড়া মেইন রোড ধরিয়া মোটর গাড়ী, ঘোড়ার গাড়ী কিংবা রিক্সা-যোগেও গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামটী গঙ্গানদীর তীরবর্তী বলিয়া বর্ষাকালে ষ্টীমার ও নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত চলে। তাহাছাড়া এই জলপথে রানীনগর গান্ধী ঘাটে অবতরণ করিয়াও গ্রামে যাইবার সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা, বুড়ো-মা তলার পূজা ও পালুনী উৎসব,

পৌষ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব, মাঘী পূর্ণিমায় যোগাত্মাদেবীর স্নানযাত্রা, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় রাধাগোবিন্দ জীউ-র দোলযাত্রা ও কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে বানেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসবগুলির মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসবটী প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণ দাবী করেন। বুড়োমাতলার পূজা ও পালুনী উৎসবের প্রাচীনত্ব প্রায় দুই শত বৎসরের এবং রাধাগোবিন্দ জীউর দোলযাত্রা উৎসবের প্রাচীনত্ব প্রায় শতাধিক বৎসরের বলিয়া অনুমান করা হয়। যোগাত্মা দেবীর স্নানযাত্রার ও বানেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসবের প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তেমন কোন নির্ভর যোগ্য হিসাব পাওয়া না গেলেও স্থানীয় গ্রামবাসীগণ উৎসব দুইটীকে বহু দিনের প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

(ঙ) স্নানযাত্রার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। ইহা প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মাঘীপূর্ণিমা স্নানের মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। ইহা প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, মনসা, বুড়ো-মা ও ষষ্ঠীর স্থান আছে। সুপ্রাচীন জগন্নাথ মন্দির ও তৎসংলগ্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ দোলমঞ্চ এই গ্রামের বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু। জগন্নাথ মন্দিরের মধ্যে প্রাচীন গৌর-গোপাল মূর্তি এবং মন্দির সংলগ্ন একটি প্রাচীন ইঁদারা আছে। এই স্থানের বকুলকুঞ্জ ভক্তদের নিকট একটি পবিত্র স্থান; কিন্তু আজ আর তাহার কোন চিহ্ন বর্তমান নাই—প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল তাহার বিলোপ হইয়াছে।

যশড়া গ্রামটি প্রায় আট শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রামের সহিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব, মহাপ্রভু নিত্যানন্দ এবং জগদীশ পণ্ডিতের নাম বিশেষভাবে জড়িত এবং গৌরাঙ্গদেবের নানা অলৌকিক কীর্তিকলাপ ও লীলা গ্রামটিকে বিশেষ ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য দান করিয়াছে।

এই গ্রাম সম্পর্কে নানা কিংবদন্তী ও জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শুনা যায়, পূর্বে যশড়ার তিন দিকে গঙ্গা প্রবাহিত ছিল; বর্তমানে উহা পশ্চিমে সরিয়া গিয়াছে। প্রবাদ আছে, গঙ্গাকে আনায়নের সময় ভগীরথের রথের চক্র এই স্থানে একটি গভীর খাতের সৃষ্টি করিয়াছিল। যশড়া গ্রামের নিম্নে গঙ্গার সেই পুরাতন খাত অদ্যাপি বিদ্যমান। আরও জানা যায়, প্রাচীনকালে নাকি গঙ্গাসাগরের ন্যায় এই স্থানেও মানতকারী বহু লোক শিশু সন্তান নিক্ষেপ করিতেন ও অনেকে সংসারের জ্বালা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য গঙ্গায় প্রাণ বিসর্জন দিতেন। আরও জনশ্রুতি আছে যে, গঙ্গাতীরে গ্রামটির অবস্থিতি বলিয়া যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের বহু ব্যক্তি তাঁহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য এই স্থানে লইয়া আসিতেন। যাঁহারা দৈবাৎ রোগমুক্তি লাভ করিতেন তাঁহারা আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানেই শান্তিতে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাইবার জন্য থাকিয়া যাইতেন।

অনেকের মতে, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি অঞ্চলের এইরূপ শান্তিপ্রিয় লোকেদের লইয়া গঠিত এই জনপদটি পরবর্তীকালে জগদীশ পণ্ডিতের পবিত্র যশঃস্মৃতি বহন করিয়া "যশড়া" নামে পরিচিত হইয়াছিল।

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যবসায়ী,
গ্রাম: যশড়া, পোঃ চাকদহ,
নদীয়া।

পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" নামক গ্রন্থে "যশড়া" গ্রাম সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়।

"…………যশোড়া গ্রাম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট। এখানে জগন্নাথদেবের একটি মন্দির আছে। কথিত আছে যে বৃদ্ধ বয়সে জগদীশ পণ্ডিত শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। সেখানে জগন্নাথদেবের নবকলেবর ধারণকালে তিনি পুরাতন প্রতিমূর্ত্তিটি পুরী হইতে স্বয়ং পদব্রজে বহন করিয়া যশোড়ায় আনয়ন ও প্রতিষ্ঠা করেন। স্নানযাত্রার সময় যশোড়ায় বহু জনসমাগম হয়। প্রতিবৎসর পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যশোড়ায় জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মাঘী পূর্ণিমা ও গঙ্গাস্নানের যোগ উপলক্ষেও এখানে বহু লোকের সমাবেশ হয়।" (পৃ: ৮৩-৮৪)

Jasra (J. L. 24)—Alight at Chakdah railway station, 38 miles from Calcutta. Jasra is 1 mile west of the railway station, and contains the Sripat of the famous Vaishnava, Jagadish Pandit, and a temple called the Jagannathdeb temple. Jagadish Pandit consecrated the image of this temple

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. 167)

৫। গ্রাম: কালীগঞ্জ (মৌজা: প্রিয়নগর)। ৩১।৩১৩৭০।৪০০।২,০৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মালো, সদগোপ, তাঁতি, কামার, ছুতার ও কুমার। গ্রামে মোট চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিমুরালি। মদনপুর রেলস্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের নিকটবর্তী কলিকাতা-বহরমপুর রোড দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) মাঘ মাসে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা। পূজাটি বাংলা ১২৯৩ সনে আরম্ভ হয়।

(ঙ) রাজরাজেশ্বরী পূজার মেলা। মাঘ মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটিও বাংলা ১২৯৩ সনে আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজামণ্ডপ পঞ্চানন্দতলা, শীতলার স্থান এবং একটি আশ্রমে গঙ্গাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

অনেক দিন আগে এই গ্রামে প্রসিদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বংশে প্রিয়বালা দেবী নামে এক দানশীলা ও ধর্মপরায়ণা মহিলা ছিলেন। বহু দূর গ্রাম হইতে তাঁহার নিকট দান গ্রহণের জন্য বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, জ্ঞানী ও গুণী লোকের সমাগম হইত। খুব সম্ভব তাঁহার নামানুসারে গ্রামের নাম হয় "প্রিয়নগর"।

নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের পূর্ব-পুরুষ রাজা রামজীবন রায়ের নামানুসারে প্রিয়নগর সংলগ্ন জীবননগর গ্রামের উৎপত্তি হয়। এই বংশের রামেশ্বর রায় রাজ্য প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া নবাব প্রদত্ত নবদ্বীপাধিপতির পাঞ্জা লুকাইয়া লইয়া আসেন এবং প্রিয়নগর গ্রামের পশ্চিম দিকে বিশাল জঙ্গলাকীর্ণ "বেড়ী" নামক স্থানে গোপনে জীবন যাপন করিতে থাকেন। নবদ্বীপাধিপতি তাঁহার পাঞ্জার অভাবে রাজকার্য চালান অসম্ভব দেখিয়া রামেশ্বর রায়ের সন্ধান পাইয়া পাঞ্জা ফিরাইয়া লইয়া যান এবং বিনিময়ে তাঁহাকে এক হাজার বিঘা জমি দান করেন। এইরূপে "বেড়ীপলতা" গ্রামের উৎপত্তি হয়। ইহার কিছু অংশ প্রিয়নগর গ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছে। রামেশ্বর রায়ের বংশধরগণ বর্তমানে এই গ্রামে বাস করিতেছেন। এই সমস্ত গ্রাম কালক্রমে রানাঘাটের বিখ্যাত পালচৌধুরীদের জমিদারীভুক্ত হয়। পরে কলিকাতার কালী প্রসন্ন ঘোষ এই জমিদারী খরিদ করেন। কালী প্রসন্ন ঘোষের নামানুসারে প্রিয়নগর গ্রামের উত্তরে

অবস্থিত নূতন বাজারের নাম পরিবর্তিত হইয়া "কালীগঞ্জ" করা হইয়াছে।

শ্রীধরণীধর মুখোপাধ্যায়,
গ্রাম: প্রিয়নগর,
নদীয়া,
ও
শ্রীউপেন্দ্র নাথ বাগচী, শিক্ষক,
"বাগচী কুটির"
নদীয়া।

৬। গ্রাম : শিকারপুর। ৪১।৬৬৬'০৪।২৩৭।১,৪৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, সদ্গোপ, কামার, জেলে, নাপিত, রজক ও মুসলমান।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্যজীবি।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিমুরালি।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজা প্রায় কুড়ি বৎসরের এবং কালীপূজাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি কালী মন্দির আছে।

ভাগীরথী হইতে উৎপন্ন চরাভূমিতে এই গ্রাম অবস্থিত। জনবসতি গড়িয়া উঠিবার আগে এই অঞ্চল জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। জনশ্রুতি আছে যে, যাযাবর বা শিকারীর দল বৎসরের এই স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে বন্য পশু-পক্ষী শিকার করিতে আসিত। অনুমান করা হয়, এই কারণে গ্রামের নাম শিকারপুর হইয়াছে।

শ্রীসুরেন্দ্র চন্দ্র শীল, শিক্ষক,
ভাগীরথী শিল্পাশ্রম,
শিকারপুর, নদীয়া।

৭। গ্রাম : ঘোষপাড়া (মৌজা: দক্ষিণ ঘোষপাড়া)।
৬৩।১৬১'৭৪।৩।৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কল্যাণী ও কাঁচড়াপাড়া।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় আউল চাঁদ ও সতীমা-র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সপ্তাহ-কালব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সতীমা-র সমাধি মন্দির ও একটি ডালিম গাছ নিম্নস্থ তাঁহার সাধনার স্থান আছে।

শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহ রায়, ব্যবসায়ী,
গ্রাম: ঘোষপাড়া,
পো: কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

Ghoshpara—A village situated in the Chākdah thānā of the Rānāghāt sub-division, about five miles north-west of the Kānchrāpārā Railway station. It is also known under the name of Nityadhan. This village is the headquarters of the *Kartābhājā* sect, of which an account has been given in *The Tribes and Castes of West Bengal.* According to Sri Gopāl Krishna Pāl, who has written an interesting note on the sect, festivals are held at Ghoshpārā at the Dol Jātrā, in the month of Fālgun ; at the Rath Jātrā in the following month ; on the the anniversary of the death of Rāmdulāl or Dulāl Chānd, the son of the original founder of the sect, in the month of Chaitra ; on the anniversary of the death of the founder, in the month of Asārh ; and on the anniversary of the death of the founder's wife in Aswin. The places visited by the pilgrims are the room where the founder's wife was buried, the room containing the relics of the founder, and the room containing the relics his son ; in

each of which places daily prayers are also offered. In addition to the above, two tanks, named Dālimtālā and Himsāgar, are also visited by the pilgrims ; both of these tanks are associated with the name of the Fakir who assisted in the founding of the sect. Except for its connection with the sect, the village of Ghoshpārā is of no interest or importance".

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. xliv)

"**ঘোষপাড়া**—ইহা কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে নামিয়া অন্যূন দুই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম মুখে যাইতে হয়। সম্বৎসরে এখানে যতগুলি পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয় তন্মধ্যে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দোল পর্ব্বই সবিশেষ প্রসিদ্ধ ও এই উপলক্ষে রেল, ষ্টীমার ও নৌকাযোগে বহু সহস্র নরনারীর সমাগম হয় এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ ও বিক্রয় হইয়া থাকে।"

(নদীয়া কাহিনী—কুমুদ নাথ মল্লিক, পৃঃ ২৫৮)

[ঘোষপাড়ায় সতী-মার উৎসব ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

৮। গ্রাম : চাঁদমারী। ৭৮।৮৯৩৮৫।২৮৯।১,৪৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, সদ্গোপ, নমঃশূদ্র ও বাগ্দী। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মদনপুর। তাহাছাড়া, কল্যাণী স্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় গাজী সাহেব-এর স্মরণোৎসব।

(ঙ) গাজী সাহেবের স্মরণোৎসব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে হিন্দুপাড়ায় সর্বসাধারণের কালী ও ষষ্ঠী দেবীর স্থান, ব্যক্তি-বিশেষের একটি শিবমন্দির এবং গাজী সাহেবের দরগাহ আছে।

শ্রীসামসুদ্দিন আহম্মদ, শিক্ষক,
গ্রাম : চাঁদমারী
পোঃ মদনপুর, নদীয়া।

৯। গ্রাম : শ্রীপাটকুলিয়া (মৌজাঃ কুলিয়া)। ৮৩।৯৫৩৫১।১,১৭৭।৪,৬৭৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কাঁচড়াপাড়া অথবা কল্যাণী রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে দেবানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব।

(ঙ) দেবানন্দ ঠাকুরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে দেবানন্দ ঠাকুরের একটি মন্দির আছে। স্বর্গীয় কানাই লাল ধর মহাশয় কর্তৃক মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ ঠাকুরের মূর্তি এবং রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীরামগোপাল মিত্র, চাকুরী,
গয়েশপুর, নদীয়া।

"কাঁচড়াপাড়া স্টেশন হইতে প্রায় তিন মাইল উত্তর-পূর্ব্বে নদীয়া জেলায় 'অপরাধভঞ্জন' বা কুলিয়ারপাট অবস্থিত। এখানে একটি সুন্দর মন্দিরে গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়। এখানকার দ্বাদশবকুল নামক কুঞ্জ বৈষ্ণবগণের নিকট অতি প্রিয়। প্রতিবৎসর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এখানে তিন দিন ব্যাপী একটি বিরাট মেলা হয়। কথিত আছে, এই তিথিতে

শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া গ্রাম নিবাসী বৈষ্ণব-নিন্দক পণ্ডিত দেবানন্দের অপরাধ মার্জ্জনা করেন। তদবধি কুলিয়া অপরাধভঞ্জনের পাট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। উক্ত তিথিতে এখানে আসিয়া পূজা অর্চ্চনা করিলে সর্ব্বপাপ ও অপরাধ দূর হয় বলিয়া লোকের বিশ্বাস।"

(বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সনে প্রকাশিত পৃ: ৮১।)

Kulia—Small village, situated in the Chākdah thānā of the Rānāghāt sub-division, about 3 miles north-east of the Kānchrāpārā Railway station. A fair is held here annually on the 11th day of Paush : it is called the *Aparadh Bhanjan Mela.* There are various legends as to the origin of this fair ; that which, perhaps, obtains the greatest credence is that the place was once visited by Chaitanya, who was well entertained there by one Debananda, after having been refused hospitality in the neighbouring village of Kānchrāpārā, and he was so pleased with the treatment which he received, that he sanctified the place and declared that all who worshipped there on the 11th day of Paush would be absolved of all their sins. There is a temple in the village, known as Debananda-pat : it is of comparatively recent date and is said to have been built by Sri Kanai Lāl Dhar of Calcutta. Adjoining the temple are some tombs, a may which one is alleged to be that of Debandanda.

(District Handbooks, Nadia. 1951, by A. Mitra, p. xlviii)

১০। গ্রাম : ঘোড়াগাছা। ৯১।৪৪৪'৫২।১০১।৫২৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মদনপুর। তাহাছাড়া কল্যাণী রেলস্টেশনে নামিয়াও গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ঘোড়াপীরের উরস্ এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম পরব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ঘোড়াপীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা।

(চ) গ্রামের মধ্যে ঘোড়া পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশক্তিপদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম: ঘোড়াগাছা,
পো: বিরহী, নদীয়া।

১১। গ্রাম : কুমারপুর। ৯৩।৯০৬'৫০।২২৯।১,১৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, দুলে ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মদনপুর।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে বড় পীরের উরস্।

(ঙ) বড় পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বর্গীয় নন্দকুমার বিদ্যাসাগর মহাশয় এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তিনি নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট হইতে বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার পৌত্র কানাই লাল ভট্টাচার্য বর্তমানে উক্ত শিবলিঙ্গের সেবায়েত। তাহাছাড়া গ্রামে একটি পঞ্চানন্দতলা এবং মানিক পীর নামক একজন পীরের স্থান আছে।

কুমারপুর গ্রামটি এক কালে নদী তীরবর্তী ছিল এবং বহু কুমার এই গ্রামে বাস করিত। সম্ভবত: কুমারদের প্রাধান্য হেতু গ্রামের নাম কুমারপুর হইয়াছে।

শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল অধিকারী, শিক্ষক,
গ্রাম : কুমারপুর,
পো: মদনপুর, নদীয়া।

১২। গ্রাম : মদনপুর। ৯৪।৮১৫'০০।৭১৫।৪,০৫১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে মোট পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে অষ্টম দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার (অষ্টম দোল) মেলা। ফাল্গুন মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি গত ছয়-সাত বৎসর যাবৎ আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামের প্রান্তে একটি চালা ঘরে গৌর-নিতাই-এর দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই গ্রামে প্রায় পনের বিঘা পরিমাণ জমি জুড়িয়া একটি বিরাট দীঘি আছে। শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে বিজয়া তিথিতে আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের দুর্গা প্রতিমা উক্ত দীঘিতে বিসর্জন দেওয়া হয়।

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই গ্রামের কিছু দূরে মদনমোহন দেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত থাকায়, গ্রামের নাম মদনপুর হইয়াছে।

শ্রীফটিক চন্দ্র সাধুর্খাঁ, শিক্ষক,
মদনপুর, নদীয়া।

১৩। গ্রাম : বেজপাড়া। ১২৩।১৩৮·০৯।৩০।১৭৪

(ক) কুমার, সদগোপ, নমঃশূদ্র ও ডোম।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ। চাকদহ-বনগ্রাম রোড হইতে একটি কাঁচা রাস্তা বাহির হইয়া গ্রাম অবধি গিয়াছে। এই রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে ব্রোঞ্জ নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া, গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ও একটি শীতলা দেবীর স্থান আছে।

শ্রীমনীন্দ্র নাথ রায়, শিক্ষক,
গ্রাম: বেজপাড়া,
পোঃ দীঘড়া, নদীয়া।

১৪। গ্রাম : ঘেটুগাছি। ১২৯।১,২৫৪·৯১।২১৩।১,' ২৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।
গ্রামে নয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শিমুরালি।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে ধর্মরাজপূজা। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে দশ-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া, গ্রামে একটি পঞ্চানন্দতলা এবং একটি মনসাতলা আছে।

শ্রীমন্মথ নাথ নন্দী, শিক্ষক,
ও
শ্রীজীতেন্দ্র নাথ ঘোষ,
গ্রাম: ঘেটুগাছি গোটেরা,
পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

১৫। গ্রাম : শিবপুর। ১৪১।৫২১·৩৫।১৫৭।৭৯৬

(ক) নমঃশূদ্র ও মুসলমান।
গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে মাদার পীরের উরস্। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) মাদার পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাদার পীরের স্থান আছে।

পূর্বে এই গ্রামটি ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে শিবগঞ্জ বলিত। বর্তমানে এই গ্রাম শিবপুর নামে পরিচিত।

শ্রীআমীর হোসেন, শিক্ষক,
গ্রাম: শিবপুর,
পোঃ দীঘড়া, নদীয়া।

১৬। গ্রাম : মথুরাগাছি। ১৫২।৫৭৩·০৮।২০২।১,০১৩

(ক) গ্রামের প্রাচীন বাসিন্দা বাগ্দী ও মুসলমান। তবে বর্তমানে এই স্থানে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তু লইয়া একটি কলোনি গঠিত হইয়াছে।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও মৎস্যজীবি।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ। গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে খেদাই ঠাকুরের (সর্প দেবতা) পূজা।

(ঙ) খেদাইঠাকুর পূজার মেলা। শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে খেদাই ঠাকুরের একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে, ইহা "খেদাই তলা" নামে পরিচিত।

শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস, কৃষিকার্য,
গ্রাম: বিষ্ণুপুর, পোঃ গৌরীপুর, নদীয়া।
শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
ছাতিমতলা, পোঃ চাকদহ, নদীয়া,
এবং
শ্রীবিভূতি ভূষণ রায়, শিক্ষক,
পড়ারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ গৌরীপুর, নদীয়া।

১৭। গ্রাম : দেউলিয়া। ১৬১।২৭০·৯২।৯০।৪৭৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জনমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ।

(ঘ) আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে জগন্নাথদেব ও রাধা-বল্লভের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া, মন্দিরের মধ্যে পাথরে খোদাই করা একটি প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তিও আছে।

শ্রীঅরুণ কুমার রায়,
ছাতিমতলা,
পোঃ চাকদহ, নদীয়া।

১৮। গ্রাম : চাকুডাঙ্গা। ১৬৫।১০১·৭২।৪৭।২৯৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাকদহ।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে মনসা পূজা। তাহাছাড়া, পঞ্চানন্দ ও ক্ষেত্রপালের পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে।

(চ) গ্রামে দুইটি কালীর, একটি ষষ্ঠী ও একটা শীতলার স্থান আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক,
ও
শ্রীজয়ন্ত কুমার নন্দী, শিক্ষক,
চাকুডাঙ্গা, নদীয়া।

১৯। গ্রাম : শ্রীনগর। ১৮৩।২,৬৩৪·৩৮।৬২৪।৩,২৭০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মাঝেরগ্রাম।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় গাজী সাহেব-এর স্মরণোৎসব।

(ঙ) গাজী সাহেব-এর স্মরণোৎসব উপলক্ষে মেলা। মাঘী পূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি ষাট হইতে সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গাজী সাহেব-এর একটা দরগাহ আছে।

কথিত আছে, আনুমানিক অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগে এই গ্রামে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজধানী ছিল। এই গ্রামের একটা পাড়াকে আজিও রাজার মাঠ বলা হয়।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, চাকুরী,
গ্রাম: রাজার মাঠ,
পোঃ শিমুলিয়া, নদীয়া।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ চাকদহ

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব
(গাজী সাহেব)

শ্রীনগর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার জনৈক গাজী সাহেবের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গাজী সাহেবের জীবনী সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। শোনা যায়, তিনি এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার কালু নামে এক ভ্রাতা ছিল। গাজী ও কালু এই দুই সহোদর ভাই শৈশব হইতে ধর্মভীরু এবং সংসারে উদাসীন ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহাদের বিবাহ হয়; কিন্তু বিবাহের কিছুকাল পরেই ঐ দুই ভ্রাতা ঈশ্বর আরাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া নিজেদের ধর্মমত প্রচার করেন। তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মমত সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে ইহা "গাজীর মত" নামে খ্যাত এবং শোনা যায় তাঁহাদের মুখে সর্বদাই "হরিনাম" ধ্বনিত হইত। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন ও আছেন, যদিও ইহা তেমন ব্যাপক নহে। ভক্তদের বিশ্বাস গাজীর বাহন ব্যাঘ্র এবং তাঁহার নাম স্মরণ করিলে ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। সুন্দরবন অঞ্চলে বাওয়ালী (কাঠুরিয়া) সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই গাজীর শিষ্য।

গ্রামবাসীদের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শ্রীনগর রাজার গড়ের পশ্চিম-দক্ষিণে গাজী সাহেব একটী আস্তানা নির্মাণ করিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। কিংবদন্তী আছে এই সময় একবার গাজী সাহেবের সহিত মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কোন বিষয় লইয়া মতান্তর হয় এবং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গাজী সাহেবের আস্তানাটী উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করেন। এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন গাজী সাহেব ঐশ্বরিক শক্তি বলে রাজ প্রাসাদের চতুর্দিক ব্যাঘ্র দ্বারা ঘিরিয়া ফেলেন। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিয়া গাজীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। বলা বাহুল্য, ইহা সম্পূর্ণই প্রবাদ মাত্র, ইহার ঐতিহাসিক কোন ভিত্তি নাই।

যাহাই হউক, উক্ত গাজী সাহেব দেহরক্ষা করিলে তাঁহার মরদেহ তাঁহার আস্তানার এক স্থানে কবরস্থ করা হয় এবং প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় তাঁহার ভক্তরা গাজীর সাহেবের স্মরণোৎসব পালনের ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতেই এই স্থানে উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং চব্বিশ পরগণা জেলা হইতে ভক্তরা আসিয়া থাকেন। সাধারণতঃ গাজীর কবর-এর স্থানে কাঁচা দুধ ঢালিয়া, অথবা মাটির ঘোড়া ও সিন্নি দিয়া গাজীর নিকট ভক্তরা মানসিক শোধ করেন। প্রধানতঃ ব্যাঘ্র ভীতি নিবারণ ও পুত্র-কন্যা কামনা জানাইয়া গাজীর নিকট মানত করা হয়। জনৈক মুসলমান বর্তমানে গাজীর খাদেম উৎসবটী সর্বজনীন।

(জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উৎসব)

যশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ শুক্লাতিথিতে আরম্ভ করিয়া তিনদিনব্যাপী জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে নাম সংকীর্তন, মালসা ভোগ ও ধুলট উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে পূর্ব বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু সংখ্যক বৈষ্ণব নরনারী ও ভক্ত যোগদান করেন। বস্তুতঃ তাঁহারা উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই উৎসব স্থানে সমবেত হন। বাংলাদেশে জগদীশ পণ্ডিতের কথা কাহারও অবিদিত নহে। এই সাধক ব্যক্তি সুদূর নীলাচল (শ্রীক্ষেত্রধাম) হইতে জগন্নাথদেবের প্রতিমূর্তি আনিয়া এই গ্রামে স্থাপন করেন; কালক্রমে এই স্থানে একটি দেব মন্দির গড়িয়া উঠে। জগদীশ পণ্ডিত ঐশ্বরিক ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন, প্রবাদ আছে, এক সময়ে পৌষ মাসে কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত আসিয়া জগদীশ পণ্ডিতকে বলেন যে, তাঁহারা আগামী কল্য ভেটকী মাছ ও কাঁচা আমের ঝোল সহকারে অন্ন প্রসাদ পাইতে

ইচ্ছা করেন। ভক্তগণের এই অভিলাষ পূরণার্থে জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথদেবের শরণাপন্ন হন। জগন্নাথদেব তাঁহার একান্ত ভক্তের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে স্বপ্নাদেশ করেন যে, পরদিন সকালে বকুলকুঞ্জে আম ও ইঁদারায় ভেটকী মাছ দেখা যাবে। দৈবাদেশে ঐরূপ সত্যই ঘটিল। ভক্তগণ তাঁহাদের অভিলাষ অনুযায়ী প্রসাদ পাইলেন। উৎসবের কয়েকদিন নাম সংকীর্ত্তন, মালসা ভোগ ও দধিলুট উৎসব বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও ভক্তগণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।

জগদীশ পণ্ডিত সম্পর্কে জানা যায় যে, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে পূর্ববঙ্গের গৌঘাটি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গয়ঘর বন্দ্য ভট্টনারায়ণের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা উভয়েই পরম ভক্ত ও বৈষ্ণব ছিলেন।

পিতামাতার মৃত্যুর পর পণ্ডিত জগদীশ স্বীয় ভার্য্যা দুঃখিনী ও ভ্রাতা মহেশ পণ্ডিতকে সঙ্গে লইয়া গৌঘাটি ত্যাগ করিয়া ভাগীরথী তীরে বাস করিবার মানসে নবদ্বীপে আসিয়া বৈষ্ণব চূড়ামণি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আলয়ে উপস্থিত হন। জগন্নাথ মিশ্র জগদীশ পণ্ডিতকে পরম বৈষ্ণব ও ভক্ত দেখিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ সখ্যতা করেন এবং নিজালয়েই থাকিবার জন্য স্থান দেন। এই সময় কিছুদিন পরে শচীদেবীর গর্ভে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব জন্মগ্রহণ করেন। জগদীশ পণ্ডিত ভক্তাবতার ছিলেন বলিয়া অনতিবিলম্বে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবকে কলিযুগের অবতার বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তৎপর মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের আদেশ অনুযায়ী জগদীশ পণ্ডিত নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রধামে) গমন করেন এবং নবকলেবর ধারণ কালে জগন্নাথের প্রতিমূর্তি স্বীয় স্কন্ধে লইয়া পদব্রজে এই গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। তাহার পর হইতে এই ভক্তপ্রবর জগদীশ পণ্ডিতের যশ গ্রাম গ্রামান্তরে ছড়াইয়া পড়ে। তাঁহার তিরোভাবের পর হইতে এই গ্রামে তাঁহার তিরোভাব উপলক্ষে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তেমন সঠিক বিবরণ পাওয়া যায় না।

(মানিক পীর)

কুমারপুর গ্রামে মানিক পীরের আস্তানায় প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতেও হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের বহু লোক যোগদান করেন। প্রধানতঃ গো মড়ক ও গো-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য মানিক পীরের স্থানে গরুর দুধ ও বাতাসা মানসিক করা হয়। উৎসবের দিন অনেক মুসলমান ফকির আসিয়া মানিক পীরের গান গাহিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া থাকেন।

শোনা যায়, মানিক পীর অলৌকিক দৈবশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। কিংবদন্তী আছে, একদা তিনি এই গ্রামের কানু গোয়ালা নামক জনৈক গোয়ালার নিকট একটু দুধ প্রার্থনা করেন; কিন্তু কানু গোয়ালা তাহার নিকট দুধ নাই বলিয়া মিথ্যা বলেন। ফলে, সেইদিনই তাহার কয়েকটি গরু মরিয়া যায়। এই অবস্থায় কানু গোয়ালা বিহ্বল হইয়া পীরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে পুনরায় তাহার মৃত গরুগুলি জীবিত হইয়া উঠে।

(সত্যপীর)

কুমারপুর গ্রামে সত্যপীরের আস্তানায় প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন সত্যপীরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। দুরারোগ্য অসুখ-বিসুখ হইতে আরোগ্যলাভের জন্য অনেকে পীরের স্থানে পশু-পক্ষী মানসিক করিয়া থাকেন। উৎসবের পরের দিন অর্থাৎ ১৪ই ফাল্গুন মানতের পশু-পক্ষীগুলি রন্ধন করিয়া সর্বজনীন ভোজ দেওয়া হয়।

এই গ্রামে সত্যপীরের আস্তানা ও পীরের উৎসব প্রচলন সম্পর্কে জানা যায় যে, টেকারুদ্দিন নামে জনৈক ফকির এই গ্রামে আসিয়া আস্তানাটি স্থাপন করেন। উক্ত ফকির সাধনা বলে ঐশ্বরিক ক্ষমতা লাভ করেন। তিনি পীর আবদুলকাদের জিলানীর যেনি সত্যপীর বা বড় পীর নামে খ্যাত এবং (যাঁহা আবির্ভাব উপলক্ষে ফতেহা-ইয়াজ-দহম্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়) ভক্ত ছিলেন। উক্ত ফকিরই এই স্থানে সত্যপীরের আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া উৎসব শুরু করেন।

কালীপূজা

(বুড়োমাতলায় পূজা ও পালুনী উৎসব)

যশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত বুড়োমাপূজা ও তদুপলক্ষে পালুনী উৎসবের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। বুড়োমা আসলে কালী দেবী। একদা স্থানীয় জনৈক মহিলা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া বুড়োমা-র 'পালুনী' উৎসবের সূচনা করেন। পালুনী উৎসবের রীতিনীতি সম্পর্কে তেমন কোন কিছু জানা যায় না। অনেকে মনে করেন, বংশের সংকটে পড়িয়া উক্ত মহিলা বুড়োমার নিকট ব্রত পালনের সংকল্প করেন। তদবধি গ্রামের বুড়োমাতলা নামক স্থানে কালীদেবীর পূজা ও তদুপলক্ষে স্থানীয় মহিলাগণের দ্বারা পালুনী ব্রত অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পূজা ও পালুনী ব্রত কেবলমাত্র মহিলাগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ বলিয়া জানা যায়। তাঁহাদের বিশ্বাস, বুড়োমাতলায় পূজা ও পালুনী করিলে ইহজন্মে বা পরজন্মে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে না। উৎসবটি স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি নির্দিষ্ট স্থানে কালীদেবীর ধ্যানে বুড়োমা-র পূজা করা হয়। বুড়োমাতলায় একটি ভগ্ন শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার বিষয় অবশ্য বিস্তারিত বিবরণ কিছু জানা যায় না। জনশ্রুতি আছে, নবাবী আমলে কাজিদের দ্বারা শিবলিঙ্গটি ঐরূপ ক্ষতি সাধিত হয়। সেই সময় স্থানীয় হিন্দুগণ উহা উদ্ধার করিয়া বুড়োমা তলায় স্থাপন করেন। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় মৃন্ময় কালীমূর্তি নির্মাণ করিয়া বুড়োমাতলায় পূজা করা হয়। মানত হিসাবে মহিলাগণ কাঁচা দুধ ও বাতাসা বুড়োমা-র নিকট নিবেদন করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে দেবীর উদ্দেশ্যে ছাগ বলি দেওয়া হইত কিন্তু বর্তমানে তাহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এই পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন পূজারীর ব্যবস্থা নাই; স্থানীয় ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতি বৎসর পূজা-অর্চনা করা হয় এবং পূজান্তে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বুড়োমাতলার পূজা ও পালুনী উৎসব কতদিনের প্রাচীন সে সম্পর্কে সঠিক কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। স্থানীয় গ্রামবাসীগণের ধারণা যে, প্রায় দুই শতাধিক বৎসর ধরিয়া এই গ্রামের মহিলাগণ এই পূজা ও পালুনী উৎসব করিয়া আসিতেছেন।

খেদাই ঠাকুর পূজা

মথুরগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে খেদাই ঠাকুর-এর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন নিমগাছের নীচে মাটি দিয়া বাঁধান নির্দিষ্ট স্থানে খেদাই ঠাকুর-এর পূজা হইয়া থাকে। "খেদাই ঠাকুর" আসলে সর্প দেবতা এবং সর্পভীতির জন্যই মূলতঃ এই দেবতার পূজা করা হয়। অবশ্য এই দেবতার স্বরূপ সম্পর্কে দ্বিমত আছে। আমাদের সংবাদদাতা শ্রীঅরুণ কুমার রায় মহাশয়ের মতে—"খেদাই ঠাকুর প্রকৃতপক্ষে ক্ষেত্রপাল ঠাকুর, ক্ষেত্রপাল হইতে 'খেদাই' শব্দটি আসিয়াছে; কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণ সাপের ঠাকুর হিসাবে খেদাই পূজা করে।" অপর পক্ষে আমাদের দ্বিতীয় সংবাদ-দাতা শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের মতে—"ইহা প্রকৃত পক্ষে মনসা পূজা" এবং আমাদের তৃতীয় সংবাদদাতা শ্রীবিভূতি ভূষণ রায় মহাশয়ের মতে—"ইহা ফণিভূষণ মহাদেবের পূজা।" যদিও তিনি এই উৎসবকে "খেদাই বাবা মনসা পূজা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

এই গ্রামে খেদাই ঠাকুর-এর পূজা প্রচলন সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে। উক্ত কিংবদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, যিনি খেদাই ঠাকুর-এর পূজা প্রচলন করেন তাঁহার আদি নিবাস ছিল বরিশাল জেলার উজিরপুর থানার অন্তর্গত সোলক গ্রামে। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং বাল্যকালে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য নবদ্বীপে আসেন। এই সময় তিনি একদিন এইরূপ স্বপ্নাদেশ পান—"তুই এখান থেকে চল আমার পূজা করবি। আমি নদীয়ার এক অখ্যাত স্থানে পড়ে রয়েছি।" কিন্তু তিনি সে-সময় এই স্বপ্নাদেশের কোন মর্ম উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। ইহার কিছুদিন পরে তিনি হুগলী

জেলার বড়গাছা মতান্তরে বগাচণ্ডীগাছা নামক স্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন এবং নদীয়া জেলার বনমালী গ্রামে (বর্তমানে খেদাইতলা হইতে মাত্র দুই মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে) বিবাহ করেন। এই সময় পুনরায় তিনি স্বপ্ন দেখেন এবং তদনুযায়ী অনুসন্ধান করিতে করিতে 'খেদাই তলায়' আসিয়া উপস্থিত হন এবং এই স্থানটির সংগে স্বপ্নাদিষ্ট স্থানের হুবহু সাদৃশ্য দেখিয়া চমৎকৃত হন। সেই সময় এই স্থানে একটি 'ডোবা' ছিল এবং ডোবার ঈশান কোণে একটি নিম গাছের নীচে কয়েকটি বিষধর সর্পকে দেখিয়া তিনি চক্ষু মুদিয়া স্তব পাঠ আরম্ভ করেন। স্তব পাঠ শেষে তিনি আর সর্পগুলিকে দেখিতে পান না। সেইদিন হইতে তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে প্রত্যহ এই স্থানে পূজাদি করিতেন। তৎকালে খেদাইতলা গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ হিংস্র জীব-জন্তুর আবাসস্থল ছিল। যাহাই হউক, ক্রমেই খেদাই ঠাকুর-এর কথা আশেপাশের অঞ্চলের লোকজন জানিতে পারিয়া সর্পদেবতা জ্ঞানে এই স্থানে পূজা দিতে আসিতেন এবং নিকট-বর্তী নেউলিয়া বিষ্ণুপুর গ্রামের কয়েকজন ধনবান সদগোপ পরিবার উক্ত ব্রাহ্মণকে কিছু জমি-জমা দান করিয়া তাঁহাকে এই গ্রামে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন। তদবধি খেদাই ঠাকুর-এর সেবায়েতগণ নেউলিয়া বিষ্ণুপুর গ্রামে বসবাস করিতেছেন।

খেদাই ঠাকুর-এর মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনা যায়, একদা রানাঘাট নিবাসী জনৈক নিঃসন্তান গোয়ালা পুত্র কামনায় খেদাই ঠাকুর-এর নিকট মানসিক করেন। ইহার কিছুকাল পর যথাসময়ে গোয়ালার একটি পুত্র সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে উক্ত গোয়ালা কয়েকজন আত্মীয়-বন্ধু সহ শিশু পুত্রটিকে লইয়া খেদাই ঠাকুর-এর মানসিক পূজা দিতে আসেন। কিন্তু এই স্থানে কোন বিগ্রহাদি নাই, কেবল মাত্র একটি নিমগাছকে পূজা করা হইতেছে দেখিয়া তাহার মনে অভক্তি জন্মে এবং পূজার জন্য আনিত নৈবেদ্যাদির কিয়দংশ দ্বারা পূজা দিয়া অবশিষ্টাংশ নিজেরাই ভক্ষণ করিবেন বলিয়া পৃথক করিয়া রাখেন। এমন সময় হঠাৎ প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হয় এবং ফলে তাহারা সকলে স্থানভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। ঝড়-জল থামিলে উক্ত গোয়ালার শিশু পুত্রটি কোথায়ও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অনেক কান্নাকাটি ও অনুসন্ধানের পর অবশেষে তাহারা স্বগ্রামে ফিরিয়া যান। ইহার কয়েকদিন পর খেদাইতলার দক্ষিণদিকে বিরাট বিলটিতে কয়েকজন বাগদী ডোঙ্গায় করিয়া মৎস্য শিকার করিতে গিয়া দেখে যে, একটি শিশু পদ্মপাতার উপর বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহারা ঐ শিশুটিকে পদ্মপাতা হইতে ডোঙ্গায় তুলিয়া আনিলে পদ্মপাতাটি জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়। ইহাতে তাহারা বিস্মিত হইয়া শিশুটিকে খেদাই ঠাকুর-এর সেবায়েত নেউলিয়া বিষ্ণুপুর নিবাসী ব্রাহ্মণের নিকট রাখিয়া আসেন। ঘটনার দিন রাত্রিতেই ব্রাহ্মণের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়—শিশুটিকে তাহার পিতার (উক্ত গোয়ালা) নিকট পাঠাইলে শিশুটি জীবনহানি হইবে, অতএব তুমিই শিশুটিকে পালন কর। কিন্তু গোয়ালা সংবাদ পাইয়া ব্রাহ্মণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া শিশুটিকে নিজের গৃহে লইয়া যান এবং সত্যসত্যই কয়েকদিনের মধ্যে শিশুটির মৃত্যু হয়। শোকাতুর গোয়ালা অনুতপ্ত হইয়া তাহার অপরাধ ভঞ্জনের জন্য খেদাই ঠাকুর-এর স্থানে আসিয়া ক্ষমা ভিক্ষা ও পূজা মানসিক করেন। পরে তাহার আর একটি পুত্র সন্তান হয়। এই অলৌকিক ঘটনার কথা চারিদিকে প্রচার হইলে পর খেদাই ঠাকুর-এর সাড়ম্বরে পূজা ও মেলার প্রচলন হয়। শোনা যায়, বিষধর সর্পের দ্বারা দংশিত মুমূর্ষু বহু ব্যক্তি খেদাই ঠাকুর-এর কৃপায় জীবন লাভ করিয়াছে। স্থানীয় অঞ্চলে খেদাই ঠাকুর-এর প্রভাব খুবই গভীর। এমন কি আমাদের সংবাদদাতা শ্রীবিভূতি ভূষণ রায় মহাশয়ের মতে—"এই সকল ঘটনা সত্য। উপরে বর্ণিত তথ্য সকল আমি যতদূর সম্ভব গ্রামের প্রাচীন লোকদের নিকট হইতে এবং সেবায়েতের বৃদ্ধা খুড়িমার নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছি। মেলা বিবরণী আমি স্বয়ং গত দুই বৎসর উপস্থিত থাকিয়া যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাই লিখিলাম।"

বৎসরের প্রতি শনি ও মঙ্গলবার খেদাই ঠাকুর-এর সাধারণভাবে পূজা হয় এবং শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে সাড়ম্বরে বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে প্রায় সপ্তাহকাল পূর্ব হইতে খেদাইতলার আশেপাশের বন-জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে খেদাই ঠাকুর-এর কোন মূর্তি নাই, একটি প্রাচীন নিমগাছকেই যথারীতি পূজা করা হয়। নিমগাছটির নীচে পূজার জন্য একটি টিনের দো চালা ঘর আছে। উৎসবের দিন এই স্থানে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে আরম্ভ হইয়া বিকাল ৪ ঘটিকা পর্যন্ত পূজা চলে। এই দিন দেড়শত হইতে দুইশত মানতের পাঁঠা-মেষ ও পশুপক্ষী বলি হয়। ইহা ভিন্ন, ষোড়শোপচারে পূজা, স্বর্ণ নির্মিত হাত বা পা ইত্যাদি মানসিক করা হয়। উৎসবে অ-হিন্দুরাও যোগদান করিয়া থাকেন এবং মানসিক করিয়া থাকেন। ভক্তদের দৃঢ় বিশ্বাস খেদাই ঠাকুর-এর নিকট মানসিক করিলে সর্প দংশনের ভয় থাকে না। উৎসবটি দুইশত বৎসরের অধিক প্রাচীন। আদিতে ইহা ব্যক্তি-বিশেষের উৎসব থাকিলেও বর্তমানে ইহাকে এই অঞ্চলে সর্বজনীন উৎসব বলা যাইতে পারে। নেউলিয়া-বিষ্ণুপুর নিবাসী আদি সেবায়েত এর বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে খেদাই ঠাকুর-এর পূজা করিতেছেন। সেবায়েতগণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। খেদাইতলা হইতে সেবায়েতগণের বাটী প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত। শোনা যায়, খেদাই ঠাকুর-এর মাহাত্ম্য চারিদিকে প্রচারিত হইলে পর একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই স্থানে আসেন এবং খেদাই ঠাকুরের পূজার্চনার জন্য কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন।

[এই সর্প দেবতার নাম কিরূপে 'খেদাই ঠাকুর' হইল তাহা সঠিক ভাবে বলা সম্ভব নয়। অনুমান করা যাইতে পারে খেদাইতলা হইতে এই দেবতার নাম এইরূপ হইয়াছে। এই গ্রাম ভিন্ন নদীয়া জেলার চাকদহ থানায় চাকুডাঙ্গা, বিষ্ণুপুর, সাতরাই, মতিমপুর প্রভৃতি স্থানে এবং চব্বিশ পরগণা জেলার বনগ্রাম থানার পাল্লা হরিশপুর গ্রামে "খেদাইতলা" নামে স্থান ও "খেদাই ঠাকুর" আছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারিলাম।]

[খেদাই শব্দটি 'খাত' শব্দজ। আশুতোষ দেব মহাশয় "নূতন বাংলা অভিধানে" 'খেদা' অর্থে 'হস্তী' ধরিবার জন্য সজ্জিত গর্ত লিখিয়াছেন। রাজশেখর বসু মহাশয়ের "চলন্তিকায়", পাইতেছি 'খেদা'—বন্য হস্তী ধরিবার জন্য বেষ্টিত স্থান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আমাদের বর্ণিত খেদাইতলার নিকট একটা বিরাট প্রাচীন বিল অদ্যাপিও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুগণ আসিয়া এই স্থানে বসবাস স্থাপন করিবার পূর্বে এই বিলটার চারিদিকে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং এই জঙ্গলে হিংস্র জীব জন্তুর আবাস স্থল ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়।]—সম্পাদক।

গণেশ জননী পূজা

চাকদহে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে গণেশ জননী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটী সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

গ্রামে গণেশ জননী পূজার জন্য সাধারণের একটী মণ্ডপ আছে। প্রতি বৎসর এই মণ্ডপে দেবী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া মাঘী পূর্ণিমা হইতে চারদিন ব্যাপী যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। দেবী গৌর বর্ণা, ত্রিনয়না এবং দ্বিভুজা; দক্ষিণ হস্তে ধৃত কার্তিক, ক্রোড়ে গণপতি, বামে সরস্বতী ও দক্ষিণে লক্ষ্মী। দেবীর বাহন দুইটী সিংহ। গণেশ জননী পূজা উপলক্ষে পূজার চতুর্থ দিনে এই স্থানে একটী লোক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং ইহা এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্যও বলা যাইতে পারে। এই লোক-উৎসব উপলক্ষে শিবের মূর্তি সহ একটী শোভাযাত্রা সমগ্র গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন এবং পরে মহাসমারোহে গণেশ জননীর সহিত শিবের বিবাহ অনুষ্ঠান হয়। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের লোকজন প্রতিমা দর্শন ও পূজা দিতে আসেন। দেবীর পূজার নির্দিষ্ট কোন ব্রাহ্মণ নাই, গ্রামের ব্রাহ্মণরাই পূজাদি করিয়া থাকেন।

ঘোষপাড়ায় সতী মা-র উৎসব ও মেলা

মত আর পথ এই নিয়েই আমাদের দেশে বার বার ধর্ম বৈষম্য দেখা দিয়েছে। মতবাদের দায়ে যেমন শৈব

এবং বৈষ্ণব দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে তেমনি পথ বিরোধে দায়ে বৈষ্ণব সম্প্রদায় চৈতন্য সমাজী এবং আউল সমাজ—এই দু'দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছেন। এ হ'লো পণ্ডিতদের কথা। ভক্তদের বিশ্বাস শ্রীচৈতন্যদেব যবন প্রীতি ও হরিজন সেবার মনোমত পথ খুঁজে পাননি তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে, তাই নূতন পথ প্রবর্তনের জন্য ঘোষপাড়ায় আউলচাঁদ রূপে আবির্ভাব হন। শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্তী শ্রীমৎ আউলচাঁদ এই আউল সমাজের প্রবর্তক। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবাই হ'লেন 'মনের মানুষ', 'সহজ মানুষ'। তাই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় হিন্দু গুরুর মুসলমান শিষ্য আবার মুসলমান গুরুর হিন্দু শিষ্য। গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাই আউলচাঁদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মসম্প্রদায় গুরুভজা বা কর্তাভজা সম্প্রদায় নামে খ্যাত।

নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার সীমান্তে অবস্থিত ঘোষপাড়া কর্তাভজা সম্প্রদায়ের অন্যতম তীর্থক্ষেত্র। কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন থেকে কল্যাণী শহর অতিক্রম করে মোটরবাস বা রিক্সায় এই গ্রামে পৌঁছান যায়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে আউলচাঁদ দেহরক্ষা করার পর তাঁর 'বাইশ' জন শিষ্যের মধ্যে ঘোষপাড়ার রামশরণ পাল "গুরুপদ" পান। গুরু রামশরণ পালের সহধর্মিণী কর্তাভজাদের কাছে "সতীমা" নামে খ্যাত হন। ভক্তদের বিশ্বাস, "সতীমা" পরমা প্রকৃতি যোগমায়া। তাই প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমাতে "সতীমার" উৎসব উপলক্ষে বঙ্গ ও বাংলাদেশের বাইরের থেকে লক্ষ লক্ষ ভক্ত এসে হাজির হন ঘোষপাড়ায়। এই বৎসরেও লক্ষাধিক লোক এসেছিলেন এই উৎসবে। বঙ্গ বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু যাত্রী এই উৎসবে যোগদান করতেন। কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক নানারকম বাধা-নিষেধের গণ্ডি অতিক্রম ক'রে তাঁদের অনেকেরই এই উৎসবে যোগদান করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার ভক্তদের মধ্যে যাঁরা বাস্তুত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে চ'লে এসেছেন তাঁরা তাঁদের ছন্নছাড়া জীবন নিয়ে এতই বিব্রত যে, উৎসব-আনন্দে যোগদানে ফুরসত নেই। ফলে, আগের তুলনায় এখন লোক সমাগম অনেক কম হয়।

উৎসবের দিন খুব সকালে আরম্ভ হয়—"দেবদোল"। তারপর আরম্ভ হয় ভক্ত ও দর্শকগণের মধ্যে "দোল খেলা"। তবে এখানকার দোল খেলায় গোলা রঙ ব্যবহার করা হয় না, কেবল মাত্র আবির, আর আতর নিয়েই দোলের মাতামাতি। হিন্দু মুসলমান, ছোট-বড় ভেদাভেদ নেই, সকলেই মনের মানুষ, সহজ মানুষ, প্রীতিভরে পরস্পরের অঙ্গে লেপন করেন 'ফাগ'। মনের মানুষের গায়ে ছিটিয়ে দেন আতর আর গোলাপ জল। স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে ঘোষপাড়া। তারপর এক সময় দোল খেলা শেষ হয়, উৎসবেরও যতি পড়ে। বহিরাগতেরা চলে যান যে যার গ্রামে, দেশে। কিন্তু ঘোষপাড়ার সাধারণ অধিবাসী ক্ষুব্ধ চিত্তে বহু দিন বহন করেন এই উৎসবের স্মৃতি—মনের মানুষের বিরহ ব্যথা।

ঘোষপাড়ায় কোন মন্দির বা মূর্তি নেই। কর্তা রামশরণ পালের আদি ভিটাটুকুই ভক্তজনের কাছে অতি পবিত্র স্থান বলে বিবেচিত। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমায় দলে দলে ভক্তরা এখানে আসেন 'সতীমা'র পুণ্যস্মৃতি স্মরণ করতে। এই ভিটায় ঢুকতে প্রথমেই দেখা যায় এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ; আর এই প্রাঙ্গণের এক ধারে একটা প্রাচীন ডালিম গাছ। শুনা যায়, এই ডালিম গাছের নীচেই সতীমা একদিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই থেকে ডালিম গাছটা আজও বিদ্যমান এবং ভক্তদের কাছে পবিত্র স্থান। এই গাছের নীচে সারাদিন একজন পূজারী বা সেবায়েত থাকেন। ভক্তগণ সতীমা-র উদ্দেশ্যে এই স্থানে পূজাদি দেন। সাধারণতঃ চিড়ে, মুড়কি, বাতাসা, কদমা ও চিনির মঠ দিয়ে পূজার নৈবেদ্য সাজান হয়। কেউ কেউ অবশ্য ক্ষেতের শাকসব্জী, লালপেড়ে কাপড়, চেলি অথবা নতুন গামছা দিয়ে থাকেন। মনের বাসনা কামনা জানিয়ে ভক্তগণ এই ডালিম গাছের ডালে ঢিল্ বা মাটির ঘোড়া সুতায় বেঁধে মানসিক জানিয়ে যান। মনস্কামনাপূর্ণ হলে নিজে হাতে ঐ বাঁধা ঢিল বা ঘোড়াকে বন্ধন মুক্ত করে মানসিক পূজা দেন। গাছটির ডালে দড়িতে ঝোলান অসংখ্য ঢিল বা ঐ জাতীয় বস্তু দেখ্‌তে পাওয়া যায়। ভক্তদের বিশ্বাস, 'সতীমা-র উদ্দেশ্যে ঐ ডালিম গাছের কাছে মানসিক

করলে অন্ধে দৃষ্টিশক্তি পায়, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করে এবং বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয়। সতীমা-র করুণা লাভে যাঁহারা উপকৃত হয়েছেন তাঁদের অনেকে আজও জীবিত আছেন বলে শুনা যায়।

উপরোক্ত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ঢুকতে বাঁ হাতে আর একটি প্রাঙ্গণ পাওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণের চারিদিকে পর পর কয়েকটি ঘরে রামশরণ ও তাঁহার পরবর্তী কর্তারা বাস করতেন। যিনি যে-ঘরে বাস করতেন, সেই ঘরে তাঁদের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যেমন, বিছানা, তোষক, বালিশ, খড়ম ইত্যাদি রক্ষিত আছে। আর আছে প্রত্যেক কর্তার একটি করে দেড়শ বড় তৈলচিত্র। এই ঘরগুলোরই এক ধারে সতীমা-র ঘর। ঘরের এক ধারে সতীমা-র বাঁধান সমাধি স্থান, অপর ধারে তাঁর ব্যবহৃত খাট-বিছানা ইত্যাদি সযত্নে সাজান।

উল্লিখিত এই ভিটার পেছনে "হিমসাগর" নামে একটি বৃহৎ দীঘি আছে। দীঘিটি বর্তমানে অগভীর এবং জলও খুব কম। তবে ভক্তরা মনে করেন, প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার দিন সতীমা-র কৃপায় "হিমসাগর" জলে পরিপূর্ণ হয়। সে যাইহোক, হিমসাগরের জল কিন্তু ভক্তদের কাছে গঙ্গার জলের মতই পবিত্র।

প্রতি বৎসর উৎসব উপলক্ষে একটি বিরাট আম বাগানের নীচে মোট প্রায় পনের-ষোল বিঘা জমির উপর সাত-আট দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি কতকটা দেবোত্তর এবং কতকটা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের।

আম বাগানের যে আম গাছগুলির নীচে মেলা বসে শোনা যায়, দুরাগত যে-সব যাত্রী প্রতি বৎসর বংশ পরাম্পরায় এই উৎসবে আসেন তাঁহারা বৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভের জন্য স্বহস্তে এক একজন এক একটি বৃক্ষ রোপন করে গেছেন। তাঁদের পরিবার-পরিজনেরা আজও উৎসবে এলে তাঁদের নিজ-নিজ নির্দিষ্ট বৃক্ষের নীচেই অবস্থান করেন এবং বৃক্ষের পূজা ও ঐ স্থানে রান্নাবান্না করে খাওয়া-দাওয়া করেন। কোন কারণে গাছটি নষ্ট হয়ে গেলে সেই স্থানে আবার নূতন চারা গাছ লাগান। এই ভাবেই আম বাগানের সৃষ্টি হয়েছে বলে শোনা যায়।

মেলায় প্রায় সাড়ে তিনশ'র থেকে চারশ' দোকান-পাট বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ। রানাঘাট, চাকদহ, কৃষ্ণনগর, নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, হালিশহর, ব্যারাকপুর, কলিকাতা এবং বাংলার বাইরে বিহার সীমান্ত থেকে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। প্রায় অর্ধেক দোকানপাট খোলা জায়গায় বসে এবং অন্যান্যগুলির জন্য অস্থায়ী ঘর তৈয়ারী করে নেওয়া হয়। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি নানাবিধ খাবার, মনিহারী, জামা কাপড়, জুতো, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, প্লাষ্টিক ও মাটির খেলনা-পুতুল, তামা-পিতল ও পাথরের বাসনপত্র প্রভৃতি আমদানী হয়। এ ভিন্ন পূজার ডালার দোকান, বই ছবির দোকান, হাকিমী ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান, ফটো তোলার ষ্টুডিও, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাদুর এবং চা-পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য তিন-চারিটি সার্কাসদল, নাগরদোলা চরকী প্রভৃতি আসে। এবৎসর "মিনাক্ষী সার্কাস" নামে একটি বড় সার্কাসের দল এবং জন্তু-জানোয়ারের একটা সুন্দর প্রদর্শনীও দেখলাম।

[ঘোষপাড়ার সতীমা-র মেলা সম্পর্কে "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" বাংলা ২৫শে ফাল্গুন ১৩৬৭ সনে বিশেষ প্রতিনিধি কর্তৃক লিখিত একটি বিবরণী প্রকাশিত হয়। নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল।]

হিমসাগরে স্নান করলে বোবাতেও কথা বলে, দৃষ্টিহীন দৃষ্টি ফিরে পায়, বন্ধ্যা নারী মা হয়। চোখের সামনেই দেখলাম এক বোবার মুখে কথা ফোটানোর চেষ্টা। তার বিশদ বর্ণনা দিতে চাইনে। দণ্ডী কাটতে কাটতে অতঃপর মন্দির পর্যন্ত যাওয়া। ঘোষপাড়ার সতীমায়ের মন্দির। একে ঘিরেই বসেছিল দোলের মেলা।

দোলের আগের দিন দেখেছি শেয়ালদা থেকে কল্যাণীমুখী প্রত্যেকটি ট্রেনেই অসম্ভব ভীড়। তীর্থযাত্রী এঁরা। নামবেন কল্যাণী স্টেশনে। সেখান থেকে

বাসে ঘোষপাড়া। যাত্রীরা বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর থেকে আসেন হেঁটে, নৌকায়, গরুগাড়িতে, মোটরে, বাসে, ট্রেনে। মেলা বসে আম আর লিচুবাগানে। ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা হয়, মন্দিরের কলি ফেরে। মন্দিরের ভিতরে সতীমা আর তাঁর স্বামীর পালঙ্কে বিছানো হয় নতুন শয্যা। সতীমার সমাধিস্থানে আছে ডালিম গাছ। সিমেণ্ট এবং রেলিংয়ে ঘেরা। তাকে ঘিরে 'হত্যে' দিয়ে পড়ে আছেন অজস্র নরনারী। ডালিম গাছে ঢিল-বাঁধা, গোড়ায় পয়সা, শাড়ি আর পূজোর অর্ঘ্য।

মন্দির থেকে কয়েকশো গজ দূরে হিমসাগর। ছোট্ট এক পুকুর, বাঁধানো ঘাট।

এখানে স্নান করলে কি হয় তা আগেই বলেছি। সতীমার মন্দির অর্থাৎ 'কর্তামার সমাজ-গৃহ' দেখতে হবে জানালার মধ্য দিয়ে। জানলার গরাদেও ঢিলবাঁধা। ভিতরে সতীমার বিছানা আর একটি বেদী। মন্দিরের সামনে চত্বর তার দুপাশে ঘর। ঘরে ঘরে শয্যা বিছানো। মার শিষ্যদের শয্যা। ভক্তরা দর্শন করে পয়সা দিচ্ছেন। এ মেলার আকর্ষণ,—অবশ্য শুধুই দর্শকের কাছে—এই ভক্তবৃন্দ, যাঁরা দূর দূরান্ত থেকে অশেষ শ্রমকে শিরোধার্য করে এখানে আসেন, চার-পাঁচ দিন উপবাসে হত্যে দিয়ে থাকেন, শুধু গোরাচাঁদের গোরা-রূপ একবার মাত্র দেখবার জন্য। হয়তো দেখা না পেয়ে আত্মধিক্কার দিতে দিতে সিমেণ্টের সিঁড়িতে মাথা-কুটে রক্তারক্তি করে ফেলবেন। কেউ বাধা দেবে না। ভক্তের এই আকুতি, তা দেখাও তো পুণ্যের!

ঘোষপাড়া বৈষ্ণবতীর্থ। বিশেষ করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের কাছে তো মহাতীর্থ।

গুরুসত্য মন্ত্রের প্রবর্তক আউলচাঁদ এখানেই আত্মপ্রকাশ করেন। প্রবাদ যে, এই আউলচাঁদই পুরীধামে অন্তর্হিত শ্রীচৈতন্যদেব। শুধু বৈষ্ণবই নয় আউল, বাউল, ফকিররাও আসেন। ত্রিশূলধারী ভৈরব-ভৈরবীও আসেন, কেননা মন্দিরে কালিকা মূর্তিরও চিত্রপট আছে।

যেখানে আউল-বাউল সেখানে গান হবে না—একথা ভাবাই যায় না। লিচু আর আমবাগানের তলায় ছোট ছোট আসর। কয়েকটি মাত্র মানুষ। টিমটিমে হ্যারিকেন নয়তো চাঁদের আলোতেই শ্রোতা এবং গায়ক আবছা হয়ে ফুটিয়ে তুলছে সুর, ভক্তের উদ্দেশে বিনীত অনুরোধে বলছে:

ওরে সাধুর সঙ্গে প্রেমতরঙ্গে
প্রেমেতে মুড়াও মাথা।
গুরু কল্পতরু জড়িয়ে ধর্
ওরে ভক্তিলতা॥
বিশ্বাসের আগরা দিয়ে
ধর তারে পাগরাইয়ে।
কু-বাতাসের দম্কা লেগে ভাঙে না যেন
লতার মাথা॥

এক জায়গায় বসেই যে সব গান শুনতে হবে এমন কোন কথা নেই। ঘুরতে ঘুরতে বসলাম মাঝদিয়ার নন্দলাল ক্ষ্যাপার পাশটিতে। তখন তিনি গাইছেন:

তিন মেয়ে গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী।
ওদের মাসে মাসে জোয়ার আসে
ত্রিবেণী সজ্ঘাতি॥
নদী যখন হয় উতলা
তাতে হবে ভাবের খেলা
একটা সাদা একটা কালো
একটা লাল মোতি॥
রসিক মেয়ে গোপন থেকে
গোপনেতে জগৎ দেখে
ঘরে বসে ধর্ম করে রেখে উপপতি।

এ গানের অর্থ করা আমার পক্ষে অসাধ্য। কেননা গূঢ় রহস্য সমাধানের চাবিকাঠিটি আমার অজানা। কিন্তু বাউলের কণ্ঠস্বর বা প্রকাশের আবেগ বুঝতে যা দরকার তা সকলেরই আছে। তাই দিয়ে বলা যায়, এ বাউল সুরের বাউল, গানের বাউল।

বসেই নাম জিজ্ঞাসা করলাম। সবিনয়ে জবাব দিলেন, "গুরুর কৃপায় জগদানন্দ দাস বৈরাগ্য। নিবাস সাতগাছিয়া, মেমারী।" বললাম একটা গান শুনি। খুশি মনেই বৈরাগী সুর ধরলেন:

"কামিনী কালনাগিণী ফণিনীর বিষম বিষ
যার নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ড শোষে না জেনে
কেন হস্ত দিস্।"

গান শেষে আফশোষ করলেন। তাঁর দোহাররা এখনো এসে পৌছয়নি, নয় তো গান আরো ভাল হ'ত।

কিন্তু শুধুই বাউল, দেবতত্ত্ব মনঃশিক্ষা, ভজন, কীর্তন ইত্যাদি এখানে গাওয়া হয়, তা ভাবলেও ভুল করা হবে। অতি সাবধানে, অন্ধকারে শোয়া মানুষগুলিকে পাশ কাটিয়ে এগোতে এগোতে এই আসরটিতেও পৌছে গেলাম।

সিঙ্গেল রীডের হারমোনিয়ামের উপরে কার্বাইডের বাতি। গায়ক প্রাণপণে গাইছেন, "মেঘ মেদুর বরষায় কোথা তুমি।" আকাশে তখন ফুটফুটে জ্যোছনা।

মেলার বর্ণনা দেওয়া বোধ হয় অনাবশ্যক, কেননা যেসব পণ্যদ্রব্য বাইরের লোককে আকর্ষণ করবে উল্লেখযোগ্যভাবেই এ মেলায় তা অনুপস্থিত। সে জিনিস হল স্থানীয় সংস্কৃতির রূপবৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার মত শিল্পকাজ। নৈহাটীর কাছে গঙ্গার ধারের এই কল-কারখানার এলাকায়, হাতের কাজের নমুনার মধ্যে চোখে পড়ল মাদুর আর ধামা, চুপড়ি। নয়তো অনেকগুলোই মেসিনের তৈরী জিনিস। কিন্তু তাই বলে কেনাকাটার কমতি নেই।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার দল কমে আসেন, গায়ক শ্রান্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু বাউলের মেলায় মানুষ আসার সংখ্যা ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে। সারারাত ধরেই মানুষ আসতে থাকেন, কেননা ভোর হওয়া মাত্রই দোল। ঘোষপাড়ার দোল। জলরঙ নয়, আবীরে আবীরে রাঙা হবার দিন।

আমাদের সংবাদদাতা শ্রীসমীরেন্দ্র নাথ সিংহরায় মহাশয়ের "আমাদের গ্রাম" নামক পুস্তিকা হইতে ঘোষপাড়ার সতীমা-র উৎসব সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী উদ্ধৃত করা হইল:—

ঘোষপাড়া গ্রাম হিসাবে নদীয়ার একটি পবিত্র তীর্থস্থান। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রধান কেন্দ্র এই ঘোষপাড়া।

ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার আগের দিন এখানে উৎসব শুরু হয় এবং সারারাত্রি উৎসব চলতে থাকে। পরদিন অর্থাৎ দোলের দিন ঐ উৎসব শেষ হয় এবং প্রসাদ বিতরণ করা হয়। কর্তাভজা দলের অনুগামীরা ও ভক্তরা নানা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হ'য়ে কীর্তন করতে থাকে। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে এক বিরাট মেলা হয়। সেই মেলাই ঘোষপাড়ার মেলা বলে প্রসিদ্ধ এবং মেলার জন্যই ঘোষপাড়া পরিচিত। এই স্থানটির একটি মাহাত্ম্য ও ইতিহাস আছে।

প্রবাদ যে ১৬১৬ শকাব্দের ফাল্গুনমাসে (১৬৯৪ খৃঃ) একদিন বর্তমান বীরনগর স্টেশনের নিকটবর্তী উলা গ্রামের মহাদেব নামে এক ব্যক্তি তাঁর পানের বরজে একটি সুন্দর শিশু দেখতে পান। মহাদেব ছেলেটিকে লালনপালন ক'রে হরিহর নামক জনৈক বৈষ্ণবের নিকট তার শিক্ষালাভের ও ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নের ব্যবস্থা করেন। বালকটির নাম রাখেন পূর্ণচন্দ্র। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণচন্দ্র ফুলিয়া গ্রামে বলরাম দাসের নিকট বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হন। পরে নানা জায়গায় শিক্ষালাভ ক'রে সাধনার সিদ্ধিলাভ ক'রে দেশে ফিরে যান। সেই সময় তিনি আউলচাঁদ নামে পরিচিত হন। বাবা আউলচাঁদ সম্বন্ধে এই সম্প্রদায়ের একটি চলতি গান আছে—

"এ ভাবের মানুষ কোথা হইতে এলো।
এর নাহিক রোষ, সদাই তোষ,
মুখে বলে সত্য বল॥
এর সঙ্গে বাইশ জন, সবার একমন,
জয় কর্তা বলি,
বাহু তুলি করলে প্রেমে ঢল ঢল।
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়,
এবু হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥

আউলচাঁদ যে ধর্মপ্রচার করলেন তার সারমর্ম এই যে, ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা এবং গুরুই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। গুরু বা কর্তার অলৌকিক শক্তিতে এই সম্প্রদায়ের অগাধ বিশ্বাস। দলের লোক ব্রাহ্মণ হউক, খৃষ্টান হউক, মুসলমান হউক—গুরু বা দলের কর্তার প্রতি এত অনুরক্ত যে তাঁর কথায় প্রাণ দিতেও পারে। গুরুকে এরা এইভাবে

ভজন করে বলে এই সম্প্রদায়ের নাম গুরুভজা বা কর্ত্তা-ভজার দল। এই সম্প্রদায়কে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটি শাখাও বলা যেতে পারে। সাধনক্ষেত্রে জাতিভেদ প্রথা এঁদের নেই, তবে ব্যবহারিক জীবনে এঁরা জাতিভেদ মেনে চলেন। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের নেতা বাবা আউল চাঁদ ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে চাকদহ হ'তে ছয় মাইল পশ্চিমে গরনী গ্রামে স্বর্গগত হন। আউল চাঁদের ২২জন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ পাল, নিতাই ঘোষ প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য। রামশরণ পালই গদির অধিকারী হন ও গুরুপদ প্রাপ্ত হন। রামশরণের স্ত্রীকে শিষ্যগণ "সতীমা" নামে অভিহিত করতেন। তাঁর সমাধি মন্দির দেখবার জন্য আজিও শিষ্য শিষ্যারা ও জনসাধারণ প্রত্যেক বৎসর ভীড় করেন ঘোষপাড়ার সেই পবিত্র স্থানে। সতীমা যে ডালিম গাছ তলায় সিদ্ধিলাভ করে ছিলেন তাহা একটি পবিত্র স্থান। পুরাতন সেই গাছটি থেকে যে গাছ হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে শত শত ভক্তবৃন্দ আজও দণ্ডি খাটেন। গাছের ডালে চারিধারে ইঁট ঝুলছে। প্রবাদ যে—যে যা মনে করে গাছে ঢিল বাঁধবে তাঁর সেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এখানে 'হিমসাগর' নামে যে দীঘি আছে তার সম্বন্ধে প্রবাদ যে—প্রাচীনকালে এক অন্ধ এই দীঘির জল চোখে দিয়ে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। সেই হ'তে আজও লোকের বিশ্বাস এই দীঘির জলে স্নান করলে ব্যাধিমুক্ত হওয়া যাবে।

দোল পূর্ণিমা ছাড়া রথযাত্রার সময়েও এখানে খুব ধুমধাম হয়। তবে দোল পূর্ণিমার মেলাই বড় এবং পূর্বে মাসাধিক-কাল থাকত ও লোকসমাগম হ'ত প্রায় ছই লক্ষের ওপর।

কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হ'তে ঘোষপাড়ায় যাবার রাস্তা ও যানবাহনের সুব্যবস্থাই আছে কিন্তু প্রধান অভাব যাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা ও পানীয় জলের। যদিও মেলার কর্তৃপক্ষরা নদীয়া জেলাবোর্ডের সহযোগিতায় জলের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন তবুও সে ব্যবস্থা অপ্রচুর।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কামালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত একমাসব্যাপী সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি আড়াইশত হইতে তিনশত বৎসরের প্রাচীন। বর্তমান সেবায়েত এই গ্রাম নিবাসী শ্রীকালি কুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের অষ্টম পূর্ব পুরুষ ৺রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতি মহাশয় দেবতার প্রত্যাদেশ পাইয়া এই গ্রামে শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি এই মন্দিরে নিয়মিত নিত্য শিবপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব চলিয়া আসিতেছে। উৎসবটি ব্যক্তি বিশেষের হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

উৎসব উপলক্ষে কেহ কেহ ১লা চৈত্র হইতে উত্তরীয় গলায় ধারণ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং সারা মাসব্যাপী ব্রহ্মচর্য ও সংযম পালন করিয়া শিব পূজা করিয়া থাকেন। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন মহাসমারোহে নীলপূজা এবং সংক্রান্তি তিথিতে সাড়ম্বরে চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ-কারীরা শবদাহের অর্দ্ধ দগ্ধ কাঠ আনিয়া তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া অঙ্গার তৈয়ারী করেন এবং প্রথমে মূল সন্ন্যাসী ঐ জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইয়া শিবমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার অঞ্জলি দেন। ইহার পর অন্যান্য সন্ন্যাসীরাও অনুরূপ অঞ্জলি দিয়া থাকেন।

উৎসব শেষে "ফুল কাড়ান" অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে একটি নব-নির্মিত পবিত্র মৃত্তিকা বেদীর উপর শিব মূর্তি স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত যথারীতি পূজার পর শিবের মস্তকে ফুল-বিল্বপত্র চাপান। ঐ বিল্বপত্রাদি শিবলিঙ্গের উপর হইতে আপনা আপনি নীচে পড়িয়া গেলে পর পূজা সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত বিল্বপত্রাদি না পড়ে ততক্ষণ পর্যন্ত পুরোহিত একাগ্র মনে শিবের স্তব করিতে থাকেন এবং ভক্ত সন্ন্যাসীরা উচ্চস্বরে শিবের জয়ধ্বনি দিতে থাকেন।

দোলযাত্রা

যশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় রাধা-গোবিন্দের দোলযাত্রা উৎসবটি বেশ জাঁকজমকপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় জগন্নাথদেবের মন্দিরে রাধাগোবিন্দ

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধাগোবিন্দ জীউর নিত্য পূজা হয় এবং উৎসবটি এই অঞ্চলের হিন্দুদিগের সর্বজনীন উৎসব। জনশ্রুতি আছে, এই তিথিতে দোলমঞ্চে রাধাগোবিন্দ দর্শনে ইহ বা পরজন্মে কষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ফাল্গুন পূর্ণিমায় রাধাগোবিন্দ জীউর অধিবাস ও যথারীতি পূজার পর পরদিন কৃষ্ণ প্রতিপদ তিথিতে জগন্নাথ বিগ্রহ মন্দির হইতে শোভা যাত্রা সহকারে প্রসিদ্ধ দোলমঞ্চে আনিয়া স্থাপন করা হয় এবং এই স্থানে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহকে পুষ্পমাল্যে দ্বারা সজ্জিত করিয়া বিগ্রহের অঙ্গে আবির লেপন করা হয়। তারপর আরম্ভ হয় ভক্তগণের মধ্যে রং ও আবিরের খেলা। উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

ধর্মরাজপূজা

ঘেটুগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ শনিবার ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন। গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের একটি মন্দির আছে। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পাথরখণ্ডকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করা হয়।

এই গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা ও পূজা প্রচলন সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে বীরু পণ্ডিত নামে জনৈক চাষী পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটবর্তী "রাজার পুকুর" নামে একটি পুষ্করিণীতে জল পান করিতে গিয়া যতবারই অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলেন ততবারই তাঁহার অঞ্জলিতে কয়েকটি পাথরখণ্ড উঠিতে থাকে। সেইদিনই তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়—"আমি ধর্মরাজ, আমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার ব্যবস্থা কর।" বীরু পণ্ডিত স্বপ্নে পূজা-পদ্ধতি ও মন্ত্র জানিতে পারেন। পরের দিন প্রভাতে তিনি "রাজার পুকুর" হইতে ধর্মরাজ শিলা ও একটি সিংহাসন উদ্ধার করেন এবং ধর্মরাজ ঠাকুরে মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজাদির ব্যবস্থা করেন। তদবধি এই গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের নিত্য পূজা ও বার্ষিক উৎসব পালন করা হইতেছে। বর্তমানে উক্ত বীরু পণ্ডিতের আত্মীয়া নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক বৃদ্ধা মহিলা ধর্মরাজ ঠাকুরের সেবায়েত। উৎসব উপলক্ষে সর্ব শ্রেণীর লোক যোগদান করিয়া থাকেন।

রথযাত্রা

নেউলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা ও সপ্তাহকাল পরে পুনঃযাত্রা উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে জগন্নাথ ও রাধাবল্লভ বিগ্রহ এবং একটি পাথরের বিষ্ণু মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যপূজা ব্যতীত এই মন্দিরে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে যথারীতি উল্লিখিত বিগ্রহাদির পূজা ও রথটানা হইয়া থাকে।

এই উৎসবটি যে কতকালে প্রাচীন তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। তবে লোক মুখে শোনা যায় যে, একদা কৃষ্ণনগরের মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র পাল্কীতে করিয়া শ্রীনগর গ্রামে যাইবার পথে দারুণ ঝড়-বৃষ্টির সম্মুখীন হন এবং উপায়ান্তর না দেখিয়া বর্তমান নেউলিয়া ও বিষ্ণুপুর গ্রামের উত্তর দিকে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের জীর্ণ কুঠিরে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সময় প্রসঙ্গক্রমে তিনি জানিতে পারেন যে, ঐ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অতিকষ্টে তাঁহার আরাধ্য দেবতা জগন্নাথদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তখন তিনি জগন্নাথ-দেবের যথাবিহিত সেবা-পূজার নিমিত্তে চুয়াডাঙা, জগন্নাথপুর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে বহু জমি দেবোত্তর স্বরূপ উক্ত ব্রাহ্মণকে দান করেন। প্রকাশ বাংলা ১১৬৫ সনের ১৭ই মাঘ তারিখে মহারাজ দেবোত্তর সম্পত্তি দানপত্র করেন এবং তদবধি সাড়ম্বরেই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব পালন করা হইতেছে। চাকদহ থানার মধ্যে এই গ্রামের রথযাত্রা উৎসবটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। একটি ছড়া আছে—

"কপাল ছাড়া পথ নাই,
নেউলে ছাড়া রথ নাই।"

রাজরাজেশ্বরী পূজা

কালিগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে খুব ধুমধামের সহিত রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলা ১২৯৩ সনে স্থানীয় জমিদার কালিপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয় কালিগঞ্জ বাজারে রাজরাজেশ্বরীর মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তদবধি নিয়মিতভাবে দেবীর পূজা হইতেছে।

রাজরাজেশ্বরী দেবী যোগনিদ্রায় শায়িত মহাদেবের নাভি হইতে উত্থিত একটি মৃণালের অগ্রভাগে প্রস্ফুটিত সহস্রদল পদ্মের উপর উপবিষ্টা। দেবীর বহু হস্ত এবং দক্ষিণে গঙ্গা, বামে যমুনা এবং নিম্নে বেদীর উপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং ইন্দ্র যুক্তকরে দেবী বন্দনায় রত। রাজরাজেশ্বরী দেবীর ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী এইরূপ সুন্দর মূর্তি বাংলা দেশে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

তিনদিনব্যাপী উৎসবে বহুদূর হইতে বহুযাত্রী দেবীদর্শন করিতে ও পূজাদি দিতে আসেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং একটি কমিটি কর্তৃক উৎসব পরিচালিত হয়। দেবীর বর্তমান পূজারী জীবননগর নিবাসী শ্রীসুরেশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং সহকারী পূজারী শিমুরালি নিবাসী শ্রীভদ্রেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায়।

শিবরাত্রি

প্রতি বৎসর ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে যশড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত বাণেশ্বর শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া শিবরাত্রি ব্রত পালন ও শিবের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শুনা যায়, বাণেশ্বর শিব পূর্বে জনৈক গ্রামবাসীর ব্যক্তিগত গৃহ দেবতা হিসাবে পূজিত হইতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে ইনি গ্রামের সর্বসাধারণের দেবতা হিসাবে যথারীতি পূজা পাইয়া আসিতেছেন। পূর্বে এই শিবলিঙ্গটি একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যদিও এখন উক্ত মন্দিরের কোন চিহ্ন নাই। নিত্যপূজা ছাড়া মহাসমারোহে পূজা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা-চতুর্দ্দশীতে। এই দিনের রাত্রিকালে দুধ, দধি, ঘৃত ও মধুর দ্বারা চারিপ্রহরব্যাপী পূজা-অর্চনা হইয়া থাকে। শিবের নিকট মানত হিসাবে গাঁজা দেওয়া হয়। পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবটি মাঝে কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল। সম্প্রতি স্থানীয় জনৈক গ্রামবাসী শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পূজাটির পুনরায় চালু করেন। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

স্নানযাত্রা

শ্রীপাট যশড়াধামে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব বাংলা দেশের মধ্যে এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য উৎসব বলিয়া বিদিত। ইহা পরম বৈষ্ণব জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট এবং বৈষ্ণবদিগের মহাতীর্থস্থান রূপে খ্যাত। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিনে রাত্রিকালে যথারীতি পূজা ও অধিবাস পর্ব এবং পরদিন পৌর্ণমাসীতে সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি মাত্র একদিন স্থায়ী হইলেও ইহার আনুসাঙ্গিক ক্রিয়াকর্ম ও প্রস্তুতি পর্ব প্রায় মাসাধিক কাল পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। উৎসবের কয়েকদিন পূর্ব হইতেই বর্ধমান, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা এবং নদীয়া হইতে হাজার হাজার নরনারী আসিয়া সমবেত হইতে থাকেন। কেবল মাত্র বাংলাদেশ নহে, ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রী আসিতে দেখা যায়। তাঁহাদের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত বহু সাধু-সন্ন্যাসীর বেশ সমাগম হয়। উৎসব সমাপ্তির পর আরও দুই-একদিন ধরিয়া ভক্ত নরনারী জগন্নাথদেবের নামকীর্তন ও লীলা কাহিনী গাহিয়া উৎসব স্থানটিকে মুখরিত করিয়া রাখেন। উৎসব উপলক্ষে কোন অতিরিক্ত যানবাহনের ব্যবস্থা না থাকায় পূর্বদিন রাত্রি হইতে অগণিত নরনারী দল বাঁধিয়া মাথায় হাঁড়িকুড়ি, চাল-ডাল, আলু-পটল এমন কি, জ্বালানীর কাঠ পর্যন্ত লইয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আসিয়া হাজির হন। উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হয়, যদিও ইহার সঠিক সময়কাল সম্পর্কে তেমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। অনেকের ধারণা জগদীশ পণ্ডিত জগন্নাথদেবের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই উৎসবটির প্রচলন করেন। কেহ কেহ এরূপ মতও পোষণ করেন যে, কৃষ্ণনগরাধিপতি কর্তৃক জগন্নাথদেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার পর হইতে উৎসবের সূত্রপাত হয়। তবে খুব সম্ভবতঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতেই মন্দিরটি নির্মিত হয়। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহের মাহাত্ম্য সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

জগন্নাথদেবের বিগ্রহ ও তাঁহার মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শ্রীজ্যোতিন্দ্র নাথ বসু কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "শ্রীশ্রী৺জগদীশ পণ্ডিত কর্তৃক শ্রীশ্রী৺জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা ও তৎসহ শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের লীলা কাহিনী" পুস্তিকায় নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :—

"কলিকালের বিষয়াসক্ত জীবের অধোগতি আলোচনা করিয়া, কিসে মায়া-মোহবিষ্ট জীব উদ্ধার পাইবে ও কি উপায়ে অজ্ঞানান্ধ জীব শ্রীবিষ্ণু ভক্ত হইয়া তাঁহার প্রসাদে ভববন্ধন মুক্ত হইবে এই চিন্তায় কাতর হইয়া, পণ্ডিত জগদীশ মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের শরণাপন্ন হন। তৎকালে হিন্দুরাজ প্রাধান্য না থাকায়, উত্তরভাগ রামানন্দ, মধ্যভাগ কবীর ও পূর্বভাগ গৌরাঙ্গদেব বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার মানসে সন্ন্যাসীদিগের দ্বারা সাধারণের নিকট ধর্ম্ম মাহাত্ম্য প্রচার করিতেছিলেন। গৌরাঙ্গদেব পণ্ডিত জগদীশকে নীলাচলে (শ্রীক্ষেত্রে) যাইতে আদেশ করেন। তিনি তথায় গমন পূর্বক নামসংকীর্তনাদির দ্বারা হিন্দু ধর্ম প্রচার করিতে থাকেন। একদা তিনি জগন্নাথদেবের ধ্যানে নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী ভগবান, তাঁহাকে দর্শন দানে কৃতার্থ করিয়া বর লইতে আজ্ঞা করেন। পবিত্রচেতা পণ্ডিত জগদীশ এই ভিক্ষা করেন যে, তিনি যেন নীলাচল হইতে তাঁহার এক পূর্ণ কলেবর লইয়া গিয়া পতিতপাবনী সুরধনীর তীরে কোন পবিত্র স্থানে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হন। জগন্নাথদেব ভক্তের এই সাধু সংকল্পে প্রীত হইয়া তাঁহাকে কহেন, 'হে ভক্ত প্রধান! তুমি আমারই অংশ, কলিযুগে পরম ভক্তরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ মাত্র; অতএব তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক, কিন্তু স্মরণ রাখিও তুমি আমাকে লইয়া যাইবার কালীন তোমার মনোনীত স্থান ব্যতীত কোথাও আমাকে নামাইতে পারিবে না, যদি নামাও আমি সে স্থান হইতে আর উঠিব না।' জগদীশ কহিলেন 'আমি তাহাই করিব, কিন্তু প্রভু তোমার এই বৃহৎ মূর্তি আমি কিরূপে লইয়া যাইব?' জগন্নাথদেব কহিলেন, 'তুমি রাজ সকাশে তোমার অভিপ্রায় জানাইলে অনুমতি পাইবে এবং যেস্থানে আমার পূর্ণ কলেবর সকল আছে, তন্মধ্যে দেখিতে পাইবে তোমার নিমিত্ত আমি ক্ষুদ্র পুত্তলিকা অবস্থায় আছি, তুমি স্কন্ধে করতঃ লইয়া যাইবে।' পরদিন প্রাতে পণ্ডিত জগদীশ রাজ সকাশে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন এবং নৃপতি সন্তুষ্ট হইয়া অনুমতি প্রদান করিলেন।........ কিছুদিন গতে একদা মধ্যাহ্নে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি থানা চাকদহের এলাকাধীন ভাগীরথী তীরস্থ (দুঃখের বিষয় ভাগীরথী এক্ষণে এস্থান হইতে অর্ধক্রোশ সরিয়া গিয়াছে) যশড়া গ্রামে একটি ছোট বটবৃক্ষতলে (ঐ বটবৃক্ষ এখনও বর্তমান আছে এবং ঐ বৃক্ষতলে ভগবান দাস বাবাজী আসিয়া কিছুকাল সাধনা করিয়াছিলেন) উপস্থিত হইলে তিনি অত্যন্ত প্রস্রাব পীড়ায় কাতর হইলেন এবং অত্যন্ত দুঃখিত ও ভীত হইয়া চিন্তা করিতেছেন সেই সময়ে দেখিলেন এক প্রৌঢ় বয়স্ক ব্রাহ্মণ গঙ্গাস্নান করিয়া তীরে উঠিতেছেন, তখন পণ্ডিত জগদীশ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন মহাশয় আমার অত্যন্ত প্রস্রাব পীড়া উপস্থিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া এই যষ্ঠীসহ ঝোলাটি রক্ষা করুন, যেন মৃত্তিকায় নামাইবেন না।..................... (পণ্ডিত জগদীশ যে যষ্ঠীর সাহায্যে জগন্নাথ বিগ্রহ বহন করিয়া আনিয়াছিলেন উহা অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, কীটে উহাকে জর্জ্জরীভূত করিয়াছে শুনিতে পাওয়া যায় পূর্বে ঐ যষ্ঠী হ্রাসবৃদ্ধি হইত। বর্তমানে উহা প্রায় ৬ হাত দীর্ঘ হইবে)। পণ্ডিত জগদীশ যেমন একটু দূরে যাইয়া প্রস্রাব ত্যাগ করিতে বসিয়াছেন সেই সময়ে ঐ ব্রাহ্মণ 'বড়ই ভারি আর রাখিতে পারিলাম না' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং ঝোলা নামাইয়া ফেলিলেন ও পশ্চাদ ফিরিয়া দেখিলেন, এক বৃহৎ জগন্নাথ মূর্তি। তাহা দৃষ্টে ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত, নির্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পণ্ডিত জগদীশ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন প্রভু নিজ কলেবর ধারণ করিয়াছেন, কিছুই মীমাংসা করিতে না পারিয়া মূর্তিটিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে প্রভু অত্যন্ত ভারশীল হইয়াছেন। পরে উভয়ে একবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বিফল মনোরথ হইয়া ব্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। এ সংবাদ ক্রমশঃ নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িল। পণ্ডিত জগদীশ ধ্যানস্থ হইয়া জানিতে

পারিলেন প্রভু এখান হইতে আর উঠিলেন না। অগত্যা পণ্ডিত জগদীশ ঐ বটবৃক্ষতলে একটি ছোট পত্র কুটীর নির্মাণ করিয়া, বিগ্রহ রক্ষা করতঃ পূজাদি করিতে লাগিলেন। এই সংবাদ ক্রমশঃ ঐ স্থানের মালিক কৃষ্ণনগরাধিপতির কর্ণগোচর হইল যে, এক সাধু ব্রাহ্মণ কোথা হইতে এক জগন্নাথ বিগ্রহ মূর্তি আনিয়া তাঁহার ভূমি দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহা শ্রবণে নৃপতি তাঁহার দেওয়ানকে তথ্য সংগ্রহ ও বিগ্রহ সহ সাধু ব্রাহ্মণকে স্থানান্তরিত করিবার জন্য যশড়ায় পাঠাইলেন।............ এমন কি নৃপতি অধৈর্য হইয়া স্বয়ং ঐ বিগ্রহকে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না।............ তখন নৃপতি পণ্ডিত জগদীশের পদপ্রান্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন............। তৎপরে নৃপতি ঐ বিগ্রহের নিমিত্ত ঠাকুরবাটী নির্মাণের ব্যবস্থা করিলেন এবং প্রচুর নিষ্কর ভূমি বিগ্রহের সেবার জন্য দান করিয়া প্রস্থান করিলেন। (বর্তমানে ঐ ঠাকুরবাটীর অবস্থা শোচনীয় এবং ভূমি আদিও সামান্য পাওয়া যায়—অন্যান্য ভূমির সন্ধান পাওয়া যায় না)"............

এই সুপ্রাচীন প্রসিদ্ধ মন্দিরের মধ্যে জগন্নাথদেবের সিংহাসনের পার্শ্বে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের কাষ্ঠ নির্মিত একটি মূর্তিও বিদ্যমান। এই সম্বন্ধে শ্রীজ্যোতিন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের পুস্তিকায় উল্লিখিত হইয়াছে যে :—

"মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপ লীলা শেষ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প করিলেন এবং শচীদেবীর ও ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার ও অন্যান্য ভক্তগণের নিকট অনুমতি গ্রহণান্তর পণ্ডিত জগদীশ ও তাঁহার ভার্য্যা দুঃখিনীর অনুমতি গ্রহণের জন্য যশড়ায় উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব পণ্ডিত জগদীশ আনীত শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ দর্শন করিয়া পরম সন্তোষ লাভ করিলেন এবং পণ্ডিত জগদীশকে কহিলেন পণ্ডিত তুমি এইস্থানে থাকহ আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের আজ্ঞা দেহ আমি নীলাচলে যাইয়া অবস্থান করি।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব তাঁহার মাকে বলিলেন—দুঃখিনী মা তুমি স্থির হও, আমি কিছুদিন পরে পুনরায় এখানে আসিব। এক্ষণে আমি চলিয়া যাওয়ার পর দুই চারিদিন পরে একদা প্রাতে তুমি ঠাকুর গৃহ খুলিবার কালীন এক খণ্ড কাষ্ঠ দেখিতে পাইবে ও ঐ কাষ্ঠখানি যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। কিছুদিন পরে উত্তরাঞ্চল হইতে এক ভাস্কর ব্রাহ্মণ আসিয়া নিজ পরিচয় দিবে এবং তুমি তাঁহাকে প্রসাদ ভুঞ্জাইয়া যে কাষ্ঠখানি পাইবে সেই কাষ্ঠখানি তাঁহাকে দিবে এবং আমার বাল্যের একটি মূর্তি নির্ম্মাণ করিয়া দিতে আজ্ঞা করিবে।"

ইহা যথার্থই ঘটিয়াছিল এবং মহাপ্রভুর বাণী অনুযায়ী এক দিন ব্রাহ্মণ ভাস্কর আসিলেন এবং গৌরাঙ্গদেবের মূর্তিটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই মূর্তিটি দুঃখিনী মা জগন্নাথদেবের সিংহাসনের এক পার্শ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। কিছুদিন গত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার কয়েকজন ভক্তগণসহ পুনরায় যশড়ায় আসিয়াছিলেন।

উক্ত গৌরগোপাল মূর্তি আজিও বিদ্যমান রহিয়াছেন এবং তাঁহার যথারীতি ভোগ পূজাদি হইয়া আসিতেছে। এই জগন্নাথ মন্দিরও তাঁহার স্নানযাত্রা উৎসবের সহিত নানা ঐতিহ্যময় ঘটনা জড়িত আছে। কোন একদিন পণ্ডিত জগদীশ কর্তৃক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শীতলভোগ দিবার কালীন তাঁহার পুত্রত্রয় কর্তৃক এক অসঙ্গত কারণবশতঃ জগদীশ পণ্ডিত ব্যাকুল হন এবং নিজেকে নিঃসন্তান হইবার বাসনা হইতে যখন কিছুতে ক্ষান্ত হইতে চাহিলেন না তখন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব পুত্রত্রয়কে নিজের অঙ্গের সহিত মিশাইয়া লন। ইহাই তাঁহার জীবনের অলৌকিক ঘটনার মধ্যে অন্যতম।

(মাঘী পূর্ণিমার স্নান)

যশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় আর একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব মাঘীপূর্ণিমার স্নান। উৎসবটি কোন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষ্যে নহে। প্রচলিত বিশ্বাস যে, এই মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গাস্নান করিলে লোকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে এবং বিশেষ করিয়া যশড়ার নিকটবর্তী ভাগীরথীতে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধ তর্পণ করিলে অনন্ত পুণ্যের অধিকারী হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পূর্বে যশড়ার তিনদিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিতা ছিল এবং এই গঙ্গার স্নানকে কেন্দ্র

করিয়াই যাবতীয় অনুষ্ঠান। উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য, স্নানার্থীদের সমবেত পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া স্বর্গত আত্মার শান্তি কামনা। পূর্বে বহু পুণ্যকামী পরিবার কর্তৃক সর্বজনীন অন্নসত্রের আয়োজন করা হইত বলিয়া জানা যায়। এই স্থানের এই স্নানযাত্রার উৎসব সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, গঙ্গাসাগরের ন্যায় এই স্থানে মাঘীপূর্ণিমার দিন অনেকে শিশু সন্তান গঙ্গার জলে নিক্ষেপ করিতেন এবং ছাগবলির মাধ্যমে গঙ্গা পূজা করিতেন। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে কিছু সংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুকের আগমন হইতে দেখা যায়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং মাত্র এক দিনই স্থায়ী হইয়া থাকে।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ চাকদহ

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোভাব উপলক্ষে মেলা

(গাজী সাহেব)

শ্রীনগর গ্রামে গাজী সাহেবের উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার দিন গাজী সাহেবের দরগাহ সংলগ্ন পীরোত্তর প্রায় দশ কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি ষাট-হইতে সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

রাজারহাট, লক্ষ্মীপুর, শ্রীরামপুর, ঘোড়ামারা, রাধানগর, হিংনাড়া, পুরুলিয়া, দেউলী, মালিন্দা প্রভৃতি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হাজার নরনারী গরুর গাড়ীতে করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলা আসেন।

মেলায় ময়রা-তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, মনিহারী, বাসনপত্র, তাঁতের কাপড়, গামছা, মাটির হাঁড়ি, কলসী, পুতুল, বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের আমদানী হয়। ইহাভিন্ন দুই-একটি কাস্তে নিড়ানি জাতীয় কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান বসে। তাঁতের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি হিংনাড়া, বল্লভপুর, পুরুলিয়া, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি রাণাঘাট এবং মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি সিমুলিয়া, মিলিন্দা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নেই।

(গাজী সাহেব)

চাঁদমারী গ্রামে জনৈক গাজী সাহেবের স্মরণোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় গাজী সাহেবের দরগার চারিদিকে পীরোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

চাঁদমারী, মাঝদিয়া, সরাটি, উমাপুর, তারিণীপুর, শিকারপুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় তিন হাজার যাত্রী গরুরগাড়ী, সাইকেলে ও হাঁটিয়া মেলায় আসিয়া থাকেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ মদনপুর, শিমুরালি, কাঁচড়াপাড়া, কল্যাণী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে এবং পনের জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকান ও খেলনার দোকান, মনিহারী দোকান, কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এই গ্রামেরই একটি দল মেলায় মানিক পীরের গান গাহিয়া থাকেন।

(ঘোড়া পীর)

ঘোড়াগাছা গ্রামে ঘোড়া পীরের উৎসব উপলক্ষে পীরের নির্দিষ্ট স্থান সংলগ্ন প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ৭ই ফাল্গুন তারিখে একটি মেলা বসে। মেলার দোকানপত্র সাধারণতঃ দুই-তিনদিন থাকে; তবে কোন বৎসর লোক সমাগম বেশী হইলে ছয়-সাতদিনব্যাপীও ক্রয়-বিক্রয় চলে। গ্রামবাসী কাহারও কাহারও মতে মেলাটি প্রায় তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। তবে গত সাত-আট বৎসর যাবত পূর্বের তুলনায় বর্তমানে মেলায় লোকসমাগম ও দোকানপত্রের আমদানী কম হইতেছে।

সাধারণতঃ ঘোড়াগাছা গ্রামের চারিদিকের প্রায় আট দশ মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রী এবং ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। মেলায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিভিন্ন খাবার, মনিহারী দ্রব্যাদি, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্র, বাঁশের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী, মাটির পুতুল ও বই-ছবি আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামবাসীদের বিশ্বাস, যদি মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা না করা হয় তবে অবশ্যই গ্রামে মহামারী দেখা দিবে।

(বড় পীর)

কুমারপুকুর গ্রামের উত্তরাংশে ফকিরপাড়ায় প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ১৩ই ফাল্গুন বড় পীরের উৎসব উপলক্ষে মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। নদীয়া জেলা হইতেই বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, মনিহারী দ্রব্যাদি এবং মাটির হাঁড়ি-কলসী বেশী আমদানী হয়। ইহা ব্যতীত কাপড়চোপড়, বই-ছবি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কেবলমাত্র নাগরদোলা আসে।

(দেবানন্দ ঠাকুর)

শ্রীপাট ফুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে দেবানন্দ ঠাকুরের তিরোধান উৎসব উপলক্ষে দেব মন্দিরের সামনে প্রায় আঠার বিঘা পরিমাণ জমির উপর তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সাড়ে চার শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। কাঁচড়াপাড়া, মদনপুর, শিমুরালি, চাকুলিয়া, চাকদহ, হরিণঘাটা, বীজপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বহুযাত্রী ট্রেন, গরুরগাড়ী, সাইকেল, রিক্সা প্রভৃতি যানবাহন যোগে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসিয়া থাকেন। সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রীগণ আসেন মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থান হইতে। স্থানীয় বিক্রেতাগণ ছাড়াও উপরোক্ত স্থান সমূহ হইতে বহু বিক্রেতা আসেন। ফেরিওয়ালা সমেত মোট দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় তিন শত। মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান বসে।

মেলা উপলক্ষে নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রা কবিগান প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের বন্দোবস্ত করা হয়।

খেদাইঠাকুরের পূজার মেলা

মথুরাগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে "খেদাইঠাকুর" এর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। খেদাইতলার আশেপাশে স্থানীয় গ্রামবাসীর জমিতে এবং বিষ্ণুপুরগামী পাকা রাস্তার দুইধারে মোট প্রায় আট-দশ বিঘা জমির উপর মেলার দোকানপাটগুলি বসিয়া থাকে।

মেলায় নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, হুগলী, চব্বিশ-পরগণা ও কলিকাতা হইতেও প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী। মেলার দিন চাকদহ ও বনগ্রাম হইতে যাত্রীদের যাতায়াতের জন্য অতিরিক্ত মোটরবাসের ব্যবস্থা করা হয়। মোটরবাসে বিষ্ণুপুর নামিয়া সেখান হইতে প্রায় এক মাইল পথ হাঁটিয়া যাত্রীরা মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পাঁচশত দোকানপাট বসে; বিক্রেতারা প্রধানতঃ চাকদহ, রানাঘাট, নৈহাটী, বনগ্রাম, হাবড়া, হাঁসখালি, গাইঘাটা প্রভৃতি থানা হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ইহাভিন্ন অন্যান্য অঞ্চল হইতে বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে যাঁহাদের জমির উপর মেলার দোকান বসে, তাঁহারা খাজনা আদায় করিয়া থাকেন। বঙ্গ বিভাগ হইবার পূর্বে খুলনা ও যশোহর হইতে বিক্রেতারা আসিতেন।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে কৃষিও কারিগরী-সংক্রান্ত যেমন, লাঙ্গল, জোয়াল, দা, কোদাল, বঁটি, কাঁচি প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকান এবং বাঁশ, বেত ও তাঁতের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী যেমন, ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী, তালপাতার পাখা, কাঠের টেবিল-বেঞ্চ প্রভৃতি বিবিধ জিনিসপত্রের দোকান সর্বাপেক্ষা বেশী আমদানী হয়। উল্লিখিত শিল্প সামগ্রী বিক্রেতাদের অধিকাংশই প্রতি বৎসর চব্বিশ-পরগণা জেলার বনগ্রাম, হাঁসখালি ও গাইঘাটা থানা হইতে আসিয়া থাকেন। আমাদের সংবাদদাতা শ্রীবিশ্বাসের মতে—"এই মেলার মত

শিল্প-দ্রব্য অন্য কোন মেলায় আমার চোখে এ পর্যন্ত পড়ে নাই।"

ইহাভিন্ন, ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি বিবিধ খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, তামা, পিতল, লোহা এবং কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রাদির দোকান, মিল ও তাঁতের কাপড়চোপড়ের দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা-পুতুলের দোকান, ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকান এবং চারা গাছের আমদানী হইয়া থাকে।

মেলাটি বর্ষাকালে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাতে কোন-রূপ আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয় না।

গণেশজননী পূজার মেলা

চাকদহ আনন্দগঞ্জ বাজারে গণেশজননী পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা হইতে পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং দোকানপাট গুলি পূজামণ্ডপে চারিদিকে প্রায় পাঁচ-সাত বিঘা জমির উপর বসিয়া থাকে। পূর্বে এই স্থানে বাজার বসিত এবং ইহা রানাঘাটের পালচৌধুরী পরিবারের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

চাকদহ, বনগ্রাম, গাইঘাটা প্রভৃতি থানার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং হুগলী জেলা হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতিদিন গড়ে পাঁচ হইতে সাত হাজার নরনারী হাঁটিয়া এবং মহিষ ও গরুরগাড়ী করিয়া মেলায় আসেন। উক্ত যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী এবং মেলার প্রথম সপ্তাহে লোক সমাগম অধিক হইয়া থাকে।

মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ ও নৈহাটী হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। উৎসব ও মেলা পরিচালনার জন্য বিক্রেতাদের নিকট হইতে কর আদায় করা হয়। উল্লিখিত দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, মনিহারী এবং শিল্পসামগ্রীই বেশী আমদানী হয়। ইহাভিন্ন বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র যেমন, কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, নিড়ানি ইত্যাদির দোকান, ঔষধপত্র, বই-ছবি এবং ফটো তুলিবার দোকান আসে। শিল্পসামগ্রীর দোকানগুলি প্রধানতঃ রানাঘাট থানা হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, কবিগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয় এবং জুয়া ও লটারী খেলা চলে। প্রধানতঃ চাকদহের শ্রীপাঁচু গোপাল সাধুখাঁর "গণেশ জননী অপেরা" এবং শ্রীষষ্ঠীচরণ সিংহ রায়ের "টাউন ক্লাব অপেরা" যাত্রাভিনয় করেন।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এই মেলাটিতে আরো দোকানপত্র এবং আরো বেশী জন সমাগম হইত।

দোলযাত্রার মেলা

যশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে রাধাগোবিন্দের দোল উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন ইতিহাসখ্যাত দোলমঞ্চের সম্মুখে প্রায় পনর বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

প্রধানতঃ নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এবং হুগলী শহর হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে নারী সংখ্যা অধিক। তাঁহারা প্রধানতঃ হাঁটিয়াই আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। অবশ্য কয়েকজন ফেরিওয়ালা বাহির হইতে আসেন। দোকানপাট ও ফেরিওয়ালার সংখ্যা যথাক্রমে চল্লিশ ও পঁচিশ। উঁহাদের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসনকোসন, আয়না চিরুনী, দেবদেবীর পট, সস্তার বই-ছবি, লুঙ্গি-গামছা, বাঁশের ঝুড়ি-চুপড়ি, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য দোকানপাটের মধ্যে দোলখেলার রংয়ের দোকানই সর্বাধিক।

মেলায় যোগদানকারী গ্রামবাসীগণ সং সাজিয়া আমোদ করিয়া থাকেন। তাহাছাড়া বাঁশের বাঁকারির সাহায্যে ময়ূরপঙ্খী নৌকা তৈয়ারী করিয়া শ্রীকৃষ্ণের

রাসলীলা ও নৌকাবিলাস প্রভৃতি দৃশ্যের প্রদর্শনী খোলা হয়। স্থানীয় গ্রামবাসীগণ এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। অধিকারী শ্রীতুলসীদাস ও তাঁহার সম্প্রদায় প্রায় প্রতি বৎসর শ্রীকৃষ্ণের রাস লীলা অভিনয় করিয়া থাকেন।

মদনপুর গ্রামে অষ্টমদোল উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে (পূর্ণিমা তিথির আটদিন পর) সপ্তাহকালব্যাপী পূজা প্রাঙ্গণের আশেপাশে প্রায় পনের বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত ছয় বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় কলিকাতা, ব্যারাকপুর, নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, রানাঘাট, চাকদহ প্রভৃতি শহরাঞ্চল হইতে এবং কুমারপুর, বিরহী, চণ্ডীরামপুর, ঘোড়াগাছা, মাঝদিয়া, সোনহালী প্রভৃতি বিভিন্ন গ্রাম হইতে ট্রেনে, ঘোড়ার গাড়ীতে এবং হাঁটিয়া প্রায় দুই হাজার নরনারী আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং নানারূপ শিল্পসামগ্রী আমদানী হয়। ইহাভিন্ন, কয়েকটি ঔষধপত্র, বই-ছবি ও জুতার দোকান বসে। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া ও রানাঘাট হইতে বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী ও খেলাধূলার আয়োজন করা হয় এবং কবিগান, জলসা, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

শ্যামসুন্দর জীউর দোল উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে বেজপুর গ্রামে শ্যামসুন্দর জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবারের ও মনিহারীর দোকানপাট বসিয়া থাকে। মেলায় আড়াইশত হইতে তিনশত যাত্রীর সমাগম হয়।

(সতীমা-র উৎসব উপলক্ষে মেলা)

ঘোষপাড়ায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ও সতীমার উৎসব উপলক্ষে উৎসব স্থানের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন; শোনা যায় মহাকবি গিরীশ ঘোষ মহাশয় এই মেলায় একবার আসিয়া ছিলেন। পূর্বে মেলাটি প্রায় একমাস স্থায়ী হইত।

যাত্রীরা নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান, কলিকাতা এবং সন্নিহিত অন্যান্য জেলা হইতে ট্রেনে, বাসে, রিক্সায়, গরুর ও ঘোড়ার গাড়িতে করিয়া মেলায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, তাঁতের কাপড়, গামছা লুঙ্গী ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, ধামা, কুলো, মাটির পুতুল খেলনা ইত্যাদির দোকান এবং বই-ছবি ও ঔষধপত্রাদির দোকান বসিয়া থাকে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক এবং কবিগান বা জারীগানের আসর বসে। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোকেরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া কীর্তন, জারী ও কবিগান গাহিয়া থাকেন।

ধর্মরাজপূজার মেলা

গোটরা গ্রামে দেবোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর ধর্মরাজ পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ শনিবার হইতে দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

চাকদহ, দিঘরা, পাঁচপোতা, কুগাছি, মহেশ্বরপুর, বিজরা, কদম্বগাছি, হরিণঘাটা প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার লোক গরুরগাড়ী, ট্রেন প্রভৃতি যানবাহনযোগে আসিয়া থাকেন। মেলায় স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী, স্থানীয় বিক্রেতা ছাড়াও চাকদহ, কলিকাতা, রানাঘাট, শিমুরালি মদনপুর, হরিণ-ঘাটা, গোবরডাঙ্গা হইতে বহু বিক্রেতা প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। মোট দোকানপাটের সংখ্যা সত্তরটি এবং ফেরিওয়ালাও প্রায় পঞ্চাশ জন। মেলায় খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী, ইহাছাড়া লোহা, কাঁচ, মাটির বাসন ও পুতুলের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈরী ধামা, কুলা, প্রভৃতির দোকান বসে এবং মাছ ও শাকসব্জী ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস ম্যাজিক ও যাত্রাভিনয়ের বন্দোবস্ত করা হয়। প্রধানতঃ চাকদহের শ্রীপাঁচুগোপাল সাধুখাঁর দল, ঘেটুগাছির শ্রীদুলাল মণ্ডলের দল এবং বিজয়া গ্রামের শ্রীইন্দুভূষণ ঘোষের দল যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন।

রথযাত্রার মেলা

নেউলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের উৎসব উপলক্ষে রথযাত্রার দিন এবং উল্টারথের দিন একটি মেলা বসে। জগন্নাথদেবের মন্দিরের নিকট স্থানাভাবে মেলার দোকানপাটগুলি চাকদহ বনগ্রাম রোডের দুইপাশে বসিয়া থাকে। মেলাটি বাংলা ১১৬৫ সনে সূচিত হইয়াছিল।

আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং বনগাম ও চাকদহ হইতে মেলার হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় তিন-চার হাজার যাত্রীর সমাগম। যাত্রীরা সাধারণতঃ ট্রেনে, গরুরগাড়ীতে এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন। উল্টারথের তুলনায় রথের দিনই যাত্রী সমাগম বেশী হয়।

মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকাপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় অঞ্চলের লোক। ইহাভিন্ন প্রতি বৎসর চাকদহ, রানাঘাট ও বনগ্রাম হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। উক্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা-তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, লুঙ্গি, গামছা ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও পুতুলের দোকান এবং দুই-চারিটি দা, কোদাল, কাস্তে ও ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান বসে। ইহাভিন্ন, মেলায় ফল ও ফুলের চারাগাছ বিক্রয় হয়।

এই মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

রাজরাজেশ্বরী পূজার মেলা

কালীগঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। দেবীর পূজামণ্ডপ সংলগ্ন জমিতে এবং স্থানীয় কালীগঞ্জ বাজারের মধ্যে প্রায় দশ-বার বিঘা জমি ব্যাপিয়া মেলায় দোকান পাট বসে।

বাংলা ১২৯৩ সন হইতে মেলাটি আরম্ভ হয়। প্রতি-বৎসর পূজার একমাস পূর্ব্বে স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী প্রায় সাত-আটখানি গ্রামের গ্রামবাসীগণ কালীগঞ্জ বাজারে সমবেত হইয়া রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজা ও মেলা-র সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করেন এবং উক্ত কমিটি রাজরাজেশ্বরী দেবীর পূজাদি ব্যতীত এক বৎসর ব্যাপী এই গ্রামে অনুষ্ঠিত যাবতীয় সর্বজনীন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও মেলা পরিচালনা করিয়া থাকেন। মেলা কমিটি সমাগত যাত্রীগণের জন্য পানীয় জলের ব্যবস্থা, সাময়িক পায়খানা, জনস্বাস্থ্য, যাত্রীদের সুখ সুবিধা প্রভৃতির দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখেন।

চাকদহ থানার অন্তর্গত প্রায় সমস্ত ইউনিয়ন, হরিণঘাটা থানার অধিকাংশ ইউনিয়ন, হুগলী ও ২৪-পরগণা জেলা এবং কলিকাতা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় দশ-বার হাজার নরনারী এই মেলায় আসেন। যাত্রীগণ প্রধানতঃ ট্রেণ, মোটরগাড়ী, মোটরবাস, রিক্সা এবং গরুরগাড়ী করিয়া আসেন। মেলা স্থানের চারিদিকে প্রায় চার-পাঁচ শত যাত্রীবাহী গরুরগাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়।

মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, রানাঘাট, হুগলী জেলার জিরাট, বলাগড়, সিজা, কামালপুর এবং ২৪-পরগণা জেলার নৈহাটি, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে। তাহাছাড়া নিকটবর্তী গ্রামসমূহ হইতেও হস্তশিল্পজাত দ্রব্য সামগ্রী লইয়া বিক্রেতাগণ আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় দুইশত এবং উহার অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। তাহাছাড়া প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বাসন-কোসন, ধর্মীয় পুস্তক ও দেবদেবীর ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতি দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক। তাহাছাড়া ঔষধপত্র, শাকসব্জী প্রভৃতি

দোকানপাটও বসে। শিকারপুর, তারিণীপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে ধামা-কুলা ইত্যাদি দ্রব্যাদি প্রতি বৎসর আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে আদায়ীকৃত দান বা তোলা হিসাবে গৃহীত অর্থের দ্বারা পূজা ও মেলার ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য তরজাগান, যাত্রাগান, পুতুলনাচ, সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়। তাহাছাড়া স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের যাত্রাদলগুলিকে যাত্রাভিনয়ের সুযোগ দিয়া তাহাদের উৎসাহ দিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল অনুষ্ঠানে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইতে দেখা যায়।

স্নানযাত্রার মেলা

যশড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় জগন্নাথ-দেবের স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন প্রায় দশবিঘা দেবোত্তর সম্পত্তির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। অনেকেরই অনুমান, ইহা প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন মেলা।

মেলায় প্রধানতঃ হুগলী, বলাগড়, জিরাট, শ্রীপুর, সোমড়া, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট এবং চাকদহের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যাত্রীর সমাগম হয়। বনগ্রাম এবং পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চল হইতেও অনেকে আসেন। প্রায় দশহাজার যাত্রীর সমাগম হয়; তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যা সর্বাধিক। দেশ বিভাগের পূর্বে এই মেলায় যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জেলা হইতে অগণিত নরনারীর সমাগম হইত। দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীগণ ট্রেনযোগে ও মোটর বাস এবং স্থানীয় অঞ্চলের যাত্রীগণ গরুর গাড়ী করিয়া এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর, বনগ্রাম, কলিকাতা শহর এবং আশেপাশের বিভিন্ন স্থানসমূহ হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় মাটির পুতুল, শঙ্খের জিনিসপত্র, মাদুর, ধামা, কুলা, মনিহারী জিনিসপত্র, ময়রা, তেলেভাজা, প্রভৃতি খাবার, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসন, আয়না-চিরুণী, জগন্নাথদেবের বই-ছবি ও মাটির মূর্তি, নানাবিধ ধর্মীয় পুস্তক, কাপড়চোপড়, দা-বটি কাস্তে, কারুশিল্পজাত জিনিসপত্র এবং শাকসব্জী প্রভৃতির প্রায় দুইশত দোকান-পাট বসে। তাহাছাড়া বহু ফেরিওয়ালা নানাপ্রকার জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্য মেলায় লইয়া আসেন।

কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুল, বনগাঁর মাদুর, নদীয়ার শঙ্খের জিনিসপত্র, রানাঘাটের ধামাকুলা এবং স্থানীয় অঞ্চলের কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্র ও মাটির হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি মেলায় আগত যাত্রীগণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে বাধ্যতামূলকভাবে দান বা তোলা-আদায় করিবার রীতি আছে।

মেলায় সার্কাস, ম্যাজিক ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা প্রায় প্রতি বৎসরই থাকে। নবদ্বীপ, খড়দহ প্রভৃতি স্থান হইতে কীর্তন গান ও প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য প্রতি বৎসর অনেক বৈষ্ণবের আগমন হয়; তাঁহারা বাদ্যযন্ত্র সহকারে কীর্তন গাহিয়া থাকেন। কথকতার মাধ্যমে সমাজের জাতি ভেদ দূরীকরণের চেষ্টায় স্থানীয় একটি দল কর্তৃক কথক সংগীতের অনুষ্ঠান হয়। এই দলের অধিকারী শ্রীসুকৃতি বন্দ্যোপাধ্যায়, যশড়া ব্রতচারী আশ্রম, পোঃ চাকদহ, জেলা নদীয়া।

(মাঘী পূর্ণিমা স্নান)

যশড়া গ্রামে মাঘী পূর্ণিমায় আর একটি মেলা বসে। ইহা কোন দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে নহে। পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর জলে অবগাহন করিবার জন্য অগণিত পুণ্যার্থী নরনারী এই স্থানে সমবেত হন এবং এই কারণে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাগীরথী তীরস্থ প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর একটি মেলা বসিয়া থাকে। কতকাল পূর্বে ইহা প্রথম আরম্ভ হয় তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না, তবে মেলাটি যে বেশ প্রাচীন তাহা অনস্বীকার্য।

মেলায় পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় বিশ হাজারের মত যাত্রী আসেন। দেশ বিভাগের পূর্বে পূর্ববঙ্গ হইতে অগণিত নরনারী এই মেলায় আসিতেন। যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যা অধিক দেখা যায়। তাঁহারা প্রধানতঃ ট্রেনে, মোটরবাসে, গরুরগাড়ী ও মহিষের গাড়ীতে করিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় অঞ্চলের লোকজন। মেলায় দোকানপাট ও ফেরিওয়ালার সংখ্যা চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ। উহার মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী নানা প্রকার জিনিসপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সাধারণত বাঁশ ও মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি টিটাগড় ও খড়দহ হইতে আমদানী হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় প্রায় প্রতি বৎসর কবিগান ও রামায়ণ গানের ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন বৎসর পালাগানের ব্যবস্থা করা হয়। পালাগানের অধিকারীর নাম শ্রীহরিপদ বসাক, গ্রাম যশড়া, পোঃ চাকদহ, জেলা নদীয়া। রামায়ণ গানের আসরে অগণিত নরনারীর সমাগম হয়।

নবদ্বীপস্থিত শ্রীবাসঅঙ্গনের
প্রবেশদ্বার

নবদ্বীপ সমাজবাড়ীতে অবস্থিত
ললিতাসখীর সমাধিমন্দির

নবদ্বীপে সোনার
গৌরাঙ্গ মূর্তি

গঙ্গাবাসের হরিহর মূর্তি

নবদ্বীপের একটি মন্দিরে
বিষ্ণুপ্রিয়া ও লক্ষ্মীপ্রিয়াসহ
শ্রীগৌরাঙ্গদেবের বিগ্রহ

শিবনিবাসের শিবমন্দির

শিবনিবাসের শিবলিঙ্গ

শিবনিবাসের রামসীতার মন্দির

কৃষ্ণনগরের আনন্দময়ী কালী

বীরনগরের ভোচেরা মা মন্দির

লক্ষ্মীতলার একটি
বৃক্ষপাদমূলে মনসাপূজার ঘট

ব্রহ্মাণীতলায় ভিক্ষারত ব্রাহ্মণগণ

ব্রহ্মাণীতলার মেলা

বাগ-আঁচড়ায় জনৈক সাধুর সমাধিমন্দির

চাঁদরায় ও কেদার রায়ের আমলে নির্মিত বাগ-আঁচড়ার একটি প্রাচীন মন্দির

ফুলিয়ায় হরিদাস বাবাজীর গুম্ফা

ফুলিয়ায় হরিদাস বাবাজীর সমাধি

ফুলিয়ার মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত
শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহাদি

জেলা : নদীয়া
থানা : হরিণঘাটা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বিরহী। ৪।৫৪৫ ৮৯।২৯৫।১,৪০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কুমার, কামার, ধোপা, নাপিত, দুলে, বাগ্দী, তিলি, বারুইজীবী, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মদনপুর। বহরমপুর রোড এবং মদনপুর-বিরহী রোড—এই দুই রাস্তায় গ্রামে যাতায়াত চলে। মদনপুর হইতে বিরহী পর্যন্ত মোটরবাস পাওয়া যায়।

(ঘ) কার্তিক মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব। উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মেলা। কার্তিক মাসে দুই দিন। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি রাধাকৃষ্ণের প্রাচীন মন্দির আছে।

গ্রামের নাম সম্পর্কে এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, বর্তমান বিরহী মৌজার মধ্যে একটি বাঁধান বটগাছের গোড়ায় আনুমানিক প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে এক অজ্ঞাতনামা বৈষ্ণব সাধক মধুরভাবে মদনগোপালের উপাসনা করিতেন। উক্ত ভক্ত সাধক দেহত্যাগ করিলে তাঁহার ভক্তগণ এই গ্রামে একটি মদনগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করেন। ইহার পর এই অঞ্চল নদীয়া রাজার অধিকারভুক্ত হইলে তাঁহাদের অর্থানুকূল্যে বর্তমান মন্দির নির্মাণ ও মদনগোপালের নিয়মিত পূজাদির ব্যবস্থা হয়। ঐ সময় একদা মদনগোপাল বিগ্রহের চোখে জল দৃষ্ট হয় এবং রাত্রে স্বপ্নাদেশ হয় যে, রাধারাণী যমুনার তীরে এসেছেন, রাধা বিরহে মদনগোপাল কাতর। পরদিন যমুনার তীরে শ্রীরাধিকার একটি মূর্তি পাওয়া যায়। উল্লিখিত ঘটনার পর এই গ্রামটি বিরহী নামে পরিচিত হয়। পূর্বে মদনগোপালের নিত্যপূজা ও সন্ধ্যারাত্রি হইত। ধর্মশালা ও অন্নসত্রের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে মন্দির শূন্য। বিগ্রহ কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে আছে। কেবল মাত্র ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ঘটে মদনগোপালের পূজা হয়।

মদনগোপালের মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বে এই গ্রামে যমুনা নদীর তীরে একটি চণ্ডীমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। উক্ত চণ্ডীদেবী জনৈক দস্যুর আরাধ্যা দেবী। দস্যুর দুষ্কৃতি ধরা পড়িলে চণ্ডী মূর্তিকে যমুনার জলে নিক্ষেপ করা হয়। ঐ চণ্ডী মন্দির অদ্যাপি আছে। শারদীয়া পূজার মধ্যে যে-কোন এক দিন স্থানীয় লোকেরা সমারোহের সহিত উক্ত মন্দিরে চণ্ডী দেবীর পূজা দেন। চণ্ডীদেবীর নামানুসারে বিরহী গ্রামের পশ্চিম ভাগের নাম চণ্ডীপাড়া হয়। বর্তমানে এই চণ্ডীপাড়া ভিন্ন মৌজা ভুক্ত হইয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষক,
বিরহী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ বিরহী, নদীয়া।

২। গ্রাম : নারায়ণপুর। ১০।৬৭৩ ৬৯।২৯৪।১,৪৫৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মদনপুর। জেলা-বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে একটি কালীপূজা হয়। দুর্গাপূজাটি মাত্র গত দুই বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গা ও কালীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

(চ) পূর্বে গ্রামে বহু ব্রাহ্মণ পরিবারের বসবাস ছিল এবং প্রতিটি পরিবারে নারায়ণ শিলার পূজা-অর্চনা হইত। সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রামের নাম নারায়ণপুর হইয়াছে।

শ্রীপরীক্ষিত সরকার, প্রধান শিক্ষক,
নারায়ণপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নদীয়া।

৩। গ্রাম: উত্তর রাজাপুর। ১২।৬২১'২৪।১৬৪।৯১৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকাজ।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁচড়াপাড়া। গ্রাম হইতে এক মাইল দূরে হরিণঘাটা পর্যন্ত মোটরবাস যাতায়াত করে। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) ফতেমা-র উৎসব। প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখ। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ফতেমা-র উৎসব উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ফতেমা-র একটি বাঁধানো স্থান ও মনসার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে গ্রামের হিন্দুগণ চাঁদা তুলিয়া মনসা পূজা ও ভাসান গানের আয়োজন করেন।

এই গ্রামে পূর্বে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের একটি বাগানবাড়ী ছিল। এই কারণে লোকে ইহাকে বাগরাজপুর বলিত। উক্ত বাগানবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। পরে সেটেলমেন্টের জরীপে এই গ্রামকে উত্তর ও দক্ষিণ রাজপুর নামে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ববঙ্গাগত উদ্বাস্তু আগমনের ফলে এই গ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রাম: উত্তর রাজপুর, পো: মোল্লাবেলিয়া,
নদীয়া।

৪। গ্রাম: কাঠডাঙ্গা। ৩৭।১,০৮৬'০০।৩৫৯।২,০৩৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, মানিকতলাপাড়া, ডোমরাপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় আঠার মাইল দূরে কাঁচড়াপাড়া রেলস্টেশন এবং সাত মাইল দূরে হরিণঘাটা বাসষ্ট্যাণ্ড। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা এবং প্রতি বৎসর ১লা মাঘ মানিক পীরের উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মানিক পীরের উরস উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মানিক পীরের দরগাহ আছে। কথিত আছে মানিক পীর দেহরক্ষা করিলে তাঁহাকে এই গ্রামে অবস্থিত ডোমরা বিলের তীরে সমাধি দেওয়া হয়।

শ্রীললিত মোহন দাস, প্রধান শিক্ষক,
কাঠডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
ও
শ্রীপ্রমথ নাথ দাস, শিক্ষক,
সবুদ্ধিপুর বিদ্যালয়,
গ্রাম: মহাদেবপুর,
পো: কাঠডাঙ্গা, নদীয়া।

৫। গ্রাম: বড়জাগুলী (মৌজা: জাগুলী)। ৫৩।২৫০'৭০।১৮১১,০১০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত, তাঁতী, ছুতার, কামার, কুমার, দুলিভ, কাওরা, মুচি, ডোম, নমঃশূদ্র, নাথ, সাহা, মুসলমান, সাঁওতাল ও কোল।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, বোসপাড়া, ভৌমিকপাড়া, ডোমপাড়া, কাওঁপাড়া, মুসলমান-পাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কাঁচড়াপাড়া। গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল, চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা পূজা। ইহা ভিন্ন, চান্দ্রমাস হিসাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ্ পরব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পঞ্চানন্দতলার মেলা। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি শিব মন্দির, একটি পঞ্চাননতলা, একটি বাবাঠাকুরতলা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি ঈদগা ও একটি জুম্মাঘর বা উপাসনার স্থান আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ভোজ এবং ঈদগায় সবজনীন ভোজ অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে শুনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে গ্রামে বহু সাধক পণ্ডিত বাস করিতেন। তাঁহাদের বহু যজ্ঞস্থল ছিল, এই কারণে গ্রামের নাম যজ্ঞস্থলী এবং অপভ্রংশে "জাগুলী" হইয়াছে।

শ্রীমনীন্দ্র কুমার বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক,
বড়জাগুলী গোপাল একাডেমী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড়জাগুলী, নদীয়া।

৬। গ্রাম ঃ দিঘলগ্রাম। ৮৭।১.০৬৭৯৯।২৭৫।১,৩৩১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কাওরা, পোদ, মুচি, নমঃশূদ্র, মুসলমান এবং আদিবাসী ও ওঁরাও। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, গবাদি পশুপালন এবং জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় চার-পাঁচ মাইল দূরে হাবড়া রেলস্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের জন্য জেলাবোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ছাড়া গ্রামে তিনটি হিন্দু বাড়ীতে দুর্গাপূজা উপলক্ষে ভাসানগান ও যাত্রাভিনয় এবং শীতকালে প্রতি বৎসর অষ্টম-প্রহরব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের হইলেও গ্রামের হিন্দু সম্প্রদায় সকলেই উৎসবে যোগদান করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ঈদ্ পরব উপলক্ষে গ্রামের মুসলমানগণ নির্দিষ্ট দিনে গ্রামের এক স্থানে মিলিত হইয়া সমবেত ভাবে নামাজ পড়েন এবং দান ধ্যান ও পরস্পরের সহিত আলিঙ্গন করিয়া আনন্দোৎসব করেন। গ্রামের বদরতলায় একটি পীরের স্থান আছে। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শেষ তারিখে মুসলমানগণ এই স্থানে অন্নব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া খাওয়া-দাওয়া করেন।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে গ্রামের আদিবাসীরা করমপূজা করিয়া থাকেন। এই সময় তাঁহারা পচাই মদ পান করিয়া নৃত্য-গীতের মাধ্যমে আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন এবং প্রতি অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশীর পরের রবিবার হইতে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত প্রতি রবিবার "মোরগ লড়াই" উৎসব পালন করেন। এই উৎসবে দুইপক্ষের দুইটি মোরগের পায়ে লোহার ধারাল কাঁটা বাঁধিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মোরগ দুইটি পরস্পরকে আঘাত করিয়া একটি হত বা আহত হয়, ফলে অপরটিকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। যে-দলের মোরগ জয়ী হয় সেই দল উক্ত আহত মোরগটি লাভ করেন। এই মোরগের লড়াই দেখিতে বহু লোকের সমাগম হয় এবং সকলেই বেশ আনন্দ উপভোগ করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বদরতলায় একটি পীরের স্থান আছে।

শ্রীনিখিলপতি ব্যানার্জি, শিক্ষক,
গ্রামঃ দিঘলগ্রাম, পোঃ টেবাবেড়িয়া, নদীয়া।

৭। গ্রাম : চাঁন্দা। ৮৯।৬৫৭·৬০।২৫৪।১,২৬৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান, বুনো বা সর্দার। গ্রামে বুনোপাড়া, গয়লাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাবড়া হইতে মোটর-বাসে তিন মাইল উত্তরে ঝিকড়া নামিয়া আধ মাইল হাঁটা পথে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসে বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত উৎসব দুইটি সবজনীন। গ্রা-ছাড়া, প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, কালীপূজা, শিবপূজা, মনসাপূজা ও মহোৎসব (অষ্টমপ্রহর নামকীর্তন) ইত্যাদি পূজা-পার্বণ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুর্গা, কালী, শিব ও মনসা প্রতিমা নির্মাণ করিয়া এবং অন্যান্যগুলি ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের মধ্যে একটি প্রকাণ্ড বটগাছের তলায় একটি পাকা চণ্ডীমণ্ডপ আছে। গ্রামের যাবতীয় পূজাদি উক্ত মণ্ডপেই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে প্রায় এক মাইল দূরে "জাহিরতলা" নামে একটি পীরস্থান আছে। পীরস্থানটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। কিংবদন্তী আছে যে, পূর্বে ঐ স্থানে একটি রাখাল গরু চরাইতে আসিয়া একদিন একটি পাঁচ পীরের দরগাহ আবিষ্কার করে। তখন হইতে রাখাল বালকটি প্রতিদিন গরু চরাইতে যাইয়া ঐ স্থানে একটি করিয়া মাটির প্রদীপ জ্বালাইয়া দিয়া আসিত। এইরূপে একদিন পাঁচ-পীরের সাক্ষাৎ পাইয়া বালকটি সংসার ত্যাগ করিয়া ঐ জাহিরতলায় গিয়া একাকী বাস করিতে থাকে ও সাধনায় আত্মনিয়োগ করে। ইহার পর সকলের ঐ স্থানের উপর দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং স্থানটি পাঁচ পীরের স্থান বলিয়া খ্যাত হয়। শুনা যায় পাঁচ পীরের স্থানে মানত করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই পীরের স্থানে মানত করিয়া থাকেন। পূর্বে এই স্থানে প্রতি বৎসর উৎসব ও তিনদিন মেলা বসিত। গত দুই বৎসর হইল মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তবে আজও বৎসরে একদিন স্থানীয় হিন্দু-মুসলমানগণ মিলিতভাবে ঐ স্থানে উৎসব পালন করেন এবং পীরের স্থানে মানত জানান।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাস হালদার, প্রধান শিক্ষক,
চাঁন্দা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়,
নদীয়া

৮। গ্রামঃ মোহনপুর।

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাবড়া হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের হরিণঘাটাস্থ দুগ্ধ বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়া গ্রামে যাইবার পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মী-পূজা কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল ও শিবরাত্রি উৎসব। উৎসবগুলি সর্বজনীন। ইহাভিন্ন, গ্রামে মনসা ও চণ্ডীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) কাঁচড়াপাড়া হইতে হরিণঘাটা রাস্তার উত্তরাংশে হরিণঘাটা দুগ্ধ বিক্রয় কেন্দ্রের সীমানার অন্তর্ভুক্ত এই গ্রাম, গ্রামের মধ্য দিয়া একটি মরা নদীর চিহ্ন বিদ্যমান।

শ্রীপ্রফুল্ল শঙ্কর চক্রবর্তী, শিক্ষক,
হরিণঘাটা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ মোহনপুর, নদীয়া।

জেলা : নদীয়া

থানা : হরিণঘাটা

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব

(ফতেমাবিবি)

উত্তর রাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে বৈশাখ হইতে তিনদিন ব্যাপী ফতেমা-র উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। ফতেমা মুসলমান ধর্ম প্রচারক হজরত মহম্মদের কন্যা। কথিত আছে, এই গ্রাম নিবাসী মহম্মদ সোমেশ মণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই স্থানে ফতেমা-র একটি আসন স্থাপন করেন এবং উৎসব চালু করেন। লাল সালু কাপড়ের চাঁদোয়া দ্বারা আচ্ছাদিত ফতেমা-র একটি নির্দিষ্ট বাঁধানো স্থান আছে। প্রতিদিন ঐ স্থানে ফতেমা-র উদ্দেশ্যে ধূপদীপ দেওয়া হয়। উৎসবটি স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং সাধারণের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ করিয়া উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের সময় ফতেমা-র স্থানে সিন্নি দেওয়া হয় এবং ঐ সিন্নি উপস্থিত জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। উৎসবটি মুসলমানগণের হইলেও হিন্দুগণ ইহাতে যোগদান করেন এবং ফতেমা-র নিকট মানত পূজাদি দেন। সাধারণের বিশ্বাস ফতেমা-র নিকট মানত জানাইলে অভীষ্ট ফল পাওয়া যায় এবং তাহার অধিষ্ঠান হেতু এই গ্রামে কলেরা হয় না। সাধারণতঃ সিন্নি, বাতাসা, দুধ ও বৃক্ষের ফল ইত্যাদি মানত করা হয়; কোন পশু-পক্ষী মানত জানান হয় না। উৎসবে ভক্তরা ফতেমা-র স্থানের নিকট নানা প্রকার ছড়া কাটেন ও গান করেন। এই সকল গান ও ছড়া সকলের নিকট প্রকাশ করা হয় না। ইহাদের প্রার্থনা নিম্নরূপ :—

> "ইয়া বরকুল, বরকুল,
> জননী ফতেমা জিন্দ।
> ওমা তাই তোমারে ডাকিলে।
> ইয়া বরকুল, ইয়া বরকুল।" ইত্যাদি।

বৈশাখ মাসে উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর পৌষ মাসে ঐ স্থানে মুসলমান মেয়েরা ফতেমা-র নাম-গান করেন। মাঘ মাসে একদিন সকালে ফতেমা স্থানে দুধ দেন এবং আবার একদিন চাঁদা তুলিয়া ঐ স্থানে "ছদগা" (?) দেওয়া হয়। বর্তমান খাদেম মহম্মদ ফকিরচাঁদ মণ্ডল, সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান।

(মানিক পীর)

কাঠডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ মানিক পীর সাহেবের দরগাতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মানিক পীর সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। পীরের দেহরক্ষার পর তাঁহার মৃতদেহ এই গ্রামেই ডোমরা বিলের তীরে সমাধি দেওয়া হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। সাধারণের বিশ্বাস গবাদি পশুর রোগ বা মড়ক দেখা দিলে উক্ত বিলের জল ও দরগার মাটি খাওয়াইলে গো-মড়ক বন্ধ হয় এবং ঐসকল গবাদি পশু আরোগ্য লাভ করে এই কারণে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ ভক্তিভরে পীরের দরগায় পূজা দিয়া থাকেন এবং স্থানটির পবিত্রতা রক্ষা করেন। পীরের নামে সাধারণতঃ দুধ, বাতাসা, পয়সা ইত্যাদি মানত করা হয়। মুসলমানেরা অনেকে মুর্গী মানত দিয়া থাকেন। উৎসবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন। হিন্দুগণ নামকীর্তন এবং মুসলমানগণ মানিক পীরের গান করেন। পীরের বর্তমান খাদেম গোদার পদবীধারী সৈয়দ-বংশীয় জনৈক মুসলমান। পীরের সেবার জন্য পীরোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমি আছে।

জেলা : নদীয়া
থানা : হরিণঘাটা

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে মেলা

(ফতেমা বিবি)

উত্তর রাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পঁচিশে বৈশাখ ফতেমা বিবির উৎসব উপলক্ষে ফতেমা বিবির স্থানের আশেপাশে প্রায় তিন বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। উহার মধ্যে পাঁচকাঠা জমি ফতেমা-র নামে উৎসর্গকৃত এবং অবশিষ্টাংশ স্থানীয় অধিবাসীদের। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং তিন দিন স্থায়ী হয়। মেলায় মোট প্রায় ছয় সাতশত নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ মোল্লাবেলিয়া, হরিণঘাটা, কাঠডাঙ্গা, প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং কাঁচড়াপাড়া হইতে কিছু সংখ্যক লোকজন আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা বিরহী, হরিণঘাটা, মোল্লাবেলিয়া, কাঁচড়াপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার দোকানই বেশী। ইহাভিন্ন, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান এবং হাকিমী ঔষধপত্রের দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর তরজা গান, পুতুল নাচ ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাভিন্ন, এই গ্রামের মুসলমানপাড়ার একটি দল প্রতি বৎসর লায়লা-মজনু গান করিয়া থাকেন। শ্রীফকির আহমেদ ও নৈহাটীর শ্রীঅন্নদা দাসের দল প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় তরজা গান করিয়া থাকে।

(মানিক পীর)

কাঠডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মানিক পীরের উরস উপলক্ষে পীরোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। মেলায় প্রতিদিন হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের গড়ে প্রায় চারশত নর-নারীর সমাগম হয়। আশেপাশের গ্রাম ও ইউনিয়ন হইতে এবং নিকটবর্তী ২৪-পরগণা জেলা হইতে মেলায় লোকজন আসেন।

মেলার খোলা জায়গা প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, ধামা-কুলা ও মাটির হাঁড়িকুড়ির দোকান, বই-ছবির দোকান ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

পঞ্চাননতলার মেলা

বড়জাগুলী গ্রামে পঞ্চানন তলায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি স্থানীয় উদ্বাস্তু পরিবারবর্গের প্রচেষ্টায় গত তিন-চার বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় অঞ্চলের উন্নতি কল্পে এই মেলার প্রচলন করা হইয়াছে। মেলাটি এই অঞ্চলে বড়জাগুলীর মেলা নামে খ্যাত। ইহাতে মোট প্রায় তিন-চারিশত নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রী অধিকাংশই স্থানীয়।

মেলায় মোট পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতারা স্থানীয় তাঁহাদের নিকট হইতে দান তোলা বা আদায় করা হয় না। সমস্ত দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারীর দোকান, বাসনপত্রের দোকান, কাপড়ের দোকান, বেতের বোনা ধামা-কুলো ও মাটির পুতুলের দোকান এবং বই-ছবির দোকান বসে।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার মেলা

বিরহী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব উপলক্ষে যমুনা নদীর তীরে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমিতে একটি মেলা বসে। অনুমান করা হয় ভাই ফোঁটা উৎসব উপলক্ষে ভাইদের জন্য মিষ্টি ও খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহের প্রয়োজনে এই মেলা বসিবার কারণ। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয় এবং মাত্র এক দিনই স্থায়ী হয়। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় কুড়িহাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং ত্রিশ জনের মত ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় দোকানদার ভিন্ন নৈহাটী, কাঁচড়াপাড়া, মদনপুর, চাকদহ প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে জমিদারদের কর্মচারীগণ দান ও তোলা আদায় করিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টির দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাভিন্ন, মাছ ও শাকসব্জির দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়-গামছার দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কৃষি ও কারিগরীসংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, শিল্প-সামগ্রী ও কারু শিল্পের দোকান এবং কয়েকটি বই-ছবি ও টোট্‌কা ঔষধপত্রের দোকানও বসে।

বিরহী গ্রামে ভ্রাতৃদ্বিতীয়া উৎসব সম্পর্কে ১৭ই কার্তিক, ১৩৭৪ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটি প্রকাশিত হয় :—

হরিণঘাটা থানার বিরহী গ্রামে মদনমোহন দেবের মন্দির অতি প্রাচীন এবং এর ইতিহাসও প্রাচীন। এই মন্দির প্রাঙ্গণে বহুকাল হতে ভাইফোঁটার মেলা হয়ে আসছে। মেলায় দোকানপাট, কেনাবেচা, নাগরদোলা, ছেলে বুড়োর ভীড়ে ২।৩ দিন বেশ জমজমাট হয়ে ওঠে। যে সব বোনেদের ভাই নেই তারা মদনমোহন বিগ্রহের কপালে ফোঁটা দিয়ে প্রার্থনা জানায় ভায়ের জন্য। এর জন্যেই এর নাম হয়েছে ফোঁটার মেলা। অনেকে সেই আকাঙ্ক্ষায় প্রার্থনা জানায়, মানত করে। ভাই ফোঁটার মেলা বাংলাদেশে আর কোথাও হয় কিনা আমার জানা নেই। এই ভাই ফোঁটার মেলাটি বসে মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণে—যমুনা নদীর ধারে। নদী থেকে বাঁধানো ঘাট মন্দিরের চত্বর পর্যন্ত উঠে এসেছে। আজ নদী শুকিয়ে হেজে-মজে কচুরিপানায় ভর্তি—আর হরিণঘাটা ফারমের গোচোনা, ময়লা ইত্যাদিতে ভরে গেছে নদী। ঘাটও ভেঙ্গে গিয়েছে। তবু মানুষের ভিড় জমে এই ঘাটে, মন্দিরে ও মেলায়। ফোঁটা দেয় বিগ্রহের কপালে আর প্রার্থনা করে ভাইয়ের জন্য।

শিবরাত্রির মেলা

মোহনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় প্রায় পঁচিশ কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং এক দিনই স্থায়ী হয়। মেলায় মোট প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ধরমপুর, ভালুকা, মুড়রী প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে লোকজন মেলায় আসেন।

মেলায় মোট প্রায় দেড়শতটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় পঁচিশ জনের মত ফেরিওয়ালা আসে। এই সকল দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানই বেশী। ইহা ছাড়া, মনিহারী দোকান ; তামা, পিতল ও লোহার বাসনপত্রের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বাঁশের তৈরী চ্যাঙ্গারী ও বেতের ধামা-কুলার দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান, হাকিমী ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকান, এবং বই-ছবির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর তরজা ও কবিগানের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা : নদীয়া
থানা : হাঁসখালী

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : পাটুলী। ৪৩।৩৭৯ ৭৭।২৩৩।১,৩২৯

(ক) হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বারুইপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, জনমজুরী, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাদকুল্লা হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসে ডাকাতে কালী এবং মাঘ মাসের অমাবস্যা তিথিতে বুড়ী কালীপূজা। বুড়ী কালীপূজাটি দেশ বিভাগের পর আরম্ভ হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে কালীর ১৭ হাত উচ্চ মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয়।

(ঙ) বুড়ীকালী পূজার মেলা। মাঘ মাসে। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় কালী মন্দির আছে। মন্দিরটি ডাকাতে কালীর মন্দির নামে খ্যাত।

শ্রীসুখরঞ্জন দুয়ারী, শিক্ষক,
নদীয়া।

২। গ্রাম : বাদকুল্লা। ৪৪।১,১৮৯·১১।৫৩১।৩,০০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, বৈশ্য কাপালিক, কামার, কুমার, মুচি, স্বর্ণকার, নমঃশূদ্র, হাড়ি, বাগদী, বুনো, গোয়ালা প্রভৃতি। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, দিনমজুরী ও চাকুরী।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। বর্ষাকালে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া প্রবাহিত অঞ্জনা নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে মহোৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। ইহা বড়পুকুরের মেলা নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) এই গ্রামের বাজারের নিকট মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধেশ্বরী কালীর নিত্য পূজা হয়। বর্তমান সেবায়েত শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী। পুরুষানুক্রমেই ইহারা সিদ্ধেশ্বরী কালীর পূজা করেন। কালীর নামে কিছু দেবোত্তর জমি আছে। ইহাভিন্ন গ্রামের মধ্যপাড়ায় একটি নির্দিষ্ট গাছের নীচে শীতলা মূর্তি আছে।

শ্রীঅক্ষয় কুমার বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বাদকুল্লা, নদীয়া।

৩। গ্রাম : মামজোয়ানী।৬০।১,৫২৫·০৭।৪৬২।২,৪২৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, নাপিত, সদ্‌গোপ, সর্দার (বুনো), নমঃশূদ্র, মুসলমান ইত্যাদি।

গ্রামে মোট সাতটি পাড়া আছে। যেমন—পালপাড়া, দাসপাড়া, নমঃশূদ্রপাড়া, সর্দারপাড়া, জেলেপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাদকুল্লা হইতে বাদকুল্লা-মামজোয়ান রোড্ নামে একটি সাড়ে তিন মাইল দীর্ঘ কাঁচা রাস্তা গ্রাম পর্যন্ত গিয়াছে। গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে আড়ংঘাটা, রানাঘাট ও উত্তরে হাঁসখালী পর্যন্ত নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) চড়ক ও শিবের গাজন—গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে একটি বটবৃক্ষতলে নির্দিষ্ট স্থানে একটি প্রস্তর মূর্তিতে শিবের পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান সেবায়েত হিন্দু, সর্দার বা বুনো সম্প্রদায়ভুক্ত। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী। উৎসবে প্রায় এক সহস্র নরনারী যোগদান করেন।

(ঙ) চড়কের মেলা একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) সংস্কৃত শব্দ "মাম" অর্থে আমাকে বা আমি এবং জোয়ান অর্থে বীর বা শক্তিশালী পুরুষ। বলিষ্ঠ ও শক্তিশালী লোকের বসবাস হেতু সম্ভবতঃ গ্রামের নাম এইরূপ হইয়াছে। পূর্বে যে মামজোয়ান পরগণা ছিল তাহা সাতাশটি গ্রাম লইয়া গঠিত হইয়াছিল। উক্ত সাতাশটি গ্রামের মধ্যে এই গ্রাম খানি শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য এবং সেই কারণে পরগণাটির নাম মামজোয়ান পরগণা হইয়াছিল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বনামধন্য পুরুষ শ্যামা চরণ সরকার এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু ভাষাবিদ্ এবং সংস্কৃত ও ব্যাকরণে মহাপণ্ডিত ছিলেন। তিনি কিছুকাল কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন এবং তৎকালীন কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের চীফ্ ইণ্টারপ্রেটার পদে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীনন্দলাল বিশ্বাস, শিক্ষক,
গ্রাম : মামজোয়ানী, নদীয়া।

জেলা : নদীয়া
থানা : হাঁসখালী

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

পাটুলী গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সর্বজনীন দক্ষিণা কালীর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি ভগ্নপ্রায় পাকা প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরেই দক্ষিণা কালীর মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা করা হয়। অমাবস্যার রাত্রিতেই দেবীর পূজা ও বলিদানের পর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। পূজাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন। এই অঞ্চলে ইহা "ডাকাতে কালী" পূজা নামে খ্যাত। শোনা যায়, এই স্থানে গ্রাম পত্তন হইবার পূর্বে গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং এই জঙ্গলে একদল ডাকাত বাস করিত। উল্লিখিত কালী মন্দিরটি তাহাদেরই নির্মিত।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বাদকুল্লা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে নীলপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। শিবের শীলা মূর্তি আছে। ওই মূর্তি অঞ্জনা নদীর জলে সারা বৎসর ডুবানো থাকে। নীল পূজার দিন মূর্তিটিকে জল হইতে তুলিয়া যথারীতি পূজা-অর্চনা করা হয় এবং উৎসবের শেষে পুনরায় ঐ মূর্তি অঞ্জনা নদীর জলে ডুবাইয়া রাখা হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

মহোৎসব

বাদকুল্লা গ্রামের মধ্যে বজপুকুর নামে খ্যাত স্থানে একটি প্রাচীন বটগাছের নীচে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম মঙ্গলবার সাড়ম্বরে নাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বটগাছের নীচেই যথারীতি পূজাদি হয়—কোন বিগ্রহ বা মূর্তি নাই। উৎসবের পূর্ব দিন রাত্রি হইতে হরিনাম সংকীর্তন আরম্ভ এবং মঙ্গলবারে সারাদিন নামকীর্তন ও পূজা হয়। পরের দিন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের ভোগ পূজার পর উৎসব শেষ হয়। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু লোকজন যোগদান করিয়া থাকেন। স্থানীয় জনসাধারণের উদ্যোগেই উৎসবটি পরিচালিত হইয়া থাকে। বর্তমান পূজারী শ্রী শ্রীদাম মাঝি। ইঁহারা বাগ্দী সম্প্রদায়ভুক্ত এবং বংশানুক্রমে সেবায়েতের কার্য করিতেছেন।

জেলা : নদীয়া
থানা : হাঁসখালী

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

পাটুলী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে অমাবস্যা তিথিতে বুড়ীকালীর পূজা উপলক্ষে অঞ্জনা নদীর উত্তর তীরে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। উৎসব ও মেলাটি দেশ বিভাগের পর আরম্ভ হইয়াছে। আশেপাশের ছয়-সাত মাইলের মধ্যবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে গরুর গাড়ীতে ও হাটিয়া প্রায় বারোশত নর-নারী মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী।

মেলাতে ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবার, বাসন-কোসন, মনিহারী দ্রব্য, কবিরাজী ঔষধপত্র ও বই-ছবি আমদানী হয়। ইহাভিন্ন দুই চারিটি কাপড়চোপড় ও কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান বসে। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রামগুলি হইতেই আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, কবিগান ও যাত্রাভিনয় হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

মামজোয়ানী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে সাধারণের জমিতে মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশেপাশের গ্রামগুলি হইতে সহস্রাধিক যাত্রী আসেন। হাজরাপুর, তাহেরপুর, টাকশালী প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় বিক্রেতারা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের, মনিহারী জিনিসপত্রের, বাসনকোসনের ও কাপড়চোপড়ের মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। ইহাভিন্ন, দুই-চারিটি ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকানও বসে।

মহোৎসবের মেলা

বাদকুল্লা গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রথম মঙ্গলবার মহোৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যবর্তী বজ্র-পুকুর নামক স্থানে সুবৃহৎ ও প্রাচীন একটি বটগাছ ও একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে প্রায় পাঁচ কাঠা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

বাদকুল্লা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রী এবং মেলার ব্যবসায়ীরা আসিয়া থাকেন। প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের, মনিহারী জিনিসপত্রের, কাপড়জামার ও শিল্প সামগ্রীর দোকানপাট বসে।

জেলা : নদীয়া
থানা : শান্তিপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : গয়েশপুর। ৭।১,০৩৬'৪৯।৪৯৩।২,৫৪৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, গোপ, কামার, বর্গক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়, উগ্রক্ষত্রিয়, মুচি, বৈরাগী, নমঃশূদ্র, কলু, নাপিত, ময়রা, হাড়ি, স্বর্ণকার ইত্যাদি। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—জেলেপাড়া, মুচিপাড়া, বর্গক্ষত্রিয়পাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) শান্তিপুর অথবা ধাত্রীগ্রাম রেলস্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি এবং চৈত্রে নীলপূজা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে তারকনাথ নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, একটি নিমগাছ ও একটি শিরীষ গাছের নীচে যথাক্রমে শীতলা ও মনসা পূজা করা হয়।

শ্রীসুপ্রভাত পাত্র, শিক্ষক,
গ্রাম: গয়েশপুর,
পোঃ গয়েশপুর হাজরাতলা, নদীয়া।

২। গ্রাম : চরপানপাড়া (মৌজা : পানপাড়া)। ৮।১,৪৪৮'২৩।৫৮৯।২,৯১০

(ক) কলু, বাগদী ও নমঃশূদ্র।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে ছয় মাইল দূরে শান্তিপুর রেলস্টেশন। গ্রামটির তিনদিক গঙ্গাধারা বেষ্টিত, কেবলমাত্র দক্ষিণদিক বর্ধমান জেলার কৃষ্ণদেবপুর ইউনিয়নের সহিত সংযুক্ত। এই কারণে নৌকা-চলাচলের বিশেষ সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসের পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন। আশেপাশে গ্রামের অধিবাসীগণ উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে অন্নসত্র ও যাত্রা-ভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

ইহাভিন্ন প্রতি বৎসর ১লা মাঘ উত্তরায়ণ উপলক্ষে গঙ্গায় পুণ্য স্নান তর্পনাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) উত্তরায়ণের মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকমলা প্রসাদ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
চরপানপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ কৃষ্ণদেবপুর, নদীয়া।

৩। গ্রাম : বাগআঁচড়া। ১২।১,৫৮০'৫৫।৩৭৬।২,০০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বর্গক্ষত্রিয়, জেলে ইত্যাদি। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন শান্তিপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। ইহাভিন্ন, নদীপথে গ্রাম হইতে কালনা যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসের পূর্ণিমা হইতে ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা পর্যন্ত বাগদেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বাগদেবীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বাগদেবীর একটি মন্দির আছে।

শ্রীজীতেন্দ্র নাথ সিবি,
গ্রাম ও পোঃ বাগআঁচড়া, নদীয়া।

বাগআঁচড়া—শ্রীশ্রীবাগদেবী মাতার স্থান বলিয়া বাগআঁচড়ার খ্যাতি ও পরিচয়। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে জনৈক সাধক খৃষ্টীয় ষোড়শ

শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রঘুনন্দন এইস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিয়া লোকে এই স্থানটিকে সিদ্ধাশ্রম বলিয়া থাকেন। কথিত আছে রঘুনন্দনের ভাগিনেয় মহাদেব মুখোপাধ্যায় এই স্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধ মহাত্মার অভিশাপে এখানকার সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় স্ববংশে নির্বংশ হয়েন। এই চাঁদরায়কে কেহ কেহ রুদ্রের দেওয়ান, কেহ বা বারভুঁইয়ার অন্যতম শ্রীপুরের চাঁদরায় মনে করেন; কিন্তু অন্নদামঙ্গলে ইঁহাকে প্রিয়জ্ঞাতি জগন্নাথ রায়-চাঁদরায় বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়।

চাঁদরায় কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন। তিনি রাজা রুদ্রের নির্দেশক্রমে নিজ গ্রামের সন্নিকটে ব্রহ্ম-শাসন গ্রামখানি স্থাপিত করেন। তিনি যে পূর্ণেন্দু চুম্বিশিখর, অত্যুচ্চ শিবমন্দির স্থাপনা করিয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি এই গ্রামে রহিয়াছে। ক্ষুদ্র একটি চতুষ্কোন প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

উত্তর দিকের মন্দিরটি অপর তিনটি মন্দির অপেক্ষা কিছু ভাল অবস্থায় আছে কিন্তু চূড়া বা আবরণ কিছুই নাই; কেবল চতুর্দিকের ভিত্তি দণ্ডায়-মান। সম্মুখের ভিত্তিতে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ প্রতিমূর্তি; মন্দিরের শীর্ষদেশে এক প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ, মন্দিরের পূর্বদিকের দ্বারের উপর ইষ্টকে খোদিত প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি রহিয়াছে;—

॥ শ্রীশিবঃ ॥

"শাকে বারমতঙ্গবাণ হরিনাঙ্কে নাষ্কিতে শঙ্করং
সংস্থাপ্যাশু সুধা সুধাকর কর ক্ষীরোদনীরোপমং।
তস্মৈ সৌধমিদমুদা সুজলদানিলীনলোলধ্বজং
তৎপাদেরিত ধীর ধীরবিরতং শ্রীচাঁদরায় দদৌ।"

অর্থাৎ সতত স্থিরবুদ্ধি শ্রীচাঁদ রায় ১৮৫৭ শকে শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া পূর্ণচন্দ্রের কিরণ ও ক্ষীরোদ জলতুল্য এবং নিবিড় মেঘ সংলগ্ন চঞ্চল ধ্বজ যুক্ত এই মন্দির সেই শিবপদে অর্পণ করিয়াছেন।

(নদীয়া কাহিনী—শ্রীকুমুদ নাথ মল্লিক, পৃঃ ৩২০-৩২১)

বাগআঁচড়া গ্রামে বাগদেবীর পূজা চাঁদরায় নামক জনৈক কীর্তিমান পুরুষ কর্তৃক ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত চারিটি শিব মন্দির সম্পর্কে শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহ রায় মহাশয়ের লিখিত "আমাদের গ্রাম" নামক পুস্তিকায় নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়:

"শান্তিপুরের নিকটেই এই বাগ আঁচড়া গ্রাম। শ্রীশ্রীবাগদেবী মাতার স্থান ব'লে বাগ-আঁচড়ার খ্যাতি ও পরিচয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দেবীর প্রতিষ্ঠা ব'লে জানা যায়। সাধক রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায় এই দেবীর প্রতিষ্ঠা করেন। সাধক রঘুনন্দন এই স্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসন ক'রে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। শোনা যায়, তিনি খুব শক্তিমান সাধক ছিলেন। গঙ্গা তখন নিকটেই ছিল। প্রায়ই তিনি কুম্ভক ক'রে গঙ্গার উপর দিয়ে কালনা যেতেন ব'লে শোনা যায়। তিনি যে ঘট স্থাপন করেছিলেন সেই ঘটই নাকি এখনও বর্তমান। সে সময় ঘর ছিল না—গাছতলায় তিনি পঞ্চমুণ্ডির আসন ক'রে সাধনা করেছিলেন। সেইস্থানে আজ পাকা ঘর উঠেছে—দালান হয়েছে—চাঁদনী হয়েছে যাত্রীদের সুবিধার জন্যে। এই মন্দিরের পাশেই সেবাইত বাস করেন। মন্দিরের পাশের গাছটীতে অসংখ্য ইঁট ঝুলতে দেখে অনুসন্ধানে জানা গেল যে যাত্রীরা কামনা ক'রে ইঁট বেঁধে দিয়ে যায়। পরে কামনা পূর্ণ হ'লে এসে খুলে দিয়ে পূজা দিয়ে যায়—কোন মূর্তি নেই কেবল একটী সিঁদুর মাখান ঘট ছাড়া। এতদঞ্চলে বাগদেবীকে সকলেই ভক্তি করে, পূজা দেয়, মানত করে।

একটী চতুষ্কোন প্রাঙ্গণের চারিদিকে চারিটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখা যায়। একটী মাত্র মন্দির কালের সাক্ষী-স্বরূপ এখনও অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন হ'য়ে কোনরূপে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। এই মন্দিরগাত্রে নানাবিধ মূর্তি খোদিত আছে এবং এর কারুকার্য্যও দেখবার মত। মন্দির নির্মাণের কুশলতা ও দুরবস্থা দেখে প্রাচীনত্বের দাবী করা যেতে পারে। তা ছাড়া আমরা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

প্রথম আমলে হেজেসের (Hedges) ডাইরীতে এই গ্রামের, এই মন্দিরের উল্লেখও দেখতে পাই।

যে সব কিংবদন্তী ও ইতিহাস এখনও মুখে মুখে চলছে তা হচ্ছে এই যে—চাঁদরায় বাগআঁচড়া হ'তে প্রত্যহ ঘোড়ার রথে ক'রে প্রায় দেড় মাইল দূরে হরিনাভী গ্রামের নীচে গঙ্গাস্নান করতে যেতেন। যে রাস্তা দিয়ে তিনি যেতেন সেই রাস্তার নাম আজও চাঁদ রায়ের জাঙ্গাল বলে পরিচিত।

বাগআঁচড়ার অপর নাম চাঁদরায়ের নামানুসারে চাঁদড়া বা চাতুড়াও বলে। বাগআঁচড়ার চাঁদরায়ের শিল্প। মন্দিরের পাদদেশেই গোপেয়া বিল। পূর্ব্বে এখানে গঙ্গা ছিল, পরে গঙ্গা সরে দূরে চলে যাওয়ায় গঙ্গা বক্ষের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে এই বিল। বিল হলেও বারমাসই এখানে জল থাকে এবং শিব মন্দিরের শিবও থাকেন এই বিলের জলে। প্রতি বৎসর গাজনের সময় সন্ন্যাসীরা জল হ'তে শিব তুলে এনে মন্দিরে বসিয়ে পূজা করে, চড়কের পর আবার জলে ডুবিয়ে রাখে এক বৎসরের মত। গাজনের ক'দিন মন্দির প্রাঙ্গণ কলকোলাহলে মুখরিত হ'য়ে ওঠে, হাসি আনন্দে ভরপুর হ'য়ে ওঠে নির্জ্জন পরিত্যক্ত স্থান।

৪। গ্রাম : শান্তিপুর।২২।৮৮০·৬৪ (শহরাঞ্চলের)

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, তিলি, তামুলি, গোপ, নাপিত, মোদক, কামার, কাংসবণিক, কুমার, তাঁতি, গোয়ালা, ছুতার, রজক, শুঁড়ি, কলু, জেলে, বাগদী, নিকিরি, নমঃশূদ্র, চণ্ডাল, মুসলমান প্রভৃতি।

শান্তিপুর বহু পাড়ায় বিভক্ত। পাড়াগুলির নাম নীচে উল্লেখ করা হইল :—

হাটখোলাপাড়া, কাশ্যপপাড়া, মদনগোপাল পাড়া, দত্তপাড়া, মতিগঞ্জ, বেজপাড়া (বৈদ্যপাড়া), বড়বাজার, শ্যামচাঁদপাড়া, লক্ষ্মীতলাপাড়া, চৌগাছা, বাতুরতলা, বুড়ো শিবতলা, কাঁসারিপাড়া, কুটীরপাড়া, বড়গোস্বামীপাড়া, সবানন্দপাড়া, পাগলা গোস্বামী পাড়া, চাতুনীপাড়া, কটকপাড়া, বল্লভীপাড়া, পঙ্করত্নতলা, জীলেশ্বরতলা, তিলিপাড়া, বোকাপাড়া, রামনগরপাড়া, দোকানতলা, চৈতলপাড়া, ডাবরেপাড়া, দাম্মে (দরিদ্র) ছুতারপাড়া, ডাকঘরপাড়া, মৈত্রপাড়া, আশানন্দপাড়া, ভবানীপাড়া, পটেশ্বরীতলা, রথতলা, উড়িয়া গোস্বামীপাড়া, কুমারপাড়া, মুদীপাড়া, মধ্যপাড়া, মামুদোপাড়া, কল্লাপাড়া, মুচিপাড়া, বাউড়ীপাড়া, শ্যামবাজার, খড়জালা, ভেরীপাড়া, বাউই গাছি, নিশ্চিন্তিপুর, নূতন গ্রাম, বেড়পাড়া, তোপখানাপাড়া, নূতন হাট, গোপালপুর, তরফদার পাড়া, পাটোয়াপাড়া, পুঁইপাড়া, সাহাপাড়া, তামাচকাপাড়া, নপাড়া, জেলে পাড়া, বড়ভুজপাড়া, আচায্যপাড়া, নিকিরিপাড়া, বাবলা, সাহেবডাঙ্গা, রামনগর চর, নেবুতলা, চরাজজিরা, আস্তাবল পাড়া, মালঞ্চ প্রভৃতি।

(খ) চাকুরী, কৃষিকায, তাঁত শিল্প ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্বরেলপথে শিয়ালদহ হইতে শান্তিপুর পর্যন্ত একটি রেলপথ আছে। ইহাভিন্ন, স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির পাকা রাস্তা দিয়া নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। শান্তিপুরের পশ্চিমে প্রবাহিত গঙ্গা নদী দিয়া নৌকা যাতায়াত করে।

(ঘ) শান্তিপুরের প্রখ্যাত শ্যামচাঁদ মন্দিরে এবং বিভিন্ন গোস্বামীদিগের গৃহে ও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বৈষ্ণব-পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উহার মধ্যে শ্রাবণ মাসে ঝুলন, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কাতিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

হাটখোলা গোস্বামী বাড়ীতে বিশেষ আড়ম্বরে সহিত ঝুলনযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্রাবণ মাসের ত্রয়োদশী, চতুর্দ্দশী ও পূর্ণিমাতিথিতে আলোকমণ্ডিত সুসজ্জিত নাট মন্দিরে গোকুলচাঁদ বিগ্রহ স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা, কীর্তন ও উৎসব পালিত হয়।

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে শান্তিপুর মতিগঞ্জে ও সূত্রাগড়ে অবস্থিত

গণেশ মন্দিরে গণেশপূজা, পূর্ণিমা তিথিতে বড়-বাজারের ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক ব্রহ্মাপূজা, আষাঢ় মাসে বড়গোস্বামী ও হাটখোলা গোস্বামীদিগের দেবালয়ে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে বিভিন্ন পল্লীতে ও গোস্বামীদিগের গৃহে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে সূত্রাগড়ে জগদ্ধাত্রী পূজা, মাঘ মাসে বিভিন্ন পূজা মণ্ডপে অনেকগুলি সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে বাসন্তীপূজা ও শিবরাত্রি উৎসব, চৈত্র মাসে দুইটি অন্নপূর্ণাপূজা, গণেশজননী-পূজা এবং চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অন্নপূর্ণা পূজা শান্তিপুরের সোনাপটির ব্যবসায়ী-গণের উৎসব। ইহা বাংলা ১২৬০ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী অন্ন মহোৎসব ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

রথযাত্রা উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে পদ্মাসনে উপবিষ্ট সবুজ বর্ণের রঘুনাথ মূর্তি, দারুময় জগন্নাথ মূর্তি এবং তৎসহ শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ ও নারায়ণ শিলাদি সুসজ্জিত রথে স্থাপন করিয়া রথের দড়ি টানা হয়। রথটানার মিছিলে বহু নরনারী ও বাজনার দল যোগদান করেন।

শান্তিপুরে প্রতিষ্ঠিত বুড়ো শিব, শ্মশানেশ্বর শিব, কাশীনাথ ও জলেশ্বর শিব মন্দিরে প্রতি বৎসর যথারীতি শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জলেশ্বর শিব মন্দিরটি বৃহৎ এবং মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটির উর্ধভাগে চক্ষু খোদিত আছে।

ইহাভিন্ন, শান্তিপুরের অন্তর্গত মালঞ্চ পল্লীতে স্থানীয় মুসলমানগণ প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ রবিবার "গাজী মিঞার বিবাহ" নামে একটি উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) ব্রহ্মাপূজার মেলা। বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে ছয় দিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

গাজী মিঞার বিবাহ উৎসব উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসের শেষ রবিবার। মেলাটি প্রাচীন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একমাস ব্যাপী। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) শান্তিপুরের বিভিন্ন স্থানে বহু মন্দির, দেবালয় ও মসজিদ আছে। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতকগুলি দেবালয় ও বিগ্রহাদির বিবরণ নীচে দেওয়া হইল :—

বৈষ্ণবদিগের দেবদেবী—বড় গোস্বামী বাড়ীর রাধারমণ জীউর মন্দির, পাগলা গোস্বামী বাড়ীর কৃষ্ণরায় ও কেশবরায় মন্দির, চাক্‌ফেরা গোস্বামী বাড়ীর রাধাবল্লভ জীউর মন্দির, বাঁশবনিয়া গোস্বামী বাড়ীর শ্যামসুন্দর মন্দির, মহাভারত পোদ্দার বাড়ীর রাধামাধব মন্দির, ৺কুঞ্জনাথ সাহার বাড়ীর রাধাবল্লভ বিগ্রহ, অদ্বৈতাচার্য্য ঠাকুরবাড়ীর মদনগোপাল মন্দির, হাটখোলা গোস্বামী বাড়ীর গোকুলচাঁদ ও রাধামাধব মন্দির, ৺কালাচাঁদ দে মহাশয়ের বাড়ীর লক্ষ্মীজনার্দ্দন মন্দির, পোদ্দার পরিবারের গোপীনাথ বিগ্রহ, খাঁ-চৌধুরী পরিবারের প্রতিষ্ঠিত শ্যামচাঁদ মন্দির, কুটীর পাড়ার নন্দদুলাল মন্দির, কাশ্যপ ভট্টাচার্য বাড়ীর গোবিন্দ জীউ মন্দির, ৺রঘুনাথ গোস্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায় মন্দির, রায় বাড়ীর গৌরহরি, নূতন গ্রামে ৺দামোদর মুখোপাধ্যায় বাড়ীর জ্যাঠা গোপীনাথ, রাধাবল্লভ রায়ের বাড়ীর রাধারমণ মন্দির, উড়িয়া গোস্বামী বাটীর নৃত্যগোপাল ও মদনমোহন, দিল্লী বাড়ীর গোপাল, আতাবুনিয়া গোস্বামী বাড়ীর শ্যাম-সুন্দর, ৺হরিমোহন প্রমাণিক মহাশয়ের বাড়ীর শ্রীধর মন্দির, ৺পাটী রায় মহাশয়ের বাড়ী কৃষ্ণচন্দ্র, ৺নিত্য-গোপাল ঠাকুর বাড়ীর বঙ্কুবিহারী, রাধাকান্ত বিগ্রহ, রানী ভবানীর গুরু বংশ ভট্টাচার্য বাড়ীর বিশ্বমোহন,

৺হরিনারায়ণ তরফদার মহাশয়ের বাড়ীর লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ, চরার উড়িয়াদের জগন্নাথ বিগ্রহ ইত্যাদি।

অন্যান্য দেব-দেবী ও দেবালয়। শান্তিপুরের মতিগঞ্জে একটি মন্দিরে জয়দুর্গা দেবীর ধাতুময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, দেবীর নিত্যপূজা হয়। বড়বাজার সোনাপট্টিতে কৃষ্ণনগরের মহারাজ কর্তৃক পূজিত একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, নিত্য পূজা হয়। নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে দক্ষিণা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে নিত্য পূজা হয়। ৺রজনীকান্ত মৈত্র কর্তৃক স্থাপিত দুইটি মন্দিরে কাশীনাথ ও শ্মশানেশ্বর নামে খ্যাত দুইটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, শান্তি-পুরের বিভিন্ন পল্লীতে অনেকগুলি শিবমন্দির এবং সূত্রাগড়ে একটি গণেশমন্দির আছে। আগমেশ্বরী পাটে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া উৎসব পালন করা হয়।

শান্তিপুরে মুসলমান সম্প্রদায়ের কয়েকটি মসজিদ আছে, তন্মধ্যে তোপখানা পাড়ায় ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক ১৭০২ (১৭০৫?) খৃষ্টাব্দে নির্মিত মসজিদটি উল্লেখযোগ্য। এই মসজিদ-এ স্বামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী অনেক সময় ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। এই মসজিদ-এর নিকট পীর মোবারক গাজী সাহেবের আস্তানা আছে, ইহা পীরের হাট নামে খ্যাত।

শান্তিপুরের উৎপত্তি সম্পর্কে কোন প্রামাণিক তথ্য পাওয়া যায় না। তবুও বিদগ্ধজনের ধারণা যে, এই সুপ্রাচীন ভূখণ্ড পুরাকালে সমুদ্রগর্ভে অবস্থিত ছিল। কালের গতিতে সেই অসীম জলরাশি ভেদ করিয়া এই ভূখণ্ডের আবির্ভাব হয়। বিভিন্ন গ্রন্থাদি এবং প্রাচীন ইতিহাস প্রভৃতি পর্য্যালোচনা করিলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, দশম শতাব্দী হইতেই শান্তিপুর নাম প্রচলিত হইয়াছে।

বহুকাল পূর্বে সেনরাজগণের রাজত্বকালেই শান্তিপুর নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার অনেকের ধারণা যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে এই স্থানে শান্তিপন নামে এক মুনি বাস করিতেন। হয়তো তাহার নামানুসারে বা তিনি এই পুরে শান্তিলাভ করেন বলিয়া এই স্থানের নাম শান্তিপুর হইয়াছে। লালমোহন বিদ্যানিধি মহাশয় তাঁহার "সম্বন্ধ নির্ণয়"-এর এক স্থানে লিখিয়াছেন—

"শান্তিপণ মনোবাসাং শান্তিপুরমিতি স্মৃতং।"

অপর একস্থানে লিখিয়াছেন—

"বটগ্রাম বর্ধমানে গঙ্গা ও প্রদীপ।
গঙ্গাবাসে গুপ্ত পল্লী অম্বিকা সমীপ॥
পরপারে থাকে শান্তিপন মুনিবর।"

(পৃঃ ৭০৮-৯)

আবার অনেকের ধারণা এই যে, শ্রীশ্রীমৎ স্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের শিক্ষাগুরু ফুলিয়ার শাস্ত্রাচার্য্য বেদান্ত বাগীশের বা দ্বিতীয় শান্তমুনির এই স্থানে আশ্রম ছিল। সেই হেতু এই স্থানের নাম শান্তিপুর হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, এই স্থানে বুড়াশিবের প্রতিষ্ঠাতা এক শান্তমুনি ছিলেন। তাঁহার নামানু-সারেই এই স্থানের নাম শান্তিপুর হইয়াছে।

অপর এক মতে এই স্থানে শান্তিকর নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন, ঐ শান্তিকরের নাম হইতেই বর্তমান শান্তিপুর নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ডক্টর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও এইরূপ জনশ্রুতির প্রামাণিক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

আবার ইহাও সম্ভব যে, তৎকালীন প্রচলিত প্রথানুযায়ী জীবনসায়াহ্নে ভাগীরথী তীরে এই মনোরম স্থানে শান্তিলাভার্থে বহুলোক বাস করিতে আসিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম শান্তিপুর হইয়াছে।

শ্রীকমলা কিঙ্কর মিত্র, শিক্ষক,
ও
শ্রীসমর লাহিড়ী চৌধুরী, শিক্ষক,
সিদ্ধেশ্বরীতলা হাটখোলা পাড়া,
পোঃ শান্তিপুর, নদীয়া।

শান্তিপুর—কলিকাতা হইতে আটান্ন মাইল দূর। ইহা একটি অতি প্রাচীন গ্রাম। এই স্থানটি কত প্রাচীন তাহা বলা কঠিন। প্রায় আট শত বৎসরের উপর হইতে শান্তিপুর প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। পূর্ব্বে শান্তিপুরের তিন দিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত ছিল, এখন কিন্তু গঙ্গা দূরে পশ্চিম দিকে সরিয়া গিয়াছে।

শান্তিপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকে বলেন যে শান্ত নামক জনৈক মুনির বাসস্থান ছিল বলিয়া এই স্থানের নাম শান্তপুর বা শান্তিপুর হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে শান্তিপুর গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া অনেকে তাঁহাদের মৃতকল্প পিতামাতাকে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য এখানে লইয়া আসিতেন। যাঁহারা দৈবাৎ রোগমুক্ত হইতেন তাঁহারা আর সংসারে ফিরিয়া না গিয়া এই স্থানেই শান্তিতে জীবন যাপন করিতেন। এইরূপ শান্তিপ্রিয় লোকদের লইয়া এই গ্রাম গঠিত হয় বলিয়া ইহার নাম শান্তিপুর হয়।

শান্তিপুরে অনেকগুলি মন্দির ও দেববিগ্রহ আছে। মন্দিরগুলির মধ্যে শ্যামচাঁদ, গোকুলচাঁদ ও জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরেই সমধিক বিখ্যাত। শ্যামচাঁদের প্রকাণ্ড মন্দিরটি ১৭২৬ খৃষ্টাব্দে শান্তিপুর নিবাসী তন্তুবায়কুলোদ্ভব রামগোপাল খাঁ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক প্রায় দুইলক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়। গোকুলচাঁদের মন্দিরটি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। জলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণের মাতা প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরগুলি বাংলার শিল্পপদ্ধতি অনুসারে নির্মিত এবং ইহাদের কারুকার্য অতি সুন্দর। বিশেষতঃ জলেশ্বর মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে উৎকীর্ণ পৌরাণিক চিত্রাদির শিল্পচাতুর্য্য অতি চমৎকার। শান্তিপুরের বড় বাজারে সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে এক প্রকাণ্ড কালী মূর্ত্তি আছে। এইরূপ বড় বিগ্রহ সচরাচর দেখা যায় না। ইহা ছাড়া গোস্বামীদের নাটমন্দির ও পঞ্চরত্ন মন্দিরও দ্রষ্টব্য।

শান্তিপুরে অধিকাংশ পালা-পার্ব্বণ বিশেষ সাড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তবে এখানকার রাসের উৎসবই দেশ বিখ্যাত। শান্তিপুরের ভাঙ্গা রাসের শোভাযাত্রা দেখিবার জন্য বাংলার নানা স্থান, এমন কি সুদূর ত্রিপুরা ও মণিপুর হইতেও বহু যাত্রীর সমাগম হয়। রাস উৎসবের শেষ দিন গোস্বামিগণের গৃহস্থিত বিগ্রহগণকে চতুর্দ্দোলার উপর স্থাপন করিয়া একসঙ্গে শোভাযাত্রা সহকারে নগর প্রদক্ষিণ করানো হয়। ইহারই নাম "ভাঙ্গা রাস"। এই মেলায় সুন্দর দেশীয় পুতুল প্রভৃতি লোক-শিল্পের নিদর্শন এখনও বিক্রীত হয়।

মুসলমান যুগেও শান্তিপুর একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। পাঠান আমলে এই স্থানে একজন কাজী ছিলেন। বাদশাহ আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ফৌজদার মহম্মদ ইয়ার খাঁ কর্তৃক শান্তিপুরের তোপখানায় একটি সুদৃশ্য মসজিদ নির্মিত হয়। ইহা শান্তিপুরের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু।

প্রাচীনকাল হইতেই শান্তিপুর বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার প্রস্তুত সূক্ষ্ম বস্ত্র পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও রপ্তানি হইত। নবদ্বীপের ন্যায় শান্তিপুরও পূর্বে সংস্কৃত চর্চার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার পণ্ডিতবর্গের মধ্যে শ্রীরাম গোস্বামী, চন্দ্রশেখর বাচস্পতি ও রামনাথ তর্করত্ন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ সুপ্রসিদ্ধ হাস্যরসিক গোপালভাঁড় শান্তিপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার লোককে হাসাইবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাহার রসিকতা সম্বন্ধে বহু কাহিনী জনসমাজে প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে শান্তিপুরে আশানন্দ মুখোপাধ্যায় নামে একজন বীরপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন।

কয়েক বৎসর হইল বীর আশানন্দের স্মৃতি রক্ষাকল্পে তদীয় বাসভবনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বর্তমান যুগের অন্যতম মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী শান্তিপুরের সুবিখ্যাত অদ্বৈত্য বংশে জন্মগ্রহণ

করেন। ১২৫১ বঙ্গাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। যৌবনে তিনি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন এবং মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একবার গয়ায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিতে গিয়া বিজয়কৃষ্ণ একজন সিদ্ধ যোগী পুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বিজয়কৃষ্ণ পুনরায় সনাতন হিন্দু ধর্মে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার অলৌকিক যোগপ্রভাব সম্বন্ধে তাঁহার জীবনী লেখকগণ বহু কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বহু শিষ্য প্রশিষ্য এখনও বর্ত্তমান আছেন। শেষ বয়সে বিজয়কৃষ্ণ পুরীধামে বাস করিতেন। সেখানে তিনি "জটিয়া বাবা" নামে পরিচিত হন। পুরীধামের নরেন্দ্র সরোবরের তীরে তাঁহার সমাধি ও মঠ বিরাজিত আছে।

শান্তিপুর একটি শহর বিশেষ। এখানে মিউনিসিপ্যালিটি আছে। এখানকার অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে রিভার টমসন্ হং শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদ, খোন্দকারদিগের স্থাপিত দাতব্য চিকিৎসালয়, গোস্বামীদের নাটমন্দির, পঞ্চরত্ন মন্দির ও মিউনিসিপ্যাল অফিস প্রভৃতি প্রধান।

[বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত পৃঃ ৯২-৯৮।]

Santipur—Santipur town, 58 miles from Calcutta. This is a very ancient town, more than 800 years old. It has a Sripat of the Vaishnavas. The town contains several famous temples built in the 18th century by wealthy weavers. The most famous is the Shyamchand temple, built in the year 1826, and the others are the temples of Gokulchand and Jaleswar. The Gokulchand temple was built in 1740. The Jaleswar temple was built early in the 18th century by the mother of Ramkrishna, Maharaja of Nadia. The Jaleswar temple has the most exquisite brick carvings. Besides these temples there are other temples belonging to the Goswamis including a Pancharatna temple and a large Natmandir.

There is a fairly ancient mosque called the Topkhana mosque."

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A. Mitra, p. 198)

৫। গ্রাম : বাবলা (মৌজা : গোবিন্দপুর)।
৩২১১,৯৪২'৭১১৬৬৬।৩,৩২৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, দুলোপাড়া, সদ্গোপপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে একমাইল দূরে শান্তিপুর রেলস্টেশন। রিক্সা ও মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে অদ্বৈতপাটে দোল উৎসব। উৎসবটি বহুপ্রাচীন।

(ঙ) পঞ্চম দোলের মেলা। ফাল্গুন মাসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে অদ্বৈত আশ্রমের মধ্যে অবস্থিত একটি মন্দিরে অদ্বৈত মহাপ্রভুর এবং গৌর নিতাই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীনির্মল কান্তি ঘোষ, গ্রামসেবক,
গ্রাম : বাবলা, নদীয়া।

……বাবলা গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈত আচার্য্যের পাটবাড়ী অবস্থিত। অদ্বৈত আচার্য্য শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড় পরগণার নবগ্রাম নামক পল্লীতে ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুবের আচার্য্য লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। মাত্র দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য অদ্বৈত শান্তিপুরে আগমন করেন। তাঁহার প্রকৃত নাম কমলাক্ষ, অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহার উপাধি। শান্তিপুরের অন্তঃপাতী পূর্ণবাটী গ্রাম নিবাসী শান্ত বেদান্তবাগীশ নামক জনৈক অধ্যাপকের নিকট বেদ-চতুষ্টয় অধ্যয়ন করিয়া তিনি "বেদ পঞ্চানন" ও

"অদ্বৈত আচার্য্য" উপাধি লাভ করেন। বিদ্যাশিক্ষান্তে অদ্বৈত গঙ্গাতীরবর্তী শান্তিপুর গ্রামেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। বৈষ্ণবজগতে তিনি মহাবিষ্ণু বা শিবের অবতার রূপে পূজিত। তাঁহার ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়াই গৌরাঙ্গদেব নবদ্বীপে অবতীর্ণ হন, বৈষ্ণব গ্রন্থাদিতে এইরূপ বর্ণিত আছে, যথা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে

"অদ্বৈতের কারণে চৈতন্য অবতার।
সেই প্রভু কহিয়াছেন বার বার॥"

বৈষ্ণব জগতে শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরেই অদ্বৈতাচার্য্যের স্থান নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। অদ্বৈতের বয়স যখন ৫২ বৎসর সেই সময়ে চৈতন্যদেবের জন্ম হয়। শ্রীচৈতন্যদেব বহুবার শিষ্যগণসহ শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে পদার্পন করিয়াছিলেন। অদ্বৈত দীর্ঘজীবী পুরুষ ছিলেন। ১২৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে শান্তিপুরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। অদ্বৈতের বংশধরগণ এখনও শান্তিপুরে বাস করিতেছেন।
[বাংলায় ভ্রমণ: ১ম খণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৯২-৯৭]

৬। গ্রাম: ফুলিয়া। ৫৪।৩৯০'৩৩।২৬৪।১,১৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ এবং তপশীল জাতির বাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) মাঘে মহাকবি কৃত্তিবাসের স্মৃতি উৎসব এবং ফাল্গুন পূর্ণিমার নয় দিন পর ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) কৃত্তিবাস প্রাঙ্গণে কৃত্তিবাসের সমাধি ও একটি মন্দির আছে। উক্ত মন্দিরাভ্যন্তরে নারায়ণ, কৃষ্ণ, বলরাম, রেবতী, রাধা প্রভৃতি দেবদেবীর বিগ্রহ আছে। মন্দিরটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। বৈষ্ণব মতে ঐ সকল দেব বিগ্রহের নিত্য পূজাদি হইয়া থাকে।

শ্রীশচীন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, গ্রামসেবক,
বলাগড়িয়া অঞ্চল পঞ্চায়েত,
পোঃ ফুলিয়া বয়ড়া, নদীয়া।

ফুলিয়া নদীয়া জেলার একটি অতিপ্রাচীন ও বর্দিষ্ণু গ্রাম। ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন সম্পাদিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের রচয়িতা মহাকবি কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ে যে বিবরণ দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল।

"পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তারপর আছিল নরসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিরহে গঙ্গা কূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি॥
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশ-বাণী শুনিবারে পায়॥
মালীজাতি ছিল তথায় মালঞ্চ এথানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া যে জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিনী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হইল তাহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্র-পৌত্রে বাড়ায় সন্ততি॥"

Fulia—A new small town, 6 miles from Ranaghat and 4 miles from Santipur on the Santipur-Ranaghat road. Built mainly at the instance of the Government

of India to house Displaced persons arriving in the district, the town was carefully planned to contain large industrial buildings, administrative buildings, a vocational training centre, an agricultural farm, facilities of irrigation, a central pipe water supply and electricity. The town was well laid out with roads, streets and lanes, including provision for community recreation centres, hospitals, high schools, primary schools and parks. It certainly is an example of how a small town should be built up from nothing at all. (p. xliv)

This contains the ancient altar of the famous Vaishnava, Jaban Haridas. Fulia is also the birthplace of the great Bengali poet, Krittibas. The altar of Haridas contains some exquisite specimens of carved wooden images. (p. 168)

(District Handbooks, Nadia, 1951, by A Mitra)

ফুলিয়া—শান্তিপুর শাখায় রাণাঘাট হইতে ৯ মাইল এবং কলিকাতা হইতে ৫৪ মাইল দূর। ফুলিয়া "ভাষা-রামায়ণ"-কার মহাকবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান। ১৪৪০ খৃষ্টাব্দের মাঘমাস রবিবার শুক্লা পঞ্চমীর দিন সরস্বতী পূজার শুভবাসরে বাণীর বরপুত্র মহাকবি কৃত্তিবাস জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম বনমালী ও মাতার নাম মালিনী দেবী। ইঁহারা মুখুটি ব্রাহ্মণ; এই বংশের নবাব প্রদত্ত উপাধি ছিল "ওঝা"। কৃত্তিবাসের সময়ে ফুলিয়া অতি সমৃদ্ধ স্থান ছিল; তখন ইহার দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত। আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন,

"গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥"

গুরু গৃহে শিক্ষা সমাপনান্তে কৃত্তিবাস পণ্ডিতরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। রাজপণ্ডিত হইবার আশায় তিনি গৌড়েশ্বরের সভায় গমন করেন এবং স্বরচিত পাঁচটি সংস্কৃত শ্লোক রাজার নিকট প্রেরণ করেন। রাজসভায় তিনি যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন। গৌড়েশ্বরের ইচ্ছানুসারে তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া বঙ্গভাষায় রামায়ণ রচনা করিতে আত্মনিয়োগ করেন। এই গৌড়েশ্বর কে ছিলেন, তদ্বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে; কেহ কেহ বলেন যে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণই কৃত্তিবাস বর্ণিত গৌড়েশ্বর, আবার কাহারও কাহারও মতে রাজা গণেশ ও এই গৌড়েশ্বর অভিন্ন। কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণই বাংলা ভাষার আদি কাব্য বলিয়া অনেকের অভিমত। কৃত্তিবাস বাল্মীকির রামায়ণের যথাযথ অনুবাদ না করিয়া উহার আখ্যানভাগ অবলম্বনে মৌলিক মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন। স্থানে স্থানে তিনি অন্যান্য পুরাণ হইতে বা কথকগণের প্রমুখাৎ শ্রুত হইয়া আখ্যান ভাগের মধ্যে নব নব বিষয়ের সন্নিবেশ করিয়াছেন। কৃত্তিবাস বর্ণিত শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গাপূজা, হনুমান কর্তৃক রাবণের মৃত্যুবান হরণ, মহীরাবণ বধ ও লবকুশের যুদ্ধ প্রভৃতি সুপরিচিত বিষয়গুলি বাল্মীকির রামায়ণে দৃষ্ট হয় না।......

কৃত্তিবাসের সময়ের গ্রামরত্ন ফুলিয়া এখন জনবিরল পরিত্যক্ত পল্লীর রূপ ধারণ করিয়াছে। ফুলিয়া হইতে গঙ্গা এখন প্রায় ৪ মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে। ২৬ বৎসর পূর্ব্বে মহাকবি কৃত্তিবাসের ধ্বংসপ্রাপ্ত জন্মভিটায় সাহিত্যসেবীদিগের উদ্যোগে একটি স্মৃতি স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার পার্শ্বে "কৃত্তিবাস কূপা" নামে একটি কূপ ও সম্মুখস্থ বিস্তৃত অঙ্গনের অপর দিকে "কৃত্তিবাস স্মৃতি বিদ্যালয়" নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শান্তিপুর সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে কৃত্তিবাসের জন্মভিটায় সাহিত্যসেবী ও স্বজাতিপ্রেমিক বাঙালী-দিগের একটি সম্মেলন হয়।......

কৃত্তিবাসের স্মৃতি স্তম্ভের গাত্রে নিম্নলিখিত কথাগুলি লিখিত আছে,—

"মহাকবি কৃত্তিবাসের
আবির্ভাব—১৪৪০ খৃষ্টাব্দে, মাঘমাস,
রবিবার।

হেথা দ্বিজোত্তম
আদি কবি বাঙ্গালার ভাষা রামায়ণকার
কৃত্তিবাস লভিলা জনম,
সুরভিত সুকবিত্বে ফুলিয়ার পুণ্যতীর্থে
হে পথিক, সম্ভ্রমে প্রণম।
শ্রীযুক্ত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী কর্ত্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হইল।
২৭শে চৈত্র, ১৩২২ বঙ্গাব্দ।"

সমাধি স্তম্ভের দক্ষিণদিকে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের নীচে একটি ভগ্ন ইষ্টক স্তূপ আছে। উহা কৃত্তিবাসের দোলমঞ্চ নামে পরিচিত। আশেপাশের জমি হইতে কৃত্তিবাসের জন্মভিটা অনেক উচ্চ। অনুমান হয় যে এই স্থান খনন করিলে অনেক অট্টালিকাদির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে।

কৃত্তিবাসের জন্মভিটার অতি নিকটে অবস্থিত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠ ফুলিয়ার অন্যতম দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণব সাহিত্যে বর্ণিত আছে যে "যবন" হরিদাস বা ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুর বেনাপোল পরিত্যাগ করিবার পর শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের সহিত মিলিত হন এবং নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রামে গঙ্গারতীরে "গোফা" বা মৃত্তিকা গাত্রে নির্ম্মিত কুটীরের মধ্যে ভজন সাধন করিতে থাকেন। মুসলমান হইয়া তিনি হিন্দুধর্মের অনুষ্ঠান করায় কাজীর অভিযোগ অনুসারে মুলুকপতি বা প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে লোকজন দিয়া ধরিয়া লইয়া যান এবং বহু যুক্তিতর্কের দ্বারাও তাঁহাকে স্বমতে আনিতে সমর্থ না হওয়ায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে একে একে বাইশ বাজারে লইয়া বেত্রাঘাত করিবার আদেশ দেন। সাধারণতঃ দুই তিন বাজারে মার খাইলেই লোকের জীবনান্ত হইত, কিন্তু ভক্ত শিরোমণি হরিদাস বাইশ বাজারে অতি গুরুতরভাবে প্রহৃত হইয়াও কোন রূপ দুঃখপ্রকাশ করিলেন না। যে সমস্ত লোক তাঁহাকে বিনাদোষে নির্য্যাতন করিতেছিল, তাহাদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া তিনি করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন,

"এ সব জীবেরে প্রভু করহ প্রসাদ।
মোরে দ্রোহে নহু এ সবার অপরাধ॥"

জগৎ-প্রেমিক যীশু খ্রীষ্টের পর এরূপ অপূর্ব্ব ক্ষমার আদর্শ জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। বৈষ্ণব জগতে ঠাকুর হরিদাসের স্থান অতি উচ্চে। স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহাকে "পৃথিবীর শিরোমণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হরিদাসের অপূর্ব প্রভাবের পরিচয় পাইয়া কাজী ও মুলুকপতির মন ফিরিয়া গেল। তাঁহারা তাঁহাকে যথেচ্ছ বিচরণ ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের স্বাধীনতা প্রদান করিলেন। হরিদাস ঠাকুর ফুলিয়ায় ফিরিয়া আসিয়া সেই গোফার মধ্যে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ তিন লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ফুলিয়ার বিখ্যাত ব্রাহ্মণ সমাজ তাঁহার অনুগত হইল। অনেকেই ধর্ম্মালোচনার জন্য তাঁহার নিকট আগমন করিতেন। বৈষ্ণবগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে হরিদাস ঠাকুরের গোফার মধ্যে এক বিষধর সর্প বাস করিত। হরিদাসের ভক্তগণ এই সর্পের বিষের জালায় গোফার নিকটে আসিতে পারিতেন না, কিন্তু হরিদাস নিজে এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না বা তাঁহার কোন কষ্টবোধই হইত না। ভক্তগণের মুখে সর্পের বৃত্তান্ত শুনিয়া তিনি তাঁহাদের সুবিধার জন্য গোফা ত্যাগের উদ্যোগ করিলে সর্পই সেখান হইতে অন্যত্র চলিয়া গেল।

কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণের পর নীলাচল গমনের পথে শ্রীচৈতন্যদেব সর্ব্বপ্রথম ফুলিয়ায় হরিদাস ঠাকুরের আশ্রমে আগমন করেন এবং নবদ্বীপবাসিগণ এইস্থানে আসিয়াই তাঁহার দর্শন লাভ করেন।

তরুকুঞ্জ-শোভিত হরিদাস ঠাকুরের সাধনপীঠটি অতি শান্তরসাস্পদ স্থান। এখানে একটি মন্দিরের মধ্যে বলরাম, রেবতী, শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকার বিগ্রহ আছে। যে গোফায় বসিয়া হরিদাস ঠাকুর নাম জপ করিতেন, একটি বৃক্ষমূলে তাহার চিহ্ন আছে। মন্দিরের সম্মুখে একটি তুলসী বেদী ও কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সমাধি নামে পরিচিত অপর একটি বেদী আছে। এই

মন্দিরটি জনসাধারণের নিকট "ফুলিয়ার মঠ" নামে পরিচিত। মঠমধ্যবর্ত্তী বিগ্রহ চতুষ্টয় দেখিতে অতি সুন্দর। এখানে প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার সময় বহু যাত্রীর সমাগম হয়।"

[বাংলায় ভ্রমণ, ১ম খণ্ড, পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্ত্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৮৪-৯২]

৭। গ্রাম ঃ আড়বান্দি। ৬৬।২০৬১৪।১৪৩।৭২০

(ক) ব্রাহ্মণ, ময়রা, কামার, নাপিত, মাহিষ্য, গোয়ালা, কলু, মুচি, রাজোয়ার, রাজবংশী, ও মুসলমান।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—মুচিপাড়া, কামারপাড়া, নিকিরিপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকাজ, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন বাদকুল্লা হইতে একটি পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা, অগ্রহায়ণে রক্ষাকালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং ফাল্গুনে ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি বহু প্রাচীন এবং সর্বজনীন। ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর—এই ত্রিমূর্তি পূজা হয়। প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমা হইতে সপ্তাহ ব্যাপী সাড়ম্বরে এই উৎসব চলে। আশেপাশের গ্রামবাসীগণ উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। ইহাছাড়া, বৎসরের যে-কোন সময় পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসার পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) ব্রহ্মাপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) বহুকাল পূর্বে গঙ্গা নদীর দিক পরিবর্তনের ফলে এই স্থানে একটি বিরাট চর-এর সৃষ্টি হয়। ঐ চরের জমি মানুষের বাসোপযোগী করিবার জন্য আড়া-আড়ি ভাবে দুইটি মাটির বাঁধ দেওয়া হয়। এই বাঁধ দুইটি যথাক্রমে আড়বান্দী ও আড়বান্দা বাঁধ নামে খ্যাত। পরে আশেপাশের গ্রাম হইতে লোকজন আসিয়া এখানে বসবাস আরম্ভ করিলে ইহা আড়বান্দি গ্রাম বলা হয়। জানা যায় তৎকালীন নদীয়াধিপতি মহারাজ রাঘব চন্দ্র ১০৬৭ সালের ১১ই ফাল্গুন তারিখে ৩৭১২৮নং তায়দাদে এই গ্রামটি প্রতিষ্ঠাতা গোবিন্দ ন্যায় বাগীশ মহাশয়কে ব্রহ্মোত্তর স্বরূপ দান করেন।

শ্রীবিভূতি ভূষণ বিশ্বাস, শিক্ষক,
আড়বান্দি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়,
পোঃ চাঁদড়া, নদীয়া।

জেলা ঃ নদীয়া
থানা ঃ শান্তিপুর

উৎসব বিবরণী

গাজী মিঞার বিবাহ উৎসব

শান্তিপুরের অন্তর্গত মালঞ্চ পল্লীতে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ রবিবার "গাজী মিঞার বিবাহ" নামে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা স্থানীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি আঞ্চলিক উৎসব বলা যাইতে পারে। উৎসবকারীরা বলেন, গাজী মিঞার বিবাহের আয়োজন সব প্রস্তুত, বিবাহের আনন্দানুষ্ঠান চলিতেছে, এমন সময় হঠাৎ পাত্রী অর্থাৎ জহরাবিবির মাতুল আসিয়া বিবাহ বাসরে উপস্থিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়—ইহাই এই উৎসবের বিষয়বস্তু। মালঞ্চ পল্লীতে উৎসবের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে; উৎসবের দিন সেই স্থানে রঙ্গীন কাপড় দ্বারা মোড়া চারিটি বাঁশ পুঁতিয়া ঢাক-ঢোলের বাজনা সহকারে মুসলমানগণ সারারাত্রি ব্যাপী উৎসব করেন, পরের দিন মধ্যাহ্নে পাত্রী জহরা বিবি রূপে সজ্জিত জনৈক বৃদ্ধা মুসলমান রমনীকে বাজনা সহকারে পাল্কী করিয়া উৎসব প্রাঙ্গণে আনা হয় এবং তিনি ঐ বাঁশগুলি প্রদক্ষিণ করিয়া স্বগৃহে চলিয়া গেলে উৎসবের সমাপ্তি হয়। উৎসবে বহু হিন্দুও যোগদান করেন এবং প্রতি বৎসর দুই-চারিজন ফকির আসেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

শান্তিপুরে জলেশ্বর শিবকে কেন্দ্র প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে পক্ষকাল পূর্ব হইতে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। গৈরিক বসন পরিহিত সন্ন্যাসব্রতীগণ প্রতিদিন গঙ্গা স্নানান্তে শিবলিঙ্গটিকে লইয়া ঢাকঢোলের বাজনাসহ নগর পরিক্রমণ করেন এবং শিববন্দনা ও শিব পূজা করিয়া থাকেন।

সংক্রান্তির দিন সন্ন্যাসীরা চড়ক গাছে পাক্ খান। এই সময় চড়ক তলায় বহু দর্শকের সমাগম হয়। চড়ক গাছে পাক্ খাইবার কালে সন্ন্যাসীগণ নীচে দর্শকদিগের মধ্যে নানারূপ ফল নিক্ষেপ করিতে থাকেন, ঐ ফল সংগ্রহের জন্য সাধারণের মধ্যে হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। সাধারণের বিশ্বাস ঐ ফল খাইলে বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করেন। অর্থ, অলঙ্কার ও ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য দিয়া অনেকে শিবের নিকট মানসিক পূজাদি দিয়া থাকেন। শিবের নিত্য পূজা হয়। বর্তমানে স্বর্গীয় কালী চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বংশধর শ্রীকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় জলেশ্বর শিবের সেবায়েত। পূর্বে কালী চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতামহগণ জলেশ্বর শিবের সেবায়েত ছিলেন।

জগদ্ধাত্রী পূজা

শান্তিপুর, ২২শে নবেম্বর—প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শান্তিপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে আনুমানিক ৪০ খানি জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বলা বাহুল্য, এই উৎসব শান্তিপুরের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করিয়া আসিতেছে। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেও অগনিত নরনারী প্রতিমা দেখিতে সমবেত হয়। ভীড় নিয়ন্ত্রণ ও জনসাধারণের সুবিধার্থে কংগ্রেস সেবাদল ও শান্তিপুর সেচ্ছাসেবক বাহিনীর সেবাকার্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

জগদ্ধাত্রী পূজা উপলক্ষে সূত্রাগড় শক্তিসঙ্ঘ কর্তৃক গত ১২ই ও ১৪ই নবেম্বর সঙ্ঘ প্রাঙ্গণে 'টিপু সুলতান' ও 'চোর' সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।

[আনন্দবাজার পত্রিকা, ইং ২৩।১১।৬১]

দোলযাত্রা

প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমা হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত শান্তিপুরের বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ীতে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলিকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ণিমায় মদনগোপাল বাড়ীতে, হাটখোলার গোস্বামী বাড়ীতে ও বড়গোস্বামী বাড়ীতে এবং প্রতিপদ তিথিতে শ্যামচাঁদ মন্দিরে শ্যামচাঁদ জীউর দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শ্যামচাঁদের দোল উৎসবটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

দোল উৎসব উপলক্ষে শান্তিপুরে একটি বিরাট হরিনাম সংকীর্তনের মিছিল বাহির হয়। উক্ত মিছিল নগর সংকীর্তন শেষ করিয়া রাত্রির প্রথমভাগে ওড়িয়া গোস্বামী-দের দেবালয় প্রাঙ্গণে আসিয়া হাজির হয়। এই দেবালয়ে গোপাল বিগ্রহ ও তৎসহ আরো কয়েকটি রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সুসজ্জিত মঞ্চে স্থাপন করিয়া পূজা-অর্চনা করা হয় এবং সমগ্র দেবালয়টি আলোকমালায় সজ্জিত করা হয়। সন্ধ্যার সময় এই দেবালয়ে বহু দর্শকের সমাগম হয় এবং অনেকে "ডালা" দিয়া পূজা দেন। পূর্ণিমার পূর্বদিন সন্ধ্যায় "বেড়া পোড়া" বা চাঁচর উৎসব উপলক্ষে নানারূপ বাজনা ও আতসবাজী পোড়ান হয়। দোলের দিন শান্তিপুরের কাশ্যপ পাড়ার মোড়ে প্রচুর লোক সমাগম হয় এবং রং খেলা ও আনন্দোৎসব হয়।

দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে শান্তিপুরের নূতন গ্রামে ৺ স্বর্গীয় দামোদর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ঠাকুর বাড়ীতে জ্যাঠা গোপীনাথ জীউর এবং গোপালপুরে সর্বজনীন পঞ্চম দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে মৃন্ময় গোপাল মূর্তি নির্মাণ করা হয়।

একটি প্রাচীন মন্দিরে জ্যাঠা গোপীনাথ নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি সংস্কারাভাবে জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। পঞ্চম দোল উপলক্ষে এই মন্দিরে যথারীতি পূজা, দেবদোল, সাধারণের মধ্যে রং খেলা ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ব্রহ্মাপূজা

প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে শান্তিপুর বড়বাজারে ব্যবসায়ীগণ কর্তৃক সাড়ম্বরে ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাজার এলাকায় অবস্থিত একটি মন্দিরে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি সহ ব্রহ্মার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির গাত্রের একটি ফলক হইতে জানা যায় যে, উহা বাংলা ১২০১ সনে নির্মিত। মন্দির সংলগ্ন একটি পাকা নাট মন্দির আছে।

ব্রহ্মাপূজার প্রচলন সম্পর্কে জানা যায় যে, আড়াইশত বৎসর পূর্বে বড়বাজার চাউলপট্টিতে আকস্মিক অগ্নি দহনে প্রভূত ক্ষতি হওয়ায় বাজারের ব্যবসায়ীগণ ব্রহ্মামূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার আয়োজন করেন।* ইহার কয়েক বৎসর পরে মন্দিরে ব্রহ্মা মূর্তির পার্শে বিষ্ণু ও মহেশ্বরের মূর্তি স্থাপন করেন। সেই হইতে অদ্যাবধি পূজা ও উৎসব চলিয়া আসিতেছে। পাঁচদিন ব্যাপী উৎসবের প্রথম দিনে ময়ূরপঙ্খী হাওদার উপর নাচ-গান, পুতুলনাচ এবং বিভিন্ন মাটির মূর্তি সহ শোভাযাত্রা বাহির হয় এবং ঢপ কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। কলি-কাতা হইতে পেশাদারী যাত্রার দল আসে। দ্বিতীয় দিনে জল সাধা এবং তৃতীয় দিনে সর্বজনীন অন্নসত্রের আয়োজনে পাঁচ-ছয় হাজার দরিদ্র নারায়ণ সেবা করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে ঘোড়ালিয়া, ফুলিয়া, বজবজ, চাপা-ডাঙ্গা, হরিপুর, গয়েশপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার নরনারী আসিয়া থাকেন। বড়বাজারের স্থায়ী দোকানপাট ভিন্ন উৎসবের সময় কতকগুলি খাবারের দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

রাসযাত্রা

শান্তিপুরের রাস উৎসবের খ্যাতি সারা বাংলা দেশে। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। শান্তিপুরের তৎকালীন বিখ্যাত খাঁ চৌধুরীগণ এই স্থানে রাস উৎসবের প্রচলন করেন। তাঁহাদের কুলগুরু শান্তিপুরের বড় গোস্বামীদের গৃহ দেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া একদা এই উৎসবের প্রচলন হয়। এই সম্পর্কে একটি ইতিবৃত্তি আছে। শুনা যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের কিছু আগে এখানকার বড় গোস্বামীদের কুল দেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দুইটি চুরি যায়। বহু অনুসন্ধানের পর পাথরের কৃষ্ণমূর্তিটি একটি মাঠের মধ্যে পাওয়া যায়; কিন্তু রাধিকার পিতলের মূর্তিটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। অবশেষে রাধিকার একটি নূতন মূর্তি তৈয়ারী করিয়া কার্তিকী পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের পুনঃ অভিষেক উৎসবের আয়োজন করা হয়। এই অভিষেক উৎসব উপলক্ষে বড়গোস্বামীদের নিমন্ত্রণে তাঁহাদের বাড়ীতে শান্তিপুরের অন্যান্য গোস্বামীবাটিতে সেবিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহাদি আনিয়া সাড়ম্বরে বড় গোস্বামীদের বাটিতে অভিষেক উৎসব পালন করা হয়। সেই বৎসর হইতে

পর পর কয়েক বৎসর বড় গোস্বামীদের বাড়ীতে সাড়ম্বরে সমবেতভাবে কার্তিক পূর্ণিমায় রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যেও বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। ইহার কয়েক বৎসর পর স্থানীয় গোস্বামীদের বাড়ীতে তাঁহাদের কুলদেবতা রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহাদিকে কেন্দ্র করিয়া পৃথক পৃথক ভাবে ভাগবতোক্ত রাস উৎসবের আয়োজন হইতে থাকে এবং অদ্যাবধি এই রাস উৎসব চলিয়া আসিতেছে।

কার্তিক পূর্ণিমার প্রায় এক মাস পূর্ব হইতেই এই উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। গ্রামের সমস্ত দেবালয়-গুলির সংস্কার কার্য, সাজসজ্জা, পথঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চলিতে থাকে। গ্রামের ঘরে ঘরে উৎসবের আয়োজন চলে এবং শান্তিপুরের সর্বত্র আনন্দের সাড়া পড়িয়া যায়। শান্তিপুরে ব্যক্তিবিশেষের গৃহে বহু রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন উল্লেখ করা যায়, বড়গোস্বামীদের রাধারমন, খাঁ চৌধুরীদের শ্যামচাঁদ, আঁতাবুনিয়া গোস্বামীদের শ্যাম সুন্দর প্রভৃতি বিগ্রহগুলি। এই সকল বিগ্রহাদি যে-সকল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছে উহার অধিকাংশ আটচালা-গঠন-ভঙ্গীতে নির্মিত। মন্দিরগুলির স্থাপত্য শিল্প বাংলা দেশের শিল্পভাস্কর বৈশিষ্ট্যগুণে দীপ্তমান। প্রত্যেক মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির কল্কাদ্বারা সুসজ্জিত। ঐ সকল কল্কায় হিন্দু দেব-দেবীর ও মনুষ্য আকৃতি নানা ভঙ্গীতে মুদ্রিত আছে। তাহাছাড়া মন্দির গাত্র নানা লতাপাতার নক্সা কাটা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরাভ্যন্তরের কারুকার্য খোচিত রৌপ্য নির্মিত সিংহাসনে স্বর্ণালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত বিভিন্ন নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই সকল সিংহাসন নানারূপ কারুকার্য সম্পন্ন উচ্চ বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দির কক্ষের দরজাগুলিতে ধাতব কিলক এবং নানাবিধ মনোরম কারুকার্য শোভাবর্ধন করিতেছে। দরজাগুলি সাধারণতঃ মেহগ্নি কাষ্ঠনির্মিত। উপরোক্ত মন্দিরগুলির মধ্যে খাঁ চৌধুরীদের নির্মিত শ্যামচাঁদের বিশাল মন্দিরটি বাংলাদেশের মধ্যে একটি বিশিষ্ট মন্দির বলিয়া খ্যাত। মন্দিরগুলি প্রায় তিন হইতে সাড়ে তিন্ শত বৎসরের প্রাচীন। বড় গোস্বামীদের রাধারমন মন্দিরটি ১৬৪৬ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

রাস উৎসবটি চারদিন ধরিয়া চলে। সকাল দশ ঘটিকায় রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের আরতি দিয়া প্রথম দিনের পূজা ও উৎসবের শুভ সূচনা হয়। বেলা দ্বিপ্রহরে অর্থাৎ বার ঘটিকায় ভোগারতির সমাপনের পর শয়ন-পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্নে গাত্রোত্থান পর্ব এবং বৈকালীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি এবং তৎপর বিগ্রহের শয়ন পর্ব অনুষ্ঠানের পর কিয়ৎক্ষণের জন্য পূজা-পাঠের বিরতি। নিশীথরাত্রি কালে শাস্ত্রানুযায়ী রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সমূহ গোস্বামীদিগের গৃহে পূজিত হইবার পর যবনিকার অন্তরালে নির্দিষ্ট রাসমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত হন। এই সময় সকল গোস্বামী বাটির ভক্তগণ এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ উপস্থিত থাকেন। যবনিকা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত ভক্তগণ ও জনমণ্ডলী হরিধ্বনি এবং বাদ্যধ্বনিতে উৎসব স্থল মুখরিত হইয়া উঠে। তৎপর বিগ্রহের শয়ন আরতির পালা। বড় গোস্বামীগণ প্রথম দিনের শয়ন আরতি অনুষ্ঠানের পূর্বে অবশ্য কিছুক্ষণ সময় রাধা এবং প্রধান গোপিনী মূর্তিটিকে এক পৃথক গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখেন। এইরূপে প্রথম দিনের উৎসব শেষ হয়। উৎসবকালে গোস্বামীবাটিগুলি শিষ্য সমাগমে পরিপূর্ণ থাকে এবং তাঁহারা নানা প্রকার খাদ্যদ্রব্যাদি দ্বারা বিগ্রহের ভোগ দেন ; অবশ্য ঐ খাদ্যদ্রব্যাদি পরে প্রসাদ হিসাবে সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনের পূজা একই রূপ এবং প্রথম দিনের ন্যায় সান্ধ্যপূজার পর যবনিকা মুক্ত করিয়া বিগ্রহগুলিকে সাধারণের দর্শনার্থে মঞ্চের উপর স্থাপন করা হয়।

তৃতীয় দিনের উৎসব বিশেষ আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। ইহা সারা বাংলা দেশে শান্তিপুরের "ভাঙ্গা রাসের মিছিল" নামে পরিচিত। এই দিনে বিগ্রহাদির যথারীতি পূজার পর গভীর রাত্রে সকল গোস্বামীগণের বিগ্রহাদিসহ এক বিরাট মিছিল নগর পরিক্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হয়। শান্তিপুরের রাস উৎসবের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে এই মিছিলে। উৎসবের দুইদিনে যত আনন্দ না হয়, ততোধিক আনন্দ হয় তৃতীয় দিনের এই মিছিল যাত্রায়। এইখানেই সর্বপ্রথম প্রকাণ্ড রাস মিছিলের সূত্রপাত হয় বলিয়া জানা যায়। সকল

গোস্বামীবাটির বিগ্রহগুলিকে স্বর্ণ-রৌপ্য নির্মিত নানাবিধ অলংকারে সজ্জিত করিয়া স্বর্ণ-রৌপ্য খোচিত হাওদায় স্থাপন করিয়া ভাঙ্গা রাসের মিছিল বাহির করা হয়। এই শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিবার জন্য বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশ হইতে বহু ভক্ত ও দর্শকের সমাগম হয়। যাত্রার পথের দুইধারের সমস্ত বাড়ীর ছাদ, আলিসা, অলিন্দ, আঙ্গিনা ও প্রাঙ্গণ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতায় ভর্তি হইয়া যায়; কোথাও তিলার্ধ পরিমাণ স্থান শূন্য থাকে না। শোভাযাত্রায় থাকে রাস-নৃত্যসহ হাওদা, বালক নৃত্যের হাওদা, ময়ূরপঙ্খী নৌকা সজ্জিত হাওদা যাহাতে সমসাময়িক সমস্যা বিষয়ক নৃত্যগীত, মৃন্ময় পুতুল সজ্জিত পৌরাণিক ও আধুনিক কাহিনী অবলম্বনে নানাপ্রকার পুতুল প্রদর্শনী, গরুর গাড়ী বা ঠেলাগাড়ীর উপর ছোট ছোট বালিকাগণের রাইবেশী নৃত্যানুষ্ঠান, সঙ্ নাচ প্রভৃতি চলন্ত প্রদর্শনী। তাহাছাড়া গোস্বামীবাটির সুন্দরী মেয়েদিগকে শ্রীমতী রাধা ও গোপীনিবেশে নানা অলংকারে সজ্জিত করিয়া রাইরাজার হাওদায় বাহির করা হয়। এই শোভাযাত্রার পুরোভাগে খাঁ চৌধুরীগণের শ্যামচাঁদ বিগ্রহ মধ্যভাগে থাকে বড়গোস্বামীদের রাধারমন বিগ্রহ এবং অপরাপর পারিবারিক বিগ্রহগুলি এবং সর্বশেষভাগে থাকে হাটখোলার গোস্বামীগণের গোকুলচাঁদ বিগ্রহ। বড় গোস্বামীগণের বিগ্রহের পুরোভাগে একশত আটজন ঢাকি ঢাক বাজাইয়া থাকে। সারারাত্রি ব্যাপী নগর পরিক্রমার পর রাত্রির শেষ ভাগে বিগ্রহগুলিকে স্ব স্ব মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। চতুর্থ দিনে কুঞ্জভঙ্গের পর "ঠাকুর তুলা" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ঐ দিন দ্বিপ্রহরে বিগ্রহগুলিকে পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত করা হয়—যাহা 'পুষ্পরাগ' নামে বিশেষ পরিচিত। তৎপর গোস্বামীগণ স্ব স্ব বিগ্রহগুলি কোলে লইয়া নৃত্য-গীত সহকারে নগর পরিভ্রমণে বাহির হন। পরিভ্রমণকালে বিগ্রহগুলির মস্তকভাগে "রাজছত্র" ধরা হয়। নগর পরিভ্রমণের পর বিগ্রহগুলি স্ব স্ব মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের পর "ডালি" ধরা অনুষ্ঠান হয়। এইদিন বৈকালে বিগ্রহাদির সমস্ত অলংকার খুলিয়া মন্ত্রাদি পাঠ করিয়া রাধাকৃষ্ণের অভিষেক পূজা হয়। তৎপর প্রসাদ বিতরণ এবং বিগ্রহাদির শয়নের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

ভক্তগণ পূজার দিনে মিষ্টান্ন ভোগ দিয়া থাকেন। এই উৎসবে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীর এবং নাগা সন্ন্যাসীর আগমন হয় সর্বাধিক। আসামের মণিপুর হইতে বহু ব্যক্তি এই উৎসব দেখিবার জন্য এই স্থানে আসেন। অহিন্দু সম্প্রদায়ের এই উৎসবে করনীয় কিছু না থাকিলেও তাঁহারা উপস্থিত থাকিয়া উৎসবের আনন্দ উপভোগ করেন। উৎসবে প্রায় লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হইতে দেখা যায়।

এই উৎসবের আর একটি বৈশিষ্ট্য রাসপূর্ণিমায় রাস-কালীর পূজা ও উহার বিসর্জনের মিছিল।

এই উৎসবের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য নানাপ্রকার সতর্ক-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। উৎসবের কয়েকদিন যাত্রীদের সুবিধার জন্য ভারতের রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করেন। স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটি জনস্বাস্থ্যরক্ষামূলক সর্বপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাহাছাড়া পুলিশ এবং সেচ্ছাসেবক শিবির স্থাপন করিয়া যাত্রীগণের সুখ-সুবিধার জন্য চেষ্টা করা হয়। উৎসবের কয়েকদিন শান্তিপুর এক অনবদ্য আনন্দভূমিতে পরিণত হয়।

শান্তিপুরের রাস উৎসব সম্বন্ধে "পুরগাথা"-য় বলা হইয়াছে—

"রাধিকা রাজা রাসযাত্রায় ঢাক, ময়ূরপঙ্খী সং।
মূর্তি নব উৎসব কত আছে এ পুরে অগনন॥"

নবদ্বীপের রাস উৎসব সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিস্তারিত বিবরণী নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :

নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমা পেরুতে না পেরুতেই নবদ্বীপের বিরাট জনস্রোত গঙ্গা পার হয়ে ওপারের শান্তিপুরে ভাঙারাসে গিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে।

নবদ্বীপ আর শান্তিপুর ওরা যেন বই-এর একখানি পাতার এ-পিঠ আর ও-পিঠ—একই কাহিনীর প্রারম্ভ আর পরিণতি। এপারে নবদ্বীপ, ওপারে শান্তিপুর

মাঝখানে গঙ্গা। জননীর দুটি স্নেহমুষ্টির বন্ধনে যেন দুদিকে দুটি শিশুর হাত ধরা। ওরা একই ভাবরসে লালিত, এক সুতোয় বাঁধা, পাঁচশো বৎসর ধরে—নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্য আর শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতের লীলাকাল থেকে। এক তীরের ভবের প্লাবন আর এক তীরকে ডুবিয়ে দিয়েছে। "শান্তিপুর ডুবুডুবু ন'দে ভেসে যায়।" ভক্ত বৈষ্ণবের ভাবমুগ্ধ বন্দনা-কল্পনা: শান্তিপুরের পরমভাগবত শ্রীঅদ্বৈত জীবদুঃখে কাতর, অসহিষ্ণু। শুষ্ক শূন্য প্রান্তরে তিনিই ছিলেন ভক্তির একটি নিঃসঙ্গ ধারা। তাঁরই সকরুণ আহ্বানে গঙ্গার ওপারে নবদ্বীপে মহাকরুণা আর কৃষ্ণপ্রেমের ধারা দেখা দিয়েছে শ্রীচৈতন্যরূপে। এই দুটি ধারার সঙ্গে প্রেমানন্দের আর একটি ধারা এসে যুক্ত হয়েছে শ্রীনিত্যানন্দরূপে। এই ত্রিবেণীসঙ্গমের ত্রিধারার ভাবস্থা একই, "একে তিন, তিনে এক।" তবুও শান্তিপুরের শ্রীঅদ্বৈতের পরম মর্যাদা, বিশেষ নাম—"গৌর-আনা ঠাকুর।"

যাই হোক, একথা সত্যি যে, পনরো-ষোল শতকে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আর সংস্কৃতির প্রবল প্লাবন সারা বাংলা দেশ এবং সে সীমানা ডিঙিয়ে ভারতের অন্য অন্য অঞ্চলে ডুবিয়েছে, নূতন প্রাণরসে সঞ্জীবিত করেছে—বাংলাদেশের নবদ্বীপ আর শান্তিপুরই ছিল তার উৎস-মুখ। অবশ্য সেদিন বৃন্দাবনের বড় গোস্বামীই এই নবজাগ্রত ধর্ম আর সংস্কৃতিকে দার্শনিক তত্ত্বভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করার আচার আচরণের সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ণয়ের একচ্ছত্র অধিকার পেয়েছিলেন। তবুও সপরিকর শ্রীচৈতন্য আর শ্রীঅদ্বৈতের লীলারঙ্গভূমি নবদ্বীপ আর শান্তিপুরই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও মতের অনুকূল অনুশীলন, আচার, আর উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাণকেন্দ্র হয়েছিল বহুদিন ধরে।

গঙ্গা থেকে শান্তিপুর আজ অনেক দূরে সরে গেছে। তবুও নবদ্বীপ আর শান্তিপুর—বৈষ্ণবের এই শ্রীধাম দুটিকে গঙ্গাই যেন যুক্ত করে রেখেছে। তাই আজও তীর্থযাত্রীরা নবদ্বীপে এলে গঙ্গা পেরিয়ে ছোট লাইনের ট্রেনে চেপে যান শ্রীপাট শান্তিপুর দর্শনের পুণ্যাকাঙ্খায়।

নবদ্বীপের রাসপূর্ণিমা তথা পট পূর্ণিমার বিশাল ভীড় তাই শান্তিপুরের ভাঙারাসে গিয়ে শেষ হয়, এবারেও শেষ হয়েছে। এবার নবদ্বীপের আড়ং-এর দিনটিতেই শান্তিপুরের ভাঙারাস হয়েছে। সেই জন্যে নবদ্বীপের বিশাল ভীড় ঐ দিন ভোর থেকেই নৌকোতে করে গঙ্গা পেরুতে শুরু করে দিয়েছিল। তারপর ওপারে ছোট লাইনের ট্রেণ বোঝাই হয়ে শান্তিপুরে গেছে। বাস বোঝাই হয়েও অনেকে গেছে। ক'লকাতা থেকেও বহু লোক গেছে ট্রেণে। শান্তিপুরের ভাঙারাস তাই লোকে লোকারণ্য।

নবদ্বীপের রাসযাত্রা মুখ্যত শক্তি পূজোরই আয়োজন। সেখানে গোস্বামীদের মন্দিরে মন্দিরে রাসযাত্রার আয়োজন থাকলেও বারোয়ারী শক্তিপূজোর তুলনায় নিষ্প্রভ। কিন্তু শান্তিপুরের রাসযাত্রার উৎসবের চেহারা সম্পূর্ণ বৈষ্ণব, কারণ রাধাকৃষ্ণকে নিয়েই সে আয়োজন।

অবশ্য শাক্ত প্রভাব থেকে শান্তিপুরও মুক্ত নয়। এখানেও শাক্তাচারের যথেষ্ট প্রাবল্য প্রাচীনকাল থেকে। তাই নবদ্বীপের পট পূর্ণিমার মত এখানে রাসপূর্ণিমার দিন এখনও আট দশখানি বিরাট বিরাট বারোয়ারী কালী মূর্তির পূজো হয়। তাছাড়া "পটেশ্বরী" নামে পটে আঁকা একখানি কালীমূর্তির পূজো পটপূর্ণিমার ঐতিহ্য আজও এখানে বহন ক'রছে। এই মূর্তিগুলোর কয়েকখানি রাধাকৃষ্ণের ভাঙারাসের মিছিলেই বাজনাবাদ্যি করে বিসর্জনে যায়। শান্তিপুরের গোঁসাই বাড়ীতেও দুর্গাপূজো হয়। শাক্ত-বৈষ্ণবের পুরানো দ্বন্দ্ব কালক্রমে সহাবস্থানের মধ্যে ঘুচে গেছে।

তিনদিনব্যাপী রাসযাত্রা—শান্তিপুরে পূর্ণিমার দিন থেকেই রাস বসে। তিন দিন চলে। গোস্বামীদের বিভিন্ন মন্দিরে এবং শান্তিপুরের আরও অন্যান্য সম্প্রদায়েরও মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহদের সাধ্যমত রত্নালঙ্কারে সাজিয়ে রাসমণ্ডপে বসান হয়। নাটমন্দিরগুলো চাঁদোয়ার ঝালরে, ঝাড় লণ্ঠনে সাজে। তিন দিন ধরে পূজো, পাঠ, কীর্তন, যাত্রা প্রভৃতি চলে। যদিও অনেক মন্দিরে এ-সবের প্রয়োজন এখন অনেক হাল্কা হয়ে গেছে, অর্থনৈতিক অবস্থাই তার মুখ্য কারণ।

কিন্তু এই রাসের চাইতে তৃতীয় অর্থাৎ শেষদিনে দেব-বিগ্রহদের নিয়ে যে মিছিল বার হয়, শান্তিপুরে,

তারই আকর্ষণ বেশী। রাসের শেষ পর্যায়ে এটির অনুষ্ঠান হয় বলে এর নাম ভাঙারাস। এই ভাঙ্গারাসের মিছিল সুরু হয় রাত আটটা-ন'টা থেকে আর একের পর এক দেব বিগ্রহের নগর পরিক্রমায় রাত প্রায় শেষ হয়েই আসে। এই ভাঙারাস দেখতেই লোকের ভীড় ভেঙ্গে পড়ে শান্তিপুরের রাস্তায় রাস্তায় এই মিছিল পরিক্রমার পথের প্রত্যেকটি বাড়ীর ছাদ, বারান্দা, জানালা, রক দর্শনার্থীতে ভরে যায়। মিছিল দেখবার জন্যে বিকেল থেকেই লোক গিয়ে জমা হয় এ-সমস্ত জায়গায়। অনেক ছাদের ওপরে ত্রিপল খাটিয়ে দর্শনার্থীদের জন্য জায়গা করে দেন। এর জন্য কোথাও কোথাও কিছু দর্শনীও দিতে হয়।

শান্তিপুরের রাস উপলক্ষে বিভিন্ন ঠাকুর প্রাঙ্গণে, রথ-তলায় দোকানপাটও বসে। কাঠের বাসনকোসন, ধামা, চুপড়ী, খেলনা, সোলার পুতুল, পাখীরই বেশী বিক্রি হয় এই মেলায়। তা-ছাড়া রাসতলার পাঁপর, কচুরি, বেগুনির দোকানগুলি তো আছেই। লোকের কেনাকাটায় দোকান-গুলো বেশ জমে ওঠে কয়েকদিন।

বড়গোস্বামী পাড়া, পাগলাগোস্বামী পাড়া, চাকফেরা, খাঁবাড়ী, আঁতাবুনে, মদনগোপাল পাড়া, হাটখোলার গোস্বামীবাড়ী, সাহাবাড়ী, পরামাণিক বাড়ী এবং আরও অনেক পল্লী ও বাড়ী থেকে ভাঙারাসের মিছিল বার হয়।

ভাঙারাসের মিছিল—মিছিলের প্রধান বাদ্যভাণ্ড ঢাক। ৬০ থেকে ১৫০ ঢাকীর গুরু গুরু আওয়াজ তুলে নাচতে নাচতে ওই মিছিলে যাওয়ার প্রথা অনেক দিনের। কিন্তু এই ঢাকীর সংখ্যাও এখন বেশ কমেছে দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ এখন পপুলার গানের গৎ বাজানো হাল আমলের ব্যাণ্ড পার্টিও দিচ্ছেন। গরুর গাড়ীর ওপরে "ময়ূরপঙ্খী" নানান পৌরাণিক আর সামাজিক ঘটনা বিকৃতকারী পুতুলের গ্যালারি বা থাকা, হাওদার ওপরে রাধাকৃষ্ণ-বেশী দলের নাচ, তা-ছাড়া আলোর সেট আরও নানান্ সং এই মিছিলের অঙ্গ। কার মিছিলের কোন্ অঙ্গটি বাদ পড়ল কিংবা কোন্‌টি সরেস-নিরেস তা দর্শনার্থীরা সকলে বিচার করেন।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় রাইরাজা—কিন্তু মিছিলে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হচ্ছে রাইরাজা। ব্রাহ্মণদের ঘরের একটি ১০।১২ বৎসরের সুন্দরী কুমারী মেয়েকে শ্রীরাধার বেশে বসনে, ভূষণে, চন্দনে, তিলকে সাজিয়ে হাওদায় চড়িয়ে নিয়ে আসা হয়। জরির পর্দায়, ঝালরে, আসনে তাকিয়া সাজানো হাওদা। তার চারপাশে কাঁচের ফানুসে বাতির নরম আলো জলে। এই হাওদায় তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসে থাকে রাইরাজা আর সেই হাওদা কাঁধে নিয়ে বেহারারা চলে। রাইরাজ আসা মাত্র দর্শনার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায় ভাল করে দেখবার জন্য। মেয়েদের শঙ্খরোলে হুলুধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হয়।

রাসমণ্ডপে রাসেশ্বরী শ্রীরাধা। তাঁর প্রণয়-ঋণের জালে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বন্দী। তিনি দাসখত লিখে দিয়েছিলেন শ্রীরাধার কাছে—কলিকালে গৌররূপে তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে চোখের জলে সে ঋণ শুধবেন আর রাধার প্রণয় মহিমা কেমন নিজে আস্বাদ করবেন। শ্রীরাধার শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া জীবের রাগমার্গে কৃষ্ণভজনের, কৃষ্ণ-সেবার অধিকার পাওয়া যাবে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই দার্শনিক পরতত্ত্বের পপুলার ভার্সান বলে এই রাইরাজাকে মনে করা যেতে পারে।

রাইরাজার হাওদার পর আসে অনুরূপভাবে সুসজ্জিত আর একটি হাওদা, তার মধ্যে মন্দিরের সুসজ্জিত শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার বিগ্রহ।

প্রভাতে কুঞ্জভঙ্গের গান—দেববিগ্রহরা এইভাবে নগর পরিভ্রমণ করে যখন আবার নিজের নিজের মন্দিরে ফিরে যান তখন রাত অল্পই বাকি থাকে। তাঁরা আবার রাসমঞ্চে গিয়ে উঠেন। সারা রাত্রির রাসবিলাসের পর রাইকানু নিদ্রায় ঢলে পড়েছেন। ভোরে তাঁদের জাগাবার জন্য কুঞ্জভঙ্গের পালাগান চলে :

রাই জাগ রাই জাগ শারীশুক বলে।
কত নিদ্রা যাও কালো মাণিকের কোলে ॥
উঠহে গোকুলের চাঁদ রাইকে জাগাও।
অকলঙ্ক কুলে কেন কলঙ্ক লাগাও ॥

মঙ্গল আরতি, কুঞ্জভঙ্গের পালাগান, বাল্যভোগ ইত্যাদি শেষ হবার পর, কোনও কোনও নাটমন্দিরে আবার কীর্তন, কথকতা, যাত্রার আসর বসে। এসব শেষ হতে হতে বেলা বাড়ে। তারপর গোস্বামীদের

ছেলেরা রাসমঞ্চের থেকে বিগ্রহদের তুলে নিয়ে কোলে করে গান করতে করতে নাচতে নাচতে যে যার মন্দিরে গিয়ে উঠেন। মেয়েরা ফুল ছুড়তে থাকেন—একে বলে খেলা। এরপর মন্দিরে অভিষেক শেষে ষোড়শ উপাচারে অর্চনা, আরতি, ভোগরাগের পর ভাঙ্গারাসের পর্ব শেষ

('বাংলার লোক উৎসব ও লোকশিল্প'—বজ্রমিত্র, যুগান্তর, ২৪শে কার্তিক, ১৩৬৭।)

১৩৬৭ সনে শান্তিপুরের রাসোৎসব সম্পর্কে ২২শে কার্তিক 'যুগান্তর'-এ প্রকাশিত আর একটি সংবাদঃ

শান্তিপুর, ৫ই নভেম্বর—শান্তিপুরের বিখ্যাত শ্রীশ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা উৎসব এই বৎসর সাড়ম্বরে ও নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ২রা নভেম্বর কার্তিকী পূর্ণিমার দিন হইতে স্থানীয় বিভিন্ন গোস্বামী বাড়ীর নিজ নিজ দেবালয় সুসজ্জিত ও সুশোভিত রাসমঞ্চে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহ যথাড়ম্বরে পূজিত হইয়া গত ৪ঠা নভেম্বর নগর পরিক্রমায় বহির্গত হন। ঐদিন গোস্বামী বাড়ীসমূহের বিগ্রহগুলি সারিবদ্ধভাবে বাহির হইয়া সহরের আড়াই মাইল দীর্ঘ বৃত্তাকার পথটি পরিক্রমা করেন। গোস্বামীদের বিগ্রহগুলি ব্যতীতও এই পরিক্রমানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন বীর আশানন্দ ও পটেশ্বরী কালীর প্রতিকৃতি ও অন্যান্য বহু ছোট-বড় কালী মূর্তি। বিগ্রহসমূহ এইভাবে প্রায় ৪ ঘণ্টাধিকাল পথ পরিক্রমা করিয়া পুনরায় নিজ নিজ মন্দিরে ফিরিয়া আসেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও বহু দূরবর্তী অঞ্চল হইতে কাতারে কাতারে যাত্রী আসিতে দেখা যায় এবং প্রায় লক্ষাধিক বহিরাগতের আগমনে সারা সহরটি বেশ সরগরম হইয়া উঠে। বহিরাগতদের নানাভাবে সাহায্য ও সেবা করিবার জন্য স্থানীয় বিভিন্ন যুব ও ছাত্র প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

নানা রকমের পশরা সাজাইয়া বিভিন্ন বিদেশী দোকানীর দল স্থানীয় রথতলা ও শ্যামচাঁদ অঞ্চলে যে দোকানের মেলা বসাইয়াছে, উৎসবের কয়দিন সেই সমস্ত দোকানে খরিদ্দারের চূড়ান্ত ভীড় দেখা যায়। এই মেলা মাসাধিক কাল চলিবে।

উৎসবের প্রথম দিন ও ভাঙ্গারাসের দিন রাত্রিতে স্থানীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের গাফিলতির ফলে দীর্ঘক্ষণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকে এবং এইজন্য উৎসবের উদ্যোক্তাদের চরম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ভাঙ্গারাসের দিন রাত্রে কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ার জন্যও দর্শকগণ বিব্রত হইয়া পড়েন।"

শান্তিপুরের রাস উৎসব সম্পর্কে ৩০শে কার্তিক, ১৩৬৭ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত একটি সংবাদঃ

শান্তিপুর, ১৩ই নভেম্বর—প্রতি বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও শান্তিপুরের রাসোৎসব সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। গত ২রা নভেম্বর বুধবার রাসোৎসব আরম্ভ হয় এবং ৫ই নভেম্বর শনিবার ঠাকুর নাচান অনুষ্ঠানের পর শেষ হয়। ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাঙ্গারাস অনুষ্ঠিত হয় ৪ঠা নভেম্বর। অতি প্রাচীন কাল হইতেই এখানকার অদ্বৈতাচার্যের বংশধরগণ ও অন্যান্য প্রাচীন বংশের নর-নারীগণ এই উৎসব নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া আসিতেছেন। উৎসবের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য—রাসপূর্ণিমা হইতে তৃতীয়া দিবসে প্রাচীন বিগ্রহ লইয়া শোভাযাত্রা। ইহাই "ভাঙ্গারাস" নামে বিখ্যাত। ঐ দিন প্রতিটি বিগ্রহের সহিত নানারূপ সঙ, ময়ূরপঙ্খী গান, বালক নৃত্য, রাধিকারাজা ইত্যাদি বাহির হয়। এক সঙ্গে এতগুলি নিত্যসেবিত প্রাচীন বিগ্রহের শোভাযাত্রা কেবল মাত্র বঙ্গদেশে কেন, ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না।

রাসোৎসব উপলক্ষে পটেশ্বরীতলা পাড়ার সভ্যবৃন্দ একটি বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। উহাতে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুরেশ কুমার প্রামাণিক। সর্বশেষে সিরাজুল ইসলামের তত্ত্বাবধানে 'কৃপণের ধন' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

জেলা : নদীয়া
থানা : শান্তিপুর

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোভাবের মেলা

(হরিদাস ঠাকুর)

ফুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর দোল পূর্ণিমার নয় দিন পরে ঠাকুর হরিদাসের স্মৃতি উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা ফুলিয়ার নবম দোলের মেলা নামে খ্যাত।

আশেপাশের ইউনিয়ন এবং নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর শান্তিপুর, রানাঘাট, চাকদহ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে মেলায় মোট প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত সাধু-সন্ন্যাসীরাও আসিয়া থাকেন।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে। ঐ সকল দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান, কাপড় ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া, বাসন-কোসনের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, মাটির হাঁড়ি, কলসী, পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, ইত্যাদির দোকান, ঔষধপত্র এবং বই-ছবির দোকানপাট বসে এবং প্রতি বৎসর কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, রানাঘাট, গুপ্তিপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে শিল্প সামগ্রী বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগর দোলা ও সার্কাসের দল আসে এবং যাত্রাভিনয় হয়।

(গাজী মিঞার বিবাহ উৎসব)

শান্তিপুরে মাগঞ্জের মাঠে গাজী মিঞার বিবাহ উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শেষ রবিবার একটি মেলা বসে। মেলাটি দুই দিন স্থায়ী হয় এবং প্রায় তিন-শত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় হরিপুর, বাগ্‌আচড়া, ব্রহ্মশাসন, বেলেডাঙ্গা, গয়েশপুর ও কালনা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই বেশী।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন প্রতি বৎসর কালনা ও কলিকাতা হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বাবদে যাহা আদায় করা হয়, উহা উৎসব উপলক্ষে ব্যয় করা হয়। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কতিপয় ফেরিওয়ালা আসেন। এই সকল দোকানপাটে খাবার, মনিহারী দ্রব্য, বাসনপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ, কৃষিযন্ত্রপাতি, বই-ছবি ও খেলনা পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদি দ্রব্য সামগ্রী আমদানী হয়।

মেলায় জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

উত্তরায়ণের মেলা

চরপানপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ উত্তরায়ণের পুণ্যস্নান উপলক্ষে গ্রামের পূর্বপ্রান্তে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর তীরে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় বারো শত নরনারীর সমাগম হয়। ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের, মনিহারী দ্রব্যের, বাসনকোসন ও কাপড়-চোপড়ের এবং এই অঞ্চলের লোকেদের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীর মোট প্রায় কুড়িটি দোকানপাট বসে। শান্তিপুর এবং কালনা হইতে বিক্রেতারা আসেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

শান্তিপুরে চৈত্র সংক্রান্তিতে জলেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মন্দির প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং আশেপাশের বিভিন্ন পল্লী হইতে মেলায় প্রায় দুই হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবার, মনিহারী জামাকাপড়, বই-ছবি ও মাটির খেলনা-পুতুলের কুড়ি-বাইশটি দোকানপাট বসে ও আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

দোলযাত্রার মেলা

বাবলা গ্রামে অবস্থিত অদ্বৈত মহাপ্রভুর আশ্রম প্রাঙ্গণে প্রায় দশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমার পাঁচদিন পর পঞ্চম দোল উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন।

এই মেলায় নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে মোট প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং শতাধিক দোকানপাট বসে।

বিক্রেতাগণ অধিকাংশই স্থানীয়। ইহাভিন্ন শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, শিল্প সামগ্রীর দোকান ও দুই একটি বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

ব্রহ্মাপূজার মেলা

আড়বান্দি গ্রামে প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমার সময় ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর সাতদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী প্রায় সমস্ত গ্রাম হইতে গরুর গাড়ীতে, সাইকেলে এবং হাঁটিয়া প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

মেলাতে পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ কৃষ্ণনগর, রানাঘাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকান, কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির, কুটীর শিল্পজাত দ্রব্যাদির এবং মনিহারী জিনিসপত্রের দোকান থাকে। মেলায় বিক্রেতাদের নিকট হইতে জমির মালিক খাজনা আদায় করিয়া থাকেন।

মেলায় পুতুলনাচ, সার্কাস, জলসা, খেমটা নাচ এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতি আনন্দ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামের যাত্রাদল ভিন্ন উৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আনা হয়।

বাগদেবীর পূজার মেলা

বাগআঁচড়া গ্রামে অবস্থিত বাগদেবীর মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর বাগদেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

হরিপুর, গয়েশপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়ন এবং কৃষ্ণনগর, শান্তিপুর, কালনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মোট প্রায় একহাজার নরনারীর মেলায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় মাত্র পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা অধিকাংশ স্থানীয়। ইহাতে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির পুতুল ও হাঁড়িকুঁড়ি দোকান বসে। ইহাছাড়া, কয়েকটি পানবিড়ির, বই-ছবির এবং তাঁতের কাপড়চোপড়ের দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর ম্যাজিক বা যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

শান্তিপুরে ফাল্গুন পূর্ণিমায় শ্যামচাঁদের দোল উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর শ্যামচাঁদ মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় দুইবিঘা জমির উপর এবং উড়িয়া গোস্বামীদিগের দেবালয় প্রাঙ্গণে প্রায় চার বিঘা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। এই মেলা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

আশেপাশের প্রায় দুই-তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত বেলেডাঙ্গা, বাগ্‌আঁচড়া, হরিপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে রিক্সায়, সাইকেলে, মোটরবাসে ও হাঁটিয়া যাত্রীরা আসেন।

মেলায় প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনের জন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে খাবার দোকানের

সংখ্যাই অধিক। ইহাভিন্ন, মনিহারী দ্রব্য, বাসনকোসন, পোষাক-পরিচ্ছদ, ছুরি-কাঁচ এবং মাটির হাঁড়ি, কলসী ও খেলনা-পুতুলের দোকান বসে। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

শান্তিপুরে জ্যাঠা গোপীনাথ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমার পরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষে ঠাকুরবাড়ী সংলগ্ন অঙ্গনে বৃক্ষ ছায়াচ্ছন্ন প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

বেলেডাঙ্গা, বাগ্‌আঁচড়া, গোবিন্দপুর, ব্রহ্মশাসন, হরিপুর প্রভৃতি আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় বহু যাত্রী ও বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় প্রায় ষাটটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। উল্লিখিত দোকানপাটের মধ্যে খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, মনিহারী দ্রব্য, বাসনকোসন, পোসাক-পরিচ্ছদ, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, মাটির পুতুল ও খেলনা এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী দ্রব্য সামগ্রীর দোকান বসে।

রথযাত্রার মেলা

শান্তিপুরে বড়গোস্বামী ও হাটখোলার গোস্বামীদিগের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর জমির উপর প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের দুই-তিন মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতিদিন প্রায় এক হাজার নরনারী আসিয়া থাকেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, বাসনকোসন, ছুরি-কাঁচি, মাটির পুতুল ও খেলনা এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদির মোট প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

রাসযাত্রার মেলা

শান্তিপুরে প্রতি বৎসর কার্তিকী পূর্ণিমায় রাস উৎসব উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা বসে। ইহা বাংলাদেশের একটি অন্যতম এবং প্রাচীন মেলা। মেলাটি মূলতঃ চারদিন হইলেও মাসাধিককাল দোকানপাট থাকে। তবে উৎসবের কয়দিন বিশেষ করিয়া ভাঙ্গা রাসের দিন মেলায় সর্বাধিক লোক সমাগম হয়।

নদীয়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে এই স্থানে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। মেলায় সাধারণতঃ ষাট হইতে সত্তর হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে। কোন কোন বৎসর লোক সংখ্যা প্রায় এক লক্ষও হয়। প্রধানতঃ ট্রেনে, মোটরবাসে, নৌকায়, রিক্সায়, গরুর গাড়ীতে এবং হাঁটিয়া যাত্রীরা মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক বলিয়া মনে হয়।

শান্তিপুরের শ্যামচাঁদ ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর জমিতে এবং প্রসেশন রোড-এর দুই ধারে অস্থায়ী চালা বাঁধিয়া মেলার দোকানপাটগুলি বসে। দেবোত্তর জমির উপর যে-সকল দোকানপাট বসে সেই সকল বিক্রেতাদের নিকট হইতে পূজা কমিটি তোলা আদায় করেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তার ধারে যে-সকল দোকানপাট বসে সেই সকল বিক্রেতাদের নিকট হইতে মিউনিসিপ্যালিটির কর্তৃপক্ষ কর আদায় করিয়া থাকেন। মোট প্রায় এক সহস্র দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা নদীয়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বর্ধমান ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মিষ্টি খাবার, তেলেভাজা, মনিহারী দ্রব্য, কাপড়-জামা, জুতা, বাসন-কোসন, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রী প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন, বই-ছবি, কবিরাজী ঔষধপত্র এবং অন্যান্য আরও কতকগুলি দোকান-পাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, সিনেমা, কবিগান, তরজা, কীর্তন এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। অভিনয় করিতে শান্তিপুর ও কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসিয়া থাকে।

শান্তিপুর—রানাঘাট কৃষ্ণনগর লাইট রেলের উপর। ইহা অদ্বৈত মহাপ্রভুর বংশধরগণের প্রিয় আবাস ভূমি।

এখানকার কার্তিকী পূর্ণিমার রাসমেলা সমগ্র ভারতে সুবিখ্যাত, এমন কি মনিপুর হইতেও এখানে শত শত ভক্তের সমাবেশ হইয়া থাকে। মেলা তিন দিবস স্থায়ী, এই তিন দিন নৃত্যগীত মহোৎসবে শান্তিপুর মুখরিত হইয়া উঠে। শেষদিন গোস্বামী প্রভুগণ বিগ্রহাদি স্বর্ণ খচিত রৌপ্য মণ্ডিত হাওদা সকলে সুসজ্জিত করিয়া বন্দ্যোর্দ্দাম সমভিব্যাহারে গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হয়েন। এই উপলক্ষে ৩০ হইতে ৫০ হাজার লোক সমাবেশ হয় এবং বহু সহস্র মুদ্রার দ্রব্যাদি খরিদ ও বিক্রয় হইয়া থাকে।

["নদীয়া কাহিনী", শ্রীকুমুদনাথ মল্লিক]

॥ হাওড়া ॥
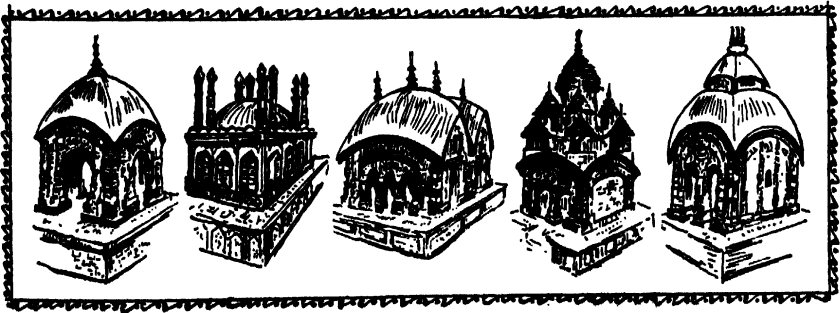
মানচিত্রে
হাওড়া জিলার
পূজা-পার্বণ ও মেলা

পূজা পার্বণের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, গন্ধেশ্বরী, গৌরী প্রভৃতি ... ...

শিব, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি ·· ... ...

ধর্মরাজ-গাজন প্রভৃতি ... ...

বিশালাক্ষী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চণ্ডী, মনসা, (বিষহরি) শীতলা, ষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী
গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি ·· ... ...

কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি ... ...

রাস, দোল, ঝুলন, পঞ্চমদোল, গোপাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ফুলদোল, স্নানযাত্রা প্রভৃতি ... ...

স্নানাদি — বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, উত্তরায়ণ, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি ... ...

অনন্তচতুর্দশী, অক্ষয়তৃতীয়া, নববর্ষ, বৈশাখীপূর্ণিমা, ভীমএকাদশী
জামাইষষ্ঠী, অম্বুবাচী প্রভৃতি ... ...

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

আদিবাসীদের উৎসবাদি — বাঁধনা, করমপূজা, মারাংবু প্রভৃতি ... ...

পীরের উরস ... ...

সাধুসন্তদের আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসবাদি ·· ... ...

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

জৈনদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

পূজাপার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
জিলা হাওড়া
উত্তর
শিবপুর
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।
সম্পাদক.

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, মহামায়া, গন্ধেশ্বরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা, শীতলা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, যুগাদ্যা, গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি . .. .

চড়ক, গাজন, গম্ভীরা ... ...

শিব, শিবরাত্রি, ব্রহ্মা, কার্তিক, গণেশ, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি ... ...

রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, গোষ্ঠাষ্টমী, রামনবমী, মহোৎসব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি · ...

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

পৌষসংক্রান্তি, পৌষপার্বণ, মাঘীপূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অম্বুবাচী, বৈশাখীপূর্ণিমা, নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া, অনন্ত চতুর্দশী, উত্তরায়ণ স্নান প্রভৃতি ... ...

আদিবাসীদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

ধর্মরাজের গাজন ... ...

সাধু-সন্ত ও পীরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব ... ...

বিবিধ পূজা ও উৎসব ... ...

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট ... .

১,০০০ পর্যন্ত .. ... .

১,০০১ — ২,৫০০ .. .

২,৫০১ — ৫,০০০ ... .

৫,০০১ — ১৫,০০০ ... .

১৫,০০১ — ২৫,০০০ .. .

২৫,০০১ এবং তদূর্ধ্ব ... .

মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
জিলা হাওড়া
উত্তর
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার ,,
থানার ,,
মেলার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক।

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

মাস	প্রতীক
বৈশাখ	(১)
জ্যৈষ্ঠ	(২)
আষাঢ়	(৩)
শ্রাবণ	(৪)
ভাদ্র	(৫)
আশ্বিন	(৬)
কার্তিক	(৭)
অগ্রহায়ণ	(৮)
পৌষ	(৯)
মাঘ	(১০)
ফাল্গুন	(১১)
চৈত্র	(১২)
চান্দ্রমাস	●
মাস অনির্দিষ্ট	◉

মেলার মাসপঞ্জী
জিলা হাওড়া
উত্তর
শিবপুর
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার "
থানার "
মেলার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।
সম্পাদক।

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি ... ...

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি ... ...

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি অন্য দেবদেবী ... ...

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা ... ...

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধি মন্দির ... ...

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল ... ...

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল .. ..

প্রতীক-গোষ্ঠী অনুযায়ী উপাসনাস্থলাদির বিন্যাস
জিলা হাওড়া
উত্তর
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব। সম্পাদক।
যে স্থানে এখনও পূজা, আরাধনা অথবা উৎসব সম্পাদন হয়, সেই উপাসনার প্রতীক অনুযায়ী মানচিত্রটিতে স্থান নির্দেশিত হইয়াছে।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ জগাছা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ বালিটীকুরী। ১।৮২৯°৩৮।১,৩৪২।৫,৭৩৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, নাপিত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, গোয়ালা, বাগ্দী ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, নস্করপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে এই গ্রামেই একটি স্টেশন আছে। তাহাছাড়া হাওড়া-ডোমজুর বাস রুট এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে বলিয়া মোটরবাসেও গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় ধর্মরাজ ঠাকুরের স্নানযাত্রা উৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রাম দেবতার স্থানে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সদানন্দ ঠাকুরের মঠে বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে সদানন্দ বাবাজীর বহু ভক্ত-শিষ্য মঠে আসেন এবং কালীকীর্তন ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে সদানন্দ মঠ, একটি শিবমন্দির, দুইটি কালীমন্দির ও একটি মসজিদ আছে। সদানন্দ মঠটি সদানন্দ বাবাজী নামে জনৈক ভক্ত প্রতিষ্ঠা করেন। শিবমন্দিরটি প্রায় একশত বৎসর পূর্বে সহস্ররাম নস্কর নামে জনৈক ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করেন এবং শিবের নিত্য সেবার ব্যবস্থা করেন। কালী মন্দির দুইটির মধ্যে একটি এই গ্রাম নিবাসী শ্রীকেদার নাথ মণ্ডল নামক জনৈক ব্যক্তি প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠা করেন এবং অপরটি শ্রীযোগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

গ্রামে একটি প্রাচীন বৃহৎ দীঘি আছে, দীঘিটির মাঝামাঝি একটি প্রাচীর দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। স্থানীয় অঞ্চলে ইহা "দুই সতীনের দীঘি" নামে খ্যাত।

শ্রীসুধীর চন্দ্র রায়, শিক্ষক,
বালিটীকুরী মুক্তারাম দে স্কুল,
হাওড়া।

২। গ্রাম ঃ পুইল্যা। ১১।১৪০°৫৪।৩৮।১১,৮২৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, গোয়ালা, কামার, কুমার, বৈরাগী, পদ্মরাজ, ডোম, বাগ্দী। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যেমন—দাসপাড়া, ডোম-পাড়া, ঘোষপাড়া, দেপাড়া, বাগ্দীপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন মৌড়ীগ্রাম হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া সাইকেল রিক্সায় গ্রামে যাতায়াত করা করা হয়। ইহাভিন্ন গ্রামের সীমান্ত দিয়া প্রবাহিত সরস্বতী নদী পথে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে স্থানীয় একটি হরিবাসরে নাম-সংকীর্তন মহোৎসব। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। পূজাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন ও সর্বজনীন। দশমী তিথিতে বিসর্জনের দিন গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহাধুমধামের সহিত দুর্গা প্রতিমা লইয়া শোভাযাত্রা বাহির করেন। উৎসব উপলক্ষে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

ইহাভিন্ন কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা, অগ্রহায়ণ মাসে শিবপূজা ও শ্যামসুন্দর ঠাকুরের বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ঠাকুর, একটি বাবা-ঠাকুর, একটি শীতলা, একটি মনসা এবং একটি ষষ্ঠী আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামের মধ্যস্থলে একটি ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির এবং গোরাচাঁদ পীর ও ওলাবিবির নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীরাধবল্লভ পাত্র,
পুইল্যা, হাওড়া।

বিঃ দ্রঃ—রামরাজাতলার মেলা সম্পর্কে একটি বিবরণী এই জেলার সমুদয় বিবরণীর শেষে লিপিবদ্ধ করা হইল।

জেলা : হাওড়া
থানা : পাঁচলা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : জুজারসাহা। ৮।৯৯৭ ৫।১,৪৯১।৯,৩৭৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, বারুজীবি, মাহিষ্য, কামার, ধোপা, নাপিত, মুচি, কাওরা, তেলি, বাগ্দী, ছাল, দুলে, গোয়ালা ও মুসলমান।

গ্রামে মোট চৌদ্দটি পাড়া। যেমন—হাজরা-পাড়া, সরকারপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালপাড়া, মল্লিকপাড়া, সামন্তপাড়া, মান্নাপাড়া, মিদ্দেপাড়া, মোল্লাপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সাঁকরাইল হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়। কেবলমাত্র বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে বুদ্ধজয়ন্তী উৎসব। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন বুদ্ধদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে উৎসবটি পালন করা হয়। মাত্র কয়েক বৎসর হইল উৎসবটি আরম্ভ হইয়াছে। ভাদ্র মাসে নন্দোৎসব। কৃষ্ণাষ্টমী হইতে দুই দিনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে এই উৎসবটি উদ্‌যাপিত হয়। প্রায় দুইদিন পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি শুরু হয়। ইহা প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা।

উপরোক্ত পূজা ছাড়াও গ্রামে সিংহবাহিনী দেবী, মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর, লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুর, ধর্মরাজ ঠাকুর ও শিবপূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি ষাট বৎসরের প্রাচীন।

নববর্ষ উৎসবের মেলা। পয়লা বৈশাখ একদিন। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্রীকৃষ্ণের পূজার জন্য ব্যক্তি-বিশেষের একটি পাকা মন্দির আছে। মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইহাছাড়া গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবা-ঠাকুর, চারটি শীতলা ও দশটি মনসা ঠাকুর আছে।

কথিত আছে যে, এই গ্রামে গৌড়েশ্বর রাজার বাস ছিল। বর্তমানে রাজবংশের কেহই জীবিত নাই। রাজপ্রাসাদগুলিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। রাজবাড়ীর স্থানটি বন-জংগলে পরিপূর্ণ হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্র চন্দ্র পাল, শিক্ষক,
গ্রাম ও পো : জুজারসাহা, হাওড়া।

২। গ্রাম : খাস জালালসি।১১।৫৫৯'৪২।৪৬৪।২,৩৭৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—মাল-পাড়া, বাগপাড়া, রায়পাড়া, মুসলমানপাড়া, খাঁড়া-পাড়া, আদকপাড়া, কল্যেপাড়া ও মাঝিপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিজীবি, কৃষিমজুরী, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা লাইট রেলপথের দক্ষিণবাটি অথবা ডোমজুর স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা চলে। বর্ষাকালে নৌকাযোগে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের সাঁকরাইল স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া যায়। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূর দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসের শেষে অথবা শ্রাবণ মাসের প্রথমে ধর্মের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা-ছাড়া, ঘট স্থাপন করিয়া গণেশ, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও দুর্গাদেবীর পূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে স্বরূপনারায়ণ ও নিরঞ্জন নামে খ্যাত ধর্মরাজ-এর শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এই মন্দির সংলগ্ন একটি কক্ষে শীতলার মূর্তি আছে। একটি শিবমন্দিরে শিবের বিগ্রহ আছে।

ইহাভিন্ন, গ্রামে ভগবতীর শিলামূর্তি ও মুসলমান পাড়ায় মর্দনালী পীরের আস্তানা আছে।

(এই গ্রামে ধর্মরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে তিনদিন ব্যাপী একটি মেলা বসিত। প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন এই মেলাটি গত কয়েক বৎসর হইল বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেলা বিবরণী দ্রষ্টব্য।)

শ্রীসনাতন মাল, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ খাসজালালসি,
হাওড়া।

৩। গ্রাম : দেউলপুর। ১২।১,০৫৮·০৭।১,০০৩।৬,৭০৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, কুমার, কামার, গোয়ালা, জেলে, বারুই, সর্দ্দার, শিউলি প্রভৃতি।

গ্রামে, এগারটি পাড়া আছে। যেমন— ব্রাহ্মণপাড়া, মালপাড়া, বাগপাড়া, দেপাড়া, পাত্র-পাড়া, গোলুইপাড়া, কোলেপাড়া, সর্দ্দারপাড়া, রাখালপাড়া, শিউলিপাড়া ও দাসপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে পাঁচ মাইল দূরে সাঁকরাইল রেল-স্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) ধর্মরাজ পূজা—আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে গ্রামে ধর্মরাজের বার্ষিক রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় আশী-নব্বই বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা যুগী সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব হইলেও গ্রামের সর্ব-সাধারণ এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

ইহাভিন্ন, আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে সিংহবাহিনীপূজা, দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী-পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল যাত্রা, চৈত্র মাসে শিবের গাজন এবং সিংহবাহিনী দেবীর পাণ্ডা সম্প্রদায় কর্তৃক দেবীর পঞ্চমদোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মেলা। আষাঢ় মাসে আটদিন ব্যাপী।

শিবের গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি আশি-নব্ব ই বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ওলাবিবির স্থান, একটি পঞ্চানন্দ ও একটি শীতলা, একটি চামুণ্ডা, বহু মনসা ও শিবলিঙ্গ আছে।

গ্রামে আনুমানিক শতবর্ষ পূর্বে বর্ধমানের মহারাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সিংহবাহিনী দেবীর একটি ভোগমন্দির সহ একটি পাকা মন্দির আছে। শোনা যায়, পূর্বে এই গ্রামে বহু দেব-দেউল প্রতিষ্ঠিত ছিল যাহার ধ্বংসাবশেষ এখনও কিছু কিছু গ্রামে দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণেই গ্রামের নাম দেউলপুর হইয়াছে।

শ্রীদেবী প্রসাদ মিত্র, ছাত্র,
দেউলপুর, হাওড়া।

৪। গ্রাম : ভবানন্দপুর (মৌজা : জলা কেন্দুয়া)। ২৯।৩৭৬·০৭।৩৮·২।১,৯২১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন আবাদা।

(ঘ) ভাদ্র মাসে অরন্ধন উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ ও চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা-ছাড়া, চান্দ্রমাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, সবেবরাত এবং ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, দক্ষিণরায়, ষষ্ঠী, পঞ্চানন, ধর্মরাজ এবং শীতলা প্রভৃতি দেবদেবীর বিগ্রহ আছে। গ্রামের শ্মশান সংলগ্ন একটি মন্দিরে মধ্যে কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীসুধন্য কুমার দলুই, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ পাজিয়াড়া, হাওড়া।

৫। গ্রাম : বেলডুবি। ৩০।৭৭৪ ৩০।৭৬৮।৪,১৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, পোদ, গোয়ালা, স্বর্ণকার, ধোপা, বাগ্দী, কাওরা এবং মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মিলশ্রমিক ও কৃষিমজুরী।

(গ) প্রায় একমাইল দূরে অবস্থিত নলপুর রেলস্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা এবং চৈত্র মাসে চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামের চারটি স্থানে চারটি পঞ্চানন্দ, চারটি শীতলা এবং চারটি মনসার স্থান আছে। বৎসরের বিভিন্ন সময়ে ঐ সকল দেবদেবীর পূজাদি হইয়া থাকে।

শ্রীসুবরণ চন্দ্র নস্কর, প্রধান শিক্ষক,
বেলডুবি ফ্রি প্রাইমারী স্কুল,
বেলডুবি, হাওড়া।

৬। গ্রাম : বেলকুলাই। ৩১।২৮২'৬৩।২১৩।১,৩৪৬

(ক) বৈশ্য কাপালী, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নাপিত, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বৈরাগী ও মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী, ব্যবসায় ও চাকুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাউরিয়া এবং বাসস্টেশন পাঁচলা। দামোদর দাস রোড নামে একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলির মধ্যে প্রথম তিনটি উৎসব যথাক্রমে পঞ্চাশ, পঁচিশ ও দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। চড়ক উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা এবং লক্ষ্মীজনার্দনের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীদীনেশ চন্দ্র সরকার, শিক্ষক,
বেলকুলাই সি, কে, এ, সি, বিদ্যাপীঠ,
হাওড়া।

৭। গ্রাম : সাহাপুর। ৩৩।৬৭৪'১৮।৪৬৩।৩,২৪০

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, তাঁতি, তেলি, বাগ্দী, কাপালী, কোড়া, মুসলমান। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন জলপুর-সাহাপুর। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীতে বর্ষাকালে নৌ-চলাচল করে।

(ঘ) কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সব কয়টি উৎসবই বেশ প্রাচীন।

ইহাছাড়া, মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক ঈদ ও মহরম পর্ব পালিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চল্লিশ-পয়তাল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, একটি মনসা, একটি ধর্মরাজ ঠাকুর, এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি মসজিদ আছে। প্রায় চারশতক জমির উপর বড় খান পীর সাহেবের দরগাহ্ আছে।

শ্রীজহরুল ইসলাম, শিক্ষক,
গ্রাম : বলরামপোতা,
পো : পাঁচলা, হাওড়া।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ পাঁচলা

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বেলডুবি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পঞ্চানন ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং আশেপাশের তিন চারিটি গ্রামের সর্বজনীন উৎসব।

চৈত্র সংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে গাজন উপলক্ষে পঞ্চানন ঠাকুরের বিশেষ পূজাদি শুরু হয় এবং এই সময়ে ভক্তরা অনেকে গলায় সুতার "কাছা" ধারণ এবং ফল-মূলাদি ভক্ষণ করিয়া সংযম ও নিষ্ঠার সহিত গাজনে সন্ন্যাসীর ব্রত পালন করিয়া থাকেন। সংক্রান্তির দিন পূজা প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীদের নৃত্য এবং অপরাহ্নে ঝাঁপ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পূজা প্রাঙ্গণে একটি বাঁশের উচ্চ মাঁচা তৈয়ারী করিয়া সন্ন্যাসব্রতীগণ একে একে নীচে খড়ের বস্তার উপর রক্ষিত কাঁটা ও বঁটির উপর ঝাঁপ দিয়া পড়েন। ঝাঁপ দিবার পূর্বে সন্ন্যাসীরা মাঁচা হইতে একটি যে-কোন ফল ছুঁড়িয়া দেন। বিশ্বাস সন্ন্যাস ব্রত পালন করা কালীন কেহ যদি ফলমূল ভিন্ন গোপনে অন্য কোন খাদ্য বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয় ঝাঁপ দেওয়ার কালে আঘাত পাইবেন।

ঝাঁপ অনুষ্ঠানের পর দর্শকদের মধ্য হইতে অনেকে সন্ন্যাসীদের কপালে চন্দনের ফোঁটা ও গলায় ফুলের মালা দিয়া আলিঙ্গন করিয়া থাকেন। এই সময়ে গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণকে মাল্যদানের জন্য আহ্বান করা হয়।

পরের দিন সন্ন্যাসীগণ গলা হইতে সুতার "কাছা" খুলিয়া ফেলিয়া পুনরায় গৃহস্থ জীবনে ফিরিয়া যান।

খাসজালালসি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় অথবা শ্রাবণ মাসের প্রথম সপ্তাহে সাড়ম্বরে ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে সাধারণের একটি মন্দিরে "স্বরূপনারায়ণ" ও "নিরঞ্জন" নামে খ্যাত দুইটি ধর্মরাজ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বরূপনারায়ণ শিলাটি কচ্ছপ আকৃতি এবং নিরঞ্জন শিলাটি তালশাঁস আকৃতি। ইহা-ভিন্ন এই মন্দিরে আর একটি শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে; এই শিলাটিকে ভগবতী জ্ঞানে পূজা করা হয়। আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে উক্ত বিগ্রহগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই গাজন উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি যে-কোন মঙ্গলবার হইতে শুরু হয় এবং দ্বাদশ দিন ব্যাপী চলে। কেবলমাত্র বুধবার দিন উৎসবের বিরতি থাকে। উৎসব উপলক্ষে যথারীতি পূজা এবং প্রতিদিন মন্দির প্রাঙ্গণে "ধর্মরাজ মাহাত্ম্য" গীত হয়। অনেকে উৎসবের কয়দিন সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-ব্রতীগণ প্রথম দিন গ্রামের কোন গৃহস্থের বাড়ী হইতে আমন্ত্রিত হইয়া তাঁহাদের ঢেঁকিশালে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে ধান কুটিয়া ঐ ঢেঁকি ছাঁটা চাউলগুলিকে দুইটি বাঁশের ধুচুনীতে করিয়া ধর্মরাজের মন্দিরে আনেন। তাহারপর মূল সন্ন্যাসী ধর্মরাজ বিগ্রহগুলিকে চালের মধ্যে রাখিয়া ধুচুনী সহ ধর্মরাজকে মুক্তিস্নানের উদ্দেশ্যে পুকুর ঘাটে লইয়া যান। স্নানের পর ধুচুনীর ভিজা চাউল হইতে যে জল পড়িতে থাকে তাহা পবিত্র জ্ঞানে বহু ভক্ত ধরিয়া রাখেন। ইহার পর বিগ্রহগুলিকে মন্দিরে স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা-অর্চনা করা হয়। উৎসবের শেষ দিনে সন্ন্যাসব্রতীগণকে সাতটি ধারাল উন্মুক্ত তরবারির উপর শোয়াইয়া একে একে তিন হইতে পাঁচবার মন্দির প্রদক্ষিণ করান হয়। এই অনুষ্ঠানকে "শালেভর" অনুষ্ঠান বলা হয়। শালেভর অনুষ্ঠানের পর মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ অনুষ্ঠান হয়। উৎসব উপলক্ষে ধর্মরাজের নিকট বারো প্রকারের যেমন,—পাঠা, পায়রা, লেবু, ডালিম, আনারস, আদাগাছ, হাঁস, আঁখ, পেয়ারা, ডাব, সুপারী ও কলা বলি দেওয়া হয়। বলি প্রদত্ত পাঠা, পায়রা, হাঁস প্রভৃতি প্রাণীর ছিন্ন মস্তকগুলি একটি নূতন হাঁড়ির মধ্যে রাখিয়া ধর্মরাজ ঠাকুরকে যে পুকুরে স্নান করান হয় সেই পুকুরের ঈশান কোণে মাটির নীচে পুঁতিয়া রাখা হয়।

উৎসবে আশেপাশের গ্রামের বহু নর-নারী যোগদান করিয়া থাকেন। প্রধানতঃ ভক্তরা ধর্মরাজের নিকট সোনা বা রূপার চক্ষু, পাঠা, পায়রা ইত্যাদি মানত করিয়া

থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। ধর্মরাজের নিত্য পূজা হয়। পণ্ডিত পদবীধারী ব্রাহ্মণের দ্বারা ধর্মরাজের পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

নন্দোৎসব

জুজারসাহা গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে "নন্দোৎসব" পালিত হয়। এই উৎসবটি গ্রামের সরকারপাড়ার বৈশ্য বারুজীবি সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব এবং ইহা প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মূর্তিটির হস্তে মুরলী, কণ্ঠে মোহন মালা, মস্তকে চূড়া এবং পদযুগলে নূপুর আছে। উৎসব উপলক্ষে এই মন্দিরে দুইদিনব্যাপী শ্রীকৃষ্ণের ভোগ-পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

সিংহবাহিনীপুজা

দেউলপুর গ্রামে একটি পাকা মন্দির ঘরে সিংহবাহিনী দুর্গার দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরে প্রতি বৎসর শারদীয়া নবমী তিথিতে সিংহবাহিনী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন আশেপাশের গ্রাম হইতে সহস্রাধিক নরনারী দেবী দর্শন করিতে ও পূজাদি দিতে আসেন। এই দিন সাধারণের জন্য অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়। সিংহবাহিনীর নিকট প্রধানতঃ ছাগ বলি ও দেবীর ভোগ মানত করা হয়।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশের কুলতিলক রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় (দেববর্মন) মহাশয় "বকুল-পুকুর" নামে খ্যাত একটি পুকুর হইতে দেবীর একটি ঘট পান এবং সেই সময় হইতে অদ্যাবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে দেবীর পূজা-অর্চনা করিয়া আসিতেছেন। জনশ্রুতি আছে বর্ধমানের মহারাজা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীর বর্তমান মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং দেবীর নিত্যপূজাদির জন্য প্রায় চারিশত বিঘা জমি দেবোত্তর স্বরূপ দান করেন। সিংহবাহিনী মন্দিরটি একটি সাধারণ পাকা ঘর মাত্র। এই মন্দির ঘর সংলগ্ন আর একটি গৃহে ভোগ রন্ধন হইয়া থাকে।

জেলা : হাওড়া
থানা : পাঁচলা

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বেলডুবি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে সাধারণের প্রায় আট-দশ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়; যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের লোকজন। মোট প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী ও বই-ছবির দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির খেলনা, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে।

মেলা স্থানে প্রায় প্রতি বৎসর হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয় এবং উহাতে বহু শ্রোতার সমাবেশ হয়।

সাহাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়কপূজা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে মাত্র আড়াইশত নরনারীর সমাগম হয় এবং কয়েকটি মিষ্টান্ন, তেলেভাজা এবং মনিহারী দোকান বসে।

জুজারসাহা গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত সিংহবাহিনীতলায় চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে প্রায় এক বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং প্রধানত জুজারসাহা ও দেউলপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় ছয়-সাত শত নর-নারী এই মেলায় আসেন। ইহাতে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের মোট কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

জুজারসাহা গ্রামের হাজরাপাড়ায় ধর্মরাজের গাজন উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমিতে প্রতি বৎসর সাতদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন এবং এই মেলায় প্রধানতঃ জুজারসাহা ও দেউলপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রাম হইতে মোট প্রায় আটশত যাত্রীর সমাগম হয়। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্রের আমদানী হয়। বিক্রেতারা স্থানীয়।

চড়ক উপলক্ষে প্রতি চৈত্র সংক্রান্তিতে দেউলপুর গ্রামে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি আশী-নব্বুই বৎসরের প্রাচীন। মেলায় লোকসমাগম ও জিনিসপত্রের আমদানী এই গ্রামে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা মেলার অনুরূপ।

নববর্ষের মেলা

জুজারসাহা গ্রামে মান্নাপাড়ায় নববর্ষ উপলক্ষে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, ছবি এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের আমদানী হইয়া থাকে।

রথযাত্রার মেলা

বেলকুলাই গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং বেলডুবি, শাঁখখালি, রঘুদেবপুর, সাহাপুর, ধামিশা, খয়জাপুর, কান্দুয়া, পানিয়ারা, নলপুর

প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় ছয়শত নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই অধিক। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে আসেন। মেলায় মাত্র পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র এবং বাঁশ ও মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্রের দুই-চারটি দোকান-পাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

পূর্বে মেলায় আমোদ প্রমোদের জন্য কবিগান, পুতুল-নাচ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইত, বর্তমানে ঐরূপ কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

দেউলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। গ্রামে যে রাস্তার উপর দিয়া রথ টানা হয়, সেই রাস্তার দুইধারে সারি দিয়া মেলার দোকানপাট বসে। আটদিনব্যাপী স্থায়ী এই মেলায় প্রায় একহাজার নরনারীর সমাগম হয়। দেউলপুর ইউনিয়নের প্রায় সকল স্থান হইতে এবং পার্শ্ববর্তী ধূলাগাড়ী, কোলোড়া ও জুজারসাহা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের লোকজন এই মেলাতে আসেন। ময়রার দোকান, তেলেভাজার দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, শিল্প সামগ্রী বা কারুশিল্পের দোকান ইত্যাদি মিলিয়া প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকান বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। কখনও কখনও দুই-একটি মনিহারী ও কাপড়চোপড়ের দোকান বসিতে দেখা যায়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, লটারী, ম্যাজিক প্রদর্শনী, পালাগান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা : হাওড়া
থানা : জগৎবল্লভপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : জগৎবল্লভপুর।
৪।১,০৫৪.২৮।৩৯৮।২,৪৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি, গোয়ালা, স্বর্ণকার, কামার, বাগ্দী, দুলে, শুঁড়ি, কুর্মী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা মার্টিন রেলপথের একটি স্টেশন আছে। গ্রামের মধ্য দিয়া মোটর চলাচলের পথ আছে।

(ঘ) গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও ফাল্গুনে শিবরাত্রি, চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব এবং কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে। প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সিংহবাহিনীদেবী ও স্বয়ম্ভু হটেশ্বর শিবের মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে জনৈক বিনোদ বিহারী পাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়।

শ্রীগোষ্ঠপদ ভট্টাচার্য্য, শিক্ষক,
গ্রাম ও পো: জগৎবল্লভপুর,
হাওড়া।

Jagatballavpur—A village in the Howrah subdivision, situated on the left bank of the Kānā Nādi, 16 miles from Howrah. It contains a Police-Station, a Post Office, a High School, and a small District Board Bungalow. Among noticeable villages in the thāna, of which it is the headquarters, are Bargachhiā, a railway junction with a five storeyed tower of brick, 165 feet high, clearly, one of those erected nearly a century ago for long distance semaphore signalling; Adampur, with the remains of a fort, and old place shewn in Rennell's Atlas (Plate VII): Paintal, one of the largest villages in the district; Baliā, with on old temple liberally endowed by the Burdwan Raj with some two thousand *bighās* of land, a place which probably gave its name to the *pargana*; and on the west bank of the Kānā Nādi, Nabasān, once well known for its fine cloth, and Māju, a railway station with a High School.

(District Handbooks, Howrah, 1951, by A. Mitra. p. lii)

২। গ্রাম : বামুনপাড়া। ১৬।৫৮৫ ৬৮।২৮৮।১,৫৯৪

(ক) ব্রাহ্মণ, তাঁতী, কুমার, তিলি, নাপিত, বাগ্দী, ডোম ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন মুন্সীরহাট হইতে জেলাবোর্ডের বাঁধ এবং সরকার নির্মিত নূতন বাঁধের উপর দিয়া মোটরযোগে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ-সংক্রান্তিতে বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক পূজা, ১লা মাঘ কতোয়ালী পীর সাহেবের স্মরণ উৎসব এবং চৈত্র মাসে ধর্মরাজের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) কতোয়ালী পীরের স্মরণ উৎসব উপলক্ষে মেলা। ১লা মাঘ হইতে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন্দ, তিনটি শীতলা, একটি মনসার প্রতিমা এবং ব্রহ্মময়ী কালী ও বিশালাক্ষী মন্দির আছে। ইহাছাড়া গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি মন্দির ও বিগ্রহাদি আছে। যেমন—কুণ্ডুপাড়ায় শ্রীচিন্তামনি কুণ্ডু প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নারায়ণ শিলা (শ্রীধর), গোপালমূর্তি, জয়চণ্ডী, মঙ্গলচণ্ডী, শ্রীনফর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে নারায়ণ শিলা,

শ্রীভীম চন্দ্র মল্লিক প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুমন্দিরে শ্রীধর শিলা, বিশ্বনাথ শিব, লক্ষ্মী, সরকারদিগের প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে নারায়ণ শিলা, শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র ঘোষ প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে মধুসূদন শিলা, কর্মকারদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে কালী ও চণ্ডীমূর্তি, বেনিয়াপাড়ায় ও নাপিত পাড়ায় দুইটি মন্দিরে নারায়ণ শিলা এবং ফকির যোগী দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে ধর্ম ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্র মাসে এই মন্দিরেই গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীঅমল চন্দ্র মিত্র, শিক্ষক,
বামুনপাড়া চিন্তামনি প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মুন্সীরহাট, হাওড়া।

৩। গ্রাম : নবাসন। ১৯।১৪৬৩২।৮৩।৪২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বাগ্দী, দুলে, গয়লা, ধোপা, পণ্ডিত। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যথা—বাগ্দী-পাড়া, কায়স্থ বা নন্দীপাড়া, দুলেপাড়া, বামুনপাড়া, গয়লীপাড়া, ধোপাপাড়া, কুলিপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের এক মাইল দূরে মুন্সীরহাট রেল স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় অবস্থিত কতোয়ালী পীর নামক জনৈক পীরের সমাধি স্থানে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ সাড়ম্বরে পীরের উরস্ প্রতিপালিত হয়। দুর্গাপূজাটি প্রায় দুইশত পঁচাত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) কতোয়ালী পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। ১লা মাঘ। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবা ঠাকুর, একটি শীতলা ও একটি মনসা আছে।

নবাসন নেতাজী পাঠাগার,
নবাসন, হাওড়া।

৪। গ্রাম : সেকরাহাটী। ২১।২০২১৬।২৮৫।১,৪৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, স্বর্ণকার, কুমার, গোয়ালা ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, দুগ্ধ ব্যবসায় ও অন্যান্য জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন হাওড়া-আমতা লাইট রেলপথের মুন্সীরহাট। স্টেশনটি গ্রামের দক্ষিণদিকে অবস্থিত। গ্রামের উত্তরদিকে সরকারী পাকা রাস্তা দিয়া মোটরবাসযোগে রামচন্দ্রপুর, পেঁড়ো, ঘোড়াদহ প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শেষ সপ্তাহে একযোগে কালী, শীতলা ও মনসার বারোয়ারী পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ব্যতীত গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রধান উৎসব ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন। গাজন উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের পাঁচ-ছয়টি গ্রামের লোক যোগদান করেন এবং ভক্তরা অনেকে সারা চৈত্র মাস ব্যাপী সন্ন্যাসব্রত পালন করেন। পূর্বে এই উৎসবের আরও আড়ম্বর ছিল। প্রায় শতাধিক লোকের সঙ বাহির হইত এবং কলিকাতা হইতে কয়েকটি পেশাদার গায়ক ও নর্ত্তকের দল আনা হইত। "সেক্রাহাটির গাজন" দেখিবার জন্য বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রচুর লোক সমাগম হইত।

এই গ্রামের মুসলমানগণ প্রতি বৎসর ফতেহা-দোয়াজ-দাহাম্ বা নবী দিবস পালন করিয়া থাকেন। এই উৎসবে আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় যোগদান করেন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দ আছেন এবং স্থানীয় ঘোষ পরিবারের দুইটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। দশ-পনের বৎসর পূর্বেও এই মন্দির দুইটিতে শিবরাত্রি উপলক্ষে বিশেষ পূজা হইত ও মেলা বসিত। বর্তমানে মন্দির দুইটি সংস্কার অভাবে জীর্ণ। ইহাছাড়া গ্রামে একটি মঠ আছে। ১৩১২ বঙ্গাব্দে গ্রামের জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি স্বর্গীয় বরদা প্রসন্ন পদ্ম এবং তাঁহার গুরুদেব স্বামী শঙ্করানন্দ অবধূত কর্তৃক এই মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে ইহা ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠান হইলেও বর্তমানে ইহা

সর্বসাধারণের। বল্লভহাটী গ্রাম নিবাসী শ্রীতিনকড়ি ঘোষ মহাশয় এই মঠের ট্রাষ্টি। মঠে তালপাতার ছাউনী যুক্ত একটি শিব মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ও তাঁহার দক্ষিণ পাশে সন্ন্যাসীর যজ্ঞকুণ্ড আছে। শিব মন্দিরের রাস্তার দক্ষিণ দিকে মঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী শঙ্করানন্দ অবধূত এবং ভূতপূর্ব সেবায়েত স্বামী রাঘবানন্দ ব্রহ্মচারীর সিমেন্ট জমানো দুইটি প্রতিমূর্তি আছে। মন্দিরের পশ্চিম পাশে উক্ত দুই সাধকের সমাধিস্থান, উত্তরে একটি পুকুর এবং পূর্বে ফুল ও ফলের বাগান। এই বাগানের ধারে সেবায়েতদের বাসস্থান ও রন্ধনশালা আছে। মঠের উত্তর-পশ্চিমে বাঁশবন এবং বাঁশবনের পাশ দিয়ে গ্রাম্য প্রশস্ত রাস্তা। মঠের নামে উৎসর্গকৃত তিন-চার বিঘা পরিমাণ নিষ্কর জমি আছে।

শোনাযায় অতি প্রাচীন কালে এই গ্রামে কেবলমাত্র স্যাকরাদেরই (স্বর্ণকার) বাস ছিল। সেইজন্য গ্রামের নাম সেকরাহাটি হইয়াছে। বর্তমান গ্রামটি শঙ্করহাটি নামে অধিক পরিচিত।

শ্রীকৃষ্ণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষক,
মুন্সীরহাট ফ্রি প্রাইমারী স্কুল,
পোঃ মুন্সীরহাট, হাওড়া।

৫। গ্রাম : শ্যামপুর। ৩০।৩১৪২৬।১৫০।৮৮৪

(ক) বর্গক্ষত্রিয় ও মাহিষ্য। মান্নাপাড়া, কাজীপাড়া ইত্যাদি নামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামের দুই মাইল দূরে মুন্সীরহাট রেলষ্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসা-পূজা, কার্তিকে কালীপূজা, মাঘে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্রে মহাকাল ও চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলির মধ্যে সরস্বতীপূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজা-গুলি সর্বজনীন। উৎসব উপলক্ষে কালী ও সরস্বতীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মিত হয়। মহাকালের কোন মূর্তি নাই, কয়েক খণ্ড শীলাকে মহাকাল জ্ঞানে পূজা করা হয়। কালী ও মহাকালের পূজা অন্যূন চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। ইহা ছাড়া বৎসরের যে-কোন সময়ে শীতলা-পূজা ও হরিসেবা হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীজহরলাল দাস, প্রধান শিক্ষক,
শ্যামপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ মুন্সীরহাট, হাওড়া।

৬। গ্রাম : মানসিংহপুর। ৫০।৪২১২৪।৪৫০।২,৪৭৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, নাপিত, বাগদী, দুলে, চামার, গোয়ালা, যোগী, হাড়ি, ডোম ও মুসলমান। দুইটি মুসলমান পাড়া সহ গ্রামটি বহু পাড়ায় বিভক্ত যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, জানাপাড়া, মান্নাপাড়া, মালপাড়া, দুলেপাড়া, যোগীপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, কুটির শিল্প ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) মার্টিন রেলপথে বড়গাছিয়া ষ্টেশনটি গ্রাম হইতে প্রায় অর্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। "কমলপুর-সাদতপুর রোড" এবং "বড়গাছিয়া-মানসিংহপুর রোড" দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমাতে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্তদেবের ফুলদোল ও আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিনে দুইটি সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে শ্যামাপূজা, অগ্রহায়ণে ব্যক্তি-বিশেষের জগদ্ধাত্রীপূজা ও রক্ষাকালী পূজা, মাঘে তেরটি সরস্বতীপূজা ও রক্ষাকালীপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি, চৈত্র মাসে মান্নাপাড়া ও জেলে-পাড়ায় রক্ষাকালীপূজা (জেলেপাড়ার মূর্তির একটি বৈশিষ্ট্য আছে, পদতলে উপবিষ্ট মহাকালের কাঁধের উপর চরণ স্থাপন করিয়া উলঙ্গিনী শ্যামা দণ্ডায়মানা।) ব্যক্তি-বিশেষের অন্নপূর্ণাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে

শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন, চৈত্র মাসে ধর্মরাজ ঠাকুর ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা হয় এবং পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(ঙ) শ্রীকৃষ্ণের ফুলদোলের মেলা, বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, একটি ক্ষেত্রপাল, একটি রাধাকান্ত, একটি রঘুনাথ, দুইটি শিব ও একটি ধর্মঠাকুরের মন্দির আছে এবং একটি প্রাচীন বটবৃক্ষ মূলে পঞ্চানন্দের নির্দিষ্ট স্থান আছে। ইহাভিন্ন, মুসলমানদের একটি মসজিদ্ আছে।

শোনা যায় যে, বাদশাহ আকবর শাহের আমলে পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ দমনের জন্য আকবরের সেনাপতি মানসিংহ এই অঞ্চলে গৌরীগঙ্গা নদীর দুইপার্শ্বে ছাউনী ফেলিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। সেনাপতি মানসিংহের নামানুসারে এই গ্রামের এক অংশের নাম মানসিংহপুর হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

শ্রীজগন্নাথ জানা, শিক্ষক,
শ্রীজীবনকৃষ্ণ সাউ, প্রধান শিক্ষক,
মানসিংহপুর শিবতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ বড়গাছিয়া, হাওড়া।

৭। গ্রাম : সাদতপুর। ৫৭।৪৬১'১৯।২২৪।১,৩২৯

(ক) মাহিষ্য, দুলে, বাগ্দী। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বড়গাছিয়া। দুইটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব ও তদুপলক্ষে মহোৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। দোল উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে একটি হরিনাম সংকীর্তনের দল আছে। দোল উপলক্ষে উক্ত দল তিনদিনব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন এবং মহাপ্রভুর পূজাদি করিয়া থাকেন। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পাঠক বংশের প্রতিষ্ঠিত একটি শীতলা মন্দির এবং জনাই নিবাসী মুখোপাধ্যায়গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাচীন শিবমন্দির আছে। উভয় মন্দিরেই নিত্যপূজা হয়। শিবমন্দিরটি বর্তমানে সর্বসাধারণের।

জনশ্রুতি আছে যে, বাংলায় মুসলমান রাজত্বের পূর্বে এই গ্রামখানি ঘোষালবাটি নামে পরিচিত ছিল। পরে মুসলমান রাজত্বের সময়ে সাহাদত্ আলি নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান এই স্থানটি জায়গীর লইয়া বসবাস স্থাপন করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার নামানুসারে এই গ্রামখানি সাহাদাতপুর নামে খ্যাত হয়। বর্তমানে গ্রামখানি সাদতপুর নামে পরিচিত।

শ্রীসঞ্জীব চন্দ্র সামন্ত, চাকুরী,
সাদতপুর, হাওড়া।

৮। গ্রাম : হাঁটলা অনন্তবাটী (মৌজা : অনন্তবাটী)। ৫৮।৮৫১'২৭।৬২১।৩,৮৯২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ধোপা, নাপিত, বাগ্দী, তাঁতী ও মুসলমান। গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) মার্টিন রেলপথে বড়গাছিয়া রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে সর্বজনীন কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে চাঁচড় ও দোল উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন, গ্রামে শয়লা পূজা ও বিশালাক্ষী দেবীর পূজা

হয়। শয়লা পূজার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই—বৎসরের যে-কোন এক সময় পূজার আয়োজন করা হয়। পূজায় আশেপাশের গ্রাম হইতে পাঁচ-ছয় শত নর-নারী যোগদান করেন এবং "মনসার ভাসান" গানের দল আসে। পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

বিশালাক্ষী খুবই জাগ্রতা দেবী বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস। কিংবদন্তী আছে যে, প্রায় একশত বৎসর পূর্বে হুগলী জেলার নাতুন সান্ধপুর গ্রামের ওলাইচণ্ডী বিশালাক্ষী দেবীকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই গ্রামে তাঁহার মন্দিরটি দখল করিয়া লন। পরে এই দুই দেবীর মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাঁধে এবং ওলাইচণ্ডী দেবীকে পরাস্ত করিয়া বিশালাক্ষী দেবী পুনরায় তাঁহার মন্দির অধিকার করেন।

উল্লিখিত পূজা-পার্বণ ভিন্ন গ্রামে "শান্তি আশ্রমে"-এ গত ত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শিবরাত্রি উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে গত ছয় বৎসর হইল কয়েকটি দোকানপাট বসিতেছে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি পঞ্চাশ-ষাট বৎসরের প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে। বহুকালের প্রাচীন।

শয়লা (মনসা) পূজার মেলা। নির্দিষ্ট সময় নাই। প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষী মন্দিরে শিব, বিশালাক্ষী, শীতলা ও মনসা-র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্যপূজা হয়। ইহাভিন্ন, দুইটি ধর্মরাজ মন্দির এবং ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত একটি মদনমোহন মন্দির আছে।

শ্রীরতন চন্দ্র মাঝি, প্রধান শিক্ষক,
হাঁটলা হরিজন বিদ্যালয়,
পোঃ হাঁটলা, হাওড়া।

৯। গ্রাম : শিয়ালডাঙ্গা। ৫৭।৬১১'১২।৪৪৩।২,৫৬৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কায়স্থ, কামার, মালাকার, বর্গক্ষত্রিয়, হাঁড়ি ও কাপালিক। কাজির চক, পাড়ুই-পাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কুটীরশিল্প, চাকুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলষ্টেশন বড়গাছিয়া।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাছাড়া, রক্ষাকালী, শীতলা ও ষষ্ঠীপূজা হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে চারদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ, কালী ও শীতলার মন্দির আছে। পঞ্চানন্দ ও শীতলার প্রস্তর মূর্তি। শীতলা মন্দিরটি ব্যক্তি-বিশেষের। গ্রামে একটি পীরের দরগাহ আছে।

শ্রীহৃষিকেশ রায়, শিক্ষক,
শিয়ালডাঙ্গা, হাওড়া।

১০। গ্রাম : কুমারপুর ও রণমহল (মৌজা : কুমারপুর)।৬০।৬৫৮'৪২।৪।৩৩

(ক) রণমহল গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বৈরাগী, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা ও কেওরার বাস এবং কুমারপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য এবং তাঁতী সম্প্রদায়ের বাস।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী এবং জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন পাতিহাল। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) রণমহল ও কুমারপুর একই মৌজাভুক্ত দুইটি পাশাপাশি গ্রাম। নিম্নলিখিত উৎসবগুলি উভয় গ্রামে মিলিতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি, চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক এবং ফাল্গুন বা চৈত্র মাসের শুক্লা

তিথিতে শনি অথবা মঙ্গলবার শয়লা উৎসব উপলক্ষে একযোগে মনসা ও শীতলার বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। দুর্গাপূজাটি বহুকালের প্রাচীন এবং অন্যান্য উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা ও পীরের স্থান আছে।

রণমহল ও কুমারপুর গ্রামদ্বয় ভুরিশ্রেষ্ঠী ও বালিয়া পরগণার অধীন ছিল। রণমহল গ্রামের উত্তর সীমানা দিয়া পূর্বে কৌষিকী নদী প্রবাহিত ছিল—এক্ষণে উহা মজিয়া গিয়াছে। গ্রামের পূর্ব দিকে শিবডাঙ্গায় শিবমন্দির ছিল।

রণমহলের পূর্ব নাম "'রাণী মহাল" ছিল। শোনা যায়, এই স্থানে গৌড়েশ্বরের রাণীরা বাস করিতেন এবং কুমারপুর গ্রামে কুমারগণ অর্থাৎ রাজপুত্রগণ বাস করিতেন।
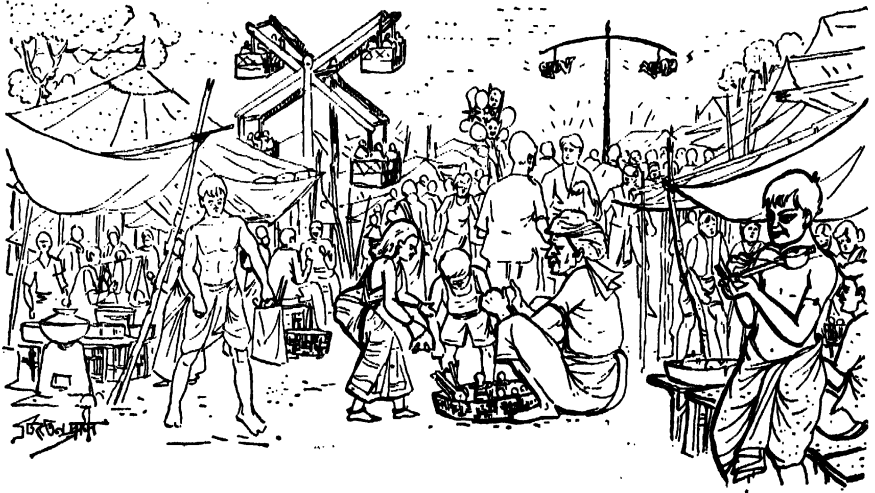
জেলা : হাওড়া
থানা : জগৎবল্লভপুর

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব
(কতোয়ালী সাহেব)

শোনাযায়, কতোয়ালী সাহেব নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বহুকাল আগে বামুনপাড়া গ্রামে আসিয়া সাধন-ভজনে লিপ্ত হন এবং তাঁহার চারিত্রিক সৎগুণে সকলকে মুগ্ধ করেন। তিনি দেহ রক্ষা করিলে পর তাঁহার ভক্ত শিষ্যগণ তাঁহাকে এই স্থানে সমাধিস্থ করেন এবং তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসব উপলক্ষে কোরান পাঠ শুনিতে প্রতি বৎসর বহু মুসলমান ফকির ও ভক্তের সমাগম হয়।

কালীপূজা

প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বামুনপাড়া গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মময়ী কালীর সাড়ম্বরে পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে দেবীর যথারীতি পূজা, ভোগ, বলি ও হোমাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে একটি মন্দিরে ব্রহ্মময়ী কালীর বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপ বিরাট কালী প্রতিমা এ অঞ্চলে দ্বিতীয় নাই। প্রতিদিন এবং উৎসব উপলক্ষে বহু দূরবর্তী অঞ্চল হইতে অসংখ্য নরনারী মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। প্রবাদ আছে বাংলা ১২০৩ সালের কিছু পূর্বে এই গ্রামের প্রান্তে একজন কাপালিক সাধু গভীর বনের মধ্যে একটি ছোট কালী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া নিত্যপূজা ও যোগ সাধনা করিতে থাকেন। পরে সাধারণে জানিতে পারিয়া শ্রীভবানী চরণ মিশ্র ও কুণ্ডুদিগের চেষ্টায় কালীর মন্দির স্থাপন করেন এবং নিত্য পূজার জন্য কিছু নিষ্কর ধান জমি সংগ্রহ করিয়া দেন। উক্ত সাধক দেহরক্ষা করিলে তাঁহাকে মন্দিরের নিকট সমাধি দেওয়া হয় এবং এই গ্রাম নিবাসী ভরদ্বাজ গোত্রীয় মিশ্র (মুখোপাধ্যায়) পদবীধারী একটি ব্রাহ্মণ পরিবারকে দেবীর নিত্য পূজার ভার অর্পণ করা হয়। তাঁহার পর যথাক্রমে রামনাথ পুরী ও পূর্ণ চন্দ্র পুরী দেবীর পূজারী হন। কিন্তু পূর্ণ চন্দ্র পুরী অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে তাঁহার স্ত্রী ননীবালা দেবী সাত বৎসর বয়স্ক হরিপদ ভারতীকে বাংলা ১৩১৩ সালে দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন। বর্তমানে তিনিই দেবীর পূজারী। শ্রীভারতী বাৎস্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

কার্তিক মাসে পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর পৌষ ও ভাদ্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

সেকরাহাটি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং ইহা এই গ্রামের সর্বজনীন উৎসব হইলেও নিকটবর্তী পাঁচ-ছয়টি গ্রামের অধিবাসী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসরই কয়েকজন ভক্ত সারা চৈত্র মাস ব্যাপী সন্ন্যাস ব্রত পালন করেন এবং সংক্রান্তির দিন ঐ ভক্তরা গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনা করিয়া আশে-পাশের কয়েকটি গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। প্রায় পাঁচ-সাত বৎসর পূর্বেও এই উৎসবে প্রায় শতাধিক লোক গাজনের সঙ্ সাজিতেন এবং কলিকাতা হইতে দুই-তিনটি পেশাদার গায়ক ও নর্তকের দল আসিত। তাঁহারা নানারূপ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া গাজনের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে গ্রামে গ্রামে যাইতেন ও নাচগানে সকলকে মুগ্ধ করিতেন।

বর্তমানে এই উৎসবের জাঁকজমক বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

বিশালাক্ষীপূজা

বামুনপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে বিশালাক্ষীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা ও ভোগ আরতি হয়। বহু দূরাগত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবের দিন সাধারণের মধ্যে অন্নসত্র এবং দেবীর ভোগ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি প্রাচীন। বহুকাল পূর্বে ভবানী মিশ্র নামক জনৈক গ্রামবাসী এই গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত কানা দামোদর নদীর তীরে

বিশালাক্ষী দেবী মূর্তি স্থাপন করিয়া নিত্য পূজা ও সাধন-ভজন করিতেন এবং পরে গ্রামবাসীর চেষ্টায় গ্রামের শ্মশানে দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু শব ও শৃগাল কুকুরের দৌরাত্ম্যে তাঁহার সাধনায় বিঘ্ন হইতে থাকে এবং একদা দেবী ও মথুরাবাটীর মল্লিকদের স্বপ্নাদেশ করেন তাঁহার মন্দির স্থাপনের জন্য। মল্লিকরা নাইকুলী গ্রামে দেবীর নাট মন্দির সহ এক বিরাট মন্দির, ভৈরব শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং মন্দির সংলগ্ন একটি পুষ্করিণী খনন করেন। পরে ভবানী মিশ্র গৃহী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে এবং এইরূপে দেবীর নিত্যপূজা বন্ধ হইয়া যায়।

বার্ষিক উৎসব ব্যতীত শারদীয়া অষ্টমী ও নবমী তিথিতে বিশেষ পূজা হয়। নবমী তিথিতে দেবীর নিকট মানতের বহু ছাগবলি দেওয়া হয়। বিশালাক্ষী মন্দিরের নিকটেই দেবীর ভৈরব মহাদেবের মন্দির আছে।

মনসাপূজা

বামুনপাড়া গ্রামে মিশ্রপাড়ায় একটি মন্দিরে মনসা প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে অতি সমারোহে পশু বলি সহ দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সারাদিন চলে। উৎসবের দিন এই গ্রাম ও আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নর-নারী মনসার পূজা দিতে আসেন। মনসা মন্দিরে দুইটি শিব, লক্ষ্মী, শীতলা, বাসুদেব, গণেশ এবং ষষ্ঠীর মূর্তি আছে। মনসাসহ এই সকল দেবদেবীর নিত্য পূজা হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমায় এই মন্দিরে আর একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বহু হিন্দু নর-নারী সন্তানাদির কল্যাণ কামনায় মনসার পূজা দিয়া থাকেন এবং সারাদিন মন্দির প্রাঙ্গণে বনভোজন উৎসব পালন করিয়া সন্ধ্যায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

মহোৎসব

সাদতপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

প্রায় পনর দিন পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি আরম্ভ হয় এবং দোল পূর্ণিমার পূর্বদিন অধিবাস, পূর্ণিমা দিন নাম সংকীর্তন এবং তাহার পরদিন নগর সংকীর্তন ও মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদনের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং উৎসব উপলক্ষে নানাপ্রকার নৃত্য-গীত এবং রং খেলা হয়।

রথযাত্রা

মানসিংহপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন এবং আদিতে ব্যক্তি-বিশেষ কর্তৃক প্রবর্তিত হইলেও বর্তমানে ইহা সর্বজনীন উৎসবরূপে পরিগণিত। শোনাযায়, বহুকাল পূর্বে এই গ্রাম নিবাসী মাহিষ্য সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি সুদূর দাক্ষিণাত্য হইতে একটি খঞ্জ ব্রাহ্মণ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে এই গ্রামে বসবাসের নিমিত্তে লইয়া আসেন। ঐ ব্রাহ্মণ পরিবার কর্তৃক এই গ্রামে রথযাত্রা উৎসব প্রচলিত হয়। বর্তমানে ঐ ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধরগণ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ ঘরে বিভক্ত হইয়া এই গ্রামে বসবাস করিতেছেন। তাঁহারাই উৎসব পরিচালনা করিয়া থাকেন।

বামুনপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি গ্রামের কুণ্ডু পরিবারের প্রতিষ্ঠিত কুলদেবতা নারায়ণ শিলাকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইলেও সর্বসাধারণে এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। এইদিন যথারীতি পূজাদির পর নারায়ণ শিলাকে রথে আরোহণ করাইয়া মন্দির হইতে বহুদূরে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আনিয়া রাখা হয় এবং আটদিন পর পুনঃযাত্রার দিন রথসহ উক্ত নারায়ণ শিলাকে মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং উৎসবে আশেপাশের গ্রামের প্রায় সহস্রাধিক নর-নারী যোগদান করিয়া থাকেন। পূজার দুই দিন সাধারণের মধ্যে ভোগ বিতরণ এব ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়।

শিবরাত্রি

সেকমাহাটি গ্রামে স্বামী শঙ্করানন্দ অবধূত কর্তৃক বাংলা ১৩২২ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি মঠে (গ্রাম বিবরণী দেখুন)

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশী তিথিতে সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উল্লিখিত মঠের এলাকার মধ্যে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে ঐ মন্দিরেই যথারীতি পূজাদি হয়। দুই-তিন দিন পূর্ব হইতে ইহার প্রস্তুতি শুরু হয়। রাত্রি জাগরণ ও চতুর্দশীব্রত উদ্‌যাপনের জন্য হরিনাম সংকীর্তন, কালী-কীর্তন ও কথকতা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চতুর্দশীর পরদিন চার-পাঁচটি গ্রামের সহ-যোগীতায় বালকভোজন, দরিদ্র-নারায়ণ সেবা ও অন্নসত্র খোলা হয়।

প্রায় দশ-বার বৎসর পূর্বেও বহু সাধু-সন্ন্যাসীগণ এই উৎসবে যোগদান করিতেন বলিয়া তাঁহাদের আশ্রয়দানের নিমিত্ত অস্থায়ী মণ্ডপ তৈয়ারী করা হইত। বর্তমানে সাধুসন্ন্যাসীগণের আগমন খুবই কম হয়।

শিবের নিকট নৈবেদ্য, ফল-মূল, মিষ্টান্ন, বস্ত্রাদি-এবং ছাগ বলি মানত দেওয়া হয়। প্রতিদিন নিয়মিত পূজা, সন্ধ্যায় আরতি ও বৈকালী দেওয়া হয়। বর্তমান পূজারী শ্রীমং শিবানন্দ ব্রহ্মচারী, দশনামী, সন্ন্যাস, রুদ্রবর্ণ-ভৃগু গোত্র এবং পদবী গিরীনামা।

মঠের এই উৎসবে পাঁচ-ছয় শতাধিক নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে।

জেলা : হাওড়া
থানা : জগৎবল্লভপুর

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান মেলা (কতোয়ালী সাহেব)

বামুনপাড়া গ্রামে কতোয়ালী সাহেব পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পীরের আস্তানা সংলগ্ন প্রায় আট বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার জমি কিয়দংশ পীরোত্তর এবং কিয়দংশ সাধারণের। পার্শ্ববর্তী প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি গ্রাম হইতে এবং উলুবেড়িয়া, আমতা, শিয়াখালা, তারকেশ্বর, চাঁপাডাঙ্গা, বড়গাছিয়া, জগৎ-বল্লভপুর, সোনামঞ্জরী, মুণ্ডলিকা প্রভৃতি স্থান হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। মেলার প্রথম চারদিন মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং অবশিষ্ট দিনগুলিতে ক্রমশই হিন্দু যাত্রী-দিগের ভীড় বাড়িতে থাকে।

মেলায় বর্তমানে প্রায় একশত দোকানপাট বসে। স্থানীয় দোকানদার ব্যতীত গৌরীপুর, আমতা, খড়িয়প, শিংটি, শিবপুর, কলিকাতা, সেকারাহাটি, নরেন্দ্রপুর, ধমা; বেলে, জগৎবল্লভপুর, পাতিহাল প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকান, মনিহারী ও বাসনকোসনের দোকান, মাটির হাঁড়ি-কুঁড়ি, পুতুল, খেলনা এবং বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাছাড়া, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতি ও শাকসব্জীর দোকানপাট বসে।

মেলার আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী প্রভৃতির ব্যবস্থা থাকে। কোন কোন বৎসর কবিগানেরও আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

জগৎবল্লভপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রাধা-গোবিন্দের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে নদীর তীরে রথতলায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর দুইদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। রূপপুর ইছানগরী, পাতিহাল, রসুল, চাদুল প্রভৃতি স্থান হইতে গরুর গাড়ী, সাইকেল অথবা পদব্রজে প্রায় পাঁচ-ছয় শত নর-নারী মেলায় আসিয়া থাকেন।

মেলায় মোট চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় বিক্রেতারা ভিন্ন রূপপুর, ইছানগরী, পাতিহাল প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া, মনিহারী দোকান, বই-ছবির দোকান ও অন্যান্য কয়েকটি জিনিসপত্রের দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে।

চড়ক-গাজন-নীলপুজার মেলা

হাঁটলা অনন্তবাটী গ্রামে বিশালাক্ষীতলায় প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

বড়গাছিয়া, পাতিহাল প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় তিন-চার হাজার নর-নারী আসেন।

মেলায় কোন বৎসর পনের-কুড়িটি এবং কোন কোন বৎসর চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত দোকানপাট বসে। স্থানীয় বিক্রেতাগণ ছাড়াও আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারীর দোকান, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি ও পুতুলের দোকান, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মনসার ভাসান গান এবং কোন কোন বৎসর যাত্রাভিনয়ও হইয়া থাকে।

জগৎবল্লভপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত হইতে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্র সংক্রান্তিতে এই মন্দিরেই গাজন উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈকালে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে।

মেলাতে প্রায় ছয়-সাতশত নর-নারীর সমাগম হয়। রূপপুর, ইছানগরী, পাঁতিহাল, রসুল, চাতুল প্রভৃতি গ্রাম হইতে যাত্রীরা আসেন। সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী ছয়-সাত মাইল দূর হইতে আসেন। যাত্রীরা সাধারণতঃ গরুর গাড়ী, সাইকেল ও পদব্রজে আসিয়া থাকেন।

মেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং পনের-কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন পাঁতিহাল, বড়গাছিয়া, বালিয়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

মেলায় দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী ও খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া বই-ছবির দোকান এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে।

কুমারপুর গ্রামের শিবতলায় প্রায় দেড় বিঘা দেবোত্তর জমির উপর প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটির শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ রিক্সা এবং পদব্রজে আসেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা ভিন্ন নিকটবর্তী শহরাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি প্রভৃতির দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কবিগান ও নানারূপ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামের যাত্রাদল ব্যতীত কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদার যাত্রার দল আনা হয়। উল্লিখিত আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় চার-পাঁচ হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

শ্যামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক পূজা উপলক্ষে মহাকালের নামে উৎসর্গকৃত জমিতে একটি ছোট মেলা বসে। কোন কোন বৎসর একদিন এবং কোন কোন বৎসর দুইদিনও মেলা স্থায়ী হয়। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। মেলায় দুই-তিন শত নর-নারীর সমাগম হয় এবং ময়রা-তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানের সঙ্গে অন্যান্য কয়েকটি দোকানপাট বসে। যাত্রী এবং বিক্রেতা উভয়ই স্থানীয়। মেলা উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

দোলযাত্রার মেলা

শিয়ালডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর চার-পাঁচ দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। সাধারণতঃ বিকালের দিকেই মেলায় লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়।

মেলায় স্থানীয় যাত্রীগণ ব্যতীত হাঁটাল, পাঁতিহাল এবং বড়গাছিয়া প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রামসমূহ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

নিভা, বালিয়া, ইছাপুর এবং কুমারপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। দোকানপাটগুলির মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানের সংখ্যাই

অধিক। তাহাছাড়া বিস্কুট, লজেন্স ও অন্যান্য জিনিস-পত্রের কয়েকটি দোকান বসিয়া থাকে। মেলায় প্রায় ত্রিশ-বত্রিশজন ফেরিওয়ালাও আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, কথকতা, কবিগান, ম্যাজিক প্রদর্শনী ও সার্কাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় প্রতি বৎসরই কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে। দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা প্রায় এক হাজারের মত হয়।

পাঁতিহাল গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় রায়বাবুদের বহির্বাটি সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর মাত্র একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন এবং ইহাতে দুই হইতে চারি হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে যাত্রীগণ আসিয়া থাকেন।

মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা বহু। বিক্রেতাগণ স্থানীয়। অধিকাংশ দোকানপাটই খোলা জায়গায় বসিয়া থাকে এবং দুই-চারিজন ফেরিওয়ালাও আসেন।

উল্লিখিত দোকানপাটের মধ্যে তেলেভাজা এবং খেলনার দোকানই বেশী। ইহাছাড়া, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, ঔষধপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান এবং শিল্প সামগ্রী ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদর জন্য সার্কাস, ম্যাজিক এবং যাত্রাভিনয় ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। এই গ্রামের যাত্রাদলই প্রধানতঃ যাত্রাভিনয় করিয়া থাকে। কখন কখনও পেশাদারী যাত্রাদলও আনা হয়।

সাদতপুর গ্রামের শিবতলায় সাধারণের প্রায় দশ কাঠা জমির উপর প্রতি বৎসর ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি মাত্র একদিন স্থায়ী হয়।

মেলায় যাত্রী এবং বিক্রেতাগণ স্থানীয়; তবে প্রতি বৎসর বড়গাছিয়া বাজার হইতে কয়েকজন বিক্রেতা আসেন।

দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসন ও বই-ছবির দোকান বসে। ইহাছাড়া, মানসিংহপুর গ্রামের মুচী সম্প্রদায়ের মেয়েদের স্বহস্তে তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের চ্যাঙ্গারী, চুবড়ী, ধুচ্‌নী, কুলো ইত্যাদি প্রতি বৎসর মেলায় আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কেবলমাত্র কীর্তনের আয়োজন করা হয়। গ্রামের দল ভিন্ন প্রতি বৎসর হাটালের পঞ্চানন অধিকারীর দল কীর্তন গাহিতে আসেন। এই কীর্তন গান শুনিতে মেলায় প্রায় সাত-আট শত নর-নারীর সমাগম হয়।

রাধাকান্ত জীউর মেলা

মানসিংহপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় রাধাকান্ত জীউর ফুলদোল উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দশ-পনর বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহা মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

মেলায় হাটাল, জগৎবল্লভপুর, পাঁতিহাল, মাজু, সেকরাহাটি, গোবিন্দপুর প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে। পূর্বোক্ত ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় তেলেভাজা ও ময়রার দোকান, মাটির বাসনপত্র ও মনিহারী দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া, কয়েকটি কাপড়চোপড়ের দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান এবং দুই একটি বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, লটারী, লাঠিখেলা এবং নানারকম সঙ প্রদর্শনী হয়। ইহাছাড়া যাত্রাভিনয়, কবিগান, মনসামঙ্গল, জলসা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতেও পেশাদারী যাত্রাদল আনা হয়।

জেলা : হাওড়া
থানা : ডোমজুড়

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : দক্ষিণ ঝাপড়দহ।

১৫।১,০৬২·৯৫।৯৮৫।৫,৫৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, কামার, তাঁতী, গন্ধবণিক, মাহিষ্য, সৎচাষী, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, ধাত্রী, হাঁড়ি, জেলে ও মুসলমান। গ্রামে তেরটি পাড়া আছে, যথা—বাড়ুয্যেপাড়া, ভট্টাচার্য্যপাড়া, মুখার্জিপাড়া, মণ্ডলপাড়া, কুমারপাড়া, মুসলমানপাড়া, মাইতি-পাড়া, ঘোষপাড়া, দাসপাড়া, মালপাড়া, জেলেপাড়া, কাওরাপাড়া, সঙ্গীয়াপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য্য, চাকুরী, মজুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা মার্টিন রেলপথে দক্ষিণবাড়ী বা ডোমজুড় স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। হাওড়ার কদমতলা হইতে ডোমজুর পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। ঐ মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়। ইহাভিন্ন, নিকটবর্তী সরস্বতী নদী দিয়া যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রধান উৎসব আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং চৈত্র মাস একযোগে ধর্মরাজের ও শিবের গাজন উৎসব। ইহাছাড়া, প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় শীতলাপূজা, মনসাপূজা, ধর্মঠাকুরপূজা এবং ভাদ্র সংক্রান্তিতে কৃষক ও মজুরেরা মিলিতভাবে আনন্দোৎসব করিয়া থাকেন। ভাদ্র সংক্রান্তির উৎসব উপলক্ষে নৌকা বাইচ, গান-বাজনা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং একটি ছোট মেলা বসে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি মসৃণ গোলাকৃতি প্রস্তর খণ্ডকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করা হয়। ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত "পণ্ডিত" পদবীধারী ব্রাহ্মণেরা ধর্মরাজের পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন। অপর একটি মন্দিরে শীতলার দারুময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা ভিন্ন, মনসা, বাস্তকালী, পঞ্চানন্দ ও ওলাবিবির নির্দিষ্ট স্থান আছে। ওলাবিবির খাদেম জনৈক মুসলমান। গ্রামে কলেরা মহামারী দেখা দিলে গ্রামবাসীরা ওলাবিবির স্থানে পূজাদি দিয়া থাকে।

শ্রীশৈলেন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
দক্ষিণ ঝাপড়দহ, হাওড়া।

২। গ্রাম : রুদ্রপুর। ১৬।৬০৫·৫৬।৬১৬।৩,৪৬৪

(ক) মাহিষ্য, রাজবংশী, বর্গক্ষত্রিয়, নাপিত। গ্রামে এগারটি পাড়া আছে, যেমন—খাঁড়াপাড়া, পাত্রপাড়া, দাসপাড়া, হাজরাপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) মার্টিন রেলপথে ডোমজুর রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। ডোমজুড়-খসনরা জেলাবোর্ডের রাস্তাই গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ। নিকটবর্তী একটি খাল দিয়া বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুনে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবের গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিবমন্দির, একটি শীতলা মন্দির, তিনটি পঞ্চানন্দ, চারটি বাবাঠাকুর এবং প্রতি ঘরে মনসা আছে।

শ্রীবিষ্ণুপদ হাজরা, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ রুদ্রপুর, হাওড়া

৩। গ্রাম : বাছুরগোট (মৌজা : রুদ্রপুর)।
১৬।৬০৫'৫৬।৬১৬।৩,৪৬৪

(ক) ব্রাহ্মণ, রাজবংশী ও বর্গক্ষত্রিয়। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডোমজুর হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে পঞ্চানন্দ পূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবে কেহ কেহ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। একটি নির্দিষ্ট স্থানে ঘটস্থাপন করিয়া পঞ্চানন্দের পূজা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

শ্রীচণ্ডী চরণ মান্না, শিক্ষক,
পোঃ কেশবপুর, হাওড়া,

৪। গ্রাম : ওয়াদিপুর। ১৭।২৬৩'৭৭।৫২৫।৩,০৪৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, তাঁতী।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডোমজুড় এবং দক্ষিণ বাড়ী। বর্ষাকালে ডোমজুড় হইতে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে। ডোমজুড় স্টেশন হইতে রিক্সায় গ্রামে পৌছানো যায়।

(ঘ) গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসা পূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, ফাল্গুনে চাঁচর, দোল ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও ধর্মরাজ পূজা।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসা, চণ্ডী ও শিবের মন্দির আছে এবং ধর্মরাজ, পঞ্চানন্দ, শীতলা ও ওলাবিবির স্থান আছে। প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে আশ্বিন মাসে চণ্ডীপূজা, শ্রাবণ মাসে ওলাবিবির পূজা এবং বৎসরের যে-কোন সময়ে শীতলাপূজা হইয়া থাকে।

শ্রীমঙ্গল লাল পাত্র, শিক্ষক,
শ্রীভনি লাল পাত্র, কৃষিকার্য,
গ্রাম ও পোঃ ওয়াদিপুর, হাওড়া।

৫। গ্রাম : কোলড়া। ২০।১,১৪৫'৫৯।
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে কুড়ি-পঁচিশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে চার মাইল দূরে রেলস্টেশন। মোটরবাস ও নৌকাযোগে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক পূজা ও ধর্মরাজপূজা। ইহাভিন্ন, চান্দ্রমাস হিসাবে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম, সবেবরাত, ঈদলফেতর ও ইদুজ্জোহা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর দুইটি শীতলা ও একটি মনসা আছেন। ইহাছাড়া, দুইটি সত্যপীর, বড়কানগাজী ও ইমান্ সাহেবের দরগাহ্ আছে।

পূর্বে এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া গৌরী নদী প্রবাহিতা ছিল। ঐ নদীর কূলে বহু কলু-র আড়া অর্থাৎ আড়ত ছিল। সম্ভবতঃ কলুর আড়া-র থেকে গ্রামটির নাম কোলাড়া হইয়াছে।

শ্রীআব্দুস্ সাত্তার লস্কর, শিক্ষক,
কোলড়া জুনিয়র হাইস্কুল, হাওড়া।

৬। গ্রাম : বেগড়ী। ২৫।২৪৬'১৭।৪৪৫।২,৪১০

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দশটি পাড়া আছে, যেমন—নস্করপাড়া, জেলেপাড়া, সর্দারপাড়া, পানপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডোমজুড়। সরস্বতী নদীর শাখা কৌষিকী নদীর খালে নৌ চলাচলের সুবিধা আছে।

(ঘ) বৈশাখী সীতানবমী তিথিতে স্থানীয় হরিসভায় নামকীর্তন মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শীতলাপূজাটি চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি গৌরাঙ্গ মন্দির ব্যতীত দুইটি শীতলা, একটি পঞ্চানন্দ, তিনটি শিব ঠাকুর এবং শ্মশান ঘাটে একটি কালী আছে।

গ্রাম সম্পর্কে শোনাযায় যে, প্রাচীন কালে এই গ্রামের পূর্ব সীমানায় হাবসী রাজারা বাস করিতেন। মাত্র ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বেও তাঁহাদের প্রাসাদের ভগ্নস্তূপগুলি গ্রামে দেখা যাইত। ঐ প্রাসাদসংলগ্ন একটি পরিখা এবং প্রাসাদের এলাকাভুক্ত জমির শেষ সীমান্তে অপর একটি পরিখা ছিল। প্রথমোক্ত পরিখাটিকে বলা হইত ভিতর গড় এবং শেষোক্তটিকে বলা হইত বাহিরগড়। অনুমান করা হয় যে, এই বাহিরগড় হইতে গ্রামের নাম বাইগড়ী এবং কালক্রমে উহা "বেগড়ী" হইয়াছে।

শ্রীধনঞ্জয় ঘোষ, শিক্ষক,
সহ-সম্পাদক, শিবপ্রভা লাইব্রেরী,
গ্রাম ও পোঃ বেগড়ী, হাওড়া।

৭। গ্রাম : বালিয়াড়া। ২৬।৪৫০'৭০।৩৫৫।১,৮৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, তপশীল, সদ্গোপ, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে আন্দুল স্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। ইহাছাড়া হাওড়া-আমতা মার্টিন রেলপথে ডোমজুড় স্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা চলে। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ "ডোমজুড়-বাউড়িয়া রোড"।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন পাকা শিবমন্দির আছে এবং খোলার চালযুক্ত একটি পাকা গৃহে মহাদেব সহ পঞ্চানন্দের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামের একটি পুকুর খননকালে পঞ্চানন্দের মূর্তিটি পাওয়া যায়। তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি পঞ্চানন্দের সেবায়েত ও পূজারী। ইহাছাড়া, গ্রামে একটি শীতলা ঠাকুর আছে।

শ্রীধনঞ্জয় ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বেগড়ী, হাওড়া।

৮। গ্রাম : মাকড়দহ। ৩৪।৪২৩'৪৫।৬১০।৩,৩৪৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যথা—চাটুয্যে-পাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, পাত্রপাড়া, চৌধুরীপাড়া, দাস-পাড়া, বেনেপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডোমপাড়া, ধোপা-পাড়া, সর্দারপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, মজুরী, কুটিরশিল্প ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। যাতায়াতের জন্য নিয়মিত মোটরবাস পাওয়া যায়। "হাওড়া-আমতা রোড," "মাকড়দহ-একসরা রোড," "ডোমজুড়-বারুইপাড়া রোড" ও "মাকড়দহ-বেগড়ী রোড" প্রভৃতি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ ও মকর সংক্রান্তির স্নান এবং ফাল্গুন মাসে

মাকড়চণ্ডীর পঞ্চমদোল উৎসব ব্যতীত মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদ্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মাকড়চণ্ডীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি বাংলা ১২২৯ সন হইতে চলিয়া আসিতেছে।

(চ) গ্রামে মাকড়চণ্ডীর একটি বৃহৎ পাকা মন্দির, ভট্টাচার্যপাড়ায় একটি শীতলা মন্দির, দাসপাড়ায় বাবাঠাকুরের মন্দির এবং বেনেপাড়ায় মনসার বেদী আছে।

শ্রীভোলা নাথ চট্টোপাধ্যায়,
সম্পাদক, চণ্ডী সেবায়েত সঙ্ঘ,
মাকড়দহ, হাওড়া।

Makarchandi temple in Makardaha (J. L. 34). A short distance from Makardaha railway station, 8 miles from Howrah on the Howrah-Amta Light Railway. Temple in the Bengal style. (p. 162)

The thana of which it is the head-quarters is densely populated, and contains several important villages. On the bank of the Saraswati are Baluti and Jhapardah with High English Schools, and Makardah at which a large *mela* is held on the fifth day of the *Holi* festival in March. West of the stream are Narna with a large *mela* held on the Charak Sankranti day in April; Rajapur (or Dakshinbar) on the drainage channel of the same name, with a railway station and a canal bungalow; and Begri with a large weekly *hat*.

(District Handbooks, Howrah, 1951, by A. Mitra, p. 1.)

মাকড়দহ—হাওড়াঘাট হইতে ৮ মাইল দূর। এই স্থান সরস্বতী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানকার মাকড়চণ্ডীর মন্দির খুব প্রসিদ্ধ। মাকড়চণ্ডী দেবী শ্রীমন্ত সদাগরের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত। পূর্ব্বকালে এই মন্দিরের পার্শ্ব দিয়াই সরস্বতী নদী প্রবাহিত ছিল। সরস্বতী এখন মজিয়া গিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে এই নদী দিয়াই সপ্তগ্রাম বন্দরে বাণিজ্যপোত সকল যাতায়াত করিত।

(বাংলায় ভ্রমণ: ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃ: ৫৩)

বিশেষ দ্রষ্টব্য:

মাকড়চণ্ডীর পঞ্চমদোল উৎসব সম্পর্কে একটি বিশেষ প্রবন্ধ উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

৯। গ্রাম: নার্না। ৪০।১,১৪৬৮০।৫৯৩।৩,১৮৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্গোপ, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, পথরাজ, মুচি, সৎচাষী, ধোপা ও নাপিত।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাত ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ডোমজুড়। "ডোমজুড়-জগদীশপুর রোড" হইতে ভাস্কর গ্রাম হইয়া অথবা পার্বতীপুর গ্রামের মধ্য দিয়া এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমায় পঞ্চানন্দ ঠাকুরের সাড়ম্বরে ঝুলনদোল উৎসব। উৎসব উপলক্ষে চাঁচড় ও বাজী পোড়ান হয় এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি বাবাঠাকুর, একটি শীতলা, পাঁচটি মনসা, একটি কালী, একটি ধর্মঠাকুর এবং তিনটি ষষ্ঠীঠাকুর আছে।

শ্রীগণেন্দ্র মোহন রায়, গ্রামসেবক,
নার্না ইউনিয়ন,
গ্রাম: দফরপুর, হাওড়া।

Narna (J. L. 40)—Alight at Chanditala on the Howrah-Siakhala line. Between two and three miles west of station lies Narna where there is a temple of Panchanan Thakur and Kali. The temple cannot be very ancient.

(District Handbooks, Howrah, 1951, by A. Mitra, p. 162)

গয়েশপুরের নিকটবর্তী নার্ণা গ্রামে এক বিখ্যাত পঞ্চানন ঠাকুর ও কালীর মন্দির আছে। লোকের বিশ্বাস যে নার্ণার পঞ্চানন ঠাকুরের মাটি মাখিলে বাতরোগ আশ্চর্য্যরূপে ভাল হয়। চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

[বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৫৮]

১০। গ্রাম : ভাস্কর। ৪১।৩৫৭'০৪।২৭১১।১,২৮৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বর্গক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, সর্দার, কুমার, তিলি। গ্রামে আটটি পাড়া আছে, যথা—ব্রাহ্মণপাড়া, মণ্ডলপাড়া, দাসপাড়া, ঘোষপাড়া, বাগ্দীপাড়া, চৌধুরীপাড়া, পালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাত ব্যবসায়।

(গ) মার্টিন রেলপথে ডোমজুড় অথবা বালুহাটী রেলস্টেশন হইতে হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। বর্তমানে ডোমজুড়-জগদীশপুর রাস্তাটি পাকা হওয়ায় সাইকেল রিক্সা চলাচলের সুবিধা হইয়াছে।

(ঘ) বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে আনন্দময়ী কালীমাতার বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে বুড়াশিব, বিশালাক্ষী, শীতলা, ধর্ম-ঠাকুর ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীশঙ্কর কুমার ভট্টাচার্য্য, চাকুরি,
গ্রাম : ভাস্কর,
পোঃ বালুহাটী, হাওড়া।

১১। গ্রাম : গয়েশপুর। ৪৪।২১৩'২৭।১১৯।৬৩২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে, যথা—হালদার পাড়া, দুলেপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন জগদীশপুর। ডোমজুড়-জগদীশপুর রোড দিয়া এই গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ৪ঠা মাঘ গয়েশ্-উদ-দীন পীরের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) গয়েশ্-উদ-দীন পীরের উরস উপলক্ষে মেলা। ৪ঠা মাঘ হইতে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গয়েশ-উদ-দীন পীরের নামানুসারে গ্রামের নাম গয়েশপুর হইয়াছে।

শ্রীগণেন্দ্র মোহন রায়, গ্রাম সেবক,
নার্ণা ইউনিয়ন,
গ্রাম ও পোঃ দফরপুর, হাওড়া।

Astana and mosque of Pir Gayesuddin in Gayespur village (J. L. 44). Alight at Baluhati station on the Howrah-Siakhala Light Railway, eight miles from Howrah and cycle two miles to the West of the station on a District Board road. There are vanishing remains of a *garh*. Neither the mosque nor the astana is of any great architectural beauty.

(District Handbooks, Howrah, 1951, by A. Mitra, p. 162)

গয়েশপুর গ্রামে পীর গয়েস্-উদ্-দীনের আস্তানা ও মসজিদ আছে। এখানে পৌষ সংক্রান্তিতে বৃহৎ মেলা বসে। পীর গয়েস্ উদ্-দীনের গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

[বাংলায় ভ্রমণ : ১ম খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ৫৮।]

১২। গ্রাম : পাকুড়িয়া। ৫৪।৩৭৮'৫৯।২৪৩।১,৪৩৩

(ক) গোপ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, বর্গক্ষত্রিয়, রাজবংশী, তাঁতী ও মুসলমান।

গ্রামে ঘোষপাড়া, নস্করপাড়া, পাঁজাপাড়া, জেলেপাড়া, বাগ্দীপাড়া, জানাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-শিয়াখালা মার্টিন রেলপথে একমরা অথবা সলপ্ রেলষ্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বর্তমানে বোম্বাই-মাদ্রাজ জাতীয় সড়কে এই গ্রামের মধ্য দিয়া উত্তরে বেনারস রোড, দক্ষিণে মাকড়দহ রোড সলপ ষ্টেশনের নিকট মিলিত হইয়াছে।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে পঞ্চানন ঠাকুরের চড়ক উৎসব।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ঘোষপাড়ায় পঞ্চানন ঠাকুরের একটি প্রাচীন জীর্ণ পাকা মন্দির ব্যতীত একটি পঞ্চানন, একটি শীতলা এবং একটি মহাকালের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রাম সম্পর্কে জানা যায় যে, বৃটিশ রাজত্বের কিছুকাল পূর্বে বর্তমান হাওড়া শহরের অন্তর্গত শালিখা হইতে একদল গোপ (বর্তমানে পল্লব গোপ নামে পরিচিত) গোচারণের সুবিধার জন্য এইস্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তাঁহারা যে স্থানে প্রথম গৃহ নির্মাণ করেন তাহা অদ্যাপিও গোয়ালবাড়ী নামে পরিচিত। এই গোপ পরিবারের আদি পুরুষ কানাই লাল ঘোষ এবং লক্ষ্মীরাম ঘোষ এই গ্রাম পত্তন করেন বলিয়া জানা যায়।

শ্রীমিছরী লাল সাধু, কৃষিজীবি,
গ্রাম : পাকুড়িয়া,
পোঃ চামরাইল, হাওড়া।

১৩। গ্রাম : বাঁকড়া। ৫৫।৮৮৬'১৭।১,৪৪৪।৭,১৫৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে চৌদ্দটি পাড়া আছে। যেমন— ঘোষপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মোল্লাপাড়া, নস্করপাড়া, তিয়রপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে এই গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে। "হাওড়া-আমতা রোড" দিয়া মোটর বাসেও গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে মিশ্র পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "জয়েশ্বর" ও "অভয়েশ্বর" শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব ও চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং গ্রামের সাধারণ লোক এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত গত বার বৎসর যাবত গ্রামে সাড়ম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। তাহা ছাড়া প্রায় দুইশত বৎসর যাবত মুসলমান সম্প্রদায়ের বকর ঈদ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। ইহা মুসলমান সম্প্রদায়ের আঞ্চলিক সর্বজনীন উৎসব। আশে-পাশের গ্রাম হইতে প্রায় দুই হাজার মুসলমান এই উৎসবে যোগদান করেন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী ও ষষ্ঠী ঠাকুরাণী আছেন। ইহা ছাড়া মিশ্রপাড়ায় মিশ্র পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অভয়েশ্বর এবং জয়েশ্বর নামে খ্যাত শিবের দুইটি প্রাচীন মন্দির এবং তৎসংলগ্ন পূজামণ্ডপ আছে। মন্দির দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং ঢাকার রাজমিস্ত্রীগণের দ্বারা নির্মিত বলিয়া জানা যায়।

গ্রামে একটি প্রাচীন শ্মশান আছে। এইস্থানে মিশ্রবংশের জনৈক বধূ একদা সহমরণে আত্মাহুতি দেন।

শ্রীঅজিত কুমার মণ্ডল, শিক্ষক,
বাঁকড়া মিশ্রপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হাওড়া।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ ডোমজুড়

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান উৎসব
(গয়েশ-উদ্-দীন পীর)

গয়েশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ৪ঠা মাঘ হইতে পনরদিনব্যাপী গয়েশ্-উদ্-দীন পীরসাহেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জনশ্রুতি আছে যে, গয়েশ-উদ্-দীন সাহেব এক ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ; তবে তাঁহার প্রকৃত পরিচয় সম্পর্কে কোন কিছু জানা যায় না। প্রথম জীবনে কিছুদিন সংসারে অতিবাহিত করিবার পর ভোগ ঐশ্বর্যে তাঁহার বীতস্পৃহা জন্মায় এবং 'ফকিরী' মত গ্রহণ করেন এবং সংসার পরিত্যাগ করিয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর এই গ্রামেই তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। গয়েশপুর হইতে জোদগিরি পর্যন্ত প্রায় এক মাইলব্যাপী একটি গড়ের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, উহা গয়েশপীরের গড় ছিল এবং তিনি ঐ স্থানে বসবাস করিতেন।

গয়েশ্-উদ-দীন পীর দেহরক্ষা করিলে তাঁহার অনুরক্ত শিষ্যগণ তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে এই উৎসবের প্রচলন করেন। বর্তমানে উৎসবটি সর্বজনীন এবং উৎসবে এই জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের বহু যাত্রীর সমাগম হয়। অবশ্য যাত্রীগণের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকের সংখ্যাই অধিক। উৎসব উপলক্ষে অন্নসত্র খোলা হয় এবং পীরের দরগাহ্-এ সিন্নি মানত করা হয়।

উৎসবটি কত কালের প্রাচীন সে সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা যায় না ; তবে অনেকের অনুমান যে ইহা প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন উৎসব।

কালীপূজা

ভাস্কর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত আনন্দময়ী কালীদেবীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে তিনটি ঘর বিশিষ্ট আনন্দময়ী কালীর একটি মন্দির আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে শায়িত শিবের নাভিস্থল হইতে উত্থিত প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর মুণ্ডমালা বিভূষিতা চতুর্ভুজা কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া চারিটি পরীমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথি হইতে দুইদিনব্যাপী আনুষ্ঠানিকভাবে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হইলেও মাসাধিককালব্যাপী ভাগবতপাঠ, তিন-চার রাত্রিব্যাপী যাত্রাভিনয় এবং অন্নসত্র খোলা হয়। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের এবং আশেপাশের গ্রামের সর্বশ্রেণীর লোক যোগদান করেন।

দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ। কালীর নিকট সাধারণতঃ ফলমূল, মিষ্টান্নাদি এবং ছাগ বলি মানত দেওয়া হয়। দেবীর নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে।

নার্না গ্রামে প্রতি বৎসর ২৮শে চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পঞ্চানন্দ ঠাকুরের কোন মন্দির বা মূর্তি নাই। গ্রামে একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে টিনের চালযুক্ত বাঁধানো নির্দিষ্ট স্থানে ঘট স্থাপন করিয়া পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা হইয়া থাকে।

কিংবদন্তী আছে যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমান রাজত্বকালে হুগলী জেলার খাতান দুর্গাপুর গ্রামে (শিয়াখালার নিকট) তুলারাম ঘোষ নামে যাদব সম্প্রদায়ের একব্যক্তি বাস করিতেন। তিনি তাঁহার সঙ্গীগণসহ প্রতিদিন নার্না গ্রামে গরু চরাইতে আসিতেন এবং একটি বাঁধের নিকট একটি অশ্বত্থ গাছের নীচে কুঁড়ে ঘর নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে রাত্রি যাপন করিতেন।

একদিন রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যেন পঞ্চানন্দ জীউ তাঁহার শিরদেশে বসিয়া বলিতেছেন, "আমি অহিন্দুর অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া এখানে আসিয়াছি। তুই আমাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজার্চনার ব্যবস্থা কর।" পরদিন প্রাতে তুলারাম তাঁহার শিরদেশে বিল্বপত্রসহ একটি ঘট

দেখিতে পান এবং সেই ঘট তিনি ঐ অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে স্থাপন করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। ইহার কিছুদিন পর পঞ্চানন্দ জীউর নামে দৈব মাহাত্ম্যযুক্ত ঔষধপত্রাদি দেওয়া হইতে থাকে। ক্রমে এই সংবাদ লোকমুখে নানা-দিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং বহুলোক ব্যাধিমুক্ত হইবার আশায় এই স্থানে আসিতে লাগিলেন। দৈবাদেশ ছিল যে, যাঁহারা পঞ্চানন্দের স্থান হইতে ঔষধ লইয়া উপকৃত হইবেন তাঁহারা সাধ্যমত চৈত্র মাসে ঠাকুরের নামে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিবেন। সুতরাং সেই সময় হইতেই চৈত্র সংক্রান্তিতে পঞ্চানন্দের গাজন উৎসব পালন করা হইতেছে।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবের তিনদিন প্রত্যহ প্রাতে সন্ন্যাসীগণ পঞ্চানন্দের নিকট দণ্ডী দেবার পর গ্রাম প্রদক্ষিণে বাহির হন। মধ্যাহ্নে যথারীতি পূজা ও সন্ধ্যায় শীতলারতি হয়। উৎসবের দ্বিতীয় দিন পঞ্চানন্দের স্থানে প্রদীপ দেওয়া হয় এবং তৃতীয় দিনে সাড়ম্বরে পূজার পর রাত্রি চারঘটিকায় সন্ন্যাসীগণ উত্তরীয় পরিত্যাগ পূর্বক সন্ন্যাসব্রত সমাপন করেন। পঞ্চানন্দের নিকট ফলমূল, সোনা-রূপা এবং ছাগ অথবা ভেড়া মানত দেওয়া হয়। মানতের পশুগুলিকে বলি দেওয়া হয়। স্থানীয় যাদব সম্প্রদায় পঞ্চানন্দের সেবায়েত। পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় রাঢ়ী শ্রেণী ব্রাহ্মণ, পদবী—বটব্যাল। উৎসবে বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি জেলার লোকও যোগদান করিয়া থাকেন।

পাকুড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পঞ্চানন্দঠাকুরের চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। বর্তমানে এই গ্রাম নিবাসী ঘোষ পরিবারের (গোপ) পূর্ব পুরুষ গদাধর ঘোষ এবং কাশীনাথ ঘোষ মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যপূজা ও উৎসবের আয়োজন করেন।

প্রতি বৎসর চৈত্রসংক্রান্তির তিন দিন পূর্ব হইতে যথারীতি পূজা ও উৎসব আরম্ভ হয়। অবশ্য উৎসবের প্রস্তুতি আরও চার-পাঁচ দিন পূর্ব হইতেই আরম্ভ হয়। পঞ্চানন্দের মন্দিরটি গ্রামের ঘোষপাড়ায় অবস্থিত। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি ঘটে যাবতীয় পূজাদি হইয়া থাকে। মন্দিরটি বর্তমানে জীর্ণ প্রায়। উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় পাঁচ শতাধিক নরনারী সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণপূর্বক এখানে সমবেত হন। উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য কদম ফুল সংগ্রহ করা করা। ভক্তদের বিশ্বাস ঐ দিন দেবানুগ্রহে গ্রামের কোন না কোন কদম গাছে অন্ততঃ একটি কদম ফুল ফুটিবেই। উৎসবের দিন সমাগত সন্ন্যাসব্রতীগণ বাদ্যভাণ্ডসহকারে গ্রামের কদম গাছগুলি অনুসন্ধান করিয়া ফুল সংগ্রহ করেন এবং ঐ ফুল দিয়া দেবতার নিকট অঞ্জলি দেন। চড়ক পূজার দুই দিন পূর্বে গ্রামের শীতলা ও মহাকালের স্থানে পূজা করা হয়—ইহা চড়ক পূজার একটি অঙ্গ।

চৈত্র মাসে উৎসব ব্যতীত সপ্তাহে প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবার পঞ্চানন ঠাকুরের নিকট মানত ও পূজা দেওয়ার জন্য দূর-দূরান্ত হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ ফল-মিষ্টান্ন দিয়া ষোড়শোপচারে পূজা এবং সোনা, রূপা, অর্থ ইত্যাদি মানত করা হয়। পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির হইতে শিশুদের ঘংরী, অম্ল, পেটের অসুখ প্রভৃতি অসুখ-বিসুখের জন্য স্বপ্নাদ্য মাদুলি দেওয়া হয়। হাঁপানি, যক্ষা প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ের জন্য এবং সন্তান কামনায় দেবতার প্রত্যাদেশ পাইবার আশায় অনেকে পঞ্চানন ঠাকুরের নিকট 'ধর্না' দেন। চড়ক উৎসবে ছাগ বলি দেওয়া না হইলেও প্রতি শনি-মঙ্গলবারের পূজায় পঞ্চাননের নিকট মানতের ছাগ বলি দেওয়া হয়।

প্রারম্ভে উৎসবটি গ্রামের ঘোষ পরিবারের কৌলিক উৎসব ছিল। বর্তমানে ইহা সর্বজনীন উৎসব। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। বর্তমান পূজারী শ্রীবিশ্বনাথ ঘোষাল ও তাঁহার ভ্রাতাগণ। তাঁহারা রাঢ়ী শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণ, গোত্র বাৎস্য।

বানিয়াড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে নীল পূজা ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে একটি পাকা শিবমন্দির আছে। মন্দিরটি উচ্চতায় প্রায় পঞ্চাশ ফুট এবং মন্দির অভ্যন্তরে সাত-আট ফুট দৈর্ঘ্য একটি পাথরের শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির সংলগ্ন দুইটি ঘরের একটিতে ভক্তগণ পূজাদি করেন, অপর ঘরটিতে পূজার উপচারাদি প্রস্তুত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। মন্দিরের সম্মুখে বাঁধানো চাতল ও স্নানের ঘাট আছে।

চড়ক উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় একমাস পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। পয়লা চৈত্র তারিখে মূল সন্ন্যাসী সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করিয়া সারা চৈত্র মাস ব্যাপী হবিষান্ন ভোজন ও সংযম পালন করেন। চৈত্র সংক্রান্তির তিন দিন পূর্বে বেগড়ী গ্রামে ধর্মঠাকুরের অনুমতি লইয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে এই উৎসবের সূচনা হয়। পরের দিন নীলের উপবাস ও নীলপূজা এবং সংক্রান্তির দিনে সাড়ম্বরে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে প্রথমে মূল সন্ন্যাসীর বাণ ফোঁড়া এবং পরে অন্যান্য সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ পর্ব ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে দূর দূরান্ত হইতে বহু নর-নারীর সমাগম হয়।

দক্ষিণ ঝাপড়দহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির চারদিন পূর্ব হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত একযোগে ধর্মরাজের ও শিবের গাজন এবং চড়ক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত গোলাকৃতি এক খণ্ড প্রস্তরকে শিবজ্ঞানে পূজার্চনা করা হয়। মন্দিরটি গ্রামের পাড়ুই পরিবার কর্তৃক নির্মিত। নীল ষষ্ঠীর দিন গন্ধবণিক সম্প্রদায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাস্তুকালীর মন্দিরে রাত্রিকালে সন্ন্যাসীগণ নীলপূজার আয়োজন করেন। এই মন্দিরে শিব ও কালীর বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের চারদিনব্যাপী সন্ন্যাসব্রতীগণ গ্রামের মধ্যে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। পূজায় ব্যগ্র ক্ষত্রিয়গণ "ফুল চাপান" পর্ব পালন করেন। তাঁহারাই শিবের মাথায় ফুল-বিল্বপত্র চাপান এবং শিবের মাথা হইতে সেই ফুল আপনা আপনি খসিয়া পড়িলে তবেই শিবের ঝাঁপ অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠানে চড়ক গাছ হইতে নীচে খড়ের গদীর উপর রক্ষিত লোহার বটির উপর একে একে সন্ন্যাসব্রতীগণ ঝাঁপাইয়া পড়েন। সাধারণতঃ ব্যগ্রক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসব্রতীগণ "ঝাঁপ" অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। চড়কগাছ হইতে ঝাঁপ দিবার পূর্ব মুহূর্তে সন্ন্যাসীগণ নীচে অপেক্ষারত দর্শকদিগের মধ্যে একটি করিয়া ফল নিক্ষেপ করেন। ভক্তদের বিশ্বাস ঐ ফল ভক্ষণ করিলে বন্ধ্যা নারী সন্তানলাভ করিতে পারেন। ইহাছাড়া এই স্থানে "কাদা ঝাঁপ" অনুষ্ঠিত হয়। একস্থানে কাদা মাখিয়া মধ্যে তাহার কাঁটা দেওয়া থাকে এবং সন্ন্যাসীগণ তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়েন।

মাকড়চণ্ডীর পঞ্চমদোল

মাকড়দহ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথিতে সাড়ম্বরে মাকড়চণ্ডী দেবীর পঞ্চম দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি বাংলা ১২২৮ সাল হইতে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া অনুমান করা হয়।

গ্রামের চট্টোপাধ্যায় বংশীয়েরা দেবীর সেবায়েত এবং পুরুষানুক্রমে তাঁহারাই দেবীর সেবা-পূজা করিয়া আসিতেছেন। গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করেন। মহিষাড়ীর জমিদার কুণ্ডু চৌধুরীগণের অর্থ সাহায্যে দেবীর বিরাট মন্দির, নাটমন্দির ও ভোগরন্ধন-শালা বাংলা ১২২৮ সালে নির্মিত হয়। দেবীর নিত্যভোগ ও পূজার জন্য অদ্যাপিও কুণ্ডু চৌধুরী পরিবারের নিকট হইতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায়।

শোনা যায়, মাকড়চণ্ডী দেবীর স্বপ্নাদেশে অনুসারে এই স্থানে পঞ্চমদোল উৎসব আরম্ভ হয়। উৎসবের পূর্বদিন রাত্রে মন্দিরের পিছনভাগে জলাভূমিতে চাঁচর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। চাঁচর উপলক্ষে এই স্থানে বহু টাকার আতস বাজী পুড়ান হয়। রাত্রি বার ঘটিকা হইতে প্রায় সারা রাত্রিব্যাপী বাজী পুড়ান হয় ও নানা আনন্দোৎসব চলে। পরের দিন অর্থাৎ পঞ্চমী তিথির প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত দেবদোল, দেবীর সাড়ম্বরে পূজা ও অন্নভোগ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। দেবদোল অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র "আবির" ব্যবহার করা হয়। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও ভোগদানের পর উৎবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উৎসব উপলক্ষে দেবীর নিকট ছাগ বলি দেওয়া না হইলেও মানত হিসাবে কেহ কেহ ছাগ বলি দিয়া থাকেন। প্রধানতঃ দেবীর নিকট "রসবড়া" নামে বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন মানত দেওয়া হয়। দেবীর নিত্যপূজা ও ভোগের ব্যবস্থা আছে। সেবায়েতগণই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন, তাঁহারা কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

উৎসব উপলক্ষে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং আশেপাশের অন্যান্য জেলা হইতে বহু নর-নারীর সমাগম হয়। মন্দির সংলগ্ন বিরাট ময়দানে সপ্তাহকাল ব্যাপী প্রতি দিন রাত্রে নৃত্যগীতের আয়োজন করা হয়। পঞ্চমী তিথির তিন দিন পরে "অন্নসত্র" উৎসবে প্রায় দশ হাজার নর-নারীর মধ্যে অন্নভোগ বিতরণ করা হয়।

"শ্রীশ্রীমাকড়চণ্ডীর পঞ্চম দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে চলে হাওড়ার অন্যতম প্রাচীন ও সুবিখ্যাত মাকড়দহের মেলা। মাকড়দহ হাওড়া শহর থেকে সাত মাইল দূরে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম, ব্যাট্রা কদমতলা থেকে ৬০নং বাসে অথবা হাওড়া ময়দান থেকে মার্টিন ট্রেনে যাওয়া যায় এই গ্রামে। গ্রামের এই মেলাটি চলে আসছে বাংলা ১২৫২ সাল থেকে। মেলার প্রধান আকর্ষণ বাজী পোড়ানো, প্রায় লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় বাজি পোড়ানো দেখতে। বাজিতে অগ্নিসংযোগেরও এক অভিনব রীতি আছে। পিতলের তিনটি কলসী রাখা হয় প্রকাশ্য স্থানে, যতক্ষণ এই কলসীগুলি দর্শক সাধারণের দেওয়া পয়সায় পূর্ণ না হয় ততক্ষণ বাজিতে আগুন দেওয়া হয় না। সাধারণত রাত্রি দেড়টার আগে বাজিতে আগুন পড়ে না। আগুন দেওয়া শুরু হলে সমস্ত রাত্রি ধরেই চলে বাজি পোড়ানো

পঞ্চম দোলের মেলা চলে পক্ষকাল ধরে। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের নানা কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি হয় মেলায়। তন্মধ্যে মাদুর শিল্পীদের সংখ্যাই সমধিক।

মাকড়দহের এই মেলা একশো পনর বছর ধরে চললেও দেবী মাকড়চণ্ডী কিন্তু তারও বহু বছর আগেকার। ঠিক কত বছর তা' নির্দিষ্ট করে বলা না গেলেও এ সম্পর্কে যে তথ্য পাওয়া যায় তাতে পাঁচশো বছরের এদিকে যে নয় বলেই মনে হয়।

এই গ্রামের কিছু কিছু পুরাতন দলিল পত্রে গ্রামের নাম 'রামেশ্বর বাটী' বলে উল্লিখিত আছে। অনুসন্ধানে জানা যায় এই গ্রামের চৌধুরী বংশের প্রতিষ্ঠাতা রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয় কয়েকখানি গ্রাম লাভ করে এখানে এসে বসতি করেন। এঁদের আদি বাস ছিল কোনাগ্রামে। তখন এখানে উচ্চ বংশের হিন্দুর বাস ছিল একান্তই নগণ্য, তাই চৌধুরী মহাশয় বহু বিশিষ্ট পরিবারকে এনে এই গ্রামে বসবাসের সুযোগ করে দেন। তাঁর দেওয়া ব্রহ্মোত্তর, নিষ্কর, চাকরাণ প্রভৃতি দান-পত্রে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই গ্রামের অধিকার লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি শ্রীশ্রীমাকড়চণ্ডীর পূজাদিরও অধিকার লাভ করেন এবং নিত্যপূজা যাতে শাস্ত্রাদিসম্মতভাবে সুসম্পন্ন হয় তজ্জন্য যোগ্য ব্রাহ্মণের সন্ধান করতে থাকেন। অবশেষে বালী থেকে রাজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে এনে তিনি তাঁর উপর দেবীর সেবার ভারার্পণ করেন। রাজেন্দ্র নাথের বংশধরগণ আজও দেবীর সেবাইত। রাজেন্দ্র নাথ থেকে বর্তমানে চতুর্দশ পুরুষ চলছে। সেবাইতরা প্রায় পাঁচশো বছর ধরে দেবীর সেবার অধিকার পেয়ে আসছেন। দেবী প্রতিষ্ঠিতা হন তারও পূর্বে।

দেবীর বর্তমান মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা ১২২৮ সালে। তৎপূর্বে দেবীর মন্দির কিরূপ ছিল সঠিক জানা যায় না। রামেশ্বর চৌধুরী মহাশয়ের জমিদারী পরবর্তীকালে মহিয়াড়ী কুণ্ডু চৌধুরীরা ক্রয় করেন। ফলে দেবীর পূজাদির ব্যবস্থার ভারও তাঁদের উপর পরে। কুণ্ডু চৌধুরী বংশের রামকান্ত কুণ্ডু মহাশয় বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করান একশোউনচল্লিশ বছর আগে। মন্দিরের স্থপতি ছিলেন—রামকানাই দাস। এখনও কুণ্ডু চৌধুরীরাই দেবীর নিত্যপূজার ব্যয়ভার বহন করে থাকেন।

দেবীর মূর্তি ঊর্ধ্বভাগে সিন্দুরচক্ষু শোভিত একটি শিলাখণ্ড। এ সম্পর্কে কিম্বদন্তি আছে যে, পূর্বে দেবীর মূর্তি খুবই বিশাল ছিল। পূজককে মই এর সাহায্যে পূজার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে হত। পরে কোন এক সময় পূজকের তিরস্কারে নাকি দেবী পাতালে

প্রবেশ করতে উদ্যত হন, তখন ঐ পূজকের ক্রন্দনে ও আকুল প্রার্থনায় বর্তমান রূপটুকুই অবশিষ্ট থাকে।

পূর্বেই বলা হয়েছে পুরাতন কিছু কিছু দলিল পত্রে গ্রামের নাম "রামেশ্বর বাটী" উল্লিখিত আছে। এ ছাড়া 'মাপুরদহ' নামও প্রাচীন কাগজপত্রে দেখা যায়। 'রামেশ্বর বাটী' নাম রামেশ্বর চৌধুরীর নামানুসারেই হয়ে থাকবে। কিন্তু 'মাপুরদহ' বা এই দুই নামকে অতিক্রম করে বর্তমান 'মাকড়দহ' নাম হল কি করে, তা সঠিক বলা শক্ত। এ সম্পর্কে বর্তমান মাকড়চণ্ডীর সেবাইতদের গুরু বংশীয় পণ্ডিত শ্রীধর স্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলেন, পূর্বে সরস্বতী নদী এই গ্রামটিকে বলয়ের মত বেষ্টন করে প্রবাহিত হত। আঁকাবাঁকা পথেই নদীর মৃত্যু ঘটে—এখানে সরস্বতীর ক্ষেত্রেও ঘটেছে তাই। নদী ক্রমে মজে গিয়ে হ্রদ বা দহে পরিণত হল। ফলে আদি নাম মা-পুর (মাতৃপুরের অপভ্রংশ) কথার সঙ্গে 'দহ' যুক্ত হয়ে 'মাপুরদহ' নামকরণ হয়েছিল। 'মাকড়দহ' নামকরণ সম্পর্কে শ্রীস্মৃতিতীর্থ মহাশয় বলেন—কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীশ্রীচণ্ডীর বাহন একটি বিশালকায় 'মকর' নাকি মন্দিরের সম্মুখস্থ সরস্বতী গর্ভে বাস করতো। তাকে কেন্দ্র করে 'মকরদহ' ক্রমশ 'মাকড়দহ' শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রাচীন মকরসংক্রান্তি উৎসবের যে সকল কৃত্যের কথা পাওয়া যায় তা' সম্পূর্ণরূপে না হলে কিছুটা আজও প্রতিপালিত হয়ে থাকে মাকড়চণ্ডীর মন্দিরে। সুতরাং মকরসংক্রান্তির সঙ্গে পরবর্তীকালে চণ্ডীকে যুক্ত করে মাকড়চণ্ডী নামকরণ হয়েছে কি না বলা শক্ত। তা ছাড়া মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীকে উপলক্ষ্য করে 'মাকড়চণ্ডী' শব্দ সৃষ্টি হয়েছে কি না তা'ও বলা যায় না।

কথিত আছে, শ্রীমন্ত সদাগর যখন বাণিজ্যে যেতেন তখন তাঁর যাত্রাপথে তিনি সুন্দর স্থান দর্শন করলে সেখানে কিছুদিন অবস্থান করতেন এবং নিজ অভীষ্ট দেবী শ্রীশ্রীচণ্ডীর পূজা সম্পন্ন করতেন। এইভাবে তিনিই এই দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন বলে স্থানীয় প্রবীণদিগের অনেকের ধারণা। এ সম্পর্কে কিন্তু প্রমাণ বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। মঙ্গল কাব্যের প্রাচীন কোন গ্রন্থেও এর উল্লেখ নেই।

পঞ্চম দোলের মেলায় দেশের সর্বস্তরের নরনারীই যোগদান করে। মুসলমান নরনারীর সংখ্যাও নগণ্য নহে। তাঁরা হিন্দুদের সঙ্গে সমানভাবেই উপভোগ করেন মেলার আনন্দ। আবার এই অঞ্চলের গয়েসপুরের মুসলীম মেলায় হিন্দুরাও দলে দলে যোগদান করে থাকেন। পঞ্চম দোল ছাড়াও মকরসংক্রান্তি, রথযাত্রা প্রভৃতি উৎসব প্রতিপালিত হয় মাকড়চণ্ডীর মন্দিরে। এই সব উৎসবে যথেষ্ট জনসমাগম হয়। এ ছাড়া যাত্রা, কথকতা, পাঁচালীগান প্রভৃতিরও ব্যবস্থা হয় মাঝে মাঝে। মোটের উপর দেবী মাকড়চণ্ডীকে কেন্দ্র করে মাকড়দহ সদাচঞ্চল, উৎসব-মুখর।"

[শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৯শে ফাল্গুন, ১৩৬৭।]

মনসাপূজা

ওয়াদিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথিতে সাড়ম্বরে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রধান উৎসব রূপে পরিগণিত। আনুমানিক আড়াইশত বৎসর পূর্বে হুগলী জেলার অন্তর্গত দ্বারবাসিনী গ্রাম হইতে পাত্র বংশীয়দের এক পূর্ব পুরুষ এই গ্রামে মনসা দেবীর মন্দির, নাটমন্দির, এবং দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

মন্দির অভ্যন্তরে জগৎগৌরী বিষহরি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। দেবীর উভয় পার্শ্বে লক্ষ্মী, সরস্বতী, বেহুলা এবং লক্ষ্মীন্দরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে অদ্যাবধি কয়েক ঘর পাত্র বংশীয় গৃহস্থ আছেন এবং তাঁহারাই মনসার নিত্য পূজা ও বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেন। উৎসবটি ব্যক্তি বিশেষের হইলেও বর্তমানে আঞ্চলিক সর্বজনীন রূপে উৎসব পরিগণিত। উৎসব উপলক্ষে দেবীর সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক পূজা, হোম ও বলি হয় এবং বহু নরনারীর সমাবেশ ঘটে। এই গ্রামের মনসা বিশেষ জাগ্রত দেবী বলিয়া গ্রামবাসীর বিশ্বাস।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে দেবীর 'ক্ষীর ভোগ' উৎসব, আশ্বিন মাসে শারদীয় অষ্টমী তিথিতে দেবীর বিশেষ পূজা ও বলি এবং

ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় দেবীর মন্দিরে চাঁচর ও দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

দশহরা ও দোল উপলক্ষে প্রতি বৎসর মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রা, তরজা, কৃষ্ণযাত্রা, পালাগান প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গ্রামে যাত্রাভিনয়ের দল আছে; তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর ভিন্ন জেলা হইতেও পেশাদারী দল আনা হয়।

মহোৎসব

বেগড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী সীতা নবমীতিথি হইতে সাড়ম্বরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় "হরিভক্তি বিধায়িনী সভা" কর্তৃক এই উৎসব আয়োজিত হয়। প্রায় আশি বৎসর পূর্বে খড়দহের গোস্বামী বংশের ৺মহেন্দ্র মোহন গোস্বামী মহাশয় বেগড়ী গ্রামের বৈষ্ণবদিগের সহায়তায় এই গ্রামে হরিসভা প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই অবধি গ্রামে এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হইতেছে। বর্তমানে উৎসবটি এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উৎসব রূপে পরিগণিত।

উৎসব উপলক্ষে রাধাগোবিন্দ জীউ-র বিগ্রহের সহিত মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দের বিশেষ পূজা, হোম ও মালসা ভোগের ব্যবস্থা আছে। একটি প্রাচীন কদম্ব-গাছের নীচে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে গাছের উপর একটি লাল রঙের পতাকা টাঙ্গাইয়া দেওয়া হয় এবং নামযজ্ঞস্থলে গৌরাঙ্গ মন্দিরের মহাপ্রভুর চিহ্নিত 'খোন্তা' ও তুলসী বৃক্ষ স্থাপন করিয়া বৈশাখী সীতা নবমীতিথি হইতে চারদিনব্যাপী অখণ্ড নামকীর্তন চলে। চতুর্থ দিবসে নামসংকীর্তন সহ গ্রাম প্রদক্ষিণের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। বৃন্দাবন, নবদ্বীপ, কালনা, কাটোয়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি কীর্তনীয়ার দল আসে। এই সকল কীর্তনীয়া দল কোনরূপ পারিশ্রমিক দাবী করেন না। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়াই তাঁহারা এই উৎসবে যোগদান করেন এবং নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন গাহিয়া ভক্তজনকে আনন্দ দিয়া থাকেন। পূর্বে প্রায় শতাধিক কীর্তনীয়ার দল আসিত। আশেপাশের এবং দূরবর্তী গ্রাম হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। কমপক্ষে প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার-পাঁচশত শ্রোতার সমাগম হয়। উৎসবের চতুর্থ দিনে মহাসভা বসে এবং এই সভায় ধর্মালোচনা এবং বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের সমন্বয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়।

উৎসবে মানত হিসাবে মালসাভোগ ও বাতাসা লুট দেওয়া হয়। কেহ কেহ পুত্রকন্যার ওজনের সমপরিমাণ বাতাসা লুট দেন। প্রতিদিন সমবেত যাত্রীদের মধ্যে মহাপ্রভুর মালসাভোগ বিতরণ করা হয় এবং উৎসবের শেষ দিন দরিদ্র নারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, উৎসবের চারিদিন গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ নিরামিষ ভোজন করেন।

৺মহেন্দ্র মোহন গোস্বামীর পুত্র ৺হীরেন্দ্র মোহন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীজীবেন্দ্র মোহন গোস্বামী বিগত বাংলা ১৩৬২ সন পর্যন্ত এই উৎসবের পৌরহিত্য করিতেন। বর্তমানে শ্রীজীবেন্দ্র মোহন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশচীন্দ্র মোহন গোস্বামী এই উৎসবের পৌরহিত্য করেন। ইঁহারা নিত্যানন্দ বংশোদ্ভূত এবং উৎসবের সময় তাঁহাদিগকে সসম্মানে নামকীর্তনসহ সভামণ্ডপে আহ্বান করিয়া আনা হয়। উৎসব উপলক্ষে মহাপ্রভুর যাবতীয় ভোগপূজাদি প্রধান পুরোহিত করিয়া থাকেন এবং রাধাগোবিন্দের পূজা অপর একজন পুরোহিত করিয়া থাকেন।

চারদিনের আনুষ্ঠানিক উৎসব শেষ হইলে, আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি অভিনয় হয়। কোন কোন বৎসর কবিগান ও বাউল গানের আয়োজন করা হয়। উৎসব অন্তে দরিদ্র নারায়ণ ভোজন উৎসবের একটি অপরিহার্য অঙ্গ।

শিবরাত্রি

বানিয়াড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী যোগদান করেন। শিবের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং পদবী মোহন্ত। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বহু রোগগ্রস্থ ব্যক্তি শিবের নিকট পূজাদি দিতে

আসেন। শিবের প্রসাদে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় হয় বলিয়া ভক্তগণের বিশ্বাস। এই গ্রামে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামে একবার মহামারীর ফলে বহু জীবনহানি হয় এবং কিছু বাসিন্দা প্রাণভয়ে এই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। এই কারণে এই স্থানটি জনমানবহীন গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়। সেই সময় জনৈক বহিরাগত সাধু ঐ জঙ্গলে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি আকস্মিক একদিন লক্ষ্য করিলেন যে, একটি গাভী প্রত্যহ অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শীলাখণ্ডের নিকট দাঁড়াইলে তাহার বাঁট হইতে আপনি দুগ্ধ ঝরিয়া পড়িতে থাকে এবং আরও লক্ষ্য করিলেন যে, উক্ত শীলাখণ্ডের দুই পাশে দুইটি বিষধর সর্প অবস্থান করিতেছে। তিনি ঐরূপ দৃশ্য দেখিয়া প্রত্যহ শীলাখণ্ডের নিকট ধূপধুনা ইত্যাদি দিতে থাকেন। এই সময়ে একদিন বর্তমান পূজারীর জনৈক পূর্বপুরুষের প্রতি ঐ শিলাখণ্ডকে শিবজ্ঞানে পূজা করিতে স্বপ্নাদেশ হয় এবং উক্ত সাধু এবং গ্রামবাসীগণ মিলিয়া ঐ স্থানে শিবপূজার ব্যবস্থা করেন। পরে ঐ এলাকার হাবসা নায়েকের সহযোগিতায় এবং গ্রামবাসীর চেষ্টায় ঐ স্থানে মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠাকালে উক্ত প্রোথিত শীলাখণ্ডটিকে স্থানান্তরিত করিবার বহু চেষ্টা করা হইয়াছিল; কিন্তু কোনক্রমেই উহা স্থানান্তরিত করা সম্ভবপর না হওয়ায় অবশেষে ঐ স্থানেই মন্দির নির্মাণ করা হয়।

জেলা : হাওড়া

থানা : ডোমজুড়

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধান মেলা
(গয়েশ-উদ্-দীন পীর)

গয়েশপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ৪ঠা মাঘ গয়েশ-উদ্-দীন পীরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে পীরের সমাধি স্থানের আশেপাশে প্রায় বার বিঘা পরিমাণ জমির উপর পনরদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন হইতে চার শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় হাওড়া, হুগলী ও চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকজনই বেশী।

মেলায় প্রায় পনর-ষোলটি বড় আকারের দোকানপাট বসে এবং পঁয়ত্রিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকানপাট বসে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পূর্বে এই মেলাটিতে প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ হাজার যাত্রীর সমাগম হইত এবং বহু দোকানপাট বসিত।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, কবিগান, তরজা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বাছুরগোট গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণের আশেপাশে কতকগুলি দোকানপাট বসে। উহার অধিকাংশই খাবারের দোকান। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গ্রাম্য নৃত্য ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

দক্ষিণ ঝাপড়দহ গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের সর্বসাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

সন্নিহিত খাঁটেরা এবং বাজারপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ শত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে স্ত্রী ও শিশুর সংখ্যা বেশী এবং তাঁহারা সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং দুই-চারজন ভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন এবং দুই-চারজন ফেরিওয়ালা আসেন। মোট পনর-কুড়িটি দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সঙ্ নাচ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রুদ্রপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

মেলায় সাধারণতঃ খসজরা, ওয়াদিপুর, রাজাপুর, খাঁটেরা, দক্ষিণ ঝাঁপড়দহ, কেশবপুর, সন্তোষপুর, দেউলপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়, নারীর সংখ্যাই অধিক।

বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ময়রা, তেলেভাজা মনিহারী, তামা-পিতলের জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, কাঁচের জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানপাট বসে। তাহাছাড়া, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস, তরজাগান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। প্রায় এক হাজার নরনারী এই সকল আনন্দানুষ্ঠানে যোগদান করেন। মেলায় জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

ওয়াদিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় দুই বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া এবং সাইকেল রিক্সা করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয়। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কৃষি যন্ত্রপাতি, কাপড়চোপড়, ধামা-কুলা এবং মাটি ও প্লাষ্টিকের খেলনাপত্রের মাত্র কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোন দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সঙ্ নাচ, তরজাগান, ম্যাজিক এবং লটারী খেলার দল আসে।

বাঁকড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে জয়েশ্বর ও অভয়েশ্বর শিবের চড়ক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তে প্রায় দশ কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র একদিন স্থায়ী হয় এবং ইহা প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ সাতাশী, ধাতসা, জগাছা, জয়াবাজ প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে; ফেরিওয়ালা আসেন প্রায় দশ-পনর জন। বিক্রেতারা স্থানীয়। মেলায় তেলেভাজা, মাটির পুতুল, বাসনপত্র এবং মনিহারীর দোকানপাট বসে। ইহাছাড়া, প্রতি বৎসর পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুচি, ডোম এবং পাটুয়াদের নির্মিত চ্যাঙারী, ধামকুলা, মাটির পুতুল ইত্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর পাড়ার ছেলেরা যাত্রা-থিয়েটার অভিনয়ের ব্যবস্থা করে।

বানিয়াড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে চড়ক উপলক্ষে শিবমন্দিরের পশ্চাৎভাগে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটির স্থায়িত্ব তিন দিন হইলেও দোকানপাট-গুলি সম্পূর্ণ উঠিতে প্রায় পনের দিন লাগে। গত ত্রিশ বৎসর যাবত মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

মেলার যাত্রীগণ প্রধানতঃ বেগড়ী, শাখারিদহ এবং বিপ্রন্নপাড়া হইতে এবং নিকটবর্তী অন্যান্য গ্রাম হইতে আসেন। মোট প্রায় আড়াই হাজার যাত্রীর মধ্যে নারীর সংখ্যাধিক্যই বেশী দেখা যায়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়াই আসেন।

মেলায় স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীগণ সাধারণতঃ দোকানপাট দেন। দোকানপাটের সংখ্যা খুব কম। মাত্র কয়েকটি মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাঠ ও মাটির জিনিস-পত্রের ও কারুশিল্পের দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, যাত্রাগান ও হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রা ও কীর্তনের দল আছে।

পাকুড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে পঞ্চানন ঠাকুরের চড়ক উৎসব উপলক্ষে ঘোষপাড়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত পঞ্চানন ঠাকুরের মন্দির প্রাঙ্গণে সাতদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলার বিক্রেতাগণ স্থানীয়। তেলেভাজা, মনিহারী এবং বই-ছবি প্রভৃতির কয়েকটি দোকানপাট বসে। মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য তিন-চার রাত্রি থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়। স্থানীয় যাত্রার দল অভিনয় করেন। কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে যাত্রার দল আসে।

মাকড়চণ্ডীর পঞ্চমদোলের মেলা

মাকড়দহ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মাকড় চণ্ডীর পঞ্চমদোল উৎসব উপলক্ষে মাকড়দহ হাটে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। বাংলা ১২২৯ সালে এই মেলাটি প্রথম আরম্ভ হয়। পূর্ণিমার পর পঞ্চমী তিথি হইতে আম বারুণী পর্যন্ত প্রায় সপ্তাহকাল ব্যাপী এই মেলা চলে।

হাওড়া, হুগলী, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও কলিকাতা হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ হাওড়া, মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন। ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনপত্রের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, মাটির পুতুল ও খেলনার দোকান, বই-ছবির দোকান, মাদুর এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীর দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস ও ম্যাজিকের দল আসে এবং লটারী খেলা হয়। তাহা ছাড়া প্রতি বৎসর কবিগান, তরজা এবং পেশাদারী ও শখের দল কর্তৃক থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয়।

মেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পুলিশ কর্মচারীবৃন্দ বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন।

শীতলাপুজার মেলা

বেগড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শীতলা অষ্টমী তিথিতে শীতলা পূজা উপলক্ষে দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে এবং নিকটবর্তী রাস্তার দুই ধারে একদিনের জন্য দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া সেবায়েতগণ দাবী করেন। মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়। উহার মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক।

মেলায় কয়েকটি খাবার ও তেলেভাজার দোকান, মাটির বাসনপত্র ও খেলনার দোকান, মনিহারীর দোকান এবং স্থানীয় লোকের হাতে তৈয়ারী বাঁশের ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান বসে এবং ফেরিওয়ালাগণ সুলভ মূল্যের বই-ছবি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, কীর্তন ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয় এবং লটারী খেলার দল আসে।

জেলা : হাওড়া
থানা : বাউড়িয়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : সন্তোষপুর। ১।২৮২´:৮।৫২৪।৩,২০৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—বামুনপাড়া, সরকারপাড়া, শেখপাড়া, নস্করপাড়া, ধোপাপাড়া, বসুজপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও মিল শ্রমিক।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাউড়িয়া হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পঞ্জিকা অনুযায়ী হিন্দু সম্প্রদায়ের রথযাত্রা, স্নানযাত্রা, বিশ্বকর্মাপূজা, দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা, রাসযাত্রা, জগদ্ধাত্রীপূজা, কার্তিকপূজা, কাত্যায়নীপূজা, পৌষপার্বণ, সরস্বতীপূজা, শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, চড়কপূজা, বাসন্তীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা, বারুণীস্নান, গঙ্গাপূজা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া এবং চান্দ্রমাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ইদসফেতর, ইদুজ্জোহা, মহরম, মিলাদ উন-নবী, ফতেহা-ইয়াজ দাহম, সবেবরাত, সবেমেরাজ, আখেরী-চাহার-সুম্বা প্রভৃতি উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) ×

শ্রীহাশমত আলী, শিক্ষক
সন্তোষপুর বিদ্যালয়,
পোঃ সন্তোষপুর, হাওড়া।

২। গ্রাম : বুড়িখালী। ২।৪৬০´৩৭।

(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদগোপ, কৈবর্ত, বর্গক্ষত্রিয়, কাপালিক, রজক, চামার, হাকরা, নাপিত ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাউড়িয়া হইতে রিক্সা অথবা গরুর গাড়ীতে গ্রামে পৌঁছান যায়। নিকটবর্তী বাউড়িয়া-ডোমজুর রোড দিয়া মোটর বাস সার্ভিসও আছে। ইহাভিন্ন, গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে প্রবাহিত ভাগীরথী নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ এবং চৈত্র মাসে ধর্মরাজের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাভিন্ন ভাদ্র মাসে রান্নাপূজা, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন শীতল ষষ্ঠী ও গোটা রান্না উৎসব এবং বৎসরের যে-কোন দিন ওলাবিবির বার উপলক্ষে সর্বজনীন বনভোজন উৎসব পালিত হয়।

রান্নাপূজা উপলক্ষে মনসা দেবীর পূজা করা করা হয়। পূজার আগের দিন গৃহস্থেরা স্ব স্ব গৃহে প্রচুর অন্নব্যঞ্জনাদি রাঁধিয়া রাখেন এবং পরের দিন মনসা পূজার পর আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব মিলিয়া খাওয়া-দাওয়া করেন।

শীতল ষষ্ঠী পূজা উপলক্ষে সরস্বতী পূজার দিন গোটা আলু, বেগুন, সীমের সহিত অন্যান্য শাকসব্জী একত্র করিয়া একটি ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয় এবং পরের দিন শীতল ষষ্ঠী ব্রত পালন করিয়া আত্মীয়-বন্ধুদের গৃহে গৃহে উল্লিখিত ব্যঞ্জন বিনিময় করা হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজের মন্দির এবং শীতলা, ষষ্ঠী ও ক্ষেত্রপালের স্থান আছে। ক্ষেত্রপাল ও ষষ্ঠীর স্থানে কয়েকটি পাথরের নুড়ি আছে।

শ্রীপ্রবণানন্দ দাস, ছাত্র,
বুড়িখালি, হাওড়া।

জেলা : হাওড়া
থানা : বাউড়িয়া

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

বুড়িখালি গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন প্রথমে শীতলা পূজার পরে কালীপূজা করা হয়। এই পূজার বৈশিষ্ট্য এই যে, উৎসবের দিনই কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া রাত্রে যথারীতি কালীর পূজা সম্পন্ন করা হয় এবং পূজান্তে ঐ রাত্রেই দেবীর মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। উৎসবের কয়েকদিন পূর্বে গ্রামে "ধ্বজা" উত্তোলন করিয়া গ্রামবাসীর নিকট কালীপূজার কথা ঘোষণা করা হয়। পূজার দিন গ্রামবাসীরা অরন্ধন ব্রত পালন করেন। উৎসব উপলক্ষে ভক্তরা সাধারণত কালী নিকট আঁখ, চালকুমড়া, কলা ও পাঁঠা বলি দিয়া থাকেন। পূজার পরের দিন গ্রামের প্রতিটি বাড়ীতে বলির প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার উৎসব

বুড়িখালি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ধর্মরাজের গাজন উৎসব আরম্ভ হয় এবং সংক্রান্তির দিন চড়ক অনুষ্ঠানের পর এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। টিনের চালাযুক্ত বারান্দাসহ একটি মাটির ঘরই ধর্মরাজের মন্দিররূপে ব্যবহৃত হয়। মন্দিরে অবশ্য কোন বিগ্রহ নাই; ঘটে ধর্মরাজের যাবতীয় পূজাদি হয়। বর্তমান সেবায়েত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবালয়টি নির্মাণ করিয়াছেন।

উৎসবে আশেপাশের গ্রামের বহুলোক যোগদান করিয়া থাকেন এবং অনেকে গাজনে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। গ্রামে ধর্মরাজের গাজন উৎসবের জন্য একজন নির্দিষ্ট সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহাকে প্রতি বৎসরই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হয়। উৎসবের দিন সন্ন্যাসীগণ ঝাঁপ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ঝাঁপের জন্য একটি উঁচু বাঁশের মাঁচা নির্মাণ করা হয় এবং নীচে খড়ের স্তূপের উপর ধারাল ছুরি, বঁটি ইত্যাদি পাতিয়া রাখা হয়। ঝাঁপের পূর্বে সন্ন্যাসীগণ হাতে ডাব, আম ইত্যাদি ফল লইয়া—"বাবা ধর্মরাজের চরণের সেবা লাগে"—মুখে এইরূপ ধ্বনি দিতে দিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া মাঁচার উপরে উঠেন এবং হাতের ফলগুলি নীচে অপেক্ষারত দর্শকদের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া নিজেরা একে একে নীচে খড়ের স্তূপের উপর ঝাঁপ দেন। গাজনে সন্ন্যাসীদের ঝাঁপান দেখিবার জন্য এই সময় পূজা প্রাঙ্গণে বহু লোকের সমাগম হয়।

উৎসব সমাপ্তির পর "ফুল চাপান" অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ধর্মরাজের নামে ঘটের উপর ফুল ও বেলপাতা স্থাপন করা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ ফুল-বেলপাতা আপনা হইতে নীচে পড়িয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত সন্ন্যাসীগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া নৃত্য করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। ধর্মের মাথা হইতে অর্থাৎ ঘট হইতে নীচে ঐ ফুল পড়িয়া গেলে অনুমান করা হয় যে, ধর্ম ঠাকুর ভক্তদের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই গ্রামে ধর্মরাজের ঝাঁপ অনুষ্ঠানের পূর্বে পীরের ঝাঁপ অনুষ্ঠিত হয় এবং ইহা এই গ্রামের গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ ও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যও বলা যাইতে পারে। গ্রামে শ্মশানের নিকটে একটি তেঁতুল গাছের নীচে জনৈক পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। জনৈক মুসলমান পীরের সেবায়েত। পীরের ঝাঁপের সময় উক্ত সেবায়েত কাঁচা মাটি দিয়া পীরের একটি কল্পিত মূর্তি নির্মাণ করিয়া তাহার উপর ঝাউ পাতা চাপাইয়া দিয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে থাকেন। মুসলমান ব্যতীত হিন্দুরাও এই নৃত্যে যোগদান করিয়া থাকেন। যদিও এই পীর কে ছিলেন সে সম্পর্কে কেহই কিছু বলিতে পারেন না, তথাপি গ্রামবাসীরা পীরের স্থানে মানত করেন এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কাহারও গৃহপালিত গরু দুধ দেওয়া আরম্ভ করিলে, প্রথম দিনের দুধ পীরের স্থানে ঢালিয়া দিয়া যান।

পৌষপার্বণ

বুড়িখালি গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে পৌষপার্বণ উৎসব পালন করা হয়। উৎসব

উপলক্ষে গ্রামের প্রতিটি গৃহস্থ তাঁহাদের ঘর-দরজা পরিষ্কার করিয়া এক স্থানে একটি ধামা বা পালিতে কিছু নূতন ধান রাখিয়া তাহার উপর তামার পয়সা সহ একটি ছোট সিঁদুর কৌটা এবং ধানের শিষ দিয়া তৈয়ারী একটি "গোছা" রাখেন। এই গোছাটি অনেকগুলি ধানের শিষ, আতপ চালের গুঁড়া, তুলসীপাতা, দূর্বাঘাস এবং ফুলদ্বারা তৈয়ারী করা হয়। এই ভাবে রাত্রে ঘরে "লক্ষ্মীর আসন পাতা" হয়। তাহা ছাড়া ঐ দিন রাত্রিতে তিন গাছা ধানের শিষ, দূর্বাঘাস, তুলসীপাতা প্রভৃতি দ্বারা সুন্দররূপে বেণীর ন্যায় বাঁধিয়া ঐগুলি ধান-চালের গোলায়, জলের কলসীর গলায় এবং ঘরে নানা আসবাবপত্রের সঙ্গেও বাঁধিয়া দেওয়া হয়। ইহাকে "বাউনি বাঁধা" পর্ব বলা হয়। পর দিন সকালে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া উক্ত আসনে লক্ষ্মীদেবীর পূজা-অর্চনা করা হয়। অবশ্য গ্রামের কোন কোন গৃহস্থের ঘরে এই দিন রাত্রেই পূজা হয় এবং রাত্রির শেষ প্রহরে শিয়ালের ডাক শুনিয়া লক্ষ্মীর আসন তুলিয়া রাখা হয়। উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহকাল ব্যাপী পিঠাপুলি তৈয়ারী করিয়া খাওয়া-দাওয়া করা হয়।

বাউনি বাঁধার সময় নিম্নলিখিত ছড়া কাটা হয়—

"আউনি বাউনি, কোথাও না যেও
তিন দিন, তিন রাত পিঠে পায়েস খেও।"
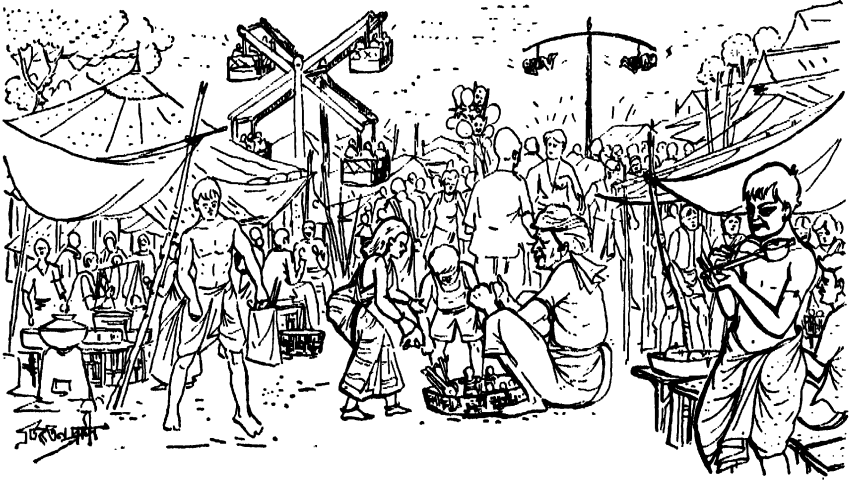
জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ বাউড়িয়া

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

সন্তোষপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক পূজা উপলক্ষে সাতদিনব্যাপী সাধারণের প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সর্ব-সম্প্রদায়ের প্রায় দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

স্থানীয় বিক্রেতারা ভিন্ন প্রতি বৎসর পাঁচলা ও বাউড়িয়া থানা হইতে মেলায় বিক্রেতারা আসেন। মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, কাপড় চোপড়, মাটির জিনিসপত্র এবং কারুশিল্পজাত জিনিসপত্রের আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, পুতুল-নাচ, ম্যাজিক প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

বুড়িপালি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক পূজা উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে প্রায় ছয়-সাত বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং প্রতিদিন বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম ও বেচাকেনা হয়।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী পাঁচলা ও বেংগাইল ইউনিয়নের গ্রাম সমূহ হইতে প্রায় ছয়-সাত শত যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং বেংগাইল, পাঁচলা, সন্তোষপুর প্রভৃতি গ্রাম সমূহ হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় আচ্ছাদনযুক্ত স্থানে মাত্র দশ-বারটি দোকান ছাড়া খোলা জায়গায় আরও কতকগুলি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন। ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দোকান ভিন্ন লোহা, মাটি ও কাঁচের বাসনপত্র, জামা-কাপড়, ধামা-কুলা, বই-ছবি, মাটির পুতুল ও টোটকা ঔষধপত্রের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, লটারী, ম্যাজিক প্রদর্শনী, কবিগান, যাত্রাগান, পুতুলনাচ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ উলুবেড়িয়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ তুলসীবেড়িয়া।

১।৪৮৭'৬৯।৫৮৪।৩,০৩০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোপ, নাপিত, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কৈওরা ও মুসলমান। গ্রামে মোট আঠারটি পাড়া আছে। যেমন—বামুনপাড়া, দাশপাড়া, মাইতিপাড়া, মণ্ডলপাড়া, দোলুইপাড়া, গোপপাড়া, ভূঁইঞাপাড়া, বেরাপাড়া, কৈওরাপাড়া, কাঁড়ারপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের দক্ষিণে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে কুলগাছিয়া রেলস্টেশন এবং উত্তরে মার্টিন রেলপথে আমতা রেলস্টেশন। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, মাঘ মাসের পূর্ণিমায় হিন্দু পানচাষী সম্প্রদায় কর্তৃক চণ্ডীপূজা, ফাল্গুন মাসে শীতলা, মনসা ও ওলাবিবির ফতেহা, চৈত্রমাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্মশান কালী-পূজা এবং সংক্রান্তিতে শিবের গাজন। কালীপূজা উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং দৈবানুগ্রহে ঔষধ প্রাপ্তির আশায় ভক্তগণ এইস্থানে তিনরাত্রি বসবাস করেন। উৎসবের দিন মানত হিসাবে প্রায় শতাধিক ছাগ বলি দেওয়া হয়। ওলাবিবির ফতেহা উৎসবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যোগদান করেন এবং হিন্দু রমণীগণ এই স্থানে একদিন বনভোজন করেন। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। গাজন উৎসবটি চারশত বৎসরের, শীতলা ও মনসাপূজা দুইটি তিনশত বৎসরের, ওলাবিবির ফতেহা আড়াইশত বৎসরের, শ্মশান কালীপূজা চুয়াত্তর বৎসরের এবং চণ্ডী পূজাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) স্নানযাত্রার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। কালী-পূজার মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহব্যাপী। মেলাটি চুয়াত্তর বৎসরের প্রাচীন।

শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা, চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ ও প্রায় আট ফুট উচ্চ একটি কালীকা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাছাড়া শীতলা ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে এবং একটি মাটির ঘরের মধ্যে মৃত্তিকা স্তূপে ওলাবিবির পূজাদি হয়।

প্রাচীনকালে এই স্থানের বহুলোক বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। এখনও এই গ্রামের বহু পরিবারে শালগ্রাম শিলার নিত্যপূজা হইয়া থাকে। বিষ্ণু-পূজার জন্য গ্রামের সর্বত্রই তুলসী গাছ দেখা যাইত। অনুমান করা হয় তুলসী বাগান হইতেই গ্রামের নাম তুলসীবেড়িয়া হইয়াছে।

শ্রীপঞ্চানন পাত্র, প্রধান শিক্ষক,
তুলসীবেড়িয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ উদং, হাওড়া।

২। গ্রাম ঃ কামিনা। ৩।৪৯৪'৮০।২৩২।১,৩৩৯

(ক) বৈরাগী, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, তিওর, নাপিত। গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুলগাছি। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। বর্ষাকালে মহিষরেখা হইতে শালতি চলে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় মহোৎসব ও চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে বর্গক্ষত্রিয়

সম্প্রদায়ভুক্ত সদয় চন্দ্র ভৌমিক নামক জনৈক ব্যক্তি শিবখালে মাছ ধরিবার সময় একটি শিবমূর্তি প্রাপ্ত হন। তিনি উল্লিখিত শিব মূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করিয়া শিবরাত্রি এবং গাজন উৎসবের প্রচলন করেন। উৎসব উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং আশেপাশের দুই-চারিটি গ্রামের লোকজন যোগদান করেন। শিবের নিত্যপূজা হয়।

ক্ষেত্রপালই নামক জনৈক ব্যক্তি প্রায় একশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামে হরিবাসর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সময় হইতে হরিবাসরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমার মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি মাত্র কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের চালাযুক্ত একটি শিবমন্দির এবং তিনটি মহাপ্রভুর মন্দির আছে। ইহা ছাড়া গ্রামে শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবীর স্থান আছে। প্রতি শনি-মঙ্গলবার শীতলা ও মনসা পূজা হয় এবং মাঘ মাসের শেষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যে শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দের বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীযুধিষ্ঠির কুমার খাটুয়া, শিক্ষক,
কামিনা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ আগুনসী, হাওড়া।

৩। গ্রামঃ ময়নাপুর। ২৬।২৫১'৪২।১৯৬।১,১৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তিলি, ডোম, কামার ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে একটি রেলস্টেশন আছে। একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত দামোদর নদে বর্ষাকালে নৌকা যাতায়াত করে।

(ঘ) শিবের গাজন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহ হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত ছয়দিনব্যাপী। গ্রামে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে মহাপ্রভু, শচীমাতা, পাঁচুগোপাল, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর ও ধর্মরাজ প্রভৃতি দেব-দেবী আছে।

শ্রীশ্যামসুন্দর দুয়ারী, প্রধান শিক্ষক,
ময়নাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ পীরপুর, হাওড়া।

। গ্রামঃ ডাহুকা (মৌজাঃ ডাহুকা নিশ্চিন্দী-পুর)। ৩৩।২৭৩'১৬।১৬৫।৯৩৩

(ক) মাহিষ্য ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বীর শিবপুর হইতে একটি কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইলের দূরে প্রবাহিত দামোদর নদ দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় পঞ্চানন্দ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পঞ্চানন্দ পূজা উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে দুই-তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দির আছে। মন্দিরে পঞ্চানন্দ ঠাকুর ব্যতীত কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, জরাসুর প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি আছে।

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ দাস, কৃষিকার্য,
গ্রামঃ ডাহুকা,
পোঃ মমরুল, হাওড়া।

৫। গ্রাম : বীর শিবপুর। ৪৯।২১৩'৩০।১৫২।৮৪৫

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, বামার, মালী, শুঁড়ি, যোগী, কাওরা, ডোম, দুলে, নমঃশূদ্র প্রভৃতি। গ্রামে বোসপাড়া, বেরাপাড়া, মান্নাপাড়া, পাত্রপাড়া, মিদ্দেপাড়া, সামন্তপাড়া, মাইতিপাড়া, বৈরাগীপাড়া প্রভৃতি নামে কতকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই একটি রেলস্টেশন আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লাপক্ষে নাম-সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) মহোৎসব উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে চারদিন। বাংলা ১২৮২ সন হইতে মেলাটি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

(চ) গ্রামে চারিটি শীতলা ও একটি পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছে এবং রাধাগোবিন্দের মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটি আটচালা ঘর আছে। মন্দিরাভ্যান্তরে কোন বিগ্রহ নাই। ইহাভিন্ন গ্রামে একটি সীতারামের মন্দির এবং একটি শিব মন্দির আছে। সীতারামের মন্দিরটি কতকালের প্রাচীন তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। গ্রামবাসীগণ অনুমান করেন অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীর শিবপুর গ্রাম নিবাসী বসু পরিবার কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত তিন-চার ইঞ্চি পরিধিযুক্ত আধা চ্যাপ্টা একটি গোলাকার কষ্টি পাথরকে সীতারামরূপে পূজা করা হয়। বিগ্রহের গায়ে চক্রের দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। শোনা যায় মূর্তিটি নেপাল রাজ্য হইতে আনা হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ দ্বারা সীতামার বিগ্রহের নিত্য পূজা হয়।

শ্রীঅমিয় কুমার বসু, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বীর শিবপুর, হাওড়া।

"বীর শিবপুর—হাওড়া হইতে ২৩ মাইল দূর। এখানকার মাঠে শিকারীরা পাখী শিকার করিতে আসেন। এখান হইতে প্রায় ৪ মাইল দূরে কানসোণা গ্রামে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর আছে। রোগমুক্তি কামনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এই পুকুরে স্নান করিয়া থাকেন।

[বাংলায় ভ্রমণ : ২য় খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ১৩।]

৬। গ্রাম : বাদিবন। ৬৩।৬৫৯'৪১।৪৪৪।২,৭৫৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, মালাকার, ব্রাহ্ম, মুসলমান ও নমঃশূদ্র।

গ্রামে অনেকগুলি পাড়া আছে। যেমন—মল্লিকপাড়া, মান্নাপাড়া, গায়েনপাড়া, বেরাপাড়া, জানাপাড়া, সাঁতরাপাড়া, বাগপাড়া, ময়রাপাড়া, নাপিতপাড়া, দলুইপাড়া, কামারপাড়া, নরুল্লোপাড়া, কাজীপাড়া, মোল্লাপাড়া, শেখপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন উলুবেড়িয়া। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। রাজাপুর খাল দিয়া নৌকাযোগে এই গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখ মাসে ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন উৎসব এবং পৌষ মাসে হজরত জঙ্গল-বিলাস পীরের তিরোভাব উৎসব পালিত হয়।

(ঙ) হজরত জঙ্গল-বিলাস পীরের তিরোভাব উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পাঁচদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মসজিদ ব্যতীত একটি শিব ও দুই-তিনটি শীতলার স্থান আছে। গ্রামে প্রতি গৃহস্থের বাড়ীতে নিয়মিত মনসা পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীতারা সাঁতরা, সমাজসেবক,
গ্রাম : নবাসন, পোঃ বাগনান,

ও

শ্রীপ্রসাদ চন্দ্র মান্না, চাকুরী,
গ্রাম ও পোঃ বৃন্দাবনপুর, হাওড়া।

৭। গ্রাম ঃ বৃন্দাবনপুর। ৯০।১,০৬৪ ৯৬।৭৫৬'৪,৩৮২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন উলুবেড়িয়া। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ উলুবেড়িয়া-বাসুদেবপুর রোড ও একটি ন্যাশানাল হাইওয়ে।

(ঘ) গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব শিবের গাজন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের ২৪শে তারিখ হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রথম দিন বেদীরচনা, দ্বিতীয় দিন মহাভোগ, তৃতীয় দিন ধর্মের ঝাপ, চতুর্থ দিন লীলাবতীর বিয়ে এবং পঞ্চম দিনে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বর্ধমানের মহারাজ কর্তৃক প্রবর্তিত এবং প্রায় তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। বর্তমানে উৎসবটি সর্বজনীন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে চারটি পঞ্চানন্দ, নয়টি শীতলা, তিনটি মনসা ও একটি বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীমুকুন্দরাম গিরি, চিকিৎসক,
গ্রাম ও পোঃ বৃন্দাবনপুর, হাওড়া।

৮। গ্রাম ঃ জগৎপুর। ৯৫।২৮৬'৫৮।৩২১।২,০৩৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ডোম ও মুসলমান।
গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, মজুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ফুলেশ্বর হইতে দেড় মাইল উত্তরে এই গ্রামটি অবস্থিত। গ্রাম হইতে স্টেশনে যাতায়াতের রাস্তাটি কাঁচা। ইহাছাড়া হাওড়া স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষে উৎসব এবং আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা ব্যতীত শীতলা ও কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শীতলা পূজা উপলক্ষে পাচালী গান এবং দুর্গাপূজার বিজয়ার দিন লাঠিখেলা ও তরজা গান হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং প্রাচীন।

(ঙ) নববর্ষ উপলক্ষে মেলা। ১লা বৈশাখ হইতে দশদিনব্যাপী। ইহা গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছে।

শ্রীকালীপদ দাস, শিক্ষক,
জগৎপুর আদর্শ বিদ্যালয়,
গ্রাম ঃ জগৎপুর, হাওড়া।

৯। গ্রাম ঃ চেঙ্গাইল। ১০৫।১,০০১'১৯।
(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)।

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য, কায়স্থ, পদ্মরাজ, বর্গক্ষত্রিয়, কৈবর্ত, ধোপা, কপালী, কলু, নমঃশূদ্র ও মুসলমান।

গ্রামে পাঁচ-ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন ফুলেশ্বর।

(ঘ) বৈশাখে মনসাপূজা, আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। ইহা ব্যতীত গ্রামে ব্যক্তি বিশেষের একটি দক্ষিণাকালী পূজা হইয়া থাকে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। মেলাটি প্রায় একমাস ব্যাপী চলে। বহুকালের প্রাচীন।

শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে, মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা বুড়া শিবের মন্দির নামে খ্যাত। ইহা ছাড়া মহাকালের বিগ্রহহীন ভগ্নমন্দির আছে। গ্রামে চারিটি পঞ্চানন্দ, চারিটি শীতলা, তিনটি মনসা ও একটি ধর্মরাজ আছে।

শ্রীভূতনাথ মাঝি, চাকুরী,
পশ্চিম চেঙ্গাইল প্রাথমিক বিদ্যালয়, হাওড়া।

১০। গ্রাম : কুশবেড়িয়া (মৌজা : ফুলেশ্বর)। ১০৮।৬৫৭'৮৭।

(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে বারোটি পাড়া আছে। যেমন—বোসপাড়া, দাসপাড়া, নায়েকপাড়া, করাতিপাড়া, মান্নাপাড়া, মণ্ডলপাড়া, মাইতিপাড়া, পাঁজাপাড়া, ভূঁইয়াপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নব নির্মিত হাওড়া বোম্বাই রাস্তাটি এই গ্রামের মধ্য দিয়া যাওয়ায় বর্তমানে গ্রামে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

(ঘ) চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব। উৎসবটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। ইহা প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) একটি শীতলা মন্দির আছে।

শ্রীক্ষুদিরাম মান্না, চাকুরী,
কুশবেড়িয়া, হাওড়া।

১১। গ্রাম : উলুবেড়িয়া। ১০৯।২৯০'৫৮।

(শহরাঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত)

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, শুঁড়ি, গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক, মুসলমান ও অন্যান্য বহু জাতির বাস।

গ্রামে অনেকগুলি পাড়া আছে। যেমন—বেনেপাড়া, শুঁড়িপাড়া, ময়রাপাড়া, উকীলপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামেই রেলস্টেশন আছে। ইহাভিন্ন হাওড়া হইতে মোটরবাসে এবং কলিকাতা হইতে হুগলী নদী দিয়া স্টীমারযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৈশাখ মাসে আনন্দময়ী কালীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কার্তিক মাসে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক পূর্ণিমা হইতে একমাসব্যাপী। মেলাটি গত সাত বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে আনন্দময়ী কালীমন্দির প্রাঙ্গণে একটি শিবমন্দির, রাধাগোবিন্দ মন্দির এবং নিতাই-গৌরের মন্দির আছে। ইহাছাড়া একটি শীতলা ও একটি পঞ্চানন্দ আছে।

আনন্দময়ী কালী মন্দিরটি উলুবেড়িয়া মহকুমার শাসক ৺যতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রচেষ্টার এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীগণের অর্থানুকুল্যে নির্মিত হয়। মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আব্দুলরাজ ভাগীরথীর তীরে প্রায় তিন বিঘা জমি দান করেন। বর্তমানে ঐ জমির উপরেই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। বাংলা ১৩২৭ সনের বৈশাখী শুক্ল ত্রয়োদশী হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবী আনন্দময়ী কালীর পূজা আরম্ভ হয়।

আদিতে এই গ্রামটি উলু ঘাসের জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া গ্রামের নাম উলুবেড়িয়া।

শ্রীতুলসী চরণ নন্দী, ব্যবসায়ী,
শ্রীতারা সাঁতরা, গ্রামসেবক,
শ্রীঝড়ু চরণ সামন্ত, শিক্ষক,
উলুবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
উলুবেড়িয়া, হাওড়া।

Uluberia—The headquarters town of the subdivision of the same name, situated on the right bank of the Hooghly river, in 22°28′ N. and 88°7′E. It is 19 miles distant by river from Howrah and 20 miles by rail, and is accessible by boat, steamer and rail. The Orissa Trunk Road and the High Level Canal to Midnapore also start from this town, and there is a station on the Bengal-Nagpur Railway at a short distance from it. The town, which is protected from the river by a high embankment, is rural in character and has no

features of interest. Before the railway was extended to it Uluberiā was a place of some importance, for pilgrims passed through it on their way to and from Jagannāth, and there was a large bazar to meet their wants. It still has a considerable trade in rice and fish, especially mango-fish and *hilsā*. In 1903 it was constituted a municipality ; but in April 1907, the municipality was abolished as unsuitable to local conditions, and the place was made the headquarters of an Union. It has the usual subdivisional offices. The name is probably derived from *ulu* (a kind of grass) and *bere* (fence), the *ulu* grass growing in abundance round the town. That derivation "Abode of Owls" given by Sir William Hunter is fantastic and improbable.

(District Handbooks, Howrah, 1951, by A. Mitra, p. liii-liv)

উলুবেড়িয়া—হাওড়া হইতে ২০ মাইল দূরে। ইহা হাওড়া জেলার একটি মহকুমা। এই স্থানটি গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখানকার ইলিশ মাছ ও পানতুয়া খুব বিখ্যাত। উলুবেড়িয়ার গঙ্গাতীরে অতি সুন্দর একটি কালীবাড়ী আছে। এখান হইতে "মেদিনীপুর কেনাল" নামক খাল ও "ওড়িষ্যা ট্রাঙ্ক রোড" নামক রাস্তা বাহির হইয়াছে।

[বাংলায় ভ্রমণ : ২য় খণ্ড, পূর্ববঙ্গ, রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ১৩১।]

১২। গ্রাম : বড়গাছা। ১১২।১৩৫'৫৮।৯৮।৪২৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, চামার ও মুসলমান। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা মার্টিন রেলপথের বড়গাছিয়া একটি জংশন স্টেশন। জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসে ধর্মরাজের স্নানযাত্রা উৎসব এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে।

(চ) গ্রামের সীমান্তে জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত ধর্মরাজের বৃহৎ পাকা মন্দির ব্যতীত অধুনা লুপ্ত গৌরগঙ্গা বা গৌরী খালের তীরে পঞ্চানন্দ, ওলাইচণ্ডী এবং দক্ষিণা কালীর মন্দির আছে। ধর্মরাজ মন্দিরের নিকট শীতলার স্থান এবং উক্ত মন্দির হইতে প্রায় আড়াই শত গজ দূরে একটি বিরাট পুষ্করিণীর তীরে একটি তেঁতুল গাছতলায় ক্ষেত্রপাল দেবতার নির্দিষ্ট স্থান আছে। প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সাড়ম্বরে ওলাই চণ্ডীর পূজা ও ভাসান গান হয় এবং প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে গ্রামের সকল স্ত্রীলোকগণ দক্ষিণা কালীর পূজা ও উক্ত মন্দির প্রাঙ্গণে বনভোজন পর্ব পালন করেন। ইহা ছাড়া গ্রামে তিন স্থানে তিনটি ষষ্ঠিকা দেবীর শিলা মূর্তি আছে।

শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বড়গাছা, হাওড়া।

জেলা : হাওড়া
থানা : উলুবেড়িয়া

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধানের উৎসব

(হজরত জঙ্গলবিলাস পীর)

বানিবন (পীরপুর) গ্রামে প্রতি বৎসর ২৯শে পৌষ হইতে পাঁচদিনব্যাপী সাড়ম্বরে হজরত জঙ্গলবিলাসী পীরের তিরোধান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

হজরত পীর সম্পর্কে লোকমুখে শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সুদূর আরব হইতে ভারতবর্ষে আসেন এবং এই গ্রামে একটি আস্তানা স্থাপন করিয়া দীর্ঘ দিন সাধন-ভজনে অতিবাহিত করেন। তিনি দেহরক্ষা করিলে পর তাঁহার অনুরাগী ভক্ত-শিষ্যগণ তাঁহাকে তাঁহার আস্তানার নিকটেই সমাধিস্থ করেন। এই অঞ্চলে তিনি হজরত জঙ্গলবিলাস পীর নামে পরিচিত ছিলেন।

জঙ্গলবিলাস পীর সম্পর্কে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। শোনাযায়, পীর সাহেব প্রায়ই রাখালের বেশে একপাল ভেড়া লইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। একদা বর্ষাকালে তিনি বর্তমান রাজপুরের নিকট নদী পার করিয়া দিবার জন্য জনৈক মাঝিকে অনুরোধ করেন। কিন্তু লোভাতুর মাঝি তাহার পরিবর্তে পীরের নিকট একটি ভেড়া দাবী করে। পীর সাহেব তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া খেয়া পার হন এবং উক্ত মাঝিকে একটি ভেড়া দেন। কিন্তু আকস্মিক ঐ ভেড়া ব্যাঘ্রে রূপান্তরিত হইয়া মাঝির জীবননাশ করে।

আরো শোনা যায় যে, একদা বর্ধমান মহারাজার জনৈক প্রতিনিধি পীর সাহেবের আস্তানাটিকে হিন্দু মন্দির বলিয়া সনাক্ত করেন, অপর পক্ষে স্থানীয় মৌলভীরা উহাকে পীর হজরত সাহেবের "বড়জাদ" অর্থাৎ সমাধি স্থান বলিয়া দাবী করেন। দুই পক্ষের এই কলহের মীমাংসার জন্য একদিন পীর সাহেব একদল গরু ও ব্যাঘ্র লইয়া বর্ধমান মহারাজের নিকট উপস্থিত হন। মহারাজা পীরের এইরূপ অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে বিস্মিত হন এবং তাঁহার কর্মচারীদের পীরের সেবার জন্য কিছু নিষ্কর জমি দান করিতে নির্দেশ দেন, কিন্তু মহারাজার কর্মচারীগণ উক্ত জমির বিলি-বন্দোবস্থ্য করিতে অযথা বিলম্ব করায় হঠাৎ গ্রামে ভীষণ বাঘের উপদ্রব দেখা দেয়। অতপর মহারাজের কর্মচারীগণ ভীত হইয়া পীরের নামে জমি বিলি-ব্যবস্থা করিয়া দিলে গ্রামে বাঘের উপদ্রব বন্ধ হয়। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, পীরের সমাধিটির গড়ন প্রকৃতপক্ষেই হিন্দু মন্দিরের মতই।

পৌষ সংক্রান্তির প্রায় পনের দিন পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এই কয়দিন পীরের আস্তানায় প্রত্যহ কোরান পাঠ ও ধর্মালোচনা হইয়া থাকে। সংক্রান্তির দিন রাত্রিতে কোরান পাঠ, মিলাদ, কাওয়ালী গান, বাজনা ও আতস বাজী পোড়ান হয় এবং ভক্তরা পীরের আস্তানায় সিন্নি দিয়া পূজা দিয়া থাকেন। ভক্তদের বিশ্বাস পীরের নিকট মানত করিলে বন্ধ্যানারী সন্তানলাভ করে এবং অনেক কঠিন রোগ-ব্যাধির নিরাময় হয়। প্রধানতঃ দুধ, সিন্নি, মাটির ঘোড়া প্রভৃতি মানত করা হয়। এই স্থানে মানত করিবার একটি বিশেষ রীতি আছে। বর্তমান পীরের আস্তানার পশ্চিম দিকে পীরপুকুর নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ১লা মাঘ সন্তান কামনা জানাইয়া বন্ধ্যা নারীরা পীরপুকুরে আবক্ষ জলে নামিয়া একটি যে-কোন ফুল ভাসাইয়া দিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অপেক্ষা করিতে থাকেন। মানতকারী যে-ফুলটি ভাসাইয়া ছিলেন, সেই ফুলটি পুনরায় তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসিলে ঐ ফুলটি হাতে লইয়া পীরের খাদেমদের নিকট আসিলে পর তাঁহারা মানতকারীকে একটি মন্ত্রপুত পান খাইতে দেন। শোনা যায় ঐ পান খাইয়া বহু বন্ধ্যা নারী সন্তান লাভ করিয়াছেন।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন। যদিও এই উৎসব মুসলমান সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত, তথাপি ইহাতে বহু অহিন্দু যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ছয় হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

পৌষ মাসে উৎসব ব্যতীত প্রতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার অনেকে পীরের নিকট মানত পূজাদি দিয়া থাকেন।

পীরের বর্তমান খাদেমগণ দক্ষিণ নবপুর গ্রামে বসবাস করেন। তাঁহারা হজরত পীরের বংশধর বলিয়া দাবী করেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

বড়গাছা গ্রামে খড়ের চালাযুক্ত একটি মাটির দেবালয়ে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিবলিঙ্গ গ্রামে বুড়াশিব নামে খ্যাত। বর্ধমান মহারাজার প্রদত্ত দেবোত্তর জমির আয় হইতে বুড়াশিবের নিত্যপূজা ও চৈত্র সংক্রান্তিতে গাজন উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা প্রায় দেড় শত বৎসরের প্রাচীন এবং সর্বজনীন উৎসব।

গাজন উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। সংক্রান্তির দিন সাড়ম্বরে যথারীতি শিবের পূজাদি হয়। এইদিন গৌরী খালের নিকট দক্ষিণা কালীর মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসব্রতীগণের ঝাঁপ অনুষ্ঠান হয় এবং সঙ-এর দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করেন। শিব মন্দির প্রাঙ্গণে মাটির পুতুলের মাধ্যমে নানারূপ সামাজিক ব্যঙ্গ চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং যুবকগণের মধ্যে কুস্তী ও লাঠিখেলা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের বহু নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন। জনৈক চক্রবর্তী ব্রাহ্মণ শিবের পূজাদি করেন।

পঞ্চানন্দ পূজা

ডাহুকা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পঞ্চানন্দ ঠাকুরের একটি মন্দির আছে, মন্দিরে কোন বিগ্রহাদি নাই, একটি ঘটে যাবতীয় পূজা সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই গ্রামে পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায়, বহুকাল পূর্বে জনৈক স্ত্রীলোক পুকুরে চাল ধুইতে গিয়া নিখোঁজ হন এবং তিন দিন পর একটি ঘটসহ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজার প্রচলন করেন। তিনি যতকাল জীবিতা ছিলেন ততকাল তিনি স্বহস্তেই পঞ্চানন্দের নিত্য পূজাদি করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর পর চক্রবর্তী পদবী ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ পূজাদি করিতেছেন। মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি বর্তমানে পঞ্চানন্দের সেবায়েত। বার্ষিক পূজা উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী মন্দিরে মানত পূজাদি দিতে আসেন। প্রধানতঃ ষোড়শোপাচারে পূজা ও ছাগ বলি মানত করা হয়। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে মানত পূজা দিতে মন্দিরে বহু নরনারী আসেন। এই মন্দিরে শীতলা, মনসা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী, ষষ্ঠী, জরাসুর প্রভৃতি দেবদেবী আছে। কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে মন্দিরে কালীঠাকুরের বিশেষ পূজা হয়। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে।

মহোৎসব

বীর শিবপুর গ্রামে অবস্থিত হরিমন্দিরে প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লপক্ষে সাড়ম্বরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হরিমন্দিরে কোন বিগ্রহ বা মূর্তি নাই, উৎসব উপলক্ষে শুক্লপক্ষের বৃহস্পতিবার হইতে রবিবার পর্যন্ত চারদিনব্যাপী পুরোহিত শালগ্রাম শিলায় যথারীতি রাধাগোবিন্দের পূজা করিয়া থাকেন। বৃহস্পতিবার ভোররাত্রে অধিবাসের পর মন্দির প্রাঙ্গণে ষোল প্রহর-ব্যাপী অখণ্ড নাম কীর্তন হয়। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের অঞ্চল হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে প্রায় পনর হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। উৎসব সমাপ্তির দিনে সাধারণ পূজা ও মানসিক হিসাবে মন্দিরে প্রায় সাত হাজার মালসা ভোগ নিবেদন করা হয়। নিবেদিত ভোগ সর্ব সাধারণের মধ্যে বিতরণ করা হয় এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবান্তে উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। পূজারী উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, পদবী পাণ্ডা। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বাংলা ১২৮২ সন হইতে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

রাসযাত্রা

উলুবেড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সাড়ম্বরে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে আনন্দময়ী কালী মন্দিরে গৌর-নিতাইয়ের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। আনন্দময়ী হরিসভা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত গৌর-

নিতাই বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়াই প্রতি বৎসর উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গত সাত বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

উৎসব উপলক্ষে কালী মন্দিরের সম্মুখে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং ঐ মণ্ডপে নিতাই-গৌর বিগ্রহ স্থাপন করিয়া কার্তিক পূর্ণিমা হইতে একমাসব্যাপী উৎসব চলে। উৎসবের প্রতিদিন ভোর চারি ঘটিকায় গৌর-নিতাইয়ের মঙ্গলারতি, মধ্যাহ্নে ভোগ ও সন্ধ্যায় আরতি হয়। উৎসবের শেষ দিন গৌর-নিতাই মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে ভক্তরা প্রায় তিনশত মাসলা ভোগ নিবেদন করিয়া থাকেন। এই উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় এক মাস পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়।

উৎসবে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা ও নিকটবর্তী জেলা হইতে প্রতিদিন গড়ে প্রায় দশ বারো হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে পুতুল ও পট প্রদর্শিত হইয়া থাকে। গৌর-নিতাই বিগ্রহের নিত্য পূজা হয় এবং রাস উৎসব ব্যতীত এই বিগ্রহদ্বয়কে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বৈষ্ণব পার্বনাদি পালন করা হয়।

স্নানযাত্রা

বড়গাছা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে সাড়ম্বরে ধর্মরাজ ঠাকুরের স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সীমান্তে জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তার পাশে ধর্মরাজের সুউচ্চ বৃহৎ পাকা মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রাচীন এবং ইহার গঠনভঙ্গি বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ।

স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ঢাক-ঢোল ও শঙ্খধ্বনির মধ্যে শোভাযাত্রা সহকারে দেবমূর্তিকে পাল্কী করিয়া মন্দিরের অনতিদূরে "ঠাকুর পুকুর" নামে একটি বৃহৎ পুষ্করিণীতে লইয়া যাওয়া হয়। স্নানান্তে মন্দির সংলগ্ন উচ্চ ঢিবির উপর নির্মিত মঞ্চে ধর্মরাজের মূর্তি স্থাপন করিয়া টোপর ও নূতন বস্ত্র পরাইয়া ধর্মরাজকে বরবেশে সজ্জিত করা হয়। অতঃপর এই স্থানে যথারীতি ধর্মরাজের পূজার্চ্চনা অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই স্নানযাত্রার বার দিন পূর্ব হইতেই আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসব আরম্ভ হয়। "ঘর জামাই", "বারুই বউ", "ভিক্ষা" ইত্যাদি মঙ্গলকাব্যের বারটি আখ্যান অবলম্বন করিয়া বারটি সন্ধ্যায় চলে নৃত্য ও গীত। এই নৃত্যগীতের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে চারি হাত দীর্ঘ ও দেড় হাত প্রস্থ ও তিন-চারি হাত গভীর এক গর্তের মুখে পাটাতন দিয়া ধূয়া ধারকগণ সমবেতভাবে নাচ ও গান করিতে থাকেন। মূলগায়ক কিন্তু ঐ পাটাতনে উঠেন না। তিনি নৃত্য-গীতের ঐ নির্দিষ্ট স্থান হইতে কিছু দূরে থাকিয়া ছড়া কাটিয়া গান গাহিতে থাকেন। নৃত্য-গীতের এই দলটি পার্শ্ববর্তী কমলাপুর গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ইহা বাবুরাম ডোমের দল নামে খ্যাত। বর্তমানে বাবুরাম ডোমের পুত্র শ্রীযতীন্দ্র নাথ ডোম এই দলটি পরিচালনা করেন।

বড়গাছা গ্রামের ধর্মরাজ ঠাকুরের সেবায়েত ডোম সম্প্রদায়ভুক্ত। অবশ্য উৎসবে এই গ্রাম ও আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের নর-নারী যোগদান করিয়া থাকেন।

উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ উলুবেড়িয়া

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোধানের মেলা
(হজরত জঙ্গল বিলাস পীর)

বানিবন (পীরপুর) গ্রামে প্রতি বৎসর ২৯শে পৌষ হজরত জঙ্গল বিলাস পীরের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে পীরের আস্তানা সংলগ্ন সাধারণের প্রায় কুড়ি হইতে পঁচিশ বিঘা পরিমাণ জমির উপর পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুই শত বৎসরের প্রাচীন।

হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর ও কলিকাতা হইতে মেলায় প্রায় ছয় হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ হাওড়া জেলার বাগনান, উলুবেড়িয়া, জোয়ারগোড়ী, চেঙ্গাইল, মেল্লক, কল্যাণপুর, চণ্ডীপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং কলিকাতা ও চব্বিশ পরগণা জেলা হইতে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান আদায় করা হয়। দোকানপাটগুলির মধ্যে বাঁশ ও বেতের তৈরী ধামাকুলো, চ্যাঙ্গারী, মাটির পুতুল, খেলনা ও হাঁড়িকুড়ির দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসন-কোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারীগরি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, জুতার দোকান, শাকসব্জির দোকান, টোটকা ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকান-পাট বসিয়া থাকে এবং অনেকগুলি পূজার ফুল ও সিন্নি বিক্রয়কারী দোকানপাটও দেখা যায়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাধুলা, নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী, প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

কালীপূজার মেলা

তুলসীবেড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চুয়াত্তর বৎসরের প্রাচীন। মেলার জমি আংশিক দেবোত্তর এবং আংশিক সাধারণের।

মেলায় প্রায় সাত-আট হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। খড়দহ, উদং, জোয়ারগোড়ী, বাঙ্গালপুর, চণ্ডীপুর, বানিবন প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে লোকজন আসিয়া থাকেন।

মেলায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে উহার মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহা ভিন্ন, তামা-পিতলের বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান, বই-ছবির দোকান, পান-বিড়ির দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীও আমদানী হয়। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে নাগরদোলা, ম্যাজিক, লটারী, কবিগান ও যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের যাত্রাদল ভিন্ন কোন কোন বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদারী দল ও আনা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বৃন্দাবনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

মেলায় প্রধানতঃ কয়েকটি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের দুই-চারটি দোকানপাট বসে। আমোদ-প্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, তর্জা, কবি ও বাউলগান এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ময়নাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে শিব মন্দিরের সম্মুখস্থ আটচালায় একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন। খোড়িয়া, লালিতাগোড়ী, বাড়মেড়িয়া, কানসোন ও বলরামপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে তিন-চার শত যাত্রী আসেন।

বিক্রেতাগণ স্থানীয়। প্রধানতঃ কয়েকটি খাবার ও মনিহারী দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য তরজা গানের আয়োজন করা হয়।

কুশবেড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের পূর্ব দিকের মাঠে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। ইহা পঁচিশ হইতে ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। কালীনগর, রামনগর, বানিবন, যদুরবেড়িয়া, তাঁতিবেড়িয়া, কোটালঘাট, কালসোনা প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় আট-নয়শত নর-নারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং মেলায় প্রধানতঃ খাবারের দোকান এবং শিল্প সামগ্রীর দোকানপাট বসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হয় এবং প্রতি বৎসর উৎসবের দিন বিকালে আশেপাশের গ্রাম হইতে কয়েকটি বাউলের দল ও সঙ আসেন। মেলায় বাউল গানের এবং সঙ সাজার প্রতিযোগীতা হয় এবং শ্রেষ্ঠ দলকে পুরস্কৃত করা হয়। এই উপলক্ষে বহু দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে।

দুর্গাপূজার মেলা

প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে চেঙ্গাইল গ্রামের বাজারে একটি মেলা বসে। গ্রামের বাজারের স্থায়ী দোকানপাট ভিন্ন মেলা উপলক্ষে বাজারের মধ্যে স্থানে স্থানে আরও কতকগুলি দোকানপাট বসে এবং ঐ সকল দোকানপাট প্রায় মাসাবধি থাকে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রতিদিন দুইশত হইতে তিনশত যাত্রীর সমাগম হয়।

জগৎপুর, বহুরবেড়িয়া, খালিসানী প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। বাজারের স্থায়ী দোকান ভিন্ন খাবার ও তেলেভাজার দোকান, বাসনপত্রের দোকান, তাঁতের কাপড়চোপড়, গামছা, লুঙ্গি ইত্যাদির দোকান, বই-ছবির দোকান, মনিহারী দোকান বসে।

পার্শ্ববর্তী গুড়িখালী গ্রাম হইতে বেতের ও বাঁশের তৈয়ারী চ্যাঙ্গারী, ধামা, কুলো এবং মাটির, হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকানপাট প্রতি বৎসর আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

নববর্ষ উৎসবের মেলা

জগৎপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসব উপলক্ষে জগৎপুর আদর্শ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে এবং প্রায় দশদিনব্যাপী চলে। মেলায় প্রধানতঃ বাসুদেবপুর ও চেঙ্গাইল ইউনিয়ন হইতে এবং হাওড়া জেলার অন্যান্য ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় চার-পাচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় মংরাও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, তাঁতের কাপড়চোপড়ের দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো ইত্যাদির দোকান ও বই-ছবির দোকান বসে। শিল্প সামগ্রীর দোকানপাট উলুবেড়িয়া হইতে এবং অন্যান্য দোকানপাট আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কবিগান, জলসা, খেলাধুলা এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

পঞ্চানন্দ পূজার মেলা

ডাহুকা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় এক একর পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং দুই-তিন দিন স্থায়ী হয়। ইহাতে উলুবেড়িয়া মহকুমার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে প্রায় দুই হাজার নর-নারী যোগদান করেন। হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুর হইতেও কিছু সংখ্যক যাত্রী আসিয়া থাকেন।

বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর আটগাছা ইউনিয়ন হইতে আসেন। মেলায় মোট কুড়ি-পঁচিশটি খাবারের দোকান ও মনিহারী জিনিসের দোকানপাট বসিতে দেখা যায়।

মেলা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদের জন্য গ্রামের একটি দল যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। অধিকারীর নাম শ্রীবিভূতি মান্না।

মহোৎসবের মেলা

বীর শিবপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর চারদিনব্যাপী মেলা বসে। উক্ত জমির কিছু অংশ দেবোত্তর ও কিছু অংশ ব্যক্তি-বিশেষের। বাংলা ১২৮২ সন হইতে এই মেলা অনুষ্ঠিত হইতেছে। ইহাতে হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় পনর হাজার নর-নারী যোগদান করেন। হাওড়া জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলা হইতে যাত্রী আসিয়া থাকেন।

বিক্রেতাগণ এই জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর মেলায় নানারকম জিনিসপত্রাদি লইয়া আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ফেরীওয়ালার সংখ্যা প্রায় ত্রিশ জন। সমস্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাছাড়া বই-ছবি, কাপড়চোপড়, তেলেভাজা, খাবারের দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি মেলায় আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, নাগরদোলা, এবং খেলাধুলা প্রভৃতির আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রা মেলা

কামিনা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে অনন্তদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন। সুমদা, তুলসী বেড়িয়া, জোয়ারগোড়ী, চকভগবতীপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় তিন হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে। স্থানীয় বিক্রেতাগণ ভিন্ন সুমদা, তুলসীবেড়িয়া, বাগনান, খড়দহ, খানপুর প্রভৃতি স্থান হইতে বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা এবং তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া মনিহারী দোকান, বই-ছবির দোকান এবং বাঙ্গালপুর, চণ্ডীপুর, জোয়ারগোড়ী, প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীর আমদানী হয়। মেলায় ফেরীওয়ালারা আম, ঘুঘনী, আইসক্রীম ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, জলসা, বাউলগান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামে সখের যাত্রাদল আছে।

রাসযাত্রার মেলা

উলুবেড়িয়ায় প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমাতে আনন্দময়ী কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে প্রায় সাত-আট বিঘা দেবোত্তর জমিতে রাস উৎসব উপলক্ষে একমাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি গত সাত বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

এই মেলায় দৈনিক গড়ে প্রায় ছয়-সাত হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। হাওড়া জেলার কালীনগর, বানিবন, জোয়ারগোড়ী, চণ্ডীপুর, হাটগাছা, ধূল সিমলা, বাউড়িয়া, চেঙ্গাইল, আমতা, শ্যামপুর, প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং কলিকাতা, হুগলী প্রভৃতি জেলা হইতে প্রতি বৎসর মেলায় যাত্রীগণ আসিয়া থাকেন। সম্প্রতি কালের হইলেও মেলাটি অল্পকালের মধ্যে বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

মেলায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারো জন ফেরীওয়ালাও দেখিতে পাওয়া যায়। ময়রা, তেলেভাজা ও চা-পান-বিড়ির দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কাঠের বারকোশ, চাকী, বেলুন ইত্যাদির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান, মাটির খেলনা ও পুতুলের দোকান, সূচী শিল্পের দোকান, বই-ছবির দোকান, পিতলের গহনা ও ফাউন্টেন পেনের দোকান এবং ফল ও ফটোগ্রাফের দোকানপাটও বসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, যাত্রাভিনয় ও সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা : হাওড়া

থানা : শ্যামপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : গোপীনাথপুর। ১।২২৮'১০।২২৪।১,১৮৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তাঁতি, স্বর্ণকার, তেলি, জেলে, ধোপা, নাপিত, ডোম। গ্রামে জেলেপাড়া, মান্নাপাড়া, তেলিপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, শিল্পকার্য ও মৎস্যব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে গ্রামটি প্রায় ছয় মাইল দূরে অবস্থিত। স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ইহাভিন্ন কোলাঘাট রেলস্টেশন হইতে রূপনারায়ণ নদীপথে নৌকাযোগে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথিতে মহোৎসব, চৈত্র মাসে পাঁচদিনব্যাপী বাসন্তী পূজা এবং চৈত্র মাসের শেষ পাঁচ দিন হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসব উপলক্ষে গ্রামে সাধারণের প্রতিষ্ঠিত শিবের আটচালায় যথারীতি ভোগপূজাদি হয় এবং ভক্তরা অনেকে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন। উৎসবটি প্রাচীন এবং এই উৎসব উপলক্ষে তরজা, কীর্তন, বাউল গান ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

বাসন্তী পূজাটি গত দশ বারো বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে এবং এই পূজা উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হয়।

উল্লিখিত সবকয়টি উৎসবই সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি মনসা, একটি শীতলা, এবং একটি আটচালায় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়, শিক্ষক,
গ্রাম : গোপীনাথপুর,
পোঃ নাকোল, হাওড়া।

২। গ্রাম : নাউল। ৯।৭১৯'৮৬।৩৪৪।২,১২০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তেলি, মালাকার, ধোপা, নাপিত, তাঁতি, কেওরা ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, শুড়েপাড়া, মণ্ডলপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে "বাগনান-কমলপুর" পাকা রাস্তা দিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইয়া "গোপীনাথপুর-দেওয়ানতলা" কাঁচা রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়। বাগনান হইতে সাইকেল রিক্সাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে ধর্মরাজ-পূজা, আশ্বিনে শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে সর্বমঙ্গলাপূজা, মাঘী পূর্ণিমায় ব্রহ্মাপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ব্রহ্মাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান এবং একটি পীরের আস্তানা আছে। একটি শিবলিঙ্গ এবং সর্বমঙ্গলা দেবীর প্রস্তর মূর্তি আছে।

শ্রীসন্তোষ কুমার প্রধান, প্রধান শিক্ষক,
নাউল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ নাকোল, হাওড়া।

৩। গ্রাম : সীতাপুর। ২৫।৩৫৭'২৬।২৭৭।১,৩৩৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুলগাছিয়া হইতে সাইকেল রিক্সায় বাঁশবেড়িয়া পর্যন্ত আসিয়া পরে খেয়া পার হইয়া দামোদর-সীতাপুর বাঁধ ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়। বর্ষাকালে কুলগাছিয়ার মহিষ রেখা হইতে দেওয়ানতলা ঘাট পর্যন্ত নৌকায় আসিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ আক্নিন স্নান উৎসব।

(ঙ) আক্নিন স্নানের মেলা। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দামোদর নদীর কূলে দেওয়ান সাহেব পীরের একটি বেদী আছে।

শ্রীসত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়,
গ্রামঃ চন্দ্রভাগা,
পোঃ মুগকল্যাণ, হাওড়া।

৪। গ্রাম: রতনপুর। ৩৩।২০৮'৭৪।১১৩।৫৬২

(ক) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, গন্ধবণিক, নাপিত প্রভৃতি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) কুলগাছিয়া অথবা বাগনান রেলস্টেশন হইতে সাইকেল রিক্সায় গ্রামে পৌছান যায়। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূরে দামোদর নদী প্রবাহিত। এই নদী পথে নৌকাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে একযোগে রতনমালা দেবীর বার্ষিক পূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রতনমালা দেবীর পূজা ও গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রতনমালা দেবীর পাকা মন্দির, একটি শিব মন্দির ও একটি পীরের স্থান আছে।

গ্রামের প্রতিষ্ঠিত রতনমালা দেবীর নামানুসারে গ্রামের নাম রতনপুর হইয়াছে।

শ্রীপ্রভঞ্জন দে,
গ্রামঃ রাজীবপুর,
পোঃ আমড়দহ, হাওড়া।

৫। গ্রাম: বৈটী। ৭৪।১৪৮'৮২।১৪৭।৭৩১

(ক) মাহিষ্য ও কোরঙ্গা অধ্যুষিত গ্রাম।

(খ) কৃষিকার্য ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রাম্য দেবতা ক্ষেত্রপাল ও ওলাবিবির স্থানে তিন-দিনব্যাপী পূজা ও পাঁচালী গান হয়। সাইবেনিয়া গ্রামে একটি পাঁচালী গায়ক দল দেবতার প্রত্যাদেশ অনুসারে প্রতি বৎসর এই স্থানে পাঁচালী গাহিয়া থাকেন। পাঁচালী গান শুনিতে আশেপাশের গ্রাম হইতে পাঁচশত হইতে সাতশত নর-নারীর সমাগম হয়।

প্রতি বৎসর শারদীয়া বিজয়া তিথিতে দক্ষিণরায় ও জয়চণ্ডী দেবীর পূজা হয়। গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দক্ষিণরায়ের পাথরে খোদাই করা মূর্তি এবং জয়চণ্ডীর ঘট স্থাপিত আছে। ইহাছাড়া, প্রতি শনি-মঙ্গলবার ব্রাহ্মণ দ্বারা দক্ষিণরায় ও জয়চণ্ডীর পূজা করা হয়। গ্রামে ব্যাঘ্র ভীতি হেতু এই পূজার প্রচলন হয় বলিয়া বিশ্বাস। দক্ষিণ-রায়ের নিকট দুধ, গাঁজা ও ছাগ বলি মানত করা হয়।

উল্লিখিত দেবদেবীগুলি গ্রামের সাধারণের এবং বহুকাল যাবত পূজা ও উৎসব চলিতেছে।

ইহাভিন্ন, গ্রামে একটি প্রাচীন রীতি অনুসারে প্রতি গৃহস্থের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া নিকটবর্তী সুলতানপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত শীতলা দেবীর নিকট বৎসরে দুইবার পূজা দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বারে সুলতানপুরের পূজা শেষ হইলে পর ভক্তরা বিকালে স্ব-গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে নর-নারী নির্বিশেষে এক সাথে মিলিয়া সন্ধ্যায় জলযোগ করেন এবং পরের দিন মধ্যাহ্নে গ্রামের প্রতি বাড়ীর গৃহস্থেরা উল্লিখিত নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া রান্না করিয়া একযোগে ভোজন এবং আনন্দ উৎসব করেন। আহারের পর উচ্ছিষ্ট পাতা ও ভুক্তাবশেষ গ্রামের প্রধানের স্ত্রীকে পরিষ্কার করিতে হয়। ইহাই চিরাচরিত নিয়ম এবং উৎসবের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দক্ষিণরায়, ওলাবিবি, ক্ষেত্রপাল ও জয়চণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রামে প্রচুর বৈচী বন থাকায় গ্রামের নাম বৈঁচি হইয়াছে।

শ্রী এ. এন কারক, শিক্ষক,
গ্রামঃ বৈচী. পোঃ খাড়ুবেড়িয়া, হাওড়া।

৬। গ্রাম : নস্করপুর (মৌজাঃ জয়নগর)। ৭৭।৬১ ও ৩৯।৫০৭।২,৬১৩

(ক) হিন্দু। গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যথা—মণ্ডলপাড়া, ঘোসপাড়া, হাজরাপাড়া, পুরকাই ত পাড়া, দাসপাড়া, মাইতিপাড়া, আদকপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় বিশালাক্ষীর নীল উৎসব।

(ঙ) বিশালাক্ষী পূজারমেলা। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষী দেবীর পাকা মন্দির আছে।

শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস, শিক্ষক,
গ্রাম : নস্করপুর,
পোঃ খাড়বেড়িয়া, হাওড়া।

৭। গ্রাম : মরশাল। ৭৮।২৩৮ ৭৭।১৭০।১,০১৯

(ক) মাহিষ্য, তেলী, ধোপা, মুচি, জেলে, বাগ্দী, প্রভৃতি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—মাঝিপাড়া, সাউপাড়া, মুচিপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান। গ্রামটি "বাগনান শ্যামপুর" রাস্তার ধারে অবস্থিত। গ্রাম হইতে একমাইল দূরে শ্যামপুর খেয়াঘাট হইতে নৌকাযোগে এই গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে সাড়ম্বরে রক্ষাকালী পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং অগ্রহায়ণ মাসে নবান্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। রক্ষাকালীপূজা ও নবান্ন উৎসবটি প্রাচীন, দুর্গাপূজাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে। মেলাটি সম্প্রতি কালের।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয়ে ব্যাঘ্র-বাহন দক্ষিণরায়, অশ্ববাহন রূপরায় ও কালীরায় এবং শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দ আছে।

পূর্বে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে এই গ্রামে একটি মেলা বসিত। বর্তমানে মেলাটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত বেরা, প্রধান শিক্ষক,
মরশাল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খাড়ুবেড়িয়া, হাওড়া।

৮। গ্রাম : শ্যামপুর। ৭৯।৮৩৬৮৩।৫৩৭।২,৮৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, প্রভৃতি।
গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামটি দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে শীতলা দেবীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শীতলাপূজার মেলা। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে।

শ্রীঝাড়ুচরণ সামন্ত, শিক্ষক,
উলুবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রামঃ চাউলখালি,
পোঃ মুজারপুর, হাওড়া।

Shyampur—A large village on the right bank of the Dāmodar, chiefly inhabited by Kaibarttas. It has a police-station, a sub-registry offiice, a post office, a ferry, a charitable dispensary and a District Board bungalow. Within its jurisdiction lie Sasāti, with a High English School, a ferry and an Irrigation Department bungalow on the Rupnārāyan ; Fort Mornington on the month of the Rūpnārāyan in the village of Makrapathar ; and Pichhalda, two miles north, north-west of Fort Mornington with a *hāt*. Sasāti is shewn in Rennel's Atlas, while Pichhalda is still older, being shewn in the oldest maps existing, *viz*, those of Gastaldi (1561), De Barros (1623) and Blaev (1650). In De Barros' *Die Asia*, printed in 1552, it is said, "Ganga discharges into the illustrious stream of the Ganges between the two places called Angeli and Pichhalda in about 22 degrees." It is also mentioned in the biographies of Chaitanya as the place where he crossed the river ; and from its position, just above the junction of the Rūpnārāyan and the Hooghly ; it must have been an important village."
(District Handbooks ; Howrah, 1951 by A. Mitra, p. liii)

৯। গ্রাম : কমলপুর। ৮৮।৪২৬৫২।২১৩।১,৩২৬

(ক) হিন্দু। গ্রামে সামন্তপাড়া, বৈতালিকপাড়া প্রভৃতি নামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান। বাগনান-কমলপুর রোড গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ এবং ঐ রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদী দিয়া নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, মাঘ মাসে ব্যক্তি-বিশেষের সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী সর্বজনীন নীল ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি যথাক্রমে ষোল, কুড়ি ও একশত বৎসরের প্রাচীন। দুর্গাপূজা ও সরস্বতী পূজা উপলক্ষে দরিদ্রনারায়ণ সেবা এবং চড়ক উৎসব উপলক্ষে দুই-তিন রাত্রিব্যাপী যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে একদিন। মেলাটি ষোল বৎসরের প্রাচীন।

সরস্বতীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টালির ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি পাকা দেবালয়ে শিব, শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি দেবদেবী আছে। ইহাভিন্ন একটি পীরের স্থান আছে।

শ্রীরাজকুমার সাউ, প্রধান শিক্ষক,
পোঃ রাধাপুর, হাওড়া।

১০। গ্রাম : পুরুলপাড়া। ৯০।৩৫৭০৯।১৬১।১,০৭৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, ধোপা, নাপিত, কামার, জেলে। গ্রামে ঘোষপাড়া, বামুনপাড়া সামন্তপাড়া, বেরাপাড়া, খান্দরপাড়া, দাসপাড়া, মাঝিপাড়া, মাইতিপাড়া, মান্নাপাড়া মণ্ডলপাড়া, আদকপাড়া, কামারপাড়া, ধোপাপাড়া প্রভৃতি অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান। গ্রাম হইতে অর্ধ মাইল পশ্চিমে কমলপুর হাট হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামের দক্ষিণ সীমানায় রূপনারায়ণ নদী দিয়া নৌকা যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শারদীয়া নবমী তিথিতে বরাহী চণ্ডীর বার্ষিক পূজা এবং চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী দেবীর ভৈরব কাশীনাথ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে টালির ছাউনীযুক্ত পাশাপাশি দুইটি মাটির গৃহে বরাহী চণ্ডী, শীতলা, মনসা, কাশীনাথ শিব, রূপরায় প্রভৃতি দেবদেবীর শিলামূর্তি আছে এবং চৈত্র মাসে উল্লিখিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত সকল দেবদেবীর পূজা ও তদুপলক্ষে পাঁচালী গান হয়। ইহাভিন্ন, ব্যক্তি বিশেষের একটি পাকা মন্দিরে শীতলা ও মনসা দেবীর দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং একটি পীরের স্থান আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বর্ধমানের মহারাজ ইংরাজদের নিকট হইতে মণ্ডলঘাট পরগণার জমিদারী পান। পুরুলপাড়া গ্রামটি মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তর্গত। বর্ধমানের মহারাজ এই পরগণার কিয়দংশ তাঁহার কন্যাকে দান করেন এবং বাকী অংশ সাতক্ষীরার চৌধুরীদের পত্তনি দেন। চৌধুরী মহাশয়রা উহার সামান্য অংশ নিজেদের খাসে রাখিয়া বাকী সমুদয় অংশ কলিকাতার প্রিন্স দ্বারিকা নাথ ঠাকুরের নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। পরে প্রিন্স দ্বারিকা নাথ ঠাকুরের অংশ মহিষাদলের রাজারা ক্রয় করিয়া লন। বাংলা ১২৫৮ সনে মতিলাল শীল মহাশয় মহিষাদলের রাজা লচমন গর্গের নিকট হইতে পুরুলপাড়া অংশ ক্রয় করেন। গ্রামটি রূপনারায়ণ নদীর কূলে অবস্থিত বলিয়া মাটি পলি পূর্ণ ও উর্বরা। এই উর্বর ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে ঝিঙ্গা ও ধুন্দুল চাষ হইত। পাকা ঝিঙ্গা ও ধুন্দুলের খোসা গায়ে সাবান মাখা ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হয়। ঐ খোসাকে স্থানীয় লোকেরা আজও "পুরুল" বলেন। অনুমান করা যায় প্রচুর পুরুলের উৎপাদন হেতু গ্রামের নাম পুরুল-পাড়া হইয়াছে. বাংলা ১৩৩২ সনে একটি পুকুর খনন কালে প্রায় চৌদ্দ হাত মাটির নীচে কালো পাথরের দুইটি বড় শ্লেট পাওয়া যায়। ওই শ্লেটদ্বয় আমাদের সংবাদদাতা এই গ্রাম নিবাসী শ্রীঅনন্তরাম প্রামাণিকের গৃহে রক্ষিত আছে। ইহাভিন্ন পুরুল পাড়া গ্রামের ভূগর্ভ হইতে সাবেকী আমলের মাটির তৈজসপত্রাদিও পাওয়া গিয়াছে।

শ্রীঅনন্তরাম প্রামাণিক, শিক্ষক,
গ্রামঃ পুরুলপাড়া,
পোঃ রাধাপুর, হাওড়া।

১১। গ্রাম : কীরিশবেড়িয়া। ৯৯।২৮২'১৫।১৭১।৯৪৫

(ক) মাহিষ্য ও কামার।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান। রূপনারায়ণ নদী পথে নৌকায় শিকাজু ঘাটে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী গ্রামে স্বয়ম্ভুনাথ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে স্বয়ম্ভুনাথ শিবের মন্দির আছে।

শ্রীঝড়ুচরণ সামন্ত, শিক্ষক,
উলুবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রামঃ চাউলখোলা,
পোঃ গুজারপুর, হাওড়া।

১২। গ্রাম : পিছলদহ।

১০২।১,০৩৫'২৮।৬৯৩।৩,৮৩৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় ও চামার। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান। গ্রামের সীমান্তবর্তী রূপনারায়ণ নদী দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমায় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রকাশ চৈতন্যদেব উৎকল ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ করিয়া স্বদেশ

প্রত্যাবর্তন কালে প্রাচীন তাম্রলিপ্ত হইতে নৌকা-যোগে রূপনারায়ণ নদী পার হইয়া এই গ্রামে অবতরণ করেন এবং কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ করিয়া পুনরায় নৌকাযাত্রা করেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর দোলপূর্ণিমায় শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে বহু দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেও লোক সমাগম হইয়া থাকে।

(ঙ) শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুনপূর্ণিমায় একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ঠাকুরের বিগ্রহ আছে। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর বার্ষিক বিশেষ পূজা হইয়া থাকে।

শ্রীঝড়ুচরণ সামন্ত, শিক্ষক,
উলুবেড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম: চাউলখোলা,
পোঃ গুজারপুর, হাওড়া।

(ঙ) গঙ্গাপূজা উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দ, শীতলা ও মনসার ঘট এবং ওলাবিবি ও বড় খানসাহেব পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। কাহারও গরু, ছাগল হারাইলে পঞ্চানন্দের নিকট গাঁজা ও কলকে মানত করা হয়। বৈশাখ সংক্রান্তিতে পঞ্চানন্দের পূজা হয়। পূজা উপলক্ষে পাঁচালী গান হয় এবং কয়েকটি দোকানপাট বসে। প্রতি শনি মঙ্গল বারে শীতলাপূজা এবং জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা ও পাঁচালী গানের আয়োজন করা হয়। প্রতি বৃহস্পতিবার ওলাবিবির পূজা এবং বৎসরে যে-কোন সময় ওলাবিবির ও বড় খানসাহেব পীরের পূজা হয়। বাৎসরিক পূজার সময় ওলাবিবির স্থানে বনভোজনের উৎসব পালিত হয়।

গ্রামে সাধারণের ব্রহ্মা মন্দির ও কালী মন্দির (মাটির ঘর) আছে এবং দেবদেবীর নিত্যপূজা হয়। ব্রহ্মার বিগ্রহটি প্রস্তর নির্মিত। ইহাছাড়া গ্রামে বিশালাক্ষী, ধর্মরাজ, দধিবামন, দামোদর প্রভৃতি দেবদেবী আছে। দধিবামন ও দামোদর গ্রামের ব্যক্তি-বিশেষের গৃহদেবতা।

শ্রীগোপাল কৃষ্ণ সাধুখাঁ, প্রধান শিক্ষক,
ডিঙ্গাখোলা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হাওড়া।

১৩। গ্রাম: ডিঙ্গাখোলা।

১০৯।৯১৮'৫৮।৩৭৪।২,৩২৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, গন্ধবণিক, তাঁতী, কাওরা, ধোপা প্রভৃতি।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে বাগনান রেলস্টেশন। গ্রামের উত্তরে দামোদর এবং পূর্বে হুগলী নদী থাকায় নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে গঙ্গাপূজা। মাঘ মাসে স্থানীয় বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী বাবা ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন ও প্রাচীন।

১৪। গ্রাম: বাগাণ্ডা। ১২৮।২৫৮'৯৩।২০২।১,১২৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সাহা, কুমার, নাপিত, জেলে, দুলে ও কাওরা।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) উলুবেড়িয়া রেলস্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে পৌছান যায়। ইহাভিন্ন নদীপথে নৌকা বা মোটরলঞ্চ যোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া

বিজয়া দশমীর পর একাদশী তিথিতে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। শারদীয়া একাদশী তিথি হইতে দুইদিন এবং প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দের এবং একটি বুড়া শিবের মূর্তি আছে।

শ্রীত্রৈলোক্য নাথ মজুমদার, শিক্ষক,
গ্রামঃ পালপাড়া, পোঃ ধূলসিমলা,
হাওড়া।

১৫। গ্রাম : বেলাড়ী। ১৩২।৫৯৭ ৯৪।৩৬৩।১,৭৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়, ধোপা, কোরঙ্গা ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন উলুবেড়িয়া হইতে নদী পথে মোটরলঞ্চে করিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে কালীপূজা, গোবিন্দ দ্বাদশী তিথিতে অষ্টম প্রহরব্যাপী অখণ্ড নামযজ্ঞ মহোৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুনে সাড়ম্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব, চৈত্র সংক্রান্তিতে পীরের উৎসব। ইহাভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাধা-গোবিন্দ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া জন্মাষ্টমী, নন্দোৎসব ইত্যাদি পালন করা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পঞ্চানন্দের একটি প্রাচীন মন্দির আছে। পঞ্চানন্দের সেবায়েত ও পূজারী বাগদী সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি। ইহাভিন্ন গ্রামে একটি শীতলা, মনসা ও শিব আছে।

বাংলা ১৩৩৮ সনে গ্রামে একটি রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ আশ্রমে একটি মন্দিরে রামকৃষ্ণ-সারদামণি ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি স্থাপিত আছে। ইহাছাড়া রামনাথ বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দের একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

শ্রীপরিতোষ কুমার জানা, প্রধান শিক্ষক,
বেলাড়ী বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির,
হাওড়া।

জেলা : হাওড়া
থানা : শ্যামপুর

উৎসব বিবরণী

আক্ষিন স্নান

সীতাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে আক্ষিন স্নান উপলক্ষে হাওড়া জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে। এই গ্রামের একটি নির্দিষ্ট পুষ্করণীতে ১লা মাঘ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব হইতে মধ্যাহ্ন পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ভক্ত নর-নারীরা পুণ্য স্নান করিয়া থাকেন এবং দরিদ্রদিগকে যথাসাধ্য দান-ধ্যান করেন। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

এই গ্রামে আক্ষিন স্নান উৎসবের সহিত দেওয়ান সাহেব নামক জনৈক পীরের সম্পর্ক জড়িত আছে। গ্রামের সীমান্তবর্তী দামোদর নদীর তীরে দেওয়ানতলায় দেওয়ান সাহেব পীরের একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে। ঐ বেদীর উপর সিমেন্ট জমানো একটি ব্যাঘ্র ও একটি অশ্বের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রাম নিবাসী রাম চন্দ্র জানা নামে জনৈক ব্যক্তি দেওয়ানতলায় ঐ মূর্তি দুইটি প্রতিষ্ঠা করেন। দেওয়ান পীরের অতীত জীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে দেওয়ান সাহেব ঈশ্বর প্রেমিক দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন এবং ঐশী শক্তির প্রভাবে বহু লোকের নানারূপ মনস্কামনা পূর্ণ করিতে পারিতেন বলিয়া জানা যায়।

১লা মাঘ তারিখে পীরের বেদীর উপর একটি আচ্ছাদন দেওয়া হয় এবং পূর্ব উল্লিখিত পুষ্করিণীতে পুণ্য স্নান করিয়া ভক্তরা পীরের স্থানে মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। প্রধানতঃ সন্তান কামনা করিয়া এবং শিশুদিগের বিছানায় মূত্ররোগ নিবারণের জন্য পীরের নিকট সিন্নি, মাটির ঘোড়া, আলতাপাতা, ঝাড়কাঠি, মাটির ভাড়, চাল-ডাল, দুধ ও রান্না করা মাংস প্রভৃতি দ্রব্যাদি দিয়া পূজা দিয়া থাকেন। ১লা মাঘ ভিন্ন বৎসরের যে-কোন সময়েই পীরের নিকট পূজাদি দেওয়া চলে। পীরের বর্তমান খাদেম জনাব আমজেদ আলী মোল্লা।

গঙ্গাপূজা

ডিঙ্গাখোলা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে আটদিনব্যাপী সাড়ম্বরে গঙ্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। গঙ্গা দেবীর কোন মন্দির নাই, একটি নির্দিষ্ট স্থানে প্রতি বৎসর প্রতিমা নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজাদি হয়। গঙ্গাপূজা উপলক্ষে একটি "মেড়ে" প্রস্তুত করা হয়। মেড়ের উপরিভাগে নারায়ণ, নীচে একদিকে ব্রহ্মা ও শিব এবং মধ্যস্থলে মকরবাহিনী গঙ্গা দেবীর মূর্তি থাকে। গঙ্গা মূর্তির দক্ষিণ পার্শ্বে যথাক্রমে লক্ষ্মী ও জহ্নুমুনির মূর্তি এবং বামপার্শ্বে যথাক্রমে সরস্বতী ও গণেশ মূর্তি এবং নিম্নে ইন্দ্র ও শঙ্খ হস্তে ভগীরথ-এর মূর্তি এবং মেড়ের দুই পার্শ্বে দুইটি পরী থাকে। উৎসবের দিন আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নর-নারী গঙ্গা মূর্তি দর্শন করিতে এবং পূজাদি দিতে আসেন।

কিংবদন্তী আছে প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে কতিপয় রাখাল বালক মাঠে গরু চরাইবার কালে খেলার ছলে একদিন একটি গঙ্গা মূর্তি তৈয়ারী করিয়া মাটির নৈবেদ্য দিয়া গঙ্গা পূজার আয়োজন করে এবং দেবীর নিকট বলি দিবার জন্য একটি রাখাল বালককে কঞ্চির যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া হোগলার খড়্গের দ্বারা স্কন্ধে আঘাত করে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় হোগলার খড়্গের আঘাতে বালকটি দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এই সংবাদ চারিদিকে প্রচারিত হইলে গ্রামবাসীগণ ঘটনাস্থলে ছুটিয়া আসেন এবং গঙ্গা মূর্তি নির্মাণ করিয়া যথারীতি পূজার আয়োজন করেন। সেই অবধি এখানে গঙ্গা পূজা হইতেছে।

চণ্ডীপূজা (বরাহী চণ্ডী)

পুরুলপাড়া গ্রামে টালির ছাউনীযুক্ত একটি মাটির দেবালয়ে বরাহী চণ্ডীর শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইনি সর্বসাধারণের দেবী। বাংলা ১২৫২ সনে গ্রামের পূর্বদিকের জঙ্গল পরিষ্কার কালে শিলামূর্তিটি পাওয়া যায় এবং

সাতক্ষীরার চৌধুরী বাবুরা স্বপ্নাদেশ অনুসারে বরাহী চণ্ডীর মূর্তি ও তৎসহ দেবীর ভৈরব কাশীনাথ শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজাদির ব্যবস্থা করেন। সেই সময় হইতে দেবীর নিয়মিত পূজা চলিয়া আসিতেছে। প্রতি বৎসর শারদীয়া নবমী তিথিতে সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক পূজা সম্পন্ন হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

ক্ষীরিশবেড়িয়া গ্রামে অবস্থিত স্বয়ম্ভুনাথ শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন নীল পূজা হয়। নীল পূজার দিন হাওড়া জেলা এবং চব্বিশ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে বহু নর-নারী মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। অনেকে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্যলাভের জন্য মন্দিরে 'হত্যা' দিয়া থাকেন। সংক্রান্তির দিন যথারীতি হোমপূজা ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য পূর্বাপেক্ষা বর্তমানে উৎসবের আড়ম্বর বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

এই গ্রামে স্বয়ম্ভু শিবের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি কিং-বদন্তী অনুসারে জানা যায় যে, আনুমানিক বাংলা ১০১০ সনে ক্ষীরিশবেড়িয়া গ্রামের ভগবান পুরকাইত নামে জনৈক ব্যক্তি মাঠে মাটি কাটিবার কালে তাঁহার কোদাল একটি পাথরে আঘাত লাগে। সেই রাত্রেই তাঁহার প্রতি এইরূপ স্বপ্নাদেশ হয় যে, "আমি স্বয়ম্ভুনাথ, তোর জমিতে এতকাল অবস্থান করিতেছিলাম। তুই আমার মাথায় আঘাত করিয়াছিস, সেইজন্য আমি ক্ষীরিশবেড়িয়া গ্রামের শ্মশানে যাইতেছি। সেখানে তুই আমার মন্দির প্রতিষ্ঠা কর।"

সকালে উঠিয়া ভগবান পুরকাইত যে জমিতে মাটি কাটিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে রক্তের চিহ্ন এবং শ্মশানে গিয়া একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের নীচে একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পান। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ঐ স্থানে তিনি স্বয়ম্ভুনাথ শিবের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তদবধি স্বয়ম্ভুনাথ শিবের নিত্যপূজা ও উৎসবাদি চলিয়া আসিতেছে। চৈত্র মাসে গাজন উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে স্বয়ম্ভুনাথের শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্মরাজপূজা

নাউল গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে যথারীতি ধর্মরাজ-এর পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। পাথরের উপর খোদিত একটি মুখাকৃতিকে ধর্মরাজ জ্ঞানে পূজা করা হয়। পূজাটি সর্বজনীন এবং প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

এই গ্রামে ধর্মরাজ পূজার প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে উড়িষ্যার কটক জেলা হইতে রামদয়াল মিশ্র নামে জনৈক ব্রাহ্মণ শিমুল তুলার ব্যবসার জন্য পার্শ্ববর্তী নাকোল গ্রামে আসেন। সেই সময় শ্যামপুর থানায় প্রচুর তুলার চাষ হইত। ইহার কিছুকাল পরে তিনি নাকোল গ্রামে স্থায়ী বসবাসের জন্য একখণ্ড জমি ক্রয় করেন এবং তথায় গৃহ নির্মাণের জন্য পুষ্করিণী খনন কালে একটি সোনার চরকা এবং পাথরে খোদিত একটি মুখাকৃতি পান। তিনি উক্ত পাথরখণ্ডটিকে স্বগৃহে রাখিয়া পূজা করিতে মনস্থ করেন। এই সময় তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, "আমি ধর্মরাজ ঠাকুর, নীচ জাতি ভিন্ন উচ্চবর্ণের কাহারও পূজা গ্রহণ করিব না। তুমি নাউল গ্রামে একটি কুড়ে ঘর নির্মাণ করিয়া আমার পূজার ব্যবস্থা কর। কেবল মাত্র ভাদ্র সংক্রান্তি তিথিতে তোমার গৃহে আনিয়া একদিন আমার পূজা করিবে।" সেই সময় হইতে প্রতি বৎসর মিশ্রদিগের গৃহে ধর্মরাজের পূজা হইত। তবে বর্তমানে উক্ত মিশ্র পরিবারের অবস্থা পড়িয়া যাওয়ায় ভাদ্র সংক্রান্তিতে তাঁহাদের বাড়ীতে পূজা হয় না—সাধারণে মিলিয়া গ্রামেই পূজার আয়োজন করেন।

আদিতে ডোম সম্প্রদায় ধর্মরাজের পূজারীর কাজ করিতেন। বর্তমানে জনৈক নাপিত দ্বারা পূজার কার্য করান হয়। উৎসবের দিন বর্ণহিন্দুরাও পূজাদি দিয়া থাকেন এবং আশেপাশের গ্রাম হইতে অনেকে ধর্মরাজের পূজা দিতে আসেন।

বিশালাক্ষী দেবীর পূজা

নন্দরপুর গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে বিশালাক্ষী দেবীর প্রস্তরময়ী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি দক্ষিণ দুয়ারী এবং সম্মুখে নাটমন্দিরযুক্ত। মন্দির সংলগ্ন একটি পুকুর আছে- ইহা "দেবী পুকুর" নামে খ্যাত।

শোনা যায় প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে একবার এই গ্রামটি জল প্লাবিত হয়। জল সরিয়া যাইবার পর বিশালাক্ষী মূর্তিটি পাওয়া যায়। ইহার কয়েকদিন পর স্বপ্নাদেশে দেবী পার্শ্ববর্তী নারায়ণপুর গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের জনৈক ব্যক্তিকে তাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দেন। তদবধি এই গ্রামে বিশালাক্ষী দেবী পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে সাড়ম্বরে বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য বৈশাখী পূর্ণিমার পাঁচদিন পূর্ব হইতে উৎসব আরম্ভ হয় এবং প্রতিপদ তিথিতে সমাপ্ত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন।

বিশালাক্ষী দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। দেবী নিকট মানত করিলে ভগন্দর, কুষ্ঠ, বাত, পুরাতন জ্বর প্রভৃতি নানারূপ ব্যাধির নিরাময় হয় বলিয়া শোনা যায়। প্রতি রবিবার দেবীপুকুরে স্নান করিয়া ভক্তরা মন্দির হইতে রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের জন্য দৈব ঔষধ গ্রহণ করেন। দেবীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা মানত করা হয়, কোনরূপ পশু-পক্ষী বলি দেওয়া হয় না। উৎসবের দিন এবং প্রতি রবিবারে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী মন্দিরে পূজা দিতে আসেন। দেবীর বর্তমান পূজারী শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

মহোৎসব

গোপীনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথি হইতে ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত তিনদিন-ব্যাপী সাড়ম্বরে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে শিব পূজার জন্য নির্দিষ্ট একটি আটচালায় এই মহোৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী একাদশী তিথিতে কালিদহ গ্রামের জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির আরাধ্য গৌরাঙ্গদেবের মূর্তি এই গ্রামে আনিয়া উল্লিখিত আটচালায় সুসজ্জিত মণ্ডপের উপর স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশী তিথি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী যথারীতি পূজা ও ভোগ এবং দ্বাদশী তিথি হইতে অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন ও অন্নমোহৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌরাঙ্গদেবের কীর্তনরত দণ্ডায়মান পূর্ণাঙ্গ মূর্তিটি দারুময়। উৎসবান্তে গৌরাঙ্গদেবের মূর্তিটি পুনরায় কালিদহ গ্রামে লইয়া যাওয়া হয়। মহোৎসবের দিন পূজা ও মানত স্বরূপ চিড়া, দধি ও মিষ্টান্ন সহযোগে প্রায় তিনশত "মালসা ভোগ" দেওয়া হয়। মহাপ্রভুর নিকট উক্ত মালসা ভোগ নিবেদন করিয়া পরে সমবেত যাত্রী ও ভক্তগণের মধ্যে উহা প্রসাদরূপে বিতরণ করা হয়। এই দিন সায়ংকাল হইতে অন্নসত্র মহোৎসব আরম্ভ এবং গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই উৎসব চলে। অন্নসত্র উৎসবে জাতি-ধর্মনির্বিশেষে সকলেই অংশ গ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষে প্রায় বারো-তেরো মণ চাউল এবং তদুপযোগী ডাল ও শাকসব্জী রন্ধন করিয়া বিতরণ করা হয়। আশে-পাশের গ্রামাঞ্চলের লোকেরাও উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবের যাবতীয় ব্যয় গ্রামবাসীগণের সমবেত সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

উৎসবের প্রধান সেবায়েত মাহিষ্য সম্প্রদায়ভুক্ত। পূজারী উৎকলবাসী ব্রাহ্মণ, পদবী মিশ্র এবং গোত্র কপিঞ্জল।

রতনমালাদেবীর পূজা ও গাজন উৎসব

রতনপুর গ্রামে টালির চালাযুক্ত একটি পাকা দেবালয়ে ভৈরব মহাকালের উপর দণ্ডায়মানা দ্বিভুজা রতনমালাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর দক্ষিণ হস্তে খড়্গ এবং বাম হস্তে সুধাভাণ্ড। দুই পাশে দুইটি ব্যাঘ্র এবং বাম পার্শ্বে ভৈরব ও বিজয়া মূর্তি আছে।

নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয়—

মহাপীঠ রতনমালা যোগিনীগণ বেষ্টিতম্।
দ্বিভুজম রক্তবস্ত্রাঙ্ক নানা রত্ন বিভূষিতাম্॥

বাম পার্শ্বে ভৈরবাঙ্ক দক্ষিণেচ ষড়ানন।
এবং ধাতা জগতমাতা ওঁ মহাকালী নমঃস্তুতে॥

প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে রতনমালা দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য সংক্রান্তির পাঁচ দিন পূর্ব হইতেই উৎসব শুরু হয় এবং ১লা বৈশাখ শেষ হয়। উৎসবের কয়দিন সাড়ম্বরে দেবীর যথারীতি পূজা অর্চনা হইয়া থাকে। সংক্রান্তির দিন এই গ্রামে অপর একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবের গাজনের সহিত রতনমালাদেবীরও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গাজন উপলক্ষে দেবার মন্দিরের সম্মুখে ভক্তদের "ঝাঁপ" অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ত্রিশ হাত উচ্চ একটি বাঁশের মাচার উপর হইতে ভক্তরা নীচে ঝাঁপ দিয়া পড়েন। ১লা বৈশাখ দেবীর নিকট একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসবে পাইকবাড়, গোবর্দ্ধনপুর, হরিণাগোচ, নস্করপুর প্রভৃতি আশেপাশের গ্রামের লোকজন যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। কথিত আছে শ্রীমন্ত সদাগর বাণিজ্য যাত্রাকালে একদা রতনমালা দেবী দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। সেই সময়ে দামোদর নদ রতনমালাদেবীর মন্দিরের ঠিক পূর্ব পাশ দিয়া প্রবাহিত ছিল। বর্তমানে ইহা প্রায় দুই মাইল দূরে সরিয়া গিয়াছে।

রতনমালাদেবীর নিত্য পূজা হয়। বর্ধমানের মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত প্রায় দেড়শত বিঘা নিষ্কর জমির আয় হইতে দেবীর নিত্য পূজাদি সম্পন্ন হয়। বার্ষিক উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া পূজার চারদিন এবং কার্তিক পূর্ণিমাতে সাড়ম্বরে রতনমালাদেবীর পূজা হইয়া থাকে। মন্দির হইতে প্রতিদিন ভোরে এবং সন্ধ্যায় দামামা বাজাইয়া 'নিশান' দেওয়া হয়—বহুদূর হইতে এই দামামার ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

দেবীর মন্দিরে ভক্তরা অনেকে রোগ-ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য "হত্যা" দিয়া থাকেন। শোনা যায় "হত্যা" দিয়া অনেকে সুফলও পাইয়াছেন। মনস্কামনা পূর্ণ হইলে ভক্তরা দেবীর নিকটে ছাগ বলি দিয়া থাকেন।

দেবী মন্দিরের পূর্বদিকে প্রায় পাঁচ বিঘা পরিমাণ স্থান জুড়িয়া রতনমালাদেবীর নামে উৎসর্গকৃত একটি দীঘি আছে। এই দীঘির জলকে গ্রামবাসীরা অতি পবিত্র জ্ঞান করেন। কিংবদন্তী আছে পূর্বে এই গ্রামে কোন গৃহস্থের ঘরে কাজকর্ম উপলক্ষে অতিরিক্ত বাসন-পত্রাদির প্রয়োজন হইলে দীঘির পাড়ে পান-সুপারি দিয়া মানত করিলে প্রয়োজনীয় বাসনপত্র পাওয়া যাইত এবং প্রয়োজন শেষ হইলে উক্ত বাসনপত্র দীঘিতে নিক্ষেপ করা হইত।

রথযাত্রা

বাগাণ্ডা গ্রামে প্রতি বৎসর ধুমধামের সহিত রথযাত্রা উৎসব পালন করা হয়। তবে উৎসবটি আষাঢ় মাসের রথযাত্রার নির্দিষ্ট তিথির পরিবর্তে আশ্বিন মাসের বিজয়া দশমীর পরের দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মাত্র পঁচিশ বৎসর পূর্বে অমৃতশাল গ্রাম নিবাসী শ্রীচকুরাম মণ্ডল নামে জনৈক ব্যক্তি উৎসবটির প্রচলন করেন।

উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শারদীয়া একাদশী তিথি হইতে সপ্তাহকালব্যাপী জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের যথারীতি পূজা করা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ। উৎসবের দিন সন্ধ্যায় জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের বিগ্রহ রথে স্থাপন করিয়া রথ টানা হয় এবং সাতদিন পর পুনরায় উল্টারথ টানা হয়। কারুকার্য খচিত কাষ্ঠ নির্মিত রথটি প্রায় বিশ ফুট উচ্চ এবং দেখিতে খুবই সুন্দর। ইহার চারিদিকের গাত্রে নানা দেব-দেবীর মূর্তি খোদিত আছে। স্থানীয় পঞ্চু মিস্ত্রী নামে জনৈক ছুতার রথটি নির্মাণ করেন।

উৎসবটি সর্বজনীন এবং উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের বহু নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন।

জেলা ঃ হাওড়া

থানা ঃ শ্যামপুর

মেলা বিবরণী

আক্ষিন স্নানের মেলা

সীতাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে আক্ষিন স্নান ও দেওয়ান পীরের উৎসব উপলক্ষে দামোদর নদী তীরস্থ হাট সংলগ্ন ধানজমিতে, নদীর বাঁধের উপর ও তাহার পাদদেশে মোট প্রায় তিন চার বিঘা ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

শ্যামপুর থানার প্রায় সমস্ত ইউনিয়ন হইতে এবং বাগনান থানার চন্দ্রভাগ, বাঁটুল, বেলাপুর এবং উলুবেড়িয়া থানার চণ্ডীপুর, হাটগাছা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

শ্যামপুর থানা হইতে প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা, মাটির তৈজসপত্র, মনিহারী দ্রব্যাদি এবং লোহার তৈয়ারী কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, উলুবেড়িয়া থানা হইতে শাকসব্জী, বাগনান থানা হইতে শাকসব্জী, শাখা ও পুতুল প্রভৃতি প্রতি বৎসর মেলায় আমদানী হইয়া থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

নিম্নে প্রত্যক্ষদর্শীর একটি বিবরণী দেওয়া হইল ঃ

এই বৎসর মেলায় মোট প্রায় তিন শত কুড়িটি হইতে পঁচিশটি দোকানপাট বসে। উহার মধ্যে শতকরা প্রায় পঁয়ষট্টিটি দোকান খোলা জায়গায় বসে, ফেরিওয়ালা ছিল প্রায় পঁচিশজন।

সমস্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রার দোকান সতেরটি, তেলেভাজার দোকান পঞ্চাশটি, রেষ্টুরেণ্ট দুইটি, চা-পান-বিড়ির দোকান দশটি, মনিহারী দোকান সাঁইত্রিশটি, মিল ও তাঁতের জামা-কাপড়, লুঙ্গি গামছা-মশারী প্রভৃতির দোকান বারোটি, লোহার বাসনকোসন, দাউলী, কাস্তে, কাটারী, বঁটি, জালের কাঁটা, খুন্তি, নারিকেল কুরুনি, হাতা, তেলের পলা, নরুন, ছুরি, সোন্না, মাছধরার কাঁটা প্রভৃতির দোকান পঁচিশটি, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা, কুলা, বাগী, ধুচুনী, চ্যাঙ্গারী, ধামা, চুবড়ী প্রভৃতির দোকান চার-পাঁচটি, মাটির হাঁড়ি-কুড়ি ও খেলনার দোকান বাইশটি ও পুতুলের দোকান নয়টি ছিল। বেত ও বাঁশের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রীর দোকান শ্যামপুর থানার আমড়াদহ ইউনিয়ন হইতে এবং হাঁড়ি-কুড়ি খেলনা ও পুতুলের দোকান বাগনান থানার বাঁটুল ইউনিয়নের কানাইপুর গ্রাম ও আমড়াদহ হইতে আসিয়াছিল। উল্লিখিত ইউনিয়নগুলি হইতে প্রতি বৎসরই বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। ইহাভিন্ন অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে ছিল মাদুরের দোকান, মশলার দোকান, জুতার ও ফটোগ্রাফের দোকান এবং শাখারী দোকান দশটি, আলতা-পাতা, বাতাসা প্রভৃতি পূজার ডালার দোকান উনিশটি, কাঁচা শাকসব্জি ও ফলের দোকান প্রায় সাতটি।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হিসাবে নাগরদোলা ম্যাজিক, (আমড়াদহ ইউনিয়নস্থ নওদা গ্রামের কুশধ্বজ মহাশয়ের ছেলের দল) চরকী, লটারী ইত্যাদি ছিল। ইহাভিন্ন দেওয়ান সাহেব পীরের পুকুর ঘাট সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে হরিনাম সংকীর্তনের একটি দল ছিল। ঘাটের ধারে একটি সাবিত্রী-সত্যবানের মূর্তির নিকট এয়োস্ত্রীদের পরস্পরের সহিত সিন্দুর বিনিময় করিতে দেখা যায়।

মেলাটি উৎসবের দিন প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত চলে। মেলায় সারাদিনে মোট প্রায় পঞ্চাশ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী বলিয়া অনুমিত হয়। বেলা বারোটার পর হইতে মেলায় অসম্ভব ভীড় দেখা যায়। বারোটা হইতে পাঁচটা পর্যন্ত সর্বক্ষণ প্রায় পনর হাজার যাত্রীর ভীড় থাকে। যাত্রীদের মধ্যে মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোকই বেশী। মেলায় পানীয় জলের একান্ত অভাব দেখা যায়। যাত্রীরা যে পুষ্করিণীতে স্নান করেন সেই পুষ্করিণীর ঘোলা জলই পান করিয়া থাকেন। এবৎসর আমড়াদহ ইউনিয়নের রাজীবপুর গ্রামের "অগ্রণী সঙ্ঘ" পানীয় জল সরবরাহের শুভ প্রচেষ্টা করিয়াছে, তবে তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই

অকিঞ্চিৎকর। যাত্রীদের মধ্যে কলেরা ও বসন্তের প্রতিষেধক টীকা দিবার ব্যবস্থা নাই।

পূর্বের তুলনায় বিগত ত্রিশ বৎসর যাবত মেলাটির জাঁকজমক ক্রমেই বাড়িতেছে এবং লোক সমাগমও বেশী হইতেছে। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে জন-সমাগম অনেক বেশী হইয়াছে।

একদিনের মেলায় আনুমানিক প্রায় অর্ধ লক্ষাধিক টাকার কেনাবেচা হয় এবং বিক্রেতাগণের নিকট হইতে প্রায় পাঁচশত টাকা খাজনা হিসাবে আদায় করা হয়। দেখা যায় মেলার শেষে অধিকাংশ কারবারীরা তাহাদের সমস্ত দ্রব্যসম্ভার বিক্রয় করিয়া শূন্য হস্তে ফিরিতেছে। মেলায় তেলেভাজা ও জিলাপী সর্বাধিক বিক্রয় হয়। চন্দ্রভাগা ইউনিয়নের হরিনারায়ণ গ্রামের জনৈক কাঁচা আনাজ ব্যবসায়ী শ্রীতিনকড়ি পাল মহাশয় তিন শত পঁচিশ টাকার উপর কাঁচা আনাজ এবং খাজুরেড়িয়া হাটের জনৈক মিষ্টি বিক্রেতা শ্রীঅজিত নস্কর মহাশয় একাই মেলায় প্রায় এক হাজার টাকার মিষ্টি বিক্রয় করেন বলিয়া জানিতে পারিলাম।

দেওয়ান সাহেব পীরের বেদীটি দামোদর নদীর কূলে অবস্থিত হওয়ায় উহা ক্রমাগত ভাঙ্গিয়া নদীবক্ষে নিমজ্জিত হইতেছে। ইহা ছাড়া মেলাটির সুষ্ঠু পরিচালনার বন্দোবস্ত না থাকায় যাত্রীদের নানারূপ কষ্টভোগ করিতে হয়।

আবির্ভাব বা তিরোভাবের মেলা
(শ্রীচৈতন্যদেব)

পিছলদহ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোল পূর্ণিমা তিথিতে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে প্রধানতঃ কয়েকটি ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, জামা-কাপড়ের দোকান এবং বই-ছবি ও মাটির পুতুলের দোকান বসিয়া থাকে। বিক্রেতারা স্থানীয়।

গঙ্গাপূজার মেলা

ডিঙ্গাখোলা গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তারিখে গঙ্গাপূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

শ্যামপুর, বানেশ্বর, সাতবেড়িয়া, বেলড়ি, নবগ্রাম, প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট ছয়-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

উপরোক্ত ইউনিয়ন হইতে বিক্রেতারাও প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং ত্রিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। উহার মধ্যে প্রায় চল্লিশটি দোকান খোলা জায়গায় বসিয়া থাকে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

সমস্ত দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কাঁচের ও মাটির বাসনপত্রের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কাস্তে, নীড়ানি, কাটারী প্রভৃতি কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান এবং বানেশ্বরপুর ইউনিয়ন হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি দোকান মেলায় আসে। ইহাছাড়া কয়েকটি ঔষধপত্রের ও বই-ছবির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রাভিনয়, থিয়েটার, কবিগান ও জলসার আয়োজন করা হয়। কলিকাতা হইতে পেশাদারী যাত্রাদল আসে এবং মনমোহনী ও মণিদার কবি গান হয়। গ্রামে একটি থিয়েটারের দল আছে। মেলায় জুয়া ও লটারী খেলা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

ক্ষীরিশবেড়িয়া গ্রামে স্বয়ম্ভূনাথ শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, তৈয়ারী জামা-কাপড়ের দোকান, শিল্প সামগ্রী ও বই-ছবির দোকান দেখিতে পাওয়া যায়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সিনেমা প্রদর্শনী, সার্কাস্ ও যাত্রাভিনয় হয় এবং জুয়া খেলা চলে।

পুরুলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষে কালীনাথ শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী দেবোত্তর প্রায় এক কাঠা জমির উপর একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় বানেশ্বরপুর, শশাটি, ডিহি মণ্ডলঘাট, শ্যামপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় চার-পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের সংখ্যা প্রায় সমান।

বিক্রেতাগণ স্থানীয়। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান এবং স্থানীয় ডোমদের তৈয়ারী ধামা, কুলা ও চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কপাটি খেলা প্রতিযোগিতা, যাত্রাভিনয়, কবিগান, জলসা এবং নীলপূজার রাত্রিতে শিব ও শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া রচিত "কালীনাচ" ও চৈতালী সঙ্ঘের "বেষ্টনী নাচ" হইয়া থাকে। যাত্রাভিনয়ের জন্য পেশাদারী যাত্রার দল আনা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

মরশাল গ্রামে সম্প্রতি গ্রামবাসীদের উদ্যোগে শারদীয়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে গ্রামের হাটের মধ্যে একদিনের জন্য একটি মেলা বসিতেছে।

মেলায় শ্যামপুর থানার অধীন বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে লোকজন আসিয়া থাকেন। বাজারে স্থায়ী দোকানপাট ব্যতীত মেলা উপলক্ষে কয়েকটি ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী শিল্পসামগ্রী দোকান ও ঔষধপত্রের দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গ্রামের যাত্রাদল কর্তৃক থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

বিশালাক্ষীপূজার মেলা

নস্করপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে বিশালাক্ষীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় দশবিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। উক্ত জমির ছয় বিঘা দেবোত্তর এবং বাকী অংশ সাধারণের। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মেলায় মোট প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদিগের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক।

মেলায় দেড় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং প্রায় পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকান খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ শ্যামপুর ও বাগনান থানার বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে এবং মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানা হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, কাটা কাপড় ও তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রীর দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকান, তালপাতার পাখা এবং বই-ছবির দোকান থাকে। ইহাছাড়া চা-পান-বিড়ির দোকান, ফলের দোকান ও অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, কবিগান, জলসা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামে একটি যাত্রাদল আছে।

ব্রহ্মাপূজার মেলা

নাউল গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় ব্রহ্মাপূজা উপলক্ষে গ্রামের হাটতলায় একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁয়ষট্টি বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় নাকোল, শশাটী, বেনাপুর, চাঁদভোগ, আমড়াদহ প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় ছয়-সাত শত নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

হাটের স্থায়ী দোকানপত্র ব্যতীত কয়েকটি ময়রা-তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির ও লোহার বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা, কুলা, চ্যাঙ্গারী প্রভৃতির দোকানপাট বসিয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

রতনমালাদেবীর গাজনের মেলা

রতনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রতনমালার গাজন উৎসব উপলক্ষে দেবীর মন্দির সম্মুখস্থ আটচালায় ও মন্দিরের চারিপাশে দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

নাকোল, শশাটি, শ্যামপুর, খাড়ুবেড়িয়া, বেড়ালী, চন্দ্রভাগ প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় আট হইতে দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। নারী ও পুরুষের সংখ্যা প্রায় সমান।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় ত্রিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজা দোকানের সংখ্যাই বেশী। অন্যান্য দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী বিবিধ শিল্প সামগ্রীর দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাগরদোলা, পুতুলনাচ এবং যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

রথযাত্রার মেলা

বাগাণ্ডা গ্রামে প্রতি বৎসর শারদীয়া দশমীর পর একাদশী তিথিতে রথযাত্রা উপলক্ষে প্রায় পাঁচ-ছয় বিঘা পরিমাণ জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঁচিশ বৎসরের প্রাচীন।

ধূলসিমলা, কালীনগর, হাটগাছা, নবগ্রাম প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং নৌকাযোগে ডায়মণ্ডহারবার হইতে মেলায় মোট প্রায় আট-দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে তপঃশীল সম্প্রদায়ভুক্ত লোকের সংখ্যাই বেশী বলিয়া মনে হয়।

মেলায় মোট প্রায় আশীটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে প্রায় অর্ধেক খোলা জায়গায় বসে। উলুবেড়িয়া, বিড়লাপুর, বজবজ, চড়িয়াল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মেলায় আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলাটি বাগাণ্ডা বাজারের নিকট বসে বলিয়া মেলা উপলক্ষে বাজারের স্থায়ী বিক্রেতাগণ অতিরিক্ত পণ্য সম্ভারে নিজ নিজ দোকান সজ্জিত করেন। ইহা ভিন্ন মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির তৈজসপত্র এবং লোহার তৈয়ারী কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, হাকিমী ঔষধপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান ও শিল্প সামগ্রীর দোকানপাট বসে। অন্যান্য দোকান পাটের মধ্যে চা-পান-বিড়ির দোকান ব্যতীত চাউল, পাট এবং মাছ ও হাঁস-মুরগীর বেচাকেনা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামেই একটি যাত্রাদল আছে।

শীতলাপূজার মেলা

শ্যামপুর গ্রামে শীতলাপূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে পনেরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারীর মেলায় আসিয়া থাকেন। মেলার ময়রা ও তেলেভাজার দোকান,

মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, শিল্পসামগ্রী ও বই-ছবির দোকান বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, ও যাত্রাভিনয় হয় এবং জুয়া খেলা চলে।

সরস্বতীপুজার মেলা

কমলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় এক একর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় বিশ বৎসরের প্রাচীন এবং উৎসবের দিন বিকাল হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত চলে। কমলপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত সমস্ত গ্রাম হইতে এবং ডিহি মণ্ডলগ্রাম, বানেশ্বরপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ শ্যামপুর থানার অন্তবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে মনিহারী এবং খাবারের দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, কয়েকটি কারিগরী যন্ত্রপাতির দোকান ও কাঁচাআনাজের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী, পুতুলনাচ, জলসা, যাত্রাভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করা হয়। প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে পেশাদার যাত্রাদল আসে।

জেলা : হাওড়া

থানা : বাগনান

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : পশ্চিম বাইনান।

৯।১,১৮৫'৭১।৮২৯।৪,৫০৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, কুমার, কামার, জেলে, ধোপা, নাপিত, তেলি, তিয়র, দুলে, বাগদী, কেওরা, তামালি, মুচি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে দামোদরের বাঁধের উপর দিয়া রিক্সায় অথবা পাল্কী করিয়া গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানকালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ১২০৯ সনে গ্রামে মহামারীরূপে কলেরা দেখা দেওয়ায় ঘিংটি শিবপুর নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ গ্রামের শ্মশানে পঞ্চমুণ্ডির আসন স্থাপন করিয়া শ্মশান-কালীপূজার প্রচলন করেন। সেই সময় হইতে গ্রামের হিন্দুগণ চাঁদা তুলিয়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শ্মশানকালীপূজা করিয়া থাকেন।

(ঙ) শশ্মানকালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। বাংলা ১২০৯ সন হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে হট্টেশ্বর শিব, পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী প্রভৃতি দেব-দেবীর স্থান আছে।

শ্রীসৈয়দ আবুল কাসেম, প্রধান শিক্ষক,
শশীভূষণ প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পশ্চিম বাইনান, হাওড়া।

২। গ্রাম : কল্যাণপুর। ১৪।৬০৯'৫১।৬০৫।৩,৭২৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কাঁসারী, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, তেলি, তাঁতী, মালি, ধোপা, নাপিত, মুচি, ডোম, হাড়ী, দুলে, বেদিয়া ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন দেউলটি হইতে রিক্সা অথবা পাল্কীযোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব, চৈত্র মাসে শীতলাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব কালীঞ্চা শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। ইহা ভিন্ন চান্দ্র মাস অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব পালিত হয়।

(ঙ) কালীঞ্চা শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে কালীঞ্চা শিবের মন্দির ব্যতীত শীতলা, মনসা, কল্যাণচণ্ডী, ওলাইচণ্ডী, পঞ্চানন্দ, জরাসুর, দক্ষিণরায়, ধর্মরাজ প্রভৃতি দেবদেবী আছেন। ধর্মরাজের পূজারী পণ্ডিত পদবীধারী জনৈক ডোম। প্রতি বৎসর শারদীয়া উৎসবের সময় কল্যাণচণ্ডীর বিশেষ পূজা হয়।

শ্রীরথীন্দ্র নাথ রায়,
গ্রাম ও পোঃ কল্যাণপুর,
হাওড়া।

৩। গ্রাম : সাঁওতা (মৌজা : মেল্লক)।

২০।৫৭৫'৫৯।৪৭০।২,৭৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, স্বর্ণবণিক, ছুতার, তাঁতী ও তেলি। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে দেউলটী রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। জেলাবোর্ডের নির্মিত শরৎ চ্যাটার্জী রোড এবং পি, ডব্লিউ, ডি-র বাঁধ ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় নাম-সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাচতুর্দশী তিথিতে

সাবিত্রীপূজা, আশ্বিন মাসে সিংহবাহিনীপূজা এবং পৌষ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

মহোৎসবটি বাংলা ১৩০৬ সন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। একটি মন্দিরের মধ্যে মঞ্চের উপর স্থাপিত তুলসী গাছের নীচে মহোৎসব উপলক্ষে মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার পার্ষদগণের সাড়ম্বরে পূজা হয়। সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবে শ্রীমদ্ভগবৎ পাঠ ও তাহার ব্যাখ্যা, কথকথা ও কীর্তন গান প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সমাপ্তির দিন নগর সংকীর্তন ও মহাপ্রভুর মালসাভোগ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বহু লোক ইহাতে যোগদান করেন।

সাবিত্রী পূজাটি বাংলা ১৩৪১ সন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের লোকজন যোগদান করেন এবং যথারীতি সাবিত্রী পূজা দিয়া দেবীর নিকট উৎসর্গীকৃত সিঁদুর এয়োস্ত্রীগণ মাথায় ধারণ করেন। উৎসব উপলক্ষে সাবিত্রী সত্যবান ও যমদূতসহ ধর্মের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করা হয়।

(ঙ) সাবিত্রীপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। বাংলা ১৩৪২ সন হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শিব, চণ্ডী, ষষ্ঠী ও বিশালাক্ষী প্রভৃতি দেবদেবী আছে। তাহাছাড়া গ্রামে সিংহবাহিনীর মূর্তি ও শীতলার তাম্রঘট প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়,
সাঁওতা, হাওড়া।

৪। গ্রাম : বাঁকুরদহ। ৩০।৩২০'৮৫।১৪৬।৮৪৬

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য ও মুসলমান।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথে দেউলটি রেলস্টেশন হইতে জেলাবোর্ডের বাঁধ ও রূপনারায়ণ নদীর বাঁধের উপর দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে। তাহাছাড়া ধোড়ামাম্না গ্রাম হইতে নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নামকীর্তন মহোৎসব এবং চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং স্থানীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। উৎসবটি প্রায় বিশ বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে প্রতিষ্ঠিত একটি শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসবটি অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা ও মদনগোপাল (রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি) আছে। মদনগোপাল, শীতলা এবং মনসার প্রস্তর মূর্তি। মনসা মূর্তিটি সম্পূর্ণ সিঁন্দুর রঞ্জিত। শীতলা মূর্তির মাথায় একটি পিতলের মুকুট আছে। বৈশাখ মাসে মনসার বিশেষ পূজা হয়। ইহাছাড়া ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিষ্ঠিত কালীর মৃন্ময়মূর্তি ও শিবলিঙ্গ আছে।

গ্রামে মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি পাকা মসজিদ এবং মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত হিন্দুগণের একটি দেবালয় আছে।

শ্রীহৃষিকেশ রায় চৌধুরী,
গ্রাম : দেউলটি,
পোঃ ওড়ফুলী, হাওড়া।

৫। গ্রাম : পাতিহাল। ৩৭।২৮৩'৮১।১৮০।১,০৭৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, গোয়ালা, ধোপা, নমঃশূদ্র, তিয়র ও মুসলমান।

গ্রামে চারটি পাড়া অছে। যেমন—নমঃশূদ্রপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, বৈরাগীপাড়া, মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান

হইতে রিক্সা বা গরুরগাড়ীযোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসের অমাবস্যাতিথিতে দুইদিন-ব্যাপী কালীপূজা, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমীতিথিতে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহাছাড়া বৎসর যে-কোন সময় গ্রামে চারদিনব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব হয়। শেষের দিন মহাপ্রভুর ভোগ ও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(ঙ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি ঘরে শিব ও শীতলা অছে। ইহাভিন্ন, বড়কান নামে জনৈক পীরের সমাধি আছে—এই সমাধিস্থানে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে মানত করিয়া থাকেন।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ দণ্ডপাঠ, শিক্ষক,
পাতিনান অবৈতনিক বিদ্যালয়, হাওড়া।

৬। গ্রাম: বাঙ্গালপুর।

৪৩।৬৮৪'৭১।৫৮৭।৩,৩৭৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কামার, নাপিত, জেলে, মালী, কাওরা ও বাগ্দী।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও দিনমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান। "বাগনান-ফতেপুর রোড" দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে। দামোদর নদী দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) গ্রামে বৈশাখী পূর্ণিমায় রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষপার্বণ এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও নামকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

ইহাছাড়া গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের একটি কালীপূজা ও দুইটি দুর্গাপূজা এবং জেলে ও তিয়র সম্প্রদায় কর্তৃক যথাক্রমে গঙ্গাপূজা ও মাকালপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের তিনটি পাকা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগাত্রগুলিতে অতি সুন্দর কারুকার্যখচিত। তাহাছাড়া বিশালাক্ষী, শীতলা, ওলাবিবি, দক্ষিণরায়, ধর্মরাজ ও পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছে। ধর্মরাজের সেবায়েত বাগ্দী সম্প্রদায়-ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি।

অগ্রহায়ণ মাসে শীতলার স্থানে গ্রামের স্ত্রীলোকগণ শীতলার পূজা ও বনভোজন উৎসব করেন এবং 'ওলাবিবি'র স্থানে মুড়ি ভিজাইয়া খান। ওলাবিবির সেবায়েত জনৈক মুসলমান। ইহা ব্যতীত পয়লা মাঘ গ্রামের কৃষকেরা মনসাপূজা করেন এবং প্রচুর মাদক দ্রব্য পান করিয়া দলবদ্ধভাবে আনন্দোৎসব করেন। এই উৎসবকে "আখ্যান" বলা হয়।

শ্রীজিতেন্দ্র নাথ ঘোষ, শিক্ষক,
গ্রন্থগারিক, রবীন্দ্র পাঠাগার,
বাঙ্গালপুর, হাওড়া।

৭। গ্রাম: আগুন্সী ভুঁইয়ারা।

৪৬।২২১'৮৫।২৯৩।১,৫৮৩

(ক) হিন্দু, মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা ধরিয়া হাটাপথে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গাপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসের ভীমএকাদশী তিথিতে দুইদিনব্যাপী নামকীর্তন মহোৎসব, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্ধাত্রী ও গঙ্গাপূজা ব্যক্তি-বিশেষের এবং অন্যান্য উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা আষাঢ় মাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে প্রায় দশদিন-ব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বুড়াশিবের একটি পাকা মন্দির এবং টিনের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে শীতলাদেবী আছে। শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং শীতলামন্দিরে ঘট স্থাপিত আছে। ইহাভিন্ন গ্রামে পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

গ্রাম সম্পর্কে শোনা যায় যে, অতি প্রাচীনকালে এই অঞ্চল বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। প্রথমে ভূঁইয়া, চক্রবর্তী, জানা, মান্না, সী, কুতি, ধোপা, নাপিত ও মুসলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কয়েকটি পরিবার এই গ্রামে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। ভূঁইয়ারা ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। এই কারণে এই অঞ্চলের নাম হয় 'ভূঁইয়াপাড়া'। ভূঁইয়াপাড়া কালক্রমে 'ভুঞেড়া' নামে পরিচিত হয়। পূর্বে ভূঁঞেড়া, শিঞেড়া, আগুনসী, বেড়, পুনলি, দত্তপাড়া, ও পটীভূঞেড়া—এই কয়েকটি গ্রাম লইয়া 'ভূঞেড়া' গ্রাম ছিল। পরবর্তীকালে ঐ সকল গ্রাম বৃহৎ ভুঞেড়া গ্রাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পৃথক নামে স্বতন্ত্র গ্রামে পরিণত হইয়াছে।

শ্রীনিমাই চাঁদ জানা, শিক্ষক,
বাঙ্গালপুর ইউনিয়ন তরুণসঙ্ঘ লাইব্রেরী, ভূঞেড়া,
পোঃ আগুনসী, হাওড়া।

৮। গ্রাম : বীরকুল। ৬৯।৩৬৭'১৩।৩০৯।১,৫০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বৈরাগী, গোয়ালা, মালাকার, বারুই, কাঁসারী, ধোপা, নাপিত, জেলে, কাওরা, বাগদী, রবিদাস এবং গোপ।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন বাগনান হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে। গ্রামের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদ দিয়া নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের ২০শে হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত চণ্ডীর গাজন, পৌষ মাসের যে-কোন মঙ্গলবার রক্ষাকালীপূজা এবং চৈত্র মাসের যে-কোন তিথিতে তিনদিনব্যাপী মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনসাপূজাটি গ্রামের রবিদাস সম্প্রদায়ের এবং অপর পূজা দুইটি সর্বজনীন। উল্লিখিত তিনটি উৎসবই প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

ইহাভিন্ন গ্রামের গোপ সম্প্রদায়গণ প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ হইতে তিনদিনব্যাপী ভগবতী পূজা করিয়া থাকেন।

(ঙ) রক্ষাকালীপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন।

(চ) ×

শ্রীবিহারী লাল ঘোষ, সম্পাদক,
বীরকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়,
গ্রাম : বীরকুল, হাওড়া।

। গ্রাম : খালোড়। ৭৪।৪৫৩'৬৩।৫৬১।৩,৪৯০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, বারুজীবি, স্বর্ণবণিক ও ধোপা।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বাগনান হইতে শ্যামপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটরবাস চলাচল করে। ইহা ভিন্ন 'বাগনান-খালোড়', 'খালোড়-ঘোড়াঘাট' এবং 'বাগনান-মুগকল্যাণ' প্রভৃতি রাস্তা দিয়াও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দিরে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ও পৌষ মাসে সাড়ম্বরে কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাদ্র মাসের পূজায় দেবীর নিকট তাল এবং পৌষ মাসের পূজায় দেবীর নিকট মূলা মানত দেওয়া হয় বলিয়া পূজা দুইটি যথাক্রমে তালকালী ও মুলাকালীপূজা নামে এ অঞ্চলে খ্যাত। পূজা দুইটি

সর্বজনীন এবং প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী ভট্টাচার্য।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে ও পৌষ মাসে মেলা বসে। মেলা দুইটি একদিন স্থায়ী হয় এবং উভয় মেলাই প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি দেবালয়ে নিমকাঠ নির্মিত কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূর্বে একটি পাকা মন্দিরে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলা ১৩৪৬ সনে ঐ মূর্তি হঠাৎ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বর্তমান মূর্তিটি নির্মাণ করিয়া দেন এবং গ্রামবাসীর উদ্যোগে বর্তমান দেবালয়টি নির্মিত হয়।

শ্রীতারা সাঁতরা,
গ্রাম: নবাসন, পোঃ বাগনান,
হাওড়া।

১০। গ্রাম: বৈদ্যনাথপুর। ৮৪৷৫২১'২৬৷৫১৮৷২,৯৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কাওরা এবং ডোম। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে। গ্রামটি মাহিষ্য প্রধান।

(খ) কৃষিকার্য ও পান চাষ।

(গ) গ্রামের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে বাগনান রেলস্টেশন। "বাগনান-শ্যামপুর" জাতীয় সড়ক দিয়া মোটরে গ্রামে যাতায়াত করা চলে। গ্রামটির প্রায় এক মাইল পশ্চিমে রূপনারায়ণ এবং প্রায় দেড় মাইল পূর্বে দামোদর নদ প্রবাহিত থাকায় নৌপথে যাতায়াতের সুবিধাও আছে।

(ঘ) গ্রামে অবস্থিত স্বয়ম্ভু বৈদ্যনাথ শিবকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব এবং ১৪ই চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং সন্নিহিত পাঁচ-সাতটি গ্রামের সর্বজনীন উৎসব। এই উৎসব দুইটিতে সমগ্র বাগনান থানার হিন্দুগণ যোগদান করিয়া থাকেন। বৈদ্যনাথ শিবের নিত্য পূজাও হয়।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র-বৈশাখ মাসে আঠারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বৈদ্যনাথ শিবের, গ্রাম্যদেবী চণ্ডীর ও শীতলা দেবীর মন্দির আছে। চণ্ডী ও শীতলার পাষাণ মূর্তি। ইহা ব্যতীত ব্যক্তি-বিশেষের লক্ষ্মী-জনার্দন, কালী, মনসা প্রভৃতি দেবদেবী আছে। গ্রামে একটি অজ্ঞাতনামা পীরের স্থান আছে।

গ্রামে স্বয়ম্ভু বৈদ্যনাথ শিবের অবস্থানহেতু গ্রামটির নাম বৈদ্যনাথপুর হইয়াছে। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে গ্রামটি "ইছাপুর" নামে খ্যাত ছিল।

গ্রামে একটি টেক্‌নিক্যাল স্কুল, সরকার অনুমোদিত একটি সাধারণ পাঠাগার, একটি নৈশ বিদ্যালয় এবং একটি শিশু পাঠাগার আছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র মণ্ডল, সম্পাদক,
বৈদ্যনাথপুর টেক্‌নিক্যাল জুনিয়র হাইস্কুল,
গ্রাম ও পোঃ বৈদ্যনাথপুর, হাওড়া।

১১। গ্রাম: আকুভাগ (মৌজা: রূপসগড়ি)।
৯৩৷৭৬৩'৪৮৷৫২৯৷২,৯৫৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে আঠারটি পাড়া আছে। যেমন—মল্লিকপাড়া, মণ্ডলপাড়া, করাতীপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে বাগনান রেলস্টেশনটি অবস্থিত। গ্রামের নিকট দিয়া মোটরবাস চলাচল করে। চন্দ্রভাগ ইউনিয়নের কাঁচা রাস্তা দিয়াও গ্রামে যাতায়াত করা চলে। গ্রাম হইতে প্রায় দুই মাইল দূর দিয়া প্রবাহিত নদীপথে কেবলমাত্র বর্ষাকালে নৌকায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শুক্লাতিথিতে দুইদিনব্যাপী গ্রামের হিন্দুগণ "পাঁচাল গান" উৎসব করেন। এই উপলক্ষে গ্রাম্য দেবদেবী শীতলা, মনসা, পঞ্চানন্দ, দক্ষিণরায় ও কালীপদ রায়—

এই পঞ্চদেবতার সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের দুইস্থানে উল্লিখিত পঞ্চদেবতার নির্দিষ্ট বাঁধান স্থানে পঞ্চদেবতার ঘট স্থাপিত আছে। উৎসব উপলক্ষে একযোগে ঐ দুইস্থানে পঞ্চদেবতার পূজাদি হইয়া থাকে। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায় চান্দ্রমাস অনুযায়ী ইদ্‌লফেতর, ইদুজ্জোহা, সবেবরাত ও মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। মহরম উপলক্ষে গ্রামের মুসলমানগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া লাঠি, ছুরি খেলিতে খেলিতে দশদিনব্যাপী গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান এবং উৎসব সমাপ্তির দিন গ্রামের প্রান্তে 'কারবালা' নামে পরিচিত একটি নির্দিষ্ট স্থানে সকলে মিলিত হন এবং লাঠি, ছোরা লইয়া নানারূপ ক্রীড়া দেখাইয়া থাকেন। এই ক্রীড়া দেখিতে হিন্দু-মুসলমান বহু লোকের সমাগম হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে পঞ্চদেবতার বাঁধানো স্থান ব্যতীত একটি ধর্মরাজের স্থান আছে। একটি কৃষ্ণবর্ণ পাথর-খণ্ডকে ধর্মরাজ জ্ঞানে প্রতি শনি ও মঙ্গলবার পূজা করা হয়।

শোনা যায় যে, প্রাচীনকালে জনৈক ধনবান জমিদারের অধীনে আকুভাগ, চন্দ্রভাগ এবং রবিভাগ নামে তিনটি পাশাপাশি গ্রাম ছিল। এই জমিদারের তিন পুত্র। অগ্রজের নাম জানা যায় না; তবে অপর দুইজনের নাম যথাক্রমে চন্দ্র ও রবি বলিয়া জানা যায়। কথিত আছে যে, পুত্রদের নামানুসারে উক্ত জমিদার গ্রাম তিনটির নামকরণ করিয়াছিলেন।

আকুভাগ গ্রামের যিনি অধিকারী ছিলেন, তাঁহার আবার সাতপুত্র ছিল। সেই কারণে আকুভাগ গ্রামটি সাতভাগে বিভক্ত হয়। যথা—হরিশপুর, দুন্দী সাঁওতা, বুনিদ সাঁওতা, ডাকুভাগ, পাঁচআনী আকুভাগ, এগার আনী আকুভাগ ও রূপসাগড়ি।

শ্রীপঞ্চানন পণ্ডিত, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ মুগকল্যাণ, হাওড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বাঙ্গালপুর ও আগুন্‌সী ভূঁইয়ারা গ্রাম সংলগ্ন হারপ্‌ (মৌজা নং ৪৫) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা বসে। এ বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ মেলা বিবরণী অধ্যায়-এ লিপিবদ্ধ করা হইল।

জেলা : হাওড়া
থানা : বাগনান

উৎসব বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কল্যাণপুর গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব কালীঞ্জা শিবের গাজন। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ দশদিন ব্যাপী গ্রামে সাড়ম্বরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

কথিত আছে যে, বর্তমানে যে স্থানে শিব মন্দিরটি অবস্থিত পূর্বে ঐ স্থানটি গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। এই গ্রামে বসবাসকারী সুবর্ণবণিক সম্প্রদায়ভুক্ত আঢ্য পরিবারের একটি গাভী প্রত্যহ ঐ গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিয়া একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াইলে আপনা হইতেই গাভীটির বাঁট হইতে দুগ্ধ পড়িতে থাকিত। এই কথা জানাজানি হইবার পর অনুসন্ধান করিয়া ঐ স্থানে একটি শিবলিঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। আঢ্যরা উক্ত শিবলিঙ্গের উপর একটি ছোট মাটির ঘর নির্মাণ করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। পরে বাংলা ১১৭৩ সনে বর্তমান মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটি আটচালা ঘর নির্মিত হয়। এই স্বয়ম্ভূ শিবই গ্রামে কালীঞ্জা শিব নামে খ্যাত। বর্তমানে ইহা গ্রামের সর্বসাধারণের দেবতা।

গাজন উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির নয়দিন পূর্ব হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। উৎসব আরম্ভের পূর্বদিন তিনজন ভক্ত শিবের নামে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণপূর্বক সংযম পালন করেন এবং পরের দিন প্রাতে একটি নির্দিষ্ট পুকুরের পাড়ে শিবপূজা করেন। এই পূজা শেষে একটি মাগুর মাছ বলি দিয়া সন্ন্যাসীগণ গলায় উত্তরীয় গ্রহণ করেন এবং একটি জলপূর্ণ ঘট লইয়া কালীঞ্জা শিবের মন্দিরে স্থাপন করেন। পরে সূর্যার্ঘ ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সন্ন্যাসীরা সকালের পূজা শেষ করেন। এই দিন সন্ন্যাসীগণ নিরম্বু উপবাস থাকেন। মধ্যাহ্নে গ্রামের একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির গৃহে হোম পূজাদি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের পর কালীঞ্জা শিবের নিকট ভোগ নিবেদন করিয়া উক্ত ভোগের কিয়দংশ পূর্ব উল্লিখিত পুকুরে ভাসাইয়া দিয়া সন্ন্যাসীগণ হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন। শিবের নিকট এইরূপ পূজা ও ভোগ নিবেদন চৈত্র সংক্রান্তি পর্যন্ত চলে।

চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিবমন্দিরে সারারাত্রিব্যাপী যথারীতি পূজা ও হোম এবং পরের দিন ভোরে মন্দির প্রাঙ্গণে "হাকুণ্ডা" পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সন্ন্যাসীদের মধ্যে একজনকে অগ্নিবাণ মারিলে ঐ সন্ন্যাসী মৃতকল্প হইয়া পড়েন। তখন তাঁহাকে মন্দিরের মধ্যে শোয়াইয়া সারা অঙ্গে পঞ্চামৃত লেপন করা হয় এবং কিঞ্চিৎ পঞ্চামৃত খাওয়াইয়া দেওয়া হয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ মৃতপ্রায় সন্ন্যাসীর জ্ঞান ফিরিয়া আসে, ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যান্য সন্ন্যাসীগণ উচ্চস্বরে কালীঞ্জা শিবের জয়ধ্বনি করিতে করিতে মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে থাকেন। জ্ঞান ফিরিলে উক্ত সন্ন্যাসীকে মন্দিরের বাহিরে আনা হয় এবং তিনি সুস্থ হইয়া উঠিলে পর মন্দির সম্মুখে সন্ন্যাসীদের "ঝাঁপ" পর্ব আরম্ভ হয়। "কাঁটা ঝাঁপ," "বেতচালা," প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের ঝাঁপ হয়। সন্ধ্যায় সন্ন্যাসীগণ গলা হইতে উত্তরীয় খুলিয়া ফেলেন এবং মন্দিরের শিব পূজার পর উৎসবেরও সমাপ্তি ঘটে।

এই উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন যোগদান করেন। অহিন্দুগণও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। গ্রামে বুড়া পীর সাহেব নামে খ্যাত সৈয়দ করমতুল্লাহ নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির জমিদারী হইতে অদ্যাপিও গাজন উপলক্ষে ভোগ, গামছা ও অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়।

দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে নিরাময়ের জন্য অনেকে শিবমন্দিরে "হত্যা" দিয়া থাকেন। সাধারণতঃ কালীঞ্জা শিবের নিকট সোনার বা রূপার কলিকা, বেলপাতা, খড়ম ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়। শিবের নিত্য পূজা হয়। পূজারী রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গাজন উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এই মন্দিরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে নিকটবর্তী প্রায় চার-

পাঁচটি গ্রামের লোক যোগদান করেন এবং এই উপলক্ষ্যে কীর্তন ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

বাঙ্গালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ২৫শে চৈত্র হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী সাড়ম্বরে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রাচীন এবং সর্বজনীন। পূর্বে এই গ্রাম সংলগ্ন আরো তিনটি গ্রামের সকল সম্প্রদায়ের লোকজন এই উৎসবে যোগদান করিতেন; কিন্তু বর্তমানে এই উৎসব কেবলমাত্র গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

গ্রামে তিনটি সুন্দর পাকা শিবমন্দির আছে এবং প্রতিটি মন্দিরের মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিবলিঙ্গগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই গ্রামে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

উৎসব উপলক্ষে সন্ন্যাসব্রতীগণ প্রত্যহ গ্রামের ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ভোগের জন্য ভিক্ষা সংগ্রহ করেন এবং মনসা, শীতলা, ধর্মরাজ ও দক্ষিণরায় প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবীর স্থানে পূজা ও নাম-গান গাহিয়া বেড়ান। এই সকল দেবদেবীর নিকটও ঝাঁপ হয়।

সংক্রান্তির পূর্বদিন নীলপূজা উপলক্ষে হর-পার্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই দিন "কামিক্ষে" পর্ব পালন করা হয় অর্থাৎ একটি মাছ কাটিয়া উহার রক্ত পূজার ঘটের জলের সহিত মিশাইয়া দেওয়া হয় এবং ঐ রক্ত মিশ্রিত জল একজন সন্ন্যাসী ব্রতীর মাথায় ছিটাইয়া দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। স্থানীয় অঞ্চলের লোকেরা ইহাকে "হাকুণ্ডা" বলেন। হাকুণ্ডায় মূর্চ্ছিত সন্ন্যাসীকে শিবের স্থানে রাখা হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসে ততক্ষণ পর্যন্ত ঢাক-ঢোল বাজান হয়।

গাজন পর্ব উপলক্ষে এই স্থানে আরও কয়েকটি রীতি পালন করা হয়। যেমন, "হেদল্" পর্ব উপলক্ষে মন্দিরের সম্মুখে একস্থানে আগুন জ্বালাইয়া একটি বাঁশের "ভাড়া" অবলম্বন করিয়া ঐ আগুনের উপর সন্ন্যাসীব্রতীদের ঝুল খাইতে হয়। "দশলকি" উপলক্ষে একটি লোহার পাত্রে আগুন রাখিয়া ঐ পাত্রটিকে সন্ন্যাসীব্রতীদের বুকের পাঁজরে একটি লোহার বড়শীর দ্বারা ঝুলাইয়া দেওয়া হয় এবং সেই অবস্থায় তাঁহাদের নৃত্য করিতে হয়। ইহাছাড়া "জিহ্বা-বাণ" "সূতাবাণ" প্রভৃতি পর্ব আছে। জিহ্বাবাণে একটি অর্ধ ইঞ্চি মোটা এবং বিশ ইঞ্চি পরিমাণ লম্বা লৌহদণ্ডকে সন্ন্যাসব্রতীদের জিহ্বার মধ্য দিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয় এবং ঐ দণ্ডটিকে দাঁতে চাপিয়া সন্ন্যাসীরা নৃত্য করিতে হয়। সূতাবাণে একজন সন্ন্যাসব্রতীর পাঁজরের দুই পাশে লম্বা সূঁচ সূতা দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দুই পাশ হইতে দুই ব্যক্তি সূতার অগ্রভাগ দুইটি ধরিয়া থাকেন এবং উক্ত ভক্ত সেই অবস্থায় নৃত্য করিতে হয়।

মনসাপূজা

সাঁওতা গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে মনসা, জরৎকারু ও বাসুকীর সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহা গ্রামের সর্বজনীন উৎসব। বাংলা ১১৪৩ সন হইতে এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে মনসার একটি নির্দিষ্ট স্থান আছে। ঐ স্থানে একটি প্রাচীন মনসা গাছের মূলে উৎসব উপলক্ষে যোড়শপোচারে যথারীতি পূজাদি হইয়া থাকে। আশেপাশের গ্রামের লোকেরা এই উৎসবে যোগদান করেন এবং সর্প ভীতির জন্য মনসাদেবীর পূজা মানত করিয়া থাকেন। পূজা শেষে মনসার প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই স্থানের মনসা বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস।

সাঁওতা গ্রামের মনসাদেবীর সম্পর্কে শ্রীপাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় রচিত "রাখাল মনসার উপাখ্যান" নামক পুস্তিকা হইতে নিম্নে উহা উদ্ধৃত করা হইল:

"সাঁওতা গ্রামের পূর্ব্বদিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে বামনা ডাঙ্গায় উচ্চভূমির উপরিস্থিত নিম ও অশ্বত্থ গাছের মধ্যভাগে মনসা গাছ বিদ্যমান আছেন, পুরাকালে রাখাল বালকগণ মাঠে গরু চরাইত, এবং বৃক্ষলতাদি গুল্ম পরিবৃত্ত জঙ্গলের ছায়ায় ঐ উচ্চ স্থানে আসিয়া দিবাবসানের কুসুম তুল্য প্রফুল্লিত হইয়া তৃপ্তিকর হাস্যে সকলে মিলিয়া বিশ্রাম করিত। মাঝে মাঝে ধানগাছের চারা ছিঁড়িয়া চড়িভাত করিত।

একদিন ঐ আনন্দ অন্ন ভক্ষণের পর সকলে যুক্তি করিল এখানে ঠাকুর তুলবো, আয়, কালীঠাকুর দুর্গাঠাকুর যার যা মনে আসে, সে তাই বলে ফেলে ; কিন্তু সেই কর্তাহীন বালক সভা মণ্ডলে তর্কের সিদ্ধান্ত করিবার কেহই ছিল না। তন্মধ্যে একটি নবীন বয়স্ক বালক বলিল, আমাদের বাড়ী মনসা পূজা হয় সকলে মনসা পূজা করবো আয়। সেখানে আশেপাশে অনেকগুলি ঝুপি বনও ছিল, কিন্তু রাখাল বালকগণের সেই লতাদি পরিবৃত পূর্ব্বদুয়ারী বিশ্রাম মণ্ডপের পাশ্বেই ঐ মনসা গাছ বিরাজ করিতে ছিলেন। গাছটি দেখাইয়া নবীন যুবক বলিল, 'ঐ যেরে একটি মনসা গাছ আছে, সকলে ঐ গাছে মনসা পূজা করবো আয়, ঠাকুরমার মুখে শুনেছি দুধ দিয়ে মনসা পূজো করতে হয়।'

এই বলিয়া সেই বালক অনতিদূরে তাহার গাভীর কাছে গিয়া জলখাবার গেলাস ধুইয়া দুগ্ধ দোহন করিয়া আনিল, অন্যান্য বালকগণ শালুক ফুল তুলিয়া আনিয়া সকলে মিলিয়া সেই মনসা গাছটিতে দুগ্ধ দিয়া স্নান ও ফুল দিয়া একাগ্র মনে মনসা মায়ের পূজা করিল।......

পূজান্তে পাচন বাড়ি হাতে লইয়া কেহ কেহ ধেনু ফিরাইবার জন্য গমনোদ্যত হইল। পার্শ্বেই জঙ্গল গ্রাম্য পথে দৈবক্রমে ঠিক সেই সময়ে পথের উপর দিয়া মাথায় ও কাঁকালে হাঁড়ি লইয়া একটি স্ত্রীলোক যাইতেছিল, তাঁর বলিষ্ঠ গঠন, পরিধানে বিচিত্র বসন, কপালে উল্কি, মস্তকে কেশদাম শোভিত, কানে ও নাকে কনিষ্ঠ অঙ্গুল পরিসর ছিদ্র, গাছের শিকড় দ্বারায় তাহা বন্ধ করা আছে, দুই হস্তে কাঁসার বাউটি ও গালার চুড়ি শোভিত। তদ্দর্শনে বালকগণ তাঁহার নিকট ছুটিয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হাগা তুই কে গা? তোর ঘর কোথা? তোর হাঁড়িতে কি গা? তোদের বাড়ী চড়িভাত হয়? আজ আমরা ফুল দুধ দিয়ে মনসা পূজো করেছি, তোদের বাড়ী মনসা পূজো হয়? স্ত্রীলোকটি ঈষৎ হাঁসিয়া বলিলেন, 'আমিই মনসা, আমার পূজা করেছিস্ বলে তো আমি সন্তোষ হয়ে তোদিকে বলতে এলুম, তোরা এই গাছটিতে ব্রাহ্মণ দ্বারা পূজা করাবি, তাহলে তোদের সাপের ভয় থাকবে না। তৎপরে স্ত্রীলোকটি হাঁড়ি খুলিয়া বাঁশি বাজাইয়া সাপের খেলা দেখাইলেন। তদ্দর্শনে বালকগণ বলিল 'মাতুস কখন মনসা হয়, তাহলে তোর গায়ে কাঁটা নেই কেন? এখন আমাদের জল তেষ্টা পেয়েছে জল দিতে পারিস্?' এই কথা শ্রবণে সেই অসীম শক্তিশালিনী দেবী তৎক্ষণাৎ বালকগণের জলপান নিমিত্ত বংশীর আঘাতে অবনী বিদারণ পূর্ব্বক হংস, কারণ্ডক, চক্রবাক সুশোভিত মৎস্য কূর্ম্ম সমাকীর্ণ সাধুগণ সেবিত নির্ম্মল সলিল সম্পন্ন বিকশিত কমলদলোপ শোভিত জলাশয় প্রস্তুত করিয়া বালকগণকে জল পান করিতে আদেশ করিলেন (বমনা পুকুর)। বালকগণ জলপান করিলে তিনি তখনই হংসের উপর বসিয়া মনসা ঠাকুরানীর রূপ দেখাইয়া স্বীয় প্রভাব মন্দীভূত করিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে অদৃশ্য হইলেন। তাঁহার রূপ দেখিয়া বালকগণ আঁতকাইয়া উঠিল, এবং কেহ কেহ বাড়ীতে সংবাদ দিতে ছুটিল, কেহ বা গোধন রক্ষণে যাইল।

সেইটি পৌষ সংক্রান্তির পূর্বদিন। এই সংবাদ গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল, সেই বাংলা ১১৭৩ সনে গ্রামের প্রধান লোক গোবিন্দ মণ্ডল ছিলেন, তিনি পরদিন বামনা ডাঙ্গায় উপস্থিত হইয়া গ্রামবাসীগণের সমক্ষে সাপুড়ে বেদিনীর আজ্ঞানুসারে সেই পূজিত মনসা গাছটিতে মকর সংক্রান্তির দিন ব্রাহ্মণের দ্বারায় জরৎকার, মনসা ও বাসুকীর পূজা করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তদবধি মণ্ডলের পর মণ্ডলের দ্বারা মার পূজা ঠিক মকর সংক্রান্তির দিনে হইয়া আসিতেছে। প্রবাদ আছে বামনা ডাঙ্গায় রাখাল মনসা।

বাংলা ১১৪৬ সনে এই সংবাদ দেশে বিদেশে প্রচারিত হওয়ায় দলে দলে সাধু সন্ন্যাসীরা মার দর্শনার্থে আসিতেন, কেহ কেহ বা কিছু সময় বসিয়া মার নিকট তপজপ সারিতেন।"

মহরম

কল্যাণপুর গ্রামের মুসলমানগণ প্রতি বৎসর মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন সৈয়দ করমাতুল্লাহ নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই গ্রামে মহরম উৎসবের প্রচলন করেন। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে বীরভূম জেলার

মায়গ্রামের সৈয়দ করমাতুল্লাহ এই গ্রামে আসেন। তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের প্রিয় ছিলেন এবং উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ স্থাপনে সতত সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার উদার হৃদয়তার জন্য কালক্রমে তিনি বুড়াপীর নামে খ্যাত হন। তিনি গ্রামে হিন্দু মন্দিরের পাশে একটি আস্তানা স্থাপন করেন এবং হিন্দুদের উৎসবের সহিত মুসলমানগণের মহরম উৎসব পালনের ব্যবস্থা করেন। বুড়াপীর সাহেবের স্ত্রী-পুত্রগণ এই গ্রামের দুই স্থানে পৃথকভাবে বসবাস করিতেন। এই কারণে এই গ্রামের ঐ দুইস্থান একটি "বড় মহল" ও অপরটি "ছোট মহল" নামে খ্যাত। বুড়াপীরের জমিদারী হইতে হিন্দুদের গাজন উৎসবের এবং মুসলমানদের মহরম উৎসবের ব্যয় বরাদ্দ আছে। তাঁহার স্থাপিত আস্তানায় প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মহরম উৎসবে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বহু লোকের সমাগম হয়।

মহোৎসব

বাঁকুড়দহ গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামবাসীর মঙ্গল ও শান্তি কামনায় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গ্রামের সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে একটি মণ্ডপ নির্মাণ করা হয় এবং মণ্ডপটি রঙীন কাগজ, ফুল-পাতা প্রভৃতি দিয়া উত্তমরূপে সাজান হয়। তিনদিনব্যাপী উৎসবের প্রথমদিন প্রাতে অধিবাস এবং রাত্রিতে গ্রামে সাধারণের একটি মন্দির হইতে মদনগোপালের মূর্তি এই মণ্ডপে আনিয়া যথারীতি পূজাদি করা হয়। মদনগোপাল রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি—হস্তে বংশীসহ কৃষ্ণ মূর্তিটি পাথরের এবং রাধিকা মূর্তিটি পিতলের নির্মিত। উৎসবের দ্বিতীয় দিন প্রাতঃকাল হইতে উক্ত মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করিয়া অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড নাম সংকীর্তন চলিতে থাকে এবং পরের দিন প্রাতে মণ্ডপে নাম সংকীর্তন শেষ হইলে একটি দল নগর সংকীর্তনে বাহির হন। নগরসংকীর্তন দল গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া পুনরায় মণ্ডপে প্রত্যাবর্তন করিলে পর মণ্ডপে 'দধিকাদা' বা 'ধূলট' উৎসবের আয়োজন করা হয়। ধূলট উৎসবে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যোগদান করেন।

শীতলাপূজা

কল্যাণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে শীতলাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে গ্রামের প্রত্যেক হিন্দু-বাড়ীর হইতে অথবা দুই-তিন বাড়ীর জন্য একজন ব্রতী শীতলাপূজার পর গ্রামের শেষ প্রান্তে ডাকিনীতলায় একটি বাঁশ পুঁতিয়া ঐ বাঁশের অগ্রভাগে কাপড়ে কিছু খৈ বাঁধিয়া ঝুলাইয়া দেন এবং ঐ বাঁশের মূলে ডাকিনী পূজা সম্পন্ন করেন। পূজার পর ব্রতীগণ গ্রামের বাহিরে একটি নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া প্রত্যেকে এক ঘটী করিয়া জল মাথায় লইয়া আসিয়া শীতলাপূজা প্রাঙ্গণে ঢালিয়া দেন। আর যে সকল ব্রতীরা অন্যান্য গৃহস্থদেরও পূজার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা তাহাদের নামে আর এক ঘটী করিয়া জল শীতলা প্রাঙ্গণে ঢালেন। শীতলা পূজায় পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং বলির পর ভক্তরা প্রচুর পরিমাণে ধুনা পোড়াইয়া থাকেন।

উৎসবটি সর্বজনীন, পূজারী ব্রাহ্মণ।

জেলা : হাওড়া
থানা : বাগনান

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

পশ্চিম বাইনান গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানকালী পূজা উপলক্ষে পরের দিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে গ্রামের বাজার সন্নিকটস্থ প্রায় চার বিঘা জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। বাংলা ১২০৯ সনে মেলাটি আরম্ভ হয়।

প্রধানতঃ আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে মেলায় বিক্রেতারা এবং বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকর সংখ্যাই বেশী।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। তেলেভাজা ও খাবারের দোকান, মাটির ও কাঁচের বাসনপত্রের দোকান, মনিহারী দোকান, মিল ও তাঁতের কাপড়, গামছা, লুঙ্গি এবং তৈয়ারী পোষাক-পরিচ্ছদের দোকান এবং স্থানীয় শিল্পীদের তৈয়ারী মাটির হাঁড়িকুড়ি, কলসী, পুতুল, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি শিল্প সামগ্রীর আমদানী হইয়া থাকে। ইহাছাড়া ঔষধপত্র ও বই-ছবির দোকানপাট প্রতি বৎসর বসিতে দেখা যায়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় যাত্রাদল ও থিয়েটার দল কর্তৃক যাত্রাভিনয়ের ও থিয়েটারের ব্যবস্থা করা হয়। পূজা কমিটি মেলার তত্ত্বাবধান করেন এবং বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করিয়া থাকেন।

বীরকুল গ্রামে পৌষ মাসে রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলায় আশেপাশের গ্রাম হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারী এবং বিক্রেতারা মেলায় আসেন। প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারীর দোকান, বই-ছবির দোকান, গামছা-লুঙ্গি ইত্যাদির দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা-চ্যাঙ্গারী প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য রতনপুরের পুতুল নাচের দল আসে এবং যাত্রা ও কবিগান হয়। কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই পেশাদার যাত্রাদল আসে।

খালোড় গ্রামে প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে তালকালীপূজা উপলক্ষে কালীবাড়ী সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

স্থানীয় এবং বাইনান, কল্যাণপুর, উলুবেড়িয়া, কোলাঘাট প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় দশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণের মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। নিকটবর্তী অঞ্চলের যাত্রীরা প্রধানতঃ হাঁটিয়া এবং দূরবর্তী অঞ্চলের যাত্রীগণ ট্রেণে এবং রিক্সায় মেলায় আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বাগনান থানার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। তাহাছাড়া কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় প্রায় আশিটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। ইহাতে মিষ্টান্ন, তেলেভাজা, মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখিন ও নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র এবং লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্রের আমদানী হয়। তাহাছাড়া ঔষধপত্র, কাপড়চোপড় ইত্যাদির কয়েকটি দোকানপাটও বসে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, স্থানীয় গ্রামসেবা সঙ্ঘ কর্তৃক নির্মিত মাটির বাসনকোসন এবং খদ্দরের কাপড়চোপড় প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় হয়। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা যায়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী, নাগরদোলা, যাত্রাগান, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হইত; কিন্তু বর্তমানে আমোদ-প্রমোদের উল্লেখযোগ্য কোন ব্যবস্থা নাই।

এই গ্রামে পৌষ মাসে কালীপূজা উপলক্ষে যে মেলা বসে তাহা উল্লিখিত মেলা বিবরণীর অনুরূপ।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

কল্যাণপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে কালীঞ্জা শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

গ্রামের চারিপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার হইতে বারশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। নিকটবর্তী দেউলগ্রাম, আমড়াজোল, বিত্তাশুন্দর, থাকুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মেলায় আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনপত্রের দোকান, কাপড়চোপড়, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির ও সোলার খেলনা এবং কাঠের তৈয়ারী আসবাব পত্রের আমদানী হইয়া থাকে। তাহাছাড়া নানাপ্রকার ফলমূল ইত্যাদিও বিক্রয় হয়। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

এই মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

আগুন্সী ভুঁইয়ারা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে সাধারণের প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর নয়-দশদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন এবং ইহাতে আগুন্সী ভুঁইয়ারা ইউনিয়নের অন্তর্গত প্রায় সকল গ্রাম হইতে সর্ব সম্প্রদায়ের প্রায় দেড় হইতে দুই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। উদং এবং কল্যাণপুর ইউনিয়ন হইতে বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা এবং তেলে-ভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাছাড়া মনিহারী, ধামাকুলা এবং চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান, বই ছবির দোকান বসে। বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখিন জিনিসপত্র প্রতি বৎসর কল্যাণপুর ইউনিয়ন হইতে আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও কৃষ্ণযাত্রার ব্যবস্থা করা হয়।

বৈদ্যনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বৈদ্যনাথ শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে সাধারণের প্রায় দুই বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। ১৪ই চৈত্র হইতে মেলায় দোকানপাটগুলি বসিতে আরম্ভ করিলেও চৈত্র সংক্রান্তির তিন চারিদিন পূর্ব হইতে মেলায় লোকসমাগম ও বেচাকেনা বেশী হয়। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী বাঁটুল, চন্দ্রভাগ, বেনাপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত প্রায় প্রতিটি গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর মেলায় প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় একশত দোকানপাট বসে এবং কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, তৈয়ারী জামা-কাপড়ের দোকান ও বই-ছবির দোকানপাট বসে। তাহাছাড়া মেলায় বেত ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা, চ্যাঙ্গারী, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি প্রভৃতি শিল্প সামগ্রীর দোকান বাঁটুল, বীরকুল প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আমদানী হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই মেলায় প্রায় দুই হাজার টাকার মাদুর ক্রয়-বিক্রয় হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য তরজা, কবিগান, নৃত্যগীত প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে সাধারণত শিল্পীরদল আসেন।

গ্রামের বিদ্যালয়ের ছাত্র ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদল কর্তৃক মেলাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইয়া থাকে।

হারপ্ (মৌজা নং ৪৫) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উপলক্ষে একটি বিরাট মেলা বসে।

মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের প্রায় কুড়ি-বাইশটি গ্রামের লোকজন যোগদান করেন।

মেলায় প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে, তন্মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই সর্বাধিক। তাহা ছাড়া বাসনপত্রের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকান, কৃষি ও কারিগরি সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বই-ছবি ও ঔষধপত্রের দোকান এবং কোন কোন বৎসর ফটো তুলিবার দুই-একটি দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল আসে এবং লটারী খেলা হয়।

রথযাত্রার মেলা

হারপ্ গ্রামে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলাটি এই গ্রামের উল্লিখিত চড়ক মেলা বিবরণীর অনুরূপ। প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে দুইদিনব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং মেলায় প্রায় এক হাজার হইতে দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

সাবিত্রীপূজা

সাঁওতা গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত সাবিত্রী পূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দশ কাঠা জমির উপর এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় কল্যাণপুর ও মেল্লক ইউনিয়নের গ্রাম সমূহ হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নর-নারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ প্রধানতঃ হাঁটিয়া আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কল্যাণপুর, আমড়াজোল, কাঁটাপুকুর এবং নিভাগ্রাম প্রভৃতি গ্রাম হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি, লুঙ্গি-গামছা প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, এই মেলার পর একটি শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং এই প্রদর্শনীতে যোগদানকারী শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

জেলা : হাওড়া

থানা : আমতা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : নুতনগ্রাম (মৌজাঃ আমরাগড়ি) ।

৭১।৫১৯'০৩।৩৩৯।২,০৩৪

(ক) হিন্দু প্রধান। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন আমতা।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

কালীপূজা ব্যতীত অন্যান্য পূজাগুলি সর্বজনীন এবং বহুদিনের প্রাচীন। ইহাছাড়া বৈশাখ মাসে হরিবাসরে নামকীর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) ×

শ্রীশিশুপতি জানা,
গ্রাম : নুতনগ্রাম,
পোঃ জয়পুর-ফকিরদাস, হাওড়া।

২। গ্রাম : কুলিয়া। ৮৫।১৯১'১০।১৪৩।৯৮৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজবংশী, কেওরা ও মুচি। গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—বামনপাড়া, আচার্যপাড়া, চৌধুরীপাড়া, কেওরাপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পূর্ব রেলপথে বাগনান বা কোলাঘাট স্টেশন হইতে হাঁটাপথে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিনী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

ইহাছাড়া জন্মাষ্টমী, ঝুলন, রাসযাত্রা ও দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির আছে। অনুমান বাংলা ১১৭১ সনে জনৈক গৌরাঙ্গ চৌধুরী কর্তৃক এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমানিক চন্দ্র চৌধুরী, শিক্ষক,
গ্রাম : কুলিয়া,
পোঃ ভাটোরা, হাওড়া।

৩। গ্রাম : বিনলা কৃষ্ণবাটী।

১০৬।৬৩০'৪০।২৪৬।১,২৯৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, ছুতার, বাগদী, দুলে, কাওরা, কলু, চুনারি, জেলে, তাঁতী ও মুসলমান।

গ্রামে ছুতারপাড়া, কামারপাড়া, বাগদীপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে আমতা স্টেশন হইতে রসপুর থলিয়ারঘাট পার হইয়া বিনলা সড়ক (জোড়বাঁধ) ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা পক্ষের শনি অথবা মঙ্গলবার রক্ষাকালী পূজা এবং তদুপলক্ষে তিনদিনব্যাপী উৎসব হয়। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিকমাসে পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচদিনব্যাপী রাস উৎসব, চৈত্র মাসে তিনদিনব্যাপী শিবের গাজন ও চড়ক এবং শীতলাপূজা ব্যতীত চান্দ্রমাস হিসাবে গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন ও বহু প্রাচীন।

চৈত্র মাসে শীতলাপূজা উপলক্ষে বনভোজন উৎসব হয়। স্থানীয় লোকে এই বনভোজন উৎসবকে 'হাটে কিনে মাঠে খাওয়া' বলিয়া থাকেন।

(ঙ) রক্ষাকালী পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে।
রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।
চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে।

উল্লিখিত মেলাগুলি আড়াই শত হইতে তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি দেবালয়ে রক্ষা কালী ও "শান্তিনাথ" নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাছাড়া গ্রামে একটি শীতলা, পঞ্চানন্দ ও মনসা দেবী আছে।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পাল, শিক্ষক,
গ্রাম : বিনলা কৃষ্ণবাটী,
পোঃ খলিয়া, হাওড়া।

৪। গ্রাম : সেহাগড়ি। ১১২।৪৮৬৯৭।২৯৫।১,৭৫২

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, তিলি, নাপিত, কাওরা, রাজবংশী ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) রেলস্টেশন আমতা। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) বৈশাখ মাসের কৃষ্ণাপক্ষে শনি অথবা মঙ্গলবার রক্ষাকালী পূজা; পূজাটি সর্বজনীন। তাহা ছাড়া এই মাসে গ্রামের আরও চারিটি স্থানে ব্যক্তি-বিশেষের কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। আশ্বিন মাসে শারদীয়া উৎসব উপলক্ষে অভয়াচণ্ডীর পূজা, পৌষ মাসে মকর উৎসব উপলক্ষে লক্ষ্মী ও মনসার পূজা এবং ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। অভয়া চণ্ডীর উৎসব প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং মকর উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব শিবের গাজন ও চড়ক। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শেষ পাঁচদিনব্যাপী এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের মধ্যে একটি পাকা মন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি সাধারণের। উৎসব উপলক্ষে প্রথম দিন ভক্তদের হবিষান্ন গ্রহণ, দ্বিতীয় দিনে ধর্মের ঝাঁপ, তৃতীয় দিনে লীলাবতীর বিবাহ, চতুর্থ দিনে শিবের ঝাঁপ এবং সংক্রান্তির দিনে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের চড়কডাঙ্গায় কয়েকটি তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান বসে।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে শিব, অভয়া চণ্ডী ও মনসা দেবীর পাকা মন্দির এবং মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনীযুক্ত একটি দেবালয়ে রক্ষাকালীর মৃণ্ময়মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগুলিতে যথাক্রমে প্রস্তরের শিবলিঙ্গ, পিতল নির্মিত অভয়াচণ্ডীর মাটির পাত্রে মনসা বৃক্ষ মৃণ্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত দেব-দেবীগণের নিত্য পূজা হয়। ইহাভিন্ন শীতলা, পঞ্চানন্দ, দামোদর, ষষ্ঠী ও পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীঅনাথবন্ধু রায়, শিক্ষক
গ্রামঃ সেহাগড়ি,
পোঃ খড়িয়প, হাওড়া।

৫। গ্রাম : খড়িয়প। ১২০।৫৮৭৭২।৩৭১।২,১৪৭

(ক) কায়স্থ, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, কামার, ধোপা, নাপিত, ডোম, কাওরা ও মুসলমান। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে আমতা স্টেশন হইতে দেড় মাইলের দূরে খড়িয়প গ্রামটি অবস্থিত। দামোদর নদের পশ্চিম তীর হইতে খড়িয়প গ্রামের মধ্য দিয়া একটি জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে শ্মশানকালী পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শ্মশানকালী পূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে সাতদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্মশানকালীর পাকা মন্দির আছে।

শ্রীসলিল কুমার বসু,
১৫, জি. টি রোড, হাওড়া (সাউথ)।

৬। গ্রাম : তাজপুর।১৩১।১,২১৭৩২।৬০০।৩,২৩২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে রায়পাড়া, মণ্ডলপাড়া, কোড়ারপাড়া, মীরপাড়া, সামন্তপাড়া, থাঁপাড়া, কুমারপাড়া প্রভৃতি কতকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে আমতা স্টেশন হইতে দামোদর নদের পূর্ব পাড় হইতে সরকারী বাঁধ ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়। বর্ষাকালে দামোদর নদে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মনসাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে কুলেশ্বর শিবের গাজন এবং একটি বারোয়ারী কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গাজন উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং অন্যান্য উৎসবগুলি প্রায় ষাট বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একমাসব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ফুলেশ্বর শিবের মন্দির এবং তিনটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা ও একটি মনসার স্থান আছে। মনসার কোন মূর্তি নাই, ঘট স্থাপন করিয়া পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শুনা যায়, তাঁজখা মসলন্দ সাহেব নামক জনৈক পীরের নামানুসারে গ্রামের নাম তাজপুর হইয়াছে।

শ্রীমানিক লাল গুহ, চাকুরী
গ্রাম ও পোঃ তাজপুর, হাওড়া।

৭। গ্রাম : মহিষামুড়ি। ১৩২।২৬২'৫৪।১৮৬।৯৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, মাহিষ্য, মোদক, তাঁতী, বর্গক্ষত্রিয়, ছুতার, নাপিত ও মুসলমান।

গ্রামে প্রায় দশ-বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আমতা হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহব্যাপী শিবের গাজন ও চড়ক এবং ধর্মের ঝাঁপ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে সপ্তাহকালব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব ও ধর্মরাজ ঠাকুরের মন্দিরে শিবলিঙ্গ এবং ধর্মরাজের শীলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া ভুবনেশ্বরী, কালী, শীতলা ও মনসার মন্দির আছে। উল্লিখিত দেবদেবীগণের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ও বাবাঠাকুর আছে।

শ্রীআদিত্য কুমার মাঝি, শিক্ষক,
গ্রামঃ মহিষামুড়ী,
পোঃ নওপাড়া, হাওড়া।

৮। গ্রাম : উদং। ১৩৪।৪৩৭'৫৪।৭৩১।৩,৭১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বারুজীবি, কামার, কুমার, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, জেলে, কাহার, মুচি, শুড়ি ও মুসলমান। গ্রামে বেরাপাড়া, মুচিপাড়া, কাওরাপাড়া প্রভৃতি নামে আট-দশটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে আমতা স্টেশন অথবা পূর্বভারতীয় রেলপথে কুলগাছিয়া স্টেশন হইতে সাইকেল রিক্সায় গ্রামে যাতায়াত চলে। গ্রামে যাতায়াতের পাকা রাস্তা আছে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও অন্নপূর্ণা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত পূজা দুইটি সর্বজনীন ও প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শিব, ধর্মঠাকুর, পঞ্চানন্দ, শীতলা, মনসা এবং ওলাবিবির স্থান আছে। ইহাছাড়া বড় খাঁন পীরের দরগাহ বলিয়া পরিচিত একটি ধ্বংসস্তূপ আছে। এইস্থানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীরের নামে সিন্নি মানত করেন।

গ্রামটি আমতার বিখ্যাত 'কেঁদোর জলা'-র অংশ বিশেষ। ধীরে ধীরে ভূভাগটি উন্নত হইয়া

লোকবসতির উপযোগী হইয়াছে। অনেকের মতে উদ্‌গত বা উত্থিত এই অর্থ অনুসারে গ্রামের নাম 'উদং' হইয়াছে।

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ উদং, হাওড়া।

৯। গ্রাম : সোনামুই। ১৩৮।৪৫৪·৫৬।৫১৯।২,৮৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি, কামার, কুমার, বর্গ-ক্ষত্রিয়, নাপিত, ধোপা ও মুসলমান।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন পাঁজা-পাড়া, সামন্তপাড়া, চাকিপাড়া, কুণ্ডুপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও পান ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথের হরিশদাদপুর স্টেশন হইতে নৌকা যোগে অথবা আমতা স্টেশন হইতে সাইকেল রিক্সাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা, ফাল্গুন মাসে চাটকেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবের গাজন উপলক্ষে ধর্মরাজ ও ক্ষেত্রপালের পূজা ও ঝাঁপ হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে আটদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে চাটকেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া শীতলা, মনসা, কালী, ধর্মরাজ, ক্ষেত্রপাল, পঞ্চানন্দ ও জনৈক পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যায় একযোগে শীতলা, মনসা ও কালীপূজা এবং পৌষ সংক্রান্তিতে পীরের স্থানে পীরের গান, কবিগান, ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীদীনবন্ধু আচার্য, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সোনামুই, হাওড়া।

১০। গ্রাম : সন্তোষনগর 'মৌজা : মাদারিয়া'। ১৪৫।৩৮৩·৪৭।৩০৩।২,০২৬

(ক) হিন্দু প্রধান গ্রাম।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন আমতা। দামোদরের বাঁধ ধরিয়া হাঁটাপথে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে ক্ষেত্রপালের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেত্রপালের গাজন উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবারের দোকান বসে। কালীপূজাটি গত চার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছের নীচে বাঁধান চাতালের উপর ক্ষেত্রপালের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীনলিনী কান্ত সাউ, শিক্ষক,
গ্রামঃ সন্তোষনগর, হাওড়া।

১১। গ্রাম : সমেশ্বর। ১৫১।৩৯৩·৫৭।২৫৪।১,৪৩২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, রাজবংশী, জেলে, ধোপা, নাপিত, কাওরা ও ডোম।

গ্রামে বারটি পাড়া আছে। যেমন—রাজ-বংশীপাড়া, হাজরাপাড়া, দেপাড়া, মাঝিপাড়া, দাস-পাড়া, গলুইপাড়া, মালপাড়া, দেয়াশীপাড়া, কাওরা-পাড়া, ডোমপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, দিন মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আমতা। দামোদরের বাঁধ ধরিয়া হাঁটাপথে গ্রামে যাতায়াত চলে। বর্ষা-কালে নৌকায় যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে শ্রীকৃষ্ণের অনন্তশয্যা উৎসব এবং চৈত্র মাসে সোমনাথ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে চারদিন-ব্যাপী। মাত্র গত দুই বৎসর যাবত মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে। আমতা, রসপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রত্যহ সর্বশ্রেণীর প্রায় দুইশত নরনারীর সমাগম হয়।

অনন্তশয্যা উৎসব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন মাসে পনরদিনব্যাপী। মেলাটি গত পাঁচ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। রসপুর, ঘোসালপুর, বসন্তপুর, গাজিপুর, তাজপুর, ভাণ্ডাগাছা, আমতা, ফলিয়া, হরিশপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার নরনারী সমাগম হয়।

শিবের গাজন উপলক্ষে মেলা। চৈত্র মাসে এক দিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুর্গাপূজা ও অনন্তশয্যা উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট স্থান এবং সোমনাথ শিবের সুউচ্চ পাকা মন্দির আছে। ইহাছাড়া পঞ্চানন্দ, শীতলা, দামোদর, ধর্মরাজ, ষষ্ঠী, ব্রহ্মা এবং প্রায় প্রত্যেক ঘরে ঘরে মনসা মূর্তি আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত সোমনাথ শিবের নামানুসারে গ্রামটির নাম, সমেশ্বর হইয়াছে।

শ্রীচণ্ডী চরণ দাস, চাকুরী,
গ্রামঃ সমেশ্বর,
পোঃ রসপুর, হাওড়া।

১২। গ্রাম : কলিকাতা। ১৫২।২৩৬·১০।২১৪।১,১৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, জেলে, ধোপা, চুনারী, ডোম ও মুসলমান। গ্রামে দশ-বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন আমতা। দামোদরের বাঁধ ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। নৌকায়ও যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে ব্রহ্মাপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা-পূজা, কার্তিক মাসে কার্তিকপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে কাত্যায়নীপূজা ও জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতী-পূজা, ফাল্গুন মাসে নারায়ণপূজা, চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজা ও চড়ক অনুষ্ঠিত হয়। জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজাটি ব্যক্তি বিশেষের। জগদ্ধাত্রী পূজাটি প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ, শিব ও কালীর নিত্যপূজা হয়। প্রতি শনি-মঙ্গলবার জনৈক ভক্তের উপর শীতলার 'ভর' হয়। রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের আশায় প্রতি শনি-মঙ্গলবার শীতলার স্থানে বহু যাত্রী আসেন।

শিব ও কালীর মন্দির ব্যতীত গ্রামে ধর্মরাজের একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির ও একটি বিগ্রহহীন প্রাচীন মন্দির আছে।

গ্রামের নামকরণ সম্পর্কে এখানে দুইটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, বর্তমানে গ্রামে যে চুনারী সম্প্রদায় বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পূর্ব পুরুষেরা 'কলি' জাতীয় একপ্রকার চুন তৈয়ারী করিতেন এবং সেই কারণেই গ্রামের নাম 'কলিকাতা' হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, গ্রামের প্রাচীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে-স্থানে 'সাহেব' বা ইংরাজেরা বাস করেন সেই স্থানই কলিকাতা হইবে। এই কারণে গ্রামের নাম কলিকাতা হইয়াছিল। পূর্বে এই গ্রামে নীল ব্যবসায়ের জন্য কিছু সংখ্যক ইংরাজ বাস করিতেন। এখনও এই গ্রামে কয়েকটি প্রাচীন 'নীলকুঠির' ভগ্নাবশেষ দেখা যায়।

ইহাছাড়া, গ্রামে একটি প্রাচীন 'গড়ের' ভগ্নাবশেষ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, উহা বাংলার রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।

শ্রীশীতল চন্দ্র নেবু, সম্পাদক,
কলিকাতা যুগবাণী সঙ্ঘ,
গ্রামঃ কলিকাতা, পোঃ রসপুর, হাওড়া।

১৩। গ্রাম : রসপুর। ১৫৩।৪২৪'৭৩।৩৫৩।১,৯৩৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, জেলে, মাহিষ্য, বাগ্দী, ডুলে, হাড়ী, মুচি, নাপিত, মালাকার ও মুসলমান।

গ্রামে নয়টি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, রায়পাড়া, জেলেপাড়া, বাগ্দীপাড়া, ডুলেপাড়া, হাড়ীপাড়া এবং মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) রেলস্টেশন আমতা হইতে রসপুর গ্রামের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। সাইকেল রিক্সায় গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, ফাল্গুন মাসে বিন্ধ্যবাসিনী পূজা এবং রাধাকান্তজীউ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া বৎসরের বিভিন্ন সময়ে রাস, দোল, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বিন্ধ্যবাসিনীপূজার মেলা। ফাল্গুন মাসে পনর-কুড়িদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাকান্তজীউ-র তিন কামরা বিশিষ্ট একটি মন্দির এবং মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালা যুক্ত একটি দেবালয়ে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাছাড়া গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শীতলা, একটি মনসা এবং শিব ও কালী আছে।

শ্রীপ্রাণেশ চন্দ্র বাগ্চী, প্রধান শিক্ষক,
ও
শ্রীপাঁচুগোপাল রায়, শিক্ষক,
রসপুর উচ্চ বিদ্যালয়,
গ্রাম ও পোঃ রসপুর, হাওড়া।

১৪। গ্রাম : কানপুর। ১৮০।৪৮৮'০৪।৫৮১।৩,২১০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, স্বর্ণকার, কুমার, ধোপা, নাপিত, গোয়ালা, তাঁতী, কলু, ছুতার, মুসলমান প্রভৃতি।

গ্রামে অনেকগুলি পাড়া আছে। যেমন—বামুনপাড়া, ময়রাপাড়া, তাঁতীপাড়া, ঢুলিপাড়া, মাহিষ্যপাড়া, কলুপাড়া, কাওরাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাত ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে অবস্থিত মুন্সীর হাট রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী।

(ঘ) জ্যৈষ্ঠ মাসে হরিসভা উপলক্ষে একমাসব্যাপী গৌরাঙ্গদেবের পূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে ভদ্রকালীপূজা উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে চড়ক উৎসব এবং চান্দ্র মাসানুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের মহরম উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন। হরিসভা উৎসবটি পঞ্চাশ বৎসরের এবং ভদ্রকালীর উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ভদ্রকালীর পূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে নাটমন্দির সহ পাকা কালী মন্দির আছে। তাহাছাড়া শীতলা, মনসা ও পাঁচটি পঞ্চানন্দের, স্থান আছে। মনসার নামে দৈব ঔষধ দেওয়া হয়।

কানপুর সেবা সঙ্ঘ পাঠাগারের সভ্যবৃন্দ,
কানপুর, হাওড়া।

১৫। গ্রাম : কাষ্ঠ সাঙ্গড়া।

২০১।৩৭৬'৯৩।২৫৮।১,৩৩৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, ধোপা, নাপিত, ডুলে ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, সরকারপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বর্গক্ষত্রিয়পাড়া, রায়পাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে মুন্সীরহাট, অথবা আমতা স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালী পূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া গ্রামবাসীর সুবিধামত বৎসরের যে-কোন মাসে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রক্ষাকালী, গণেশজননী, শীতলা, মনসা, ও পঞ্চানন্দ আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্য পূজা হয় এবং বৎসরের যে কোন সময় একদিন বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় কালী, পঞ্চানন্দ ও শীতলার নিকট পাঁঠা বলি ও বুকের রক্ত দিয়া ভক্তরা মানত পূজা দেন। তাহাছাড়া গ্রামে রুদ্রেশ্বর শিবের কারুকার্য খচিত একটি প্রাচীন পাকা মন্দির আছে।

নবনির্মিত আমতা-হাওড়া সড়কের পাশে কাষ্ঠ সাঙ্গড়া গ্রামটি অবস্থিত। গ্রামটি মাহিষ্য সম্প্রদায় প্রধান। বিস্তীর্ণ জলাভূমির মধ্যস্থলে অবস্থিত গ্রামটিতে বন-জঙ্গলের অপ্রাচুর্য্যহেতু জ্বালানী কাঠের একান্ত অভাব। খুব সম্ভবতঃ এই কারণে গ্রামটির নাম 'কাষ্ঠ সংগ্রহ' এবং অপভ্রংশে 'কাষ্ঠ সাঙ্গড়া' হইয়াছে।

রায় বাঘিনী ভবশঙ্করীর প্রতিষ্ঠিত রুদ্রেশ্বর শিবের মন্দিরের জন্য গ্রামটির একটি ঐতিহাসিক মর্য্যাদা আছে। এই মন্দির হইতে কিছু দূরে 'সিপাহী বেড়' নামে একটি বাগান আছে। ঐ স্থানে জাহাঙ্গীরের জনৈক সেনাপতি ওসমান খাঁ সময় সময় ছাউনী ফেলিয়া বসবাস করিতেন বলিয়া শোনা যায়। রাণী ভবশঙ্করীর রূপের খ্যাতি শুনিয়া ওসমান খাঁ তাঁহাকে অপহরণ করিবার উদ্দেশ্যে সাতশত সৈন্য লইয়া একদা আক্রমণ করেন। কিন্তু ভবশঙ্করী বাল্যকাল হইতেই মল্লযুদ্ধে, বর্শা নিক্ষেপনে ও অসি চালনায় পারদর্শীনী ছিলেন। তিনি একটি নারী বাহিনীকে ঐরূপ যুদ্ধবিদ্যায় শিক্ষিতা করিয়া আপন দেহরক্ষী কাজে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওসমান খাঁ'র সহিত এই নারী বাহিনীর যুদ্ধে ওসমান খাঁ পরাজিত হন এবং পলায়ন করেন। এই স্থানে একটি প্রাচীন বকুল বৃক্ষ আজও দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে, রানী ভবশঙ্করী এই বকুল গাছের আড়াল হইতে ওসমান খাঁ'র বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করিয়া ছিলেন। এই সম্পর্কে শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য মহাশয় প্রণীত "রাণী রায় বাঘিনী" পুস্তকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

শ্রীমনোহর কুমার সরকার, চাকুরী,
গ্রামঃ কাষ্ঠ সাঙ্গড়া,
পোঃ ঘোসালপুর, হাওড়া।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—আমতার মালাইচণ্ডী পূজা ও মেলা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণকুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যবিবরণী উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

জেলা : হাওড়া
থানা : আমতা

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

খড়িয়প গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে শ্মশানকালীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। শুনা যায় যে, এক বৎসর গ্রামে বিসূচিকা রোগ মহামারীরূপে দেখা দিলে বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হন। এই সময়ে খড়িয়প গ্রামের বসু পরিবারের কাশীনাথ বসু এবং তাঁহার ভ্রাতা বৈদ্যনাথ বসু মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া শ্মশানকালী পূজার আয়োজন করেন এবং তাহাতে মহামারীর প্রকোপ কমিয়া যায় বলিয়া বিশ্বাস। সেই সময় হইতেই এই গ্রামে শ্মশানকালীর পূজা চলিয়া আসিতেছে। প্রথমে গ্রামে খড়্গেশ্বর শিব মন্দিরেই দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হইত। কালক্রমে দেবীর মহিমায় আকৃষ্ট হইয়া দূর-দূরান্তর হইতে বহু নরনারী আসিতে থাকেন এবং পূজা ও উৎসবের আড়ম্বর বাড়িতে থাকে। ফলে বাংলা ১২২৯ সনে বসু পরিবারদের জমির উপর শ্মশানকালীর পাকা মন্দির এবং মন্দিরের উত্তরাংশে মার্বেল পাথরের সুউচ্চ বেদী নির্মাণ করিয়া শ্মশানকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে এই স্থানেই পূজাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। দেবীর ভৈরব খড়্গেশ্বর মহাদেব।

কানপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে ভদ্রকালী পূজা এবং 'এয়োজত উৎসব' অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এই গ্রামের সর্বজনীন উৎসব হইলেও আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন।

গ্রামে ভদ্রকালীর পাকামন্দির ও নাটমন্দির আছে। মন্দিরে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। মকর সংক্রান্তিতে কালীর যথারীতি পূজা ও পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। কালীপূজার সহিত এয়োজত উৎসবটি জড়িত। এয়োজত উৎসব উপলক্ষে মকর সংক্রান্তির দিন সকালে সধবা স্ত্রীলোকগণ একটি নির্দিষ্ট পুকুরে স্নান করিয়া কালীর নিকট পূজা দিয়া পরস্পর পরস্পরের সহিত শাঁখা-সিঁদুর বিনিময় করেন।

ভদ্রকালী পূজাটি প্রায় দুইশত বৎসরের এবং এয়োজত উৎসবটি প্রায় আশি বৎসরের প্রাচীন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

তাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ফুল্লেশ্বর শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মন্দিরে ফুল্লেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি প্রাচীন এবং মন্দিরের চারিদিকের দেওয়াল গাত্রে হর-গৌরীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। ইহাভিন্ন, মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের দুই পার্শ্বে যথাক্রমে একটি ষাড় ও একটি গরুড়ের মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মূল মন্দিরের সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। বর্তমানে শিবলিঙ্গটি ভূগর্ভে প্রায় দশ ফুট নীচে বসিয়া গিয়াছে। শোনাযায়, প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে জনৈক গোয়ালা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এই শিবলিঙ্গ ও মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র হইতে গাজন উৎসব আরম্ভ হইয়া চৈত্র সংক্রান্তিতে শেষ হয়। প্রতিদিন নিয়মিত পূজা, হোম অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তির দিন ডাবের জল ও দুধ মিশ্রিত একশত আট কলসী গঙ্গা জল দ্বারা শিবের স্নানাভিষেক উৎসব সম্পন্ন হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন নহবতে সানাই বাজে এবং আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী মানত পূজাদি দিতে আসেন। সাধারণের বিশ্বাস ফুল্লেশ্বর শিবের নিকট মানত করিলে যক্ষ্মা রোগ হইতে আরোগ্যলাভ করা যায়।

চৈত্র মাসে উৎসব ব্যতীত ফুল্লেশ্বর শিবের নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে। শিব মন্দিরটি উপরিভাগে কিঞ্চিৎ ফাঁকা স্থান আছে। ঐ ফাঁক দিয়া সূর্যের রশ্মি শিবলিঙ্গের মাথায় আসিয়া পড়িলে প্রতিদিনের পূজা আরম্ভ হয়।

গ্রামে জনৈক চক্রবর্তী পরিবার পুরুষানুক্রমে শিবের নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন।

সমেশ্বর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের মাঝামাঝি হইতে পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত সাড়ম্বরে সোমনাথ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তবে উৎসবের শেষ দুইদিনই বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে সোমনাথ শিবের সুউচ্চ পাকা প্রাচীন মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দির আছে। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি সাধারণের এবং উৎসবটি সর্বজনীন।

উৎসব উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির দুইদিন আগে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীগণ ঢাক-ঢোল বাজাইয়া প্রথমে গ্রামে পঞ্চানন্দ স্থানে উপস্থিত হইয়া পঞ্চানন্দের যথারীতি পূজা এবং পরে ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা করেন। ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজার পর শোভাযাত্রা করিয়া মহাসমারোহের সহিত ধর্মরাজ ঠাকুরকে সোমনাথ শিবের মন্দিরে আনা হয় এবং এই স্থানে 'ভাসান ভোগ' উৎসব পালন করা হয়। পরের দিন ধর্মরাজঠাকুরসহ শোভা-যাত্রা করিয়া সন্ন্যাসব্রতীগণ পার্শ্ববর্তী সন্তোষনগর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ক্ষেত্রপালের মন্দিরে উপস্থিত হন এবং ক্ষেত্রপালের যথারীতি পূজাদি করিয়া স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। ঐ দিন সন্ধ্যায় মন্দিরে সোমনাথ শিবের সহিত লীলাবতীর বিবাহ উৎসব বা নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন মন্দিরে সম্মুখে ঝাঁপ, মাল্যদান ও আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে বালক-বালিকাদের মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয়। শিবের নিকট সাধারণতঃ দণ্ডীকাটা, স্বর্ণ-রৌপ্য মানত অথবা শিবের নামে সন্ন্যাসব্রত সংকল্প করা হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী।

কাষ্ঠ সাঙ্গড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা চৈত্র হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত একমাসব্যাপী সাড়ম্বরে রুদ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন যথারীতি শিবের পূজা ও পরমান্ন-ভোগ দেওয়া হয় এবং পূজার শেষ হইলে উপস্থিত যাত্রীদের মধ্যে শিবের প্রসাদ ও পরমান্ন বিতরণ করা হয়। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীরাও এই উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের প্রাচীন। রাজা রুদ্রেশ্বরের বিধবা পত্নী রাণী ভবশঙ্করী এই গ্রামে রুদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজধানী পেড়ো (যাহা বর্তমানে 'পেচড়াগড়' নামে খ্যাত) হইতে প্রতিদিন নৌকাযোগে শিবপূজা করিতে আসিতেন। তিনি যে জলপথে যাতায়াত করিতেন বর্তমানে তাহা মজিয়া গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে এই গ্রামে একটি পুষ্করিণী খননকালে একটি বৃহদাকার নৌকার ভগ্নাবশেষ এবং পূর্ণ অবয়ব নর-কঙ্কাল পাওয়া যায়।

রাণী ভবশঙ্করী কর্তৃক নির্মিত রুদ্রেশ্বর শিব মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্বে এই গ্রাম নিবাসী ভুবনেশ্বর দলুই নামক জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন মন্দিরটির ঘরটি পাকা, উপরে গম্বুজ এবং ইহার দেওয়াল গাত্র সুন্দর কারুকার্য খচিত। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের দুইটি প্রবেশদ্বার এবং সম্মুখে একটি নাটমন্দির আছে। অভ্যন্তরে প্রায় তিন ফুট উচ্চ কালো পাথরের রুদ্রেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। শিবলিঙ্গটি ওজন প্রায় চার মণ হইবে। রাণী ভবশঙ্করী নির্মিত পরিত্যক্ত প্রাচীন মন্দিরটি ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

চৈত্র মাসে গাজন উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে এই মন্দিরে সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব পালন করা হয়।

চণ্ডীপূজা (আমতার মালাইচণ্ডী)

'হাওড়া-আমতা' মার্টিন রেলপথের প্রান্তিক রেল স্টেশন আমতা কলিকাতা হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে দামোদর নদীর তীরে অবস্থিত। প্রাচীনকাল হইতেই এই স্থানটি ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্ররূপ পরিচিত। বর্তমানে ইহা একটি শহর এবং ১৯৬১ সালের আদমসুমারী অনুযায়ী এই শহরের মোট জনসংখ্যা ৮,০৮৬ ট্রেণ ভিন্ন হাওড়া হইতে উলুবেড়িয়াগামী মোটর বাসে রাণীহাটি

নামিয়া স্কুটারে (চার জন বসিবার) এই স্থানে পৌছান যায়। তাহাছাড়া বর্ষাকালে দামোদর নদ দিয়া নৌকায় মালপত্র বহন করা হয়।

কেবলমাত্র বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়াই নহে, আমতা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান রূপেও প্রসিদ্ধ। এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত দেবী মালাই চণ্ডী অতি জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া বিশ্বাস। অনেকের মতে ইহা একটি পীঠস্থান। বিষ্ণুচক্র দ্বারা সতীদেহ খণ্ডন কালে দামোদর নদের অপর পাড়ে জয়ন্তী গ্রামে সতীর বাঁ পায়ের মালাই চাকি (হাঁটুর উপরের অংশ) পড়িয়াছিল, এই হিসাবে ইহা একান্ন পীঠের একটি পীঠ বলিয়া মনে করা হয় এবং এই স্থানে দেবী মালাইচণ্ডী নামে খ্যাত। অবশ্য পণ্ডিতদিগের মতে তন্ত্রে জয়ন্তী নামে যে স্থানের উল্লেখ আছে, তাহা জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত।

যতদূর জানা যায় আমতা গ্রামে মালাইচণ্ডী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা জটাধারী চক্রবর্তী মহাশয় একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিংবদন্তী আছে একদা তাঁহার প্রতি দেবী চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ হয় যে, "আমি জয়ন্তী গ্রামে অবস্থান করিতেছি, এই স্থানে আমার পূজাদি হইতেছে না। অবিলম্বে তুই আমার যথারীতি পূজার ব্যবস্থা কর।" এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া চক্রবর্তী মহাশয় প্রতিদিন দামোদর নদী পার হইয়া জয়ন্তী গ্রামে দেবীর পূজাদি করিতে লাগিলেন। কিংবদন্তী আছে, উক্ত ব্রাহ্মণ প্রতিদিন চণ্ডীদেবীর অনুগ্রহে দুইটি কুমীরের পৃষ্ঠে চড়িয়া দামোদর নদী পারাপার হইতেন। অবশেষে ব্রাহ্মণের ক্লেশ লাঘবের জন্য তাঁহার প্রতি দেবীর পুনরাদেশ হয়—"তুই আমাকে জয়ন্তীর থেকে আমতায় এনে পূজার ব্যবস্থা কর।" এই স্বপ্নাদেশ অনুসারে দেবীকে আমতা গ্রামের হাটতলায় স্থাপন করিয়া তাঁহার পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করা হয়।

কিংবদন্তী অনুসারে আরো জানা যায় যে, একদা ঝড়ে জনৈক বণিকের লবণসহ কয়েকটি নৌকা দামোদর গর্ভে ডুবিয়া যায়। তিনি দেবী মালাই চণ্ডীর নিকট মানসিক করেন যে, যদি লবণসহ তাঁহার নৌকাগুলি পুনরায় জলে ভাসিয়া উঠে তবে তিনি দেবীর জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিবেন। দেবী তাহার মনস্কামনা পূর্ণ করেন, উক্ত বণিক দেবীর বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ একটি লিপি হইতে জানা যায় যে, ১০৫৬ বঙ্গাব্দে মন্দিরটি নির্মিত। অনেকে দাবী করেন যে, মালাইচণ্ডী দেবীর মন্দিরটি হাওড়া জেলার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মন্দির। মন্দির নির্মাণের পর হাটতলা হইতে দেবীর মূর্তি আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং তদবধি এই মন্দিরেই দেবীর পূজাদি চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি বৈশাখ মাসে উৎসব উপলক্ষে জয়ন্তীতে এবং হাটতলায় ঘটে মালাইচণ্ডী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। মালাই চণ্ডীর মন্দিরের সম্মুখে নাটমন্দির এবং তাহার পূর্বদিকে দেবীর ভৈরব দুর্গেশ্বর শিবের মন্দির আছে। শিবমন্দিরটি কলিকাতা হাটখোলার মদনমোহন দত্ত মহাশয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

মন্দিরাভ্যন্তরে মেলাই চণ্ডীর প্রতীক একটি প্রস্তর নির্মিত মুখমণ্ডল প্রতিষ্ঠিত আছে। মস্তকে রৌপ্য বর্ণ নির্মিত মুকুট এবং স্বর্ণখচিত চক্ষু-কর্ণাদি আছে।

বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে চণ্ডীদেবীর মূর্তি গ্রামের হাটতলা হইতে মন্দিরে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল বলিয়া প্রতি বৎসর এই দিনে সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক পূজা ও অভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে দেবী দর্শন করিতে ও মানসিক পূজা দিতে প্রায় পনের হইতে বিশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। প্রধানতঃ হাওড়া, হুগলী, চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা হইতে যাত্রী আসিয়া থাকেন। এইদিন যথারীতি পূজার পর দেবীর সম্মুখে মানতের পশু বলি হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর ত্রিশ-চল্লিশটি মানতের পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিরা বলেন কিছুকাল পূর্বেও উৎসবের দিন দেবীর নিকট তিন শতাধিক ছাগ বলি হইত।

বার্ষিক উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত চারদিন, মাঘী পূর্ণিমায় এবং ফাল্গুন মাসে সপ্তম দোল উপলক্ষে মহা ধুমধামের সহিত মালাই চণ্ডী দেবীর পূজা হইয়া থাকে। মাঘী পূর্ণিমার দিন মন্দির প্রাঙ্গণে একটি ছোট মেলাও বসে এবং

সপ্তম দোলের দিন সন্ধ্যায় প্রচুর আতস বাজী পোড়ান হয়। এই সকল উৎসবগুলিতে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী আসিয়া থাকেন।

দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে এবং আমতা বাজারে ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে তোলা সংগ্রহ করিয়া দেবীর নিত্যপূজাদি এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে উল্লিখিত উৎসবাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। আদি পূজারী জটেশ্বর চক্রবর্তীর বংশধরগণই পুরুষানুক্রমে দেবীর পূজাদি করিতেছেন।

প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় দেবীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণের আশেপাশে দেবোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। ইহাতে প্রায় শতাধিক দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির বাসনপত্র ও খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হইয়া থাকে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

এই মেলা উপলক্ষে আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর লাঠি খেলার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন স্থান হইতে লাঠিয়ালরা এই লাঠিখেলা প্রতিযোগিতা যোগদান করিয়া থাকেন। প্রতিযোগিতার শেষে বিজয়ী দলকে পুরস্কৃত করা হয়।

দুর্গাপূজা

রসপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমী হইতে দশমী পর্যন্ত সাড়ম্বরে দুর্গোৎসব পালিত হয়। এই গ্রামের আদি বাসিন্দা প্রখ্যাত রায়বংশের আদি পুরুষ যশশ্চন্দ্র রায় আনুমানিক ইংরাজী ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রামে বসতি স্থাপন করিয়া দুর্গাপূজার প্রচলন করেন এবং তদবধি এই উৎসব চলিয়া আসিতেছে। অদ্যাপি বংশানুক্রমে তাঁহারা দুর্গাপূজা করিতেছেন। গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে সানন্দে যোগদান করিয়া থাকেন।

প্রচলিত দুর্গাপূজার প্রতিমা গঠন ও পূজা পদ্ধতির সহিত এই স্থানের দেবী প্রতিমা গঠন ও পূজা পদ্ধতির কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের জন্মাষ্টমী তিথি হইতে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রচলিত রীতি অনুসারে কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে প্রতিমা নির্মাণের জন্য অন্ততঃ একখানি বাঁশ কাটিয়া রাখিতে হয় এবং প্রায় সেইদিন হইতেই প্রতিমা নির্মাণের কাজ শুরু হয়।

দুর্গাপ্রতিমার উপরিভাগে কার্তিক ও গণেশ এবং নিম্নভাগে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মূর্তি স্থাপন করা হয়।

কৃষ্ণানবমী হইতে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবীর পূজা আরম্ভ হয় এবং শুক্লাষ্টমী পর্যন্ত প্রতিদিবসের পূজায় একটি করিয়া ষোলটি গণেশঘট, দুইটি দেবীঘট, একটির পরিবর্তে তিনটি নবপত্রিকা অর্থাৎ মোট একুশটি ঘট স্থাপন করিয়া পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই রীতি প্রাচীনকাল হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে।

দুর্গাপূজার জন্য পাকা চণ্ডীমণ্ডপ আছে। মণ্ডপের সম্মুখে অবস্থিত একটি প্রাচীন বিল্ববৃক্ষের মূলদেশে ষষ্ঠীর দিন দেবীর বোধন কার্য সমাপনের পর চণ্ডীমণ্ডপে সাড়ম্বরে যথারীতি সপ্তমী ও অষ্টমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে সন্ধিপূজা উপলক্ষে দেবীর নিকট বলি প্রদান করা হয়। বলির সময়ে দেবীর হস্তে বিল্বপত্রের একটি মালা অর্পণ করা হয়। পূর্বে সন্ধি পূজায় ছাগ ও মহিষাদি বলি দেওয়া হইত। কিন্তু রায়বংশে জন্মগ্রহণকারী পরম বৈষ্ণব কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণের আমল হইতে ঐ প্রকার বলি বন্ধ হইয়া যায়।

সন্ধিপূজার শেষে গৃহস্থ বধূরা পরিবারের মঙ্গল কামনায় দেবীর নিকট ধূনা পুড়াইয়া থাকেন। মানতকারীগণ সারাদিন উপবাস থাকিয়া সন্ধিপূজা সমাপনান্তে মণ্ডপ প্রাঙ্গণে দেবীর সম্মুখে আসিয়া উপবেশন করেন। তাঁহাদের মস্তকের উপর একটি ও দুই হাতে দুইটি মাটির নূতন সরা দেওয়া হয় এবং ঐ সরায় অগ্নি দিয়া তিনবার ধূনা নিক্ষেপ করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়। "ধূনাপোড়া" মানত এখানকার এক বিশেষ রীতি।

নবমীপূজার দিন "বুহিত (বহিত্র) ভোগা" নামে একটি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে একটি বাঁশের তৈয়ারী নৌকা দুর্গামণ্ডপে আনিয়া পূজাদি করা

হয় এবং পূজান্তে রাত্রে রায় পরিবারের সধবা স্ত্রীলোকগণ শঙ্খ ও ঢাক-ঢোলের বাজনাসহ শোভাযাত্রা করিয়া নৌকাটিকে স্বগৃহে লইয়া যান। ইহা রায় পরিবারের একটি পারিবারিক প্রথা মাত্র।

এই পূজা সম্পর্কে এতদঞ্চলে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একদা দুর্গাপূজার কয়েকদিন পূর্বে প্রচণ্ড ঝড়ে গ্রামের বহু ঘরবাড়ী এবং গাছপালা ভূমিসাৎ হইয়া যায়। কিন্তু দুর্গাপ্রতিমার কোন প্রকার ক্ষতি হয় নাই। পূজার আর মাত্র কয়েকদিন বাকী, এদিকে গ্রামে ফলমূল, এমন কি চাউল পর্যন্ত দুষ্প্রাপ্য; কি প্রকারে দেবীর পূজা সম্পন্ন হইবে গৃহকর্তাদের অহর্নিশি এই চিন্তা। এইরূপ অবস্থায় দেবী জনৈক ভক্তকে স্বপ্নাদেশ করিলেন, "আমার পূজার জন্য কোন চিন্তা করিও না। ঝড়ে যে সকল কলাগাছ পড়িয়া গিয়াছে তাহারই "থোড়" দিয়া আমার পূজা দিও। তাহাতেই আমি তৃপ্ত হইব।" দেবীর প্রত্যাদেশ অনুসারে সে বৎসর থোড়ের নৈবেদ্য দিয়াই দুর্গাপূজা সম্পন্ন হয়। এ অঞ্চলের লোকের মুখে এখনও এই কাহিনী শোনা যায়।

দশমীর দিন অপরাহ্ণে প্রতিমা নৌকায় করিয়া নদীতে "মনসার দহে" বিসর্জ্জন দেওয়া হয়। প্রতিমা বিসর্জ্জন দেখিতে মনসাদহে বহুলোক সমাগম হয় এবং বিসর্জনের পর দর্শকেরা গ্রামস্থ সকল দেবদেবীকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। রাত্রে প্রতিবেশীদের সহিত রায়বংশের সকলে চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত হন এবং শান্তিজল গ্রহণ ও প্রণাম-আলিঙ্গনাদির পর উৎসব শেষ হয়।

বিন্ধ্যবাসিনী পূজা

রসপুর গ্রামে বিন্ধ্যবাসিনী তলায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে বিন্ধ্যবাসিনী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; উৎসবটি সর্বজনীন এবং শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

উৎসবের প্রায় দুই-তিন মাস পূর্বে একটি শুভদিন দেখিয়া দেবী প্রতিমা নির্মাণের জন্য মাটি কাটা হয়। এইদিন গ্রামের ঢাকী-ঢুলিরা ঢাক-ঢোল বাজাইয়া সারা গ্রামে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজার কথা ঘোষণা করেন। দেবী বিন্ধ্যবাসিনী তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, ত্রিনয়না এবং অষ্টভুজা। দুইটি সিংহের পৃষ্ঠে অবস্থিত একটি সিংহাসনের উপর দেবী উপবেষ্টিত। দেবীর দুই পাশে নীচে হইতে উপরে দশটি মাটির পুতুল পরপর সাজান থাকে। সর্ব উচ্চে দেবীর ঠিক মস্তকের উপর দুইটি ক্ষুদ্রাকৃতি মাটির পুতুল থাকে। পূজা মণ্ডপে কৃত্রিম পাহাড় নির্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে দেবী প্রতিমা স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজাদি হইয়া থাকে।

সপ্তমী পূজার দিন দেবীর নিকট একটি পাঁঠা বলি দেওয়া হয় এবং নবমী পূজার দিন পাঁঠা ও একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী প্রতিমা দর্শন করিতে এবং পূজাদি দিতে আসেন। বিশেষ করিয়া নবমী পূজার দিন মহিষ বলি এবং মহিষের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া নৃত্য দেখিতে প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারী পূজা মণ্ডপে উপস্থিত হন। স্থানাভাবে অনেকে আশেপাশের বাড়ীর ছাদে এবং গাছের শাখায় উঠিয়া এই মুণ্ড নৃত্য প্রত্যক্ষ করেন। মহিষ বলির পর রক্তাক্ত মহিষের ছিন্ন মুণ্ড লইয়া নৃত্য করিবার জন্য ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ সকলের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায়। প্রায় এক ঘণ্টা কালব্যাপী পূজা প্রাঙ্গণে এই মুণ্ড নৃত্য চলে।

দশমী পূজার দিন বিজয়া উপলক্ষে দেবীর ঘট নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয়; পরে সর্বসম্মতিক্রমে একটি দিন ধার্য করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রতিমা সাড়ম্বরে বিসর্জন দেওয়া হয়।

দশমী পূজার পর অন্নসত্র অনুষ্ঠিত হয়। এই দিন বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট খিচুড়ী ভোগ দেওয়া হয় এবং পরে ঐ ভোগ সমবেত যাত্রীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

উৎসবে জনশিক্ষার উদ্দেশ্যে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে মাটির মূর্তি তৈয়ারী করিয়া প্রদর্শনী খোলা হয়।

রাধাকান্ত জীউ-র পূজা

রসপুর গ্রামে রায়বংশের আদি পুরুষ যশশ্চন্দ্র রায়ের পৌত্র "শিবায়ণ" কাব্য প্রণেতা ("শিবায়ণ কাব্য"—

অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মন্দির হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।) পরম বৈষ্ণব রামকৃষ্ণ কবিচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত রাধাকান্ত জীউ-র মন্দিরে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে রামকৃষ্ণ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হইয়া রাধাকান্ত বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন।

অধ্যাপক দীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়দ্বয় সিদ্ধান্ত করেন, ১৫৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। সুতরাং দেখা যায়, প্রায় তিন শতাব্দীকাল পূর্বেই এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষালাভের পর রামকৃষ্ণ রাধাকান্তজীউর সেবা-পূজায় জীবন উৎসর্গ করেন। রাধাকান্তজীউ জাগ্রত বিগ্রহ বলিয়া এতদঞ্চলের সকলের বিশ্বাস। এই সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শুনা যায়। শুনা যায় রামকৃষ্ণ এই বিগ্রহকে জীবন্তরূপে প্রত্যক্ষ করিতেন। বিগ্রহ সেবার ত্রুটি বা বিলম্ব হইলে রামকৃষ্ণ স্বপ্নাদেশে তাহা জানিতে পারিতেন। প্রখর গ্রীষ্মে বিগ্রহের অঙ্গ বাহিয়া ঘাম ঝরিত। বিগ্রহের সম্পর্কে এইরূপ নানা অলৌকিক কাহিনীতে আকৃষ্ট হইয়া বর্ধমানের মহারাজা কৃষ্ণরায়ের মনে এই জাগ্রত বিগ্রহকে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠা করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা জাগে। তিনি রামকৃষ্ণের নিকট ঐ বিগ্রহ প্রার্থনা করেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ কোনক্রমেই বর্ধমান মহারাজকে এই বিগ্রহ দিতে সম্মত হইলেন না। অগত্যা রাজা কৃষ্ণরায় লোকজন সহ রসপুরে উপস্থিত হইয়া উক্ত রাধাকান্ত বিগ্রহ বলপূর্বক অধিকার করেন। এই অভাবনীয় ঘটনায় অভিভূত হইয়া রাধাকান্তের বিরহে রামকৃষ্ণ অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার কথা রাজা কৃষ্ণরায়ের কর্ণগোচর হইলে তিনি এইস্থানে একটি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করেন এবং দেব সেবার নিমিত্তে কিছু ভূসম্পত্তি দান করেন।

বর্তমান কৃষ্ণ মূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত, হাতে মুরলী এবং ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। উহার বামে ধাতুময়ী রাধিকা মূর্তি। রামকৃষ্ণ নির্মিত প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। বর্তমানে তিন-প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি পাকা মন্দিরে উক্ত বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠিত আছে। উহার একটি প্রকোষ্ঠে শীতলা মূর্তি আছে; শীতলা দেবীর নিত্য পূজা হয়। ইহা ব্যতীত প্রতি বৎসর রাধাকান্ত জীউর রাস, দোল, জন্মাষ্টমী ও নন্দোৎসব এবং কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে অতি সমারোহের সহিত বিশেষ পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। নন্দোৎসব উপলক্ষে সর্বসাধারণের মধ্যে ঠাকুরের প্রসাদ "আট কড়াই" এবং "তেল-হলুদ" বিতরন করা হয়। দোলযাত্রা উপলক্ষে রাধাকান্ত বিগ্রহ গ্রামের শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে শিবতলায় আনিয়া দেবদোল পর্ব পালন করা হয়। অপরাহ্নে দোল উৎসব শেষ হইলে বিগ্রহদ্বয়কে পুনরায় মন্দিরে আনিয়া স্থাপন করা হয়। রাত্রে বিগ্রহের পূজা এবং আরতি হয়। পূজারী চক্রবর্তী পদবী ধারী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। দোলের দিন বিকালে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি খাবার ও মাটির খেলনা-পুতুলের দোকান বসে।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ আমতা

মেলা বিবরণী

কালীপূজার মেলা

খড়িয়প গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে বারোয়ারী শ্মশানকালী পূজা উপলক্ষে কালী মন্দির সংলগ্ন ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। পূর্বে মেলাটি প্রায় মাসাধিকাল স্থায়ী হইত; বর্তমানে মাত্র সপ্তাহব্যাপী চলে।

আশেপাশের প্রায় পঞ্চাশটি গ্রাম হইতে এবং কলিকাতা, হুগলী, মেদিনীপুর হইতে মেলায় মোট প্রায় বিশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীদের মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী দেখা যায়।

মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতারা প্রধানতঃ প্রতি বৎসর কলিকাতা হইতে আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার, তামা, পিতল, লোহা ও কাঁচের বাসন-পত্র, মনিহারী দ্রব্য, কাপড়চোপড়, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা এবং বই-ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানপাট উল্লেখযোগ্য।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী, কবিগান, তরজা ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

কানপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তিতে ভদ্র-কালীর পূজা উপলক্ষে কালীতলায় একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র একদিন স্থায়ী হয় এবং ইহা প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আমতা এবং জগৎবল্লভপাড়া থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় ছয়-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং ফেরি-ওয়ালারা প্রধানতঃ কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারীর দোকান, কাঁচ, পাথর ও লোহার বাসনপত্রের দোকান, তৈয়ারী জামা-কাপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, বেত ও বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান, বই-ছবির দোকান এবং নানাবিধ টোট্‌কা ঔষধপত্রের দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় তরজা, জলসা এবং যাত্রাভিনয় ও সঙ নাচের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা।

তাজপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে ফুলেশ্বর জীউর মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর জমির উপর একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং চৈত্র মাসের পয়লা হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত মেলা স্থায়ী হয়।

আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় পাঁচ হইতে সাত শত নরনারীর সমাগম হয় এবং দশ-পনরটি দোকান-পাট বসে ও আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান এবং দুই-তিনটি শিল্পসামগ্রীর দোকানই উল্লেখযোগ্য।

মহিষামুড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক উৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় দশ কাঠা জমিতে সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় গাজীপুর, তাজপুর প্রভৃতি আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে সকল শ্রেণীর মোট প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় পনর-কুড়িটি দেকানপাট বসে এবং তিন-চারজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় বিক্রেতা ভিন্ন নওপাড়া, গাজীপুর, তাজপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন। দোকানপাটের মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান, মাটির ও কাঠের খেলনার দোকান এবং বই-ছবির দোকানপাট অধিক দেখা যায়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

উদং গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় আধ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি ষাট হইতে সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়িকুড়ি, পুতুল, খেলনা, শোলা ও কাগজের তৈয়ারী পুতুলের দোকান প্রভৃতি বসে। বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন।

সোনামুই গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষে গ্রামের শিব তলায় সেবায়েতগণের প্রায় তিন-চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আটদিন ধরিয়া চলে এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

সোনামুই, গাজীপুর, ভগবতীপুর এবং উদং হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারী এবং বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় আসেন। পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরিওয়ালাও আসেন। মেলায় মিষ্টান্ন, মনিহারী, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহাছাড়া মেলায় শিল্পসামগ্রী ও বই-ছবির কয়েকটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, লটারী, যাত্রাগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্রামেই যাত্রার দল আছে।

সমেশ্বর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সোমনাথ শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে শিব মন্দির সংলগ্ন জমিতে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় সন্তোষনগর, মিষ্কিচক, রসপুর, কুমারিকা, মান্দারিয়া প্রভৃতি গ্রাম হইতে সর্বশ্রেণীর মোট প্রায় এক-হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বই-ছবির দোকান, মাটির পুতুল ও শিল্পসামগ্রীর দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন, তরজা গান এবং যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

কাষ্ঠ সাঙ্গড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে রুদ্রেশ্বর শিবের গাজন উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

ঘোশালপুর, চালতাখালি, দাঁড়পুর, রামচন্দ্রপুর, কাঁমড়া, শরপোতা, বাণেশ্বরপুর প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম সমূহ হইতে মেলায় মোট প্রায় দুই হাজার নরনারী এবং বিক্রেতারা আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, বাসনকোসন, মনিহারী, কাপড়-চোপড়, কৃষি ও কারিগরি সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির পুতুল, খেলনা, হাঁড়ি-কুড়ি এবং বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী, কবিগান, তরজাগান ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। গ্রামেরই একটি যাত্রাদল অভিনয় করে।

বিন্ধ্যবাসিনীপূজার মেলা

রসপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বিন্ধ্যবাসিনীপূজা উপলক্ষে প্রায় চার বিঘা জমির উপর পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সর্বশ্রেণীর প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীর অধিকাংশই আমতা থানার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী গ্রাম হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বই-ছবির দোকান, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল প্রভৃতির দোকানপাট বসে। ইহা ভিন্ন অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রীর কতকগুলি দোকান-পাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। এই গ্রামের বাগ্দী সম্প্রদায়ের একটি যাত্রাদল কর্তৃক মেলায় যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। তাহাছাড়া কোন কোন বৎসর ভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রার দল আনা হয়।

রথযাত্রার মেলা

উদং গ্রামে অনুষ্ঠিত রথযাত্রার মেলার বিবরণী এই গ্রামে অনুষ্ঠিত গাজনের মেলার বিবরণীর অনুরূপ। তবে রথের মেলায় প্রচুর চারাগাছ ক্রয়-বিক্রয় হয়।

রাসযাত্রার মেলা

বিনলা কৃষ্ণবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে রাস পূর্ণিমার দিন রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব উপলক্ষে রাস্তার দুই ধারে এবং সাধারণের জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

থলিয়া, রসপুর প্রভৃতি আশেপাশের চার-পাঁচটি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় মাত্র পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটগুলির মধ্যে প্রধানতঃ খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির ও লোহার বাসনপত্র এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান এবং মাটির পুতুলের দোকান বসে।

রাস উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ বিনা পারিশ্রমিকে নানারূপ মাটির মূর্তি নির্মাণ করিয়া প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। তাঁহাদের শিল্পকুশলতা বিশেষ প্রশংসনীয়। তাহা ছাড়া আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর যাত্রা-ভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা : হাওড়া
থানা : উদয়নারায়ণপুর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : রামপুর। ৩।৮৪৪'৫২।৩২৬।২,১৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, নাপিত, কামার, কুমার, কলু জেলে, হাড়ী ও বাগ্দী।

গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে আমতা রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে কালীপূজা, আশ্বিন মাসে দুর্গা ও লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে হটেশ্বর শিবের চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে হটেশ্বর শিবের মন্দির এবং সাধারণের একটি আটচালা পূজামণ্ডপ আছে। ইহাছাড়া, দুইটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, তিনটি শীতলা ও তিনটি মনসাদেবী আছে।

শ্রীপঞ্চানন্দ জানা, শিক্ষক,
গ্রাম : রামপুর, পোঃ ডিহিভূরশীট,
হাওড়া।

২। গ্রাম : সিংটী। ৩৩।১,০৯৫'৬৩৫৩৭।২,৭৯৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈরাগী, মাহিষ্য, ক্ষত্রিয়, গোপ, সদ্গোপ, শোলাংকী, কামার, কুমার, জেলে, তাঁতী, ধোপা, মালাকার, ছুতার, মোদক, তিলি, কলু, তাম্বুলী, স্বর্ণকার, দুলে, বাগ্দী, হাড়ী, মুচি, ডোম ও মুসলমান।

গ্রামে বামুনপাড়া, চৌধুরীপাড়া, মণ্ডলপাড়া, বেরাপাড়া, ময়রাপাড়া, গোয়ালাপাড়া, জেলেপাড়া, খাঁপাড়া, শোলাংকীপাড়া, হাড়ীপাড়া, দুলেপাড়া প্রভৃতি অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) জাঙ্গিপাড়া, মুন্সীরহাট অথবা আমতা রেল স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রাম হইতে উল্লিখিত তিনটি রেলস্টেশনের দূরত্ব প্রায় আট মাইল। স্টেশন হইতে গ্রামে আসিতে প্রায় চার মাইল পথ মোটরবাসে এবং বাকী পথ হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে দামোদর নদ দিয়া বর্ষাকালে নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা তিথিতে রক্ষা-কালীপূজা এবং মাঘ মাসের ১লা তারিখে ভাই খাঁ পীরের উৎসব।

(ঙ) ভাই খাঁ পীরের উৎসবের মেলা। মাঘ মাসে। মেলাটি প্রায় সাত শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে সাধারণের একটি পাকা কালীমন্দির আছে। ইহাছাড়া গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ এবং প্রায় প্রতিটি পাড়ায় শীতলা ও মনসা আছে।

গ্রামের সিংটী নাম সম্পর্কে শোনা যায় যে, বহুকাল পূর্বে বাংলার ভূরী শ্রেষ্ঠ রাজ্যের ব্রাহ্মণ রাজা রুদ্রনারায়ণ রায় পাঠান সর্দার কতলু খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এই স্থানে সিংহবাহিনী দেবী মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই কারণে এই স্থানটির নাম সিংহটী নামে পরিচিত হয়। সিংহটী হইতে বর্তমানে গ্রামের নাম সিংটী হইয়াছে।

শ্রীনিতাই চরণ খাঁ, শিক্ষক,
গ্রামঃ সিংটী শিবপুর,
হাওড়া।

৩। গ্রাম : মনসুকা। ৪৫।৪০৮'২৮।২০৯।১,২৩৩

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, গোপ, ধোপা, নাপিত, বর্গক্ষত্রিয়, কামার, মাইতি ও নমঃশূদ্র।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) হাওড়া-আমতা রেলপথে মুন্সীরহাট রেল স্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ জেলাবোর্ডের রাস্তা। গ্রামের মধ্য দিয়া মোটরবাস যাতায়াত করে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে গ্রামের দুই স্থানে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজা দুইটি মাত্র পনর বৎসরের প্রাচীন, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবতলা নামক স্থানে চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাছাড়া, গ্রামের পূর্ব পাড়ায় ও পশ্চিম পাড়ায় বাস্তুকালী পূজা হয়। উৎসবগুলি সর্বজনীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। কার্তিক মাসে।

(চ) গ্রামে শীতলা ও মনসার ঘট এবং দক্ষিণরায়, পঞ্চানন্দ ও দামোদরের শিলাখণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাছাড়া, শ্রীধরনাথ জীউ নামে খ্যাত ব্যক্তি-বিশেষের শালগ্রাম শিলা আছে।

শ্রীশীতল চন্দ্র দাস, প্রধান শিক্ষক,
মনসুকা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খিলা, হাওড়া।

৪। গ্রাম : কানুপাট। ৪৮।২৬৬ ১৮।২৫২।১,১৫৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে বারটি পাড়া আছে। যেমন—মণ্ডল-পাড়া, বেরাপাড়া, মাইতিপাড়া, রায়পাড়া, সামন্তপাড়া, তাঁতিপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে অবস্থিত মুন্সীরহাট রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। পাতুয়া হইতে মোটরবাসেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামের পশ্চিম সীমানা দিয়া জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা আছে। বর্ষাকালে দামোদর নদ দিয়া নৌকায় যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) বৈশাখ অথবা জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যার মধ্যে যে-কোন শনি অথবা মঙ্গলবার কালীপূজা, ভাদ্র মাসে মনসাপূজা উপলক্ষে অরন্ধন উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং মল সংক্রান্তি উৎসব, পৌষ মাসে পৌষ পার্বণ উপলক্ষে লক্ষ্মীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবগুলি সর্বজনীন। দুর্গাপূজাটি গত বাইশ বৎসর যাবত এবং অন্যান্য উৎসবগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত।

ইহাভিন্ন গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি দেবালয়ে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উৎসবাদি পালন করা হয়। যেমন—ধর্মরাজ ঠাকুরের পাকা মন্দিরে ধর্মরাজ ঠাকুরের শিলামূর্তি ব্যতীত মনসার প্রতীক মনসা গাছ, ষষ্ঠীর প্রতীক পাথরের নুড়ি, নাড়ুগোপাল ও লক্ষ্মীনারায়ণের পিতলের মূর্তি এবং শীতলার ঘট স্থাপিত আছে। উক্ত দেবদেবীর নিত্য পূজা ব্যতীত মন্দিরে নবমীপূজা, দোল ও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ধর্মরাজের সেবায়েত ও পূজারী তপশীল সম্প্রদায়ভুক্ত। পূজারীর গোত্র কাশ্যপ এবং পদবী পণ্ডিত। শুনা যায়, বহুকাল পূর্বে জনৈক রমণী গ্রামের উত্তর সীমানায় প্রবাহিত দামোদর নদীতে (বর্তমানে ময়না) স্নান করিতে গিয়া নদীগর্ভে ধর্মরাজ ঠাকুরের শীলামূর্তি পাইয়া ছিলেন।

রঘুনাথ জীউ'-র পাকা মন্দিরে রঘুনাথ জীউর শীলা মূর্তির সহিত শীতলা ও মনসার মূর্তি আছে। মন্দিরে নিত্যপূজার ব্যবস্থা আছে এবং ফাল্গুন মাসে সাড়ম্বরে চাঁচর ও দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রামে দুইটি শ্রীধরনাথের পাকা মন্দিরে শ্রীধরনাথের দুইটি শীলামূর্তি ব্যতীত শীতলা, মনসা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি আছে। ইহাদের নিত্য পূজা হয়।

কানুপাট গোপালজীউর মঠটি আমতা থানার ঝিখিরা ইউনিয়নের অন্তর্গত বয়াল গ্রামনিবাসী নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ৺রাম চন্দ্র দাস বাংলা ১২৮৪ সনের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ স্থানীয় লোকেদের সহায়তায় স্থাপন করেন। মঠে গোপাল, কানাই ও রাধারাণীর

দারুময় মূর্তি, মদনমোহনের প্রস্তর মূর্তি এবং বলরামের পিতলের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্যপূজা এবং বৎসরের বিভিন্ন সময়ে জন্মাষ্টমী, ঝুলন, দোল, চাঁচর প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ইহাছাড়া প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে মঠ প্রতিষ্ঠাতার তিরোধান উৎসব পালন করা হয়। এইদিন সমবেত প্রায় দুই হাজার নরনারীর মধ্যে ভোগ বিতরণ করা হয়।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনে ধর্মরাজের মন্দিরে "ধর্মের ঝাঁপ" অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন ধর্মরাজের মন্দির প্রাঙ্গণে কতকগুলি ময়রা-তেলেভাজা প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, তিনটি শীতলা ও পাঁচটি মনসার স্থান আছে। ইহাছাড়া দুইটি কালী-মন্দির, ধর্মরাজের মন্দির, রঘুনাথ জীউ'-র মন্দির, দুইটি শ্রীধরনাথের মন্দির এবং একটি গোপালজীউ-র মঠ আছে।

শ্রীনবকুমার মাইতি, শিক্ষক,
গ্রাম: কাসুপাট, পোঃ রায়চক, হাওড়া।

৫। গ্রাম : সোনাতলা। ৫২।১৩০'৭২।৫৩১।২,৭৬০

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কলু, স্বর্ণকার, জেলে, কুমার, মালী, তামলী, ধোপা, নাপিত, দুলে ও মুসলমান।

গ্রামে বামনপাড়া, করাতিপাড়া, পাইনপাড়া, দাসপাড়া, ধোপাপাড়া, আদকপাড়া, কুমারপাড়া, জেলেপাড়া, দুলেপাড়া, বারুইপাড়া, পাঁজাপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে অবস্থিত আমতা অথবা মুন্সীরহাট রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। পাতুয়া হইতে মুন্সীরহাট পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে তিনদিনব্যাপী শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত উৎসব দুইটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় ছয় শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনীযুক্ত সাধারণের একটি দেবালয়ে গ্রামের সকল প্রকার পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই দেবালয়ে একটি শিবের প্রস্তর মূর্তি আছে। ইহাছাড়া গ্রামে দুইটি শীতলা, তিনটি মনসা ও দুইটি পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

শ্রীকাশীনাথ করাতি, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ সোনাতলা, হাওড়া।

৬। গ্রাম : কানসোনা। ৫৬।২৪৬'৯৭।১৯০।১৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোপ, ময়রা, বর্গক্ষত্রিয়।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে মুন্সীরহাট রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। আমতা স্টেশন হইতেও রিক্সাযোগে গ্রামে যাতায়াত করা চলে। মুন্সীরহাট হইতে পাতুয়া গ্রাম পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে। পাতুয়া হইতে পশ্চিমে প্রায় তিন মাইল হাঁটাপথে গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামের মধ্য দিয়া উত্তর-দক্ষিণে সুদীর্ঘ জেলাবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। বর্ষাকালে আমতা হইতে দামোদর নদে নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিন ব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত বার বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামের শ্মশানে শ্মশানেশ্বর শিবের মন্দির আছে।

শ্রীপুলিন বিহারী চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক,
পাথিয়াগড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়,
পোঃ খাসমহল বালিচক, হাওড়া।

কানসোনা—কানসোনা গ্রামে পীর গোরাচাঁদের আস্তানা ও পুকুর আছে। রোগমুক্তি কামনায় হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই এই পুকুরে স্নান করিয়া থাকেন।

[বাংলায় ভ্রমণ : ২য় খণ্ড, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ হইতে ১৯৪০ সালে প্রকাশিত, পৃঃ ১৩১।]

জেলা : হাওড়া
থানা : উদয়নারায়ণপুর

উৎসব বিবরণী

কালীপূজা

সিংটী গ্রামে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের অমাবস্যা-তিথিতে সাড়ম্বরে রক্ষাকালী পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব। ইহা প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন উৎসব। শুনা যায় পূর্বে এই গ্রামটি আমতা থানার খড়িয়প গ্রামের বসু পরিবার-গণের জমিদারীভুক্ত ছিল। উক্ত জমিদারগণ নিজ গ্রামে রক্ষাকালী পূজা উপলক্ষে বারোয়ারী উৎসব করিতেন এবং পরে এই গ্রামে ঐ প্রকার বারোয়ারী উৎসব প্রবর্তন করেন। সেই হইতে উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে। গ্রামে একটি কালী মন্দির আছে। উৎসব উপলক্ষে এই মন্দিরে কালীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে পূজা হয়। উৎসবটি একদিনের বটে তবে উৎসবের পরেও কয়েকদিন মন্দিরে প্রতিমা রাখা হয় এবং ঐ কয়দিন প্রত্যহ সকাল-বিকাল যৎসামান্য উপকরণাদির দ্বারা পূজা দেওয়া হয়। গ্রামের প্রতিটি পরিবার নূতন মাটির সরায় করিয়া রক্ষাকালীর নিকট সাধ্যমত পূজা দেন। কালীর নিকট প্রধানতঃ ছাগ বলি মানত করা হয়। উৎসবের দিন মানত স্বরূপ প্রায় দেড়শত ছাগ বলি হয় এবং বালক ভোজন ও দুই-তিন রাত্রি যাবত যাত্রাভিনয় ও কবিগানের আসর বসে।

পূজার প্রধান সেবায়েত হিসাবে গ্রামস্থ চারজন ব্যক্তিকে গণ্য করা হয়। ঐ চারজনের মধ্যে তিনজন মাহিষ্য এবং অপরজন শোলাংকী সম্প্রদায়ভুক্ত। পূজারী ব্রাহ্মণ, ভিন্ন গ্রামে বাস করেন।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

কানুপাট গ্রামে সর্বসাধারণের দুইটি কালীমন্দিরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে একযোগে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। শিবের কোন মূর্তি নাই, দুইটি প্রাচীন শিলাখণ্ডকে শিব জ্ঞানে পূজা করা হয়।

চৈত্র সংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে গাজন উৎসব আরম্ভ হয় এবং সংক্রান্তির দিন উৎসব শেষ হয়। অর্থাৎ চারদিনব্যাপী এই উৎসব চলে। উৎসবের কয়দিন যাঁহারা শিবের নামে সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন, তাঁহারা সারাদিন অনাহারে থাকিয়া সূর্যাস্তের পর যথারীতি শিবের পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া জল গ্রহণ করেন। উৎসব উপলক্ষে নীলপূজা এবং তৃতীয় দিনে ধর্মরাজ মন্দিরে "ধর্মের ঝাঁপ" ও চতুর্থদিনে "শিবের ঝাঁপ" প্রভৃতি অনুষ্ঠান পালন করা হয়। ঝাঁপের পূর্বে শিবের সম্মতি গ্রহণ করিবার জন্য পুরোহিত শিবের মাথায় চন্দন লেপন করিয়া তাহার উপর তিনটি বিল্ব পত্র স্থাপন করেন এবং শিবের নিকট প্রার্থনা জানান। ঐ বিল্বপত্র আপনা-আপনি শিবের মস্তকচ্যুত হইলে ঝাঁপ অনুষ্ঠানে শিবের সম্মতি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হয়। শিবের ঝাঁপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এই দিন মন্দির প্রাঙ্গণে বহু দর্শকের সমাগম হয়।

লক্ষ্মীপূজা

কানুপাট গ্রামে প্রতি বৎসর জলসংক্রান্তিতে গ্রামবাসীরা লক্ষ্মীপূজা করিয়া থাকেন। ঐ দিনটি "লক্ষ্মীর সাধের দিন" নামে অভিহিত করা হয়। উৎসবটি প্রাচীন এবং উৎসবের দিন সকালে একটি জলগাছ (?) কাটিয়া কিছু আতপ চাল, দুধ, তালের আঁটির শাঁস, কাঁচা ওল একসাথে মিশ্রিত করিয়া উহার কিছু অংশ একটি "রেহিড়" পাতার দ্বারা মুড়িয়া উক্ত গাছের সহিত ভাদ্র মাসের কাঁচা পাট দিয়া বাঁধা হয় এবং গাছটিকে ধানের ক্ষেতে পুঁতিয়া নিম্ন-লিখিত শ্লোকটি পাঠ করা হয় :

"আশ্বিন গেল কার্তিক এল ছোট বড় ধান সুফল হ'ল
ওল কুট কুট রোইড় পাতা খাও লক্ষ্মী সাধ ভাত।
কাটলে দিলাম জল ধান এলে গজগল্
জল পড়ল ভূঁয়ে শনি যাও উত্তর মুয়ে।"

শিবরাত্রি

দামোদর নদের পশ্চিম তীরে এবং কানসোনা গ্রামের দক্ষিণদিকে নির্জন শ্মশান সংলগ্ন "শ্মশান কুটীর আশ্রম"-এর

সীমানার মধ্যে অবস্থিত একটি মন্দিরে শ্মশানেশ্বর শিব নামে খ্যাত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই শিব ও আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধু আত্মানন্দ গিরি ও তাঁহার সহধর্মিণী। আত্মানন্দগিরি এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি একজন সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। পরে বাঁকুড়া জেলার মণিপুর গ্রামের ব্রহ্মচারী পাগলাবাবার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সস্ত্রীক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণপূর্বক উল্লিখিত আশ্রম ও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধনভজন আরম্ভ করেন।

প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে এই আশ্রমে শ্মশানেশ্বর শিবকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গত সাইত্রিশ বৎসর যাবত অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রারম্ভে উৎসবটি সাধু আত্মানন্দগিরি ও তাঁহার ভক্তবৃন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ফাল্গুন চতুর্দশী তিথিতে তাঁহারা শিবের পূজা এবং সারাদিনব্যাপী কীর্তন ও ধর্মালোচনা করিতেন। পরের দিন ভক্তবৃন্দদের সাধ্যমত প্রদত্ত চাউল-ডাল দিয়া শিবের অন্নভোগ দেওয়া হইত এবং ঐ ভোগ ভক্তদের মধ্যে বণ্টন করা হইত। বর্তমানে ইহা এই অঞ্চলের সর্বজনীন উৎসব।

উৎসবটি পনেরদিনব্যাপী চলে। প্রস্তুতি আরম্ভ হয় আরও তিন-চারদিন পূর্ব হইতেই। প্রস্তুতি কার্যের মধ্যে পূজামণ্ডপ, ভোগরন্ধনশালা, নহবতখানা, বাজী-ওয়ালাদের ঘর এবং সমাগত যাত্রীদের আসবাবপত্র রাখিবার জন্য অস্থায়ী শিবির নির্মাণ করা হয়।

উৎসবের দিন সন্ধ্যা হইতে যথারীতি শিবপূজা আরম্ভ হয়। এই দিন সন্ধ্যা হইতেই মণ্ডপে হরিনাম সংকীর্তনের আসর বসে এবং পরের দিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত এই পর্ব স্থায়ী হয়। চতুর্দশীর দিন রাত্রে পূজা প্রাঙ্গণে প্রচুর আতসবাজী পোড়ান হয়। আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে উৎসবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী উৎসবে শান্তি-শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনা কার্যে সাহায্য করিয়া থাকেন।

জেলা ঃ হাওড়া
থানা ঃ উদয়নারায়ণপুর

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোভাবের মেলা
(ভাই খাঁ পীর)

সিংটী গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ গ্রামের পশ্চিমদিকে বিস্তীর্ণ মাঠে আনুমানিক প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বিঘা জমির উপর ভাই খাঁ পীরের উরস্ উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলার জমির কিয়দংশ পীরের নামে উৎসর্গীকৃত এবং অবশিষ্টাংশ স্থানীয় গ্রামবাসীর। গ্রামবাসীগণ মেলাটিকে প্রায় সাতশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করেন। ইহা মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়; তবে মেলার কিছু কিছু দোকানপাট দুই-তিনব্যাপী থাকে।

মেলায় হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। সিংটী ইউনিয়ন ভিন্ন গড়ভবানীপুর, দেবীপুর, উদয়নারায়ণপুর, রসপুর, ঝিকিরা, খালনা প্রভৃতি বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে এবং আমতা থানা, কোলাঘাট এবং কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর মেলায় লোকজন আসিয়া থাকেন।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আমতা থানা হইতে আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়। সমগ্র দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা এবং অন্যান্য খাবারের দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, তামা, পিতল, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসন, মনিহারী দোকান, জামাকাপড়ের দোকান, কৃষি যন্ত্রপাতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির খেলনা, বই-ছবি প্রভৃতির দোকানপাট বসে। শিল্প সামগ্রী ও কারুশিল্পের দোকানগুলি প্রতি বৎসর হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী, লটারী এবং মানিক পীরের গান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। ঐ সকল আমোদ-প্রমোদের দল প্রধানতঃ হুগলী জেলা হইতে আসে। হুগলী জেলার হরিণখোলার জমিদারবাবুদের হাতী মেলায় আসে। এক আনার পরিবর্তে মেলায় আগত বহু বালক-বালিকা হাতীর পিঠে উঠিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকে। কোন কোন বৎসর মেলায় ঘোড়দৌড় হয়।

মেলায় নিয়ম-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পুলিশ ও স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকদল উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া মেলায় পানীয় জল সরবরাহ বিষয়ে স্বেচ্ছাসেবকদলের কাজ প্রশংসনীয়।

চড়ক-গাজন-নীলপুজার মেলা

রামপুর গ্রামের মধ্যপাড়ায় অবস্থিত হট্টেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে চড়ক উৎসব উপলক্ষে একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন এবং চারদিনব্যাপী স্থায়ী হয়।

আশেপাশের পার শ্যামপুর, ক্ষেমপুর, ঘোলা, ডিহি-ভূরশীট প্রভৃতি গ্রাম হইতে মেলায় প্রায় সাত-আটশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় মাত্র দশ-বারটি দোকানপাট বসে এবং বার-তেরজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয় এবং প্রধানতঃ মেলায় খাবার ও মনিহারী দোকানপাট দেখা যায়।

আমোদ প্রমোদের জন্য মেলায় যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামের একটি যাত্রাদলই অভিনয় করিয়া থাকেন।

সোনাতোলা গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবপূজা উপলক্ষে গ্রামে সাধারণের জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে; ইহা প্রায় ছয়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় নিকটবর্তী গ্রাম হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয় এবং পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে ও আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ স্থানীয় ও আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান,

মনিহারী দোকান, মাটির পুতুল, শোলার খেলনা এবং শিল্পসামগ্রীর দোকানপাট উল্লেখযোগ্য।

শিবরাত্রির মেলা

কানসোনা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের চতুর্দশী তিথিতে শ্মশানেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে আশ্রম সংলগ্ন দামোদর নদের তীরে প্রায় কুড়ি-বাইশ বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলার সামান্য অংশ আশ্রমের সত্বাধিকারে এবং বাকী অংশ ব্যক্তি-বিশেষের। মেলাটি গত বার-বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন ইউনিয়ন হইতে সকল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় ত্রিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা নিকটবর্তী ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা এবং মনিহারী দ্রব্য, লোহা-কাঁচ-মাটি ও তামা-পিতলের বাসনকোসন, জামা-কাপড়, কৃষি ও কারিগরি জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের জিনিসপত্র, মাটির পুতুল, বই-ছবি প্রভৃতি আমদানী হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী, সার্কাস, নাগরদোলা ও লণ্ঠন বায়োস্কোপ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

রামনবমী উৎসব

[হাওড়া জেলার জগাছা থানার অন্তর্গত সাঁত্রাগাছিতে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে রামনবমী উৎসব ও তদুপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে ২১শে চৈত্র, ১৩৬৭ সনে "আনন্দবাজার পত্রিকা"-য় শ্রীবিভূতি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত প্রবন্ধটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

"শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি রামনবমীতে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ সাঁত্রাগাছির রামরাজা মেলা। এত দীর্ঘদিন স্থায়ী মেলা সম্ভবতঃ বাংলাদেশে দ্বিতীয় নেই। চৈত্র মাসের শুক্লানবমী থেকে শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার পর্যন্ত সমানভাবে চলে এই মেলা। মেলার বিশেষ আকর্ষণ শ্রীশ্রীরামরাজার বিরাট প্রতিমা। তেইশ ফুট উচ্চ এই প্রতিমার সীতারাম ছাড়াও আরও চব্বিশটি বিগ্রহ আছে। এরূপ সুবৃহৎ প্রতিমা পূজার ব্যবস্থা বোধ হয় বাংলাদেশে আর কোথাও নেই। দূর-দূরান্তর থেকে বহু পূজার্থী আসেন রামরাজা মেলায় শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনাকাঙ্ক্ষায়।

রামরাজা পূজাকে কেন্দ্র করেই নিকটবর্তী রেলস্টেশনের নামকরণ হয়েছে রামরাজাতলা। হাওড়া স্টেশন থেকে রামরাজাতলার দূরত্ব চার মাইল মাত্র। পূর্বে সাধারণত রেলপথেই যাত্রীরা আসতেন, এখন আসেন ৫২ নম্বর বাসে।

রামরাজা পূজার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে জানা যায় প্রায় দু'শো বছর আগে জমিদার অযোধ্যারাম চৌধুরী এই পূজার প্রবর্তন করেন। সাঁত্রাগাছিতে এই চৌধুরী পরিবার ঠিক কতদিন আগে এসে বসবাস আরম্ভ করেন, তা জানা না গেলেও এই পরিবারের বদান্যতা ও প্রভাব প্রতিপত্তির বহু কীর্তি কথা লোকমুখে শুনা যায়। অযোধ্যারাম ছিলেন রামভক্ত। তিনি নিজ গৃহে সাড়ম্বরে তাঁর ইষ্টদেবের পূজা করতেন। এক সময়ে শ্রীরামচন্দ্রের মৃন্ময় মূর্তি পূজার প্রবল বাসনা হল তাঁর। তিনি ভাবতে লাগলেন কেমন মূর্তি হবে শ্রীরামচন্দ্রের। তিনি কি সীতা-লক্ষ্মণ সহ বনচারীর রূপে পূজিত হবেন? অথবা যুদ্ধরত ধনুর্ধারী রাবণারি বা সীতাপতি রামচন্দ্র হবেন। এ সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে—ইষ্টদেবের মূর্তি কল্পনায় উক্ত অযোধ্যারাম যখন একান্ত ব্যাকুল চিত্ত—সীতারামের নাম ও চিন্তায় তন্ময়—বিভোর, সেই সময়ে ভক্তের ভগবান একদিন দেখা দিলেন স্বপ্নে। দেখা দিলেন সীতারামের যুগল রাজারানী মূর্তিতে। হঠাৎ স্বপ্নাবেশে এই মূর্তি দর্শনে বিহ্বল হয়ে পড়লেন অযোধ্যারাম। স্বপ্ন গেল ভেঙ্গে। তিনি ভাবতে লাগলেন। তবে কি তাঁর ইষ্টদেব এই মূর্তিতেই প্রকাশমান হবেন? সংশয় মেটে না অযোধ্যারামের। তিনি বার বার আকুতি জানালেন

দেবতার চরণে,—'বল ঠাকুর, এই মূর্তিই আমি প্রতিষ্ঠা করব?' ভক্তের আকুতি শুনলেন ভগবান। পরদিন পুষ্করিণীতে স্নানকালে আবার আবির্ভূত হলেন শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যারামের নয়ন পথে,—জলে নিমজ্জমান অবস্থায়। অন্তর পুলকিত হল, রোমাঞ্চিত হলেন অযোধ্যারাম। ভক্তি গদগদকণ্ঠে তিনি তার কুল পুরোহিত সেকালের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত হলধর ন্যায়রত্নকে জানালেন শ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাবের কথা। অতঃপর ন্যায়রত্ন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে মহাসমারোহে সীতারামের মৃন্ময়ী মূর্তি পূজা করলেন অযোধ্যারাম। ভক্ত অযোধ্যারামের মনের পাতায় ধরা দেওয়া সেদিনের সেই মূর্তিই আজকের রামরাজা।

রামরাজা পূজা প্রবর্তনের পূর্বে সাঁত্রাগাছির এই অঞ্চলে মহাসমারোহে সর্বসাধারণের 'সরস্বতী পূজা' হ'ত। স্থানীয় ভাড়ড়ী, লাহিড়ী, মৈত্র প্রভৃতি এই পূজার উদ্যোগী ছিলেন। যাত্রা, থিয়েটার, কীর্তনাদির মাধ্যমে এক পক্ষকাল ধরে চলতো এই সরস্বতী পূজার উৎসব। শ্রীরামচন্দ্রের পূজা প্রবর্তনে সংঘর্ষ দেখা দিল দুই পূজার কর্তৃপক্ষের মধ্যে। সুখের কথা, সংঘর্ষ চরম আকার ধারণ করার পূর্বেই উভয় পক্ষের প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা সচেতন হলেন। তখন এঁদের মধ্যস্থতায় স্থির হল যে, অতঃপর একটি পূজা অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্রের পূজাই প্রতি বৎসর নিয়মিত ভাবে হতে থাকবে। তবে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তির উপরিভাগে থাকবেন বাগ্‌দেবী শ্রীশ্রীসরস্বতী এবং শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি নির্মাণের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হবে 'সরস্বতী পূজার' দিন শ্রীপঞ্চমীর শুভলগ্নে। এইদিন যথারীতি পূজানুষ্ঠানের পর বালক বালিকাদের মধ্যে মিষ্টান্ন ও প্রসাদাদি বিতারিত হবে। এছাড়া আরও ঠিক হল যে, অতঃপর শ্রীরামচন্দ্রের পূজা তিন দিনের পরিবর্তে পনর দিন ধরে চলবে। এই সর্তগুলি আজও যথারীতি প্রতিপালিত হয়। দেবদেবীর বিগ্রহবহুল রামরাজা প্রতিমায় সীতারামের উপরিভাগে দেবী সরস্বতী মধ্যমণি হয়ে আছেন। বর্তমানে যদিও চার মাসাধিক কাল শ্রীরামচন্দ্রের পূজা-ভোগাদি হয়ে থাকে, তথাপি পূর্ব সিদ্ধান্তানুযায়ী এখনও পনরদিন দেবতার বিশেষ পূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা আছে।

বর্তমানে রামরাজা মেলা যেস্থানে হয়, এ স্থানটি নির্বাচিত হয়েছে রামরাজার প্রতিষ্ঠাতা অযোধ্যারামের পরলোকগমনের পর। রামরাজা পূজা বা মেলার স্থায়ীত্ব, স্থান নির্বাচন নিয়েও যথেষ্ট বাক্‌বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। অবশেষে তৎকালীন এই অঞ্চলের সুধীবর্গের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে বর্তমান স্থানটি পূজা ও মেলার জন্য নির্দিষ্ট হয়।

রামরাজার প্রতিমা বিশেষ আকর্ষনীয়। প্রতিমায় মোট ছাব্বিশটি বিগ্রহের মধ্যে রাজা রূপে রামচন্দ্র তদীয় বামপার্শ্বে সীতা, দক্ষিণে লক্ষ্মণ, তাঁর পাশে মহাদেব। রামচন্দ্রের বামপার্শ্বে ব্যজনরত ভরত, তদীয় পার্শ্বে ব্রহ্মা। দ্বিতীয় সারিতে একদিকে শত্রুঘ্ন, অপর দিকে বিভীষণ, তন্নিম্নে নন্দীভৃঙ্গী, বশিষ্ঠ, বাল্মিকী, হনুমান, জাম্বুবাণ এবং উপরিভাগে সরস্বতী, দুর্গা প্রভৃতি বিরাজমানা। এছাড়া প্রতিমার সম্মুখে পৃথকভাবে রামভক্ত শ্রীহনুমান, মণ্ডপের পূর্বদিকে সাবিত্রী-সত্যবান এবং বামন ভিক্ষা লীলার বিগ্রহাদি আছে। পূর্বে মণ্ডপের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকের সমস্ত ঘরে বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যান, সামাজিক নকসা পুতুলের সাহায্যে প্রদর্শিত হত। এখন এই সব স্থান অধিকার করেছে মেলার দোকান পসারিগণ।

মেলায় আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয় মাঝে মাঝে। প্রায় শনিবারেই যাত্রা, থিয়েটার বা ঐরূপ কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়। তাছাড়া রামায়ণ গান, কীর্তনাদি তো আছেই।

রামরাজা পূজার প্রতিষ্ঠাতা ও অনুষ্ঠাতৃগণের বংশধরগণ আজও এই পূজা ও মেলার পরিচালনা করছেন। রামরাজার সেবাইত শ্রীপবন চন্দ্র কাব্যতীর্থ চৌধুরীদের কুলপুরোহিত—পূর্বোক্ত হলধর ন্যায়রত্নের বংশধর।

রামরাজার নিরঞ্জন উৎসব হয় শ্রাবণ মাসের শেষ রবিবার। অবশ্য শ্রাবণ মাস মলমাস হলে নিরঞ্জন অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায় আশ্বিন মাস পর্যন্ত। কিন্তু এরূপ ক্বচিৎ হয়ে থাকে। রামরাজা নিরঞ্জনের শোভাযাত্রাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই শোভাযাত্রা লোকে দেখতে আসে বহুদূর থেকে। লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হয় শোভাযাত্রায়।

শোভাযাত্রার পূর্বে নির্দিষ্ট পথের টেলিফোনের তার খুলে রাখতে হয়। এ নিয়ে রামরাজা বারোয়ারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বেঙ্গল টেলিফোনের মামলা-মোকদ্দমা হয়ে ঐরূপ ব্যবস্থা স্থিরীকৃত হয়েছে। এ ছাড়া ট্রাম কোম্পানীকে প্রতিমার উচ্চতাহেতু জি. টি রোডে ট্রামের তার উঁচু করে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়।

রামরাজা উৎসবের সঙ্গে আরও তিনটি বারোয়ারী প্রতিমার উৎসব যুক্ত হয়েছে। এই তিনটি বারোয়ারীর পূজাও বহুদিন থেকে চলে আসছে। এই তিনটির দুইটি সাতঘরা ও বাকমাড়ার নরনারী ও তৃতীয়টি ইছাপুর বারুজীবী সমিতির 'সৌখচণ্ডী'। নিরঞ্জনের শোভাযাত্রায় নানারূপ বাদ্যের সাথে বন্দনা ও কীর্তনগানও থাকে। তাছাড়া শোলার বড় বড় পুতুল, নানারকম সঙ, পুতুলনাচ প্রভৃতিতে শোভাযাত্রাটি জমজমাট হয়ে উঠে। রামরাজাকে কেন্দ্র করে চারমাস শাঁত্রাগাছি উৎসব মুখর থাকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—বেলুড়

অরুণ কুমার রায়

হাওড়া জেলার বালি থানার অন্তর্গত বেলুড় হাওড়া সদর হইতে প্রায় চার মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে ইহা একটি শহর এবং পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি স্টেশন আছে। হাওড়া হইতে মোটরবাসেও বেলুড়ে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

এইস্থানে গঙ্গার পশ্চিমতীরে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান কার্যালয় প্রসিদ্ধ বেলুড়মঠ অবস্থিত। পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের তিরোধানের পর স্বামী বিবেকানন্দ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধন ও মনুষ্যত্বের চরম বিকাশ সাধনের উদ্দেশে ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই মঠ ও মিশন অগণিত ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসীর আধ্যাত্মিক জীবনে সহায়তা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রসার এবং এই মঠ কর্তৃক পরিচালিত চিকিৎসালয়, মহাবিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় কারিগরি ও হস্ত-শিল্প শিক্ষাকেন্দ্র, ছাত্রনিবাস, অনাথ আশ্রম, গ্রন্থাগার প্রভৃতি বিবিধ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানাবিধ সমাজ কল্যাণমূলক কার্য সাধন করিতেছেন। ইহাভিন্ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মহামারী পীড়িত দুস্থ ও আর্ত ব্যক্তিদের সাহায্য এবং সেবা করাও মঠের বহুমুখী কার্যের একটি অঙ্গ। বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের মোট ৮৮টি শাখা বা কেন্দ্র আছে।

বেলুড় মঠের সীমানার মধ্যে অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দিরটি গত ইং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী ও বিদেশী বহু ভক্ত ও অনুরাগীদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। মন্দিরটি নির্মাণ করিতে মোট প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। মন্দিরটির গঠন পরিকল্পনাও স্বামী বিবেকানন্দের; যদিও তাঁহার জীবদ্দশায় ইহা নির্মিত হয় নাই। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরের দৈর্ঘ ২৩৩ ফুট এবং প্রস্থ ১০৯ ফুট। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রার্থনাগৃহের দৈর্ঘ ১৫২ ফুট, প্রস্থ ৭২ ফুট এবং উচ্চতা ৪৮ ফুট। প্রার্থনাগৃহের মেঝে মার্বেল পাথর দ্বারা নির্মিত এবং ইহার উত্তর দিকের শেষ সীমান্তে একটি বেদীর উপর উপবিষ্ট ঠাকুর রামকৃষ্ণের পূর্ণাবয়ব শ্বেত প্রস্তর নির্মিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র মন্দিরটি লাল বেলে পাথর দ্বারা প্রস্তুত। এইরূপ সুউচ্চ ও বিশাল মন্দির পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও দেখা যায় না। অপূর্ব স্থাপত্য শিল্প বৈশিষ্ট্যের জন্যও মন্দিরটি বিখ্যাত।

এই মন্দিরে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যথারীতি নিত্য পূজার্চনা হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় প্রার্থনাগৃহে সন্ধ্যারতি, রামকৃষ্ণ কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত ও ভক্তিমূলক গানের আসর বসে। ইহা দেখিবার জন্য বহু নরনারীর সমাবেশ হয়। ইহাভিন্ন প্রতি রবিবার মন্দিরে বহু দর্শক আসেন। বৈশাখ হইতে আশ্বিন মাস পর্যন্ত সকাল

৫½ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২ ঘটিকা ও বিকাল ৪ ঘটিকা হইতে সন্ধ্যা ৭½ ঘটিকা এবং কার্তিক মাস হইতে চৈত্র মাস পর্যন্ত সকাল ৬½ ঘটিকা হইতে দুপুর ১২ ঘটিকা ও বিকাল ৩½ ঘটিকা হইতে ৬½ ঘটিকা পর্যন্ত সাধারণ দর্শকের জন্য মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকে।

এই মঠের প্রধান উৎসব হইল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের আবির্ভাব মহোৎসব। ইহা প্রতি বৎসর ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে মহাসমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে দেশ-বিদেশ হইতে লক্ষাধিক ভক্ত, অনুরাগী ও সন্ন্যাসীর সমাগম হয়।

উল্লিখিত উৎসবটি ব্যতীত বেলুড় মঠে প্রতি বৎসর বৈশাখী অমাবস্যা তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় স্নানযাত্রা, আশ্বিন মাসে শারদীয়া দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে কালীপূজা, মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা এবং মাঘী কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন এইস্থানে রামকৃষ্ণ মঠের সাধক স্বামীজীদের এবং অন্যান্য মহাপুরুষদিগের আবির্ভাব মহোৎসব পালন করা হয়। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য, বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্যদেব, যীশুখ্রীষ্ট, সারদামা ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বেলুড় মঠের যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে পালিত হয়।

বেলুড় মঠের সীমানার মধ্যে অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দের সমাধি মন্দির ও তাঁহার বাসস্থান, শ্রীমা সারদামণির মন্দির এবং বেলুড়মঠের অধ্যক্ষ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তু।

বেলুড় মঠে স্বামী
বিবেকানন্দের
সমাধি মন্দির

বেলুড় মঠ, হাওড়া

॥ হুগলী ॥
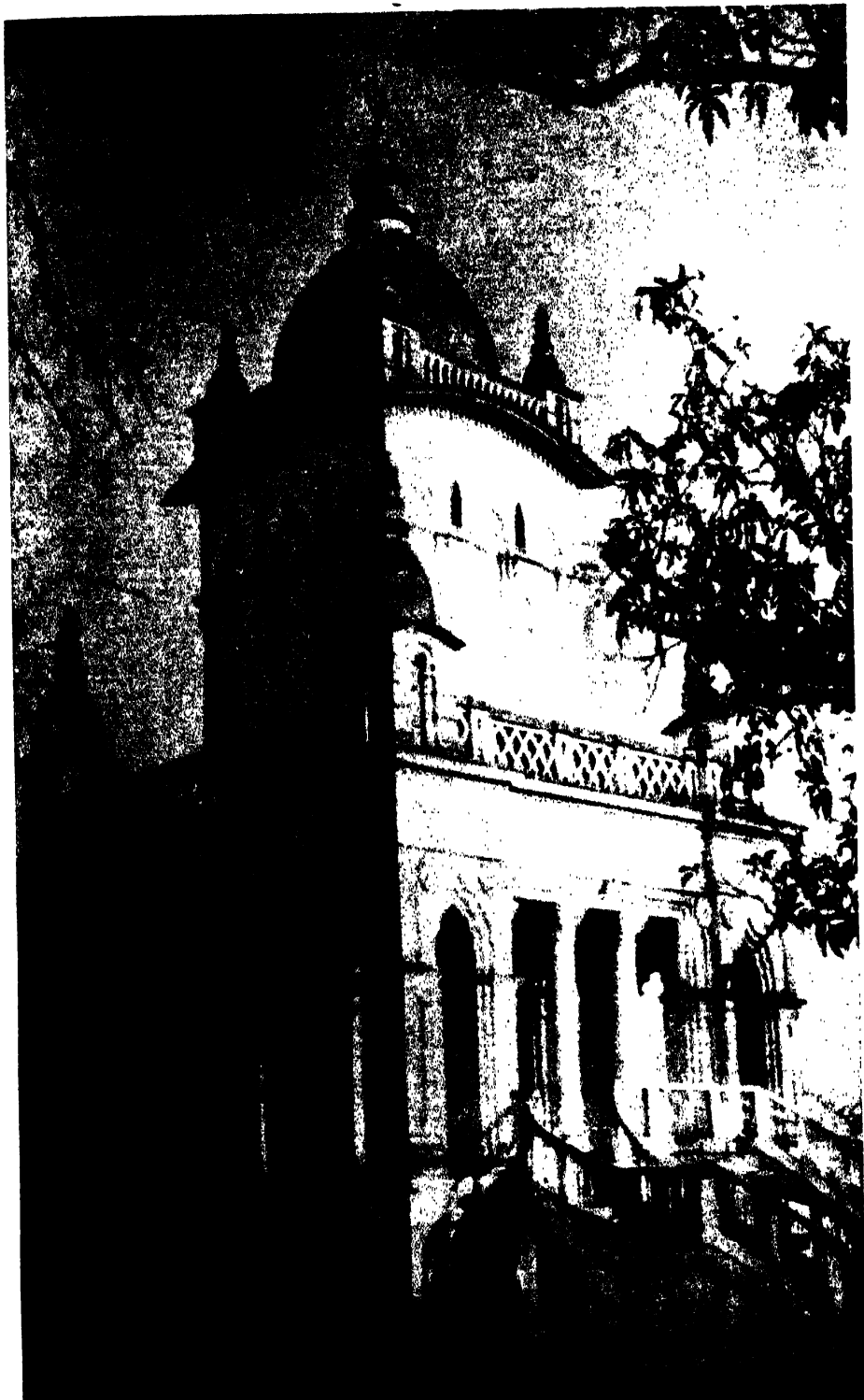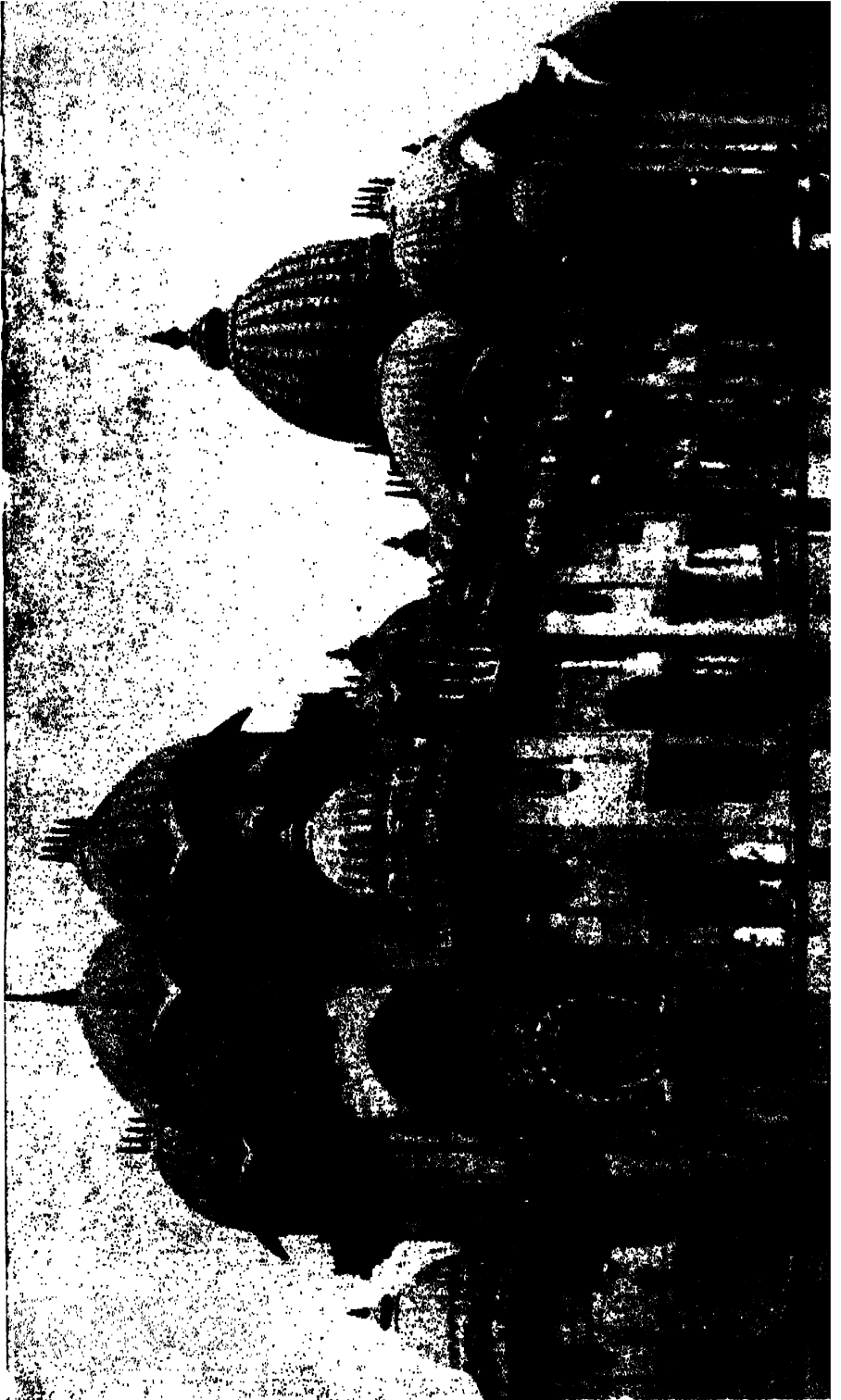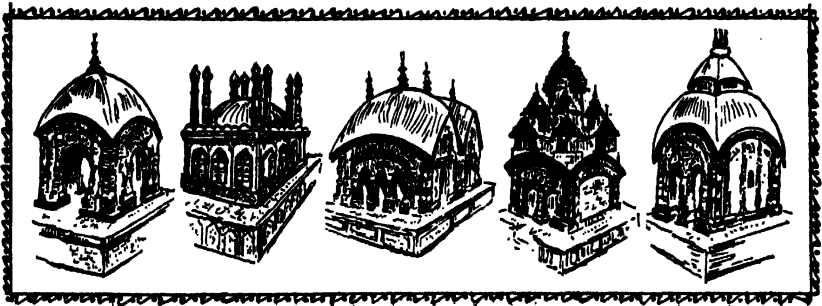
মানচিত্রে
হুগলী জিলার
পূজা-পার্বণ ও মেলা

পূজা পার্বণের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, গন্ধেশ্বরী, গৌরী প্রভৃতি ... ...

শিব, শিবরাত্রি, চড়ক, গাজন, গম্ভীরা প্রভৃতি ·· ... ...

ধর্মরাজ-গাজন প্রভৃতি ... ...

বিশালাক্ষী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, চণ্ডী, মনসা, (বিষহরি) শীতলা, ষষ্ঠী, নাগপঞ্চমী
গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি ·· ... ...

কার্তিক, গণেশ, বিশ্বকর্মা, শনি, ব্রহ্মা, ক্ষেত্রপাল প্রভৃতি ... ...

রাস, দোল, ঝুলন, পঞ্চমদোল, গোপাষ্টমী, রাধাষ্টমী, ফুলদোল, স্নানযাত্রা প্রভৃতি ... ...

স্নানাদি— বারুণী, পৌষসংক্রান্তি, মাঘীপূর্ণিমা, উত্তরায়ণ, মকরসংক্রান্তি প্রভৃতি ... ...

অনন্তচতুর্দশী, অক্ষয়তৃতীয়া, নববর্ষ, বৈশাখীপূর্ণিমা, ভীমএকাদশী
জামাইষষ্ঠী, অম্বুবাচী প্রভৃতি ... ...

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

আদিবাসীদের উৎসবাদি— বাঁধনা, করমপূজা, মারাংবু প্রভৃতি ... ...

পীরের উরস ... ...

সাধুসন্তদের আবির্ভাব-তিরোভাব উৎসবাদি ·· ... ...

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

জৈনদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

পূজা পার্বণ ও অন্যান্য উৎসব
জিলা হুগলী
উত্তর
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি o
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।
সম্পাদক।

মেলার উপলক্ষ ও লোকসমাগমের প্রতীক নির্দেশক

দুর্গা, কালী, অন্নপূর্ণা, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, মহামায়া, সর্বেশ্বরী, লক্ষ্মী, সরস্বতী,
মনসা, শীতলা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, যুগাদ্যা, গঙ্গা, দশহরা প্রভৃতি .. ..

চড়ক, গাজন, গম্ভীরা ... ...

শিব, শিবরাত্রি, ব্রহ্মা, কার্তিক, গণেশ, বিষ্ণু, বিশ্বকর্মা, পঞ্চানন্দ প্রভৃতি .. ..

রথযাত্রা, দোলযাত্রা, ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, গোষ্ঠাষ্টমী, রামনবমী, মহোৎসব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি · ...

মুসলমানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

খৃষ্টানদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

বৌদ্ধদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

পৌষসংক্রান্তি, পৌষপার্বণ, মাঘীপূর্ণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, অম্বুবাচী, বৈশাখীপূর্ণিমা,
নববর্ষ, অক্ষয় তৃতীয়া, অনন্ত চতুর্দশী, উত্তরায়ণ স্নান প্রভৃতি ... ...

আদিবাসীদের যাবতীয় উৎসবাদি ... ...

ধর্মরাজের গাজন ... ...

সাধু-সন্ত ও পীরের আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব ... ...

বিবিধ পূজা ও উৎসব ... ...

লোকসমাগম অনির্দিষ্ট ...
১,০০০ পর্যন্ত .. ...
১,০০১ — ২,৫০০ ...
২,৫০১ — ৫,০০০ ...
৫,০০১ — ১৫,০০০ ...
১৫,০০১ — ২৫,০০০ ...
২৫,০০১ এবং তদূর্ধ্ব ...

মেলার স্থান, উপলক্ষ ও লোকসমাগম
জিলা হুগলী
উত্তর
সাংকেতিক
জিলার সীমানা ...
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি ... ০
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে
প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব
সম্পাদক।
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
উত্তরপাড়া
তারকেশ্বর
পুরশুড়া

মাসপঞ্জীর প্রতীক নির্দেশক

মাস	প্রতীক
বৈশাখ	(১)
জ্যৈষ্ঠ	(২)
আষাঢ়	(৩)
শ্রাবণ	(৪)
ভাদ্র	(৫)
আশ্বিন	(৬)
কার্তিক	(৭)
অগ্রহায়ণ	(৮)
পৌষ	(৯)
মাঘ	(১০)
ফাল্গুণ	(১১)
চৈত্র	(১২)
চান্দ্রমাস	●
মাস অনির্দিষ্ট	◉

মেলার মাসপঞ্জী
জিলা হুগলী
উত্তর
পুরশুড়া
চন্দননগর
শ্রীরামপুর
উত্তরপাড়া
সাংকেতিক
জিলার সীমানা
মহকুমার ,,
থানার ,,
মৌজার অবস্থিতি
মানচিত্রটি বিবরণ প্রেরকের তথ্যের ভিত্তিতে
প্রস্তুত। ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্ভব।
সম্পাদক।

উপাসনাস্থলাদির প্রতীক নির্দেশক

কালী, দুর্গা, বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গঙ্গা, মহামায়া প্রভৃতি ... ...

শিব, ধর্মরাজ, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতি ... ...

চণ্ডী, শীতলা, মনসা, বিশালাক্ষী, ষষ্ঠী, পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর প্রভৃতি গ্রাম্য দেবদেবী ... ...

বিষ্ণু আদি যাবতীয় দেবতা ... ...

হিন্দু সাধুসন্তদের সমাধিমন্দির ... ...

পীর-ফকির প্রভৃতির সমাধিস্থল ... ...

মুসলমান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

জৈন সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপাসনাস্থল ... ...

আদিবাসীদের উপাসনাস্থল .. ..

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ পোলবা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ পোলবা। ৯৬।১,৪৯৩'৬২।৫৫২।২,৭৯৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, মাহিষ্য, কামার, বাগ্দী, খয়রা, বাউরী, হাড়ী, মুচি, দুলে, কেওরা, সাঁওতাল ও মুসলমান।

গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যথা—দুলেপাড়া, খয়রাপাড়া, বাউরীপাড়া, মুসলমানপাড়া, সাঁওতাল-পাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে মগরা ও প্রায় ছয় মাইল দূরে ব্যাণ্ডেল রেলস্টেশন।

শ্রীরামপুর হইতে চুঁচুড়া ও ব্যাণ্ডেলের মধ্য দিয়া ২নং রুটের মোটরবাস নিয়মিত যাতায়াত করে। ব্যাণ্ডেল হইতে মাজিনান রোড নামে একটি রাস্তা এবং মগরা হইতে অপর একটি পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে। ইহাভিন্ন রিক্সা ও মোটরগাড়ী যোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে গ্রামের দুই স্থানে রক্ষাকালী পূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা উৎসব, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসাপূজা, আশ্বিন মাসে গ্রামের দুই স্থানে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে সিদ্ধেশ্বরী কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। তাহাছাড়া বদর সাহেব পীরের আবির্ভাব উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন।

মনসাপূজার মেলা। ভাদ্র মাসে একদিন। মেলাটি সম্প্রতিকালের।

শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে এক সপ্তাহ-কাল। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে তিনটি ষষ্ঠী, পাঁচটি শিব, পঞ্চানন ও ধর্মরাজ ঠাকুর আছে।

শ্রীগোপাল চন্দ্র হালদার, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ পোলবা, হাওড়া।

পোলবা গ্রাম সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ২য় খণ্ড. গ্রন্থে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :—

পোলবা নামকরণ সম্বন্ধে জনশ্রুতি যে, পোলবায় পাল বংশের আদি পুরুষ নারায়ণ পাল ও তাহার ভাই জনার্দন পাল ৮৭০ সালে এই স্থানে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। তখন এই অঞ্চল দিয়া দামোদরের কয়েকটি শাখা ভাগীরথী অভিমুখে প্রবাহিত হইত। বন্যায় তখন গোস্বামী-মালিপাড়া, হারিট, মহানন্দ, দ্বারবাসিনী প্রভৃতি গ্রামগুলি প্রায়ই ভাসিয়া যাইত, তাই তাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ জায়গা দেখিয়া এই স্থানে বাস করেন।

পরে পাল বংশের বৃদ্ধির সময় তাঁহারা যেখানে বাস করেন, তাহা 'পালবাস' বলিয়া কথিত হয়। এই পালবাস বিকৃত হইয়া 'পালবা' এবং পরে পোলবায় পরিণত হইয়াছে। পোলবা গ্রামের সদ্‌গোপ বংশীয় পাল ও নিয়োগী ছাড়া রায় বংশ খুব প্রাচীন বলিয়া খ্যাত। প্রায় চারশ বৎসর আগে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ শ্যাম রায় এই গ্রামের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহারাজ প্রতাপাদিত্যের উচ্চপদস্থ রাজ কর্মচারী ছিলেন।

শ্যাম রায়ের "রায় বংশ" জনার্দন পালের "পাল বংশ" (সদ্‌গোপ) এবং সদ্‌গোপ কুলীন "নিয়োগী বংশ" এখানকার অতি প্রাচীন বংশ। শ্যাম রায়ের ৭ম অধস্তন পুরুষ হর চন্দ্র রায় কুচবিহার মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। তিনি পোলবার বসত বাটীতে অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত পূজার দালান, দ্বিতল নাটমন্দির ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্মাণ করেন। তিনি বাড়ীতে "গঙ্গাধর" শিব মন্দির স্থাপন করেন। কালক্রমে এই মন্দির অতিশয় জীর্ণ

হইলে শ্যাম রায়ের অধস্তন দশম পুরুষ প্রাণকৃষ্ণ মন্দির পুনঃ নির্মাণ করেন।

গ্রামের বারওয়ারী পূজিতা দেবতা শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার প্রাচীন মন্দির বিনষ্ট হইলে ১২৯৬ সনে ৺তারিণী চরণ দত্ত (এই গ্রাম নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ) মহাশয় ইহার নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

তিনি একটি পুষ্করিণী সংস্কার করিবার সময় একটি সুন্দর বাসুদেবের মূর্তি প্রাপ্ত হন। এই মূর্তিটি সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে নিত্য পূজিত হইতেছেন। মূর্তিটি গুপ্তযুগের মূর্তির মতন।

দত্তরা গ্রাম্যদেবতা রক্ষাকালীর ছোট মন্দিরটিও নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

প্রাচীন গ্রাম্য দেবতা শ্রীশ্রীবিষহরি বা মনসা দেবীর পূর্ব মন্দির জীর্ণ হইলে অনিল চন্দ্র বসু (এই গ্রাম নিবাসী দক্ষিণ রাঢ়ীয় প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ) একটি সুন্দর নূতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন।

ধর্মপ্রাণ জনার্দন পাল "গোপাল সাগর" নামক দীঘি কাটাইবার সময় ধাতুনির্মিত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধারাণী বিগ্রহ প্রাপ্ত হন। মাটি কাটিবার সময় কোদালের আঘাতে রাধারাণীর ডান হাত কাটা যায়। ছিন্নহস্ত রাধারাণী এবং শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয় অদ্যাপি পাল বংশে পূজিত হইতেছে। জনার্দন পালের অধস্তন কাশীনাথ পাল দেব সেবার জন্য বিস্তর ভূসম্পত্তির মহাত্রাণ প্রাপ্ত হন এবং নিজে অধিকন্তু প্রস্তরময়ী রাধাগোবিন্দ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পালদিগের বৃহৎ অট্টালিকা সংযুক্ত বসত বাটীর সম্মুখেই দেব মন্দিরে বিগ্রহগুলি নিত্য পূজিত হইতেছেন। গ্রামের হাটতলার কাছে ইহাদের দোলমঞ্চ এবং বাড়ীর কাছে রাসমঞ্চ ছিল, এইগুলি লুপ্ত হইয়া ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে।

সদ্‌গোপ বংশের নিয়োগী বাড়ী কুলীন ও সম্ভ্রান্ত। ইহাদের আর্থিক অবস্থা পূর্বে সমুন্নত ছিল। ইহাদের কৌলিক দেবতা "শ্রীধর" শালগ্রাম নিত্য পূজিত হইতেছে। পূর্বে ইহারা মহাসমারোহে রথযাত্রা ও দুর্গোৎসব পর্বের অনুষ্ঠান করিতেন।

প্রাচীন গ্রাম্য দেবতা—শ্রীশ্রীবিষহরি বা মনসা দেবী, ইহার বর্তমান মন্দির অনিল চন্দ্র বসু নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন—ইহা পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা—ইহার বর্তমান মন্দির তারিণী চরণ দত্ত নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন তাহাও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। গ্রাম্য দেবতা রক্ষাকালীর মন্দিরের বিষয়ও পূর্বে উক্ত হইয়াছে। দুলেপাড়ার মনসার মন্দির ওঁচাই নিবাসী তিলি জাতীয় ধর্মপ্রাণ সন্তোষ কুমার দে নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই গ্রামের দুইটি পারিবারিক শিব মন্দির ও বারওয়ারী ষষ্ঠী দেবীর মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

দুলেপাড়ার মনসা মন্দিরের কাছে ভাদ্র মাসের শেষভাগে প্রায় সপ্তাহব্যাপী ঝাপান মেলা হইয়া থাকে। [পৃঃ ৮২৭-৮৩০]

২। গ্রাম: তালচিনান সানিহাটী।

১০৮।১,৩০৪৮৮।২২২।২,২৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, বর্ণক্ষত্রিয় ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চুঁচুড়া হইতে চুঁচুড়া-ধনিয়াখালি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে দুইদিনব্যাপী জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু দিনের প্রাচীন এবং তালচিনান-সানিহাটী ও পোলবা গ্রামের সর্বজনীন উৎসব।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্রীধরনাথজীউ, বুড়াশিব, একটি পঞ্চানন, একটি শীতলা, দুইটি মনসা ও একটি শিবলিঙ্গ আছে।

শ্রীধর্মদাস বিশ্বাস, কৃষিজীবি,
গ্রামঃ তালচিনান,
পোঃ পুইনান, হুগলী।

৩। গ্রাম : সালুকগড় (মৌজা : পরঙ্কপুর)।
১১৮।৩৫০°০৫।৮৪।৪৮৮

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে। যথা—মণ্ডলপাড়া, ঘোষপাড়া ও বাঁকপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন হইতে মোটর বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বাংলা ১৩২১ সন হইতে আরম্ভ হয়। রথযাত্রার দিন একটি শালগ্রাম শীলাকে রথে স্থাপন করিয়া রথ বাহির হয়। উৎসবের দিন সমবেত লোকের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং সত্যনারায়ণ ও সত্যপীরের গান হয়। বর্তমান সেবায়েত শ্রীপাচুগোপাল বাঁক এবং পূজারী শ্রীসূর্যকান্ত চক্রবর্তী।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীপাচুগোপাল বাঁক, ব্যবসায়ী,
গ্রাম: সালুকগড়,
পো: রামনাথপুর, হুগলী।

৪। গ্রাম : মহানাদ (মৌজা : নগরপাড়া)।
১২৬।৪৩৪'১২।৮৪।৪৫৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, বারুজীবি, পদ্মরাজ, মোদক, স্বর্ণকার, মালাকার, যুগী, যাদব।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন। "মগরা-খানপুর রোড", "পাণ্ডুয়া-কল্যাণপুর রোড" ও "রামনাথপুর-হড়াল রোড"—এই তিনটি পথ দিয়াই গ্রামে যাতায়াত করা চলে। বর্তমানে মগরাগঞ্জ হইতে মগরা-খানপুর রোড ধরিয়া দ্বারবাসিনী পর্যন্ত চারখানি মোটরবাস দিনে দুইবার যাতায়াত করিতেছে।

(ঘ) ফাল্গুনী কৃষ্ণাচতুর্দশীতে শিবরাত্রি উৎসব। ইহা গ্রামের অন্যতম প্রধান উৎসব। উৎসবটি মানাদের জাত নামে খ্যাত। তাহাছাড়া, অন্নপূর্ণা, সরস্বতী, শ্যামা, রক্ষাকালী, শীতলা, মনসাপূজা এবং অগ্নিশ্বর শিবের গাজন ও হরিবাসর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে প্রায় এক পক্ষকাল। মেলাটি প্রায় সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। স্থানীয় অঞ্চলে মেলাটি মানাদের জাত মেলা নামে খ্যাত।

(চ) গ্রামে বটুকভৈরব, কালভৈরব এবং জটেশ্বরনাথ নামে খ্যাত অনাদি শিবলিঙ্গ আছে। জটেশ্বরনাথের মন্দিরটি গ্রামের একটি দ্রষ্টব্য বস্তু।

গ্রাম সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী এই যে, এইস্থানে মহাশঙ্খ নিনাদ হয় বলিয়া গ্রামের নাম হইয়াছে 'মহানাদ'। ইহা দক্ষিণ রাঢ়ের শেষ হিন্দু রাজধানী। তেরশত শতাব্দীতে ফিরোজ শাহ-এর রাজত্বকালে পাণ্ডুয়ার নিকট গো-বধের অছিলায় যে যুদ্ধ হয় তাহাতে মহানাদের রাজার পরাজয়ের জন্য দক্ষিণ রাঢ়ে হিন্দু আধিপত্য লোপ পাইয়া মুসলমান রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রাচীন রাঢ়ীয় সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বিধায় এইস্থান হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ও সভ্যতার ধ্বনি সমুত্থিত হইত বলিয়া 'মহানাদ' নামকরণ হওয়া সম্ভব। লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ডি. জি. ক্রফোর্ড তাঁহার 'Medical Gazetter'-এ মহানাদের পূর্বনাম Kissabulty',বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে ভূরিশ্রেষ্ঠ নরপতি বৌদ্ধ পাণ্ডুয়া দাস দক্ষিণরাঢ়ের নরপতি ছিলেন ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের ধারায় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর বহু নিদর্শন যথা; বৃহৎ ইট, মূর্তি, ছাঁচ, ইমারতের ধ্বংসাবশেষ, তৈজষপত্রের ভগ্নাবশেষ এবং মুদ্রা প্রভৃতি পাওয়া যাওয়ায়। ইহা গুপ্তযুগের একটি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয়। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পাটনার জগমোহন পণ্ডিত কর্তৃক রচিত 'দেশাবলি

বিবৃতির', 'অথ মানাত্ দেশ বিবরণম্' অধ্যায়ের শেষাংশে 'Colaphon'-এ আছে 'By Mānāt is meant the district Hooghly'। কোম্পানীর আমলে ১৮৩০ সালে মহানাদ বর্ধমান জেলার মহাকুমা ছিল তাহার প্রমাণ আছে। এখন চব্বিশটি মৌজার সমষ্টি মহানাদ। পাণ্ডুয়া থানার দক্ষিণাংশ মহানাদের অন্তর্গত। নগরপাড়া মহানাদের একটি গ্রাম।

শ্রীরামেন্দ্র কৃষ্ণ ঘোষ, সাহিত্যরত্ন,
জটেশ্বরনাথ শিব ঠাকুরের সেবায়েত,
পোঃ মহানাদ, হুগলী।

["হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মহানাদ গ্রাম ও তথায় অবস্থিত বিভিন্ন মন্দিরাদি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, উহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।]

মহানাদ হুগলী জেলার অন্তর্গত ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত বর্তমানে একটি সামান্য স্থান হইলেও, শত বৎসর পূর্বে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ বৃহৎ জনপদ বলিয়া ছিল। ত্রিবেণীর চারি ক্রোশ পশ্চিমে এবং কলিকাতা হইতে মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে এই স্থানটি অবস্থিত। মহানাদ নামকরণ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান প্রচলিত আছে যে, সুদূর অতীতকালে এই স্থানে একটি দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ পতিত হয় এবং বায়ু লাগিয়া উহা হইতে মহানাদ উত্থিত হয় বলিয়া পরবর্তীকালে এই স্থান মহানাদ নামে খ্যাত হয়। লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল ডি. জি. ক্রাফোর্ড 'হুগলী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' নামক গ্রন্থে মহানাদের অপর নাম 'কিশাবতী' ছিল লিখিয়াছেন। এখন মহানাদে গ্রামের কিয়দংশ পোলবা থানা এবং বেজপাড়া পটি পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্ভুক্ত।

ভারত সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে রচিত "দেশাবলি বিবৃতি" নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আবিষ্কার করেন। উক্ত গ্রন্থে মহানাদের সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যোগীরাজ মহেন্দ্রনারায়ণ এই স্থানে পুরস্কমৃত্তিকাময় দুর্গ নির্মাণ করিয়া রাজত্ব করিতেন।

পূর্বে মহানাদ বাঙ্গলার নাথধর্ম ও নাথসংস্কৃতির অন্যতম মহাকেন্দ্র ছিল। পূর্বভারতে ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নাথযোগীদের এত বড় সাধনকেন্দ্র আর ছিল না। তাই নাথযোগীদের নাথতত্ত্ব হইতে মহানাদের নামকরণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। নাথপন্থীদের প্রধান সাধনকেন্দ্র মহানাদ প্রাচীনকালে শৈব ও শক্তি সাধনার প্রধান কেন্দ্র ছিল, কারণ তাঁহারা শিবের সঙ্গে শক্তিকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। মহানাদের সর্বত্র যে সব প্রাচীন মূর্তি ছড়াইয়া আছে, তাহা হইতে এই স্থানে শিব ও শক্তি সাধনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নাথযোগীরা এক সময় ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্র রসায়ন বিদ্যাকে যথেষ্ট সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারত সম্রাট দ্বিতীয় ফিরোজ শাহ অর্থাৎ জালালুদ্দীন খিলজী শাহের ভগ্নী পাণ্ডুয়ায় বসবাস করিতেন। ১২৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই সময় পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজা মহানাদে বাস করিতেন, সম্রাটের ভাগীনেয় শাহ সুফি হিন্দু রাজার দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া দিল্লীতে পলায়ন করেন এবং তাহার মাতুলের সৈন্য সাহায্যে ও সপ্তগ্রামের জাফর খাঁ গাজির সহায়তায় পাণ্ডুয়ার হিন্দু রাজাকে তিনি পরাজিত করেন এবং পাণ্ডুয়া ও মহানাদ তখন মুসলমানদিগের করতলগত হয়।

মহানাদে 'জটেশ্বরনাথ' মহাদেবের মন্দির বহু প্রাচীন; কাহার দ্বারা যে এই মন্দির সর্বপ্রথম নির্মিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই মন্দিরের মোহান্ত 'যোগীরাজা বলিয়া খ্যাত। পূর্বোক্ত 'দেশাবলি-বিবৃতি' গ্রন্থে রাজা মহেন্দ্রনারায়ণের নাম লিখিত আছে; সম্ভবতঃ তিনি এই মন্দিরের মোহান্ত ছিলেন এবং মহানাদ শাসন করিতেন। জটেশ্বর নাথের মোহান্তগণ নাথপন্থী এবং ইহারা গৈরিক বসন পরিধান করেন। ইহাদিগকে চিরকুমার থাকিতে হয় এবং মৃত্যুর পর সমাহিত করা হয়। মোহান্তর নির্দেশমত তাঁহার মৃত্যুর পর প্রধান শিষ্য মোহান্তের গদি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই মোহান্তগণ উত্তর-পশ্চিম প্রদেশীয় ব্যক্তি, বাঙালী নহেন।

জটেশ্বরনাথের মোহান্তদের চেষ্টায় এই মন্দির প্রতি বৎসর সংস্কার করা হয়। মোহান্ত খুসীনাথ মন্দিরটির আমূল সংস্কার করেন এবং মন্দিরের চতুর্দ্দিকে লোহার কড়ি দিয়া বারাণ্ডা ও চীনামাটির টালি গ্রথিত করিয়া দেন বলিয়া, পূর্বদিকে মন্দিরগাত্রে তাঁহার নাম উৎকীর্ণ আছে।

এই স্থানে প্রাচীনকাল হইতে মহাকালের পূজা প্রতিদিন হইয়া থাকে এবং মন্দিরের মধ্যে বহু শালগ্রাম শিলা রক্ষিত আছে। একস্থানে এতগুলি শালগ্রাম থাকিবার কারণ এই যে, পূর্বে স্থানীয় গৃহস্থদের বাড়িতে এই শালগ্রামগুলি পূজিত হইতেন; কিন্তু উক্ত গৃহস্থদের কালক্রমে অবস্থা খারাপ হওয়ায়, তাঁহারা পূজা চালাইতে অসমর্থ হইয়া এই মন্দিরে শালগ্রামগুলি পূজার জন্য দিয়া গিয়াছেন।

বহু প্রাচীনকাল হইতে শিবরাত্রির সময় জটেশ্বরনাথের একটি মেলা হয়, ইহা 'মানাদের জাত' বলিয়া খ্যাত। প্রায় মাসাধিককাল ধরিয়া এই মেলা উপলক্ষ্যে বিবিধ দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় হয় এবং আনন্দবিধায়ক নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতির অনুষ্ঠানাদি দেখিবার জন্য বহু দেশ-দেশান্তর হইতে এই স্থানে জনসমাগম হইয়া থাকে।

জটেশ্বরনাথের মন্দিরের নিকটে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণার মন্দির, শিবমন্দির এবং অন্নপূর্ণার মন্দিরের উত্তরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মন্দিরগুলি ও শিবলিঙ্গটি পূর্বতন মোহান্তদিগের সমাধির উপর স্থাপিত। ইহাছাড়া নিম্ব ও বটবৃক্ষমূলে বটুক-ভৈরব শিব ও ভগ্ন কয়েকটি প্রাচীন মূর্তি রক্ষিত আছে। বটুক-ভৈরব শিবের দক্ষিণ পার্শ্বে দুই হাত লম্বা একটি মকরের মস্তকের শুণ্ডের অগ্রভাগ এবং তাহার পার্শ্বে একটি একপাদ ভৈরব মূর্তিকে দণ্ডায়মান দেখিতে পাওয়া যায়।....এই স্থানে খিলানের মধ্যে হর-গৌরী মূর্তি ও ভৈরবনাথের মূর্তি রক্ষিত আছে। বিষ্ণু, শীতলা ও মনসা প্রভৃতির কয়েকটি মূর্তি এইস্থানে আছে। এইস্থানে রক্ষিত অধিকাংশ মূর্তি বশিষ্ঠগঙ্গা ও স্থানীয় পুষ্করিণী হইতে পাওয়া গিয়েছিল। এই স্থানে একটি সাত হাত লম্বা শিবলিঙ্গের ভগ্ন গৌরীপট্ট পতিত আছে। এতবড় গৌরীপট্ট ভারতের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মময়ী দেবীর কারুকার্য খচিত নবচূড়াবিশিষ্ট অত্যুচ্চ মন্দির মহানাদের অন্যতম দর্শনীয় বস্তু। এইরূপ গগনচুম্বী সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গদেশের মধ্যে দিনাজপুর, চন্দননগর, তেলিনীপাড়া ও খাকসা ব্যতীত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। মন্দিরের মধ্যে ব্রহ্মময়ী হংসেশ্বর কালিকা দেবী বিরাজিত এবং চারিকোণে চারিটি শিবলিঙ্গ ও ত্রিতল সুবৃহৎ চূড়ার মধ্যে হংসেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি দুইটি হইতে কৃষ্ণচন্দ্র নিয়োগী কর্তৃক ১২৩৬ বঙ্গাব্দ অথবা ১৭৫১ শকাব্দায় মন্দির নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

১৭৭৩ শকাব্দায় অর্জ্জুন দাস মহানাদে এক চূড়াবিশিষ্ট সুউচ্চ "লালজীউর" মন্দির নির্মাণ করেন। এই অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির বহু দূর হইতে দৃষ্ট হয়। এই মন্দিরটি আধুনিক হইলেও ভূমিকম্পে এরূপ ফাটিয়া গিয়াছে যে, ভয়ে কেহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেইজন্য বিগ্রহ অন্যত্র রক্ষিত হইয়াছে।

করবংশের কাছারী বাড়ীর একাংশে ভীম চন্দ্র কর,শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরের জোড়া শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১২৬৭ বঙ্গাব্দে উক্ত শিবের নামে নদীয়া জেলার পীরপুরদিগর গ্রাম নিত্যপূজার জন্য খরিদ করেন। বর্তমানে উক্ত দেবত্র সম্পত্তি হইতে নিত্য দেবসেবা হইয়া থাকে।

এই স্থানে অগ্নিশ্বর, অখিলেশ্বর, গৌরীশঙ্কর প্রভৃতি আরো বহু দেব মন্দির আছে। মুসলমানদিগের নিদর্শনের মধ্যে কাজিমন ফকিরের সমাধি স্তম্ভ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই ফকির সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা বিচিত্র বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। [পৃঃ ৮৩৩ ৮৩৯]

মহানাদ সম্পর্কে শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাসে" পর পৃষ্ঠার প্রদত্ত বিবরণী পাওয়া যায় :—

মহানাদ বাঙলার বৌদ্ধযুগেই খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। তারপর বৌদ্ধ সভ্যতার অবসান সময়ে এ অঞ্চলে মহানাদকে কেন্দ্র করিয়াই হিন্দু ধর্মাচারের পুনঃ প্রবর্তন হইয়াছিল। তাই ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠাক্ষেত্রে নাথপন্থীদিগের শিব মন্দিরের পার্শ্বে সনাতনীদিগের পাষাণময়ী শক্তি প্রতিমা! মহানাদে হিন্দু প্রাধান্যের ইহাই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ নিদর্শনও বাঙলায় মুসলমান আগমনের বহু পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত। মহানাদের এইখণ্ড অখণ্ড প্রস্তর মূর্ত্তির সাক্ষ্যের দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যখন বাঙলায় মুসলমানগণের আগমন হয় নাই, তখন এই স্থান সনাতনী হিন্দুদিগের পূজা অর্চনায় পবিত্রীকৃত—জ্ঞান গৌরবে গৌরবান্বিত সৌভাগ্য সম্পদে দেশ বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই এই পুণ্যভূমিকে বারাণসী ক্ষেত্রের মত পুণ্যতীর্থে পরিণত করিবার আয়োজনও একদিন আরম্ভ হইয়াছিল, যে নিষ্ফল আয়োজনের স্মৃতি কথা উপকথায় পরিণত হইয়া পল্লীবাসীর কৌতূহল চরিতার্থ করিতেছে। সেই স্মরণাতীত যুগে এই পুণ্যভূমির নাম "মহানাদ"ই ছিল। "মানাত" বা "মানাদ" ছিল না। মহানাদের অপভ্রংশই "মানাদ"। সাধারণ জনগণের মুখে মহানাদ "মানাদ" রূপে উচ্চারিত হইল। তা'রপর বাঙলার উচ্চারণ পাটনার পণ্ডিতের মুখে "মানাত" হইয়া গিয়াছিল।

Mahanad (J. L. 126 Nagarpara)—A large village in two mauzas lying partly in thana Pandua (J. L. Mahanad Bijpara) and partly in thana Polba (J. L. 126). Situated a mile north of the station of the same name on the Bengal Provincial Railway (Tarakeswar-Tribeni Line). Alternatively travel up to Khanyan (39 miles from Howrah) on the G. T. Road, turn left, south-west, past Khanyan railway Station on the Main Line, E. I. Rly, past Itachona 7 miles to the village, the last three over the Jamai Jangal road.

There are remains of an extensive fort called Garpar ascribed to Raja Chandraketu. Calcutta University undertook excavations but only a very little was exacavated. There are some old stone sculptures under a tree and recent temples. There is a good gargoyle of sandstone in the form of a maker machh which closely resembles the makar machh gargoyle found in Pandua (Malia) and now preserved in the Indian Museum. There is a small pond called Jivat Kunda and a khal called Vasistha Ganga. There is an ancient muhammadan tomb of Kaziman Pir."

(District Handbooks, 1951, Hooghly, by A Mitra. p. 223)

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের "মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থে কাজিমন ফকিরের সমাধি ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়:—

"মহানাদের রাজার সহিত যুদ্ধে মুসলমানেরা পুনঃ পুনঃ পরাজিত হওয়ার পর জীয়ৎকুণ্ডের সঞ্জীবনী শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হন এবং উহাতে গো-মাংস নিক্ষেপ পূর্ব্বক জলের পবিত্রতা বিনষ্ট করিবার জন্য কাজিমন ফকীর নামক একজন সাধুকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তিনি প্রথমে এই পরম হিতকর প্রতিষ্ঠান নষ্ট করিতে অসম্মত হন, কিন্তু অবশেষে স্বজাতির সম্মান রক্ষনার্থে জীয়ৎকুণ্ডকে অপবিত্র করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাহার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত কিম্বদন্তী এইরূপ,—কাজিমন ফকীর হিন্দু সন্ন্যাসীবেশে পীড়ার ভাণ করিয়া মহানাদের রাজার নিকটে যাইয়া রোগমুক্তির নিমিত্ত জীয়ৎকুণ্ডে স্নান করিবার অনুমতি প্রার্থনা করে; রাজা তাহাতে সম্মত হয়েন না। কিন্তু সমস্ত দিন সেই অবস্থায় তথায় বসিয়া থাকিতে দেখিয়া এবং তাহার নিতান্ত কাতর প্রার্থনায় কৃপা-পরবশ হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্নান করিবার অনুমতি প্রদান করেন, রক্ষী দ্বার ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু স্নান করিবার সময় দৃষ্ট হয় যে, সন্ন্যাসীর জটার অভ্যন্তর হইতে মাংস খণ্ডের ন্যায় কোন পদার্থ জলে পতিত হয় এবং অভ্যাস

বশতঃ সন্ন্যাসীপ্রবর পশ্চিম মুখ হইয়া স্নান করে ও স্নানান্তে বশিষ্টগঙ্গার তীর দিয়াই দ্রুতগতিতে চলিয়া যাইতে থাকে। রাজার নিকটে অবিলম্বে এ সংবাদ প্রদত্ত হয় এবং তিনি তাহাকে ভণ্ড সন্ন্যাসী ও মুসলমান বোধে তৎক্ষণাৎ শিরচ্ছেদ করিতে আজ্ঞা দেন। তখনই পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাকে বধ করা হয়। পরে মহানাদ বিজয়ের পর মুসলমানগণ সেই স্থানেই তাহার সমাধি প্রদান করেন। ঐ স্থানটি অমুচ্চ প্রাচীর বেষ্টিত ও আজিও সুসংস্কৃত অবস্থায় আছে।

পরবর্ত্তীকালে একটি ঘটনায় এই কাজিমন ফকীরের মাহাত্ম্য দেশময় রাষ্ট্র হইয়াছিল এবং তাঁহার প্রতি সাধারণের ভক্তি আকৃষ্ট হইয়াছিল। সে ঘটনাটি এই—একজন পথিক রাত্রিকালে একাকী কোনও স্থানে যাইতেছিল এবং তাহার নিকটে অনেক টাকা ছিল, এমন সময় দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। মুসলমানদিগের ন্যায় উপস্থিত বিপদে রক্ষা পাইবার জন্য পথিক কাজিমন ফকীরকে মনে মনে স্মরণ করেও। অকস্মাৎ কোথা হইতে একজন অশ্বারোহী তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে দস্যুগণ ভীত হইয়া পলায়ন করে। অনন্তর অশ্বারোহী ঐ পথিককে সঙ্গে লইয়া মহানাদে আগমন করেন এবং কাজিমন ফকীরের সমাধির সন্নিকটে আসিয়া অন্তর্হিত হন। পথিক রক্ষা পায় এবং এই ঘটনা কাজিমন ফকীরের লীলা মনে করিয়া তাঁহার ভগ্ন সমাধির সংস্কার করিয়া দেয়। চতুর্দ্দিকে ঐ সংবাদ প্রচারিত হয় এবং কাজিমন ফকীর তদবধি সর্ব্বত্র জাহির হইয়া পড়েন। তাঁহাকে স্মরণ করিলে সকল অভিষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। সকল হিন্দু-মুসলমান তাহাকে ভক্তি করে, সিন্নি দেয়, গাভী প্রসব হইলে দুধ দেয় মুসলমানেরা মোরগ দেয়। কাহারও কিছু হারাইলে, কাজিমন সন্ন্যাসীর মানিলেই তাহা পাওয়া যায়, গাভী প্রসব হইবার সময় সিন্নি মানিলে নির্বিঘ্নে প্রসব হয়। কাহারও পায়ে পক্ষাঘাত কি বাত হইয়া চলৎশক্তি রহিত হইলে কাজিমন সাহেবকে ঘোড়া (মাটি) দিলে পা ভাল হয়। কেহ কেহ এরূপ বিশ্বাস করেন যে, কাহারও সহিত বিরোধ থাকিলে শুক্রবারে উপবাস থাকিয়া যদি কাজিমন সাহেবের ঘোড়ার পা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে শত্রুর পা খোড়া হয়। ঘোড়ার চোখে চূর্ণ দিলে, চোখ কানা হয়, ঘোড়া উল্টাইয়া দিলে শত্রু মরিয়া যায়। তিনি ভক্তের নিকটে কাজিমন ফকীর, কাজিমন সাহেব, বাবা কাজিমন, কাজিমন ঠাকুর প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হন। প্রতি বৎসর ১লা মাঘ তাঁহার সমাধির সম্মুখস্থ স্থানে মেলা হইয়া থাকে।"

[পৃঃ ১৪০-১৪২]

৫। গ্রাম : সুলতানগাছা। ১৩৬।৮৫'৫৪।২৬।১৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, যাদব, ধোপা, বাগ্দী, মুচি, বারুজীবি, তিলি, যোগী।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) পূর্ব রেলপথে মগরা রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্ত্তী। মগরা-খানপুর রোড হইতে মোটরবাস ও রিক্সাযোগে এই গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বাংলা ১৩৪২ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি উৎসবের প্রবর্ত্তনের কাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি তারকনাথ ঠাকুর, একটি বিষহরি, তিনটি শিব, একটি পঞ্চানন, একটি দয়াময়ী ও একটি ষষ্ঠী আছে।

শ্রীমহাদেব ঘোষ, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ সুলতানগাছা, হুগলী।

৬। গ্রাম : সুগন্ধা। ১৮০।৩১৪ ১৪।২২৩।৯৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় তিন মাইল দূরে চুঁচুড়া রেলস্টেশন। চুঁচুড়া হইতে ধনিয়াখালি পর্যন্ত পাকা রাস্তা গিয়াছে। এই রাস্তায় মোটর ও রিক্সাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে কালাচাঁদজীউ-র দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় চারি-শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে। মেলাটি ও প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে কালাচাঁদজীউর মন্দির ব্যতীত নওবাটী, ছয়বাটী, নূতনবাটী ও বউবাটী নামে খ্যাত চারিটি বাটীতে চারিটি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শোনা যায়, এই গ্রামের বর্তমান বসু বংশ-এর উর্ধতন সাতাশ পুরুষ ৺চিন্তামণি বসু ধন্বন্তরী চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শীতার জন্য দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীর শাহ তাঁহাকে 'রায়' উপাধি দেন ও তৎসহ প্রায় তিন শত বাধট্টি বিঘা সুগন্ধা জায়গীর (লাখেরাজ) প্রাপ্ত হন। খুব সম্ভবতঃ এই কারণে গ্রামের নাম 'সুগন্ধা' হইয়াছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ রায়

গ্রাম ও পোঃ সুগন্ধা, হুগলী।

"সুগন্ধা হুগলী জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত পোলবা থানায় অবস্থিত একটি প্রাচীন গ্রাম। কুন্তী ও সরস্বতী নদী বলয়াকারে এই স্থান বেষ্টন করিয়া আছে। চুঁচুড়া স্টেশন হইতে দুই মাইল ও গঙ্গা হইতে চার মাইল দূরে গ্রামটি অবস্থিত।

এই গ্রামে শীতলাদেবী ও মহেশ নামে ভৈরবের মন্দির আছে। কিংবদন্তী যে, মহেশ কুন্তী নদীর গর্ভ হইতে আবির্ভূত হন। যে স্থান হইতে তিনি আবির্ভূত হন, সেই স্থানটিকে মহেশতলা বলে। মহেশের প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে শ্রীবিভূতি ভূষণ রায় ও শ্রীহেমন্ত কুমার রায়ের চেষ্টায় ১৩৪১ সালে উহার সংস্কার করা হয়।...দোলের সময় গ্রামে একটি মেলা হয়। গ্রামের রায় বংশের যুগল বিষ্ণুমূর্তি ও বাল-গোপালের সুন্দর মন্দির আছে। পূর্বে গ্রামে প্রত্যহ বাজার বসিত এবং এই স্থান তখন জনমুখরিত থাকিত; কিন্তু সপ্তগ্রামের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সুগন্ধাও জনশূন্য হয়।"

(হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ, ২য় খণ্ড,
—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, পৃঃ ৮৬০)

পোলবা থানার অন্তর্গত অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি ও উৎসব-পার্বণ সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' ২য় খণ্ড, গ্রন্থে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়:

দিঘমখর (মৌজা নং ১৭)।

পোলবা থানার অন্তর্গত বর্তমানে একটি অজ্ঞাত অখ্যাত গ্রাম হইলেও প্রাচীনকালে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামের সর্বেশ্বর শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। এই শিব স্থানীয় শিবপুকুর হইতে পাওয়া যায়। বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে এই শিব আরোগ্য করেন বলিয়া কথিত আছে। সর্বেশ্বর শিবমন্দির বর্তমানে বন্দোপাধ্যায়দের অধিকারভুক্ত আছে।...গ্রামে মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। [পৃঃ ৮৭০]

পুইনান (মৌজা নং ১৮)।

পুইনান পোলবা থানার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। চুঁচুড়া ষ্টেশন হইতে তারকেশ্বর বা হরিপাল পর্যন্ত যে বাস সার্ভিস আছে, সেই রাস্তার উপরে অবস্থিত।

গ্রামে হালদার, ঘোষ ও শেঠদের অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর মন্দির আছে। এই গ্রামে একটি ধর্মরাজের মন্দির আছে, ইহার পুজারী হইতেছেন ডোম। এই মন্দিরের দুই ধারে শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরের মন্দির ও কারুকার্যখচিত ইটের দোলমঞ্চ ও রাসমঞ্চ

আছে। রাজরাজেশ্বর হইতেছেন রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ। এই মন্দিরটি বর্তমানে ভাঙিয়া গিয়াছে; সত্বর সংস্কার না হইলে পড়িয়া যাইবে।

পুইনান গ্রামে তিনটি শিবমন্দির শঙ্কর হালদার প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার শিবলিঙ্গগুলি কাশী হইতে আনিত। ইহার নিকটে গৌর মোহন শেঠের ভগ্ন ঠাকুরদালান বিদ্যমান। গ্রামে কামেশ্বর একটি সুন্দর মন্দির, ইহাও হালদারদের প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরের মধ্যে মঙ্গলচণ্ডী, মনসাদেবী এবং শীতলাদেবীও আছেন। সম্ভবতঃ ঐ মূর্তিগুলি অন্যস্থান হইতে আনিয়া এই শিবমন্দিরের মধ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে। [পৃঃ ৮৬২]

হারিট (মৌজা নং ৯১)।

পোলবা থানার অন্তর্গত হারিট একটি গণ্ড গ্রাম। গোস্বামী মালিপাড়া হইতে হরেকৃষ্ণ গোস্বামী এই গ্রামে আসিয়া প্রথমে বসতি স্থাপন করেন এবং শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ মদনমোহন জীউর সেবা প্রতিষ্ঠা পূর্বক একটি সুন্দর মন্দির নির্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরে তাঁহার পিতামহ শ্যামদাস গোস্বামীর পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীদামোদর শালগ্রামও পূজিত হন।

শ্যামদাস গোস্বামীর তিরোভাব উৎসব উপলক্ষ্যে প্রতিবৎসর বৈশাখী কৃষ্ণা পঞ্চমী হইতে তিন দিন ধরিয়া হারিট গ্রামে গোপীনাথ জীউর মন্দিরে মহোৎসব উপলক্ষ্যে বহু বৈষ্ণবের সমাবেশ হয়। তদুপলক্ষ্যে লীলাকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়।

হারিট গ্রামে যন্ত্ররূপিণী বাস্তকালী আছে। ইহা স্থানীয় একটি পুকুর হইতে পাওয়া যায়। মন্দিরে উৎকীর্ণ একখানি পাথরে লেখা আছে :

শ্রীশ্রী৺কালীমাতা বিজয়

স্থাপিত ১২৯৮ সাল।

রাধাগোপীনাথ জীউ ও মদনমোহন জীউর বিগ্রহ অতি সুন্দর। অগ্রহায়ণ মাসে কাত্যায়ণীকল্পে বিগ্রহের অষ্টকালীন সেবা পূজা উল্লেখযোগ্য। ভোর চারটায় মঙ্গলারতি, নাম সংকীর্তন, মন্দির পরিক্রমা। সকাল সাতটায় শয্যাউত্থান, আরতি ও ভোগরাগ। আটটায় গোষ্ঠের আরতি ও ভোগরাগ। দশটায় সেবা, ফলমূলাদি; চৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থপাঠ। বেলা একটায় অন্নভোগ, আরতি ও শয়ন। বৈকাল চারটায় গাত্রোত্থান ও ধূপারতি। সন্ধ্যা হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত সন্ধ্যারতি ও নামকীর্তন এবং রাত্রি দশটায় ভোগারতির পর শয়ন। [পৃঃ ৮৫৫-৮৫৬]

পাউনান (মৌজা নং ৯৫)।

পাউনান গ্রামের পূর্বপ্রান্তে গ্রামের বাহিরে মনোহর পরিবেশে "শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউ" অনাদি শিবলিঙ্গ সমন্বিত সুন্দর মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিবগঙ্গা পুষ্করিণী বর্তমান। অতি প্রাচীন মন্দির, কে নির্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ বলিতে পারে না। কয়েক বৎসর পরপর ইহার সংস্কার হইয়া আসিতেছে। গ্রামবাসী প্রভৃত বিত্ত-উপার্জনকারী ৺সিদ্ধেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউর ইষ্টক নির্মিত ভোগঘর নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জীউর নিত্যপূজা হয়। এইরূপ শিবলিঙ্গ সাধারণতঃ দেখা যায় না। শ্রীশ্রীটাটেশ্বরনাথ জাগ্রত দেবতা বলিয়া এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায় বংশ শ্রীশ্রীটাটেশ্বর-নাথ জীউর আদি সেবাইত। নিত্য সেবার জন্য পূর্বে বিস্তর দেবোত্তর সম্পত্তি ছিল। চট্টোপাধ্যায়দিগের ওয়ারীশসূত্রে বর্তমানে গ্রামের বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারীও আংশিকভাবে সেবাইত আছেন। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে এই মন্দিরে বিস্তর যাত্রিসমাগম হইয়া থাকে। এখানে প্রায় ১৫ দিনব্যাপী শিবরাত্রি মেলা হয়।

গ্রামের মধ্যভাগে প্রাচীন গ্রাম্য বারওয়ারী দেবতা ৺শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা আছেন। প্রথমতঃ

তিনি কাষ্ঠময়ী দণ্ডাকৃতি ছিলেন, পরে গ্রামবাসী ৺গিরীশ চন্দ্র ঘোষ (গোপ) পাকা ঘর করিয়া দিলে গ্রামের ৺যদুনাথ মজুমদার (সদ্গোপ) সেবার জন্য ভূসম্পত্তি প্রদান করিলে গ্রামবাসীরা তন্মধ্যে মৃন্ময়ী মূর্তি স্থাপনা করেন এবং তদবধি, পূজা এই আকারেই চলিয়া আসিতেছে। ৺শরৎ চন্দ্র সুর মহাশয় এই মন্দিরে কতকগুলি জানালা করিয়া দিয়াছিলেন। কালক্রমে এই মন্দির জীর্ণ হইলে গ্রামবাসী ৺সুরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের বিশেষ উদ্যোগে সংস্কৃত বর্তমান সুন্দর মন্দির হইয়াছে।

এইস্থানে পালা পার্বণে বিশেষ তিথিতে বলিদান হয়। প্রাচীন সেবাইত বৈদিক বংশীয় ব্রাহ্মণগণ। পূর্ব বারওয়ারীতলায় হালদারদিগের শিবমন্দির আছে। এই প্রাচীন শিবমন্দিরের পূজারী বৈদিক ব্রাহ্মণবংশীয় শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য।

এই শিবমন্দিরের নিকটে ধর্মরাজের আস্তানা আছে। ৺কৈলাস চন্দ্র পণ্ডিত ডোম—ইহার শেষ ডোম পূজারী ছিলেন। দক্ষিণপাড়ায় পঞ্চানন্দের মন্দির আছে। বর্তমানে বৈদিক ব্রাহ্মণ পূজারী।

পশ্চিম পাড়ায় "দে সরকার"দিগের পূর্বপুরুষদিগের স্থাপিত অতি প্রাচীন শিবমন্দির ছিল, তাহাতে সুশোভন শ্বেত শিবলিঙ্গ ছিলেন। নিত্য সেবা দীর্ঘকাল বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। প্রায় দুই বৎসর পূর্বে এই শিবমন্দির ইচ্ছাকৃত ভগ্ন করিয়া বিলুপ্ত করা হইয়াছে। "ছোট সান" অনেক দীঘির পাড়ে ৩টী শিবমন্দির আছে। ইহাদের অধিষ্ঠিত "শিবলিঙ্গ"ত্রয় কোন ও মুখোপাধ্যায়ের পূর্বপুরুষ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বর্তমানে নিত্য সেবা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। [পৃঃ ৮৬৩-৮৬৫]

গোস্বামী-মালিপাড়া (মৌজা নং ১১৬)।

গোস্বামী-মালিপাড়া হুগলী জেলায় পোলবা থানার অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু প্রাচীন স্থান। সুদূর অতীতে এই গ্রামের ভূভাগ কেদারমতী নদীর গর্ভগত ছিল। এই নদী এখনও ক্ষীণাকারে গোস্বামী-মালিপাড়া ও দাঁতড়া গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। যখন এই নদী খুব বেগবতী ছিল, তখন পারাপারের জন্য দুই তীরে দুইটি ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। সেই দুইটি ঘাটে উত্তর দিকে দ্বারবাসিনীতে শ্রীশ্রীবিষহরি দেবী ও দক্ষিণ দিকে সানিহাটে শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবী অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছেন। ইঁহাদের সেবার জন্য কুচপালের নবাবের জমি দান করা আছে। কালক্রমে এই নদীগর্ভে যে চর বাহির হয়, সেই চরে রাজা দ্বারপালের পুষ্পোদ্যান হইয়াছিল এবং রাজার মালিরা সেই চরে বাস করিত বলিয়া, ইহা মালিপাড়া বলিয়া খ্যাত হয়।

ভগবান শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্যতম পরিকর শ্রীপাদ খঞ্জ ভগবান আচার্যের সময় হইতে গোস্বামীগণ এইস্থানে আসিয়া বসবাস করেন এবং গোস্বামীদের প্রাধান্য হেতু ইহা গোস্বামী-মালিপাড়া বলিয়া পরিচিত হয়।

ভগবান আচার্য মহাশয় গৃহাশ্রমে বাস করা কালে পৈত্রিক বিগ্রহ শ্রীশ্রীলক্ষ্মীজনার্দন, শ্রীশ্রীবৃদ্ধামাতা-জীউ স্বপূজিত প্রিয়াজীসহ কেশবলালজীউ প্রভৃতি বিগ্রহের পূজা মালিপাড়া গ্রামে প্রবর্তন করিয়া এই স্থানে প্রেম-দীক্ষা-শিক্ষা প্রবর্তনের বীজ পত্তন করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনিই আধুনিক গোস্বামী মালিপাড়া গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতিতে আজও তাঁহাদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। মহাপ্রভুর সময় হইতেই বাংলাদেশে তাঁহাদের ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং আজও এই গ্রামের অসংখ্য মন্দিরাদি দেখিয়া, পূর্বে ভগবান আচার্য মহাশয় যে ইহাকে সত্য সত্যই অভিন্ন বৃন্দাবনরূপে পরিকল্পনা করিয়াছিলেন তাহা উপলব্ধি করা যায়।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ ও রাধাকান্তজীউর মন্দির বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণব মন্দিরগুলির অন্যতম। শ্রীপাদ বল্লভ গোস্বামী মদন-গোপাল জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই মন্দিরের

মধ্যে প্রিয়াজীসহ রাধাবল্লভ ও রাধা, মদনগোপাল এই দুই যুগল মূর্তি আছেন। এতদ্ব্যতীত গোস্বামী বংশের বংশীবাদন শালগ্রাম এবং শ্রীশ্রীবুদ্ধামাতা নামক দক্ষিণ কালিকা প্রতিষ্ঠিতা আছেন। একটি মন্দিরের মধ্যে দুইটি যুগল মূর্তি কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। দুইটি যুগলমূর্তি থাকিবার সম্বন্ধে একটি ইতিহাস আছে।

বল্লভ গোস্বামী সর্বপ্রথম প্রিয়াজীসহ রাধাবল্লভ সেবা এই মন্দিরে প্রকাশ করেন। ইহার অল্পদিন পরে মৃত্যুঞ্জয় ব্রহ্মচারী নামক এক শিষ্য তাঁহার কুলদেবতা মদনগোপালজীউর বিগ্রহ লইয়া গুরুগৃহে এই গ্রামে আসেন। তিনি রাধাবল্লভ দর্শন করিয়া স্নান করিতে যান; স্নানান্তে বাড়ি যাইবার সময় তিনি আর মদনগোপালকে মন্দির হইতে উঠাইতে পারেন নাই। পরে মদনগোপাল কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন যে, তিনি এই স্থানেই থাকিবেন, অন্যত্র যাইবেন না। ব্রহ্মচারী ইহাতে বিশেষ ব্যথিত হইয়া ত্রিবেণীতে নিজ প্রাণ বিসর্জন দেন। বল্লভ গোস্বামী মহাশয় মদনগোপালজীউকে রাধাবল্লভের পার্শ্বে রাখিয়া যথাবিধি সেবা পূজা দ্বারা তাঁহার কৃপালাভ করেন এবং কথিত আছে যে, বিগ্রহের সহিত তাঁহার কথোপকথন হইত। পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গোস্বামী মহাশয় রাধারাণী বিগ্রহ প্রস্তুত করাইয়া মদনগোপালের সহিত বিবাহ দেন এবং একই মন্দিরে যুগল সেবা লাভ করেন। এই মন্দিরের মধ্যে তিনশত বৎসরের পুরাতন একখানি পাল্কি আছে। এই পাল্কি করিয়া দুই যুগলমূর্তি রাসের সময় রাসমঞ্চে এবং রথযাত্রার সময় রথে আরোহণ করিবার জন্য যান। মন্দিরের বাহিরে বল্লভ গোস্বামী মহাশয়ের পুষ্পসমাধি রক্ষিত আছে। অদ্যাপি তাঁহার তিরোভাব মহোৎসব সপ্তাহব্যাপী ধরিয়া এই মন্দিরে অনুষ্ঠিত হয়। গোস্বামী মহাশয়ের শিষ্যগণ কর্তৃক মন্দির ও নাটমন্দির প্রতি বৎসর সুসংস্কৃত হয়। ১২৮৫ সালে শ্রীনন্দকিশোর গোস্বামী নাটমন্দিরে শ্বেতপাথর বসাইয়া দেন, ইহা একটি প্রস্তরে লিখিত আছে।

মন্দিরের পার্শ্বে দেশদেশান্তর হইতে আগত বৈষ্ণবদিগের থাকিবার জন্য সুন্দর ঘর আছে।

গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীউর মন্দির। শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ গোস্বামী এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, প্রিয়াজীসহ রাধাকান্ত বিগ্রহ মহারাজ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এই বিগ্রহ হুগলী জেলার পোলবা নিবাসী শ্যাম রায়ের গৃহে পূজিত হইতেন। শ্রীপাদ ভাগবতানন্দ গোস্বামী স্বপ্নাদেশ পাইয়া উক্ত বিগ্রহ গোস্বামী-মালিপাড়া গ্রামে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিত্যসেবা ও ভোগরাগাদিতে পরমানন্দে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু দিন পরে জনৈক বটব্যাল ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যাকে লইয়া মন্দিরে আসেন এবং তথায় ব্রাহ্মণ কন্যার মৃত্যু হয়। কন্যার মৃত্যুতে ব্রাহ্মণ বিশেষ কাতর হন; তখন ভগবতানন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ হয় যে, ব্রাহ্মণ কন্যা জড়দেহ ত্যাগ করিয়া আমার প্রিয়াজী হইয়াছে সুতরাং ব্রাহ্মণকে শোকত্যাগ করিতে বল এবং তাঁহার কন্যার একটি ধাতুময়ী প্রতিমূর্তি গঠন করিয়া আমার পার্শ্বে সংস্থাপন কর। উহা "বড়ালের ঝি" নামে রাধাকান্ত জীউর বাম পার্শ্বে অদ্যাপি বিরাজিত আছেন। এই প্রাচীন বিগ্রহ অপহৃত হয় বলিয়া একটি সংবাদ ১লা নভেম্বর ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের 'যুগান্তর' পত্রে প্রকাশিত হয়। [পৃঃ ৮৪৮-৮৫০]

দাঁতড়া (মৌজা নং ১১৭)।

গোস্বামী-মালিপাড়ার পার্শ্বস্থিত দাঁতড়া গ্রাম কেদারমতি নদীর তীরে অবস্থিত। বহু পূর্বে যখন এই নদী বেগবতী ছিল তখন এই গ্রাম রেশমের ও তাঁত শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

গ্রামে ভট্টাচার্যদের শিবমন্দিরে তিনটি শিবলিঙ্গ আছে। পূর্বে গ্রামে ভৈরবনাথ ও কাশীনাথের মন্দির ছিল। বর্তমানে উহা বিনষ্ট হইয়াছে। সিদ্ধেশ্বরী কালী গ্রামের জাগ্রতা দেবী বলিয়া কথিত। [পৃঃ ৮৫৬]

আমনান (মৌজা নং ১৬৫)।

আমনান গ্রাম পোলবা থানার অন্তর্গত একটি সুপরিচিত প্রাচীন স্থান। এখানকার গ্রাম পূজিতা দেবতা বৃক্ষরূপিণী বসন্ত চণ্ডীমাতা, ধর্মরাজ ঠাকুর, পঞ্চানন্দ এবং সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা আছেন। এখানকার চক্রবর্তী বংশে একজন কৃষ্ণভক্ত সন্ন্যাসী ভ্রমণ করিতে করিতে আমনানে আসেন। তাঁহার নিকট যাদব রায়, রাধারাণী, গোপাল ও নারায়ণের বিগ্রহ ছিল। কৃষ্ণকিঙ্কর চক্রবর্তী উহা তাঁহার নিকট হইতে সেবা করিবার জন্য গ্রহণ করেন।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে প্রাপ্ত বিগ্রহ নিত্য পূজিত যাদব রায় ও রাধারাণী অত্যাপি আছেন। এই চক্রবর্তী বংশের একজন কন্যা এলোকেশী দেবী উন্নত ধর্মাসিদ্ধির জন্য "গোপালের মা" নামে এ অঞ্চলে খ্যাত ছিলেন। তাঁহার অলৌকিক কাহিনী শ্রীগোপাল লীলামৃত নামক দুইখানি পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে।

[পৃঃ ৮৭০]

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ পোলবা

উৎসব বিবরণী

রথযাত্রা

সুলতানগাছা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং বাংলা ১৩৪২ সন হইতে আরম্ভ হয়। এই উৎসবের বৈশিষ্ট্য এই যে, এই স্থানে প্রচলিত জগন্নাথ দেবের রথযাত্রার পরিবর্তে রাধাকৃষ্ণের রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শুক্লা প্রতিপদের দিন সন্ধ্যায় অধিবাস এবং পরদিন অর্থাৎ দ্বিতীয়ার সকালে যথারীতি বিগ্রহ পূজা, রথ পূজা ও বিগ্রহের রথে আরোহন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বৈকালে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহসহ রথ বাহির হয় এবং সাতদিনে বিশেষ পূজাদির পর পুনর্যাত্রা অনুষ্ঠান পালিত হয়। পুনর্যাত্রার পরের দিন ভোগ ও সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উৎসবে কিছু সংখ্যক অহিন্দুও যোগদান করেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীমহাদেব ঘোষ (যাদব সম্প্রদায়ভুক্ত) পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চট্টোপাধ্যায়।

শিবরাত্রি (মানাদের জাত)

মহানাদ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী চতুর্দশী তিথিতে শিবরাত্রি উপলক্ষে জটেশ্বরনাথ শিবকে কেন্দ্র করিয়া "মানাদের জাত" নামে এক বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জটেশ্বরনাথের প্রকাশ অনাদিলিঙ্গরূপে। "জাত" বৌদ্ধদিগের বসন্তোৎসব বলিয়া কথিত এবং "মানাদের জাত" পাল যুগ হইতে প্রচলিত প্রায় এক হাজার বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হয়। গ্রামে জটেশ্বরনাথের মন্দির আছে। ইহা গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের কানফাটা যোগী মোহান্তদিগের মন্দির এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী বা তাহার পূর্ব হইতেই ইহা গোরক্ষনাথ সম্প্রদায়ের মোহান্তদিগের অধিকারে আসে। সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গলে তৎকালে মীননাথ (নাথযোগী) মহানাদের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

শিবচতুর্দশী হইতে একপক্ষকালব্যাপী উৎসবটি চলে। মাসাধিককাল পূর্ব হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। উৎসব উপলক্ষে বহু দূর-দূরান্ত হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু নরনারীর সমাগম হয় এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসী বিশেষ করিয়া গোরক্ষ সম্প্রদায়ের সাধু-সন্ন্যাসীদের আগমন হয়।

উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য রাজ্যাভিষেক পর্ব। শিবরাত্রির দিন বৈকালে মোহান্তের গদি স্থাপনা ও স্থানীয় জমিদার বা তাঁহাদের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ও ব্যয়ে জটেশ্বরনাথদেবের মন্দির প্রাঙ্গণে স্থাপিত বটুক ভৈরবের স্থানে বিশেষ পূজা, ছাগবলি ও বলির রক্তে মোহান্তকে রাজটীকা প্রদান, সাতবার ভৈরব বেদী প্রদক্ষিণ করান, রাজছত্রের উদ্ঘাটন ও জটেশ্বরনাথ মন্দির সাতবার প্রদক্ষিণ করাইয়া মোহান্তকে গদিতে বসাইয়া রাজ্যাভিষেক পর্ব সমাপন করা হয়। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মীননাথের সময় হইতেই এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বাংলা ১৩৬২ সন পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদে রাজ্যসরকার কর্তৃক দেবোত্তর সম্পত্তির কোন সুমীমাংসা না হওয়ায় বর্তমানে সাধারণের পক্ষে মহানাদ-বেজপাড়া নিবাসী শ্রীগৌরকিঙ্কর সরকারের উদ্যোগে ও ব্যয়ে বটুক ভৈরবের পূজা, ছাগবলি ও মোহান্তের রাজ্যাভিষেক পর্ব অনুষ্ঠিত হইতেছে। শিবরাত্রির পর দিবস প্রাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

উৎসব উপলক্ষে জটেশ্বর নাথের যথারীতি সাড়ম্বরে হোমপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে স্ত্রীলোকগণ যাঁহারা সন্তানকামী বা মৃৎবৎসা তাঁহারা জীয়ৎকুণ্ড নামক সরোবরে স্নান ও অভীষ্ট সিদ্ধ কামনা করিয়া বটুক ভৈরব ও কাল ভৈরবের স্থানে মানত অনুযায়ী ফলমূলাদি দিয়া পূজা বা ছাগ বলি দিয়া থাকেন। জটেশ্বরনাথের দ্বাদশ কুণ্ডুর মধ্যে জীয়ৎকুণ্ডুই অন্যতম।

শিবের ধ্যানে জটেশ্বরনাথের নিত্য পূজা হয়। প্রধান সেবায়েত গোরক্ষ সম্প্রদায়ভুক্ত। বর্তমান পূজারী চক্রবর্তী (সিমলাই) পদবীধারী ব্রাহ্মণ; বিপ্রবর্ণ ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়। উচ্চ সমাজভুক্ত যে-কোন ব্রাহ্মণই পূজারীর আসন গ্রহণ করিতে পারেন, বংশ পরম্পরায় পূজারী নির্ণিত হইবে, এমন কোন বিধি নাই।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ পোলবা

মেলা বিবরণী

দোলযাত্রার মেলা

সুগন্ধা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে কালাচাঁদ জীউর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় দেড়-দুই বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় সুগন্ধা, দেবানন্দপুর প্রভৃতি ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম এবং চুঁচুড়া ও চন্দননগর হইতে প্রায় দুই সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীর মধ্যে পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। ইহা ভিন্ন চন্দননগর ও চুঁচুড়া হইতে কিছু সংখ্যক বিক্রেতা প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ইহাতে প্রায় চল্লিশটি দোকান-পাট বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকান-পাটগুলির মধ্যে তেলেভাজা ও খাবারের দোকান এবং মনিহারী, লোহার জিনিসপত্র, কাপড়চোপড়, বাসনপত্র, বই-ছবি, ঔষধপত্র, পান-বিড়ি প্রভৃতি দ্রব্যাদি আমদানী হয়। তবে মনিহারী দোকানের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা বেশী। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। এই গ্রামের একটি দলই যাত্রাভিনয় করিয়া থাকেন। অধিকারী—শ্রীনিতাই চন্দ্র দাস ও শ্রীনারায়ণ চন্দ্র রায়, গ্রাম: সুগন্ধা। এই অনুষ্ঠানে প্রায় দুই হাজার দর্শকের সমাগম হয়।

রথযাত্রার মেলা

তালচিনান সানিহাটি গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রায় এক বিঘা জমিতে রথ এবং উল্টোরথের দিন বিকালে মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মালীপাড়া, দাদপুর, হারিট, সাটিথান, সুগন্ধা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ পুইনান, সানিহাটি, নাগবল, সিকটা, হারিট, সুগন্ধা, গোটু প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় খাবার, তেলেভাজা, মনিহারী, কাঁচ ও মাটির খেলনা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

সুলতানগাছা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে দেবোত্তর প্রায় চারি বিঘা জমিতে রথযাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

রাজবলহাট, পোলবা, মহানাদ, দ্বারবাসিনী, ইটাচুনা, হোয়েড়া, দিগমুই, মগরা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। সর্বাপেক্ষা দূরের যাত্রী রাজবলহাট ও দ্বারবাসিনী হইতে মেলায় আসেন। যাত্রীদের মধ্যে পুরুষের সংখ্যাই অধিক। বি. পি. রেলপথটি লোপ পাওয়ায় বর্তমানে মেলায় লোক সমাগম কম হইতেছে।

মেলায় দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। পূর্ব-উল্লিখিত ইউনিয়ন হইতে বিক্রেতাগণ প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহাছাড়া, মনিহারী, ফলমূল, বই-ছবি এবং মহানাদ, আকনা, ইটাচুনা ইউনিয়ন হইতে মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র আমদানী হইয়া থাকে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। কোন কোন বৎসর ম্যাজিক নাচ-গান ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। পূর্বে এই মেলায় প্রায় প্রতি বৎসরই পুতুলনাচ হইত। কিন্তু বর্তমানে পুতুলনাচের দল আসে না।

শিবরাত্রির (মানাদের জাত) মেলা

মহানাদ গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথিতে জটেশ্বরনাথ শিবকে কেন্দ্র করিয়া "মানাদের জাত" উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় তিন বিঘা জমিতে পনরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। প্রতিদিন সকাল হইতে রাত্রি নয়টা পর্যন্ত মেলায় বেচাকেনা চলে। ইহা কমপক্ষে প্রায় এক হাজার বৎসরের প্রাচীন মেলা বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় প্রতিদিন গড়ে প্রায় চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়। আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে এবং কলিকাতা, কাটোয়া, ধনিয়াখালি, ত্রিবেণী প্রভৃতি দূরবর্তী অঞ্চল হইতে যাত্রীরা আসেন। বি. পি. রেলপথটি লোপ পাওয়ায় গ্রামে যাতায়াতের অসুবিধার পূর্বের তুলনায় বর্তমানে যাত্রী ও বিক্রেতার সংখ্যা কম দেখা যাইতেছে।

মেলায় প্রায় একশতটি দোকানপাট এবং কুড়ি-পঁচিশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। কলিকাতা, কাঁকিনাড়া, নৈহাটী, চন্দননগর, ত্রিবেণী, মগরা, পাণ্ডুয়া, বলাগড়, মেমারী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসর বিক্রেতাগণ মেলায় আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে মনিহারী দোকানের সংখ্যা সর্বাধিক। তেলেভাজা, ময়রা, কৃষি ও কারিগরি সংক্রান্ত জিনিসপত্র, গামছা-লুঙ্গি, বই ছবি, শাক-সজী, মাছ, ধামাকুলা, মহানাদ-বেজপাড়ার কুমারগণের দ্বারা তৈয়ারী প্রসিদ্ধ মাটির হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতির দোকান-পাট বসে। তাহাছাড়া বড় সরষা, সুদর্শনা, খিরকুণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রায় প্রতি বৎসর আমদানী হয়। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে নাম মাত্র তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা প্রতি বৎসর সম্ভব হয় না। কোন কোন বৎসর মেলায় যাত্রাভিনয় হয়। এই অনুষ্ঠানে প্রায় তিন সহস্র দর্শকের সমাগম হইতে দেখা যায়।

শ্রীপ্রভাস চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের "মহানাদ বা বাঙ্গলার গুপ্ত ইতিহাস" গ্রন্থে এই মেলা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায়:—

"অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রতি বৎসর শিবরাত্রির সময় ৺জটেশ্বরনাথ মহাদেবের একটি মেলা হয়। এই মেলাকে মানাদের জাত বলা হইয়া থাকে। একদা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় বয়স্য গোপালভাঁড়ের সাহায্যে কিরূপে মহারাণীকে "মানাদের জাত" দর্শনে নিবৃত্ত করিয়া-ছিলেন, তাহা অবগত নহেন এরূপ লোক বাঙ্গলায় কেহ আছেন বলিয়া মনে হয় না। বিগত সন ১৩২৯,'৩০ ও '৩১ সালে হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, প্রতি বৎসর ৺শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে সহস্রাধিক যাত্রী শিবপূজার জন্য সমাগত হয়, তন্মধ্যে স্ত্রী লোকের সংখ্যাই অধিক। এই মেলায় সকল প্রকার দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় ও প্রতি নিয়ত নাচ গান তামাসা প্রভৃতি আমোদ প্রমোদ এবং অসংখ্য লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সেই সময় মহানাদের এই নগরপাড়াটি প্রকৃতই নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। পূর্ব্বে এই মেলা ৭।৮ দিনের অধিক স্থায়ী হইত না, কিন্তু এক্ষণে ২০।২৫ দিন থাকে।" [পৃঃ ১৫১]

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ ধনিয়াখালি

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ দশঘরা। ২৯।৪২০১৬।১৪৫।৯১২

(ক) ব্রাহ্মণ, বায়স্থ, নবশাখ ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তারকেশ্বর হইতে মোটরবাস বা রিক্সাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে রক্ষাকালীপূজা, আষাঢ় মাসে গোপীনাথ জীউ-র রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা (৫টি স্থানে) কার্তিক মাসে শ্যামাপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রীপূজা, মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে একাধিক সরস্বতীপূজা এবং চৈত্র মাসে বুড়া শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

তাহাছাড়া গ্রামে নিত্য ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ডুলে সম্প্রদায়ের পণ্ডিত পদবী-ধারী জনৈক ব্যক্তি ধর্মরাজের সেবায়েত।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বিশ্বাস পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথজীউ-র রাস উৎসব প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবটি বিশ্বাস পরিবারের ব্যক্তিগত হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ ইহাতে যোগদান করেন। উৎসবটি ১৬৫০ শকাব্দে প্রথম আরম্ভ হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিন মেলা বসে। মেলাটি ১৬৫০ শকাব্দে প্রথম আরম্ভ হয়।

গাজনের মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপীনাথ জীউর মন্দির এবং দুইটি পঞ্চানন্দ আছে।

দশটি পল্লী লইয়া গ্রামটি গঠিত বলিয়া গ্রামের নাম দশপল্লী নামে খ্যাত হয়। দশপল্লী হইতে গ্রামের নাম দশঘরা হইয়াছে।

শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ জাড়গ্রাম, হুগলী।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" দ্বিতীয় খণ্ড গ্রন্থে দশঘরা গ্রাম সম্পর্কে লিখিত বিবরণীর অংশ বিশেষ নীচে উদ্ধৃত হইল ঃ—

"দশঘরা ধনিয়াখালি থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থান। কলিকাতা হইতে ১৬ মাইল দূরে অবস্থিত। বর্তমানে দশঘরা একটি ক্ষুদ্র গ্রামে পরিণত হইলেও প্রায় সাড়ে সাত শত বৎসর পূর্বে দশঘরা বারোভূঁয়ারী রাজার রাজধানী ছিল বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দশখানি গ্রাম লইয়া রাজধানী গঠিত হইয়াছিল বলিয়া এই অঞ্চল দশঘরা বলিয়া প্রখ্যাত হয়। যে দশখানি গ্রাম লইয়া দশঘরা হইয়াছিল সেই দশখানি গ্রাম এখনও বিদ্যমান আছে। তাহাদের নাম— শ্রীকৃষ্ণপুর, জাড়গ্রাম, দিঘরা, আগপাপুর, শ্রীরামপুর, ইছাপুর, গোপীনগর, গঙ্গেশনগর, পাড়াম্বো ও নলথোবা।

দশঘরার প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। এই গ্রামের পশ্চিম প্রান্ত দিয়া বিমলা ও পূর্বপ্রান্ত দিয়া কানানদী প্রবাহিত ছিল।

দশঘরার বিশ্বাস বংশের পুষ্করিণীর তীরে মনোরম পরিবেশে বিরাট অট্টালিকা এবং দুর্গাপূজার ঠাকুর দালান ও কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউর কারুকার্য খচিত মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। একটি পাথরে মন্দির "শ্রীসদানন্দ বিশ্বাস" কর্তৃক "১৬৫১ শকাব্দে" প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। পোড়ামাটির শিল্প সম্ভার সমৃদ্ধ সুদৃশ্য এই মন্দির শ্রীপৃথ্বীশ চন্দ্র বিশ্বাস সংস্কার করিয়া ইহার প্রাচীন রূপবৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বজায় রাখিয়াছেন। আজও দোল,

দুর্গোৎসব প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপাদি এই বংশে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্বাসদের রথ এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ।

রায় বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায় জীউর মন্দিরও বিপিন কৃষ্ণরায় নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রা বা কীর্তনাদির জন্য আলাদা প্রশস্ত নাটমন্দির আছে। কৃষ্ণরায়ের তিনি একটি ঝিল খনন করেন। ইহাও একটি দর্শনীয় জিনিস। দশঘরার বুড়ো শিব ও বিশালাক্ষীদেবী গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হন। পূর্বে রথতলার পশ্চিমে শিবপুকুরের পূর্ব ও পশ্চিম পাড়ে শিবঠাকুর ও বিশালাক্ষীর মন্দির ছিল। কালক্রমে মন্দির ভগ্ন হইলে বিগ্রহ অন্য মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে প্রতি বৎসর বুড়োশিবের গাজন হয়। তদুপলক্ষে অত্যাপি দশঘরায় বহু লোকের সমাগম হয়।

দশঘরায় একটি প্রাচীন শিব মন্দির আছে। ইহার গায়ে ইঁটের উপর বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল।

দশঘরার নিকটবর্তী জাড়গ্রামের 'কালু রায়' সম্বন্ধে কবি রামদাস আদক লিখিয়াছেন :

জাড়গ্রামে বন্দিলাম ঠাকুর কালু রায়
যাঁহার কৃপায় কবি রামদাস গায়॥

কালু রায় কর্তৃক প্রাপ্ত শিলাখণ্ড এখনও এই গ্রামে আছে। কালু রায়ের সেবায়েত হইতেছেন সাহা। পরে তাঁহারা পণ্ডিত উপাধি গ্রহণ করেন। কালু রায়ের বাড়ির ভগ্নাবশেষ ও পুষ্করিণী এখনও বিদ্যমান আছে। প্রতি বৎসর গাজনের সময় 'বুড়ো রায়'কে বাদ্য ও শোভাযাত্রা সহকারে দিঘীড় গ্রামে আনা হয় এবং পূজার পর জাড়গ্রামে ফিরাইয়া আনা হয়। প্রতি বৎসর এই গ্রামে বৈশাখ মাসে তের দিন ধরিয়া কালু রায়ের গাজন হয়। ধর্মরাজ কালু রায় এই অঞ্চলে খুব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিলে বর্ধমানের জাড়গ্রামে কালু রায়ের মন্দির ও নাটমন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন।" [পৃঃ ৮২০-২৪]

২। গ্রাম : শাহবাজার। ৩৫।১২০৭৬।৪০৬।৪৬৭

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, দুলে, বাগ্দী, হাড়ী ও মুসলমান।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) তারকেশ্বর রেলষ্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ গোলাম আলী পীরের উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় চার-পাঁচদিনব্যাপী স্থায়ী হয় এবং প্রায় দুই-তিনশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) পীরের উৎসব উপলক্ষে মেলা। ১লা মাঘ হইতে চার-পাঁচদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুই তিন শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোলাম আলী পীরের একটি সমাধি এবং পীরের নামে একটি পুষ্করিণী আছে।

শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ জাড়গ্রাম, হুগলী।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থে শাহবাজার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণী পাওয়া যায় :

পারাম্বুয়া ও শাহবাজার ধনিয়াখালি থানার অন্তর্ভুক্ত দুইটি গ্রাম বর্তমানে নগণ্য ও অখ্যাত হইলেও, প্রাচীনকালে শাহবাজার গোলাম আলী পীরের জন্য মুসলমানদের নিকট একটি পবিত্র স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি ও তাহার পর দিন এই গ্রামে গোলাম আলীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে দুইদিবসব্যাপী একটি বিরাট মেলার অনুষ্ঠান হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নরনারী উক্ত মেলায় পীরের কাছে মনস্কামনা সিদ্ধির জন্য পীরের পুকুরে সিন্নি অর্থাৎ বাতাসা ভাসাইয়া দেয়। পীরের মাহাত্ম্যে যাঁহার বাতাসা আবার ফিরিয়া আসে, তাঁহার অভিষ্ট লাভ হয়। শাহবাজার গ্রামটি মুসলমান প্রধান গ্রাম।

বর্তমান তারকেশ্বর হইতে বাসে করিয়া গোপীনগরে নামিয়া এই গ্রামে যাইতে হয়।

[পৃঃ ৮ ১৪]

৩। গ্রাম : শেয়াপুর। ১৩৫।১০৩'৯৫।৫৮।৩০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, গোয়ালা, ভুঁইয়া, নাপিত, মুচি, বাউরী, কোড়া।

গ্রামে ঘোষপাড়া, ধনেপাড়া ও মাঝেরপাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গুড়াপ। বৈচি-দশঘরা রাস্তার ঘোষলা হইতে শেয়াপুর পর্যন্ত একটি রাস্তা আছে। এই পথেই গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং ৪ঠা আশ্বিন মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত পূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। ৪ঠা আশ্বিন একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মনসার একটি মন্দির আছে।

শ্রীবলাই চন্দ্র ঘোষ, কৃষিকার্য,
গ্রামঃ শেয়াপুর, পোঃ বারুল,
হুগলী।

৪। গ্রাম : কন্দুইবাঁকা। ১৯৭।৪৫০'০৭।১৬৯।৮৬৭

(ক) হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া ও গোয়ালাপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী, ব্যবসায়।

(গ) বেলমুড়ি রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সন্ধ্যা দেওয়ান পীরের উরস্ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) দেওয়ান পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে তিন-চারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হয়।

(চ)

শ্রীফকির মহম্মদ মুকতি, কৃষিজীবি,
গ্রামঃ কন্দুইবাঁকা, পোঃ বোসো,
হুগলী।

ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দিরাদি ও উৎসব-পার্বণ সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ," ২য় খণ্ড গ্রন্থে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায় :

গুড়বাড়ী (মৌজা নং ৫)।

গুড়বাড়ী গ্রাম হুগলী জেলার শেষ প্রান্তে অবস্থিত। ইহার পরই বর্ধমান জেলার সীমানা সুরু হইয়াছে।

গুড়বাড়ীর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর বিরাট মন্দির ও দোলমঞ্চ একটি দর্শনীয় বস্তু। ১৭১১ শকে রামনারায়ণ চৌধুরী ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহারা কাঁক্সা বংশ, জাতিতে সদ্গোপ। ইঁহাদের কুলদেবতা কঙ্কেশ্বর মহাদেব।

ইঁহাদের দুর্গাপূজার বিরাট দালান বর্তমানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। চৌধুরীদের দুইটি বাড়ীতে দুইটি বড় বড় মন্দির। বড় বাড়ীতে রামনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ ও ছোট বাড়ীতে ইন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণের। এই দুই ঠাকুরের বহু ভূ-সম্পত্তি ছিল। উহা হইতে অতিথি সেবা, দেব-সেবা হইত; মন্দিরগুলি মধ্যে মধ্যে সংস্কার করার দরুণ এখনও বেশ ভালো আছে। [পৃঃ ৭৭৮]

চোপা (মৌজা নং ৮)।

গুড়বাড়ী ইউনিয়নের ঠিক মধ্যস্থলেই হইতেছে চোপা। এই গ্রামে বর্তমানে উচ্চ বিদ্যালয়, হেলথ সেণ্টার, অফিস প্রভৃতি সমস্তই আছে, কিন্তু যাতায়াতের অসুবিধার জন্য গ্রামটি যথোচিত উন্নতির অন্তরায় হইয়া আছে।

প্রাচীনকালে চোপা একটি সুসমৃদ্ধ গ্রাম ছিল। এই গ্রামের মজুমদার বংশের সুবৃহৎ ভবন ও অসংখ্য দেবালয় দেখিলে এক সময় মজুমদার বংশ যে কিরূপ অর্থশালী ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। এই বংশে রামদেব মজুমদার কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন; গ্রামের অসংখ্য শিব মন্দির ও তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউর মন্দির তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। গোপীনাথের মন্দির, দুর্গাপূজার দালান এবং চারিটি শিবমন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে, কিন্তু অন্যান্য কীর্তি আজ ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।

মুখোপাধ্যায় বংশের বহু কীর্তি চোপায় আছে। তন্মধ্যে দুইটি শিবমন্দির ও ঢাকেশ্বরী মন্দির উল্লেখযোগ্য।

চোপা গ্রামের ব্রাহ্মণপাড়ায় বারোয়ারী কালীপূজা খুব প্রাচীন বলিয়া শুনিলাম। মন্দির দেখিয়া প্রাচীন বলিয়াই মনে হয়। মন্দিরের উপরিভাগ পড়িয়া যাওয়ায় উহা খড় দ্বারা ছাউনি করা হইয়াছে। ১০১৫ সালে কণাদ সিদ্ধান্ত এই পূজার প্রবর্তন করেন। গ্রামটি সদ্গোপপ্রধান হইলেও মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও ঘোষ, বসু, মজুমদার, মিত্র প্রভৃতি কায়স্থ এবং দুলে, বাগ্দী, কর্মকার প্রভৃতি লোকের বাস আছে। [পৃঃ ৭৯৬-৭৯৭]

গোপীনগর (মৌজা নং ৪৩)।

গোপীনগর গ্রামের দুইটি পটি আছে একটি ইছাপুর, আর একটি মল্লিকপাড়া। এই স্থানের দানশীল ব্যক্তি গোপীনাথ সিংহ চৌধুরীর নামানুসারে গ্রামের গোপীনগর নামকরণ হয়।

সিংহচৌধুরী বংশের পঞ্চচূড়া শিবমন্দির ইছাপুর গ্রামের একটি দর্শনীয় বস্তু ছিল। সম্প্রতি এই মন্দিরের একদিকের দেওয়াল ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই মন্দিরের পাশে আরও একটি শিবমন্দির আছে। পাশাপাশি দুইটি মন্দিরে কাল ও সাদা পাথরের দুইটি শিবলিঙ্গ ছিল।

গোপীনগরের রামনাথ শিব একটি দর্শনীয় বস্তু। শিবমন্দিরে উৎকীর্ণ একখানি লিপি হইতে মন্দির ১৩৫৯ সালে সংস্কার করা হইয়াছিল জানা যায়।

শিবের নাম রামনাথ, বিরাট গৌরীপট্ট ও বিশাল শিবলিঙ্গ। এতবড় শিব সচরাচর দেখা যায় না। রামতর্কালঙ্কার প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই শিব প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে এই বংশের শিষ্য আঁটপুরের কৃষ্ণরাম মিত্র নবরত্ন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। মন্দিরের গায়ে বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত ছিল। ১৩৫৯ সালে মন্দির সংস্কারের সময় সেগুলি চুনবালি দেওয়ায় ঢাকিয়া গিয়াছে। নিতাই-গৌর, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি ছয়খানি ইটের উপর অঙ্কিত চিত্র এখন বিদ্যমান আছে।

বাজার বারোয়ারীতলায় বিশালাক্ষী গ্রাম্য দেবীরূপে পূজিতা হন। মন্দিরটি সম্প্রতি সংস্কার করা হইয়াছে।

গোপীনগরের দ্বাদশ মন্দির রূপনারায়ণ রায় ১২৬৭ সালের বৈশাখ মাসে প্রতিষ্ঠা করেন। রায়বংশের পঞ্চাশ বিঘা জমির উপর প্রাসাদোপম বিরাট তিন মহল বাড়ি এই অঞ্চলের দর্শনীয় বস্তু ছিল। বাড়ির প্রথম মহলে দ্বাদশটি শিবমন্দির দুই দিকে দুইটি করিয়া আড়ভাবে চারটি এবং মধ্যে আটটি মন্দির ও একটি বিরাট তুলসীমঞ্চ অদ্যাপি আছে। [পৃঃ ৮১৪-৮১৬]

ভাণ্ডারহাটী (মৌজা নং ৮০)।

ভাণ্ডারহাটী সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। হরিপাল ষ্টেশন হইতে সাত মাইল দূরে অবস্থিত। হরিপাল হইতে চুঁচুড়া পর্যন্ত যে বাস সার্ভিস আছে উক্ত সার্ভিসের বাসগুলি কেজুর-ভাণ্ডারহাটী-বেলমুড়ির মধ্যে দিয়া গিয়াছে।

প্রসিদ্ধ ষ্টিভেডোর অতুল চন্দ্র চৌধুরী এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁহার প্রাসাদোপম বাড়ি

নির্মাণ করিয়া তাহার সম্মুখে শৈলেশ্বর শিবের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্বে ভাণ্ডারহাটী গ্রামে সাঁওতালদের একটি খুব বড় মেলা ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন হইত। এই মেলায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার সাঁওতাল নরনারীর সমাগম হইত। [পৃঃ ৮১৩]

সোমসপুর বা সমসপুর (মৌজা নং ৯৭)।

সোমসপুরের প্রাচীন শিবমন্দিরের গাত্রে বহু দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। কিন্তু মন্দির ভগ্ন হওয়ায় বর্তমানে শিবলিঙ্গ শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহে রক্ষিত আছে। শিবমন্দিরের সম্মুখে নিম্নলিখিত কথাগুলি উৎকীর্ণ আছে: "শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শুভমস্তু—১২৬১ শকাব্দ"। এই গ্রামে আর একটি শিবমন্দির গাত্রে লেখা আছে: "শ্রীশ্রীরঘুনাথ শিবশম্ভু শকাব্দ ১৭৫৯" এই মন্দির ১২৪৪ সালে প্রকাশ চন্দ্র শর্মা, রাজ চন্দ্র শর্মা ও শিব চন্দ্র শর্মা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত আছে। সোমসপুরের শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জীউর মন্দির এই গ্রামের একটি প্রাচীন মন্দির। শ্যামসুন্দরের বিগ্রহ অতি সুন্দর। কথিত আছে গোস্বামী-মালিপাড়ার গোস্বামীদের নিকট হইতে এই বিগ্রহ আনীত হয়। মন্দির ভগ্ন হইয়া যাইলে বৃন্দাবনপুর নিবাসী শ্রীবট কৃষ্ণ ভড়, শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ভড়, শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভড, শ্রীনলিন চন্দ্র ভড় ও দেবেন্দ্র নাথ ভড়, তাঁহাদের পিতা নন্দলাল ভড় ও মাতা প্রিয়বালা দাসীর স্মৃতিরক্ষার্থে ১৩৪৯ সালে দেবালয় পুনঃনির্মিত করিয়া দেন।

এইস্থানে নাথ সম্প্রদায়ের দুখীরাম চিত্রকর প্রতিষ্ঠিত "বুড়ো দামান" আছে। বর্তমানে এই নাথ সম্প্রদায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু পূর্বে ইহারা মুসলমান ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। ইহারা মৃতদেহ কবর দিত। এই "বুড়ো দামান" খুব জাগ্রত দেবতা। পুত্র কন্যা না হইলে এই দেবতার কাছে পুত্র-কন্যা লাভের জন্য অনেকে মানত করেন। এই স্থানে একটি কালী মন্দির আছে।

সোমসপুরের পার্শ্বেই নাথনগর গ্রামের শ্রীশ্রীবিশালাক্ষী দেবীর মন্দির ১২১৪ সালে রাধাচরণ শীল কর্তৃক স্থাপিত হয় বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরটি ভাঙ্গিয়া গেলে শ্রীবট কৃষ্ণ ভড় ও তাঁহার চারি ভ্রাতা ১৩৫৩ সালে ১৩ই মাঘ উহার সংস্কার করিয়া দেন। গ্রামের কালীমন্দিরটিও উঁহারা ১৩৪৮ সালে সারাইয়া দেন। ইহার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রাম আছে, তাহার নাম হারপুর। এই গ্রামে হর-নগরেশ্বর শিব জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত।

[পৃঃ ৮০১-৮০২]

পলাশী (মৌজা নং ১১৭)।

পলাশী হুগলী জেলার সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম; পলাশীর প্রাকৃতিক শোভা অতি মনোরম। ইহার পাশ দিয়া ঘিয়া নদী বলয়াকারে প্রবাহিত। এক সময়ে এই নদী খুব বেগবতী ছিল।

পলাশী গ্রামে শ্রীশ্রীপতিদুর্গামাতা খুব জাগ্রতা দেবতা বলিয়া এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। পতিদুর্গা অর্থাৎ শিবদুর্গার বিরাট মূর্তি একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরের মধ্যে শিবের পদতলে একটি ষাঁড় ও দুর্গার পদতলে সিংহ বিরাজিত এবং শিবের দক্ষিণে নন্দী ও দুর্গার বামে জয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ব্রাহ্মণে ইহার পূজা করেন না। ইহার পুরোহিত শ্রীবিজয়কৃষ্ণ পণ্ডিত, ইনি জাতিতে হাড়ি। আশ্বিন মাসে ও পৌষ সংক্রান্তি উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট মেলা বসে। ১৩৪৮ সালের ২রা আশ্বিন গুড়াপ নিবাসী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ নন্দী এই মন্দির সংস্কার করিয়া দেন। [পৃঃ ৮০৬]

গুড়াপ (মৌজা নং ১২৬)।

গুড়াপ সদর মহকুমার ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত একটি কায়স্থ প্রধান গণ্ড গ্রাম। কর্ড লাইনে গুড়াপ হুগলী জেলার শেষ স্টেশন। এই স্থানের দূরত্ব স্টেশন হইতে ছত্রিশ মাইল।

গুড়াপে অসংখ্য দেবালয় আজও বিদ্যমান আছে, তন্মধ্যে রামদেব নাগ প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীনন্দলাল জীউর বিরাট মন্দির ও মন্দির গাত্রে ইটের কারুকার্য

একটি দর্শনীয় জিনিস। মন্দিরের রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ, নাট্যমন্দির এবং মন্দির প্রাঙ্গণে গোপেশ্বর শিব অদ্যাপি বিরাজিত।

নন্দদুলালের বিগ্রহ কাল কষ্টিপাথরের নির্মিত এবং রাধারাণীর বিগ্রহ অষ্টধাতু নির্মিত। নন্দদুলাল ও রাধারাণীর বিগ্রহ দুইটি দেখিতে এত সুন্দর যে, একবার দেখিলে ভক্তের মনের ভাবের সঞ্চার হয়; নন্দদুলালের দক্ষিণে নাড়ুগোপাল ও বামে বালগোপালের মূর্তি আছে। প্রতিষ্ঠাতা রামদেব নাগের কন্যা বালগোপালের বিগ্রহ স্থাপনা করেন। কালীপূজার পর দিন প্রতিপদের অমাবস্যায় প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত নন্দদুলাল জীউর অন্নকূট উৎসব হয়। এই উৎসবে দেশ-দেশান্তর হইতে পূর্বে অসংখ্য যাত্রীর সমাগম হইত।

নন্দদুলালের নাটমন্দির ১৩৫০ সালের ১৪ই জ্যৈষ্ঠ শ্রীকরুণাময় নাগ তাঁহার পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মাণ করিয়া দেন।

গুড়াপের গ্রাম্য প্রাচীন দেবী হইতেছেন 'বুড়িমা' অর্থাৎ দেবী দুর্গা। দুর্গার বামে গণেশ এবং দক্ষিণে কার্তিক। একমাত্র গুড়াপের নাগবংশের যে দুর্গা প্রতিমা হয়, তাহা ছাড়া হুগলী জেলার আর কোথাও এইরূপ গণেশের মূর্তি বাম দিকে দেখা যায় না। বুড়িমার বর্তমান সেবায়েত হইতেছেন শ্রীকেশব লাল চট্টোপাধ্যায়।

গুড়াপের চক্রবর্তীদের প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দিরে জটিলেশ্বর বিগ্রহ আছেন। এই মন্দিরের সেবায়েত হইতেছেন শ্রীগোপাল দাস, নীলরতন ও মথুরামোহন চক্রবর্তী। চক্রবর্তীদের আর একটি মন্দিরের নাম শ্রীশ্রীগোপালজীউর মন্দির। এতদ্ব্যতীত রামদেব নাগের গুরুদেব পণ্ডিত রামসুন্দর তর্কালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত মুক্তকেশী মন্দির গ্রামের প্রসিদ্ধ মন্দির।

গুড়াপের চক্রবর্তীদের দুর্গা প্রতি বৎসর দশমীর পরিবর্তে একাদশীর দিন বিসর্জন হয়। এই স্থানের শ্রীশ্রীগৌড়েশ্বর জীউ খুব জাগ্রত দেবতা। গৌড়েশ্বর শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভু বলিয়া প্রখ্যাত। এই স্থানে চৈত্রমাসে গাজন সন্ন্যাস, ঝাঁপ ও চড়কপূজা খুব সমারোহের সহিত হয়। গৌড়েশ্বরের তেলপড়া খুব বিখ্যাত; ঘায়ে একবার লাগাইলে ঘা সম্পূর্ণ সারিয়া যায় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। তজ্জন্য তেলপড়া লইতে ঠাকুরের কাছে প্রত্যহ বহু লোক আসে।

৫ই জুন ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ হইতে শ্রীনন্দদুলার জীউর বিগ্রহ চুরি হইয়া যায় বলিয়া জানা যায়।

[পৃঃ ৭৯৮-৮০০]

রুদ্রাণী (মৌজা নং ১৮৯)।

রুদ্রাণী বেলমুড়ি ইউনিয়নের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামে মদনমোহন জীউ খুব জাগ্রত বলিয়া খ্যাত। বৃন্দাবন হইতে ঠাকুর বৈরাগ্য নামক একজন সন্ন্যাসী মদনমোহনকে আনেন। বৃন্দাবনে গিরিগোবর্ধনের গুহায় বৈরাগ্য এই মদনমোহন মূর্তি প্রাপ্ত হন। দারুময় মূর্তি। ঠাকুর বৈরাগ্যের সমাধি এখনও বর্তমান আছে। চৈতন্য পূর্ব আমলের ঘটনা। মোগলরা যখন বাংলাদেশে আসিয়া পাঠানদের আক্রমণ করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দেন তখন দাউদ খাঁ এই গ্রামের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে এই গ্রামে ঠাকুর বৈরাগ্যের আশ্রমে আশ্রয় নেন। এখানে কিছুদিন নিরাপদে থাকিয়া যান এবং ঠাকুর বৈরাগ্যকে প্রচুর অর্থ দেন। সেই অর্থে এই দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। বিগ্রহ—মদনমোহন (নীল) বলরাম (শুভ্র), রাধিকা ও রেবতী (স্বর্ণকান্তি)।

কথিত আছে এই গ্রামের পাশ দিয়া এককালে দামোদর প্রবাহিত ছিল। এই গ্রাম উঁচু দ্বীপের মত ছিল। এই মন্দিরের পাশে পুষ্করিণীর নাম যমুনা—যেখানে এককালে জোয়ার ভাঁটা খেলিত। এখানে একটি বকুল গাছ আছে। উক্ত গাছটি যে কতোদিনের তাহা কেহ বলিতে পারে না। কথিত আছে ঠাকুর বৈরাগ্য তপপ্রভাবে উক্ত গাছ হইতে আম পাড়িয়া খাওয়াইয়া ছিলেন।

বর্তমানে শ্রীমদ নিত্যানন্দ বংশের নিম্নোক্ত চারজন গোস্বামী তিন মাস পালা করিয়া মদন-মোহনের সেবা করেন। গোস্বামীদের নাম—সুবল চন্দ্র গোস্বামী, নৃত্যগোপাল গোস্বামী, গোষ্ঠবিহারী গোস্বামী ও শ্যামচাঁদ গোস্বামী।

মদনমোহন জীউর মন্দির একবার বহু পূর্বে লালমণি দেবী সংস্কার করেন। [পৃঃ ৮০৭-৮০৮]

বেলমুড়ি (মৌজা নং ১৯০)।

বেলমুড়ি ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত বেলমুড়ি ইউনিয়নের অধীনে একটি প্রাচীন গণ্ড গ্রাম। চুঁচুড়া হইতে তারকেশ্বর ও চুঁচুড়া হইতে হরিপাল এই দুইটি পাকা রাস্তার সংযোগস্থলে এবং হাওড়া বর্ধমান নিউ কর্ড রেলপথের উপর গ্রামটি অবস্থিত।

বেলমুড়ির পূর্বনাম রুক্ষরামবাটী ছিল। গ্রামে এক সময় বসু, চট্টোপাধ্যায় ও বসুরায় বংশের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল। বসু বংশের কুলদেবতা গোপীনাথ জীউর বিগ্রহের পাদপীঠে 'চিন্তামণি' এই নামটি উৎকীর্ণ আছে দেখা যায়। গোপীনাথজীউর মন্দির ১২৬২ সালে বৈকুণ্ঠদাস বসু কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়।

গ্রামের দ্বাদশ শিবমন্দিরও বসু বংশীয়গণের প্রতিষ্ঠিত; বর্তমানে একধারে তিনটি ও অন্যদিকে একটি মাত্র ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। মন্দিরের গায়ে ইটের উপর যে কারুকার্য করা ছিল, তাহা আজও দৃষ্টিপথে আসে।

ইহাছাড়া বসুরায় বংশের ঠাকুরবাড়ী ও দুর্গাপূজার দালান এবং বসু বংশের আরো দুইটি শিবমন্দির গ্রামের মধ্যে আছে। পূর্বোক্ত দুইটি শিবমন্দির হইতে শিবলিঙ্গ দুইটি একটি সুসংস্কৃত মন্দিরে সংস্থাপিত করিয়া সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইয়াছে।

কানানদী।

ধনিয়াখালী থানার অন্তর্গত কানানদী গ্রাম আদিবাসীদের মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তির দিন খুব উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে "টুসু" উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষ্যে আদিবাসীদের নাচ ও গান তীরধনুক প্রতিযোগিতায় বিজয়ীগণকে রৌপ্যপদক পুরস্কার দেওয়া হয়। এই মেলা দেখিবার জন্য বহুদূর হইতে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাজার নরনারী সমবেত হয়। সন্ধ্যায় 'টুসু' ঠাকুরকে কানানদীর জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই গ্রামের বসুমল্লিক বংশ প্রসিদ্ধ। [পৃঃ ৮২৬]

বসুয়া।

বসুধাবাসিনী দেবীর নামানুসারে বসুয়া গ্রামের নামকরণ। প্রায় ২০০ বৎসর পূর্বে (৮ পুরুষ পূর্বে) লালা গৌরহরি সিংহ এই মন্দির ও দেবী প্রতিষ্ঠা করেন। দেবীর মূর্তি মহিষমর্দিনী-দারুমূর্তি। দুর্গামূর্তি। দুর্গা, অসুর, বামে সিংহ, দক্ষিণে বাঘ। এই দেবীকে চৈত্রসংক্রান্তির সময় লীলাবতীর বিবাহের সময় স্থানীয় শিবের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। সেখানে ৪ দিন অবস্থান করিবার পর পুনরায় নিজ মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়।

সিংহবংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ রামলাল সিংহের বংশধর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লালা গৌরহরি সিংহ উক্ত শিবমন্দির ও মহাপ্রভুর মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মহাপ্রভুর এখনও নিত্য ভোগ হয়। বিরাট নাটমন্দির এখনও বর্তমান। [পৃঃ ৮০৭]

ধনিয়াখালী।

ধনিয়াখালী একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। এখানকার তাঁতের শাড়ীর কাপড় বিখ্যাত। সারা ভারতব্যাপী ইহার খ্যাতি আছে। দেশের বাজারেও ইহার সমাদর আছে। এখানে ইংরাজ আমলে বা তৎপূর্বে একটি গঞ্জ ছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল। এই গ্রামের চারিদিকে খাল গড় ও দ' বা দহগুলি ইহার প্রমাণ দেয়। এককালে বহু দূর দেশ হইতে সওদাগরগণ বাণিজ্য ব্যপদেশে এখানে আসিতেন এবং ধনসমাগম হইত প্রচুর।

ধনিয়াখালী নামের সার্থকতা মনে হয় এই সব বিষয় হইতে পাওয়া যায়। এখনও ইংরাজ আমলের নীলকুঠি এখানে বিরাজিত। এখানের একটি প্রাচীন মসজিদও এই তথ্যের সাক্ষ্য হিসাবে বিরাজিত। এখানে যে এককালে বহু ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি বাস করিতেন তাহার প্রমাণও পাওয়া যায় এই অঞ্চলের চতুষ্পার্শে অবস্থিত বহু প্রাচীন মন্দির হইতে।

এখানে বুড়ো শিবের মন্দির বাংলা ১১১০ সনে স্থাপিত। এই মন্দিরই এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রাচীন মন্দির। শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার সংস্কার করেন।

নিত্যানন্দ রক্ষিত একটি শিবমন্দির ১১৯৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন। এই শিবমন্দিরও প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য হিসাবে এখনও বিরাজিত। সম্প্রতি এই মন্দির রক্ষিত বংশের উত্তরাধিকারিগণ সংস্কার করেন।

ভগবানদাস বাবাজী নবদ্বীপ হইতে আসিয়া এইখানে শ্রীগৌরাঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে একটি বিরাট দহ ছিল। উহা এখনও গৌরাঙ্গের দ' বা দহ নামে খ্যাত।

আনুমানিক ৩০০ বৎসর পূর্ব হইতে রুদ্রানীর মদনমোহন ধনিয়াখালী গ্রামে আসিতেছেন আষাঢ় মাসে রথযাত্রার সময়। রথযাত্রার দিন তাঁহাকে মহাধুমধামের সহিত বসুয়া গ্রামের সিংহ বংশের লোকেরা আনেন এবং তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত রাধাগোবিন্দ জীউ মন্দিরে রাত্রে ৩।৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, ভোগরাগ গ্রহণ করিয়া ধনিয়াখালী গ্রামে আসেন এবং পুর্নযাত্রার দিন আবার রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দিরে যান এবং সেখান হইতে রুদ্রাণীতে আদি নিবাসে ফিরিয়া যান। এই উপলক্ষে ধনিয়াখালিতে বহুকাল ধরিয়া এই সাতদিন বারোয়ারী চলে। এক একদিন এক এক ভক্ত পালাক্রমে এখানে ভোগ দেন এবং যাত্রা, কীর্তন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয় এবং খুব জাঁক-জমক হয়। এই অঞ্চলের ইহা একটি প্রসিদ্ধ উৎসব।

এখানে আর একটি প্রসিদ্ধ মেলা হয়—স্নানযাত্রার মেলা। জগন্নাথদেবকে স্নানযাত্রার দিন ধনিয়াখালী বাজারে স্নান পিড়িতে বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ী হইতে আনা হয়। এই উপলক্ষ্যেও উৎসব হয়। জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্তি দেখিতে খুব সুন্দর।

ঘনরাজপুর গ্রামটি ধনিয়াখালী গ্রামেরই একটি পটি। এখানে শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা বিখ্যাত। দেবী খুব জাগ্রতা। বারমাস নিত্য সেবা হয়। দেবী মৃন্ময়ী। দেবীর চিন্ময়ী মূর্তি গ্রামের অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দেবীর কল্যাণে এই গ্রাম মহামারীর হাত হইতে রক্ষা পায়।

শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মন্দির ও বিরাট মূর্তি গ্রামের শ্রীমতি তারকাবালা দাসী নিজ ব্যয়ে নূতন করিয়া নির্মাণ করিয়া দেন। [পৃঃ ৭২৪-৭২৬

জেলা : হুগলী
থানা : খনিয়াখালি

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোভাব উৎসব
(গোলাম আলী পীর)

শাহবাজার গ্রামে গোলাম আলী নামক জনৈক পীরের দরগায় প্রতি বৎসর পয়লা মাঘ হইতে চার-পাঁচ দিনব্যাপী উৎসব চলে। ইহা আনুমানিক দুই-তিন শত বৎসরের প্রাচীন এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের এক বিশেষ উৎসব।

পয়লা মাঘ ভোর হইতে পীরের নির্দিষ্ট পুকুরে 'সিন্নি' ভাসান হয়। ঐদিন মানতকারীরা পীরের পুকুরে এক কোমর জলে নামিয়া কলাপাতায় মোড়া 'সিন্নি' হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কথিত আছে যে, সিন্নি হাত হইতে আপনি জলে ভাসিয়া যাইবে এবং পীরের কৃপা হইলে জল হইতে ঐ সিন্নি পুনরায় মানতকারীর হাতে ফিরিয়া আসিবে। হিন্দু সম্প্রদায়ের বহুলোক এই উৎসবে যোগদান করেন এবং পীরের নামে সিন্নি ভাসান। এই দিন পীরের দরগাহ-এ খাসী, মোরগ, মিষ্টান্ন, টাকাপয়সা ইত্যাদি মানত হিসাবে দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে দরিদ্র ভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। পীরের দরগাহের বর্তমান সেবায়েত সৈয়দ মহিউদ্দিন সাফেজ ও সৈয়দ আবদুল হাই। এই উৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

(সন্ধ্য়া দেওয়ান পীর)

কনুইবাঁকা গ্রামে সন্ধ্য়া দেওয়ান পীরের উরস উপলক্ষে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে একটি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের কোন নির্দিষ্ট তারিখ নাই; গ্রামবাসীর সুবিধামত মাঘ মাসের যে-কোন একদিন উৎসব আরম্ভ হইয়া তিন-চারদিনব্যাপী চলে। ইহা স্থানীয় গ্রামের মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব। ইহাতে হিন্দুগণ সক্রিয় অংশ গ্রহণ না করিলেও উৎসব পালনে আর্থিক সাহায্য করিয়া থাকেন। সাধারণত পীরের নিকট মোরগ, খাসী ইত্যাদি মানত দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে দুই-একজন মুসলমান ফকীরের আগমন হয়। পীরের বর্তমান সেবায়েত সেখ ফকির মহম্মদ মুফতি। উৎসবের দিন তরজাগানের আয়োজন করা হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

তাহাছাড়া চৈত্রমাসে এই পীরের স্থানে আর একবার উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং মানতের পশুপক্ষী জবাই করা হয়।

মনসাপূজা

শেয়াপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ৪ঠা আশ্বিন মনসার ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন। গ্রামে একটি দেবালয়ে মনসাদেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী।

বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ৩রা আশ্বিন রাত্রে প্রারম্ভিক পূজা হয়, ইহাকে 'সয়লা' বলা হয়। ৪ঠা আশ্বিন নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী বাদ্যভাণ্ড সহকারে মনসাদেবীর পূজা দিতে এই গ্রামে সমবেত হন এবং পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ পূর্ব্বক স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন। সর্পভয় নিবারণ উদ্দেশে স্থানীয় গ্রামবাসীগণের এই পূজা করেন। সাধারণত চিনি-সন্দেশ, ফলমূল ইত্যাদির নৈবেদ্য ও ছাগবলি প্রদান করিয়া দেবীর মানত সম্পন্ন করে।

রথযাত্রা

দশঘরা গ্রামের বিশ্বাস পরিবারদিগের কুলদেবতা গোপীনাথজীউ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে গোপীনাথজীউর মন্দির আছে; মন্দির অভ্যন্তরে রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। উৎসবটি বিশ্বাস পরিবারের নিজস্ব হইলেও গ্রামের সর্বসাধারণ এই উৎসবে যোগদান করেন।

রথযাত্রার দিন বিশ্বাসবাবুদের বাসভবন হইতে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহকে রথে আরোহন করাইয়া

শোভাযাত্রাসহ মহা ধুমধামের সহিত রথ টানা হয়। দশঘরার রথযাত্রা উৎসবটি এ অঞ্চলে বেশ বিখ্যাত এবং এই উপলক্ষে অগণিত নরনারী সমাগম হয়।

পূর্বে অর্থাৎ ১৬৫০ শকাব্দে ২১ চূড়া, ১৩ চূড়া ও ৯ চূড়া বিশিষ্ট তিনখানি রথ উৎসব উপলক্ষে বিশ্বাস-বাবুদের বাড়ী হইতে বাহির হইত। ১৭৪৯ শকাব্দ হইতে তিনখানি রথের পরিবর্তে একখানি রথই এ যাবত বাহির হইতেছে।

উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসিয়া থাকেন।

জেলা : হুগলী
থানা : ধনিয়াখালি

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা

(গোলাম আলী পীর)

শাহবাজার গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে আরম্ভ করিয়া চার-পাঁচদিনব্যাপী গোলাম আলী পীরের উরস্ উপলক্ষে প্রায় দশ-বার বিঘা পীরোত্তর জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রতিদিন সকাল হইতে আরম্ভ হইয়া সারাদিনব্যাপী চলে। ইহা প্রায় দুই-তিন শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া স্থানীয় লোকে দাবী করেন।

মেলা উপলক্ষে হুগলী, হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় তিন-চার হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে আসেন। ইহাতে প্রায় সত্তর-পঁচাত্তরটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় দোকানপাটের মধ্যে বিভিন্ন রকমের খাবারের দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহাছাড়া মনিহারী, লোহা, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসনের দোকান, কাপড়-গামছা-লুঙ্গি ইত্যাদির দোকান, বই-ছবির দোকান, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখিন ও নিত্য ব্যবহারিক জিনিসপত্র, মাটির হাড়ি-কলসী এবং পান-বিড়ি প্রভৃতির দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় দল কর্তৃক যাত্রাভিনয়, নাগরদোলা, ম্যাজিক প্রদর্শনী, মর্সিয়া গান ও নাচের ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল আনন্দ অনুষ্ঠানে প্রায় দশ-বার শত লোক অংশ গ্রহণ করেন। অনেকে জুয়া খেলেন।

(সজুয়া দেওয়ান পীর)

কমুইবাঁকা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে সজুয়া দেওয়ান পীরের উরস উপলক্ষে পীরোত্তর প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর প্রতিদিন বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি তিন-চারিদিনব্যাপী স্থায়ী হয় এবং প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং রামচন্দ্রপুর, ন-পাড়া, মেহেরপুর, বাগনান ও দক্ষিণে উলুবেড়িয়া হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় দুই-তিনশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ পদব্রজে মেলায় আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ তারকেশ্বর, সিঙ্গুর, ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রধানতঃ খাবারের দোকান, তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান এবং চীনাবাদাম ও পান-বিড়ির দোকানপাটই বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য তরজা গানের ব্যবস্থা করা হয়।

মনসাপূজা

শেয়াপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ৪ঠা আশ্বিন মনসাপূজা উপলক্ষে আংশিক দেবোত্তর ও স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তির প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং ভান্ডাড়া, বাক্সা, ঘোষলা, পিড়াতলী, গোপীনাথপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং সীমান্তবর্তী বর্ধমান জেলার দুই একটি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে বাউরী, দুলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকই বেশী দেখা যায়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ গুড়াপ, ভান্ডাড়া, বাক্সা, পিড়াতলী, ঘোষলা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশটি এবং প্রায় দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা ও তেলে-ভাজার দোকান ও মনিহারী দোকানের সংখ্যা বেশী। তাহাছাড়া বাক্সা ও কুলীণগ্রাম হইতে প্রতি বৎসর বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি, কুলা ইত্যাদির দোকানপাট আসে।

মেলায় যাত্রাভিনয় হয় না বটে কিন্তু ঢাক-ঢোলের বাজনা ও বাজি পোড়াইতে দেখা যায়।

রথযাত্রার মেলা

দশঘরা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে বিশ্বাস পরিবারের গৃহদেবতা গোপীনাথজীউ-র রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে বিশ্বাস পরিবারের প্রায় আট-দশ বিঘা জমির উপর রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা দিন মেলা বসে। মেলাটি আরম্ভকাল ১৬৫০ শকাব্দে।

মেলায় স্থানীয় এবং হুগলী, হাওড়া এবং কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় দশ-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কলিকাতা, হাওড়া, হুগলী এবং বর্ধমান জেলা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় দেড়শত হইতে দুইশত দোকানপাট বসে এবং প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় বিভিন্ন প্রকারের খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, বিভিন্ন প্রকারের কলমের চারাগাছ, আনারস, ছিপ, পোলো, ঘুনি প্রভৃতির দোকানপাট বেশী দেখা যায়। তাহাছাড়া তামা-পিতল-লোহার বাসনকোসন, বই-ছবি, পান-বিড়ির দোকান, বাদামভাজা, কুলপী, ফানুস ইত্যাদির দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কাস্তে, কাটারী, ছুরি, হেঁসো, কোদাল, মাছধরার কাঁটা বা বড়্শী ইত্যাদির দোকান, চ্যাঙারী, ধামা-কুলার দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল-খেলনার দোকানপাট বসে। কোন কোন বৎসর মেলায় পাখী বিক্রয় হইতে দেখা যায়। কলিকাতা হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই বিভিন্ন নার্শারীর দোকানপাট আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, সত্যপীরের গান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। ইহা ব্যতীত এই স্থানে জুয়াখেলাও হইয়া থাকে। এই সকল আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় দশ-বার হাজার নরনারী অংশ গ্রহণ করেন।

জেলা : হুগলী
থানা : পাণ্ডুয়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম: ভোঁপুর। ১২।৭২৮ ৭২।২১৫।১,২১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্‌দী, সাঁওতাল। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বৈঁচি। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামের সীমানা দিয়া মোটরবাস সার্ভিস আছে।

(ঘ) আষাঢ় মাসে মনসা দেবীর ঝাঁপান উৎসব। উৎসবটি বহু প্রাচীন। গ্রামের একটি অতি প্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে হোরা পঞ্চমী তিথিতে উৎসবটি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ, মনসা এবং ষষ্ঠী আছে। ইহাভিন্ন গ্রামের সীমানায় ধুসী নদীর তীরে আলিমন পীরের নির্দিষ্ট স্থান আছে।

জনশ্রুতি আছে যে, এই স্থানে মহাদেব স্বয়ম্ভু অর্থাৎ ভূমি ফুঁড়িয়া উত্থিত হইয়াছিলেন বলিয়া গ্রামের নাম ভুঁইফোড় এবং অপভ্রংশে ভোঁপুর হইয়াছে।

শ্রীআশুতোষ পাত্র, শিক্ষক,
ভোঁপুর যজ্ঞেশ্বর বিদ্যাপীঠ,
পো: বৈঁচি, হুগলী।

২। গ্রাম: সোণাটিকরি। ৭২।৩৫৭৮।১৯৩।৪৮৬

(ক) বাগ্‌দী, বাউরী, সাঁওতাল ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বৈঁচি। গ্রামে যাতায়াতের কাঁচা রাস্তা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ঈদলফেতর উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা বহু দিনের প্রাচীন।

(ঙ) ঈদলফেতর উপলক্ষে তিনদিনব্যাপী মেলা। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বালা সৈয়দপীরের মাজ্‌হার আছে।

শ্রীএরসাদ আলী খাঁ, কৃষিকার্য,
গ্রাম : সোণাটিকরি,
পো: হরালদাসপুর, হুগলী।

পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও উৎসব-পার্বণাদি সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ২য় খণ্ড গ্রন্থে নিম্নোক্ত তথ্যাদি পাওয়া যায় :

ইনছুরা (মৌজা নং ১৪)।

পাণ্ডুয়া থানার জামনা ইউনিয়নের মধ্যে ইনছুরা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এখানকার বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশ সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত হরকালী ঠাকুর ও পোষ্ট-অফিস আছে। এই গ্রামে স্বর্গীয় প্রসন্ন কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডের আসন ও কালীবাড়ী আছে। প্রতি শনি-মঙ্গলবারে ও প্রতি অমাবস্যার দিনে এখানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ইহাছাড়া মেদিনীপুর নিবাসী (নাগা-বাবা) মোহনগিরি মহাশয়ের শিষ্য উক্ত গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত গোমতীগিরি মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত আনন্দাশ্রম আছে। প্রতি মাঘী-পূর্ণিমাতে ইহার মহোৎসব হয়।

এই গ্রামে বৈঁচি-বৈদ্যপুর রাস্তা হইতে এক মাইল পশ্চিমে ধুসী নদীর উত্তর কূলে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ পীর আলীমন্ সাহেবের সমাধি আছে। প্রতি বৃহস্পতিবারে বহু যাত্রীর সমাগম হয়। ফাল্গুন মাসের প্রথম সপ্তাহের প্রথম বৃহস্পতিবারে তাঁহার উরস্ (স্মৃতি উৎসব) সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে দেশ-বিদেশ হইতে বহু রোগী আসিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। [পৃ: ৯০১ ৯০২]

বৈঁচি (মৌজা নং ২০)।

হুগলী সদর মহকুমার পাণ্ডুয়া থানার অন্তর্গত বৈঁচিগ্রাম একটি প্রাচীন ও সমৃদ্ধশালী পল্লী। সম্প্রতি

এখানে ইষ্টার্ণ রেল পথের বৈঁচিগ্রাম নামে একটি স্টেশন হইয়াছে।··(স্থানীয়) বিদ্যালয় বাড়ীর প্রশস্ত প্রাঙ্গণে দুইটি প্রাচীন মন্দির বিরাজ করিতেছে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ বৃহদাকারের মন্দিরটির দক্ষিণ গাত্রে ১৬০৪ শকাব্দে নির্মিত বলিয়া উল্লিখিত ছিল। এই পৌনে তিনশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন মন্দিরটি বর্তমানে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছে।

ইহাছাড়া এখানকার প্রাচীন রামনাথের মন্দির, রাধাবল্লভজীউর মন্দির ও বামদেব দত্তের কালীমন্দির প্রভৃতি নাম উল্লেখযোগ্য। পিতলের নির্মিত রথ আছে এবং এখানে রথের মেলা হয়।

বৈঁচি গ্রামে রথের মেলায় এইরূপ বিপুল লোক সমাগম হুগলী জেলার মহেশ ভিন্ন খুব অল্প স্থানেই হয়। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বৈঁচির জাগ্রতা দেবী জগৎগৌরী মাতার পূজাকে উপলক্ষ করিয়া স্থানীয় বাজারের কেন্দ্রস্থলে যে মেলা হয় তাহাও দর্শনীয় এবং পরম উপভোগ্য। এখানে মৃৎ-নির্মিত বড়মা কালীর মূর্তিটি প্রায় চৌদ্দ ফুট উচ্চ। এতবড় মৃৎ-নির্মিত কালী মূর্তি এই অঞ্চলে আর কোথাও নাই। [পৃঃ ৮৯৫-৮৯৬]

চৌবেড়া (মৌজা নং ২১)।

বাটিকা-বৈঁচি ইউনিয়নের অন্তর্গত চৌবেড়া একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে স্বর্গীয় ধনঞ্জয় মণ্ডলের প্রদত্ত একটি প্রাচীন মন্দির আছে। এই মন্দিরগাত্রে "১৬৩৮ শকাব্দা" লিখিত আছে। এখানে মহাকাল দেবের একটি স্থান আছে, প্রতি বৈশাখী-পূর্ণিমাতে মহাকাল দেবের পূজাদি হইয়া থাকে ও উক্ত ঠাকুরের নামানুসারে 'মহাকাল দীঘি' নামে একটি পুষ্করিণী আছে। ঐ পুষ্করিণীতে বাতগ্রস্থ রোগী ও অন্যান্য রোগী দেশ-বিদেশ হইতে আসিয়া স্নান করিয়া আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। ইহার পার্শ্ববর্তী আলীপুর ক্ষুদ্রগ্রাম। এই গ্রামে উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পীর আজ্‌গুবী সাহেবের সমাধি আছে। [পৃঃ ৯০৩]

বেড়েলা-কোচ্‌মালী ইউনিয়নের অন্তর্গত বোড়াগড়ি একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহা একটি সমৃদ্ধশালী গ্রাম ছিল। এখানকার প্রাচীন মনোরম পঞ্চরত্ন 'জোড়া শিবমন্দিরটি' দর্শনীয় বস্তু। মন্দির-গাত্রে শকাব্দা ১৭৫৪ ও সন ১২৩৯ সাল লিখিত আছে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন 'গোপালজীউর' মন্দিরটির গাত্রেও ১৬০১ শকাব্দা লিখিত আছে।

কোচ্‌মালী গ্রামের উত্তর-পূর্ব কোণে ও তেল্‌কোপা গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে পীর সাহ্‌বান্দ সাহেবর সমাধি আছে। এখানে আধ-কপালে ও চক্ষু রোগ ভাল হয়। [পৃঃ ৯০৩]

হরাল (মৌজা নং ৭১)।

হরাল একটি প্রাচীন প্রসিদ্ধ সমৃদ্ধশালী গ্রাম। এখানে সাতটি মসজিদ আছে, তন্মধ্যে শাহ্ আলম বাদশাহের বাদশাহী আমলের এক গম্বুজ-বিশিষ্ট মসজিদটি অত্যন্ত প্রাচীন। এই মসজিদ-গাত্রে প্রস্তর-ফলকে আরবী অক্ষরে যাহা লিখিত আছে তাহা এতই অস্পষ্ট যে, তাহার পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহাছাড়া এখানে ছোট শাহ্‌জী, গাজী সাহেব ও বালাসৈয়দ নামক চারিজন সুপ্রসিদ্ধ পীরের সমাধি আছে। যে-স্থানে বালাসৈয়দ সাহেবের সমাধি আছে সেই স্থানে ইদোপলক্ষে মেলা বসে ও খেলাধুলা হয়।

এই ইউনিয়নের মধ্যে বাসুদেবপুরে পীর সাহবান্দ সাহেবের সমাধি আছে। এই স্থানে চক্ষুরোগের ভাল ঔষধ পাওয়া যায় বলিয়া প্রতি বৃহস্পতিবার বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

হরাল-দাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত তারাজোল একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে পীর সুফী সাহেব ও বুড়ো দেওয়ান সাহেবের সমাধি আছে। ২৮শে পৌষ তারিখে সুফী সাহেবের উরস্ (স্মৃতি-উৎসব) সম্পন্ন হইয়া থাকে। এখানে বুড়ো দেওয়ান সাহেবের একটি পুষ্করিণী আছে, ঐ পুষ্করিণীতে স্নান করিলে কুকুরে ও বিড়ালে কামড়ান রোগী ভাল হয় বলিয়া শুনা যায়। [পৃঃ ৯০৪]

পাণ্ডুয়া থানার সিমলাগড়-ভিটাসীন ইউনিয়নের অন্তর্গত পোটবা একটি প্রাচীন গ্রাম। পূর্বে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ নগরী ছিল। এখানে আনন্দময়ী দেবী আছে।

চাঁপাহাটী একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এই গ্রামে সচ্চিদানন্দ ভারতীয় আশ্রম আছে। এখানে বার্ষিক রাস-লীলা ও দোলমেলার উৎসব হয়। [পৃঃ ২০৫]

বেলুন (মৌজা নং ৯৯)।

বেলুন পাণ্ডুয়া থানার এলাকায় একটি বর্ধনশীল পল্লী। হিন্দু রাজত্বে ইহা মহানাদের উত্তর সীমা ছিল।

প্রাচীনকাল হইতে বেলুনে একটি পূজার ব্যবস্থা আছে, তাহার নাম 'বাস্তুপূজা'। উত্তরপাড়ায় 'বাস্তুতলা' নামে একখণ্ড পতিতভূমি আছে। তথায় প্রাচীন ইষ্টক, মৃৎপাত্রখণ্ড এবং একটি পাটযুক্ত কূপের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। বাস্তুপূজার জন্য এই স্থানে এক মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। প্রতি বৎসর আষাঢ় নবমীতে চিরাচরিত প্রথানুসারে বাস্তু-পূজা হইয়া থাকে।

বহুকাল যাবত বেলুনে শাক্তধর্মের প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে মহাসমারোহের সহিত এক মৃন্ময়ী দেবীমূর্তির পূজা হইয়া থাকে। দেবীর নাম "হাঁপাকালী"। পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন পল্লী ও সহর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম দেখা যায়। পূজার অন্যান্য অনুষ্ঠান ব্যতীত ন্যূনাধিক অর্ধশত ছাগ বলি হইয়া থাকে। নিশার ন্যায় পরদিন প্রত্যুষেও প্রসাদ বিতরণের আর এক আনন্দোৎসব সৃষ্টি হয়। কি ছাগ, কি ফলমূল, কি চিনি-সন্দেশ যেন সকল প্রসাদই নীলামে বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। সমাগত আবালবৃদ্ধ দেবী প্রসাদ নীলামের মাধ্যমে ক্রয় করিতে আনন্দ বোধ করেন। কারণ তাঁহারা জানেন, এই প্রকারে সংগৃহীত অর্থ দেবীর মন্দির, ভূমি ও আসবাবপত্রাদির জন্য ব্যয়িত হয়। সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ ৩০০৲ হইতে ৫০০৲ পর্যন্ত হইয়া থাকে। এইরূপ প্রসাদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায় না। বহু দুরারোগ্য ব্যাধির জন্য দেবীর স্বপ্নাদ্য ঔষধ বিতরণেও ব্যবস্থা আছে।

১১৯৮ সালে গোপালপুর নিবাসী ৺কৃষ্ণদাস অধিকারীর অনুরোধে বেলুনে এক হরিসভার সূচনা। অতঃপর স্থানীয় সর্বসাধারণের আন্তরিক চেষ্টায় হরিসভার জন্য একটি পাকা গৃহ নির্মিত হয়। তদবধি হরিসভা স্থায়িত্বলাভ করে।

ইতঃপূর্বে প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার সময় মহোৎসব হইত এবং গোস্বামী-মালীপাড়া নিবাসী নফরচন্দ্র গোস্বামী পৌরোহিত্য করিতেন। প্রায় ৩০ বৎসর হইল স্থানীয় সাধারণের সুবিধার্থে প্রতি বৎসর গুড্ ফ্রাইডের ছুটিতে মহোৎসবের ব্যবস্থা হইয়াছে। [পৃঃ ২০২—২১২]

পাণ্ডুয়া (মৌজা নং ১০৮)।

পাণ্ডুয়া হুগলী জেলার একটি প্রাচীন স্থান, পূর্বে এই স্থানে "পণ্ডুনগর" বা "পাণ্ডুনগর" বলিয়া পরিচিত ছিল এবং মুসলমান-রাজত্বকালেও এই স্থানে হিন্দু রাজার দ্বারা শাসিত হইত। প্রবাদ এইরূপ যে, বুদ্ধদেবের পিতৃব্য অমৃতোদনের পুত্র পাণ্ডুশাক্য নামে একরাজা পাণ্ডু রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পাণ্ডুশাক্যের বংশধরগণের মধ্যে রাজা পাণ্ডুদাস আমতার অধীন পেঁড়োবসন্তপুরে নিজ রাজ্য স্থাপন করিয়া তথায় রাজত্ব করিতেন। রাজা পাণ্ডুদাস নিজ বংশের নামানুসারে উক্ত স্থানের নাম বদলাইয়া পাণ্ডুয়া নামকরণ করিয়াছিলেন। এই স্থান কলিকাতা হইতে ৪২ মাইল দূরে এবং হাওড়া হইতে ইষ্টার্ণ রেলওয়ের পাণ্ডুয়া নামক ষ্টেশনে অনতিদূরে অবস্থিত। অনেকে অনুমান করেন গৌড়ের পাণ্ডুয়ার অনুকরণে এই পাণ্ডুয়ার নামকরণ হইয়াছে।

পাণ্ডুয়া ঐতিহাসিক স্থান এবং ঐতিহাসিক গৌরবের দিক হইতে সপ্তগ্রামের অব্যবহিত পরেই পাণ্ডুয়ার স্থান নিঃসন্দেহে দেওয়া যাইতে পারে।

হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও এইস্থান পরবর্তীকালে মুসলমান শাসকগণ কর্তৃক শাসিত হইয়াছিল বলিয়া হিন্দুদিগের কোন নিদর্শনই বর্তমানে দৃষ্ট হয় না। হিন্দুদিগের মন্দিরগুলিকে রূপান্তরিত করিয়া মসজিদে পরিণত করা হয় এবং হিন্দুদিগের প্রত্যেক দেবদেবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সমস্ত হিন্দুদিগকে এইস্থান হইতে বিতাড়িত করা হয়। ফলে পাণ্ডুয়া হিন্দু রাজার রাজধানী হইলেও হিন্দুদিগের যাবতীয় চিহ্ন এই স্থান হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। [পৃঃ ৮১৭]

ইলছোবা (মৌজা নং ১৪০)।

হুগলী সদর মহকুমায় পাণ্ডুয়া থানার ইলছোবা একটি প্রাচীন গ্রাম। ইলছোবা গ্রামে দাসবংশের দুইটি পঞ্চরত্ন মন্দির দর্শনীয় বস্তু। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মন্দির দুইটি নির্মিত হইয়াছিল। একটি মন্দিরে বিষ্ণু আর অন্যটিতে শিব আছেন। মন্দির নির্মাণের তারিখটি বোধহয় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দির গঠন উড়িষ্যার ভদ্রদেউলের অনুরূপ। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির বহু সুন্দর সুন্দর চিত্র অঙ্কিত আছে।

ইলছোবা বারোয়ারীতলায় ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীর শিবমন্দিরটি স্থাপত্য শিল্পের একটি সুন্দর নিদর্শন। এইরূপ কারুকার্য সাধারণতঃ দেখা যায় না।

এই গ্রামে শ্রীশ্রী৺তারামা একটি জাগ্রত দেবী। দেবীর "সবে শিবা মূর্তি"র সবগুলির দেহই প্রস্তর খোদিত করিয়া প্রস্তুত। উচ্চতা কিঞ্চিৎন্যূন ১॥ হাত। রাজা অশোকের সময়ের কোন বৌদ্ধশিল্পীর দ্বারা খোদিত বলিয়া মনে হয়। দাঁড়া-গো-পান মানত করিলে এখনও পর্যন্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

কলিকাতার শ্রীনাথ দাস মহাশয়ের পূর্ব বাস-ভূমি ছিল এই ইলছোবা গ্রামে। দক্ষিণপাড়ায় বারোয়ারীতলার নিকট তাঁহার পিতৃপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে শিব, নারায়ণ, এবং বাসুদেব এখনও বিরাজিত। মন্দির গাত্রে কারুকার্য পুরাকালের মৃৎশিল্পীর অসীম দক্ষতার পরিচয়। [পৃঃ ৯১৫-৯১৬]

জেলা : হুগলী
থানা : পাণ্ডুয়া

মেলা বিবরণী

ঈদলফেতরের মেলা

সোণাটিকরী গ্রামে প্রতি বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ের ঈদলফেতর উৎসব উপলক্ষে বালা সৈয়দ পীর সাহেবের মাজারের সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা জমিতে তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের দুই-তিনটি ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

বৈঁচি, পাণ্ডুয়া, দশঘরা, ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসিয়া থাকেন। ময়রা ও তেলেভাজা, মনিহারী, বাসন-কোসন, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষি ও কারিগরি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা এবং মাটির খেলনা, পুতুল ইত্যাদি দ্রব্যাদির মোট প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন।

পাণ্ডুয়ার মাঘ মেলা

হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায় ১লা মাঘ এই মেলা বসে। সারা মাঘ মাস ধরিয়া এই মেলা বেশ জমজমাট থাকে। এই মেলাটি প্রধানতঃ মুসলমানদের হইলেও সর্ব সম্প্রদায়ের লোকই এই মেলাতে অংশ গ্রহণ করে। বিশেষ করিয়া আদিবাসীদের এই মেলায় যথেষ্ট ভীড় হয়। পেড়োর মন্দির পাণ্ডুয়ার একটি দর্শনীয় বস্তু। দৈনিক এই মেলায় আগত হাজার হাজার লোক এই উচ্চ পেড়োর মন্দিরে উঠিয়া আনন্দ লাভ করেন। প্রতি বৎসর মেলার উদ্বোধনী দিনে সর্বাপেক্ষা বেশী জনসমাগম হয়।

আনন্দবাজার পত্রিকার জনৈক রসিকপাঠক 'মধুকর' ছদ্মনামে পাণ্ডুয়ায় মেলা দেখিয়া ১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারী হালিসহর হইতে মেলার যে জীবন্ত চিত্র দেখাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধারযোগ্য :

হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের গাড়িতে বসেই দেখা যায়, অদূরে গ্রামের মাঝখানে বিশাল গম্বুজ তার উদ্ধত তর্জনী তুলে রেখেছে আকাশে। ষ্টেশনের গায়ে দেখুন, গাঁয়ের নাম পাণ্ডুয়া। একদা বর্ধিষ্ণু হুগলী জেলার এক গ্রাম। কলকাতা থেকে চল্লিশ মাইলও হবে না। ইলেকট্রিক ট্রেনে দেড় ঘণ্টার বেশী সময় নেবে না। ষ্টেশনের বাইরে এসে রিক্সা পাবেন। কোথায় যাবেন আপনি? কি দেখবেন? বাইশ দরওয়াজা? শাহ সফির মসজিদ? পাণ্ডুয়ার মিনার? তাহলে পায়ে হেঁটে চলে যান। আধ ঘণ্টা সময়ও নেবে না।

সারাটা বৎসর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। ভয়াবহ নির্জনতা একে স্থবির গম্ভীর করে রেখেছে। আর আজ? আজ এখানে লক্ষ লোকের মেলা। মেলার উপলক্ষ্য কেউ জানে না। কেবল মিলতে হয়, মিলতে হবে এই কথাটিই হয়তো মেনে নিয়েছে সবাই তাই বৎসর ঘুরে এলে মাঘের প্রথম দিনেই এসে হাজির হয়েছে সবাই। হোটেল বসেছে। সারে সারে কাঁচের চুড়ির দোকান আগলে বসেছে মুসলমান মেয়েরা। মনিহারী দোকানের পাশেই বটতলার নাটক নভেল। শুধুই কি নাটক? রামায়ণ-মহাভারতের পাশে হজরত বড় পীরের জীবনী। তার গা ঘেঁষে শনির পাঁচালী, লক্ষ্মী মাহাত্ম্য, শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম, সেই সঙ্গে সিনেমার গানের পুস্তিকা। এসেছে শৈলজানন্দ, প্রভাবতী দেবী, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমার। আবার তাদের গা ঘেঁষে সাহিত্যরত্ন অমুক আলীর সেরা উপন্যাস 'জীবন আর চাই না'। তাছাড়া আছে হিন্দী চিত্রতারকাদের সুসজ্জিত ছবি। পাশেই রামকৃষ্ণ সারদা দেবীর ধ্যানমৌন মূর্তি। উত্তর দিকে বসেছে খাট-পালঙ্কের দোকান। মিস্ত্রিদের মরবার সময় নেই এখন। মাটির বাসন, আয়না, কাঁকুই, চুলের ফিতে— না আছে কী? হরেক কিসিমের খদ্দের, হরেক রকমের মাল। ছুরি-কাঁচি-দা-কোদাল আছে সবই। লোহার বেড়ি, কড়াই-খুন্তির দোকান বসেছে গোটা চারেক।

কাঁসা পেতলের দোকান তিনটি। আলাপ হল দোকানীর সঙ্গে। বললে, না মেলা জমলে কী হবে। বিক্রি-বাটা আর নেই। সারাদিনে বিশ টাকাও মেলে না। অথচ দেখুন আট হাত জায়গার ভাড়া চৌদ্দটি টাকা। ধান-চাল ছোলা-মটরের দোকানও আছে। আছে তরিতরকারি, মাছ, দুধের ব্যবস্থা। অবশ্য সকালের দিকেই পাবেন সেসব। রাস্তার পাশে সারকাসের তাঁবু পড়েছে একটাই। এবার সবাই ঝিমিয়ে পড়েছে কেমন।

জায়গার মালিক বোখরের মোল্লা সাহেব। মেলার সময় খাজনা আদায় করেন অবশ্য জায়গীরদার। মেলা চলবে পুরো একটি মাস। তারপর আবার সেই শূন্য-পুরী খাঁ খাঁ করবে। জি, টি, রোডের বুকে ছুটন্ত বাসের জানালায় চোখ রেখে অবাক হবে সে যে কোন দিন এ পথে আসেনি। দেখবে নির্জন, নিঃসঙ্গ মিনারের পাশে বাইশ দরওয়াজা যার পাথরের ভাঙ্গা দরজার খিলান একদা হুগলী পাণ্ডুয়ার সমস্ত ইতিহাস খোদাই করা আছে : প্রায় তেতাল্লিশ গজ উঁচু মিনার। পাঁচতলা বাড়ির সমান। গোলাকৃতি গম্বুজের ব্যাস উপরের দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে গেছে। রাস্তার অপর পার্শ্বে শাহ্ সুফির মসজিদ। এমন বিস্ময়কর প্রত্নতাত্বিক নিদর্শন বাংলাদেশে হয়তো অনেক জায়গাতেই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু এখানে এলে মনে হবে আপনি যেন কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে কোথায় হারিয়ে গেছেন। এ যেন এক মুসলমান যুগের যাদুঘরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন আপনি।......এখানে 'পীরপুকুর' নামে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। মেলার সময় এই পুষ্করিণীতে দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রী ও দর্শক আসিয়া স্নান করিয়া রোগ-মুক্ত হইয়া থাকে। এই পুষ্করিণীতে দুইটি কুমীর আছে, উহারা ফুল-শিরনি গ্রহণ করে।

["হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ", ২য় খণ্ড, শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ৮৮২-৮৮৪]

মনসাপূজার মেলা

ভোঁপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে মনসাদেবীর পূজা উপলক্ষে প্রায় চার বিঘা পরিমাণ জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন এবং মাত্র একদিনই স্থায়ী হয়।

মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ পদব্রজে ও গরুর গাড়ীতে আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, বই-ছবির দোকান, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলো, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির দোকান ও মাটির পুতুল-খেলনার দোকানপাট বসিয়া থাকে। প্রধানতঃ বৈঁচি ও বৈদ্যনাথপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত গ্রাম হইতে মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন। মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কেবলমাত্র কবিগানের আয়োজন করা হয়। গ্রামেই একটি কবিগানের দল আছে।

জেলা : হুগলী
থানা : বলাগড়

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : কৃষ্ণবাটী। ৮।৪৭৮ ১১।৪০০।২,৬০৮
গুপ্তিপাড়া। ৯।১৮০৮৬।১৪৪।৮৪৮

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, নবশাখ, বৈরাগী, গোপ, কৈবর্ত, দুলে, বাগ্দী, বুনা, ভূমিজ, বাউরী, কুর্মি, নমঃশূদ্র, জেলে, মুসলমান ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য, কুটিরশিল্প, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন গুপ্তিপাড়া। ইহা-ভিন্ন পূর্ব রেলপথের ব্যাণ্ডেল স্টেশন হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে সাড়ম্বরে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উৎসব, উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব, প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন। শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা উৎসব। কার্তিক মাসে দেশ কালিকা মাতার পূজা, প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। পৌষ মাসে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন মহোৎসব, ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবনজীউ-র দোলযাত্রা উৎসব, প্রায় দুইশত পঁচাশি বৎসরের প্রাচীন। চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব, প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন এবং ষষ্ঠীতলায় নীলপূজা, প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) স্নানযাত্রার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। মেলাটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রা মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

রামনবমীর মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ-র মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

গ্রাম সম্পর্কে শোনা যায় যে, মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালের শেষার্ধে ভগবান শঙ্করাচার্যের প্রবর্তিত দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সত্যদেব সরস্বতী নামক জনৈক সিদ্ধ মহাত্মা চারিধাম পর্যটন শেষে এই গ্রামে উপস্থিত হন ও গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ধর্মীয় পরিবেশ ও অধিবাসীগণের সারল্যে মুগ্ধ হইয়া এই গ্রামের কৃষ্ণবাটী মৌজায় ভাগীরথী তীরস্থ অরণ্যে আশ্রম স্থাপন করেন।

কিছুকাল পরে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি ভাগীরথী তীরস্থ নদীয়া জেলার অন্তর্গত শান্তিপুর গ্রাম হইতে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ মূর্তি আনিয়া আশ্রমে স্থাপন করিয়া সেবাপূজা করিতে থাকেন। শীঘ্রই চারিদিকে দেবমাহাত্ম্য প্রচারিত হয় এবং দেবতার নামানুসারে গ্রামের নাম "গুপ্তবৃন্দাবন পল্লী"—সংক্ষেপে "গুপ্তপল্লী" হয়। গুপ্তপল্লী অপভ্রংশে বর্তমানে "গুপ্তিপাড়া" হইয়াছে।

অন্য মতে এই গ্রামে যে-সমস্ত জাতির লোকজন বাস করিতেন তাঁহাদের মধ্যে বৈদ্য জাতিই সংখ্যাগরিষ্ঠ ও বর্দ্ধিষ্ণু ছিলেন। তাঁহাদের উপাধি "গুপ্ত"। এই কারণেই গ্রামটির নাম 'গুপ্তপাড়া' হয় এবং ক্রমে 'গুপ্তপাড়া' হইতে গুপ্তিপাড়ায় পরিণত হয়।

শ্রীনৃসিংহ প্রসাদ ভট্টাচার্য, এম. এ, সাহিত্যরত্ন,
সভাপতি, গুপ্তিপাড়া গ্রামোন্নতি বিধায়িনী সমিতি,
"শিশির বাণী মন্দির",
ও
শ্রীএম. দাস, গ্রামসেবক,
গুপ্তিপাড়া, হুগলী।

Guptipara (*Gupti*, concealed and *para*, quarters)—A large village in thana Balagar of the Hooghly subdivision, in the extreme north-east of the district, situated about

1½ miles west of the right bank of the Hooghly. The houses extend along a wide road for about a mile and half, and include some fine modern buildings belonging to the Sen family.

Guptipara was a well-known place in the eighteenth century. "Guptipara" is shown in the map of Stavorinus (circa 1770 A. D.) but on the left bank of the river. This, if correct, indicates an older site ; for in the Bengali poems of the eighteenth century, the village is distinctly mentioned as being on the right bank.

[P. 32]

The village is a mile to the east of Guptipara station which is 22 miles from Bandel.

The chief object of interest is a group of four temples at the eastern end of the village. Ranged round a quadrangle and enclosed within a rather high wall are four shrines known as the temples of Chaitanya Dev, Brindabanchandra, Ramchandra and Krishnachandra, all in the Bengal thatched hut model ; the whole group being often called Brindabon Chandra's *math*. (Compare the Chari Bangla temples of Rani Bhabani in Baranagar, Murshidabad.)

(a) The oldest is that of Chaitanya Dev which faces east and has a door on the west ; there were three cusped arches on the east, but they have been walled up, leaving a small door. Reputed, according to local records, to have been built by Bisweswar Rai in the reign of Akbar, and therefore, apparently in the beginning of the 17th century, its roof is of the Jor-bangla type with two iron rods to represent spires. It contains the images of Chaitanya and Nityananda.

(b) The shrine of Brindabanchandra, the biggest of the four, is a brick temple of the double thatch roof model. The entrance door and the inside of the sanctum are painted with figures of Krishna, Radha, and Gopis, of trees, foliage, etc. In the sanctum are wooden images of Krishna, Radha, Garud, Jagannath and Balaram.

(c) The temple of Ramchandra is made of red-coloured brick and has a curved roof ; over the roof is a towerlike structure, to which access is had by a staircase. The front wall of the verandah, and also, to some extent, of the sanctum, is covered with brick panels finely carved in the best style of Bengali art, with figures of gods and goddesses and scenes from the epics. The temple is said to have been built by Harischandra Rai of Sheoraphuli at the end of the 18th century. It contains painted wooden images of Ramchandra, Lakshman (to the right) and Sita (to the left).

(d) Just opposite the Ramchandra temple, on the other side of the quadrangle, stands the fourth temple of Krishnachandra, with small images of Krishna and Radha, said to have been built by Dandi Madhusudan in the time of Nawab Ali Vardi Khan."

(District Handbooks, 1951, Hooghly by A. Mitra, p. 227)

গুপ্তিপাড়াতে বহু দেবায়তন আছে, তন্মধ্যে "বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির" সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ; ইহা "গুপ্তিপাড়ার মঠ" বলিয়া খ্যাত। সেওড়াফুলির রাজা হরিশ চন্দ্র রায় কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই সুন্দর মন্দিরটি নির্মিত হয়। ইহার কারুকার্য অতি অপূর্ব। লাল ইট দিয়া নির্মিত মন্দির গাত্রে গ্রথিত বহু দেব-দেবীর মূর্তি, রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনের ঘটনাবলী ও তাঁহার জীবনী সংক্রান্ত কয়েকটি দৃশ্য দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে।

গুপ্তিপাড়ার মঠ দশনামী বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মঠ এবং তারকেশ্বরের মোহান্তদের অধীন।

সত্যদেব সরস্বতী শান্তিপুরের এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়ী হইতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রকে আনিয়া গুপ্তিপাড়ার নিকট কৃষ্ণবাটী নামক বিজন অরণ্য মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার শিষ্য রাজা বিশ্বেশ্বর রায় ঠাকুরের জন্য যাবতীয় সম্পত্তি উৎসর্গ করিয়া যান। যে স্থানটিতে শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র বিরাজ করেন—স্বভাব-সৌন্দর্যে সেই স্থানটিকে বৃন্দাবন বলিয়া মনে হয় এবং এজন্য উহা "গুপ্তবৃন্দাবন" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই মন্দিরের ছাদ চালাঘরের ধরনে নির্মিত—সেই চালার উপরে আবার এক ছোট থাক আছে, তদুপরি তিনটি কলসী স্থাপিত। মন্দিরের অত্যুচ চূড়াগুলি গঙ্গার অপর পারে অবস্থিত শান্তিপুর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। পুরাতন মন্দির ভগ্ন হইয়া গেলে বাগবাজার নিবাসী গঙ্গানারায়ণ সরকার ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। শ্রীরাধিকা মূর্তি পরে মোহান্ত রামানন্দ স্বামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়।

রাজা বিশ্বেশ্বর রায় বৃন্দাবনচন্দ্রের সেবার জন্য গুপ্তিপাড়ার দক্ষিণে সোমড়া গ্রাম দেবোত্তর হিসাবে দান করেন।

বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাদেবের রথযাত্রা গুপ্তিপাড়ার অন্যতম প্রধান পর্ব; এইরূপ অত্যুচ্চ রথ বাংলাদেশে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ। একমাত্র পুরী ব্যতীত আর কোন রথ নাকি এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে না। রথযাত্রা উপলক্ষে এই স্থানে এক বৃহৎ মেলা হয়। তখন গুপ্তিপাড়া একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়। রেভারেণ্ড লং 'কলিকাতা রিভিয়ু' পত্রে এই মর্মে লিখিয়াছেন যে, ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে গুপ্তিপাড়ায় রথযাত্রা উপলক্ষে লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয় এবং উক্ত স্থানে মেলা দেখিতে যাইবার সময় একখানি নৌকা উল্টাইয়া যাওয়ায় পঁয়তাল্লিশ জন লোকের জীবননাশ হয়। উল্টোরথের আগের দিন দেবতার ভোগ ঠাকুরকে নিবেদন করিবার পর পুরোহিত মন্দিরের দরজা খুলিয়া দেন এবং জন-সাধারণ সেই প্রসাদ লুট করে। ইহাকে "ভাণ্ডার লুট" বলা হয়।

গুপ্তিপাড়ার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। এইরূপ কারুকার্যখচিত মন্দির বাংলাদেশে খুব অল্পই আছে। দিনাজপুরের কান্তজীউর মন্দির ও বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেব মন্দিরের ন্যায় এই মন্দিরের গড়ন। শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের উত্তরে গঙ্গার দিকে এই মন্দির অবস্থিত এবং মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্মণ ও মহাবীরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ১৮২২ সনে এই মন্দির নির্মিত হয়। রামচন্দ্রের মন্দির গাত্রে পোড়ামাটির অপূর্ব কারুকার্য আছে।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দিরের দক্ষিণদিকে আর একটি জোড়া মন্দির আছে। ইহা 'জোড়বাংলা' বলিয়া কথিত। ইহার মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। সমগ্র ভারতে একমাত্র গুপ্তিপাড়া ব্যতীত দণ্ডীস্বামীদিগের সেবায় মহাপ্রভুর পূজা আর কোথাও হয় না। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্মিত হয়। ইহা বর্তমানে ভগ্ন ও পরিত্যক্ত।

এতদ্ব্যতীত সেন-পরিবারের জোড়াশিব-মন্দিরও গুপ্তিপাড়ার দেবালয়গুলির মধ্যে অন্যতম। এই মন্দির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছে। রামধন সেন ইহার নির্মাতা।

সম্প্রতি শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে এই স্থানে "শ্রীকৃষ্ণানন্দ হরিমন্দির" নির্মিত হইয়াছে। ১৩৫৭ সালের ৫ই মাঘ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা হয়।

["হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ২য় খণ্ড, শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ৯৪৫-৯৪৭]

২। গ্রাম : বাকুলিয়া। ২৬।২৯৪'৫৭।১৪৮।৭৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা, সদ্গোপ, কুমার, দুলে ও সাঁওতাল। গ্রামে দুলেপাড়া ও সাঁওতালপাড়া প্রভৃতি কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কালনা। কালনা-পাণ্ডুয়া রোডে গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) পৌষকালী পূজা। প্রতি বৎসর পৌষ মাসের ৮ই হইতে ১৫ই তারিখের মধ্যে যে-কোন দিন পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। কালীদেবী গ্রামের সর্বসাধারণের। মানত হিসাবে সাধারণতঃ চিনি, সন্দেশ ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজারী—ব্রাহ্মণ। পূজাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির এবং পঞ্চানন্দ ও শিব আছে।

শ্রীগৌর দাস মুখোপাধ্যায়,
ও
শ্রীনির্মল কুমার মুখোপাধ্যায়, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ বাকুলিয়া, হুগলী।

৩। গ্রাম : আলিসাগড়িয়া। ২৯।১৪৭·২৩।২৭।১৬৬

(ক) বাগ্দী, নাপিত, বাউরী ও মাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোমড়া বাজার।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় ওলেশ্বরী দেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ওলেশ্বরীপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ওলেশ্বরী দেবীর একটি পাকা মন্দির ব্যতীত গ্রামে পঞ্চানন্দ, বাবাঠাকুর ও মনসা আছে।

শ্রীরাখাল চন্দ্র সাঁতরা, কৃষিজীবি,
গ্রামঃ আলিসাগড়িয়া,
পোঃ বাকুলিয়া, হুগলী।

৪। গ্রাম : তিলডাঙ্গা। ৩৩।২৯৫·৬৭।৯২।৫০৩

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কামার, মুচি, যুগী, বাগ্দী, ডোম, বাগাল, ভূমিজ ও মাল। গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোমড়া বাজার। কালনা-পাণ্ডুয়া রাস্তা হইতে জি, টি, রোড ধরিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে এই গ্রামে পৌছান যায়। এই রাস্তা দিয়া মোটরে যাতায়াত করাও চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ধর্মরাজ ঠাকুরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) ধর্মরাজপূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) ধর্মরাজ পূজার জন্য একটি মাটির দেবালয় ব্যতীত গ্রামে পঞ্চানন্দ,বাবাঠাকুর, শীতলা, মনসা, প্রভৃতি আছেন।

শ্রীশম্ভুপদ পণ্ডিত,
গ্রামঃ তিলডাঙ্গা,
পোঃ দিগড়া, হুগলী।

৫। গ্রাম : মাটাগড়ি। ৩৪।৫০৩·২১।১৭৪।৯৭৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মালাকার, সদ্‌গোপ, নমঃশূদ্র বাগ্দী, যুগী, কুমার ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, ব্যবসায় ও দিনমজুরী।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোমড়া বাজার। কালনা-কাটোয়া রোড হইতে জেলাবোর্ডের সোমড়া-দিগড়া রাস্তা ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ সংক্রান্তিতে নোয়াজন ঠাকুরের পূজা ও উৎসব। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) নোয়াজন ঠাকুর পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা এবং নোয়াজন ঠাকুরের নির্দিষ্ট স্থান আছে। এইস্থানে রক্ষিত একটি শিলা-মূর্তিকে নোয়াজন ঠাকুর রূপে পূজা করা হয়।

শ্রীশচীন্দ্র নাথ বিশ্বাস,
গ্রামঃ সুখড়িয়া, হুগলী।

৬। গ্রাম : দেবীপুর। ৪২।১৭৯'৪৫।২।১।৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, নায়েক ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন সোমড়াবাজার। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ সংক্রান্তিতে বিষহরির (মনসা) ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু কালের প্রাচীন।

(ঙ) বিষহরি পূজার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিষহরির নির্দিষ্ট স্থানে কতকগুলি ছোট ছোট মাটির ঘোড়া দেখিতে পাওয়া যায়।

এই গ্রামের বিষহরি দেবী বিশেষ জাগ্রত বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সম্ভবতঃ এই কারণে গ্রামটির নাম দেবীপুর হইয়াছে।

শ্রীভরত রায়চৌধুরী, চাকুরী,
পোঃ সোমড়া,
শ্রীবগলা কুমার চট্টোপাধ্যায়,
গ্রামঃ খামারগাছি, পোঃ সিজা,
হুগলী।

৭। গ্রাম : জাগুলিয়া। ৫৮।৬৯৬'০৬।১৪২।৭২৪

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, ভূমিজ, ভুঁইয়া, দুলে, মুসলমান ও সাঁওতাল।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, মাহিষ্যপাড়া ও মুসলমান-পাড়া নামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) সোমড়া বাজার অথবা পাণ্ডুয়া রেলস্টেশনে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রাম হইতে প্রায় আড়াই মাইল দূরে কালনা-পাণ্ডুয়া রোডের উপর অবস্থিত পোতাগাছি হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় জাগেশ্বরী দেবীর পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) জাগেশ্বরী দেবীর পূজার মেলা। বৈশাখ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জাগেশ্বরী দেবীর মন্দির ব্যতীত একটি শিব, একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা ও একটি মনসার শিলামূর্তি আছে।

শ্রীনিরাপদ চক্রবর্তী,
শ্রীপঞ্চানন্দ চক্রবর্তী,
ও
শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী,
গ্রামঃ জাগুলিয়া,
পোঃ এক্তারপুর, হুগলী।

৮। গ্রাম : এক্তারপুর। ৭০।৬০০'২৭।২৪৮।১,২২৩

(ক) হিন্দু।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে সোমড়া বাজার রেলস্টেশন এবং প্রায় আড়াই মাইল দূরে মোটরবাস ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন; তবে মাঝে কয়েক বৎসর উৎসবটি বন্ধ ছিল। সেবাইত শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিন ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে একটি শিবমন্দিরে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি বাবা-ঠাকুর, একটি শীতলা, দুইটি মনসা এবং একটি কালী ও একটি ষষ্ঠীতলা আছে।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সিংহরায়,
সহ-সভাপতি,
এক্তারপুর ইউনিয়ন বোর্ড,
হুগলী।

৯। গ্রাম : বৃন্দাবনপুর (মৌজা : কামারপাড়া)। ৭৩।৪৫৬৯৯।২৫০।১,০১৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, কামার, তাঁতী, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, নমঃশূদ্র, দুলে, মুসলমান ও সাঁওতাল।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—কামারপাড়া, তাঁতীপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, দুলেপাড়া, সাঁওতালপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও জাত ব্যবসায়।

(গ) খন্যান অথবা পাণ্ডুয়া রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। কালনা-পাণ্ডুয়া রাস্তা হইতে গজিনা-দাসপুর হইয়া গ্রামে পৌছান যায়। উক্ত রাস্তায় মোটর চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর দোল অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুনমাসে পাঁচদিন ব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত পাঁচ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা ও বিশালাক্ষী ঠাকুর আছে।

শ্রীদাশরথি সরকার,
গ্রাম: কামারপাড়া,
পোঃ গজিনা দাসপুর,
হুগলী।

১০। গ্রাম : বাসনা। ৮৩।৬৯৫৮৩।১৮১।৮৯৫

(ক) হিন্দু।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খামারগাছি। গুপ্তিপাড়া ত্রিবেণী মেটে পথ দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে একদিন। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে জগন্নাথদেবের দারুময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটির চারিদিকের বারান্দা টিনের চালার দ্বারা আচ্ছাদিত। ইহাভিন্ন, রাধাকান্ত আশ্রম নামে একটি আশ্রম এবং শীতলা, মনসা ও পঞ্চানন্দের স্থান আছে।

শ্রীদেবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,
গ্রামঃ বাসনা, হুগলী।

১১। গ্রাম : মুণ্ডুখোলা। ৯৮।৩৭৭০২।৮৩।৪৯২

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, গোয়ালা, দুলে, সাঁওতাল ও মুসলমান। জাঙ্গলপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও কৃষিমজুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে জীরাট ও প্রায় দেড়মাইল দূরে বলাগড় রেলস্টেশন। গ্রামের নিকটবর্তী জেলা বোর্ডের রাস্তা দিয়া চাঁদরা হইতে বলাগড় পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে ধর্মরাজঠাকুরের পূজা, ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসার ঝাঁপান উৎসব, মাঘী শুক্লা প্রতিপদ হইতে তৃতীয়া তিথি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী "ধর্মরাজের জাত" এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে ধর্মরাজের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত সবগুলি উৎসবই প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) "ধর্মরাজের জাত" উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে গোলাকৃতি ধর্মরাজ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, মনসা ও শীতলার স্থান আছে।

শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, কৃষিজীবি,
ও
শ্রীপঞ্চানন বোধক, কৃষিজীবি,
গ্রামঃ মুণ্ডুখোলা, পোঃ পাটুলীগ্রাম,
হুগলী।

১২। গ্রাম ঃ শ্রীপুর। ১০১।৬৭১'৬৪।৬৯৮।৩,৫৪০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, তিলি, কামার, কুমার, তেলী, ধোপা, নাপিত, স্বর্ণকার, হাড়ী, মুচি, ডোম, ছুতার, জেলে, মালো, তিয়র, গোয়ালা, বাউরী, বুনো, দুলে, বৈরাগী, নমঃশূদ্র, পাটনী ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতি ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন বলাগড় হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর উৎসব, রটন্তী কালীপূজা ও গন্ধেশ্বরী পূজা। জ্যৈষ্ঠ মাসে গঙ্গাপূজা, স্নানযাত্রা, ফলহারিণী উৎসব। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা। শ্রাবণ মাসে ব্রহ্মাপূজা ও ঝুলনযাত্রা। ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী ও বিশ্বকর্মাপূজা। আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা। কার্তিক মাসে কালীপূজা। অগ্রহায়ণ মাসে রাসযাত্রা। পৌষ মাসে বাস্তুপূজা। মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা। ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, অষ্টমপ্রহর হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব এবং শিবরাত্রি। চৈত্র মাসে বুড়াশিবের গাজন। উল্লিখিত উৎসবগুলি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। দুর্গাপূজা এবং সরস্বতীপূজা গ্রামে সর্বজনীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে পনরদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে দুইটি বাবাঠাকুর, একটি মনসা, একটি শীতলা এবং সিদ্ধেশ্বরী কালী, রাধাগোপীনাথ ও বুড়া শিব আছে।

গ্রামে মুস্তৌফী মহাশয়দের কুলদেবতা গোবিন্দ-জীউর মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ, শিব, চণ্ডী ও শালগ্রাম শীলা প্রতিষ্ঠিত আছে। তাঁহাদের দুর্গামণ্ডপের দেওয়ালে নানা দেবদেবীর মূর্তি, কাঠের থামগুলিতে সুন্দর কারুকার্য ও দেবদেবীর মূর্তি এবং বড় বড় কড়িকাঠে মনুষ্য আকৃতি নানা ভঙ্গিমায় খোদিত আছে। পূর্বে এই মণ্ডপের চাল উলুখড়ের তৈয়ারী ছিল ও মণ্ডপ অভ্যন্তরে বেতের কারুশিল্প কার্যের দ্বারা শোভামণ্ডিত ছিল। উহা নষ্ট হইয়া গেলে বর্তমানে মুস্তৌফী বংশধরগণ টীনের ছাউনী দিয়া মণ্ডপটি রক্ষা করিয়া-ছেন। ইহার সম্মুখভাগে পাকা চাঁদনী আছে এবং তাহার বড় বড় কড়ি কাঠের মুখে রাক্ষসমূর্তি ক্ষোদিত আছে। চাঁদনী সন্নিকটে পাকা হোমঘর, যজ্ঞকুণ্ড এবং অনতিদূরে বোধন দালানবাটী। গোবিন্দ জীউ মন্দিরের সম্মুখে রাসমঞ্চ, দোলমঞ্চ ও নহবৎখানা অবস্থিত।

গোবিন্দজীউর মন্দিরে পূজিত রাধাকৃষ্ণ মূর্তিদ্বয় প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে স্থানীয় জমিদার রঘুনন্দন মুস্তৌফী মহাশয় প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায় তিনি ঐ মূর্তি স্থানীয় জেলেদের নিকট পাইয়া ছিলেন।

গ্রামে বুড়া শিবের মন্দিরটি রঘুনন্দন মহাশয় স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে যে স্থানে শ্রীপুর গ্রামটি অবস্থিত পূর্বে এই স্থানটিকে লোকে 'আঁটি শেওড়া' বলিত এবং তৎকালে এই স্থানে কোন লোকবসতি ছিল না। যতদূর জানা যায়, স্বর্গীয় রঘুনন্দন মিত্র মুস্তৌফী মহাশয় সর্ব প্রথম এই স্থানে গ্রামের পত্তন করেন এবং ধীরে ধীরে লোকবসতি গড়িয়া উঠে। এই সময় গ্রামটি 'শ্রীপুর' নামে অভিহিত হয়। এই মুস্তৌফী পরিবার নদীয়া জেলায় উলা গ্রামে বসবাস করিতেন। স্বর্গীয় রামেশ্বর মিত্র মুস্তৌফী বাংলার শাসনকর্তা শায়েস্তা খাঁর শাসনকালে ঢাকায় রাজকার্যে প্রবেশ করেন। রামেশ্বর সংস্কৃত, পারসী ও আরবী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিশালী ছিলেন। প্রতিভাবলে মুস্তৌফী দপ্তরের তিনি সর্বেসর্বা হইয়া উঠেন। যদুনাথ সরকার মহাশয়ের "The Moghul Administration" গ্রন্থের ৩২ পৃষ্ঠায় এবং লোকনাথ ঘোষের "The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas and Zeminders," Pt. II, গ্রন্থের ৩৬৪ পৃষ্ঠায় এই মুস্তৌফী বংশের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

১৭০০ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ ঔরঙ্গজিব কর্তৃক দেওয়ান নিযুক্ত হইয়া ঢাকায় আগমন করিলে রামেশ্বর তাঁহার অধীনে পূর্বপদে কার্য করিতে থাকেন। বঙ্গের তৎকালীন শাসনকর্তা শাহজাদা

আজিম-উস্-শানের সহিত দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁর বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে থাকায় আজিম-উস্-শানের নিকটে থাকা উচিত নহে বিবেচনা করিয়া মুর্শিদকুলী খাঁ ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ানী দপ্তর মুর্শিদাবাদে উঠাইয়া লইয়া আসেন। এই সময় তিনি হিসাব-নিকাশসহ বিশ্বস্ত কর্মচারী রামেশ্বর মহাশয়কে দিল্লী প্রেরণ করেন। দিল্লী পৌঁছিয়া সন্তোষজনকরূপে হিসাব নিকাশ বুঝাইয়া দিলে, বাদশাহ ঔরঙ্গজেব রামেশ্বরের কার্য দক্ষতা এবং আরবী ও পার্সী ভাষায় অগাধ জ্ঞান দেখিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে "মুস্তৌফী" উপাধি, মূল্যবান খেলাৎ ও বঙ্গের নানাস্থানের জায়গীর প্রদান করেন। রামেশ্বর কায়স্থ কুলোদ্ভব কাশীদাস মিত্রের অন্যতম বংশধর ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনন্দনও সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় বিশেষভাবে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। ইহাভিন্ন রঘুনন্দন একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। রামেশ্বরের মৃত্যুর পর রঘুনন্দন গণনাদ্বারা তাঁহার বংশধরদিগের সুখ সমৃদ্ধস্থান অবগত হইয়া ১৬৩০ শকাব্দে (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে, সন ১১১৪ সালে) স্ত্রী পুত্রাদিসহ উলাগ্রাম ত্যাগ করিয়া হুগলী জেলার শ্রীপুর গ্রামে গঙ্গাতীরে বসবাস স্থাপন করেন এবং পরে ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময় বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব রায়ের নিকট হইতে পঁচাত্তর বিঘা মহাত্রাণ ভূমি গ্রহণ করিয়া উলা গ্রামের বাসভবনের অনুকরণে এইস্থানে গড়বেষ্টিত অট্টালিকা, দীঘিকা, চণ্ডীমণ্ডপ এবং দেবালয়াদি নির্মাণ করেন। রঘুনন্দনের উলা ত্যাগেরও একটী কারণ আছে। জানা যায়, উলা হইতে গঙ্গা সরিয়া যাওয়ায় গঙ্গা বিবর্জিত দেশে বাস করিতে তাঁহার মন চাহিত না। দ্বিতীয়তঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত রঘুনন্দনের বিশেষ সদ্ভাব ছিল না, সেই কারণে তিনি নদীয়া জেলার উক্ত গ্রাম ত্যাগ করিয়া বর্তমান শ্রীপুর গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করেন।

শ্রীপুর গ্রাম এক সময় বিশেষ সমৃদ্ধশালী ছিল। এই গ্রামের তিলি সম্প্রদায়ের লোকেরা এক-সময়ে কাষ্ঠ ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থশালী হইয়া উঠেন। তাহাছাড়া এককালে এখানে চিনিশিল্পের এক বিশেষ কেন্দ্র ছিল। স্থানীয় মোদক সম্প্রদায়ের লোকেরাই এই শিল্পের বিশেষ পৃষ্টপোষক ছিলেন বলিয়া প্রকাশ।

কথিত আছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দাক্ষিণাত্যে যাইবার কালে এই স্থানে (তৎকালে শ্রীপুর গ্রাম সৃষ্ট হয় নাই) একটি বৃক্ষের নীচে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই কারণে অনেকে এই স্থানটিকে 'আঁটি শেওড়ার পাঠ' বলিয়া থাকেন। আরও প্রবাদ আছে যে, সূতিকাগারের ধোঁয়ায় স্থানটি অপবিত্র হইতে পারে, এই কারণে যেস্থানে মহাপ্রভু বিশ্রাম করিয়াছিলেন সেই স্থান সন্নিকটস্থ গৃহস্থদের প্রসূতি প্রসব নিষেধ ছিল। আজিও স্থানীয় গ্রামবাসী সেই নিষেধ পালন করিয়া চলিয়াছেন।

শ্রীভবনাথ মিত্র মুস্তৌফী,

ও

শ্রীরাখাল দাস সরকার, গ্রামসেবক,

শ্রীপুর বাজার, হুগলী।

শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" গ্রন্থের ২য় খণ্ডে শ্রীপুর গ্রাম সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিবরণী পাওয়া যায়:

শ্রীপুর হুগলী জেলার বলাগড় থানার অন্তর্গত ভাগীরথীতীরস্থ একটি প্রসিদ্ধ গণ্ড গ্রাম; প্রাচীনকালে ইহা "আঁটিশেওড়া" নামে খ্যাত।

শ্রীপুরে গোবিন্দজীউর মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দিরটি একটু বিশিষ্ট এবং সম্মুখে দুর্গা দালানের ন্যায় প্রশস্ত চাতাল আছে। বর্তমান মন্দির ১৭১৯ শকাব্দে নিধিরাম মুস্তৌফী নির্মাণ করিয়া দেন। কৃষ্ণ প্রস্তর নির্মিত গোবিন্দজীউর ও অষ্টধাতু নির্মিত শ্রীরাধিকার বিগ্রহ মন্দির মধ্যে বিদ্যমান আছে এবং রঘুনন্দন ইহা প্রতিষ্ঠা করেন বলিয়া, বিগ্রহের পাদদেশে 'মিত্র দাসস্য' এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। এই অঞ্চলে গোবিন্দজীউ অতীব জাগ্রত দেবতা বলিয়া প্রখ্যাত। স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী ও দোল উপলক্ষে গোবিন্দজীউর মন্দিরে বহু

জনসমাগম অদ্যাপিও হইয়া থাকে। কিংবদন্তী এইরূপ যে, বর্গীর আক্রমণকালে গোবিন্দজীউকে গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া দেওয়া হয়; পরে তিনি ধীবরের জালে উঠিয়াছিলেন বলিয়া, প্রতি বৎসর গোষ্ঠযাত্রার দিন গোবিন্দজীউ গ্রাম প্রদক্ষিণকালে জেলেপাড়ার মধ্য দিয়া গমন করেন।

গোবিন্দজীউর মন্দিরের নিকট একটি সুন্দর দোলমঞ্চ আছে; ইহা রুদ্ররাম মুস্তৌফীর সহধর্মিণী ১৬৬৮ শকাব্দে নির্মাণ করিয়া দেন।

দোলমঞ্চের উত্তরে ইষ্টক নির্মিত বারোয়ারী গৃহ ও তাহার নিকটে একটি শিবমন্দির আছে। শ্রীপুরের বারোয়ারী বা সর্বজনীন পূজা বঙ্গদেশের প্রাচীনতম বারোয়ারীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া খ্যাত।

অদ্যাপি শ্রীপুরের বারোয়ারী গৃহে মহা-সমারোহে গ্রামবাসীগণ কর্তৃক রাস-পূর্ণিমা হইতে তিন দিবস কার্তিক গণেশসহ জগদ্ধাত্রী মূর্তি গড়িয়া পূজা করিয়া থাকেন।

গ্রামের মধ্যে কারুকার্য খচিত দক্ষিণদুয়ারী পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট দুইটি ভগ্ন শিবমন্দির বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে শ্রীপুর বনজঙ্গলে পূর্ণ একটি সামান্য স্থান হইলেও এক সময় ইহা সুসমৃদ্ধ পল্লী বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুস্তৌফীদিগের গৌরবে এই গ্রাম পূর্বে গৌরবান্বিত ছিল। [পৃঃ ২৭২—২৭৫]

১৩। গ্রাম : হাট গোবিন্দগঞ্জ (মৌজা : শ্রীপুর)। ১০১।৬৭১'৬৪।৬৯৮।৭,৫৪০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্‌গোপ, গোয়ালা, তিলি, তামিলি, মুচি, হাড়ী, চণ্ডাল, মেথর ও সাঁওতাল।

গ্রামে অনেকগুলি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, গোয়ালাপাড়া, জেলেপাড়া, মোদকপাড়া, ছুতারপাড়া, মুচিপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-কাটোয়া রেলপথে অবস্থিত বলাগড় রেলস্টেশনটি গ্রামের নিকটবর্তী। জেলাবোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। নিয়মিত কোন মোটরবাস চলাচলের ব্যবস্থা নাই। তবে বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সকল ঋতুতেই মোটর যাতায়াত করিতে পারে। নিকটবর্তী নদী দিয়া নৌকা ও মোটরলঞ্চ চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর শ্রাবণ পূর্ণিমায় ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলা ১২৬৬ সনে সর্বপ্রথম উৎসবটি আরম্ভ হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে ব্রহ্মার পাকা মন্দির আছে।

প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্বে গঙ্গাবক্ষে জেলেদের জালে শ্রীকৃষ্ণের একটি সুন্দর প্রস্তর মূর্তি উঠে। জেলেরা ঐ মূর্তিটিকে গঙ্গার তীরসংলগ্ন এই পল্লীতে রাখিয়া নিকটবর্তী শ্রীপুর গ্রামে জমিদার রঘুনন্দন মুস্তৌফী মহাশয়ের নিকট সংবাদ প্রেরণ করেন এবং পরে জমিদার মহাশয় স্বগ্রামে মন্দির নির্মাণ করিয়া উক্ত রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

গঙ্গা বক্ষ হইতে তুলিয়া জেলেরা ঐ মূর্তিটিকে কিছুক্ষণের জন্য এই পল্লীতে রাখিয়াছিল বলিয়া জমিদার মহাশয় এই পল্লীর নাম "গোবিন্দগঞ্জ" রাখেন। ইহার পর অর্থাৎ একশত বৎসরের কিছু বেশী হইবে তদীয় উত্তরাধিকারী পরবর্তী জমিদারগণ এই পল্লীর কেন্দ্রস্থলে একটি "বাজার" প্রবর্তন করেন। তখন হইতে এই গ্রামটি "হাট গোবিন্দ গঞ্জ" নামে পরিচিত হয়।

শ্রীলোহানান মোদক, ব্যবসায়ী,
পোঃ শ্রীপুর, হুগলী।

১৪। গ্রাম : সিজা। ১১৮।১৪২'৫৫।২০০।৯৩৩

(ক) হিন্দু।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পূর্ব-ভারতীয় রেলপথে অবস্থিত খামারগাছি স্টেশনটি এই গ্রামের নিকটবর্তী। জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি আনুমানিক ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন এবং এই উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বহু লোকজনের সমাগম হয়। পূজারী ব্রাহ্মণ, উপাধি—মুখোপাধ্যায়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা উপলক্ষে দুইদিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীতারক নাথ নন্দী,
গ্রামঃ সিজা, পোঃ খামারগাছি,
হুগলী।

১৫। গ্রাম ঃ দক্ষিণ গোপালপুর।

১২৮।১,২৮০'৬৫।৪১৫।২,২০৮

(ক) ব্রাহ্মণ, গোয়ালা ও কুমার।
গ্রামে এগারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিত্যানন্দপুর হল্ট স্টেশন হইতে জেলা-বোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। রামনগর হইতে নৌকাযোগেও গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে নয়দিন-ব্যাপী। মেলাটি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবত বসিতেছে।

(চ) ×

শ্রীশিবনারায়ণ হালদার, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ দক্ষিণ গোপালপুর, হুগলী।

বলাগড়—ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে ১৬ মাইল দূর। ইহাও একটি প্রাচীন স্থান। এখানে পঞ্চমুণ্ডী আসন সংযুক্ত এক চণ্ডীমন্দির আছে। উহা বলয়োপ-পীঠ নামে প্রসিদ্ধ। বলাগড়ের রাধাগোবিন্দ মন্দির একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। এখানকার চণ্ডীমন্দিরের প্রাচীর গায়ে ইষ্টকের উপর অতি সুন্দর কারুকার্য আছে। নিত্যানন্দের দুহিতা ৺গঙ্গাগোস্বামিনীর বংশধরগণ এই স্থানে বাস করেন বলিয়া ইহা বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীপাট বলিয়া সম্মানিত। বাংলার বরেণ্যে সন্তান পরলোকগত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৈতৃক নিবাস ছিল বলাগড়ে।

(বাংলায় ভ্রমণ, ২য় খণ্ড পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ কর্তৃক ১৯৪০ সনে প্রকাশিত, পৃঃ ৯৮।)

Balagar P. S.—Balagar and Guptipara are reached by two road routes. One takes off from Magra at miles 33 of the G. T. Road, goes east *via* Tribeni and up north about 11 miles to Balagar, and a further eight miles north beyond Balagar to Guptipara 22 and 30 miles respectively from Hooghly. Alternatively, and the better route, is to arrive at Pandua, miles 42 from Howrah on the G. T. Road, and then turn east, drive for 9 miles to Inchhura on a straight road. There is a fork at Inchhura, one on the left (north-west) going to Ambika Kalna, the other on the right (south-east) goes to Somra ($3\frac{1}{2}$ miles from Inchhura). From Somra Balagar is two miles south along the Ganges, while Guptipara is 5 miles to the north. There is a shorter cut to Guptipara from Inchhura on a direct road (5 miles). Both Balagar and Guptipara are on the Bandel Barharwa Loop line connected by convenient trains with Howrah.

Balagar (J. L. 105)—Jeerut station, which is nearer to Balagar village than Balagar station is 14 miles by train from Bandel. Balagar is less than a mile from Jeerut Station.

(a) The temple of Radhagovinda is worth visiting.

(b) The brick temple of Chandi in the Bengal thatched hut model, in the walls of which are brick panels each measuring 2

feet by 1 foot, and finely carved with flowers and human figures. The pillars and beams of jackwood are also carved with figures and tracery. It has a seat of meditation on five human skulls and is called Balayopapith."

(District Handbooks, 1951, Hooghly by A. Mitra, p. 226—227)

শ্রীসুধীর কুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ২য় খণ্ড, গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত গ্রামগুলির বিবরণ উদ্ধৃত করা হইল :—

বলাগড় (মৌজা নং ১০৫) – বলাগড় এই থানার অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ; কলিকাতা হইতে ৪১ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই স্থানের রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ; এতদ্ব্যতীত একটি চণ্ডীর মন্দির আছে। এই মন্দিরের ইষ্টকগুলি দুই ফুট লম্বা এবং এক ফুট চওড়া, সম্ভবতঃ ভগ্ন কোন প্রাচীন মন্দিরের মালমশলা লইয়া ইহা নির্মিত হইয়াছিল কাঠের 'পিলারে' বহু কারুকার্যও দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চমুণ্ডী আসনযুক্ত এই চণ্ডী মন্দির বলয়োপপীঠ নামে প্রসিদ্ধ।

সোমড়া (মৌজা নং ৩৭)।

বলাগড় থানার অন্তর্গত সোমড়া খুব বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। এখানকার 'রাধাগোবিন্দের' মন্দিরে প্রতিদিন দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণ এবং ৫০ জন ভিক্ষুককে নিয়মিতভাবে খাইতে দেওয়া হয়।

সোমড়ার আনন্দ ভৈরবাণী মন্দির বাঙ্গলাদেশে প্রাচীন শিল্পকলার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। এই মন্দিরের গঠন পদ্ধতি নাগারার ভাস্কর্যের অনুকরণে নির্মিত। মন্দিরের স্তম্ভগুলি হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যের নিদর্শন স্বরূপ। কালী, বেণুগোপাল, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতির মূর্তি টেরাকোটায় অঙ্কিত আছে। এই মূর্তিগুলির ভঙ্গিমা অজন্তা ও বাগের মূর্তিগুলির সমগোত্রীয় বলিয়া কথিত।

এই গ্রামের দেওয়ান রামশঙ্কর রায় ও রায় রায়ন রাজা রামচন্দ্র সেন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন।

রাজা রামচন্দ্রের প্রাসাদ বর্তমানে ভগ্ন হইয়াছে। এখনও তাঁহার বংশধরগণ গ্রামে মহা-সমারোহের সহিত দুর্গাপূজা করেন। এই বংশের দুর্গাপ্রতিমার বৈশিষ্ট্য যে দেবীর দশভুজা মূর্তির তিনটি হাত কেবল সামনে থাকে, বাকি সাতটি হাত পিছনে অদৃশ্য থাকে। এইরূপ ত্রিভুজা সিংহবাহিনী মূর্তি হুগলী জেলার আর কোথাও দেখা যায় না।

এই গ্রামে রামশঙ্কর রায়ের ভবনও এক সময় দ্রষ্টব্য ভবন বলিয়া পরিগণিত হইত। তাঁহার গড়খাদ বেষ্টিত বিরাট অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ এখনও বর্তমান আছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একাধিক মন্দিরের চিহ্ন এখনও বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে পঞ্চরত্ন ও নবরত্ন মন্দির দুইটি উল্লেখযোগ্য। নবরত্ন মন্দিরে জগদ্ধাত্রী মূর্তি আছে। ১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে নবরত্ন মন্দির প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে।

পঞ্চরত্ন মন্দিরটি ১১৭২ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা বঙ্গের আদি শ্রীশ্রীমহাবিদ্যা নামে খ্যাত। মন্দিরের ছাদ পিরামিডের ন্যায় দেখা যায়। এইরূপ মন্দির বাঙ্গালার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

সোমড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়গণও প্রাচীন বংশ। ইহাদের গৃহদেবতা জগদ্ধাত্রীর নিত্যপূজা হয়। কিন্তু পিতলের মূর্তি রামশঙ্কর রায় প্রতিষ্ঠিত ত্রিভুজা সিংহবাহিনী মূর্তির অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল।

সোমড়া গাঁয়ের অভিনব মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯শে আশ্বিন, ১৯৬৭ তারিখে প্রকাশিত নিম্নোক্ত বিবরণী উদ্ধৃত করা হইল :—

"সোমড়া ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরে হুগলী জেলার একটা গাঁ। বর্তমানে পূর্ব রেলপথের হাওড়া-ধুলিয়ান শাখার একটা রেলস্টেশন। স্টেশনে নেমে আপনি সোজা চলে যাবেন পাকা রাস্তা ধরে একেবারে গাঁয়ের ভেতর ; খানিক দূর যাবার

পর হঠাৎ রুদ্ধ হবে আপনার গতি। চোখে পড়বে একটা বিরাট প্রাসাদতুল্য পাকাবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ। যদি ঢুকতে যান ভাঙ্গা বাড়ীর ভেতরে চোখে পড়বে মর্মর ফলকের একটা লেখা: এখানে বাস করতেন রায় রায়ান রাজা রামচন্দ্র দেওয়ান বাংলা-বিহার।

ইংরাজীতে লেখা এই স্মৃতিফলক। এই শ্বেত পাথরের লেখাটি ও ইঁটের তৈরী বাড়ীর ভাঙ্গা পাঁজরগুলো স্মরণ করিয়ে দেয় বাংলা-বিহারের দেওয়ান রাজা রামচন্দ্র রায় মহাশয়ের গৌরবময় অতীতের কথা। সাক্ষী হিসাবে বর্তমান রয়েছে ভগ্ন চণ্ডীমণ্ডপ ও ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ইঁটগুলো।

গাঁয়ের ভেতরে কাঁটা ও বনজঙ্গলে ঢাকা ভাঙাচোরা অনেকগুলো ইঁটের তৈরী মন্দির রয়েছে। তন্মধ্যে যেটা ভালো ও অভিনব বলে বোধ হয় তা হচ্ছে ষোলচালা বিশিষ্ট জগদ্ধাত্রী দেবীর ও অষ্ট-কোণাকৃতি আটচালার মন্দিরটি। পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের মন্দিরগুলোর বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। তথাপি ষোলচালা ও আটচালার মন্দিরদ্বয় বাংলার স্থাপত্য শিল্পের ইতিহাসে একটা বিশেষ স্থানের দাবি রাখে। পশ্চিম বাংলার আটচালা, বারচালা ও ষোলচালার মন্দির চারচালার মতন সচরাচর বেশী চোখে পড়ে না। আবার যা পাওয়া যায় তাও জরাজীর্ণ অবস্থায়। মন্দিরটি বঙ্গের আদি শ্রীশ্রীমহাবিদ্যা নামে খ্যাত শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী দেবীর মন্দির, দেওয়ান রায় রামশঙ্কর কর্তৃক ১১৭২ বঙ্গাব্দে স্থাপিত। মন্দিরের গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ আয়তক্ষেত্র বিশিষ্ট। গর্ভগৃহের চাল ক্রমহ্রস্বমান আকৃতিতে ধাপে ধাপে উপরের দিকে উঠে গেছে। কিন্তু এর অন্যতম আকর্ষণীয় হলো মন্দিরের পিরামিডাকৃতি ছাদ। দক্ষিণ-ভারতের পল্লব মন্দির-স্থাপত্যের সঙ্গে এর তুলনা করা যেতে পারে।

দূর থেকে দেখতে অনেকটা উল্টানো নৌকার তলার মতো। যদিও এটির মধ্যে দক্ষিণ ভারতীয় দ্রাবিড় মন্দির স্থাপত্য রীতির ছাপ পড়েছে তবুও উড়িষ্যার পীরা ভদ্র দেউলের প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেনি বাঙ্গালী শিল্পী। উড়িষ্যার ভদ্র-দেউলের গম্ভীর উপরিভাগকে এক কথায় মস্তক বলা হয়। মিনারগুলির মস্তকের উপরে উড়িষ্যার দেউল স্থাপত্যের প্রভাব লক্ষণীয়। মন্দিরটা একটা চতুষ্কোণ ঘরের মতন দেখতে। দেওয়ালে না আছে কোন উৎকীর্ণ ভাস্কর্য, না আছে কোন কারুকার্য, আছে শুধু চুন-বালির সাদা পলেস্তারা।

এখানকার দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মন্দির হলো ঝোপ-জঙ্গলে ঢাকা আট-চালার মন্দিরটি। এরূপ ভাল অষ্ট কোণাকৃতি আটচালার মন্দির সাধারণতঃ দেখা যায় না। অনুরূপ একটা জীর্ণ আটচালা মন্দির হুগলীর ইলছোবা-মণ্ডলাই গাঁয়ে আছে। মন্দিরের বাইরে থেকে সমগ্র মন্দির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করা যায় না। মন্দিরটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে তৈরী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগের নিকট অনুরোধ তাঁরা যেন এটিও সংরক্ষণের দায়িত্ব অচিরাৎ গ্রহণ করেন। পঞ্চরত্ন ও নবরত্নের মন্দিরগুলো অধিকাংশ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিলো তা বোঝা যায় নবরত্ন মন্দিরের খোদিত তারিখ (১৬৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ইংরেজী ১৭৫৫ সালে) ও গঠন রীতি থেকে। ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভে বাংলাদেশের গ্রামগুলো যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ধারা বহন করে চলেছিলো তার প্রমাণ আজকের পশ্চিমবঙ্গের এ সমস্ত জরাজীর্ণ মন্দির।" [পৃঃ ৯৩৯—৯৪২]

সুখড়িয়া (মৌজা নং ৯৬)।

ভাগীরথীর তীরস্থ সোমড়া ও বলাগড়ের মধ্যস্থিত সুখড়িয়া একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। বহু প্রাচীন দেবালয় অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান আছে দেখিতে পাওয়া যায়। উলার মুস্তৌফী বংশের একটী শাখা এই স্থানে বসবাস করায়, এই গ্রাম প্রসিদ্ধ হইয়া উঠে। সুখড়িয়া হইতে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন কাগজে লিখিত আছে নদীয়াধিপতি কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত আনন্দরাম মুস্তৌফীর মনোমালিন্য ঘটায়,

বর্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদ তাঁহার বাসস্থানের জন্য তদানীন্তন বর্ধমান জেলার অন্তর্গত সুখড়িয়া, গোপীনগর প্রভৃতি স্থানগুলি তাঁহার পুত্রের নামে বিক্রয় কোবলা লিখিয়া দেন। তিনি সম্ভবতঃ ১১৬১ সালে এই গ্রামে বসবাস করেন এবং নিজ নামানুসারে অনন্তদেব নামক বহু চক্র শোভিত একটি শালগ্রাম শিলা, শ্যামরায় নামক যুগল রাধাকৃষ্ণ মূর্তি এবং দ্বাদশটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন; সেগুলি অদ্যাপি এই স্থানে বিদ্যমান আছে।

সুখড়িয়া গ্রামে গঙ্গেটিয়া নামক খালের ধারে নিস্তারিণী কালীর সুবৃহৎ মন্দির একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দির আধুনিক হইলেও, মন্দির মধ্যে দেবীর কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত মূর্তি সজীব বলিয়া ভ্রম হয়। কাশীপতি মুস্তৌফী ১২৫৪ সালে অর্ধ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইহা নির্মাণ করেন; মন্দিরের উচ্চতা প্রায় পঞ্চাশ ফুট হইবে।

এই স্থানের আনন্দময়ীর মন্দির বঙ্গদেশের মধ্যে অন্যতম প্রসিদ্ধ মন্দির বলিয়া খ্যাত। ১৭৩৫ শকাব্দে লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া বীরেশ্বর মুস্তৌফী ইহা নির্মাণ করেন। মন্দিরটি ৭০ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং ইহার পঁচিশটি চূড়া আছে। মন্দির গাত্রে টালির উপর নানা দেবদেবীর মূর্তি খোদিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। খোদিত মূর্তিগুলির মধ্যে রাধাকৃষ্ণ, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, সিংহবাহিনী, রামসীতা প্রভৃতির মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। মন্দিরের মধ্যে বেদীর উপর শায়িত শিবের বক্ষোপরি উপবিষ্টা আনন্দময়ী কালী আছেন, দেবীর উচ্চতা প্রায় তিন ফুট হইবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে মন্দিরের সর্বোচ্চ পাঁচটি চূড়া ভাঙ্গিয়া যাইলে পরবর্তীকালে রাধাজীবনের দৌহিত্রগণ চূড়াগুলি পুনরায় নির্মাণ করিয়া দেন।

হরসুন্দরী কালীর মন্দিরও এক সময় দেখিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে যাত্রী সমাগম হইত। কিন্তু বর্তমানে মন্দিরটি ভগ্ন হওয়ায় ইহার শোভা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরটি দ্বিতল ও নয়টি চূড়ায় শোভিত ছিল এবং ইহার উচ্চতা প্রায় ষাট ফুট ছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্তমানে মন্দিরের উপরের সমস্ত চূড়াগুলিই ভূমিস্মাৎ হইয়া গিয়াছে। হরসুন্দরী কালী মন্দিরের উঠানের মধ্যে দুইটি পঞ্চচূড়া বিশিষ্ট মন্দির এবং দুই সারিতে বারটি মন্দিরের মধ্যেই শিবলিঙ্গ আছে।

[পৃঃ ১৭৫—১৭৬]

পাটুলী (মৌজা নং ৯৯)।

বলাগড় থানার মধ্যে পাটুলী প্রাচীনতম গ্রাম। জীরাট স্টেশনের পশ্চিমে এক মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। পাটুলীর মঠবাড়ি হুগলী জেলার অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। মঠবাড়িতে অনুষ্ঠিত দুর্গাপূজায় দেবী দুর্গার দুইটি মাত্র হাত বাহির হইতে দেখা যায়। বাকি আটটি হাত পিছনে অপ্রকট থাকে। ইহাছাড়া দুর্গার দক্ষিণে কার্তিক ও বামে গণেশ থাকে। এই ধরণের অদ্ভুত দুর্গাপূজা জেলার আর কোথাও হয় না। পূজায় ছাগ বলি হয় এবং বলির পর ছাগলটিকে ছাড়াইয়া তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটা হয় এবং উহার সহিত মাসকলাই, দই, দুধ মিশাইয়া চতুষ্কোটি যোগিনীদের উৎসর্গ করা হয়। দুর্গাপূজার সময় সন্ধিপূজা হয় না। পূর্বে এই স্থানে তান্ত্রিক আচারে পূজা হইত এবং নরবলি হইত। এখন পিটুলির নরপুত্তলিকা পূজায় বলি দেওয়া হয়। মঠবাড়ির দেবী "মঠের মা" বলিয়া খ্যাত। এই গ্রামের দুর্গাপূজা একটি দেখিবার জিনিস। এই বংশের পূর্বপুরুষ বৌদ্ধতান্ত্রিক ছিলেন মনে হয়। বর্ধমান জেলায় এই নামে আর একটি গ্রাম আছে। ভারতের অন্যতম সংস্কৃতি কেন্দ্র পাটলিপুত্রের নামের অনুকরণে গ্রামের নাম পাটুলী হইয়াছিল বলিয়া অনেকের বিশ্বাস।

[পৃঃ ১৮৪—১৮৫]

জিরাট (মৌজা নং ১০৯)।

জীরাট ব্যাণ্ডেল-বারহারোয়া লুপ লাইনের একটি স্টেশন; কলিকাতা হইতে ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। জীরাট নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেকের

ধারণা যে ফরাসী 'জিরায়ৎ' শব্দ হইতে জীরাটের নামকরণ হইয়াছে। জিরায়ৎ শব্দের অর্থ ক্ষেত। ষ্টেশন হইতে পূর্বদিকে কিছু দূরে গঙ্গাতীরে গ্রামের অবস্থিত ছিল এখন গঙ্গা পূর্বদিকে আরও সরিয়া গিয়াছে। অতীতকালে জীরাটের নাম মহম্মদপুর ছিল। পরবর্তীকালে গোপীনাথজীউর জন্য এই গ্রাম বৈষ্ণবতীর্থে পরিণত হয় এবং গোপীনাথজীউর "জীউ" হইতে জীরাট নাম হয় বলিয়া অনেকে মনে করেন। (গোপীনাথজীউ সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ" ২য় খণ্ড গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, অনুসন্ধিৎসু পাঠক উহা পাঠ করিতে পারেন)।

জীরাটের বুড়োশিব, মহাকাল ভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর পরে রাধাগোপীনাথ ও মৃন্ময়ী কালী প্রাচীন বিগ্রহাদির মধ্যে অন্যতম বলিয়া বিনয় ঘোষ লিখিয়াছেন। [পৃঃ ২৭৭—২৭৮]

পারাম্বুয়া

সদর মহকুমায় পারাম্বুয়া প্রাচীনকালে শাঁখারী অধ্যুষিত একটি সুসমৃদ্ধ গ্রাম বলিয়া খ্যাত ছিল। শাঁখারী ও গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বহু কীর্তি কলাপের চিহ্ন এখনও এই গ্রামে বিদ্যমান আছে।

গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তাহার মধ্যে গন্ধবণিক সম্প্রদায়ের বিশ্বনাথ দত্তের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীমন্দির, কালিকা মোহন দত্ত প্রতিষ্ঠিত কালীমাতার মন্দির এবং তারা চাঁদ দত্তের পূর্বপুরুষ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণবলরাম জীউর দোলমঞ্চ ও নাটবাংলা উল্লেখ্য। চণ্ডীমন্দিরে অবস্থিত দুর্গামূর্তি এখন আর মন্দিরে নাই। মন্দিরের পোড়ামাটির কারুকার্য এক সময় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কিন্তু কালপ্রবাহে মন্দির এখন ধ্বংসোন্মুখ। মন্দিরের গায়ে "শ্রীরাম শুভমস্তু—শকাব্দ ১৬৯৪" এই কথা উৎকীর্ণ আছে।

কালীতলায় কালীমাতার মন্দিরের উপরিভাগ ভগ্ন হইলে উহা ফেলিয়া দিয়া মন্দিরটি ছোট করা হয়। মন্দিরের মধ্যে বহু চিত্র অঙ্কিত আছে। উপরের সারিতে চারিখানি চিত্রের শিল্পনৈপুণ্য অপূর্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই চারিখানি চিত্রের মধ্যে প্রথমটি কদম্ববৃক্ষের তলায় শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের মূর্তি, দ্বিতীয়টি শ্রীশ্রীদুর্গা দেবীর মূর্তি ও তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গণেশ, তৃতীয়টি কালীমাতার মূর্তি এবং চতুর্থটি রামের রাজ্যাভিষেকের চিত্র।

ইহাছাড়া নীচের সারিতে আটটি কুলুঙ্গীর মধ্যেও আট রকমের চিত্র আছে। তাহার মধ্যে মঙ্গলঘট, শিবলিঙ্গ ও ভারতের জাতীয় পক্ষী ময়ূর-ময়ূরীর নৃত্য দর্শনীয় বস্তু।

হাটতলার ব্রহ্মঠাকুর বহু প্রাচীন বলিয়া কথিত। এই স্থানে প্রতি বৎসর বারোয়ারী পূজা হয়। গ্রামের মধ্য দিয়া কানানদী প্রবাহিত হইয়াছে। নদীর অপর পাড়ে সরমপাড়া গ্রামে কৃষ্ণবলরাম জীউর সুন্দর বিগ্রহ আছে। প্রতি বৎসর দোল ও রাসের সময় বিগ্রহকে শোভাযাত্রা করিয়া পারাম্বুয়ায় আনা হয় এবং তদুপলক্ষে যাত্রা, কথকতা প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠান বহু প্রাচীন কাল হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। শাঁখারী সম্প্রদায়ের দ্বারা দোলমঞ্চ ও নাটবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন শাঁখারীদের অবস্থা খারাপ হওয়ায় গ্রামবাসিগণ সমবেতভাবে প্রাচীন উৎসবগুলি পরিচালনা করেন।

[পৃঃ ২৮৭—২৮৯]

নিত্যানন্দপুর

কলিকাতা হইতে নিত্যানন্দপুরে দূরত্ব প্রায় ৩৩ মাইল। পূর্বে নিত্যানন্দপুর নামেই একটি রেলস্টেশন ছিল; বর্তমানে উহার নাম বদলাইয়া কুন্তীঘাট হইয়াছে। স্টেশন হইতে উত্তর আসাম রোড পার হইয়া কুন্তী নদীর তীরে নিত্যানন্দপুর গ্রাম অবস্থিত। প্রাচীনকালে রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর এই স্থানে আগমন স্মরণীয় করিবার জন্য গ্রামের নিত্যানন্দপুর নামকরণ করেন। দুই শতাব্দী পূর্বে এই বৈশিষ্টহীন ক্ষুদ্র গ্রামে একজন

প্রখ্যাতনামা পণ্ডিত ছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রশেখর বাচস্পতি। তিনি নবাব সরফরাজ খাঁ কর্তৃক প্রদত্ত জমিদারী পাইয়া এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার পৌত্র শঙ্করনারায়ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক কুন্তী নদী তীরে নির্মিত ঈশানেশ্বর ও ত্র্যম্বকেশ্বর নামক জোড়া শিবমন্দির এই গ্রামের একটি দর্শনীয় বস্তু। মন্দির গাত্রের প্রস্তর ফলক হইতে ইহার নির্মাণের তারিখ "১৭০৫ শকাব্দ" বলিয়া জানা যায়। মন্দিরে পোড়ামাটিতে সুন্দর কারুকার্য পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের কারুকার্যের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মোগল এই তিন রকমের শিল্প বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায়। শতদল পদ্ম, সহস্রদল পদ্ম, চক্র প্রভৃতি হিন্দু যুগের নিদর্শন এবং প্রাচীনকালের বহু অলঙ্কারের মৃৎরূপ ইহার গায়ে খোদিত আছে। ইহাছাড়া মোগল আমলের জাফরি ও কল্কা এবং বৌদ্ধ যুগের বুদ্ধমূর্তির অনুকরণে ধ্যানস্থ পদ্মনাভ মূর্তিও মন্দিরে শোভাবর্ধন করিতেছে। কালের নির্মম আঘাতে এই সমস্ত পোড়ামাটির শিল্পসমন্বিত ইঁটগুলি একটুও ম্লান হয় নাই। চিন্তামণি দে এই মন্দিরে শিল্পী ছিলেন। [পৃঃ ৭৮৪]

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ বলাগড়

উৎসব বিবরণী

ওলেশ্বরী দেবীর পূজা

আলিসাগড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে ওলেশ্বরী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে ওলেশ্বরী দেবীর চতুর্ভুজা নিমকাঠের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবের দিন একটি ছাগ বলি দিয়া যথারীতি পূজা হয়। তাহাছাড়া প্রতি শনি-মঙ্গলবার দেবীর স্থানে পূজা হইয়া থাকে। সাধারণতঃ দেবীর নিকট মানত হিসাবে চিনি-সন্দেশ ইত্যাদির নৈবেদ্য ও ছাগ বলি প্রদান করা হয়। বর্তমানে দেবীর সেবায়েত ও পূজারী শ্রীনিমাই চন্দ্র দুর্লভ, কাশ্যপ গোত্র।

কালীপূজা

গুপ্তিপাড়ায় প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর মঠে দেশ কালিকামাতার মন্দিরে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি স্থাপন করিয়া যথারীতি পূজা সম্পন্ন করা হয়। উৎসবের দিন রাত্রিতে দক্ষিণা কালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং পূজান্তে রাত্রি শেষে দেবী মূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়।

শোনা যায় ইংরাজী ১৬৭০-৭২ খৃষ্টাব্দে বৃন্দাবনজীউর মঠের পঞ্চমদণ্ডী মোহন্ত রামানন্দ স্বামী মঠ হইতে কিছুদূরে পঞ্চমুণ্ডীর বেদী স্থাপন করিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তদবধি তাঁহার সাধন পীঠে দেবী কেশ সম্বলিত ছটায় দক্ষিণা কালীর নিত্য পূজা এবং প্রতি বৎসর অমাবস্যা তিথিতে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রবাদ আছে যে, যে-পটুয়া দেবী মূর্তি নির্মাণ করেন তাঁহারা সকলেই নির্বংশ হন। এই কারণে বাজার হইতে গোপনে দেবীর মূর্তি ক্রয় করিতে হয়।

উৎসবের দিন আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের বহু নরনারী দেবী দর্শন করিতে এবং মানত পূজাদি দিবার জন্য মন্দিরে আসেন। প্রধানতঃ দেবীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা, শাঁখা-শাড়ী এবং ছাগ বলি মানত করা হয়। দেবীর মন্দিরের রেলিং-এ সুতার দ্বারা ইটের টুকরা বাঁধিয়া ভক্তরা দেবীর নিকট মনস্কামনা জানান। উৎসবের দিন সর্বজনীন অন্নভোগ বিতরণের আয়োজন করা হয়। দেবীর বর্তমান পূজারী শ্রীহরিসাধন ভট্টাচার্য, কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ।

জাগেশ্বরী দেবীর পূজা

জাগুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় জাগেশ্বরী দেবীর বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসরের প্রাচীন। জাগেশ্বরী দেবীর মন্দির আছে; মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর পাষাণমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন দেবীর অধিবাস ও পরদিবস বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের প্রথম দিন চিনি-সন্দেশের নৈবেদ্য ও ছাগ বলি ইত্যাদি মানত ও পূজা দেওয়া হয়। বর্ধমান মহারাজ কর্তৃক প্রদত্ত কিছু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি আয় হইতে দেবীর নিত্য পূজাদি হয়। দেবীর পূজারী ব্রাহ্মণ, গোত্র ঘৃত কৌশিক এবং পদবী চক্রবর্তী। এই উৎসবে কিছু সংখ্যক অহিন্দুও যোগদান করেন বলিয়া জানা যায়।

দোলযাত্রা

গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইংরাজী ১৬৭০-৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই উৎসব শুরু হয় বলিয়া জানা যায়। এই উৎসবে প্রচলন সম্পর্কে শোনা যায় যে, একদা বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর মঠে পঞ্চমদণ্ডী মোহান্ত সিদ্ধ রামানন্দ স্বামী রাস পূর্ণিমায় শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিন নৈশ ভোগ পূজাদির শেষে মন্দিরের একপার্শ্বে বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর বিগ্রহ এবং অপর দিকে শ্রীরাধিকার বিগ্রহ রাখিয়া মন্দিরে দ্বার রুদ্ধ করতঃ তিনি মন্দিরের বারান্দায় শয়ন করেন।

কিন্তু গভীর রাত্রে তিনি মন্দিরাভ্যন্তরে নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পান এবং পরদিন প্রভাতে মন্দিরের দ্বার মুক্ত করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ ও শ্রীরাধিকা মূর্তি একত্রে দেখিতে পান। অতঃপর তিনি ইষ্টদেবতার প্রীতির জন্য রাস, ঝুলন ও দোল উৎসবের প্রচলন করেন।

মন্দিরাভ্যন্তরে শ্রীরাধিকা সহ দারু নির্মিত শ্রীকৃষ্ণের ত্রিভঙ্গ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীকৃষ্ণের হাতে মোহনবংশী এবং মাথায় শিখীপুচ্ছ সহ মুকুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিগ্রহই বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ নামে খ্যাত। দোলপূর্ণিমার পূর্ব দিন মন্দির প্রাঙ্গণে চাঁচর পর্ব পালন করা হয় এবং উৎসবের দিন শেষ রাত্রিতে বাদ্যাদি সহকারে শোভাযাত্রা করিয়া বৃন্দাবনচন্দ্রজীউকে মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত গুণ্ডিচাবাড়ীতে দোলমঞ্চে স্থাপন করা হয়। পূর্ণিমার দিন প্রাতঃকালে রং ও আবির দ্বারা দেবদোল পর্ব ও যথারীতি পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেও বহু লোকজন আসেন।

ধর্মরাজপূজা

মুণ্ডুগোলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্ল প্রতিপদ হইতে তৃতীয়া তিথি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে ধর্মরাজ ঠাকুরের জাত বা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। ইহা স্থানীয় দুর্লভ সম্প্রদায়ের উৎসব হইলেও এই উৎসবে সর্বসাধারণ যোগদান করিয়া থাকেন। গ্রামে একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত একটি গোলাকার পাথরখণ্ডকে ধর্মরাজ শীলা জ্ঞানে পূজাদি করা হয়। মন্দিরে ধর্মরাজ শীলা ব্যতীত শীতলার মূর্তি, পঞ্চদেবতার মূর্তি এবং মনসার ঘট স্থাপিত আছে। ধর্মরাজের সহিত উল্লিখিত বিগ্রহাদিরও নিত্য পূজা হইয়া থাকে।

মাঘ মাসে উৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে মন্দিরে স্থানীয় স্ত্রীলোকেরা ধর্মরাজের পূজা করিয়া থাকেন এবং রাত্রে ধর্মরাজের নিকট একটি পশু বলি দেওয়া হয়। পরে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রচুর আতস বাজী পোড়ান হয়। দ্বিতীয়া ও তৃতীয়া তিথিতে যথারীতি ধর্মরাজের পূজা হয়। উৎসবের সময় আশে-পাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী ধর্মরাজের নিকট মানসিক পূজাদি দিতে আসেন। সাধারণতঃ যোড়শোপচারে পূজা এবং পাঁঠা ও ভেড়া বলি মানত করা হয়। অনেক অহিন্দুও ধর্মরাজের নিকট মানসিক পূজা দিয়া থাকেন। উৎসবের তিনদিনই মানতের বলি হইয়া থাকে। যদিও মাদকদ্রব্য পান প্রয়োজনীয় ধর্মাচার নহে, তথাপি উৎসব উপলক্ষে অনেকে মাদক দ্রব্য পান করেন।

বার্ষিক উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে ধর্মরাজ ঠাকুরের চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিছু দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতে ধর্মরাজ ঠাকুরের নিত্য পূজা ও উৎসবাদি পালিত হয়। প্রতি শনি-মঙ্গলবার ধর্মরাজ ঠাকুরের নিকট মানসিক পূজা ও বলিদান হইয়া থাকে। ধর্মরাজ ঠাকুরের বর্তমান সেবায়েত ও পূজারী শ্রীপঞ্চানন মোদক, ইনি শিব গোত্রীয় এবং জাতিতে দুর্লভ। ইঁহারা যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন না।

তিলডাঙ্গা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের দ্বিতীয়া তিথিতে ধর্মরাজ ঠাকুরের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন। গ্রামে একটি মাটির ঘরে ধর্মরাজ ঠাকুরের শিলা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

ধর্মরাজের দৈনিক পূজা ও ভোগারতি এবং ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাদ্যসহকারে সাড়ম্বরে প্রতি-বৎসর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণতঃ মানত হিসাবে চিনি-সন্দেশের নৈবেদ্য ও কুমড়া, ইক্ষু, কলা, ছাগ ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়; বলি সাধারণতঃ উৎসবের দিনই হয়। ধর্মরাজের বর্তমান সেবায়েত শ্রীশম্ভুপদ পণ্ডিত, জাতিতে ডোম, কাশ্যপ গোত্র।

নোয়াজন ঠাকুর পূজা

নাটাগড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী সংক্রান্তিতে নোয়াজন পূজা নামে একটি বিশেষ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন। নোয়াজন

ঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। গ্রামের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট নিমগাছতলায় পূজা হয়; গাছের গোড়াটি ইঁট দ্বারা বাঁধান। বৈশাখ মাসে উৎসবের সময় স্থানীয় ও দূরবর্তী অঞ্চল হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়। হিন্দু-অহিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের লোকজনই উৎসবে যোগদান করেন। বাৎসরিক উৎসব ব্যতীত প্রতি শনি-মঙ্গলবার নোয়াজন ঠাকুরের পূজা হয়। সাধারণতঃ মানত হিসাবে চিনি-সন্দেশ প্রভৃতির নৈবেদ্য ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজারী জাতিতে ব্রাহ্মণ। বর্তমান সেবায়েত সুখড়িয়া নিবাসী শ্রীমনীন্দ্র নাথ বিশ্বাস ও নাটাগড়ি নিবাসী শ্রীনন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ব্রহ্মাপূজা

হাটগোবিন্দ গঞ্জ গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণী পূর্ণিমা তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে ব্রহ্মাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাংলা ১২৬৬ সনে একদা আকস্মিক দারুণ অগ্নিকাণ্ডের ফলে স্থানীয় বাজারে বহু ঘরবাড়ী এবং প্রভূত অর্থক্ষতি হয়। সেই কারণে ভবিষ্যতে অগ্নিভয় নিবারণের জন্য বাজারের ব্যবসায়ীগণ ও তৎকালীন জমিদার কার্তিক চন্দ্র সরকার মহাশয়ের সাহায্যে বাজারের মধ্যস্থলে প্রায় চার শতক জমির উপর একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া ব্রহ্মা-পূজার সূচনা হয়।

মন্দিরে প্রতি বৎসর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও নারদের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া ব্রাহ্মণ দ্বারা যথারীতি পূজাদি করা হয়।

উৎসবের প্রথম দিন পূজা, হোম, ব্রাহ্মণ ও অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, জনসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং সন্ধ্যায় আরতি হইয়া প্রথম দিনে পূজার সমাপ্তি ঘটে। উৎসবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সকালে যথারীতি পূজা ও প্রসাদ বিতরণ, সন্ধ্যায় আরতি ও রাত্রে আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয় হয়। চতুর্থ দিনে সকালে পূজা শেষে দধিকর্দমাভোগ ও প্রসাদ বিতরণ এবং রাত্রে প্রতিমা বিসর্জনের পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। সাধারণতঃ ফল-মূল-মিষ্টি ও বস্ত্রাদি দিয়া ভক্তরা মানত পূজা দিয়া থাকেন। বর্তমান পূজারী ব্রাহ্মণ, উপাধি ভট্টাচার্য। এই উৎসব উপলক্ষে আশে পাশের প্রায় দুই চারি ক্রোশ দূরবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক সহস্র নরনারীর সমাবেশ ঘটে।

স্থানীয় বাজারের ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া এবং মন্দিরের চতুপার্শ্বস্থ ঘরগুলি হইতে ভাড়া আদায় করিয়া উৎসবের ব্যয় নির্বাহ করা হয়। স্থানীয় একটি পূজা কমিটি উৎসবের পরিচালনা করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে কোন কোন বৎসর পেশাদারী যাত্রাদল আনা হয়।

মনসাপূজা

দেবীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে মনসার ঝাঁপান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন। মনসার কোন মন্দির ও মূর্তি নাই; তবে নির্দিষ্ট স্থানে দেবীর নিত্যপূজা ও বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের দিন ষোড়শোপচারে পূজা হয় এবং আশেপাশের পনর-ষোলটি গ্রাম হইতে বহু নরনারী ঢাক-ঢোল বাজাইয়া দেবীর পূজা দিতে আসেন। মানত হিসাবে চিনি-সন্দেশের নৈবেদ্য ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসবের দিন মানতস্বরূপ প্রায় এক হাজার পাঁঠা বলি হয়। উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। বর্তমানে পূজারী কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চট্টোপাধ্যায়।

মহোৎসব

গুপ্তিপাড়া গ্রামে কুর্মিপাড়ায় প্রতি বৎসর পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দশী হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে অষ্টম প্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনায় শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর বিগ্রহ পূজা ও ভোগারতি হইয়া থাকে। এই উৎসবের প্রস্তুতি প্রায় মাসাধিক কাল পূর্বে আরম্ভ হয়।

উৎসবটি স্থানীয় কুর্মী সম্প্রদায়ের, তবে ইহাতে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত লোকজনেরাও যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা এবং বর্ধমান জেলা

হইতে বহু কুর্মী সম্প্রদায়ভুক্ত নর-নারী, বৈষ্ণব মহান্ত এবং কীর্তনীয়ার দল আসিয়া থাকেন।

প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে এই গ্রামে একবার মহামারী দেখা দিয়াছিল; শোনাযায়, সেই সময় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ হয় যে, এই গ্রামে একটি হরিবাসর প্রতিষ্ঠা করিয়া নাম সংকীর্তনের আয়োজন করিলে মহামারীর ভয় দূর হইবে। সেই সময় হইতে অদ্যাপি উৎসবটি চলিয়া আসিতেছে।

রথযাত্রা

গুপ্তিপাড়ায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে শুক্লা দশমী তিথি পর্যন্ত বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর মঠের পরিচালনায় সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মঠে সত্যদেব সরস্বতী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দারু নির্মিত জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহত্রয়কে কেন্দ্র করিয়া উৎসবটি পালন করা হয়। মূর্তিগুলির উচ্চতা প্রায় চারিফুট হইবে। ইংরাজী ১৭৪৫-৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মঠের মোহন্ত পীতাম্বরানন্দ স্বামী একটি ত্রয়োদশ চূড়া বিশিষ্ট সুবৃহৎ রথ নির্মাণ করিয়া রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন করেন।

উৎসবের প্রথম দিন মূল মন্দিরে পূজান্তে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা বিগ্রহত্রয়কে রথে স্থাপন করিয়া বৈকালে মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল দূরে অবস্থিত গুণ্ডিচাবাড়ী পর্যন্ত রথটানা হয় এবং আটদিনব্যাপী ঐ স্থানে বিগ্রহ রাখিয়া প্রত্যহ প্রাতে বাল্যভোগ, বেলা এক প্রহরে দধিকদমা ভোগ, দ্বিপ্রহরে অন্নভোগ, তৃতীয় প্রহরে ফলাদি ভোগ, সন্ধ্যারতির পর দুধ-চিঁড়া ভোগ এবং রাত্রিতে লুচি-সন্দেশ ভোগ দ্বারা যথারীতি পূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সমাপ্তির দিন অর্থাৎ উল্টোরথের দিন পুনরায় উক্ত বিগ্রহত্রয়কে রথে করিয়া মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। বর্তমান রথটি নয়চূড়া বিশিষ্ট। রথের দড়ি টানিতে অগণিত লোকে ভীড় হয়। এই সকল লোকজন প্রধানতঃ হুগলী, বর্ধমান, নদীয়া, চব্বিশ-পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে আসিয়া থাকেন।

গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রার অন্যতম বৈশিষ্ট্য "ভাণ্ডার লুঠ" উৎসব। পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোথাও এই পর্ব পালন করা হয় বলিয়া শোনা যায় না। ভাণ্ডার লুঠ উপলক্ষে পুনর্যাত্রার পূর্বদিন গুণ্ডিচাবাড়ীতে নানারূপ নৈবেদ্য দিয়া পুরোহিত মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া জগন্নাথদেবের পূজা করেন। এই সময় অসংখ্য ভক্ত নর-নারী মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষা করিতে থাকেন। পূজা শেষ করিয়া পুরোহিত মন্দিরের দ্বার উন্মোচন করিবামাত্র মন্দিরের বাহিরে অপেক্ষারত জনতা মধ্যে ঐ ভোগের সামগ্রী লুঠ করিবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়িয়া যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে জনতা ঐ ভোগ লুঠ করিয়া লইয়া যান।

ভাণ্ডার লুঠ উৎসব উপলক্ষে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর মঠ হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্র বিগ্রহকে দোলায় করিয়া গুণ্ডিচাবাড়ীর চাঁদনীতে আনিয়া স্থাপন করা হয়। এই পর্ব শেষ হইলে পর উক্ত বিগ্রহদ্বয়কে দোলায় তুলিয়া বাদ্য ও পতাকা সহ শোভাযাত্রা করিয়া রাত্রিকালে মন্দিরে ফিরাইয়া আনা হয়। ভাণ্ডার লুঠ পর্বে প্রধানতঃ স্থানীয় গোপ সম্প্রদায় অধিক সংখ্যায় যোগদান করিয়া থাকেন। নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রাম হইতে তাঁহারা আসেন।

গুপ্তিপাড়ার রথযাত্রা সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকার ২৩শে আষাঢ়, '৬৭ তারিখে নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়:

"গুপ্তিপাড়া (হুগলী), ৫ই জুলাই—গুপ্তিপাড়ার শ্রীশ্রী৵বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ মঠের সুপ্রাচীন রথযাত্রা উৎসব ও মেলা নির্বিঘ্নে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উপলক্ষে প্রায় দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

রামনবমী

গুপ্তিপাড়ায় রঘুনাথজীউর মন্দিরে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে রামনবমী উৎসব পালন করা। শোনা যায়, প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে রামকান্ত গোস্বামী নামে গুপ্তিপাড়া নিবাসী জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অযোধ্যায় অবস্থানকালে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রঘুনাথ জীউর শিলামূর্তি প্রাপ্ত হন। তিনি ঐ শিলামূর্তি সহ গুপ্তিপাড়ায়

আসিয়া ভাগীরথী তীরে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া রঘুনাথজীউর নিত্যপূজা ও রামনবমী উৎসবের প্রচলন করেন। তদবধি এই স্থানে নিয়মিতভাবে রামনবমী উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথ জীউর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম-যজ্ঞ এবং আবীর খেলা হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং ইহাতে আশেপাশের গ্রামের লোকজনও যোগদান করেন।

স্নানযাত্রা

গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লাপূর্ণিমা তিথিতে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ মঠে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা—এই বিগ্রহত্রয়কে কেন্দ্র করিয়া স্নানযাত্রা উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

বৃন্দাবনচন্দ্রজীউ-র মঠে প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথাদি বিগ্রহ-ত্রয়কে উৎসবের দিন প্রত্যূষে মহাধূমধামের সহিত শোভাযাত্রা সহকারে স্নানমঞ্চে আনিয়া স্নানাভিষেক পর্ব পালন করা হয়। তৎপরে বিগ্রহত্রয়কে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা ও হোম সম্পন্ন হয়। এই উৎসবটি গুপ্তিপাড়া এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের হিন্দুজাতির সর্বজনীন উৎসব এবং এই উৎসবে বহু লোকজন যোগদান করিয়া থাকেন।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ বলাগড়

মেলা বিবরণী

ওলেশ্বরীপূজার মেলা

আলিসাগড়িয়া গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ওলেশ্বরী দেবীর পূজা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় আড়াই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন এবং সাধারণতঃ বিকালের দিকে লোক সমাগম হয়।

মেলায় ধোবাপাড়া, ঠাকুলিয়া, কল্যাণপুর প্রভৃতি আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আট শত যাত্রীর সমাগম হয়। সমাগত যাত্রীর মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দ্রব্যাদির পনের ষোলটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

কালীপূজার মেলা

বাকুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষকালীর পূজা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় পাঁচ-ছয় কাঠা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে তিন-চার শত নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসর আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারীর প্রভৃতি দ্রব্যাদির কয়েকটি দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কালীকীর্তন এবং স্থানীয় যুবক সম্প্রদায় কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়।

জাগেশ্বরীপূজার মেলা

জাগুলিয়া গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমাতে জাগেশ্বরী দেবীর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য মেলাটি বসে। মেলার জমি কিয়দাংশ দেবোত্তর এবং কিয়দাংশ স্কুল বোর্ড ও ইউনিয়ন বোর্ডের। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং মহিপালপুর, পিণ্ডিরা, বাকুলিয়া, ধোবাপাড়া, দাসপুর, একতারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীরা সাধারণতঃ হাঁটিয়া আসেন।

মেলায় সতের-আঠারটি দোকানপাট বসে এবং দুই-তিনজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কল্যাণশ্রী, বলাগড় ও পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ইহাতে ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, পুতুলের দোকান, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয় না।

দোলযাত্রার মেলা

গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে দোলমণ্ডপ সংলগ্ন প্রায় এক বিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলায় বিকালের দিকে লোকসমাগম ও বেচা-কেনা হইয়া থাকে।

মেলায় স্থানীয় এবং সোমড়া, ধোবাপাড়া ইউনিয়ন, বর্ধমান জেলার কল্যাণপুর এবং নদীয়া জেলার শান্তিপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীগণ প্রধানতঃ ট্রেন, নৌকা ও গরুরগাড়ীযোগে আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় মেলায় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশটি দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায়

বসে। ইহাভিন্ন প্রায় পনের-কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া ঔষধপত্র, বই-ছবি, কাপড়চোপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, শিল্প সামগ্রী প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেই।

বৃন্দাবনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল-পূর্ণিমার পূর্বে একাদশী তিথিতে বৃন্দাবনচন্দ্রজীউর বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রায় চার বিঘা পতিত জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে; মেলায় সাধারণতঃ বিকালের দিকে লোকজনের সমাগম হয়। ইহা গত পাঁচ-বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় এক্তারপুর, ইলছোবা, দাসপুর, শিলিবা, চাঁপতা, মহিপালপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-সাত শত নরনারী আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। কল্যাণশ্রী, দাসপুর, বলাগড় প্রভৃতি নিকটবর্তী ইউনিয়ন হইতে বিক্রেতারা প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মনিহারী, ময়রা, কাপড়চোপড় ইত্যাদি দোকান ব্যতীত তেলেভাজা, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্র ইত্যাদির দোকান-পাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য তরজাগান ও যাত্রাভিনয় হয়। গ্রামে সখের যাত্রাদল আছে। অধিকারী শ্রীগোপাল চন্দ্র সরকার। উপরোক্ত আনন্দানুষ্ঠানে প্রায় পাঁচশত নরনারী যোগদান করেন।

ধর্মরাজপূজার মেলা

মুণ্ডুখোলা গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে তৃতীয়া পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী ধর্মরাজের জাত উপলক্ষে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার দুইপার্শ্বে ও দেবোত্তর প্রায় তিন-চারি বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। প্রথম দিন বৈকাল হইতে মেলাটি আরম্ভ হয় এবং বাকি দুইদিন সারাদিনব্যাপী চলে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

সমগ্র বলাগড় থানা এবং পাণ্ডুয়া, কালনা, নদীয়ার চাকদহ, রানাঘাট থানা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলাতে প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের অধিকাংশই খোলা জায়গায় বসে। মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ কলিকাতা, ত্রিবেণী, শ্যামনগর, নৈহাটী, পাণ্ডুয়া, শ্রীপুর, চন্দননগর, চাকদহ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, তামা-পিতল-লোহার জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুলের দোকানের সংখ্যাই অধিক। তাহাছাড়া কাপড়চোপড়, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র ও বলাগড় থানার বিখ্যাত বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে। মেলায় ব্যবসায়ীগণের নিকট হইতে খাজনা আদায় করা হয়।

আমোদ প্রমোদের জন্য স্থানীয় যাত্রাদল কর্তৃক যাত্রাভিনয়, ডায়মণ্ডহারবারের পুতুলনাচের দল, নৈহাটীর তরজা গানের দল এবং নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় কোন কোন বৎসর জুয়া খেলা হয়। এই সকল আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠানে প্রায় এক সহস্র নরনারী যোগদান করেন।

তিলডাঙ্গা (চলতি নাম ক্ষেতপুর) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ধর্মরাজঠাকুরের পূজা উপলক্ষে প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী সোমড়া, গুপ্তিপাড়া, বাকুলিয়া, এক্তারপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ গরুর গাড়ীতে ও হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গুপ্তিপাড়া, সোমড়া, কুলিয়াপাড়া, শান্তিপুর ও কালনা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন।

মেলায় খোলা জায়গায় প্রায় সতের-আঠারখানি দোকানপাট বসে ও তিন-চারিজন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী দ্রব্যাদি, মাটির পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র এবং কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র মেলায় আমদানী হয়। ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

নোয়াজন ঠাকুর পূজার মেলা

নাটাগড়ি গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে নোয়াজন ঠাকুরের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী সোমড়া ইউনিয়ন হইতে প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়। প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে ও দুই-তিনজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন নদীয়া জেলার শান্তিপুর হইতে প্রতি বৎসর কয়েকজন বিক্রেতা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির পুতুল প্রভৃতি আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

মনসাপূজার মেলা

দেবীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসে বিষহরি ঠাকুরাণীর (মনসার) বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে গ্রামের উত্তর সীমানায় প্রায় দুই বিঘা জমির উপর এক-দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বহুযাত্রীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ স্থানীয় এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং পনের-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, শিল্পসামগ্রী, কাপড়-চোপড়, বই-ছবি, বাসনকোসন ও অন্যান্য জিনিসপত্রের দোকানপাট থাকে।

আমোদ-প্রমোদের বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই।

রামনবমীর মেলা

গুপ্তিপাড়ায় প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব উপলক্ষে রঘুনাথজীউ মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে সহস্রাধিক যাত্রী ট্রেনে, নৌকায় এবং হাঁটিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারাও আশে-পাশের গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসেন। মোট দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, বই-ছবি, জামা-কাপড়, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, মাটির খেলনা, কাঠের আসবাবপত্র প্রভৃতিই উল্লেখযোগ্য। তাহাছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাটও বসে। মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী এবং যাত্রাভিনয় ও রামায়ণগানের ব্যবস্থা থাকে। অনেকে মেলায় জুয়া খেলিয়া থাকেন। যাত্রাদলের অধিকারী শ্রীনারায়ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোবিন্দ কর মজুমদার এবং রামায়ণগানের অধিকারী শ্রীবলরাম ভট্টাচার্য।

মেলাটি জেলাবোর্ডের অনুমোদিত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত। স্থানীয় সেচ্ছাসেবকদল পানীয় জল, জনস্বাস্থ্য এবং মেলায় শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

রথযাত্রার মেলা

গুপ্তিপাড়ায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে 'রথসড়কে'র দুই পাশের জমিতে এবং গুণ্ডিচাবাড়ীর নিকটস্থ বাজারের মধ্যে মোট প্রায় একুশ বিঘা জমির উপর সপ্তাহকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী সোমড়া, শ্রীপুর, বলাগড়, সিজা, কামালপুর, ডুমুরদহ, নিত্যানন্দপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং নদীয়া ও বর্ধমান জেলা হইতে প্রধানতঃ হিন্দু-সম্প্রদায়ের ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের প্রায় দশ-পনর হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় যাত্রীগণ সাধারণতঃ ট্রেনে, গো-যানে ও নৌকাযোগে আসেন।

মেলার বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নদীয়া, বর্ধমান ও হুগলী জেলার শহরাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মোট প্রায় আড়াইশত দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী ও কাপড়চোপড় প্রভৃতির দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া বাসনকোসন, ঔষধপত্র, বই-ছবি, কৃষিসংক্রান্ত জিনিসপত্র, শিল্প সামগ্রী প্রভৃতির দোকানপাট বসে। অন্যান্য জিনিসপত্রের কিছু কিছু দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা, যাত্রা ও রামায়ণ গানের ব্যবস্থা থাকে। গ্রামেই যাত্রাদল আছে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মেলাটি স্থানীয় জেলাবোর্ডের দ্বারা অনুমোদিত ও লাইসেন্স প্রাপ্ত। মেলায় পানীয় জলের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়।

বাসনা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাধাকান্ত আশ্রম সংলগ্ন জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় নিকটবর্তী একারপুর, মহিপালপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মাত্র দুই-তিন শত নরনারীর সমাগম হয় এবং মনিহারী, তেলেভাজা প্রভৃতির দশ-পনেরটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-সাতজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

সিজা গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে রথতলার সন্নিকটে জেলাবোর্ডের রাস্তার দুই ধারে ও দেবোত্তর জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ষাট সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচ-ছয়-শত নরনারীর সমাগম হয় এবং পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে ও দশ-বার জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ স্থানীয়। কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির পুতুল, হাঁড়িকুড়ি ও ফলের দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

দক্ষিণ গোপালপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে হাটতলায় ব্যক্তি বিশেষের প্রায় তিন বিঘা জমির উপর নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

স্থানীয় এবং দিগসুই, হোয়েরা, মগরা, মহিপালপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় কুড়ি-পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন ত্রিবেণী, মগরা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই ব্যবসায়ীরা আসেন। সমগ্র দোকান-পাটগুলির মধ্যে মনিহারী ও শাক-সব্জীর দোকানপাটই বেশী। তাহাছাড়া ময়রা, তেলেভাজা কাপড়চোপড়, শিল্পসামগ্রী, বই-ছবি ইত্যাদি দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য পুতুলনাচ ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা থাকে।

রাসযাত্রার মেলা

শ্রীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ বিঘা জমির উপর এক পক্ষকালব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং শ্রীপুর, বলাগড়, সোমড়া, ত্রিবেণী, গুপ্তিপাড়া, খামারগাছি, মাকড়দহ, বর্ধমান জেলার কালনা, নদীয়া জেলার রানাঘাট, উলা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্বসম্প্রদায়ের প্রায় পঞ্চাশ হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় সমাগত যাত্রীর মধ্যে পুরুষ ও নারীর সংখ্যা প্রায় সমান। যাত্রীরা প্রধানতঃ ট্রেন, গো-যান ও হাঁটিয়া আসেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং পাঁচ-ছয়জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রাম ও শহরাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন।

ঐ সকল দোকানপাটের মধ্যে ময়রা এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া মেলায় বাসন-কোসন, বই-ছবি, তৈয়ারী জামা-কাপড়, জুতা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, পান-বিড়ি, ফল-মূল প্রভৃতির দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনী, লটারী, যাত্রাগান, তর্জাগান, চণ্ডীমঙ্গল গান, কবিগান প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়।

এই মেলা উপলক্ষে শ্রীপুর বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গ্রামের মেয়েদের তৈয়ারী নানাবিধ সূচিকার্য এবং তৎসহ কৃষি ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়; এই প্রদর্শনীটি অবশ্য সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

শিবরাত্রির মেলা

এক্তারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। তবে মধ্যে কয়েক বৎসর যাবত মেলাটি বন্ধ ছিল, গত বাংলা ১৩৬৩ সন হইতে পুনরায় ইহা আরম্ভ হইয়াছে। স্থানীয় শ্রীঋষিকেশ ঘোষ ও শ্রীগৌর ঘোষের প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর সাতদিন-ব্যাপী মেলাটি বসে। এক্তারপুর ও নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় সতের-আঠারটি দোকানপাট বসে এবং দুই-তিনজন ফেরিওয়ালা আসেন। ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র ও নানারকম শিল্পসামগ্রী প্রভৃতি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয় এবং তাহাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, তর্জাগান ও যাত্রাভিনয় প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়।

স্নানযাত্রার মেলা

গুপ্তিপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনচন্দ্র জীউর স্নানযাত্রা উৎসব উপলক্ষে স্নানমঞ্চ সন্নিকটস্থ প্রায় একবিঘা দেবোত্তর জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং সোমড়া, বাকুলিয়া, ধোবাপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন এবং বর্ধমান জেলার কল্যাণপুর ইউনিয়ন হইতে ট্রেনে, গো-যানে, সাইকেল রিক্সায় ও পদব্রজে সর্বসম্প্রদায়ের মোট প্রায় এক হাজার নরনারী আসেন।

উল্লিখিত স্থানগুলি হইতে মেলায় প্রতি বৎসরই বিক্রেতাগণ আসেন। প্রায় ত্রিশ-পঁত্রিশটি দোকনপাট বসে এবং আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। উক্ত দোকানপাটের মধ্যে খাবার, বাঁশ, বেত ও কাঠের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানই বেশী। তাহাছাড়া, মনিহারী, কাপড়চোপড় ও মাটির হাঁড়িকুড়ির দোকান বসে। মেলায় ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

জেলা : হুগলী

থানা : মগরা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : হোয়েরা। ১।৪৪১।৯৫।১৭০।৯২২

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—খয়রাপাড়া, জেলেপাড়া, মুসলমানপাড়া, সাঁওতাল-পাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন খন্যান। গ্রামটি জি টি. রোডের ধারে অবস্থিত বলিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াতের সুবিধা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে মনসার ঝাঁপান উৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা ও লক্ষ্মীপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, অগ্রহায়ণে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং মাঘে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি সর্বজনীন। মনসার ঝাঁপান উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের এবং দুর্গাপূজাটি প্রায় পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

ইহাভিন্ন, গ্রামে নিয়োগী পরিবারের কুল বিগ্রহ নারায়ণজীউকে কেন্দ্র করিয়া আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও চৈত্র কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথিতে দোলযাত্রা এবং গোপালজীউকে কেন্দ্র করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় দোল উৎসব এবং চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণাপূজা হইয়া থাকে। ব্যক্তি-বিশেষের এই উৎসবগুলি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। গ্রামের সাঁওতাল সম্প্রদায় প্রতি বৎসর পালুইপূজা নামে একদিন একটি উৎসব পালন করিয়া থাকেন।

(ঙ) রথযাত্রায় মেলা। আষাঢ় মাসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মনসাপূজায় মেলা। ভাদ্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে সাতটি শিবমন্দির, একটি মনসাপূজার ঘর এবং নারায়ণজীউর মন্দির আছে। উল্লিখিত সাতটি শিব মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

পার্সী ভাষায় 'হোয়েরা' অর্থে বিড়াল। খুব সম্ভবতঃ মোগল রাজত্বকালে গ্রামটির এইরূপ নামকরণ হইয়াছিল।

শ্রীজানকী নাথ নিয়োগী,
গ্রামঃ হোয়েরা, পোঃ খন্যান,
হুগলী।

দিগসুই (মৌজা নং ১২)।

দিগসুই মগরা থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গণ্ড গ্রাম। গঙ্গার একমাইল পশ্চিমে পূর্বে গ্রামটি অবস্থিত ছিল। বর্তমানে গঙ্গা পূর্বদিকে অনেকখানি সরিয়া গিয়াছে।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যুষিত এই গ্রামে প্রাচীন-কালে অনেকগুলি টোল ছিল। এখনও দুটি টোল গ্রামে আছে। একটি টোল পণ্ডিত শ্যামশঙ্কর বিদ্যাভূষণ পরিচালনা করেন। ১৩২০ সনে "সাধন সমিতি" নামে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এই গ্রামের বহু কল্যাণকর কার্য করে।

দিগসুই গ্রামে দাশরথি দেব সাধন সমিতির পরিচালক ছিলেন। তাঁহার ধর্ম সাধনায় চতুঃপার্শ্বস্থিত গ্রামসমূহে ধর্মপ্রচার ও জনসেবা সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এবং বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে বর্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধক হুগলীর শ্রীসীতারাম ওঙ্কারনাথ।

দিগসুই গ্রামের সুর বংশের দেওয়ান ব্রজলাল সুর একজন কীর্তিমান পুরুষ ছিলেন এবং দোল দুর্গোৎসব প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি দ্বারা এই অঞ্চলে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি শিবমন্দির এখনও ভগ্নাবস্থায় আছে দেখিতে পাওয়া যায়। সুর বংশের কুলদেবতা যাদব রায়ের নবরত্ন মন্দির এই গ্রামের একটি দর্শনীয় বস্তু। নয়টি

চূড়াবিশিষ্ট এইরূপ বিরাট মন্দির বক্সা ব্যতীত আর কোথাও দেখা যায় না।

সাধন সমিতির প্রাঙ্গণে ১৩৬৫ সনে একটি রাম মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্র, সীতাদেবী, লক্ষ্মণ ও মহাবীরের শ্বেতপ্রস্তরের চারিটি বিগ্রহ এবং চারকোণে চারিটি বৃহৎ আলমারীতে খাতায় লিখিত ১ শত ২৫ কোটি 'শ্রীরাম' নাম প্রত্যহ পূজিত হয়। এইরূপ রামনাম পূজা ভারতের আর কোথাও হয় না।

এই মন্দিরের সম্মুখে আর একটি মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা হইয়াছে। উহাতে মদনমোহন জীউ অধিষ্ঠিত হইবেন। সেয়ারসোলের রাজা কর্তৃক প্রদত্ত কাল কষ্টিপাথরের মদনমোহন জীউ ও শ্রীরাধিকার বিগ্রহ প্রদত্ত হইয়াছে। বর্তমানে উক্ত বিগ্রহদ্বয় শ্রীরাম মন্দিরে পূজিত হইতেছেন।

দিগসুই গ্রামে শ্রীশ্রীহট্টেশ্বর মহাদেব জীউর প্রাচীন মন্দির ভগ্ন হইলে ১২৯২ সালে শ্রীমতী সুখদা দাসী তাঁহার স্বামী আনন্দ চন্দ্র নিয়োগীর স্বর্গার্থে উহা সংস্কার করিয়াছেন বলিয়া একটি পাথরে লেখা আছে।

["হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ২য় খণ্ড, শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ৯২৫—৯২৭]

সপ্তগ্রাম (মৌজা নং ৫৫)।

সপ্তগ্রাম বা সাতগাঁও হুগলী জেলার একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ স্থান। হাওড়া হইতে ইহার দূরত্ব প্রায় ২৭ মাইল। পূর্ব রেলপথে বর্তমানে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। বঙ্গের হিন্দু-রাজগণের রাজত্বকালে সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত স্থান ছিল ও তৎকালে ইহা একটি তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইত। কথিত আছে, পৌরাণিক যুগের কান্যকুব্জের রাজা প্রিয়বন্তের সপ্ত পুত্র গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে সাতখানি বিভিন্ন গ্রামে তপস্যা করিয়া ঋষিত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম হয় সপ্তগ্রাম। কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, "সপ্ত ঋষির শাসনে বোলয় সপ্তগ্রাম বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল, মাধবাচার্যের চণ্ডী এবং লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ধোয়ী প্রণীত "পবনদূতম্" নামক প্রাচীন কাব্যাদিতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। এক সময়ে ইহার খ্যাতি সুদূর রোম পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কেহ কেহ ইহাকে গ্রীকগণ বর্ণিত গঙ্গারিডি্ রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী বলিয়া মনে করেন। ইংরাজ অধিকারের পূর্বকাল পর্যন্ত সপ্তগ্রাম একটি বিখ্যাত বন্দর ছিল এবং এখানে দেশবিদেশের বাণিজ্যতরীর সমাগম হইত। নিকটস্থ হুগলী বন্দরের অভ্যুত্থান এবং সরস্বতী নদী মজিয়া যাওয়ায় সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রামের পতন ঘটে এবং ক্রমে ইহার সমুদয় ব্যবসাবাণিজ্য হুগলীতে স্থানান্তরিত হয়। মুঘলগণের হস্তে পর্তুগীজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটিলে সপ্তগ্রামের ফৌজদার হুগলীতে গিয়া বসেন এবং সমস্ত সরকারী কার্যালয়ও তথায় চলিয়া যায়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে সপ্তগ্রাম বৈষ্ণব তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে দ্বাদশগোপালের অন্যতম শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট অবস্থিত। তাঁহার প্রকৃত নাম দিবাকর। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে তিনি সপ্তগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা শ্রীকর দত্ত এবং মাতা ভদ্রাবতী দেবী। যৌবনে পত্নী বিয়োগের পর উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুর গৃহত্যাগ করেন এবং সারা-জীবনব্যাপী সাধন-ভজন ও বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করিয়া ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। উদ্ধারণ দত্ত শ্রীচৈতন্যদেবের প্রধান পার্ষদ নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র ছিলেন এবং তিনি এই স্থানে বহুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

সপ্তগ্রামে অবস্থিত শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাটে একটি মন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ সহ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তাঁহার একটি ফুলসমাধি আছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য সেবাপূজা এবং প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে শ্রীমৎ উদ্ধারণ দত্তের তিরোভাব মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত নরনারী ও বৈষ্ণব

মহান্তদিগের সমাগম হইয়া থাকে এবং অতিথি সেবা ও ভোগ বিতরণ করা হয়।

বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার অন্তর্গত উদ্ধারণপুর গ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে।

(পূর্ববঙ্গ রেলপথ কর্তৃক প্রকাশিত "বাংলায় ভ্রমণ" ২য় খণ্ড গ্রন্থের সাহায্যে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক রচিত।)

কৃষ্ণপুর

সপ্তগ্রামের অন্তর্গত কৃষ্ণপুরে পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ দাস জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থান "রঘুনাথ দাসের শ্রীপাট" এবং বৈষ্ণবদিগের পীঠস্থান রূপে খ্যাত হয়।

গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহের সময়ে গোবর্দ্ধন ও হিরণ্য মজুমদার নামক দুই ভ্রাতা সপ্তগ্রামের "অধিকারী" বা রাজা ছিলেন। তাঁহাদের বার্ষিক আয় ১২ লক্ষ টাকার উপর ছিল। হিরণ্য মজুমদারের একমাত্র পুত্র রঘুনাথ শ্রীচৈতন্য-দেবের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। কপিলাবস্তুর রাজকুমার সিদ্ধার্থের ন্যায় বিপুল ঐশ্বর্য স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পদে আত্ম-সমর্পণ করেন এবং কঠোর বৈরাগ্য সাধন ও অতুলনীয় ভক্তির প্রভাবে উত্তরকালে বৈষ্ণব জগতের চির-সম্মানিত ষট্ গোস্বামীর অন্যতমরূপে পরিচিত হন।

বৈষ্ণব পীঠস্থান কৃষ্ণপুরে প্রতি বৎসর ১লা মাঘে মহোৎসব এবং উত্তরায়ণের মেলা নামে একটি বৃহৎ মেলা বসে। এই বিষয়ে 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত দুইটি সংবাদ নীচে লিপিবদ্ধ করা হইল :

"বাংলায় বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম প্রাচীন মহাকেন্দ্র হইতেছে হুগলী জেলার অন্তর্গত 'সপ্তগ্রাম'। জেলার সদর মহকুমার অন্তর্গত খামারপাড়া, বংশবাটী, শিবপুর, বাসুদেবপুর, ত্রিশবিঘা, কৃষ্ণপুর, দেবানন্দপুর—সাতটি গ্রামের সমন্বয়ে এই 'সপ্তগ্রাম'। সপ্তগ্রাম কেবলমাত্র জেলার একটি প্রাচীন গ্রাম বলিলে মারাত্মক ভুল হইবে। একদা উহা ছিল ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট নগর ও বন্দর। তাহার বিপুল নিদর্শন আজিও বিদ্যমান। এতদ্ সম্পর্কে বঙ্গদেশের একাধিক প্রাচীন পত্র-পত্রিকায় ও তদানীন্তন সরকারী নথিপত্রে বহু তথ্য সম্বলিত ইতিহাসও পাওয়া যায়। এমন কি এখনও সরকারী উদ্যোগে উহার পুরাতত্ত্ব বিভাগ ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যদি অন্বেষণ করেন, তবে বহু প্রাচীন ঐতিহ্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে সন্দেহ নাই।

সপ্তগ্রামের অপর গ্রাম কৃষ্ণপুর গ্রাম হাওড়া-বর্ধমান মেন লাইনের 'আদি সপ্তগ্রাম' স্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তায় দূরত্বে মাত্র দেড় মাইল। এখানে বৈষ্ণব চূড়ামণি মহাপ্রভুর বড় গোস্বামীর এক গোস্বামী যিনি একমাত্র কায়স্থ কুলজাত সেই শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামী ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার শ্রীপাট আজিও বিদ্যমান।

সপ্তগ্রামের অধিপতি গোবর্ধন দাস মজুমদারের একমাত্র পুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস মজুমদার শৈশব হইতেই তাঁহাদের কুলদেবতা 'রাধা-কৃষ্ণে'র প্রতি বিশেষ-ভাবে আকৃষ্ট হন এবং সেই সময় তিনি ঠাকুর হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন। তিনি তাঁহার সমস্ত ঐশ্বর্য ও ধন সম্পদ পরিত্যাগ করিয়া সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীনিত্যানন্দমহাপ্রভুর আকর্ষণে সংসার পরিত্যাগ পূর্বক ভগবত প্রেমে বিভোর হইয়া দীনহীন কাঙ্গালের বেশে সদাই ব্যাকুলিত চিত্তে 'কবে নিতাই পদে ঠাঁই পাবো,' 'কবে গৌর পদে ঠাঁই পাবো,' বলিয়া মাতিয়া উঠেন এবং এই সময়েই তাঁহার গৃহত্যাগের উৎকণ্ঠা দেখা দেয়।

অতঃপর তিনি পাণিহাটিতে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ দর্শনলাভ ও তথায় দণ্ডমহোৎসব অনুষ্ঠানের পর শ্রীশ্রীনিত্যানন্দের বিশেষ কৃপা লাভ করেন। পরে তিনি পদব্রজে বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া ক্রোশ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে গমন পূর্বক শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দর্শন লাভ ও তাঁহার কৃপা

লাভ করেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে স্বরূপের হস্তে সমর্পণ করেন এবং রঘুনাথকে গোবর্ধনশীলা ও গুঞ্জমালা দান করেন। তারপর রঘুনাথ পুরীধাম হইতে মহাপ্রভুপ্রদত্ত মদনমোহন বিগ্রহ লইয়া সপ্তগ্রামে আগমন করেন এবং তাঁহাদের কুলদেবতার মন্দিরে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

একদা তিনি যখন শ্রীবৃন্দাবনে তপস্যায় মগ্ন, তখন মুসলমানগণ 'সপ্তগ্রাম' আক্রমণ করে ও অধিকার করে এবং সেই সময় সপ্তগ্রাম রাজবাড়ী ও তাঁহাদের কুলদেবতার মন্দির ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। তদানীন্তন মন্দিরের পূজারী মন্দির ধ্বংসের পূর্বেই রাজবাড়ীর 'রাধাকৃষ্ণ', 'মদনমোহন' বিগ্রহগুলিকে সরস্বতী নদীতীরে প্রোথিত করিয়া রাখেন।

তখন রঘুনাথ এই বার্তা শ্রবণ করিয়া পুনরায় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য জনৈক ভক্তকে সপ্তগ্রামে প্রেরণ করেন এবং তিনি বিগ্রহগুলি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে রঘুনাথ দেহত্যাগ করেন। ইহাই মোটামুটি পুরাতন তথ্য বলিয়া জানা যায়।

বঙ্গদেশের বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক এই সপ্তগ্রামস্থিত কৃষ্ণপুরে অবস্থিত শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস গোস্বামীজীর শ্রীপাট যাহা একদা শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর আবির্ভাবে পীঠস্থানে পরিণত হইয়াছিল, সেই পীঠস্থানটির বর্তমান দুর্দশা দেখিলে লজ্জায় মাথা অবনত করিতে হয়। অতীব দুঃখের কথা, ৩৭ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ১৩৩০ সালে সিমলা গ্রাম নিবাসী শ্রীহরিচরণ ঘোষ এই শ্রীপাঠের সংস্কার সাধন করেন। তৎপরে উহার আর কোন সংস্কার কেহ করেন নাই। ফলে বর্তমানে উহা ভগ্নদশায় পরিণত হইয়াছে। শ্রীপাঠ হইতে সরস্বতী নদীর গর্ভ পর্যন্ত যে বিশাল 'খাস' এককালে বিপুল অর্থব্যয়ে নির্মিত হইয়াছিল, যাহার পার্শ্বে আনুমানিক প্রায় তিনশত বৎসরাধিক কালের বকুল বৃক্ষটি অবস্থিত তাহার দুরবস্থা অতীব বেদনাদায়ক। বর্তমানে এই মন্দিরে আছে 'মদনমোহন', 'নিতাই গৌর', রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ ব্যতীত শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস ব্যবহৃত কাষ্ঠপাদুকাযুগল। এই শ্রীপাঠের বর্তমান সেবায়েতের নাম শ্রীবিজয় চক্রবর্তী।

প্রতি বৎসর ১লা মাঘ এই শ্রীপাঠে ও তৎপার্শ্বস্থ সরস্বতী নদীতীরে উত্তরায়ণ মেলা যুগ যুগ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এবারও ১লা মাঘ হইতে সেই মেলা শুরু হইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন এই মেলা শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস প্রবর্তিত এবং উহা বঙ্গদেশের প্রাচীন মেলাগুলির অন্যতম। সেইদিন স্থানীয় শহরাঞ্চল ও পল্লীগ্রাম হইতে আগত কয়েকসহস্র ভক্ত নরনারী তথায় সমবেত হইয়া হরিনাম সংকীর্তন ও বহু বৈষ্ণব ভক্তের সমাবেশে এই সুপ্ত, অবলুপ্ত ক্ষুদ্র গ্রামটি যেন পুনর্গঠন লাভ করে, যেন সে অতীতের সবকিছু ঐতিহ্য ফিরিয়া পায়—গ্রামটি প্রকৃতই সেদিন একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। অনুরূপ জাঁকজমকাল মেলা বর্তমানে পল্লীঅঞ্চলে আর বড় দেখা যায় না। সেদিন সমবেত নরনারী তথায় রন্ধনকার্য সমাপন করিয়া মধ্যাহ্নে ভোজন করিয়া থাকেন এবং সেইজন্য গাড়ি গাড়ি কপি, আলু বেগুন, মাছ, তরিতরকারী, মাটির হাঁড়ি তথায় বিক্রয় হয়।

এই মেলাটি কেষ্টপুর বা ভোদো কেষ্টপুর বা কৃষ্ণপুরের মেলা বলিয়া খ্যাত।

গ্রামবাসীদের মধ্যে বর্তমানে কেহই বিশেষ অবস্থাপন্ন নহেন। গ্রামে প্রায় ২০ ঘর হিন্দু ও ৩০ ঘর মুসলমান বাস করেন। চাষ আবাদই উঁহাদের প্রধান উপজীবিকা। তাঁহাদের দেখিলে মনে হয় কাহারও মুখে ভাষা নাই, শরীরে বল নাই, মনেও সতেজতা নাই। গ্রামে ইদানীংকালে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। অথচ গ্রামে প্রবেশ করিলেই দেখা যায় নুড়ি ইট ও শিবলিঙ্গের ভগ্ন প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। উহা হইতেই সহজেই অনুমিত হয় যে, এককালে এই গ্রাম ছিল বর্ধিষ্ণু। বাঁশবন ও ঘন জঙ্গলের মধ্যে একটি জোড়া শিবমন্দির রহিয়াছে। উহা ১৭২০ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়। এবং বহুকষ্টে উহার অন্দরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম 'চামচিকির'র মলত্যাগে শিবলিঙ্গের

উপরিভাগ আবৃত হইয়া গিয়াছে। সেইগুলির নিয়মিত পূজাও হয় না। ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি থাকিতে পারে? এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের ভিটা দেখিলে মনে হয় একদা তাঁহাদের অবস্থা অতি উত্তম ছিল। শোনা যায় শ্রীপুর গ্রামের শ্রীরাখাল সরকার নাকি এই বংশের লোক। গ্রামে মাটির কাঁচা রাস্তা যাহা আছে তাহারও অবস্থা শোচনীয়।

বঙ্গদেশে যুগে যুগে মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়া থাকে। বিশেষত এই হুগলী জেলা মনীষীর তীর্থ-ক্ষেত্র। এই জেলায় বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাই ভগবানের কৃপা ও অনুগ্রহপ্রাপ্ত শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস যেস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাল্য-কাল যেস্থানে অতিবাহিত হইয়াছিল, যে মহাপুরুষ বিপুল ঐশ্বর্য, ধন-সম্পদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মাতাপিতার অপত্যস্নেহ, স্ত্রীর আকর্ষণ পর্যন্ত যাঁহাকে গৃহী করিতে পারে নাই, সেই মহাপুরুষের লীলাক্ষেত্র কৃষ্ণপুর (সপ্তগ্রাম) আজ অবহেলিত, অবজ্ঞাত, বিস্মৃত।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩ই জানুয়ারী ১৯৬১।

"কৃষ্ণপুর (হুগলী), ১৬ই জানুয়ারী—গত ১লা মাঘ, রবিবার হুগলী জেলার সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম কৃষ্ণপুরে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনের আকুতি ও সম্প্রীতি স্মরণের নিমিত্ত তাঁহারই দেশ কৃষ্ণপুরে প্রবর্তিত বঙ্গের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী উত্তরায়ণ মেলা মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই মেলায় হাওড়া, হুগলী, বর্ধমান ও ২৪-পরগণা হইতে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের সমাগমে গ্রামটি একদিনের জন্য জনাকীর্ণ শহরে পরিণত হয়।

অপরাহ্ণে মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ, বড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্মরণোৎসব প্রতিপালিত হয়। এই সভায় শৈলেন্দ্র মোহন দত্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। উক্ত সভায় 'হুগলী জেলার ইতিহাস' লেখক শ্রীসুধীর কুমার মিত্র এই শ্রীপাটে শ্রীশ্রীরাধামোহন ও শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দের বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা সপ্তগ্রামের রাজপুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামীর পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিয়া বলেন যে, ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে বৃন্দাবন তিনি দেহরক্ষা করেন; বৃন্দাবনে বসবাসকালে উক্ত স্থান যখন জঙ্গলাকীর্ণ ছিল তখন তিনি বৃন্দাবনের শ্রীরাধাকুণ্ড ও শ্রীশ্যামকুণ্ড কিভাবে পুনরুদ্ধার করেন এবং রঘুনাথক্রীত বৃন্দাবনের জমিগুলির প্রাচীন দলিল যাহা পার্থসারথি পত্রে উল্লিখিত হইয়াছে তদ্বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সভাপতি শ্রীশৈলেন্দ্র মোহন দত্ত তাঁহার ভাষণে শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট সংরক্ষণের আবেদন জানাইয়া বলেন যে, রঘুনাথের মুখে শ্রীগৌরাঙ্গের বিষয় অবগত হইয়া শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি আরও বলেন যে, সপ্তগ্রামের ঐতি-হাসিক মর্যাদার বিলুপ্তির পরও, এই মেলা প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া লোকশিক্ষার আকর ও পল্লী-জীবনের সামগ্রিক উৎকর্ষ প্রদর্শনের ক্ষেত্ররূপে এক অমোঘ আকর্ষণের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। শ্রীবিজয় কৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ ও শ্রীদেবেন্দ্র চন্দ্র বসু মল্লিক সভায় বক্তৃতা করেন।

সভায় দেবানন্দপুর হইতে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত রঘুনাথ গোস্বামী রোড নামক দেড় মাইল কাঁচা রাস্তাটি পাকা করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অনুরোধ জানান হয়।

পুলিশ, স্থানীয় গ্রামরক্ষীদলের সাহায্যে সমস্ত মেলাটি ঘিরিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। মেলায় সাঁওতাল রমণীগণের নৃত্যগীত ও শ্রীপাটে সারাদিন ধরিয়া সঙ্কীর্তন বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯শে জানুয়ারী ১৯৬১।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মগরা থানার অন্তর্গত বংশবাটি গ্রামের প্রখ্যাত হংসেশ্বরী দেবীর পূজা ও উৎসব এবং ত্রিবেণীতে অনুষ্ঠিত পূজা-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

জেলা : হুগলী
থানা : মগরা

উৎসব বিবরণী

হংসেশ্বরীদেবীর পূজা ও উৎসব

হুগলী জেলার প্রাচীন সপ্তগ্রামের অন্যতম গ্রাম বংশবাটী কলিকাতা হইতে প্রায় ২৮ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রাচীনকালে ভাগীরথীর তীরস্থ এই ভূখণ্ড বাঁশবনে পরিপূর্ণ ছিল। বাঁশবন পরিষ্কার করিয়া একদা গ্রামের পত্তন হয় বলিয়া গ্রামের নাম হয় বংশবাটী। বংশবাটী বর্তমানে বাঁশবেড়িয়া নামে পরিচিত, চলতি কথায় লোকে বলেন বাঁশবেড়ে। প্রাচীন গ্রন্থাদির বহু স্থানে বংশবাটীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্বে প্রসিদ্ধ জনপদরূপে ইহার খ্যাতি ছিল। পূর্ব রেলপথে এই গ্রামে একটি স্টেশন আছে। ইহাভিন্ন ব্যাণ্ডেল জংশন স্টেশন হইতে ত্রিবেণীর মধ্য দিয়া মোটরবাসেও এই গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

বর্তমানে বাঁশবেড়িয়ার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ দেবী হংসেশ্বরীর মন্দির। প্রায় ৭০ ফুট উচ্চ এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুবিশাল দেবালয়টি বাঁশবেড়িয়া রাজবাড়ীর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত। তন্ত্রের ষট্চক্রের অনুকরণে কুলকুণ্ডলিনী শক্তির প্রকাশরূপে এই দেবী মন্দির পরিকল্পিত ও নির্মিত। পাঁচতলা বিশিষ্ট এই মন্দিরটি মনুষ্য দেহমধ্যস্থিত ইড়া, পিঙ্গলা, বজ্রাক্ষ, সুষুম্না ও চিত্রিণী প্রভৃতি পাঁচটি নাড়ীর ইঙ্গিত বাহক। মন্দিরটির আটকোণে আটটি, মধ্যস্থলে চারিটি এবং সর্বোচ্চ কেন্দ্রস্থলে একটি—মোট তেরটি চূড়া আছে। মন্দিরের চূড়াগুলি পদ্মকোরকের ন্যায়। বিচিত্র গঠন ভঙ্গিমায়, স্থাপত্য-শিল্পের বৈশিষ্ট্যে এবং ভাব ব্যঞ্জনায় এই মন্দির বাংলা তথা ভারতবর্ষের অতুলনীয়।

হংসেশ্বরীর মন্দিরটি দক্ষিণমুখী। ইহার চারিদিকে বারান্দা এবং সম্মুখভাগে উন্মুক্ত বাঁধান প্রশস্ত চত্বর আছে। সমগ্র মন্দিরটি পাথর ও ইট দ্বারা নির্মিত। মন্দিরাভ্যন্তরে পঞ্চমুণ্ডীর বেদীর উপর স্থাপিত সহস্রদল পদ্মের উপর শবরূপে শায়িত শিবের নাভি হইতে উত্থিত দীর্ঘ মৃণালসহ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দেবী হংসেশ্বরী বাঁ পা মুড়িয়া এবং দক্ষিণ পা ঝুলাইয়া উপবিষ্টা। শিব ও বেদীর উপর সহস্রদল পদ্মটি শ্বেতপাথর নির্মিত। দেবী মূর্তি দারুময়ী। নিমকাষ্ঠ নির্মিত, নীলবর্ণ এবং দেবীর চতুর্ভুজের দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে অভয় ও বরাভয় মুদ্রা এবং বাম হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে অসি ও মুণ্ডমালা। বস্ত্র পরিহিত সুন্দর ষোড়শী মূর্তি রূপে দেবী প্রতিষ্ঠিত। ইহাভিন্ন মন্দিরের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

বাঁশবেড়িয়ার রাজপরিবারের সাধক প্রবর রাজা নৃসিংহদেব ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে হংসেশ্বরী দেবীর মন্দিরটি নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। মন্দির নির্মাণের মূল পরিকল্পনাটি তাঁহারই, যদিও তাঁহার জীবিতাবস্থায় উহার গঠন কার্য সমাপ্ত হয় নাই। তাঁহার অসমাপ্ত কার্য তদীয় পত্নী রাণী শঙ্করী সম্পূর্ণ করিয়া ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মন্দিরে দেবী হংসেশ্বরী মূর্তি প্রতিষ্ঠা ও নিত্যসেবাপূজার সুবন্দোবস্ত করিয়া যান। বাঁশবেড়িয়ার রাজ বংশের আদি পুরুষ ভারতীয় রাজপুত বংশোদ্ভব এবং একাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা কণৌজ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন বলিয়া জানা যায়।

প্রতিদিন নিয়মিত যথারীতি হংসেশ্বরীর পূজা, অন্নভোগ ও শীতলারতি ব্যতীত বৈশাখ মাসের অমাবস্যা-পূর্ণিমা ও অক্ষয় তৃতীয়াতে, জ্যৈষ্ঠ মাসের অমাবস্যা-পূর্ণিমায়, ষষ্ঠী ও স্নানযাত্রার দিন, আষাঢ় মাসে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বার্ষিক পূজা, আশ্বিন মাসের শারদীয়া দুর্গাপূজায় এবং অগ্রহায়ণ পূর্ণিমার নবান্ন উপলক্ষে চণ্ডীপাঠ, বলি, হোম ও অন্নভোগ দিয়া সাড়ম্বরে বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং অন্নভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ইহাভিন্ন, এই মন্দিরে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে গঙ্গাপূজা, আশ্বিন মাসে লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে রূপার মুখোসে কালীপূজা, অগ্রহায়ণ মাসে জগদ্ধাত্রী পূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, ফাল্গুন মাসে দোল ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র মাসে নীলপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

উল্লিখিত বিভিন্ন উৎসবাদি উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থান হইতে বহু লোকজনের সমাগম হয়।

বাঁশবেড়িয়া রাজ পরিবারের বর্তমান বংশধরগণই দেবীর সেবাইত। দেবোত্তর সম্পত্তির আয় হইতেই দেবীর

পূজা-পার্বণাদি পরিচালিত হয় বর্তমান পূজারী শ্রীঅনিল কুমার চট্টোপাধ্যায়, ইঁহারা বংশানুক্রমে দেবীর পূজাদি করিতেছেন।

হংসেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন বাসুদেব মন্দিরটি বাঁশবেড়িয়ার আর একটি অন্যতম প্রধান দর্শনীয় বস্তু। বাঁশবেড়িয়া রাজবংশের রাজা রামেশ্বর মহাশয় ১৬০১ শকাব্দে পোড়ামাটি শিল্পকাযে সমৃদ্ধ এই অপূর্ব সুন্দর মন্দিরটি নির্মাণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বাসুদেব মূর্তিটি অপহৃত হইয়াছে।

বংশবাটীর বাসুদেব মন্দির সম্পর্কে ১০ই ভাদ্র, ১৩৬৮ সনে আনন্দবাজার পত্রিকায় শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়ের লিখিত একটি সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার অংশবিশেষ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল।

সপ্তদশ শতকে বাংলার যে কয়েকটি প্রাচীন মন্দির কালের গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এখনও বাংলার পোড়ামাটির ভাস্কর্যের বিশ্বজোড়া খ্যাতির সাক্ষ্য বহন করছে, বংশবাটি রাজপ্রাসাদ প্রাঙ্গণে অবস্থিত বাসুদেবের মন্দির বোধ হয় তাদের মধ্যে প্রধানতম।

মন্দিরটির গঠনশৈলী এবং অজানা শিল্পীদের পোড়ামাটির ভাস্কর্য সহজেই দর্শকমনকে বিমোহিত করে। চালা মন্দিররীতিতে তৈরি মন্দিরটির চতুষ্কোণ গর্ভ-গৃহের তিনদিক প্রশস্ত অলিন্দ। চালের উপরে একটি শিখর। বহিঃপ্রাকার নির্মিত হয়েছে অপূর্ব সুষমামণ্ডিত পোড়ামাটির ইটে। প্রত্যেকটি ইটে তুলে ধরা হয়েছে রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণোক্ত বিভিন্ন উপাখ্যানের ইতিহাস। ভারতের সুপ্রাচীন কাহিনী অজানা শিল্পীদের হাতের পরশে জীবন্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে মন্দিরের বহিঃপ্রাকারে।

বাসুদেব মন্দির নির্মিত হয় রাজা রামেশ্বর দত্তের রাজত্বকালে। দীর্ঘদিন ধরে একটি একটি করে ইট তৈরী করে মন্দিরের বহিরাবরণ সজ্জিত করা হয়। মন্দির গাত্রে একটি ফলকে মন্দিরটি নির্মাতা হিসেবে রামেশ্বর দত্তের নাম পাওয়া যায়।

অধিকাংশ ইটগুলির মাপ দৈর্ঘ্যে ছয়, প্রস্থে তিন ইঞ্চি অথবা ছয় এবং আট ইঞ্চি চতুষ্কোণ। কিন্তু এই স্বল্প পরিসর স্থানে ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিমায় কি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে, তার বর্ণনা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। নৃত্যরতা নর্তকীর মুখের ভঙ্গিমা, মুদ্রা অথবা মৃদঙ্গবাদকের নৃত্যের তালে তালে মৃদঙ্গবাদনে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করেছে অজানা শিল্পীর দল যে, দর্শকমনকে সহজেই টেনে নিয়ে যায় কল্পলোকে; মনে হয়, সত্যই যেন ইন্দ্র সভার উর্বশী, মেনকা, রম্ভা জীবন্ত মূর্ত হয়ে উঠেছে সেই মন্দির প্রাঙ্গণে।

গঙ্গারিড-এর রাজধানী সপ্তগ্রাম প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর বলে খ্যাতিলাভ করেছিল। তাই মন্দির গাত্রে বাঙালী সওদাগরদের বাণিজ্যের পসরা নিয়ে অকূল সাগরে অর্ণবযান ভাসানর চিত্রেরও অভাব নেই। দ্বিতল সে অর্ণবযানে নীচে সুন্দর সুঠামদেহী মাল্লারদল তালে তালে দাঁড় ফেলছে আর পাটাতনের উপর আনন্দে উৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে আরোহীর দল। হয়তো এ চিত্রণ বিজয় সিংহের লঙ্কা বিজয় বা ধনপতি সওদাগরের সমুদ্র যাত্রার বিবরণী। হয়তো বাণিজ্যের পসরা নিয়ে সুবর্ণভূমির পানে ছুটে চলেছে কোন ভাগ্যান্বেষী বাঙালী সওদাগর। ধ্বংসোন্মুখ মন্দির চিত্রণে অবশ্য সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এইরূপ দক্ষযজ্ঞ, মহিষাসুরমর্দিনী, দশমহাবিদ্যার, হরধনুভঙ্গ, জনক নন্দিনীর সঙ্গে রামের বিবাহ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, বিষ্ণুর দশ অবতার ইত্যাদি বহু ঘটনার সমাবেশ, পরপর কয়েকটি ইটে চিত্রিত করে তুলে ধরা হয়েছে এক পূর্ণাঙ্গ বিবরণী। মহিষাসুরমর্দিনীতে দেবীর মুখের প্রশান্ত হাসি এবং নৃসিংহ অবতারে ছিন্নোদর হিরণ্যকশিপুর বেদনাক্লিষ্ট মুখের ভঙ্গিমার নিখুঁত চিত্র দর্শনের পর এই অপূর্ব ভাস্কর্যের স্রষ্টা অজানা শিল্পীদের প্রতি আপনা থেকেই শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত হয়ে আসে।

এই মন্দির ভাস্কর্যে মধ্যযুগীয় বাংলার সামরিক রীতি-নীতি ও কলাকৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। এই ভাস্কর্য থেকে সে যুগের বাংলার সামরিক শক্তি সম্বন্ধে একটা মোটামুটি পরিচয় পাওয়া যায়।

দীর্ঘদিন সংস্কারের অভাবে মন্দিরের কিছু কিছু অংশ ধ্বংস হয়ে গেছে। পরবর্তীকালে সংস্কারের চিহ্ন মন্দির গাত্রে ইতস্তত বিদ্যমান। এ ছাড়াও কারুকার্য মণ্ডিত

ইটগুলি খুলে বা ভেঙ্গে নেওয়ার প্রচেষ্টায়ও মন্দিরের যথেষ্ট সৌন্দর্যহানি হয়েছে।

ত্রিবেণী—পৌষ সংক্রান্তির স্নান ও বেণীমাধবের গাজনোৎসব

হুগলী জেলার ত্রিবেণী হিন্দুদিগের একটি প্রাচীন তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদী এলাহাবাদের নিকট প্রয়াগতীর্থে একটি যুক্তধারায় প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে আসিয়া পুনরায় তিনটি পৃথক ধারার প্রবাহিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। এই কারণে এইস্থান ত্রিবেণী বা মুক্তবেণী নামে খ্যাত, এই কারণেই ইহার তীর্থগৌরব। বহু প্রাচীন গ্রন্থাদিতে ও সরকারী নথিপত্রে ত্রিবেণীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা তৎকালে একটি প্রসিদ্ধ বন্দর ও সংস্কৃত চর্চার কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। ত্রিবেণীর অতীত গৌরব আজ আর নাই; বর্তমানে ইহা একটি সামান্য গ্রাম। তবে ইহার তীর্থ-মাহাত্ম্য আজিও অম্লান আছে। কলিকাতা হইতে ইহার দূরত্ব ৩২ মাইল। পূর্ব রেলপথে এইস্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। ইহাভিন্ন, ব্যাণ্ডেল জংশন হইতে মোটরবাসেও এই গ্রামে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে মুক্তবেণীতে পুণ্যস্নান ও পরলোকগত পিতৃপুরুষের আত্মার তৃপ্তি কামনায় তর্পণাদির জন্য প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রায় দশ হাজার নরনারী এবং বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়া থাকে। ত্রিবেণীর বেণীমাধবের ঘাটেই পুণ্যকামীরা স্নান-তর্পণাদি করেন। বেণীমাধবের ঘাটটি প্রশস্ত এবং ইট দ্বারা বাঁধান। ঘাটের উপর একটি অতি প্রাচীন অশ্বত্থ গাছ শাখা প্রশাখা বিস্তৃত করিয়া ঘাটটিকে ছায়া সুশীতল করিয়া রাখিয়াছে। ঘাটের উভয় পার্শ্বে কয়েকটি মন্দিরে গঙ্গা, জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, লক্ষ্মী-নারায়ণ, হরিহর, গোপাল প্রভৃতি দেব-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এই দিন ত্রিবেণী ঘাটের নিকট নানারকম দ্রব্য সম্ভারে সমৃদ্ধ বাঁধা দোকানপাট ব্যতীত উৎসব উপলক্ষে গঙ্গার তীরে এবং রাস্তার দুইপার্শ্বে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রীর আরও কতকগুলি দোকানপাট বসে।

বেণীমাধব ঘাটের বাম পার্শ্বে একটি প্রাচীন মহাশ্মশান আছে। শোনা যায় এই শ্মশানে বহু সাধক তন্ত্রসাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং এখনও বহু সাধক সাধনার নিমিত্তে এই মহাশ্মশানে আসেন। হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এমন কি নিকটবর্তী হাওড়া, বর্ধমান প্রভৃতি জেলাগুলি হইতে অনেকে এই স্থানে শব সৎকার করিতে আসেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিন ব্যতীত নানা যোগে যেমন দশহরা, বারুণী, মাঘীপূর্ণিমা, বিষ্ণুপদী সংক্রান্তি ও গ্রহণ উপলক্ষে পুণ্যস্নানের জন্য দূর-দূরান্ত হইতে এই স্থানে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

ত্রিবেণীর ঘাটের অনতিদূরে বেণীমাধব শিবের প্রাচীন মন্দির আছে এবং এই মন্দিরের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে যথাক্রমে শশিশেখর, বিশ্বেশ্বর, রামেশ্বর, যোগেশ্বর, গঙ্গাধর ও চণ্ডীশ্বর নামে খ্যাত ছয়টি পাকা শিবমন্দির আছে। মন্দির গাত্রের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, উক্ত ছয়টি শিবমন্দির ১৭৬৩ শকাব্দে ২রা মাঘ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বেণীমাধবের মন্দিরে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজন আসেন।

গাজন উৎসবে প্রতি বৎসর পনর হইতে ত্রিশ জন ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীদের মূল সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি লইতে হয়। গাজনে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকেন। ইনিই গাজনে সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করেন। বর্তমান মূল সন্ন্যাসী শ্রীসুকুমার অধিকারী; ইহারা বংশপরম্পরায় মূল সন্ন্যাসীর কার্য করিতেছেন। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে যে-কেহই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রতগ্রহণকারীদের নূতন বস্ত্র পরিধান, গলায় উত্তরীয় বা কাছা ধারণ এবং সংক্রান্তিতিথি পর্যন্ত এক বেলা হবিষ্যান্ন খাইয়া শিবপূজা ও সংযমের সহিত পবিত্র জীবন যাপন করিতে হয়।

২৭শে চৈত্র মহাহবিষ্য উপলক্ষে সন্ন্যাসীগণকে মাত্র তিনটি চালের ভাত—একটি হাতে, একটি পাতে ও একটি দাঁতে কাটিতে হয়। মহাহবিষ্যের দিন হইতে সংক্রান্তি পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ন্যাসীগণ বেণীমাধবের মন্দির হইতে বেণীমাধবের প্রতিনিধি স্বরূপ একটি শিব মূর্তি লইয়া ঢাকঢোলের বাদ্যসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়ান।

২৮শে চৈত্র চড়কপূজা এবং শিবের মাথায় 'ফুল চাপান' অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই দিন মন্দির প্রাঙ্গণে সন্ন্যাসীরা ফুল খেলা, পাটভাঙ্গা প্রভৃতি বিবিধ আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। মূল সন্ন্যাসী এইদিন শ্মশান হইতে আগুন সহ অর্ধদগ্ধ কাঠ আনিয়া তাহা লইয়া মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করেন।

২৯শে চৈত্র অর্থাৎ সংক্রান্তির পূর্ব দিন সাড়ম্বরে মন্দিরে নীলপূজা হইয়া থাকে। এইদিন নীলপূজা দিতে এবং সন্ধ্যায় মন্দিরে নীলের প্রদীপ জ্বালিতে বহু স্ত্রীলোকের সমাগম হয়।

চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে হোম-যজ্ঞসহ মহাধুমধামের সহিত শিবপূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে সন্ন্যাসীগণ চড়ক গাছে পাক্ খাইতেন। বর্তমানে চড়ক গাছে পাক্ খাওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কেবল মাত্র সন্ন্যাসীদের ঝাঁপ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। চড়কতলা বেণীমাধব মন্দির হইতে আধ মাইল দূরে অবস্থিত।

১লা বৈশাখ সন্ন্যাসীরা গলার উত্তরীয় পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যান।

বেণীমাধব সহ উল্লিখিত অন্যান্য শিবলিঙ্গের নিত্য পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বর্তমান সেবায়েত ও পূজারী শ্রীসমর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গাজনে সন্ন্যাসীদের শিবপূজা প্রভৃতি কাৰ্যে ভিন্ন ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য করেন। বর্তমানে গাজনে সন্ন্যাসীদের পুরোহিত শ্রীযতীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী। উৎসবটি প্রাচীন এবং উৎসব উপলক্ষে সর্বজনীন প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

ত্রিবেণীতে অবস্থিত সপ্তগ্রামের শাসনকর্তা জাফর খাঁ-কর্তৃক ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত প্রাচীন মসজিদটি একটি দ্রষ্টব্য বস্তু। ইহা পাঁচটি গম্বুজ বিশিষ্ট এবং হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দ্বারা নির্মিত বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। মহরম এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের অন্যান্য উৎসবাদি উপলক্ষে বহু লোকজনের সমাগম হয়।

জেলা : হুগলী
থানা : মগরা

মেলা বিবরণী

মনসাপূজার মেলা

হোয়েরা গ্রামে মনসার ঝাঁপান উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ভাদ্র সংক্রান্তিতে জি. টি. রোড ও জেলাবোর্ডের রাস্তা ধারে এবং আশেপাশের ব্যক্তি-বিশেষের মোট প্রায় কুড়ি বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

মেলার অন্যান্য বিবরণী এই গ্রামে অনুষ্ঠিত রথযাত্রা মেলার অনুরূপ।

রথযাত্রার মেলা

হোয়েরা গ্রামে নারায়ণজীউর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গ্রামের রথতলায় জি. টি. রোড ও জেলা বোর্ডের রাস্তার দুই ধারে এবং দেবোত্তর ও ব্যক্তিগত মোট প্রায় কুড়ি বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। হোয়েরা, দিগসুই, ইটাচুনা, খন্যান, চাঁপতা, শিকরা, মহীপালপুর, মগরা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাবেশ হয়।

মেলায় মোট সত্তর-আশিটি দোকানপাট বসে এবং কুড়ি পঁচিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর মগরা, তারাবিহারী, বাড়াল, বাহিরনগর, খন্যান, কল্যাণশ্রী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকেন। ময়রা ও তেলেভাজা, মনিহারী, কৃষিযন্ত্রপাতি, তালপাতা ও বাঁশের শিল্পসামগ্রী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, কবিরাজী ঔষধ, বই-ছবি এবং কাটাকাপড়, লুঙ্গি, গামছা ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কবি গান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে। তবে প্রতি বৎসরই নিয়মিত এই সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সম্ভব হয় না।

জেলা : হুগলী
থানা : চন্দননগর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : চন্দননগর (শহরাঞ্চলের অন্তর্গত)।

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতি, তিলি, তাম্বুলী, যুগী, কলু প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বাস।

(খ) চাকুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে চন্দননগরে একটি রেলস্টেশন আছে। চন্দননগরে যাতায়াতের প্রধান রাস্তা গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড। তাহাছাড়া নৌকায় হুগলী নদী দিয়া চন্দননগরে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের অক্ষয়তৃতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তেরদিনব্যাপী "প্রবর্তক সংঘ" কর্তৃক অক্ষয়তৃতীয়া উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় চৌত্রিশ বৎসরের প্রাচীন। অগ্রহায়ণ মাসে রাধাবল্লভ জীউর আঠারদিনব্যাপী স্নানযাত্রা ও নামসংকীর্তন মহোৎসব এবং তিনদিনব্যাপী জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চৈত্র মাসে চড়ক ও প্রাচীন গ্রাম্য দেবী বোড়াই চণ্ডীর বার্ষিক পূজা, এবং গড়বাটীতে চারদিনব্যাপী সাড়ম্বরে সর্বজনীন রাজরাজেশ্বরী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই ফরাসী চন্দননগরে ফরাসী প্রজাতন্ত্র উপলক্ষে উল্লেখযোগ্য ফ্যাস্তা (Fete National) উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। উৎসবটি ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম আরম্ভ হয়। ফরাসীগণ চলিয়া যাওয়ার পর উৎসবটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

(ঙ) অক্ষয়তৃতীয়ার মেলা। বৈশাখ মাসে তেরদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চৌত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মহোৎসবের মেলা (খুন্তীর মেলা)। অগ্রহায়ণ মাসে আঠারদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় আশি-নব্বুই বৎসরের প্রাচীন।

জগদ্ধাত্রীপূজার মেলা। অগ্রহায়ণ মাসে তিন-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

বোড়াই চণ্ডীপুজার মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি বহুপ্রাচীন।

(চ) এই স্থানে ছয়টি শীতলা ও দুইটি পঞ্চানন্দ আছেন। ইহাভিন্ন, প্রাচীন গ্রাম্য দেবী মনসা, বোড়াই চণ্ডী ও ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দির ও খৃষ্টান দিগের একটি গীর্জা আছে।

চন্দননগর বহু প্রাচীন শহর। ব্যবসা-বাণিজ্যে এই স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধশালী। এককালে জলপথে বাণিজ্য চলিত এবং মুসলমান রাজত্বের পূর্বে ও পরে এইস্থানে চন্দন কাঠের ব্যবসায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল। খুব সম্ভব এই কারণে এই স্থানের নাম চন্দননগর হইয়াছিল। তাহা ছাড়া মানচিত্রে চন্দননগরের আকার অর্দ্ধ চন্দ্রের মত দেখা যায় বলিয়াও হয়ত এই স্থানটির নাম চন্দননগর হইয়াছে।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামক সহস্র বর্ষের পুরাতন সংস্কৃত ভূগোল গ্রন্থে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, "খলসানি মহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবর॥" খলসানি বর্তমানে চন্দননগরের অন্তর্গত একটি পল্লীবিশেষ। ১৪১৫ খৃষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের "মনসা-মঙ্গল"-এ ও ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত মুকুন্দরামের "চণ্ডীমঙ্গল" গ্রন্থে চন্দননগরের কোন কোন স্থানের নাম পাওয়া যায়।

১৬৬০ খৃষ্টাব্দে (অর্থাৎ ফরাসীদের এখানে কুঠী ও উপনিবেশ স্থাপনের পূর্বেই) চন্দননগর প্রসিদ্ধ বন্দর হিসাবে গড়িয়া উঠে।

ঐতিহাসিক Malleson- এর মতে ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা এখানে আসেন, এবং অন্যমতে Du Plessis নামক এক ব্যক্তি প্রথম ১৬৭৩-৭৪ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রান্তে কিষণপুর নামক পল্লীতে প্রথম এক খণ্ড প্রায় ১০ আরপাঁ (মতান্তরে ২০ আরপাঁ) পরিমিত জমি ৪০৴ টাকা মূল্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন [১ আরপাঁ (arpent) = প্রায় তিন বিঘা]। এ বিষয়ে বাংলার তদানীন্তন নবাব ইব্রাহিম খাঁ (মতান্তরে শায়েস্তা খাঁ) ফরাসীদের প্রতি বিশেষ আনুকূল্য

প্রদর্শন করেন। Du Plessis তালডাঙ্গায় যে কুঠী নির্মাণ করান, শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাহা পরে গড়বন্দি করা হয় ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে; কিন্তু প্রথমবার ফরাসীরা সেই স্থান পরিত্যাগ করায়, সেই খানেই (বর্তমানে ফ'তউংখানার বাগান) ওলন্দাজদের কুঠী নির্মিত হয়। পরবর্তী কালে এই স্থানে দিনেমাররা ও জার্মানেরা কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে লব্ধ সনদের বলে ফরাসীরা চন্দননগর অধিকার করেন, ফরাসী কোম্পানীর প্রথম অধিনায়ক Monsieur Ardre Buvean Deslande—পূর্ব বৎসরে প্রতিষ্ঠিত হুগলী-ব্যাণ্ডেলের ব্যবসায় ছাড়িয়া মোগল বাদশাহের নিকট হইতে ৪০,০০০৲ মুদ্রা বিনিময়ে চন্দননগর কুঠী স্থাপন ও তথাকার মালিকত্ব লাভের পর ফরাসীরা বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পান। ঐতিহাসিকগণের মতে চন্দননগরে ফরাসীশাসনের এই মূলভিত্তি স্থাপিত হয়। ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে মঁসিয়ে দেলান্দ প্রধানতঃ খলসানি, বোড়ো ও গোলন্দপাড়া—এই তিনখানি গ্রাম লইয়া ফরাসী চন্দননগরের ভিত্তি স্থাপন করেন।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুরের বেতোয়া বরদার রাজা শোভা সিংহের অত্যাচার হইতে শহর রক্ষার জন্য ফরাসীরা এখানে 'কোর্ট দ্য ওঁরল্যা' (Fort de Orleans) নামে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শোভা সিংহের লুণ্ঠন ও অত্যাচার হইতে ফরাসী চন্দননগর রক্ষা পায় নাই। তৎকালে শিল্প ও ব্যবসায়ে ক্রমশঃ চন্দননগর বাংলার সমস্ত বৈদেশিক উপনিবেশের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

একদা বিদেশীরা বাংলার ছেলেমেয়েদের লইয়া যে ব্যবসা করিত তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল এই চন্দননগর। পলাসী যুদ্ধের প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে চন্দননগরে বাংলার ছেলেমেয়েদের লইয়া বেসাতি চলিত। ফরাসী দেওয়ান ইন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী ও ফরাসী গভর্ণর ডুপ্লের সাক্ষরিত ইস্তাহারে ক্রীতদাসের উপর কর স্থাপনের উল্লেখ আছে।

শ্রীলালমোহন গোস্বামী,
প্রবর্তক বিদ্যার্থীভবন, গোস্বামীঘাট,
ও
শ্রীহরিসাধন নিয়োগী, ডিরেক্টর,
কানাইলাল বিদ্যামন্দির,
চন্দননগর।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ২য় খণ্ডে চন্দননগর সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল।

১৯৫৪ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর চন্দননগর মহকুমা গঠিত হয়। চন্দননগর ফরাসী অধিকৃত স্থান ছিল এবং আয়তনে ছোট হইলেও ইহা ঐতিহ্য মুখর। সমগ্র বঙ্গদেশে যখন বৃটিশ-শাসিত ভারতের একটি প্রদেশরূপে ইংরাজ রাজত্বের অধীন, তখন এই ক্ষুদ্র অঞ্চল ফরাসী শাসনের অধীনে এক স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। রাজনীতিক ও শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিতে বাঙ্গালা এই শহরটি তখন বাঙ্গালীর কাছে বিদেশ বলিয়া গণ্য হইলেও প্রাকৃতিক বিন্যাসে বাঙ্গালার এই অবিচ্ছেদ্য অংশ শিল্পে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালীর সহিতই অন্তরসংযোগ যুক্ত ছিল।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে ইংরাজ শাসনের অবসান হইলে বাঙ্গালার এই বিশিষ্ট ফরাসী শহরটির উপর বৈদেশিক শাসনের অবস্থান বাঙ্গালীর অন্তরকে আন্দোলিত করে বলিয়া চন্দননগরের মুক্তি আন্দোলন বহ্নিমান হইবার আগেই ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের ২রা মে ফরাসী সরকার চন্দননগরকে ভারত সরকারের নিকট হস্তান্তরিত করেন।

পুরাতন চন্দননগরের গৌরবময় স্মৃতিচিহ্ন এখন অতি অল্প যুক্ত আছে। যাহা আছে তন্মধ্যে কোম্পানীর সময়ের গোরস্থান, সুবৃহৎ জলাশয় 'লালদীঘি', ১৭২০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত কনভেণ্ট সংলগ্ন

গির্জা, শ্রীশ্রীনন্দদুলাল মন্দির, শ্রীশ্রীদশভুজা দেবীর মন্দির, তায়ংখানা বাগানের ডাচ নির্মিত ভজনাগারের ধ্বংসাবশেষ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এখানকার ফরাসী জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা, যাদুঘোষের রথ ও বারোয়ারীর সুপ্রসিদ্ধ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা বহু দিনের। ফরাসী প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার দিনটি স্মরণীয় করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই ফ্যাস্তার উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। ফরাসীগণ চলিয়া যাইবার পর এই উৎসবটি এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

সমস্ত সহরটি বহু পল্লীতে বিভক্ত। তন্মধ্যে গোন্দলপাড়া, বারাসাত, দিনেমারডাঙ্গা, হাটখোলা, হাঁজিনগর, মানকুণ্ডু, দিগলসপটী, বড়বাজার, বাগবাজার, লালাবাগান, উড়পাড়া, হালদারপাড়া, ভাকুণ্ডা, খলসানি, কলুপুকুর, নাড়ুয়া, বোড়, সরিষাপাড়া, গোস্বামীঘাট, কাবারিপাড়া, বক্সীরবেড়, চাঁপাতলা, বোড়াই চণ্ডীতলা, হরিদ্রাডাঙ্গা, সুরের পুকুর, কাঁটাপুকুর প্রভৃতিই প্রধান।

এখানকার গ্রাম্যদেবতা শ্রীশ্রীবড়াইচণ্ডী ও শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী অতি প্রাচীন ও জাগ্রত।

১৪ই জুলাইয়ের জাতীয় উৎসব ফ্যাস্তা, স্বর্গীয় যাদবেন্দু ঘোষ প্রতিষ্ঠিত "যাদুঘোষের রথ," রাজেন্দ্র নাথ গোস্বামী (গাঙ্গুলী) প্রতিষ্ঠিত খুস্তির মহোৎসব নামক মেলা এবং সর্বোপরি শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার ধুম এখানকার বিখ্যাত বাৎসরিক উৎসবরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। যাদুঘোষের উপর জগন্নাথদেবের স্বপ্নাদেশ হওয়ায় এই রথ প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া একটা কিংবদন্তী আছে। এখানে যেরূপ বৃহদায়তনের সুন্দর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা গঠিত হইয়া মহাসমারোহে ৩ দিন পূজা হইয়া বিসর্জ্জন হইয়া থাকে, তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। উপস্থিত এরূপ ঠাকুর বহু পুরাতন। চাউল-ব্যবসায়ীদের দ্বারা উহা প্রতিষ্ঠিত হইলেও, প্রথম প্রতিষ্ঠাতাকে এবং কোন্ সময় হইতে এই পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় না। শুনা যায়, কাপড়পটীর ঠাকুরের প্রতিষ্ঠাতার নাম শ্রীধর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি একজন বস্ত্র-ব্যবসায়ী ছিলেন। প্রায় শত বৎসর পূর্বে তিনি চাঁদা সংগ্রহ করিয়া প্রথম এই পূজা আরম্ভ করেন। পূর্বে শহরের উত্তরাংশে গোন্দলপাড়া ও ভাঁশপুকুর নামক স্থানে আর দুইখানি বড় বড় ঠাকুর হইত।

জগদ্ধাত্রী পূজার ন্যায় চন্দননগর গড়বাটীতে রাজরাজেশ্বরী পূজা বহুদিন হইতে অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই পূজা সম্বন্ধে ১৯৬০ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ আনন্দ-বাজার পত্রিকায় যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও উত্তর চন্দননগর গড়বাটীতে রাজরাজেশ্বরী পূজার আয়োজন করা হইয়াছে। সর্বজনীন ভিত্তিতে রাজরাজেশ্বরীর মাতার পূজা এতদঞ্চলে একমাত্র এখানে হইয়া থাকে এবং এই উপলক্ষে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে প্রচুর জনসমাগম হয়। পূজা শুক্রবার সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ হইয়া সোমবার দশমী পর্যন্ত চলিবে।

চড়ক, পাটভাঙ্গা, স্নানযাত্রা, দ্বাদশ গোপাল, ঝাঁপান প্রভৃতিতেও পূর্বে বেশ লোক সমাগম হইত, এখন পর পর কমিয়াই যাইতেছে।

[পৃঃ ৯০৯—১০০২]

বিশেষ দ্রষ্টব্য : চন্দননগরের জগদ্ধাত্রীপূজা সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

জেলা : হুগলী
থানা : চন্দননগর

উৎসব বিবরণী

অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব

চন্দননগরের প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসবটি ধর্মপ্রাণ সাধক শ্রীমতিলাল রায় কর্তৃক প্রবর্তিত। এই পুণ্য তিথিতে প্রবর্তক সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা ১৩৩০ সনে বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে রথের ন্যায় এগার চূড়া বিশিষ্ট সত্তর ফুট উচ্চ প্রবর্তক মন্দিরে স্বুবর্ণ ওঁঙ্কার সংযুক্ত একটি রজত ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়া এই উৎসবের শুভারম্ভ হয়। এই মন্দিরটি বহু প্রাচীন এবং সুদৃঢ়াকারে নির্মিত। প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে মন্দিরটি কালীমন্দির বলিয়া সর্বসাধারণের নিকট পরিচিত ছিল এবং মন্দিরের কালীমূর্তিটি বহুকাল যাবত অনাদৃত অবস্থায় থাকিবার পর কোন অজ্ঞাত ব্যক্তির দ্বারা অপসারিত হয়। তৎপর এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন পতিত জমি প্রবর্তক সঙ্ঘের হস্তগত হয়। সঙ্ঘগুরু মন্দিরে রজত ঘট স্থাপন করতঃ সমাজকল্যাণমূলক ও ধর্মমূলক কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই সঙ্ঘের পরিচয় ও কার্যকলাপ সর্বজনবিদিত। চৌদ্দ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৩৪৪ সালে এগারই আষাঢ় উক্ত রজত ঘটটি (স্বুবর্ণ ওঁঙ্কার সংযুক্ত) অপহৃত হয়। তৎপরিবর্তে ১৩৪৫ সনে বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া তিথির দিনে মন্দির গাত্রে ঘট অঙ্কিত একটি বিরাট মর্মরফলক প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎপর ১৩৫০ সনে উক্ত তিথিতে মন্দিরে ত্রি-স্তর বেদীর উপর ধাতুনির্মিত প্রণববেষ্টিত প্রস্তরময় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এই বিগ্রহের পূজাই অক্ষয় তৃতীয়ার উৎসব নামে পরিচিত। শাস্ত্র বর্ণিত এই তিথিটি সত্যযুগের প্রারম্ভকাল, মহাশূন্য দিবস, পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অবতরণ, ভৃগুনন্দন পরশুরামের জন্ম, শুভ শস্যবীজ বপন প্রভৃতি বিশেষত্ব থাকায় উৎসবের দিনটি এই তিথিতেই ধার্য হইয়াছে। তদবধি প্রতি বৎসর বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ পূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত তেরদিনব্যাপী শ্রীবিগ্রহের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উৎসব আরম্ভের পাঁচদিন পূর্ব হইতে সঙ্ঘ মন্দিরে পুরশ্চরণ, হোম, বেদ ও স্তোত্রপাঠ এবং নানাবিধ শাস্ত্র বিষয়ক আলোচনা হইয়া থাকে। উৎসবের দিন অর্থাৎ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন বিগ্রহের ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ভোগ, আরতি প্রভৃতি যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথির দিন প্রাতঃকালে সঙ্ঘের স্বামীজী, সঙ্ঘগুরু এবং অন্যান্য ভক্তগণ মন্দিরে সমবেত হন এবং যজ্ঞের পর স্নান পর্ব সমাপন করেন। এই দিন অপরাহ্নে ভক্তগণের প্রীতি সম্মেলনের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

উৎসব উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শিল্পকলা প্রদর্শনী, সমাজকল্যাণমূলক প্রচার কার্য ও নানাবিধ অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ভারতের নানা স্থান হইতে জ্ঞানীগুণী ও দেশনেতাদের এক বিরাট সমাবেশ হয় এবং বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত ভক্ত ও লোকজনের সমাগম হয়।

চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে গত ইংরাজী ২০শে মে ১৯৫৯ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। নিম্নে উহা লিপিবদ্ধ করা হইল :

"চন্দননগর, ১৭ই মে—ত্রয়োদশ দিবসব্যাপী সপ্তত্রিংশ বর্ষীয় শ্রীশ্রীঅক্ষয় তৃতীয়া উৎসব গত ২৬শে বৈশাখ তারিখ হইতে স্থানীয় প্রবর্তক সঙ্ঘ শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে আরম্ভ হইয়াছে। সকাল সাড়ে চার ঘটিকা হইতে রাত্রি সাড়ে আট ঘটিকা পর্যন্ত প্রাথমিক দিনের অনুষ্ঠান অনাড়ম্বর কিন্তু ভাবগম্ভীর পরিবেশের মধ্যে চলে। প্রাতঃকালীন নগর পরিক্রমা, সমবেত উপাসনা, সাংস্কৃতিক পতাকা উত্তোলন এবং তৎপরে ষোড়শোপচারে শ্রীবিগ্রহের পূজা, হোম, বৈদিক যজ্ঞ, নাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ এবং সান্ধ্যকালীন সমবেত উপাসনান্তে অনুষ্ঠিত উৎসব-সভায় সূচনা হয়। প্রবর্তক নারী মন্দিরের কন্যাগণ কর্তৃক উদ্বোধন সঙ্গীত গীত হইলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী মঙ্গলাচরণ পাঠ করেন। অতঃপর শ্রীঅরুণ চন্দ্র দত্ত সভাপতি বরণ

এবং উৎসব পরিচয় প্রদান করিলে ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী বেদানন্দজী মহারাজ সভাপতির অভিভাষণ দান প্রসঙ্গে সর্বপ্রথমে সঙ্ঘগুরু স্বর্গত মতিলাল রায়ের জীবনব্যাপী সাধনার উল্লেখ করেন এবং অক্ষয় তৃতীয়ার মাহাত্ম্য কীর্তন বর্ণনাচ্ছলে ভারতীয় দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব আলোচনা করেন।

দ্বিতীয় দিনের কথকতা অনুষ্ঠানে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী জগদ্বীশ্বরানন্দজী মহারাজ 'বাংলার শাক্ত কবি ও শাক্ত সঙ্গীত' বিষয়ে সুললিত ভাষায় বক্তৃতা দেন।

তৃতীয় দিন রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠানে শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্র সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে একক ভাষণ প্রদান করেন।

চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে দেবী মাহাত্ম্য ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলা বিষয়ে আলোচনা করেন আকাশবাণীর কথক পণ্ডিত শ্রীসুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী।

উল্লেখ থাকে যে, সঙ্ঘগুরুর সাম্প্রতিক মহাপ্রয়াণের জন্য এই বৎসর অক্ষয় তৃতীয়া উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী ও স্বদেশী মেলার কার্যক্রম বর্জন করা হইয়াছে। তবে এই-বার একটি নূতন কার্যক্রম সংযোজিত হইয়াছে। সঙ্ঘ গুরুর কর্ম ও ধর্ম—জীবনের বিভিন্ন সময়ের আলেখ্যাবলীর একটি সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে।"

(শ্রীচৈতন্য মহা প্রভু)

চন্দননগরে শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব সম্পর্কে গত ইংরাজী ৩রা এপ্রিল ১৯৫৯ তারিখে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয় :—

চন্দননগর, ৩০ শে মার্চ—গত ১০ই চৈত্র মঙ্গলবার পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব উৎসব ভদ্রেশ্বরস্থ সারদা পল্লী হরিসভার ভক্তবৃন্দ কর্তৃক উদযাপিত হয়। সকাল ৬টায় শতাধিক ভক্ত শ্রীহরিনাম সংকীর্তন দ্বারা পল্লী পরিক্রমা করেন। বেলা ১১টায় যথারীতি পূজার্চনা ও ভোগরাগ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় এবং তৎপরে দরিদ্রনারায়ণ এবং ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ হয়। বৈকাল ৩টায় শ্রীমতী অঞ্জলি বন্দোপাধ্যায় কয়েকখানি ভক্তিরসসিক্ত সঙ্গীত পরিবেশন করেন। অতঃপর চন্দননগরের প্রবীণ শিক্ষাব্রতী শ্রীকাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় এক ভক্ত সমাবেশে সভাপতিরূপে ভাষণ দান প্রসঙ্গে বলেন যে, মহাপ্রভু প্রেমের অবতাররূপে জীবের উদ্ধারের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আচণ্ডাল প্রেম বিতরণ করিয়া তিনি মানবসত্বাকে অমৃতের পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। শ্রীনরেন্দ্র নাথ বর্মণ প্রধান অতিথিরূপে মহাপ্রভুর প্রেমাদর্শের বর্ণনা দেন।

কালীপূজা

"১লা অগ্রহায়ণ—চন্দননগর মহকুমায় আরক্ষবাহিনী প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও উৎসাহ উদ্দীপনার সহিত কালীপূজা অনুষ্ঠান করে। হুগলীর পুলিশ সুপার শ্রী এন, আর বসু অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। বাহিনীর সদস্যগণ কর্তৃক এই উপলক্ষে 'টিপু সুলতান' নাটক সাফল্যের সহিত অভিনীত হয়।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

জগদ্ধাত্রীপূজা

পশ্চিমবঙ্গের জগদ্ধাত্রী পূজার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের কথা উল্লেখ করিতে হয়। কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার বিভিন্ন স্থানে জগদ্ধাত্রী পূজা হয় বটে তবে নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর এবং হুগলী জেলার চন্দননগরের মত এমন স্বতঃস্ফূর্ত সর্বজনীন উৎসব বাংলাদেশের আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের এই উৎসব আজ একটি উল্লেখযোগ্য আঞ্চলিক লোক উৎসবরূপে পরিচিত।

তন্ত্রে জগদ্ধাত্রী পূজার কথা উল্লেখ থাকিলেও বাংলা-দেশে ব্যাপকভাবে এই পূজার প্রচলনের কথা শোনা যায় না। অনেকের মতে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে প্রথম এই পূজার প্রচলন করেন। কাহারও মতে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কার্যোপলক্ষে প্রায়ই চন্দননগরে আসিতেন এবং এই স্থানের জগদ্ধাত্রী-পূজার আড়ম্বরে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং রাজবাটীতে পূজার আয়োজন করেন। আবার অনেকের মতে মহারাজ

কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপৌত্র মহারাজ গিরিশচন্দ্র কর্তৃক কৃষ্ণনগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেই হিসাবে বিচার করিলে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রাচীনত্ব আড়াই শত বৎসর হইতে তিন শত বৎসরের বেশী হয় না।

জগদ্ধাত্রী পূজা চন্দননগরের অন্যতম প্রধান উৎসব। শারদীয়া দুর্গাপূজার ন্যায় চন্দননগরে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথি হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী মহা সমারোহে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং দশমী তিথিতে দেবী প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হয়।

চন্দননগরের তুলনায় কৃষ্ণনগরের জগদ্ধাত্রী পূজার সংখ্যা অনেক বেশী হইলেও চন্দননগরের পূজার জাঁকজমক ও আড়ম্বর কৃষ্ণনগরের তুলনায় অনেক বেশী। বিশেষ করিয়া এইস্থানে যেরূপ বিশাল দেবীমূর্তি নির্মাণ করা হয় এইরূপ দেবী মূর্তি অন্যত্র কোথাও দেখা যায় না। এই স্থানে প্রায় প্রতিটি পূজামণ্ডপে পনের হইতে কুড়ি হাত পর্যন্ত দীর্ঘ সুন্দর জগদ্ধাত্রী প্রতিমা নির্মাণ করা হয়। চতুর্ভুজা দেবী সর্বত্রই সিংহবাহিনী, সিংহের পদতলে হস্তী থাকে। মূর্তির গড়ন সাবেকী ধরণের অর্থাৎ লম্বা গঠনের মুখাকৃতি; আকর্ণ বিস্তৃত চক্ষু এবং চতুর্হস্তে যথাক্রমে শঙ্খ, চক্র, বাণ ও ধনুক শোভা পাইতেছে। মৃৎ শিল্পীদের মূর্তি নির্মাণ কৌশল বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ইহাভিন্ন চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ দেবীর ডাকের সাজের গহনা ও প্রতিমার পিছনের সোলার নির্মিত সুন্দর চালচিত্রটি। স্থানীয় এবং কাটোয়ার মালাকার শিল্পীদের সোলার তৈয়ারী নিখুঁত সুন্দর বস্ত্রে, ওড়নায়, অলঙ্কারে ও মুকুটে দেবী মূর্তি অপূর্ব শোভাধারণ করেন। সুসজ্জিত হোগলার তৈয়ারী সুবৃহৎ পূজা মণ্ডপগুলির আলোকসজ্জাও দর্শকদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

এই বৎসর চন্দননগরের সর্বজনীন জগদ্ধাত্রী পূজাগুলির মধ্যে দীঘিধার, পালপাড়া, নাড়ুয়া, গোস্বামীঘাট, বিদ্যালঙ্কার কাপড়পটি, নীচেপটি, বাজার, লক্ষ্মীগঞ্জ চৌমাথা বাগবাজার, বাগবাজার দিনুগুড়ীর মোড়, ফটকগোড়া, খলিসানী, হালদারপাড়া, বেশোহাট, বাবুরবাজার, ভদ্রেশ্বর তেলেনীপাড়া, চন্দ্রবাবুরবাজার, লিচুতলা, বারাসত তেমাথা, চারমন্দিরতলা, মোরনরোড, মনসাতলা, বারাসত গড়েরধার, হাটখোলা, চাউলপটি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাভিন্ন ব্যক্তি-বিশেষের গৃহেও কয়েকটি জগদ্ধাত্রী পূজা হয়। বারোয়ারী পূজাগুলির মধ্যে কাপড়পটি, হালদারপাড়া, লিচুতলা এবং বাগবাজার দিনুগুড়ীর মোড়ের উৎসবগুলি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। লিচুতলা ও দিনুগুড়ীর মোড়ের উৎসব দুইটি যথাক্রমে ১৫০ ও ১১৭ বৎসরের প্রাচীন বলিয়া জানা যায়।

এই উৎসব উপলক্ষে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং হাওড়া, বর্ধমান চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় দেড় লক্ষ নরনারীর সমাগম হয়। পূজার কয়দিন চন্দননগরবাসী প্রায় প্রতিটি গৃহস্থের বাড়ী আত্মীয়-স্বজনে, বন্ধু-বান্ধবে পূর্ণ থাকে। যাত্রীদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত মোটরবাস এবং নিয়মিত ট্রেন ব্যতীত বিশেষ ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসব উপলক্ষে চন্দননগরের সরকারী অফিস আদালত ও স্কুল-কলেজগুলি বন্ধ থাকে।

পূজার তিনদিন গভীর রাত্রি পর্যন্ত হাজার হাজার নরনারী বিভিন্ন পূজামণ্ডপে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রতিমা দর্শন করিয়া বেড়ান। রাস্তার আশেপাশে বিভিন্ন রকমের খাবার ও মনিহারী দ্রব্যাদির কিছু কিছু দোকানপাট বসে এবং চাউলপটির পাকা পূজামণ্ডপের নিকট একটি ছোটখাট মেলা বসে।

দশমী তিথিতে প্রতিমা বিসর্জন প্রত্যক্ষ করিবার জন্য অপরাহ্ণ হইতেই গঙ্গার তীরে এবং শোভাযাত্রার নির্দিষ্ট পথের দুইধারে, গৃহের ছাদে ও আলসে হাজার হাজার দর্শক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে দেখা যায়। এই দিন সন্ধ্যা হইতেই একে একে বিসর্জনের শোভাযাত্রা বাহির হইতে আরম্ভ করে। প্রতিটি পূজামণ্ডপ হইতে বিবিধ বাদ্যভাণ্ডসহ বিচিত্র আলোক সজ্জায় সজ্জিত বিশালকায় প্রতিমাগুলিকে লরীতে তুলিয়া ধীরে ধীরে শহরে পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গার ঘাটের দিকে অগ্রসর হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আবার বিসর্জন মিছিলের সহিত প্রদর্শনীর আয়োজন করেন—লরীর উপর সাজান

হয় নানারকম মাটির তৈয়ারী মডেল। এই বৎসর চাউলপটি প্রদর্শনী বার করিয়াছিলেন পার্থসারথি, শিবাজী, অকালবোধন এবং অন্নপূর্ণার মূর্তি। লক্ষ্মী চৌমাথার পূজা কমিটি বার করিয়াছিলেন বেলুড়মঠ, কালীপূজারত শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের মূর্তি। শোভাযাত্রার পথে স্থানে স্থানে নানারূপ আতস বাজী পোড়ান হয়। বাস্তবিকই এই শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিবার বস্তু। মধ্য রাত্রির পর একে একে গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন পর্ব আরম্ভ হয় এবং শেষ হইতে রাত্রি প্রায় ভোর হইয়া যায়।

উৎসবের কয়দিন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ও যানবাহন নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে বিভিন্ন পূজামণ্ডপে যাত্রা, থিয়েটার ও জলসার আয়োজন করা হয়।

উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত চন্দননগর শহরের বিভিন্ন স্থানে বিশ্বকর্মাপূজা, দুর্গাপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা সরস্বতীপূজা, অন্নপূর্ণাপূজা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়।

মহোৎসব (খুন্তীর মেলা)

চন্দননগর গোস্বামী ঘাটস্থ জগদীশতীর্থে প্রতিষ্ঠিত একটি শ্রীমন্দিরে প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথি হইতে কৃষ্ণাদশমী তিথি পর্যন্ত রাধাবল্লভ জীউর বার্ষিক পূজা ও সাড়ম্বরে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা খুন্তীর মহোৎসব নামে প্রসিদ্ধ। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে পোলবা থানার গোস্বামী-মালিপাড়ার গোস্বামী খঞ্জ ভগবান আচার্য বসবাস করিতেন। তথায় এখনও তাঁহার বংশধরগণ বসবাস করিতেছেন। এই গোস্বামী বংশ রাঢ়ী শ্রেণীর কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। শোনা যায়, খঞ্জ ভগবান আচার্য গোস্বামী-মালিপাড়া হইতে প্রত্যহ বারো মাইল পথ হাঁটিয়া চন্দননগর গোস্বামী ঘাটে স্নান করিতে আসিতেন। কিন্তু বার্ধক্যবশতঃ তাঁহার শরীর জীর্ণ হইয়া পড়িলে প্রতিদিন এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া গঙ্গাস্নান করিতে আসা কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। অথচ স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভ জীউকে ত্যাগ করিয়া গঙ্গার তীরে আসিয়া বসবাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা ছিল না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি বড়ই কাতর হন। এই সময় তাঁহার কুলদেবতা গোস্বামীঘাটে উক্ত বিগ্রহ স্থাপন করিয়া প্রত্যহ গঙ্গা স্নান অব্যাহত রাখিতে স্বপ্নাদেশ করেন। কিন্তু গোস্বামী প্রভু কুলদেবতাকে স্থানান্তরিত করিতে দুঃখবোধ করেন; পুনরায় রাধাবল্লভ জীউ স্বপ্নাদেশে জানান যে, গোস্বামী-মালিপাড়ার জনৈক ময়রা যে পুষ্করিণী খনন করিতেছে, সেই পুষ্করিণী খনন কালে একটি কৃষ্ণমূর্তি পাওয়া যাইবে। সেই মূর্তি চন্দননগর গোস্বামী ঘাটে প্রতিষ্ঠা করিয়া তিনি যেন প্রত্যহ গঙ্গাস্নান ও রাধাবল্লভ জীউর সেবা, পূজা করেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে কৃষ্ণমূর্তি প্রাপ্তির পর একটি রাধিকা মূর্তি নির্মাণ করিয়া খঞ্জ ভগবান আচার্য চন্দননগরে ভাগীরথীকূলে প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই স্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তদবধি প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণ মাসে রাধাবল্লভ জীউর বার্ষিক পূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে বহু ভক্ত ও বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের সমাবেশ ঘটে।

ভগবান আচার্য প্রভুর আদেশক্রমে তাঁহার সন্তানগণ এবং বংশধরগণ রানাঘাট অঞ্চলের যশড়া নিবাসী ৺প্রভুপাদ জগদীশ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুদেবের নামে এই মহোৎসব ও তদুপলক্ষে মেলাটি উৎসর্গ করেন। ফলে চন্দননগরে বর্তমান গোস্বামীঘাট পল্লীটি "জগদীশতীর্থ" নামে সুপরিচিত হয়।

জগদীশ গোস্বামী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর একজন প্রিয় পার্ষদ ছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি একখানি "শ্রীখুন্তী" (হরিনাম সংকীর্তনের শোভাযাত্রার পুরাভাগে একটি দণ্ডের উপর পিতল বা রৌপ্য নির্মিত চক্রবত বস্তু) খঞ্জ ভগবান আচার্য প্রভু বংশীয় সন্তানদের হস্তে অর্পণ করেন। প্রবাদ আছে যে, "শ্রীখুন্তী" লইয়া ভগবান আচার্যের এক পুত্র শ্রীপাট খড়দহে অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাটে আসিয়াছিলেন, তাহাতে নিত্যানন্দ পুত্র অমিত তেজস্বী বীরভদ্র গোস্বামী প্রভু উক্ত খুন্তী দেখিয়া রহস্য করেন এবং উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করেন। ইহাতে আচার্য গোস্বামীর পুত্র শ্রীখুন্তীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া

বীরভদ্র গোস্বামীকে জানান যে, এই খুন্তী স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীহস্ত স্পর্শিত এবং মহিমাক্রমে অদ্য নিশাকালেই শ্রীখুন্তী ভাসিয়া জগদীশ ঘাটে অবশ্যই পৌছাইবে আশা করেন। সত্য সত্যই জগদীশতীর্থ ঘাটে শ্রীখুন্তী আসিয়া পৌছায় এবং তিনি সগৌরবে উৎফুল্ল বদনে শ্রীখুন্তী লইয়া নাম সংকীর্তন করিতে করিতে গোস্বামী-মালিপাড়ায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেই হইতে উৎসবটি এবং তদুপলক্ষে মেলাটি "শ্রীখুন্তীর মেলা" নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তদবধি প্রতি বৎসর অগ্রহায়ণী পূর্ণিমা তিথির দিনে "শ্রীখুন্তী" লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে হরিনাম সংকীর্তনের দল নাম সংকীর্তন করিতে করিতে নগর পরিভ্রমণের পর জগদীশ তীর্থঘাটে আসিয়া গঙ্গার জলে স্পর্শ করিবার পর গোস্বামী-মালিপাড়ায় ফিরিয়া আসেন এবং মহাসমারোহে মালসা ভোগ ও পূজাদি সম্পন্ন হয়।

এই খুন্তীর মহোৎসবটি নির্দিষ্ট গ্রাম বা শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রায় সকল শ্রেণীর হিন্দু নর-নারী শাক্ত-বৈষ্ণব নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করেন। পূর্ণিমার দিন সকালে "মালসা ভোগ" অর্থাৎ চিড়ামুড়কী, দধি, ফল, মিষ্টান্ন প্রভৃতি সহযোগে পূজা দেন এবং প্রসাদ গ্রহণ করেন। আঠারদিনব্যাপী উৎসবের প্রতিদিন শ্রীবিগ্রহ মন্দির হইতে মেলাস্থানের সুসজ্জিত মঞ্চে স্থাপন করা হয় এবং পূজা আরতির পর রাত্রি দশ ঘটিকায় মন্দিরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। উৎসবের শেষ দিন অর্থাৎ কৃষ্ণাদশমী তিথির দিন শ্রীবিগ্রহকে শ্রীমন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। তৎপর যথারীতি পূজা ও মালসা ভোগ দেওয়া হয় এবং এই দিনেই "শ্রীখুন্তা" লইয়া শেষ বারের মত নাম সংকীর্তন সহকারে নগর পরিভ্রমণান্তে মালসা ভোগ ও সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের পর উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জেলা : হুগলী
থানা : চন্দননগর

মেলা বিবরণী

অক্ষয় তৃতীয়ার মেলা

চন্দননগরে প্রবর্তক সঙ্ঘের অক্ষয় তৃতীয়া উপলক্ষে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়া তিথি হইতে তেরদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। গত প্রায় চৌত্রিশ বৎসর যাবত মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

চন্দননগর ও আশেপাশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু লোকজন মেলা দেখিতে আসেন এবং ময়রা, মনিহারী, বাসনকোসন, পাথরের থালা, গ্লাস এবং সূচীশিল্প ও ফটো-তোলার দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সঙ্গীতানুষ্ঠান, থিয়েটার ও যাত্রাভিনয়, কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সমাজ উন্নয়নমূলক বিবিধ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী আয়োজন করা হয়।

মহোৎসবের (খুস্তীর) মেলা

চন্দননগর গোস্বামী ঘাট বা জগদীশ তীর্থঘাট নামক স্থানে প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি হইতে কৃষ্ণাদশমী তিথি পর্যন্ত আঠার দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় আশী-নব্বই বৎসরের প্রাচীন এবং এই অঞ্চলে ইহা খুস্তীর মেলা নামে খ্যাত।

হুগলী জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে এবং কলিকাতা ও নিকটবর্তী অন্যান্য জেলা হইতে মোটরবাস, ট্রেন, নৌকা, গরুরগাড়ীতে ও হাঁটিয়া বহু যাত্রী আসিয়া থাকেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ভিন্ন কলিকাতার কিছু ব্যবসায়ী মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। ইহাতে শতাধিক দোকান বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানপাটের ময়রা ও তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাছাড়া তামা-পিতল ও কাঁচের জিনিসপত্র ও বাসন কোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কবিরাজী ও হাকিমী ঔষধপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির দোকান, মাটির হাড়িকুড়ি ও খেলনার দোকান, বাঁশের ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ও চ্যাঙ্গারীর দোকানপাটও মেলায় দেখা যায়। বিক্রেতা-গণের নিকট দান ও তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক, যাত্রা, থিয়েটার, কথকথা, কবিগান, ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় একটি সখের থিয়েটারের দল আছে। এই দলই প্রতি বৎসর থিয়েটার করিয়া থাকে। বাঁকুড়া নিবাসী রামায়ণ গায়ক প্রতি বৎসর মেলায় আসেন।

জেলা ঃ হুগলী

থানা ঃ হরিপাল

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ নওপাড়া। ২৯।২৬৩'৫১।১০৫।৫৭২

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, হাড়ী, বাউরী, রুইদাস।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে হাওয়াখানা অথবা পিয়াসাড়া রেলস্টেশন হইতে অহল্যাবাঈ রোড ধরিয়া পূর্বদিকে দেড় মাইলের মধ্যে গ্রামটি অবস্থিত।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথি হইতে স্নানযাত্রা পর্যন্ত আট-নয়দিন যাবত মরাই মনসা দেবীর পূজা সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে আট-নয় দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসার মন্দির আছে।

শ্রীরঘুনাথ সিংহ, কৃষিজীবি,
গ্রামঃ নওপাড়া,
পোঃ বাসুড়ী, হুগলী।

২। গ্রাম ঃ বাসুড়ী। ৩১।৩১৮'৯৮।১০০।৬৫১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, বাউরী, বাগ্দী, তাম্বুলী। গ্রামে পাচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-আমতা মার্টিন রেলপথে হাওয়াখানা-ও পিয়াসাড়া রেলস্টেশন দুইটি গ্রাম হইতে যথাক্রমে অর্ধ ও এক মাইল দূরে অবস্থিত। 'ওল্ড বেনারস রোড' হইতে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা ধরিয়া এই গ্রামে পৌছানো যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হরিসভায় মহোৎসব এবং আশ্বিন মাসে ভবানী দেবীর উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মহোৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামের মধ্যস্থলে অবস্থিত স্থানীয় হরিসভার একটি আটচালা ঘর, ভবানী মন্দির, তিনটি শিবমন্দির এবং ওলাই চণ্ডীর নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীকার্তিক চন্দ্র রক্ষিত, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ বাসুড়ী,
হুগলী।

৩। গ্রাম ঃ দ্বীপা (ডিপা)। ৪১।২২৪'৯২।১২৪।৮০৭

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্গোপ, মাহিষ্য, কংস-বণিক, সাহা, জেলে, দুলে, মুসলমান ইত্যাদি।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ঘোষপাড়া, বামুনপাড়া, শুঁড়িপাড়া, তাঁতীপাড়া, কাঁসারীপাড়া, কুলিপাড়া ও খেঁড়েপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে হাওড়া-তারকেশ্বর শাখায় হরিপাল রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। গ্রামের মধ্য দিয়া ওল্ড বেনারস রোড ও ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে গৌরগোপাল বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং নয়দিনব্যাপী চলে। ইহাভিন্ন, শ্রাবণ মাসে ঝুলন-যাত্রা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গৌরগোপাল মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে শোনা যায় যে, শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তর্ধানের পর নবমূলের একমূল শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী গৌরাঙ্গ বিরহে কাতর হইয়া স্বহস্তে একটি গৌরগোপাল মূর্তি নির্মাণ করিয়া এই নির্জন স্থানে একটি অশোকবৃক্ষের নীচে নিভৃতে সাধন-ভজন করিতেন। তিনি দেহরক্ষা করিলে পর বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত নামে তাঁহার জনৈক ভক্ত এই স্থানে আসিয়া

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও উক্ত বিগ্রহের নিত্য সেবাপূজা ও উৎসব-পার্বণাদির ব্যবস্থা করেন। প্রাচীন অশোক বৃক্ষটি অদ্যাপি বিদ্যমান।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে নয়দিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় চারশত বৎসরের প্রাচীন।

ঝুলনযাত্রার মেলা। শ্রাবণ মাসে একদিন।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে একদিন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন মন্দিরে গৌরগোপাল নামে খ্যাত শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি এবং নিত্যানন্দ, রাধাবিনোদ, শ্রীরাধিকা মূর্তি ও শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরের সম্মুখে একটি প্রাচীন জীর্ণ রাসমঞ্চও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাভিন্ন, গ্রামে শিব, শীতলা ও ওলাইচণ্ডীর মূর্তি আছে।

কৃষ্ণানন্দপুরী যে সময় এই স্থানে সাধন-ভজন করিতেন সেই সময় এই স্থানটি গভীর বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও লোক বসতিহীন ছিল। পরে এই স্থানে লোক বসতি শুরু হয় এবং কালক্রমে ইহা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হয়। ম্যালেরিয়া আক্রমণের ফলে বর্তমানে গ্রামের পূর্বশ্রী বহুলাংশে হ্রাস পাইয়াছে।

অতীতে এই গ্রামের তিনদিক বেষ্টন করিয়া দামোদর নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া এই স্থানটিকে দ্বীপের ন্যায় দেখাইত; সম্ভবতঃ সেই কারণে গ্রামের নাম 'দ্বীপ' হইয়াছিল এবং দ্বীপ হইতে বর্তমানে দ্বীপায় পরিণত হইয়াছে। সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে গ্রামটির নাম ডিপা বলিয়া উল্লেখ আছে।

শ্রীবিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়, ব্যবসায়,
গ্রামঃ দ্বীপা, পোঃ দলপতিপুর,
হুগলী।

দ্বীপা নামক গ্রাম হরিপাল হইতে মাত্র চার মাইল দূরে অবস্থিত একটি নগণ্য স্থান হইলেও মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী এইস্থানে হরিনাম বিতরণ করিয়া এই অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার-পূর্বক মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করায়, বৈষ্ণবদিগের নিকট ইহা অন্যতম পুণ্য পবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়া খ্যাত। কৃষ্ণানন্দপুরী হইতেই দ্বীপা গ্রামের ইতিহাস আরম্ভ হয়।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্বে এই স্থান জঙ্গলাবৃত ছিল এবং ইহার তিনদিক বেষ্টন করিয়া কৌশিকী, বিমলা ও দামোদর নদী প্রবাহিত হইত বলিয়া স্থানটিকে দ্বীপের ন্যায় দেখাইত এবং সেইজন্যই ইহার 'দ্বীপ' নামকরণ হয়। পরবর্তীকালে 'দ্বীপ' নামটি 'দ্বীপায়' পরিণত হইয়াছে।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, মহাপ্রভুর তিরোধানের পর শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরী এই দ্বীপের জঙ্গলে আগমন করিয়া নিজ হস্তে তাঁহার একটি সুন্দর গৌরগোপাল বিগ্রহ প্রস্তুত করেন এবং উক্ত বিগ্রহের সেবা করিয়া তিনি বিরহ যন্ত্রনা লাঘব করেন। প্রবাদ এইরূপ যে, দামোদর নদের প্রবল স্রোতে তাঁহার পূজার ব্যাঘাত হওয়ায়, তিনি দামোদরকে অভিশাপ দেন যে, "আমার পূজার দ্রব্যাদি তুই ভাসাইয়া দিলি, দেখিতে পাইলি না; তোর চক্ষু কানা হইয়া যাক।" তদবধি দামোদর 'কানা দামোদর' বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত এবং এই স্থান হইতে বর্তমানে দামোদর নদও প্রায় ছয় মাইল দূরে চাঁপাডাঙ্গার নিকট সরিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণানন্দপুরীর তিরোভাবের পর, হরিপালের সন্নিকট জ্যোত-সিন্দুর গ্রামের বিষ্ণুদেব সিদ্ধান্ত নামক এক ভক্ত স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দ্বীপা গ্রামে আসিয়া মহাপ্রভুর গৌরগোপাল-বালগোপাল মূর্তির সেবাভার গ্রহণ করেন। অতঃপর দ্বারহাট্টার জমিদারগণের সাহায্যে বনজঙ্গল কাটিয়া তিনিই প্রথম এই গ্রামে স্থায়িভাবে বসতি করেন এবং পরবর্তীকালে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হরিদেব ঠাকুরকে দ্বীপায় আনাইয়া প্রভুর সেবায় নিয়োজিত করেন। ইঁহাদের বহু শিষ্য ও ভক্ত আছেন এবং ইঁহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি এই স্থানে বসবাস করিয়া মহাপ্রভুর সেবাকার্য বিশেষ অনুরাগের সহিত নির্বাহ করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত এই স্থানে নিত্যানন্দ, রাধা-বিনোদ ও রাধারানীর তিনটি বিগ্রহ আছে এবং প্রতি

বৎসর রথযাত্রার বার্ষিক মহোৎসবের সময় এই গ্রামে বহু জনসমাগম হইয়া থাকে।

[হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ সমাজ, ৩য় খণ্ড, ়ীর কুমার মিত্র, পৃঃ ১০৮৭—১০৮৮।]

৪। গ্রাম : চাঁদবাটী। ৪৪।২০৯'৫০।৮৪।৪৭৯

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, সাধুখাঁ, সৌণ্ডিক, দুলে, কাওরা ও মুসলমান।

গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) চাকুরী, মজুরী ও জাতিব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথের হরিপাল রেলস্টেশন অথবা হাওড়া ময়দান হইতে ছোট রেলপথে অবস্থিত আঁটপুর স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। গ্রামে যাতায়াতের রাস্তাটি কাঁচা।

(ঘ) আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ কেন্দ্র করিয়া দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দুর্গাপূজাটি প্রায় কুড়ি বৎসরের প্রাচীন এবং দোল উৎসবটি মাত্র গত তিন বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি মাত্র গত তিন বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ ও ব্যক্তি-বিশেষের শীতলা, সিদ্ধেশ্বরী কালী ও কয়েকটি শিবলিঙ্গ আছে। পঞ্চানন্দের নিকট সাধারণতঃ গ্রামবাসীরা সন্তানের মাথার চুল মানত করেন।

শ্রীমদন মোহন রায়, শিক্ষক,
গ্রামঃ চাঁদবাটী,
পোঃ দ্বারহাট্টা, হুগলী।

৫। গ্রাম : দ্বারহাট্টা। ৪৫।৪০৪'৮৮।৩৭০।১,৭৭০

(ক) ব্রাহ্মণ, ছত্রি, তাঁতী, কুমার, সুবর্ণবণিক, শুঁড়ি, কাঁসারী, মালাকার, মাহিষ্য, হাড়ি, ধোপা, মুচি ও সাঁওতাল।

গ্রামে আটটি পাড়া আছে।

(খ) জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-আমতা ছোট রেলপথে আঁটপুর রেল স্টেশন গ্রামের নিকটবর্তী। স্টেশন হইতে কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে শারদীয়া সপ্তমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত চারদিন ব্যাপী দ্বারিকাচণ্ডী দেবীর পূজা। পূজাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলা ও দুইটি মনসা আছে। দ্বারিকাচণ্ডীর একটি জীর্ণ মন্দির আছে, বর্তমানে চণ্ডীর মূর্তি নাই।

সম্ভবতঃ গ্রামে প্রতিষ্ঠিত দ্বারিকা চণ্ডীর নামানুসারেই গ্রামের নাম 'দ্বারহাট্টা' হইয়াছে।

শ্রীসুধাংশু শেখর সিংহরায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ দ্বারহাট্টা, হুগলী।

হরিপাল থানার অন্তর্গত দ্বারহাট্টা একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। প্রাচীন গ্রাম্য দেবতা দ্বারিকাচণ্ডীর নামানুসারে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। হরিপাল স্টেশনের চার মাইল দক্ষিণে গ্রামটি বর্তমান। হরিপাল-গজা-রাজবলহাট রাস্তায় এখন বাস চলাচল করিতেছে বলিয়া যাতায়াতের বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। বাসের প্রধান রাস্তা হইতে এক মাইল পশ্চিমে কানা দামোদর নদীর তীরে দ্বারহাট্টা গ্রাম অবস্থিত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলা তিনটি মহকুমায় বিভক্ত হয়। সদর, দ্বারহাট্টা ও ক্ষীরপাই। দিনেমার শাসিত শ্রীরামপুর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্রয় করিলে উহা হুগলী জেলার অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দ্বারহাট্টা মহকুমা পরিবর্তন করিয়া শ্রীরামপুর করা হয়।

দ্বারহাট্টা গ্রামে দ্বারিকাচণ্ডীর মন্দির ও রাজ-রাজেশ্বরী মন্দির কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত। দ্বারিকাচণ্ডী দ্বিভুজা দুর্গামূর্তি। কিম্বদন্তী স্থানীয় একটি পুষ্করিণী হইতে সিংহরায় বংশের জনৈক ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া দেবীকে উত্তোলন করেন। তিনি দেবীর জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেবীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠার অব্যহতি পূর্বে একটি শৃগাল দেবীর বেদীর উপর প্রস্রাব

করায় উক্ত মন্দির পরিত্যাক্ত হয়। উহা এখনও বিদ্যমান আছে।

পরে মোহিনী মোহন সিংহরায়ের পূর্বপুরুষ বর্তমান মন্দিরটি তৈয়ার করিয়া দেন। মন্দিরের গায়ে "শুভমস্তু শকাব্দ ১৬৮৬" এই তারিখ উৎকীর্ণ আছে। মন্দিরের গায়ে ইঁটের অপূর্ব কারুকার্য একটি দর্শনীয় বস্তু। বর্তমানে মন্দিরের সম্মুখভাগ পড়িয়া গিয়াছে এবং দেবীও অন্যত্র স্থানান্তরিতা হইয়াছেন। রাধা-কৃষ্ণের অসংখ্য চিত্রে এই মন্দির সুশোভিত ছিল। মন্দিরের পশ্চাতে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ও পাশে দেবীর পুষ্করিণী এখনও আছে।

দুর্গাপূজার সময় দ্বারিকাচণ্ডীর বলিদান হইবার পর চতুঃপার্শ্বস্থিত দশ-বারোটি গ্রামের পূজার বলিদান হয়। এই নিয়ম বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

দ্বারহাট্টার দ্বিতীয় উল্লেযোগ্য মন্দির শ্রীশ্রীরাজ-রাজেশ্বরের মন্দির। অপূর্বমোহন সিংহরায় এই বিরাট মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা। মন্দিরের গায়ে একটি পাথরে মন্দির ১১৩৬ সনে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া লেখা আছে। ব্যবসায়াদি করিয়া সিংহরায় বংশ প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিয়া এই অঞ্চলের বহু জমিদারী ক্রয় করেন এবং দান-ধ্যান, পূজা-পার্বণ, পুষ্করিণী খনন, মন্দির প্রতিষ্ঠা বিবিধ ক্রিয়া করিয়া তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। রাজরাজেশ্বর সিংহরায় বংশের কুলদেবতা— শালগ্রাম শিলা।

রাজরাজেশ্বরের টেরাকোটা একটি দর্শনীয় বস্তু। অসংখ্য চিত্র মন্দিরের শোভাবর্ধন করিয়াছে। রামরাবণের যুদ্ধ, শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাস ছাড়া মন্দিরের সম্মুখের দুইটি থামের একটিতে দুর্গা, মহাবীর, লক্ষ্মী, সরস্বতী ও অন্যটিতে শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও পোর্তুগীজ সৈন্যদের চিত্র-শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন বলিতে পারা যায়।

ইহাছাড়া রায়-সরকার বংশের জোড়া শিব মন্দিরের সম্মুখে দুইটি সুন্দর মূর্তি অঙ্কিত আছে। এই শিব মন্দির শকাব্দ ১৭০০ সন এবং ১১৮৫ সালে নির্মিত বলিয়া লেখা আছে। এই স্থানটিকে চাঁদবাটি বলে।

দ্বারহাট্টার হাটতলার পশ্চিমে কানা দামোদরের তীরে কামদেবপুর গ্রামে জাগ্রত মনসাদেবী আছেন। মনসাদেবীর কাশীর ঔষধ লইবার জন্য দেবীর নিকট বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

["হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ", ৩য় খণ্ড, শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ১০৮৩—৮৪।]

৬। গ্রাম : কিঙ্করবাটী (মৌজা : বাজে ইসলাম-পুর)। ১১০।৩০৬'৬৮।৭৩।৪১০

(ক) বর্ণহিন্দু, ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, কামার, কুমার, গন্ধবণিক, গোয়ালা, নাপিত, নিম্নহিন্দু, বর্গক্ষত্রিয়, কাওরা, তাঁতি, মুচি, বাউরী ও পশ্চিমা সংগোপ।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী, মজুরী ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-তারকেশ্বর রেলপথে নালিকুল অথবা হাওড়া-বর্ধমান কড্ রেলপথে মধুসূদনপুর স্টেশন হইতে শেওড়াফুলি-তারকেশ্বর রোড্ দিয়া পদব্রজে গ্রামে পৌছান যায়। গ্রামের পাশ দিয়া কানা নদী প্রবাহিত। তবে নৌ-চলাচলের ব্যবস্থা নাই।

(ঘ) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা। রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রার দিন শ্রীধর নারায়ণের বিগ্রহকে রথে স্থাপন করিয়া নানা বাদ্যাদি ও হরিনাম সংকীর্তনাদি সহ রথটানা হয়। উৎসবটি ব্যক্তি-বিশেষের এবং প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা এই দুইদিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি পঞ্চানন, দুইটি শীতলা, দুইটি কালী, দুইটি শিব এবং একটি আশ্রমে রাধামাধব জীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন, শ্রীধর নারায়ণ ও রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি ব্যক্তি-বিশেষের বিগ্রহাদি এবং

মাটির দেওয়াল ও টিনের ছাউনি যুক্ত একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ দত্ত, ব্যবসায়,
গ্রাম : কিঙ্করবাটী, হুগলী।

৭। গ্রাম : বন্দীপুর। ১১৩।৫৩৮·২৯।৩২৪।১,৯৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সৎগোপ, জেলে, তিলি, ধোপা, ময়রা, হাড়ী, বাগ্দী, দুলে, কৈবর্ত, তামালী ও মুসলমান।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় একমাইল দূরে রেলস্টেশন। গ্রামে যাতায়াতের জন্য ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা আছে। গ্রামের নিকট একটি শীর্ণকায় নদী প্রবাহিত আছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শ্যামরায় নামে খ্যাত ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) ধর্মরাজঠাকুরের গাজন উপলক্ষে মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শ্যামরায় ঠাকুরের একটি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির আছে। ইহাভিন্ন, গ্রামে চার-পাঁচটি পঞ্চানন্দ, চার-পাঁচটি মনসা ও চার-পাঁচটি শীতলা আছে।

শ্রীরাধানাথ পণ্ডিত, দেবসেবা,
গ্রাম ও পোঃ বন্দীপুর হুগলী।

হরিপাল থানার অন্তর্গত অন্যান্য কয়েকটি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত মন্দির ও উৎসব-পার্বণাদি সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গ-সমাজ", ৩য় খণ্ড গ্রন্থে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায় :—

পাণিশেওলা (মৌজা নং ১২)।

জেজুর ইউনিয়নের মধ্যে পাণিশেওলা পূর্বে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। হরিপাল স্টেশন হইতে দেড় মাইল দূরে এই গ্রাম অবস্থিত। গ্রামে বসু, মিত্র ও সিংহরায় বংশের বহু প্রাচীন কীর্তি আজও বিদ্যমান আছে।

পাণিশেওলার নিকটবর্তী বাসুদেবপুর গ্রামের পঞ্চানন ঠাকুর জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। সন্তানাদি হইয়া যাহাদের বাঁচে না, তাহারা এই দেবতার নিকট মানত করিবার জন্য সমাগত হন ও ঔষধ লইয়া যান। [পৃঃ ১১০৪—১১০৫]

হরিপাল (মৌজা নং ৬৮)।

ইহার পুরাতন নাম শিমূল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ" নামে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, নৃপতি কুলপালের হরিপাল ও মহিপাল নামে দুই পুত্র ছিল। হরিপাল সিংহপুর বা সিঙ্গুরের পশ্চিমে হাট-বাজার ও দীঘি-সরোবর শোভিত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া স্বীয় নামানুসারে উহার নাম "হরিপাল" রাখেন। এই হরিপালের কন্যা কানাড়ার বীরত্ব কাহিনী মানিকরাম গাঙ্গুলী প্রণীত ধর্মমঙ্গল কাব্যে বর্ণিত আছে।

হরিপাল বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ড গ্রাম; কলিকাতা হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। ইষ্টার্ন রেলওয়ের তারকেশ্বর লাইনে ইহা একটি স্টেশন। ধর্মমঙ্গল সমূহে রাজা হরিপালের প্রভাব যথেষ্ট থাকিলেও, হরিপালে তাঁহার কোন ঐতিহাসিক নিদর্শন নাই।

হরিপাল রাজার প্রতিষ্ঠিত বিশালক্ষী দেবীর মূর্তি অদ্যাপি এই গ্রামে বিদ্যমান আছে এবং ইহা বর্তমানে চণ্ডালকন্যা বিশালক্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ; এই স্থানে বহু নরবলি হইয়াছে। বিশালক্ষী দেবীর 'চণ্ডাল কন্যা বিশালক্ষী' নামকরণ সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। বহুদিন পূর্বে এই স্থানে বহু চণ্ডাল রাজার সৈনিকের কার্য করিত। জনৈক চণ্ডাল দলপতি তাহার পুত্রের বিবাহ দিয়া দেবীকে প্রণাম করিবার জন্য বর ও কন্যাকে লইয়া মণ্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহার নিকট প্রণামী না থাকায় বর-কন্যাকে তথায়

রাখিয়া সে প্রণামী আনিতে যায়; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আর কন্যাকে দেখিতে পায় না। অথচ দেবীর মুখে চেলীর কিয়দংশ ঝুলিতেছে দেখিতে পায়। চণ্ডাল ক্রন্দন করিতে করিতে প্রার্থনা জানাইল—"মা কন্যাকে ফিরাইয়া দেন।" প্রত্যাদেশ হইল আমি কন্যাকে খাইয়া ফেলিয়াছি—আজ হইতে আমাকে যেন চণ্ডালকন্যা-বিশালক্ষী বলিয়া অভিহিত করা হয়।"

হরিপালে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। তন্মধ্যে সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত রায় বংশের শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দজীউর মন্দির বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মন্দিরগাত্রে কারুকার্য খচিত ইটে বহু দেবদেবীর লীলা কাহিনী অঙ্কিত আছে। মন্দির ১১৪৪ শকাব্দে মেরামত করা হয় বলিয়া লেখা আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের ছাদ ভগ্ন হইলে পরবর্তীকালে উহা করোগেট টিন দিয়া ছাউনি করায় মন্দিরের সৌন্দর্য অনেকখানি নষ্ট হইয়াছে। রাধাগোবিন্দের রাসমঞ্চটি স্থাপত্যশিল্পের একটি অপূর্ব নিদর্শন। বৃহৎ তোরণের মত ইহার সম্মুখভাগ এবং চারিদিকে চারটি গম্বুজ ও মধ্যে গম্বুজের উপর একটি বড় চূড়া ইহার শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। রাসমঞ্চের সম্মুখস্থ সুবৃহৎ চাতালে অষ্টসখীর নামানুসারে আটটি তুলসীমঞ্চে রোপিত তুলসীবৃক্ষ স্থানটিকে মধুময় করিয়াছে। প্রতিটি তুলসীমঞ্চে সখীদের নাম খোদিত আছে।

রায়দের বুড়ো শিবের মন্দিরও খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ইহাছাড়া আরও পাঁচটি শিব-মন্দির বর্তমানে বিদ্যমান আছে ও দুইটি পড়িয়া গিয়াছে। বর্ধমানের মহারাজা প্রতিষ্ঠিত একটি শিব মন্দির ও ভড়দের জোড়া শিব মন্দির ১৭৪৫ শকাব্দে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। ভট্টাচার্যদের আনন্দ-দেবের মন্দির (বর্তমান সেবায়েত নন্দগোপাল চট্টোপাধ্যায়) ও কালী মাতার মন্দিরও উল্লেখযোগ্য। কালী মন্দিরে এখন কোন প্রতিমা নাই; তামায় প্রত্যহ পূজা হয়। রায়বংশের কুলপুরোহিত শ্রীঅমিয় কুমার ভড় ইহার সেবায়েত। ভড়দের কৌলিক উপাধি চট্টোপাধ্যায়।

রায় বংশের দুর্গোৎসব কেবল প্রাচীন নয়, ইহাদের দুর্গা প্রতিমারও কিছু বিশেষত্ব আছে। ইহাদের দুর্গা প্রতিমার কার্তিক ও গণেশ উপরে থাকেন এবং তাঁহাদের নীচে থাকেন সরস্বতী ও লক্ষ্মী। এক পক্ষকাল ধরিয়া দেবীরকল্প হয় এবং কলা বউ হয় তিনটি। বলি হয় নয়টি—চারটি ছাগল, একটি ভেড়া, একটি মহিষ, একটি আখ, একটি কুমড়া ও একটি লেবু। মহিষ বলি দেখতে পূজায় সময় হরিপালে বহুলোকের সমাগম হয়। [পৃঃ ১০৭৩—১০৮০]

জেজুর (মৌজা : নং ৮৩)।

জেজুর হুগলী জেলার অন্তর্গত চন্দননগর মহকুমার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে এই গ্রামের নাম ছিল কসবা এবং জনশ্রুতি আছে যে, ১০৫০ সালে গোবিন্দ রায় মিত্র এই গ্রামের জেজুর নামকরণ করেন। কিংবদন্তী এইরূপ যে, পুরাকালে এই গ্রাম নাগর নামক এক রাজার রাজধানী ছিল। বর্তমানে যে-স্থানে জেজুরের শ্মশান অবস্থিত, তথায় রাজপ্রাসাদ ছিল বলিয়া প্রকাশ।

জেজুরে বহু দেবালয় আছে। তাহার মধ্যে হাটতলার কালীমন্দির ও শিবমন্দির প্রাচীনতম দেবস্থান। ঘোষ বংশের ও বসু বংশের দুর্গাপূজায় ঠাকুর দালান একটি দর্শনীয় বস্তু। বসুবংশের ঠাকুর দালান এখন করবংশের দখলিভুক্ত। উহার অর্দ্ধাংশ পড়িয়া গিয়াছে। মিত্রবংশের শ্রীধরজীউর মন্দির ও লক্ষ্মীজনার্দনের মন্দিরের অবস্থাও ভগ্নপ্রায়। শ্রীধর জীউ জাগ্রত দেবতা বলিয়া কথিত। [পৃঃ ১০৯৪]

বন্দীপুর (মৌজা নং ১১৩)।

বন্দীপুর হুগলীর একটি প্রসিদ্ধ পল্লীগ্রাম। ইহার নামে পরগণা প্রচলিত; এখানে ডাকঘর, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় এবং বহু লোক ও জাতির বাস। বন্দীপুরে ঘটক (বন্দ্যোপাধ্যায়) জমিদারগণ একসময়

বিখ্যাত ছিলেন। বন্দীপুর গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন বংশ "রায় বংশ"। এই বংশ রাজপুতানা হইতে প্রথম বঙ্গদেশে আসিয়া বন্দীপুরে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

এই বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺গোপীজনবল্লভ জীউ। ইহার নিত্য সেবা ও জন্মাষ্টমী, দোলযাত্রা ও অন্যান্য উৎসব নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। এই বংশ বহু প্রাচীনকাল হইতে শ্রীশ্রী৺দুর্গা পূজারও প্রবর্তন করিয়াছিলেন। বর্তমানেও এই পূজা চলিতেছে। অন্যান্য দেবতা ও বিগ্রহের মধ্যে ৺গঙ্গাধর শিব আছেন। তাঁহারও নিয়মিত সেবা ও চড়ক পূজার সময় গাজন হইয়া থাকে।

বন্দীপুরে ধর্মঠাকুর শ্যামরায় প্রসিদ্ধ। বুদ্ধদেবই বঙ্গদেশে ধর্মঠাকুর নামে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের দ্বারা পূজিত হইতেছেন। সমগ্র বঙ্গদেশে অগণিত ধর্মঠাকুরের মধ্যে বন্দীপুরের শ্যামরায় এবং বাঁকুড়ার যাত্রাসিদ্ধ রায়ই প্রসিদ্ধ। শ্যাম রায়ের পূজারিরা ডোম জাতীয়, উপাধি পণ্ডিত। ইহারা শ্যামরায়ের নামে জলপড়া ও নানা রোগের ঔষধ দেন।

[পৃঃ ১০৮৯—১০৯০]

জেলা : হুগলী
থানা : হরিপাল

উৎসব বিবরণী

চণ্ডীপুজা (দ্বারিকাচণ্ডী)

দ্বারহাট্টা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া সপ্তমী তিথি হইতে দশমী তিথি পর্যন্ত চারদিনব্যাপী দ্বারিকাচণ্ডীর বাৎসরিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। যদিও উৎসবটি গ্রামের সিংহরায় পরিবারের ব্যক্তিগত উৎসব, তবে এই উৎসবে গ্রামের সর্বসাধারণ যোগদান করিয়া থাকেন।

গ্রামে দ্বারিকাচণ্ডীর একটি প্রাচীন পাকা মন্দির আছে। বর্তমান মন্দিরটি ভগ্ন প্রায়। পূর্বে মন্দির অভ্যন্তরে দ্বারিকা দেবীর অভয়া মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, বর্তমানে মূর্তি নাই, ঘট স্থাপন করিয়া যথারীতি দেবীর পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। পূর্বে এই উৎসব উপলক্ষে খুব ধূমধাম হইত, সর্বজনীন ভোজ হইত, এখন আর তেমন ধূমধাম হয় না।

উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন যথারীতি পূজা এবং পূজান্তে একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়। নবমী তিথিতে বার্ষিক বলির পর, মানসিকের ছাগ বলি দেওয়া হয়। এইদিন পঞ্চমুণ্ডির আসনের উপর হোম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। দেবীর নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। ইহার বর্তমান পূজারী শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বটব্যাল, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ছত্রী ব্রাহ্মণ।

ভবানীদেবীর পূজা

বাসুড়ী গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসের শারদীয়া নবমীতিথিতে সাড়ম্বরে দেবী ভবানীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের উত্তরভাগে একটি পাকা মন্দিরে সিংহাসনের উপরে ভবানী দেবীর দ্বিভুজা মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

উৎসবের দিন যথারীতি পূজা, হোম ও ছাগ বলি হইয়া থাকে।

উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। শোনা যায় রানী রায় বাঘিনী কর্তৃক এই মন্দির ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একদা এক অমাবস্যার রাত্রিতে রানী রায়বাঘিনী ভবানী মন্দিরে পূজা করিতে আসিলে পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ কর্তৃক আক্রান্ত হন এবং এই মন্দির হইতে কিছুদূরে তাঁহার সহিত ওসমান খাঁ-র সৈন্যদের প্রবল সংঘর্ষ হয়। এই গ্রামের দুই মাইল দূরে ছাতনাপুর নামে একটি গ্রাম আছে। কথিত আছে, এই গ্রামে রানী রায়বাঘিনীর একটি দুর্গ ছিল। সেই স্থানটিকে এখনও লোকে ছাতনা-পুরের গড় বলে।

মহোৎসব

বাসুড়ী গ্রামে টিনের আটচালা যুক্ত একটি প্রাচীন হরিসভা মন্দির আছে। এই হরিসভায় প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের একাদশী তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত পাঁচ-দিনব্যাপী সাড়ম্বরে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবের প্রথম তিন দিন ভগবত পাঠ, চতুর্থ দিন অখণ্ড নামকীর্তন ও পূর্ণিমায় মহোৎসব হইয়া থাকে। পূর্ণিমার পরের দিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে চিড়া-মুড়কী ইত্যাদি উপাচার দ্বারা প্রচুর মালসা ভোগ দেওয়া হয়; উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু ভক্ত নর-নারী ও কীর্তনীয়া দল আসিয়া থাকেন। সমাগত যাত্রীদের মধ্যে মহাপ্রভুর প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

জেলা : হুগলী
থানা : হরিপাল

মেলা বিবরণী

চড়ক-গাজন-নীলপুজার মেলা

বন্দীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শ্যামরায় ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন উৎসব উপলক্ষে উৎসব প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় আট-দশ বিঘা জমির এক দিনের জন্য একটি মেলা বসে।

মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে ও লালপুর, জমাইবাটী, ঘাটরা, খানাখানপুর, কাশীমপুর, কিঙ্করবাটী, চক্ হরিপুর, দিলালপুর প্রভৃতি আশেপাশের ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় দুই-তিন হাজার নর-নারী মেলায় আসেন। বর্ধমান, শ্রীরামপুর ও তারকেশ্বর প্রভৃতি স্থান হইতে কিছু সংখ্যক যাত্রী আসেন।

মেলায় মোট চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকান বসে এবং পনের কুড়ি জন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রায় সবগুলি দোকানই খোলা জায়গায় বসে। আশেপাশের ব্যবসায়ীরা ভিন্ন, সিঙ্গুর, নালিকুল, বেগমবাবু প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয় না। মেলায় তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, মাটির খেলনা-পুতুল এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও ম্যাজিকের দল আসে এবং অনেকে লটারী খেলিয়া থাকেন।

দোলযাত্রার মেলা

চাঁদবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রাধাকৃষ্ণজীউর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত বসন্ত কুমার রায় মহাশয়ের সদর বাটীর সম্মুখস্থ প্রায় দুই বিঘা পরিমাণ জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি গত তিন বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে মোট প্রায় দেড় হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীগণ সাধারণতঃ পদব্রজেই আসিয়া থাকেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, বই-ছবি এবং স্থানীয় গ্রামবাসীদের তৈয়ারী বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, চ্যাঙ্গারী ইত্যাদির মাত্র দশ-পনেরটি দোকান বসে এবং দুই-চারি জন ফেরিওয়ালা আসেন।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কীর্তন গানের ব্যবস্থা করা হয়।

মনসাপুজার মেলা

নওপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে মনসা পূজা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের জমির উপর একটি মেলা বসে।

আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীরা আসিয়া থাকেন। তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী ও বই-ছবি প্রভৃতির মাত্র দশ-বারোটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক ও যাত্রাভিনয় হয়।

রথযাত্রার মেলা

কিঙ্করবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় এক বিঘা জমির উপর পল্লীর রাস্তার দুই পার্শ্বে রথযাত্রা এবং পুর্নযাত্রার দিন একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন।

বন্দীপুর, নালিকুল, গোপালনগর প্রভৃতি নিকটবর্তী বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে এবং হাওড়া ও বর্ধমান জেলা হইতে মেলায় প্রায় আট-দশ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়। নিকটবর্তী যাত্রীরা প্রধানতঃ হাঁটিয়া ও সাইকেলে এবং দূরবর্তী যাত্রীরা ট্রেনে করিয়া মেলায় আসেন।

মেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং আট-দশ জন ফেরিওয়ালা আসেন। নালিকুল, বন্দীপুর, বেড়াবেড়ি, গোপীনাথপুর, বড়গাছিয়া, ছিলানপুর প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বিক্রেতারা আসেন। দোকানপাট-গুলির মধ্যে ময়রা এবং তেলেভাজার দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন মনিহারী, বাসনকোসন, লোহার তৈয়ারী জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র, ঔষধপত্র, পান-বিড়ি-সরবৎ এবং শাকসব্জী ইত্যাদি আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কেবলমাত্র হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

ঝিপা গ্রামে প্রতি বৎসর রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে জগন্নাথদেবের মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা পরিমাণ জমির উপর নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন।

নিকটবর্তী হরিপাল, আঁটপুর, জঙ্গীপুর প্রভৃতি স্থান হইতে মোট প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে। যাত্রীগণ সাধারণতঃ পদব্রজেই আসিয়া থাকেন।

মেলায় প্রায় ত্রিশটি দোকান বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে তেলেভাজা ও খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ী-কুড়ির দোকান এবং স্থানীয় গ্রামবাসীর বেত বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলো ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা ও জগন্নাথদেবের নাম কীর্তন ছাড়া অন্য কিছুর ব্যবস্থা করা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে অনুষ্ঠিত শ্রাবণ মাসে ঝুলনের মেলা, কার্তিক মাসে রাসের মেলা এবং ফাল্গুনে দোলের মেলা উল্লিখিত রথের মেলার অনুরূপ।

জেলা : হুগলী
থানা : তারকেশ্বর

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : মোক্তারপুর।১৪।৭৭৫'৪৯।৬৩০।৩,০৩৮

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বাগদী, স্বর্ণকার ও কামার। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রামের নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাঁপাডাঙ্গা ও তারকেশ্বর। গ্রামের নিকট দিয়া সরকারী বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে নিত্যানন্দ ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গত প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন। তাহাছাড়া, ইহাদের নিত্য পূজার ব্যবস্থা আছে। সেবায়েত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, পদবী—অধিকারী। উৎসব উপলক্ষে যে রথ বাহির হয় তাহার অবস্থা খুবই জীর্ণ।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুই দিন। মেলাটি প্রায় সত্তর-আশি বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামের প্রায় প্রতিটি পাড়ায় শীতলা ও মনসা ঠাকুর আছে।

শ্রীরাজমোহন সামন্ত, কৃষিকার্য,
গ্রামঃ মোক্তারপুর, হুগলী।

২। গ্রাম : প্রতিহারপুর। ৫৭।২৮৫'০৬।১১৪।৫০১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন "লোকনাথ" হইতে জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রা এবং আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব উপলক্ষে প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

(ঙ) স্নানযাত্রার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে একদিন। রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। দুইটি মেলাই প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, গৌরনিতাই, মদনগোপাল, শ্যামসুন্দর, রাধারাণী, নারায়ণ, শিব প্রভৃতি দেবদেবী আছে।

শ্রীকালীবরণ গঙ্গোপাধ্যায়,
গ্রামঃ প্রতিহারপুর
পোঃ রামনগর, হুগলী।

৩। গ্রাম : গোবরহাঁড়া। ৮৪।৩৪১'০৫।১০৮।৭০৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া ময়দান হইতে ছোট রেলপথে হাওয়াখানা" বা "পিয়াসাড়া" স্টেশনে নামিয়া কিছুদূর উত্তরে অহল্যাবাঈ রোড ধরিয়া এই গ্রামে পৌঁছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে কুড়িদিন-ব্যাপী শীতলা পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন। শীতলা দেবীর কোন মূর্তি নাই। একটি নির্দিষ্ট আটচালা গৃহে ঘটস্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। উৎসব উপলক্ষে পূজা প্রাঙ্গণে কয়েকটি ময়রা, তেলেভাজা প্রভৃতি খাবারের দোকানপাট বসে ও দুইদিনব্যাপী যাত্রাভিনয় হয়। তাহাছাড়া গ্রামে একটি কালীপূজা হয়।

(ঙ) ×

(চ) গ্রামে একটি ভুবনেশ্বরী দেবীর মূর্তি আছে।

শ্রীঅভয়পদ কুণ্ডার,
গ্রাম : গোবরহাঁড়া,
পোঃ বাসুড়ী, হুগলী।

[হুগলী জেলার প্রখ্যাত শৈবতীর্থ তারকেশ্বর সম্বন্ধে আমাদের প্রতিনিধি অরুণ কুমার রায় কর্তৃক

সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ও শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড, গ্রন্থের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করা হইল।]

হুগলী জেলার তারকেশ্বর কলিকাতা হইতে প্রায় ৩৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র এবং বর্তমানে একটি বাণিজ্য কেন্দ্র বলিয়া খ্যাত। এই স্থানে থানা, ডাকঘর, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, সরকারী অফিস, সিনেমা, বাজার প্রভৃতি শহরের যাবতীয় সব কিছু সুব্যবস্থা আছে।

পূর্ব রেলপথে হাওড়া হইতে তারকেশ্বর পর্যন্ত একটি ট্রেন লাইন আছে। ইহাভিন্ন মোটর-বাসে তারকেশ্বর হইতে আরামবাগ, খানাকুল, শ্রীরামপুর, চুঁচুড়া, মশাগ্রাম ও বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

বাংলা দেশে একমাত্র চন্দ্রনাথ ব্যতীত তারকেশ্বরের ন্যায় দ্বিতীয় শৈবতীর্থ নাই; ইহা দশনামী শৈবসম্প্রদায়ের প্রধান মঠ এবং এই মঠটি ১৭২৯ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্বে এই স্থান গভীর বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ক্ষত্রিয় রাজবংশী ভূস্বামী রাজা বিষ্ণুদাস অযোধ্যা প্রদেশের জৌনপুর জেলার হরিহরপুর নামক স্থান হইতে তারকেশ্বরের তিন মাইল দূরে রামনগর নামক স্থানে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন। তিনি নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর নিকট হইতে রামনগরে বসবাসের জন্য প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি লাভ করেন।

তারকেশ্বরের আবির্ভাব ও তারকেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, রামনগর রাজ-বাটির গো-রক্ষক মুকুন্দ ঘোষ একদা লক্ষ্য করিলেন তাঁহার পালের কয়েকটি গাভী গভীর অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি শিলাস্তম্ভের নিকট দাঁড়াইলে তাহাদের বাঁট হইতে আপনি দুধ ঝরিয়া শিলার উপর পড়িতেছে। তিনি এই সংবাদ রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা সাধক ভারামল্লকে জানাইলে তিনিও গোপনে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেন এবং ঘটনাটি রাজা বিষ্ণুদাসের কর্ণগোচর করেন।

রাজা বিষ্ণুদাস এই শিলাকে তুলিয়া আনিয়া রামনগরে প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করেন। সেই সময় ভারামল্ল স্বপ্নাদেশে জানিতে পারেন যে, ইহা সামান্য শিলা নহে, ইহা তারকনাথ অনাদি স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গ। সুতরাং উক্ত শিলাকে তুলিবার বৃথা চেষ্টা না করিয়া উভয় ভ্রাতা এই স্থানে তারকেশ্বরের মন্দির নির্মাণ করিয়া নিত্যসেবাপূজার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন এবং মুকুন্দ ঘোষ হইতেই তারকেশ্বরের প্রথম প্রকাশ বলিয়া তাঁহাকেই তারকেশ্বরের সেবক নিযুক্ত করেন।

পরবর্তীকালে মন্দির জীর্ণ হইয়া গেলে বর্ধমান মহারাজ মন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করেন এবং পরে ঐ মন্দির ছোট বিবেচনা করিয়া যাত্রীদের সুবিধার জন্য হুগলী জেলার শিয়াখালার অন্তর্গত পাতুল নন্দিপুর গ্রাম নিবাসী গোবর্ধন রক্ষিত মহাশয় পুরাতন মন্দিরের উপর বর্তমান বৃহৎ মন্দিরটি নির্মাণ করিয়া দেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে চিন্তামণি দে নামক জনৈক ভক্ত মন্দির সম্মুখস্থ নাট মন্দির নির্মাণ করেন এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গঙ্গাধর সেন নামে জনৈক ব্যক্তি দুধপুকুরের ঘাট ইট দ্বারা বাঁধাইয়া দেন।

বর্তমান মন্দিরটি আটচালা গঠনে নির্মিত। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গের উপরিভাগের যতটুকু অংশ দৃষ্টিগোচর হয় তাহার উচ্চতা প্রায় ১½ ফুট এবং ব্যাস প্রায় ¾ ফুটের মত হইবে। মন্দিরে পিছনের দেওয়াল সংলগ্ন চরণামৃত কুণ্ড আছে। ভক্তরা শিবের মাথায় জল ঢালিলে ঐ জল মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি নালা দিয়া চরণামৃত কুণ্ডে আসিয়া পড়ে। ভক্তরা এই কুণ্ড হইতে চরণামৃত পান করিয়া থাকেন।

কথিত আছে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে গভীর বনজঙ্গলের মধ্যে অবস্থিত এই অনাদি শিবলিঙ্গকে সামান্য শিলা জ্ঞান করিয়া গ্রাম্য স্ত্রীলোকগণ বহু বৎসর যাবত শিবলিঙ্গের উপর ধান ভানিতেন।

বর্তমান শিবলিঙ্গের উপর মধ্যস্থলে রূপার চাকতি (পূজারীরা বলেন 'ভেক') দ্বারা ঢাকা যে গর্তটি দৃষ্ট হয় তাহা ঐরূপ ধান ভানিবার ফলে সৃষ্ট বলিয়া প্রবাদ আছে।

রাজা ভারামল্ল কর্তৃক মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তারকেশ্বরের আবির্ভাবের কথা চতুর্দিকে প্রচারিত হয় এবং নানা স্থান হইতে প্রতিদিন পূজা দিবার জন্য দলে দলে নরনারী মন্দিরে আসিতে লাগিলেন এবং ক্রমেই তারকেশ্বর এক মহান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়।

তারকেশ্বর বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত; তারকেশ্বরের মন্দিরে 'ধর্না' বা 'হত্যা' দিয়া বহুলোক বহু দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। অদ্যাপি বহুলোক নানারূপ মনস্কামনা জানাইয়া প্রতিদিন মন্দিরে 'হত্যা' দিয়া থাকেন। মানতকারীরা মন্দিরের পার্শ্বে 'দুধপুকুর' নামে খ্যাত একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া মানসিক সংকল্প করেন এবং মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে তারকেশ্বরের প্রত্যাদেশের জন্য হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকেন। ভক্তরা প্রধানতঃ অর্থ, স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার, বস্ত্র ও ষোড়শোপচারে পূজা মানসিক করিয়া থাকেন। চৈত্র মাসে গাজনের সময় অনেক ভক্ত মানসিক করিয়া তিনদিন, একসপ্তাহ, পক্ষকাল অথবা সারা চৈত্র মাসব্যাপী সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া নানারূপ কৃচ্ছ সাধন করিয়া থাকেন। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলে সন্নাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। অনেকে মানত করিয়া পায়ে হাঁটিয়া কলিকাতা অথবা সেওড়াফুলী হইতে শিবপূজার জন্য বাঁকে করিয়া তারকেশ্বর মন্দিরে গঙ্গার জল লইয়া আসেন।

তারকেশ্বরের নিয়মিত নিত্যপূজা হয়। স্থানীয় গাঙ্গুলী উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ পুরুষানুক্রমে তারকেশ্বরের পুরোহিতের কাজ করিয়া থাকেন। প্রতিদিন বহু নরনারী মন্দির দর্শন করিতে ও মানসিক পূজাদি দেওয়ার জন্য আসেন। নিত্যপূজা ব্যতীত শ্রাবণ মাসে শ্রাবণী উৎসব, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি এবং চৈত্র মাসে সাড়ম্বরে গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রায় অর্ধলক্ষ এবং গাজন উৎসব উপলক্ষে লক্ষাধিক নরনারীরও সাধু-সন্তের সমাগম হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ হইতে যাত্রীরা আসেন। যাত্রীদের থাকিবার জন্য এই স্থানে কয়েকটি ধর্মশালা আছে এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য নিয়মিত মোটরবাস ও ট্রেন ব্যতীত অতিরিক্ত মোটরবাস সার্ভিস ও ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে এবং চৈত্র মাসে গাজন উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে এবং মন্দিরে বাহিরে উন্মুক্ত মাঠে মেলায় সর্বপ্রকার জিনিসপত্রে প্রায় আড়াইশত দোকানপাট বসে। গাজনের মেলায় তরমুজ, কুমড়া এবং মাটির হাঁড়ি-কলসী সর্বপেক্ষা বেশী আমদানী ও বেচাকেনা হয়। বিহার প্রদেশের গয়া এবং দুমকা হইতে প্রতি বৎসর ব্যবসায়ীরা পাথরের তৈয়ারী নানারূপ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রয়ের জন্য আসেন।

তারকেশ্বর মন্দিরে অনুষ্ঠিত উৎসব-পার্বণ ও মেলা সম্পর্কে শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয় তাঁহার "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড গ্রন্থে যে বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন আমারা নিম্নে তাহা হুবহু উদ্ধৃত করিলাম:

পশ্চিম বাংলার অন্যতম প্রধান শৈবতীর্থ তারকেশ্বরে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী মূল অনুষ্ঠানের প্রতিদিনই ট্রেনে, বাসে, পদব্রজে শিবব্রতধারী সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসিনীদের এক অভূতপূর্ব সমাবেশ ঘটে এবং ১লা বৈশাখ আনুষ্ঠানিক-ভাবে উৎসবের পরিসমাপ্তি হয়। তারকেশ্বরের গাজন-উৎসব বাঙালা দেশের সর্বাপেক্ষা বড় গাজন উৎসব। এই মহোৎসবে তারকেশ্বরের গোপের কাহিনী ও বিবিধ লৌকিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে বাঙ্গালার নিজস্ব সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে। ইহা যে দশনামী শৈবদের দান নয় এবং মোহান্তদের আচারভুক্তও নয় তাহা নিঃসন্দেহে বলা হয়।

মেলা সুরু হয় ২০শে চৈত্র। স্থানীয় লোকেরা ইহাকে দখ্‌নো মেলা আখ্যা দিয়াছে। মেদিনীপুর, হাওড়া, বাগনান, আমতা শ্যামপুর, থানাকুল, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি স্থানের কৃচ্ছ্রব্রতধারী ভক্তের দল গৈরিক ধারণ করিয়া বাঁকে করিয়া পবিত্র গঙ্গাজল বহন করিয়া তীর্থধামে উপস্থিত হইয়া পূজা দেন। চৈত্র মাসে ৩১ দিনে হইলে মেলা ২১শে চৈত্র হয়।

২৪শে চৈত্র হইতে আরম্ভ হয় "পূর্বে মেলা।" এই সময়টা খুলনা, যশোহর ও ২৪ পরগণা জেলার (ডায়মণ্ডহারবার বাদে) লোকেরা পূজা দিতে আসে।

২৬শে চৈত্র সংক্রান্তির পাঁচদিন পূর্বে মূল অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। ঐ দিনটিকে বলে মহাবিষ্যি অর্থাৎ মহাহবিষ্যি। উপবাসী ব্রতধারীরা সেই দিন দিনান্তে হবিষান্ন আহার করে।

২৭শে চৈত্র ফল উৎসব। এই দিন ফল ছোড়া, কাটা ঝাঁপ—রামনগরের গাজন হইয়া থাকে।

২৮শে চৈত্র নীল। এই উপলক্ষে মন্দিরে শিবের বিবাহ বার্ষিকী পালিত হয়। "বাবা" এইদিন মাথায় টোপর ও পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া দিব্য জামাই সাজেন। মন্দিরে সেইদিন দলে দলে ভক্তরা নীলের বাড়ি পালায়। বাদ্যভাণ্ড, আতস-বাজিতে সমস্ত উৎসব ক্ষেত্রটি এক অপূর্ব সুষমামণ্ডিত হইয়া উঠে। নীলাবতীর বিবাহোপলক্ষে এইদিন হাতীসহ এক বিরাট শোভাযাত্রা হয়। চড়কের সময় মুকুন্দ ঘোষের দৌহিত্র বংশ গাজনের মূল সন্ন্যাসী হন।

২৯শে চৈত্র। চড়ক উৎসবের ঝাঁপ খেলা হইয়া থাকে। এই দিন কাঁটা-ঝাঁপ একটি দর্শনীয় অনুষ্ঠান। মেলায় বিভিন্ন অঞ্চলের নরনারীর নৃত্য হয়।

৩০শে চৈত্র গৈরিক বস্ত্র ত্যাগ ও ব্রত সমাপন।

এই পাঁচ দিনের অনুষ্ঠানের প্রত্যহই মন্দিরে পূজা, অর্চনা, মন্দিরের প্রাঙ্গণে দণ্ডী করিয়া মন্দির প্রদক্ষিণ, বাবার মাথায় গঙ্গাজল "বর্ষণ প্রভৃতি থাকার প্রতিপালিত হয়।"

ব্রতধারণের ও নিয়ম পালনের ধরা বাঁধা কোনও রীতি অধুনা প্রচলিত না থাকিলেও সাধারণতঃ একমাস, উনত্রিশ দিন, বা আরো অল্প দিনের জন্য কৃচ্ছ সাধনের ব্রত গ্রহণ করা হয়। ব্রতী সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনী তখন এই মন্ত্র শ্রবনপূর্বক গৈরিক ধারণ করেন :

"আত্মা গোত্রং পরিত্যজ্যং শিব গোত্রে প্রবিশতু"

গৈরিক ধারণের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ এক গোত্র হইয়া যান। আত্মিক সমন্বয় সাধনের ইহা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। তখন এখানে আর কোন ভেদাভেদ থাকে না। আবার ব্রত উদযাপনের শেষে শিবগোত্র পরিত্যাগ করিয়া ভক্ত স্বীয় গোত্রে প্রত্যাবর্তন করেন। ওম্যালী সাহেব গেজেটিয়ারে কেবল শূদ্রগণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া মুসলমানদের রমজানের ন্যায় একমাস দিবাভাগে উপবাস করিয়া সূর্যাস্তের পর আহারাদি করেন বলিয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা ঠিক নয়। সর্ববর্ণের নরনারী এই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন; তখন কোন ভেদাভেদ থাকে না। এখনও বহু মুসলমান রোগমুক্তির জন্য ধর্ণা দেন এবং তাহাদের থাকিবার জন্য পৃথক ব্যবস্থা আছে।

এই মেলা ও জনসমাবেশকে কেন্দ্র করিয়া কৃষি মেলা, কুটির শিল্প প্রদর্শনী, লোক সঙ্গীত ও নাটকের আসর অনায়াসেই বসানো যায়। নানারূপ সরকারী তথ্য ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের প্রাচীরপত্র প্রদর্শন করিয়া জনসাধারণকে বুঝানোর এইরূপ সুযোগের সদ্ব্যবহার করা উচিত। গণ-সংযোগের এই সুন্দর সুযোগটি হারানো কখনও উচিত নয়।

ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ হিন্দুতীর্থ তারকেশ্বরধাম শিবরাত্রি মেলা উপলক্ষে অগণিত তীর্থযাত্রীদের কল-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠে। সুদূর পল্লীবাংলার প্রতিটি জেলা হইতে হাজার হাজার পুণ্যলোভাতুর নরনারী শিবক্ষেত্রে মিলিত হইয়া বিভিন্ন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মাদির মাধ্যমে ব্রত উদ্‌যাপন করেন। দোকানপাটের ভীড় এবং বহু

লোকের আনাগোনায় এখানকার নাগরিক জীবন কর্মচঞ্চল হইয়া উঠে। মেলা দুইদিন ধরিয়া চলে মেলার সময় তারকেশ্বর এষ্টেট কর্তৃক স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়।

তারকেশ্বরে দোলোৎসব

স্মরণাতীত কাল হইতে তারকনাথের ধামে বিশেষ উৎসবের মধ্যে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর দোলযাত্রা উৎসব এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করে। দোলের পূর্বদিন সন্ধ্যায় শাস্ত্রীয় বিধিমতে চাঁচড় উৎসবও তারকেশ্বরের এক আকর্ষণীয় বস্তু। মন্দির হইতে আধমাইল দূরে অবস্থিত সাহাপুরের চাঁচড়তলা হইতে মন্দির পর্যন্ত ছড়া দেওয়া হয়, তারপর তারকনাথের ও লক্ষ্মীনারায়ণজীউর সন্ধ্যারতি শেষ হইলে স্থানীয় গোপগণ পূর্বপ্রথানুযায়ী লক্ষ্মীনারায়ণের বিগ্রহ কীর্তন, বাদ্যভাণ্ড ও নানারূপ জয়ধ্বনি সহকারে বাবা তারকনাথের মন্দিরে লইয়া আসে। এই হরিহর-মিলনের অপূর্ব দৃশ্য একটি দেখিবার জিনিষ। মন্দিরে পূজার পর লক্ষ্মীনারায়ণজীউ পূর্ববৎ গোপস্কন্ধে সাহাপুরের চাঁচড়তলায় যান এবং তথায় পূজা ও হোম-যজ্ঞাদির পর চিরপ্রথানুযায়ী চাঁচড়গৃহে অগ্নিসংযোগ করা হয়। অগ্নিশিখার লেলিহান রূপ দেখিবার জন্য বহু লোকের সমাবেশ হয়। পরদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে পূজার পর এষ্টেটের দোলমঞ্চে বিগ্রহ দোলনায় তোলা হয় এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে আবীর ও রঙে-র দ্বারা সমস্ত তারকেশ্বরকে লাল করিয়া দেয়। মোহান্ত মহারাজের বাড়ীর সামনে লক্ষ্মীনারায়ণ জীউর দোলমঞ্চ আছে এবং বাড়ীর মধ্যে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের সুন্দর বিগ্রহ একটি দর্শনীয় বস্তু।

শ্রাবণোৎসব

তারকেশ্বরে শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তিথি অনুসারে কোন কোন বৎসর আষাঢ় মাসের শেষ সোমবার হইতে উৎসব আরম্ভ হয়। প্রতি সোমবার মাড়োয়ারী সম্প্রদায় এই উৎসবে যোগদান করেন। তাঁহারা শেওড়াফুলি হইতে পদব্রজে গঙ্গাজল লইয়া বাবা তারকনাথের অর্চনা করিয়া থাকেন।

জেলা : হুগলী
থানা : তারকেশ্বর

মেলা বিবরণী

রথযাত্রার মেলা

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে মোক্তার-পুর গ্রামের উত্তরপাড়ায় ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দেড় বিঘা জমির উপর দুই দিনের জন্য একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় ষাট-সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

মাকড়ার, আস্তাড়া, তালপুর, মন্থরপুর, চাঁপাডাঙ্গা, রামনারায়ণপুর প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় আট-নয়শত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় প্রধানতঃ তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী ও পান-বিড়ি প্রভৃতির কয়েকটি দোকান বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ চাঁপাডাঙ্গা হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই।

স্নানযাত্রার মেলা

প্রতিহারপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা উপলক্ষে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

এই মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় দুইশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় কুড়ি-বাইশটি দোকানপাট বসে এবং দশ-বারজন ফেরিওয়ালা আসেন। নানারকম জিনিসপত্রের মধ্যে বেতের ও বাঁশের ধামা, কুলা ও মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা ইত্যাদি আমদানী হয়।

এই মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

তারকেশ্বরের চড়কপূজা উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হইল :

শ্রীশ্রীতারকেশ্বর ধামে শ্রীশ্রীচড়কপূজা উপলক্ষ্যে আগামী ২৭শে, ২৮শে এবং ২৯শে চৈত্র সঙ্গীতোৎসব, পূজা এবং মিছিলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলিকাতার বিখ্যাত ওস্তাদ গায়ক প্রো: শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষের তত্ত্বাবধানে তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন শ্রীভরীব সাউয়ের বাটীতে উক্ত সঙ্গীতোৎসব হইবে। বেনারসের বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রীবুন্দী মিশ্র, শ্রীমহাপুরুষ মিশ্র বাঁয়া তবলায় অংশ গ্রহণ করবেন। প্রো: সতীশ চন্দ্র ঘোষ, নলিন মালাকার, নিদান ব্যানার্জী প্রমুখ গায়কগায়িকাগনের সমাবেশ হইবে।

—যুগান্তর, ৬ই এপ্রিল ১৯৫৬।

চৈত্র সংক্রান্তির মেলা উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর ভীড়। বর্ত্তমান ব্যবস্থা ছাড়া আরও অতিরিক্ত ট্রেণের প্রয়োজনীয়তা।

কলিকাতা ১১ই এপ্রিল—চৈত্র সংক্রান্তি মেলা উপলক্ষ্যে গতকাল হইতেই হুগলী জেলার তারকেশ্বরে গাজনের সন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীদেব ভিড় প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শুধু কলিকাতা ও হুগলী জেলা হইতেই নহে, পশ্চিম বাঙ্গলার দূর দূর অঞ্চল হইতেও তারকেশ্বরের নামে উপবাসী সন্ন্যাসীর দল পদব্রজে এবং ট্রেণযোগে যাইয়া জড় হইতেছেন।

হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রী যাতায়াতের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় গতকাল হইতেই রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একখানা আপ ও একখানা ডাউন স্পেশাল ট্রেণ তারকেশ্বর পর্য্যন্ত চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

এই স্পেশাল ট্রেণখানি আগামী ১৪ই এপ্রিল পর্য্যন্ত হাওড়া হইতে যাতায়াত করিতে থাকিবে এবং প্রত্যহ সকাল সাতটা ত্রিশ মিনিটে হাওড়া হইতে ছাড়িবে। ইহা ছাড়া টাইম টেবিল অনুযায়ী প্রত্যহ হাওড়া তারকেশ্বর লাইনে ১১খানা ডাউন ট্রেণ যথারীতি চলাচল করিতেছে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে সংখ্যক যাত্রীর বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে একখানা স্পেশাল ট্রেণ এবং নির্ধারিত অপর ১১খানা ট্রেণে যাত্রীবহন করা সম্ভবপর হইতেছে না। ওয়াকিবহাল মহলের আশঙ্কা আগামী কাল হইতেই যাত্রী সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইবে। ফলে ট্রেণের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি না করিলে যাত্রীদের যাতায়াতে এক সংকট সৃষ্টি হইবে।

যাত্রীরা যাহাতে সুশৃঙ্খলভাবে যাতায়াত করিতে পারে তাহার জন্য রেল পুলিশ বিশেষভাবে ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। টিকিটের কাউন্টারে আজ যাত্রীদের দীর্ঘ লাইন দেখা গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, যাত্রীদের একটি অংশ কিন্তু সরাসরি তারকেশ্বরে যাইতেছেন না।

তাঁহারা শেওড়াফুলিতে অবতরণ করিয়া তথাকার নিমাইতীর্থঘাটে যাইয়া ভাগীরথীতে স্নান করিতেছেন এবং "বাবা তারকেশ্বর"-এর মাথায় জল দিবার জন্য বাঁকে করিয়া ভাগীরথীর জল লইয়া পদব্রজে রওনা হইতেছেন। আবার অপর একটি অংশ শেওড়াফুলিতে ট্রেণে বা বাসে আসিয়া তথা হইতে পুনরায় ট্রেণে তারকেশ্বরে যাইতেছেন।

—যুগান্তর, ১২ই এপ্রিল ১৯৬১।

তারকেশ্বর মেলা—চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে আজ হুগলী জেলার তারকেশ্বরে গাজন সন্ন্যাসীদের এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ মেলায় পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা এবং আসামের বিভিন্ন স্থান হইতে লক্ষাধিক নরনারী আজ সেখানে জমায়েত হন। মেলার যাত্রীদের এক বিরাট অংশ ছিলেন গাজন সন্ন্যাসী। গাজন সন্ন্যাসীদের একাংশ পশ্চিমবঙ্গের সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে পদব্রজে সেখানে যান। তাঁহারা বাঁকে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া সেখানে গিয়া "বাবা তারকেশ্বর"-এর মাথায় ঢালেন। সন্ন্যাসীদের ধারণা যে, ঐ জল তারকেশ্বরের মাথায় ঢালিলে পৃথিবীর লোক শান্তি পাইবেন।

সারা চৈত্রমাস ধরিয়াই তারকেশ্বরে এই মেলা চলে। আজ সকাল হইতে তারকেশ্বর মন্দিরে ভীড় এত বাড়িয়া যায় যে পুলিশ এবং স্বেচ্ছাসেবকদের উহা নিয়ন্ত্রণ করিতে বেশ বেগ পাইতে হয়।

আজ মেলা উপলক্ষ্যে সেখানে অতিরিক্ত ৩০০ শত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। তারকেশ্বর মন্দিরের নিকট বিগত কয়েকদিন ধরিয়া একদল পুণ্যকামী এবং রুগ্ন নরনারী "শিবের মনস্তুষ্টির" জন্য "হত্যা" দিতেছেন। ভীড়ের চাপে তাঁহাদের কয়েকজন তাঁহাদের নির্দিষ্ট স্থান ছাড়িয়া অন্যত্র সরিয়া যাইতে বাধ্য হন। মন্দিরের দরজায় কয়েকজন মহিলা মূর্ছিত হইয়া পড়েন। তাঁহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

তারকেশ্বর মন্দিরের নিকটবর্তী পুকুরে স্নান করিতে গিয়া জনৈকা মহিলা ডুবিয়া গেলে অন্যান্য স্নানার্থীরা তাঁহাকে সুস্থ শরীরেই টানিয়া তোলেন।

—যুগান্তর, ১৪ই এপ্রিল ১৯৬২।

রবিবার ৩১শে চৈত্র—চড়কপূজা হইবে। ঐ মেলা এবং চড়কপূজাকে কেন্দ্র করিয়া হাজার হাজার পুণ্যকামী নরনারী ট্রেণে, বাসে এবং পদব্রজে তারকেশ্বরে রওনা হইয়া যাইতেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান, উড়িষ্যা, বিহার এবং আসামের ও অন্য কোন কোন স্থান হইতে ঐ সকল নরনারী হাওড়া এবং শেওড়াফুলি হইয়া সেখানে যাইতেছেন।

যাঁহারা যাইতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই গাজন সন্ন্যাসী। তাঁহাদের একটি বিরাট অংশ বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থ ঘাট হইতে গঙ্গার জল বাঁকে লইয়া পদব্রজে যাইতেছেন। বৈদ্যবাটী বা শেওড়াফুলি তারকেশ্বর হইতে প্রায় ২০।২১ মাইল দূরে। পদব্রজে যাইবার সময় সন্ন্যাসীদের যাহাতে কোন অসুবিধা না হয়, তাহার জন্য পথিমধ্যে কিছু সংখ্যক জলছত্র খোলা হইয়াছে।

জনশ্রুতি যে, বৈদ্যবাটীর যে ঘাট হইতে গাজন সন্ন্যাসীরা জল লইয়া রওনা হইতেছেন সেই ঘাটে স্বয়ং "নিমাই" স্নান করিয়াছিলেন।

মেলা উপলক্ষে হুগলী জেলার পুলিশের পক্ষ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইতিমধ্যে কিছু সংখ্যক লোক "বাবা তারকেশ্বর"-এর মাথায় জল ঢালিয়া আবার প্রত্যাবর্তন করিতেছেন এবং কিছু লোক তারকনাথের মন্দিরের সম্মুখে "বাবার" কথা পাইবার আশায় "আমৃত্যু" অনশন সুরু করিয়াছেন।

—যুগান্তর, ১৪ই এপ্রিল ১৯৬৩।

তারকেশ্বর (হুগলী), ১৮ই এপ্রিল—চারদিনব্যাপী তারকেশ্বরের বিখ্যাত গাজন বা চৈত্র সংক্রান্তি মেলা

হাওড়া ষ্টেশনে তারকেশ্বরের
গাজন উৎসবে যোগদান
ইচ্ছুক যাত্রীর ভীড়

তারকেশ্বর অভিমুখে মহিলা
যাত্রী---হাওড়া ষ্টেশনের
আর একটি দৃশ্য

বৈদ্যবাটীর নিমাইতীর্থ ঘাট
হইতে তারকেশ্বরের পথে
গঙ্গাজলের বাঁক কাঁধে
সন্ন্যাসীর দল

তারকেশ্বরের পথে
আর একদল সন্ন্যাসী

তারকেশ্বরের পথে জনৈকা
মানতকারিণী

তারকেশ্বর মন্দিরের বাহিরে
উন্মুক্ত প্রান্তরে হবিষ্যান্ন রন্ধনরত
গাজনের সন্ন্যাসী
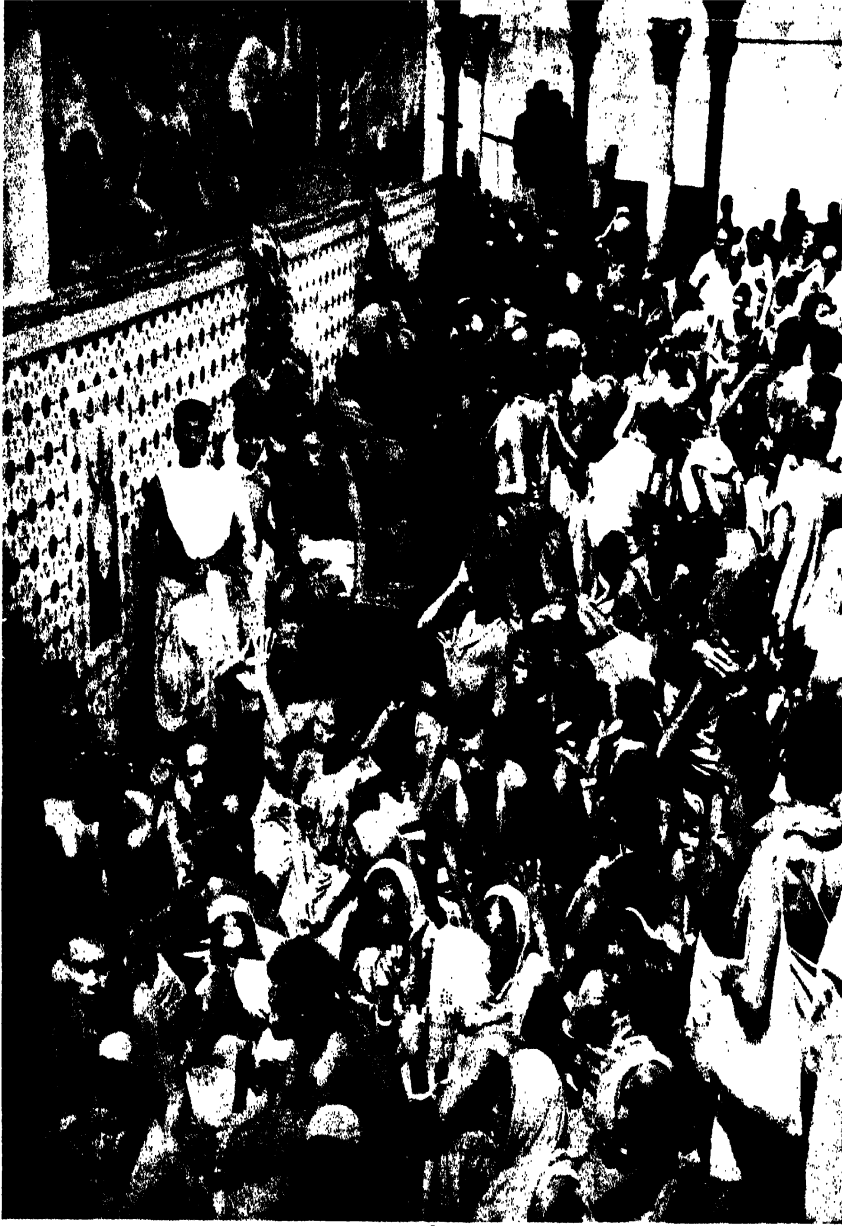
তারকেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরে
প্রবেশ ইচ্ছুক প্রতীক্ষারত
ভক্ত ও সন্ন্যাসীর দল

তারকেশ্বর মন্দিরের বাহিরে
মানতকারী ভক্ত ও
সন্ন্যাসীর দল
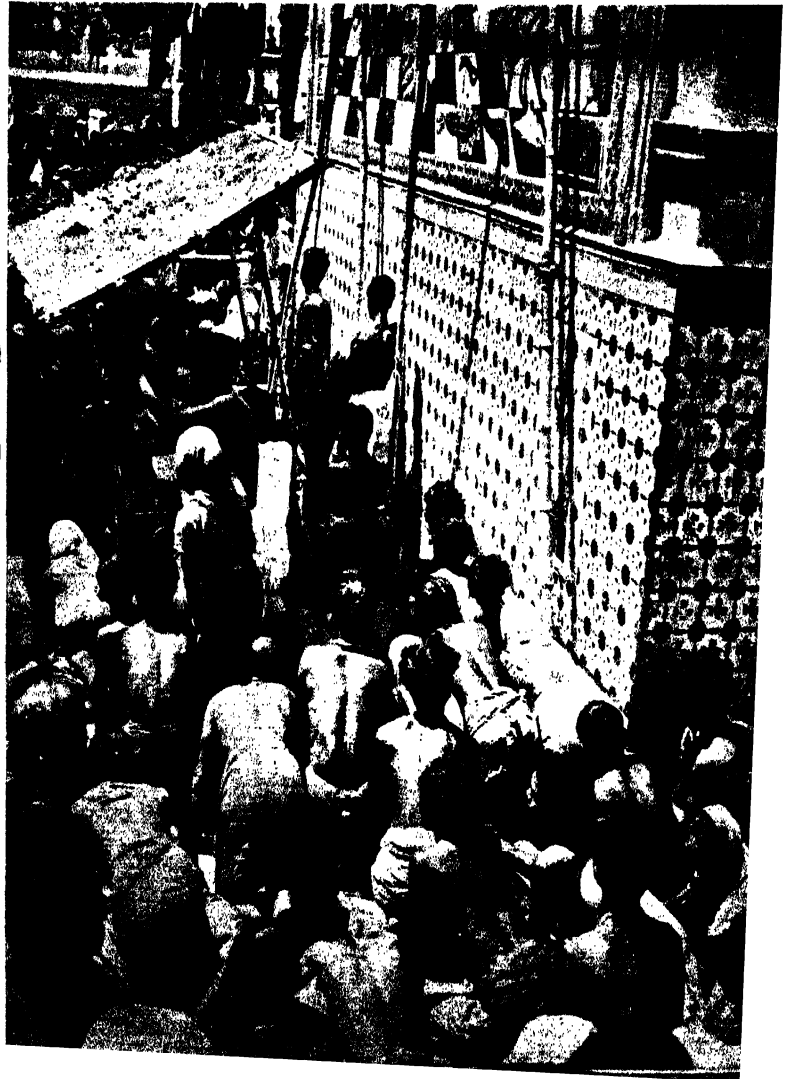
তারকেশ্বর মন্দিরে দণ্ডীর মা ও সন্তান

তারকেশ্বর শিবমন্দির

তারকেশ্বরে গাজন
মেলার একটি দৃশ্য

তারকেশ্বরে গাজন মেলার
আর একটি দৃশ্য

বাঁশবাটির প্রখ্যাত হংসেশ্বরী মন্দির

হংসেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন বাসুদেব মন্দির

মাহেশের রথযাত্রা

মাহেশে রথযাত্রায়
দর্শক সমাবেশ

ব্যাণ্ডেল গীর্জা

হুগলীতে বড়ালদের
ঠাকুরবাড়ী

অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই উপলক্ষে এই বৎসর দেড় লক্ষাধিক নরনারী তারকেশ্বরধামে সমবেত হয়।

ইষ্টার্ন রেলওয়ের নিয়মিত ট্রেণ ব্যতীত কয়েকখানি বিশেষ ট্রেণ যাতায়াত করে। তারকেশ্বর, বর্ধমান, চুচুঁড়া, সেওড়াফুলি ও চাঁপাডাঙ্গার মধ্যে যাত্রিবাহী বাসসমূহ যাতায়াত করে। এবার মেলায় যে দর্শনার্থী বা গাজন সন্ন্যাসীর সমাগম হয় তন্মধ্যে ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী বলিয়া জানা যায়।

তারকেশ্বর টাউন ক্লাব, সেণ্ট জন্‌স্ এ্যাম্বুলেন্স এবং বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান মেলায় সেবাকার্যে নিয়োজিত থাকে। মেলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বিশেষ পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা থাকে। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারিগণ মেলা পরিদর্শন করেন। পশ্চিমবঙ্গ জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মিগণ মেলায় আগত তীর্থযাত্রীদের কলেরা ও বসন্ত প্রতিষেধক টিকা দানের কয়েকটি ভ্রাম্যমান শিবির খোলেন। কোনরূপ বিশেষ দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। আহত ও অসুস্থ ব্যক্তির জন্য প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকজনকে তারকেশ্বর থানা স্বাস্থ্য-কেন্দ্রে ও তারকেশ্বর দাতব্য চিকিৎসালয়ে ভর্তি করা হয়। মেলায় পানীয় জল সরবরাহ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিশেষ অব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়।

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

তারকেশ্বর শিবরাত্রি উপলক্ষে বিভিন্ন সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে তারকেশ্বরে বিরাট মেলা—আজ শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে হুগলীজেলায় তারকেশ্বরে বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। মেলাতে প্রায় লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে তাঁহারা ট্রেণে, বাসে এবং পদব্রজে সেখানে যান। কিছু সংখ্যক ভক্ত দূর দূরাঞ্চল হইতে বাঁকে করিয়া গঙ্গাজল লইয়া সেখানে উপস্থিত হন।

তারকেশ্বরের মেলায় আজ ভিড়ের জন্য কয়েকজন অচৈতন্য হইয়া পড়েন। তাহাদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। মেলায় সমাজবিরোধী দৌরাত্ম্য-দমনকল্পে এবং অবস্থা আয়ত্তে রাখার জন্য ৪০০ শত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

হুগলী জেলার পুলিশ সুপার শ্রী এন. বি. চৌধুরী জানান যে, ঐ স্থানে মেলা শান্তিপূর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আজ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ হাওড়া হইতে একখানা স্পেশাল এবং শেওড়াফুলি হইতে দুইখানা সাট্‌ল ট্রেণ তারকেশ্বরে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও অতিরিক্ত ভিড়ের জন্য অনেক যাত্রী তারকেশ্বরে যাইতে পারেন নাই বলিয়া জানা গিয়াছে।

—যুগান্তর, ৫ই মার্চ ১৯৬২।

তারকেশ্বর, ৯ই মার্চ—ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থ তারকেশ্বরধামে দুইদিনব্যাপী শিবরাত্রি উৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়। শনিবার সকাল হইতেই হাজার হাজার পুণ্যকামী নরনারী শেওড়াফুলি হইতে সুদীর্ঘ বাইশ মাইল পথ পদব্রজে গঙ্গাজল লইয়া এখানে আসে। ইহাদের মধ্যে অবাঙ্গালীর সংখ্যাই বেশী। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব তীর্থযাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার পর সহর ও গ্রামাঞ্চল হইতে বাঙ্গালী যাত্রীর সমাবেশ ঘটিতে দেখা যায় এবং সন্ধ্যায় সমগ্র তারকেশ্বর জনারণ্যে পরিণত হয়। সারারাত্রি তাহারা যথারীতি পূজা ও অন্যান্য অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে ব্রত উদ্‌যাপন করে। মেলায় বিভিন্ন পণ্যসামগ্রীর দোকান ছাড়াও সার্কাস, ম্যাজিক প্রভৃতি আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। মেলা উপলক্ষে কয়েকটি অতিরিক্ত ট্রেণ ও বিভিন্ন রুটে বাস দেওয়া হয়। কিন্তু ভীড়ের তুলনায় উহা অকিঞ্চিৎকর মনে হইতেছিল। ইহা ছাড়াও প্রাইভেট গাড়ী, সাইকেল রিক্সা ও পায়ে হাঁটিয়া বহু লোক আসে। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এই মেলায় লক্ষাধিক লোক সমাগম হয়। ছোটখাট কয়েকটি ঘটনা ছাড়া মেলা নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হয়।

তারকেশ্বর টাউন ক্লাব, সেণ্ট জন্‌স এ্যাম্বুলেন্স, তীর্থযাত্রী নিবাস মালিক সঙ্ঘ, কলিকাতার কাঠগোলা নব যুবক সঙ্ঘ এবং আরও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও সরকারী বিভাগ মেলায় বিভিন্ন সেবাকার্যে অংশ গ্রহণ করেন।

—বসুমতী, ২৭শে ফাল্গুন ১৩৬৫।

তারকেশ্বর অন্নকুট উৎসব সম্পর্কে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

তারকেশ্বর, ৯ই নভেম্বর ১৯৫৯—গত ১লা নভেম্বর এখানে কালীবাড়ী মাঠে অনুষ্ঠিত তারকেশ্বর অন্নকূট উৎসবের তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠান বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে সুসম্পন্ন হয়। গ্রামাঞ্চল হইতে বহুসংখ্যক পুণ্যকামী নরনারী সকাল হইতেই উৎসব প্রাঙ্গণে অন্নকূট দর্শনের জন্য অধীর আগ্রহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অবস্থান করে। শাস্ত্রীয়ভাবে যথারীতি পূজা কার্য সম্পন্ন হইলে তারকেশ্বর মঠাধীশ আনুষ্ঠানিকভাবে অন্নকূট উৎসবের উদ্বোধন করেন। ইহার পর অপেক্ষামান জনতা অন্নকূট দর্শনা-কাঙ্খায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠে। অতঃপর প্রসাদ বিতরণ সুরু হয়। এই সময় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে নরনারীগণ যেন জাতপাতের কথা ভুলিয়া যায়। পরম আনন্দে এক পংক্তিতে বসিয়া তাহাদের প্রসাদ ভক্ষণের দৃশ্যটি খুবই উপভোগ্য হয়। স্থানীয় যুবকগণ অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে রাত অবধি প্রসাদ বিতরণ করেন। সমিতির মুখপাত্রগণ উদ্বৃত্ত অর্থাদি বন্যার্তদের সাহায্যার্থে পাঠাইবেন বলিয়া জানান।

৪ঠা কার্তিক ১৩৬৭ সন—তারকেশ্বর অন্নকূট উৎসবের ৪র্থ বার্ষিক অনুষ্ঠান তারকেশ্বর মন্দির সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইবে। উৎসব উপলক্ষ্যে শ্রীমতী কান্তিলতা দেবীর ভাগবত পাঠ ও কথকতা, বিখ্যাত রামায়ণ গান কথক ও গায়ক শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তীর রামায়ণ গান, কীর্তন, ধর্মসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী শ্রীতরুণ কান্তি ঘোষ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবেন।

তারকেশ্বর মহারুদ্র যজ্ঞ সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত দুইটি সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

৬ই আগষ্ট বেলা ১১ টায় তারকেশ্বরধামে মহারুদ্র যজ্ঞের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী প্রধান অতিথি, শ্রীপূজ্যপাদ মোহন্তজী উদ্বোধন ও শ্রীকালিপ্রসাদ খৈতান সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন। বহু দেশ-দেশান্তর হ'তে পণ্ডিত সাধু ও দর্শকের সমাগম হয়। ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহারুদ্র যজ্ঞের ব্যাখ্যা করে ভাষণ দেন ও বর্তমান পরিস্থিতিতে ঠিক এই সময় এইরূপ একটি যজ্ঞের বিশেষ প্রয়োজন উল্লেখ করেন। সকলকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।"

—১২ই আগষ্ট, ১৯৫৯।

গত ২০শে শ্রাবণ হইতে তারকেশ্বরে মহারুদ্র যজ্ঞ আরম্ভ হইয়া ৩১শে শ্রাবণ যজ্ঞের সমাপ্তি হয়। হাজার হাজার পুণ্যার্থী যজ্ঞ দর্শন করেন। ৩০ জন ব্রাহ্মণ এই যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রতী ছিলেন। প্রত্যহ ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং তারকেশ্বর হরিনাম প্রদায়িনী সভা কর্তৃক ভোর ও সন্ধ্যায় নাম কীর্তন ও ভজন প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। ১১ই আগষ্ট পূজ্যপাদ মোহান্ত মহারাজ হৃষিকেশ আশ্রমের সভাপতিত্বে রামায়ণ রচয়িতা তুলসী দাসের জন্মোৎসব অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে পূজ্যপাদ মোহান্ত মহারাজ, শ্রীদীঘাপতি ভট্টাচার্য ও কয়েকজন বিশিষ্ট পণ্ডিত তুলসীদাসের জীবনী সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৪ ই আগষ্ট পণ্ডিত রামরতন সাংখ্য-শাস্ত্রী ভাগবত পাঠ করেন।

—১৯শে আগষ্ট, ১৯৫৯।

তারকেশ্বরের শ্রাবণী মেলা সম্পর্কে আনন্দ-বাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদ প্রকাশিত হয়।

তারকেশ্বর (হুগলী), ৫ই আগষ্ট—'ভোলে বাবা, পার কারেগা.' 'ভোলে ব্যোম,' ধ্বনি উঠিতেছে—উচ্চ, মৃদু, কাতর কণ্ঠস্বর, কাঁধে গঙ্গাজলের ভার, বৈদ্যবাটী হইতে তারকেশ্বর ২২ মাইল সুদীর্ঘ পথ—পদব্রজে চলিয়াছে তীর্থযাত্রীর দল—তারকেশ্বর শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে। রবিবার সারারাত ধরিয়া কলমুখরিত করিয়া চলে তীর্থ-যাত্রীর দল—এমনইভাবে শ্রাবণ মাসে শুভ সোমবার শিবপূজায় উদ্দেশ্যে। এ ছাড়া আছে মোটর বাস, ট্রেণ। শ্রাবণের সোমবারে তারকেশ্বরে জমা হয় শত শত নয় সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী। অধিকাংশ অবাঙালী ও মাড়োয়ারী

সম্প্রদায়। মন্দিরের চত্বর হইতে প্রায় দীর্ঘ এক মাইল পথে ভোর হইতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকে পথ-শ্রান্ত ভক্ত, শিশু, নারী, যুবা, বৃদ্ধা পূজার্থীর দল। পূজা যখন শেষ হয়, ভীড় যখন কমে তখন সূর্য পশ্চিম গগনে—অর্থাৎ বেলা পড়িয়া আসে। খাবারের দোকানে দোকানে পসরা হয় শূন্য, স্টেশনে স্পেশ্যাল ট্রেণের ব্যবস্থা, কাতারে কাতারে ট্রেণে ওঠার জন্য যাত্রীর ভীড়। এতেও ট্রেণে যেন স্থান সংকুলান হয় না। শ্রাবণী মেলার প্রতি সোমবার তারকেশ্বরে যে মেলা হয় গত ১লা আগষ্ট তাহার সমাপ্তি হইল।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা" গ্রন্থে সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্ত-পূজা সম্পর্কে নিম্নলিখিত একটি বিবরণী পাওয়া যায়।

(২ ফেব্রুয়ারি ১৮২২। ২১ মাঘ ১২২৮) গুপ্তপূজা—"সমাচার পাওয়া গেল যে পশ্চিম অঞ্চলে মোকাম তারকেশ্বর সন্নিকটে শিববাটী কালিকাপুর গ্রামের অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর মাঠে এক প্রসিদ্ধা সিদ্ধেশ্বরী প্রতিমা আছেন সম্প্রতি ৯ মাঘ সোমবার রটন্তী পূজার রাত্রিতে ঐ সিদ্ধেশ্বরীর গুপ্তরূপে পূজা হইয়াছে সে পূজা কে করিল তাহা স্থির হয় নাই কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে সেই সিদ্ধেশ্বরীর সেবাকারি ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া পূজার আয়োজন দেখিয়া চমৎকৃত হইল। চারি জোড় পট্ট বস্ত্র ও চারিবর্ণের চারিখান পট্ট শাড়ী বস্ত্র আর ঘড়া প্রভৃতি এক প্রস্থ তৈজস পাত্র এবং প্রচুর উপকরণযুক্ত নৈবেদ্য ও আট প্রমাণ পিতলের বাটিতে আট বাটি রক্ত আছে ইহাতে অনুমান হয় যে আট বলিদান করিয়াছিল ও বলিদানের চিহ্নও আছে কিন্তু কি বলিদান করিয়াছিল তাহার নিদর্শন কিছু নাই কেহ কেহ অনুমান করে যে নর বলি হইয়া থাকিবেক। এবং নগদ ৫ পাচটী টাকা রাখিয়াছে ও লিখিয়া রাখিয়াছে যে এই তাবৎ সামিগ্রী ও পাঁচ টাকা দক্ষিণা সেবাকারি ব্রাহ্মণের কারণ রাখা গেল।" [পৃঃ ২৬২]

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ শ্রীরামপুর

হুগলী জেলার শ্রীরামপুর নিবাসী শ্রীযুত ফনীন্দ্র নাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত "Some sites of interest & Institutions of note in Serampore" এবং "শ্রীরামপুর পরিচিতি" নামক প্রবন্ধের ভিত্তিতে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক রচিত শ্রীরামপুরের উৎসব-পার্বণ সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা হইল।

শ্রীরামপুর হাওড়া হইতে প্রায় ১৩ মাইল দূরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত এবং হুগলী জেলার অন্যতম মহকুমা।

১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই থানার আয়তন ২২·৪ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা ১,৯৭,৩৪৫। পূর্বরেল পথে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। বালিখাল হইতে মোটরবাসেও এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

শ্রীরামপুর নামে প্রাচীন নহে। অধুনাতন শ্রীরামপুর অঞ্চল মোগল যুগে সেওড়াফুলীর রাজা মনোহর চন্দ্র রায় মহাশয়ের জমিদারীভুক্ত ছিল। রাজা মনোহর চন্দ্র সন ১১৬০ সালে শ্রীরামপুরে শ্রীশ্রীরামচন্দ্রজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া তদাধিকৃত শ্রীপুর, মোহনপুর ও গোপীনাথপুর গ্রাম তিনখানির আয় উপসত্ব উক্ত ৺রামচন্দ্রের সেবার্থে নিয়োগ করিয়া উক্ত গ্রামত্রয়ের "শ্রীরামপুর" বলিয়া নামকরণ করেন। তদবধি এস্থান শ্রীরামপুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন সুহ্মদেশের রাঢ়াঞ্চলের অন্তর্গত ভাগীরথী তীরবর্তী এস্থানের যথেষ্ট ঐতিহ্য বর্তমান। মোগলরাজ্যে এতদঞ্চল সরকার সপ্তগ্রামের সামিল চাকলা ভূরশুটের অন্তর্গত বোরা পরগণার একাংশ বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। এস্থান পূর্বাপর সজ্জনবহুল হইলেও ঐ সম্প্রদায় এস্থানের সমগ্র অধিবাসীগণের সংখ্যা তুলনায় মুষ্টিমেয় মাত্র ছিলেন এবং বিরাট জনসংঘ কৃষ্টি বিষয়ে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ ও উচ্চস্তরের স্মার্তবাদিগণের সহিত সম্পূর্ণ সম্পর্ক রহিত হইয়া তথাকথিত সাম্যবাদে আকৃষ্ট হওয়ায় নিকৃষ্ট তান্ত্রিক, বৌদ্ধ বা ধর্মপূজায় অনুরক্ত হন। নিদর্শন স্বরূপ আজিও চাতরা, মধ্য শ্রীরামপুর ও পূর্ব শ্রীরামপুরে ধর্মের আস্তানা বর্তমান রহিয়াছে। সমাজের এবম্বিধ অবস্থায় এতদঞ্চলে শ্রীচৈতন্যদেবের সাম্যনীতি বিশেষভাবে প্রচারিত হয়। শ্রীরামপুরের মধ্যস্থলে, পূর্ব ও পশ্চিমে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গগণ চাতরায় শ্রীগৌরাঙ্গ, বল্লভপুরে শ্রীরাধাবল্লভ ও মাহেশে শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার্চ্চনা প্রচলিত করেন ও স্থানে স্থানে আখড়া স্থাপিত হওয়ায় আচণ্ডাল জনগণের মধ্যে এমন একটি উচ্চাঙ্গের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় যাহার ফলে স্মার্তবাদী উচ্চস্তর ও সমন্বয়বাদী জনগণের মধ্যে স্বতঃই সকল পার্থক্য তিরোহিত হয়। এস্থানে সামাজিক সর্বস্তরের মনোবৃত্তি এমনভাবে গঠিত যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে কখনও কোন বিরোধ হয় নাই। কিন্তু পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এস্থান প্রভাবান্বিত হওয়ায় এস্থানের কৃষ্টিধারা ক্রম বিবর্তনের কাল বলিয়া অনুমিত হয়। পূর্ব বর্ণিত কৃষ্টি-সংঘাত বহিরাগত ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের সংস্পর্শ প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয় এবং সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী নানা প্রকার কারু ও কুটীর শিল্পে আত্মনিয়োগ করায় ও ধনীজনেরা অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য বিষয়ে লিপ্ত হওয়ায় এস্থানের সমৃদ্ধি স্বতঃই বর্দ্ধিত হয়। সজ্জন ও শ্রেষ্ঠী-জনের সমন্বয়ে শ্রীরামপুর অঞ্চল যে অভিনব জগৎ সৃজন করে তদ্বারা পাশ্চাত্যেও তাহার সত্তা স্বীকৃত হয়।

বল্লভপুর—রাধাবল্লভজীউর মন্দির

শ্রীরামপুরের আকনা অঞ্চল ও মাহেশের পশ্চিমাংশ লইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের পার্ষচর পণ্ডিত রুদ্ররাম রাধাবল্লভ জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা কালাবধি এস্থান বল্লভপুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। শ্রীরামপুরের পার্শ্ববর্তী চাতরা নিবাসী বৈষ্ণবচূড়ামণী শ্রীচৈতন্য পরিকর পণ্ডিত কাশীশ্বরের জ্যেষ্ঠ ভাগিনেয় শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ পণ্ডিত রুদ্ররাম এই গ্রামে ভাগীরথীর তীরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫৪৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

এই মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে প্রবাদ আছে যে, পণ্ডিত কাশীশ্বর অত্যন্ত গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি

প্রত্যহ স্বহস্তে তাঁহাদের কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজাদি করিতেন। 'তিনি কোন অ-বৈষ্ণবকে এই বিগ্রহ স্পর্শ করিতে দিতেন না। একদা কাশীশ্বর কার্যোপলক্ষে বাহিরে গমন করিলে তাঁহার গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে বিলম্ব দেখিয়া তাঁহার ভাগিনেয় শাক্তধর্মাবলম্বী রুদ্ররাম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপূজা সমাধা করেন। গৃহে ফিরিয়া এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া কাশীশ্বর অত্যন্ত কুপিত হন এবং ভাগিনেয় রুদ্ররামকে লাঞ্ছিত করেন। মনকষ্টে রুদ্ররাম গৃহত্যাগ করিয়া বর্তমান বল্লভপুরে নির্জন স্থানে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় দিন অতিবাহিত করিতে থাকেন। তাঁহার ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা গৌড়ের বাদশাহের প্রাসাদ হইতে শিলা সংগ্রহ করিয়া এই স্থানে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতে স্বপ্নাদেশ দেন। রুদ্ররাম গৌড়ে উপস্থিত হইয়া বাদশাহের হিন্দু প্রধান মন্ত্রী সাহায্যে একটি শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইলেন বটে; কিন্তু ঐ শিলাখণ্ড বল্লভপুরে আনয়ন করা তাঁহার পক্ষে সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। এই সময় তাঁহার আরাধ্য দেবতা স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে বল্লভপুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভাগীরথীর তীরে প্রতীক্ষা করিতে নির্দেশ দেন। রুদ্ররামের প্রত্যাবর্তনের অনতিবিলম্বে বল্লভপুরের ঘাটে যে স্থানে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃস্নান করিতেন সেই স্থানে গঙ্গায় ভাসিয়া উক্ত শিলাখণ্ড আসিয়া উপস্থিত হইল।

আরো শোনা যায় যে, বাদশাহের প্রধান মন্ত্রী বাদশাহের নিকট রুদ্ররামের জন্য উক্ত শিলাখণ্ডটি প্রার্থনা করিলে প্রথমে বাদশাহ উহা দান করিতে অস্বীকৃত হন। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে বাদশাহ লক্ষ্য করিলেন তাঁহার প্রাসাদের একটি শিলাখণ্ড হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল বাহির হইতেছে। এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রধান মন্ত্রীর অনুরোধে অবশেষে বাদশাহ রুদ্ররামকে ঐ শিলাখণ্ডটি দান করেন।

যাহাই হউক, অতঃপর রুদ্ররাম উক্ত শিলাখণ্ডটিকে পূজার্চনা করিতে আরম্ভ করিলে পর একদা জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকটে আসিয়া হাজির হন এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত শিলাখণ্ড হইতে তিনটি অতি সুন্দর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া দেন। কাশীশ্বর রুদ্ররামের ভক্তিতে প্রীত হইয়া দেবসেবার যাবতীয় ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং তাঁহার তিন ভগিনেয়কে উক্ত তিনটি কৃষ্ণমূর্তির সেবার ভার অর্পণ করেন। জ্যেষ্ঠ রুদ্ররাম রাধাবল্লভজীউর, মধ্যম রামরাম খড়দহের শ্যামসুন্দরজীউর ও কনিষ্ঠ লক্ষ্মণ সাইবনের নন্দদুলাল জীউর সেবা ভার গ্রহণ করেন।

সম্ভবতঃ ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে রাধাবল্লভজীউর পুরাতন মন্দিরটি নির্মিত হয়। তৎপরে সুন্দর রাসমঞ্চ, বল্লভজীউর ঘাট ও চাঁদনী নির্মিত হয়। অনন্তর গঙ্গার ভাঙ্গন উক্ত মন্দিরের পদমূলে পৌঁছিলে সেবায়েতগণ আশঙ্কান্বিত হইয়া বিগ্রহ স্থানান্তরিত করেন এবং মন্দিরটি অরক্ষিত অবস্থায় ক্রমশঃ জীর্ণাবস্থাগ্রস্ত হয়। পরিত্যক্ত এই মন্দিরটি সাময়িক ভাবে কিছুকাল খৃষ্টানদের গীর্জা স্বরূপে ব্যবহৃত হয় এবং মন্দিরে পাদ্রী হেনরী মার্টিন সাহেবও কিছুকাল বসবাস করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে মন্দিরটি সংস্কৃত হইয়া পুরাকীর্তি রক্ষা আইনে সংরক্ষিত হয়। সরকারীভাবে ইহা "হেনরী মার্টিন প্যাগোডা" বলিয়া পরিচিত।

বর্তমান বল্লভপুরের রাধাবল্লভজীউর বৃহদাকার মন্দিরটি কলিকাতা নিবাসী নয়ন চাঁদ মল্লিক ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে নির্মাণ করাইয়া দেন। এই মন্দিরেই রাধাবল্লভ জীউর বিগ্রহ আছে এবং নিত্য সেবাপূজা ও বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে বৈষ্ণব উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে। মাহেশের জগন্নাথ মন্দিরের কর্তৃপক্ষের সহিত মনোমালিন্যের কারণে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরে জগন্নাথদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রথযাত্রা উৎসবের প্রচলন করা হয়।

রাধাবল্লভজীউর শ্রীমূর্তি অতীব মাধুর্য সম্পন্ন থাকায় মহারাজ নবকৃষ্ণ আকৃষ্ট হইয়া ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মাতৃ শ্রাদ্ধ ব্যপদেশে উক্ত বিগ্রহ নিজ ভবনে লইয়া যান এবং প্রত্যাবর্তন করিতে অনিচ্ছুক হইলেও সেবায়েতগণের সম্মতি না পাওয়ায় বিগ্রহ ফেরত দিতে বাধ্য হন। কিন্তু শ্রীবিগ্রহের ব্যবহারের জন্য নানাবিধ স্বর্ণালঙ্কার ও সেবার জন্য ভূসম্পত্তি অর্পণ করেন। পরবর্তীকালে সেবার জন্য অপরাপর ভক্তগণ কর্তৃক বহু অর্থ ও সম্পত্তি

প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীজীউর অধিষ্ঠান হেতু প্রতিনিয়ত অসংখ্য ভক্তবৃন্দের পাদস্পর্শে এই গ্রাম একটি বিশিষ্ট বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হইয়াছে। বল্লভজীউর রথ ইদানীং অপ্রচলিত হইলেও রথযাত্রা ও অপরাপর বৈষ্ণব পার্বণে শত শত ভক্তের আগমন অব্যহত রহিয়াছে। রুদ্ররামের বংশধরগণই বংশপরম্পরায় রাধাবল্লভজীউর মন্দিরে সেবাইতের কার্য পালন করিতেছেন।

শ্রীরামপুরে দুইটি খৃষ্টানদিগের গীর্জা ও একটি মানিক-পীরের আস্তানা আছে। উহার মধ্যে ওলফ্ গীর্জাটি ১৮০৮ এবং রোমান ক্যাথেলিক গীর্জাটি ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাভিন্ন শ্রীরামপুরে ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশী তিথির পরদিন হইতে এক মাসব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি "ক্ষেত্র সাহার মেলা" নামে প্রসিদ্ধ। এই মেলা উপলক্ষে একটি কৃষিপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং মৃৎ পুতুলের মাধ্যমে দশমহাবিদ্যা ও নানারূপ সমাজচিত্র প্রদর্শিত হয়। এই সকল মৃন্ময়মূর্তি কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত মৃৎশিল্পী দ্বারা নির্মিত। আমোদ-প্রমোদের জন্য প্রতি বৎসর পুতুলনাচ হইয়া থাকে।

চাতরা—গৌরাঙ্গজীউর মন্দির

শ্রীরামপুরের পশ্চিমে চাতরা গ্রাম। চাতরা শব্দ "ছত্রপুর" শব্দের অপভ্রংশ। পূর্বে ঐ গ্রাম ছত্রপুর বলিয়া পরিচিত ছিল। পরে জনৈক বাসুদেব ভট্টাচার্যের নামানুসারে মৌজাটি বাসুদেবপুর বলিয়া উল্লিখিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই বাসুদেব ভট্টাচার্যই চাতরার চৌধুরীপাড়ার একটি মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার পুত্র শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পরিকর কাশীশ্বর পণ্ডিত বলিয়া বৈষ্ণব জগতে বিখ্যাত হন ও তিনি পিতৃ প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের সহিত মন্দির নির্মাণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে তিনি গৌড়ের বাদশাহ সরকারে চাকলা সপ্তগ্রামের দেওয়ান শ্রীমদ্ উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের খুল্লতাতের অধীনে নায়েব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এবং গৌড়ের বাদশাহের আবাস হইতে বারিক্ষরণকারী একখণ্ড কৃষ্ণপ্রস্তর প্রাপ্তে তাহা হইতে তিনটি শ্রীকৃষ্ণ মূর্তি প্রস্তুত করাইয়া তাঁহার তিন ভাগিনেয়কে সেবার ভারার্পণ করেন।

পরম বৈষ্ণব প্রভুপাদ কাশীশ্বর পণ্ডিতের আহ্বানে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্য শ্রীগৌরাঙ্গ ঐ মন্দিরে কীর্তন করেন ও দুইটি রথযাত্রার অন্তবর্তী হরিবাসরে শ্রীশ্রীরাধাবল্লভজীউর পাটে দ্বাদশ গোপালসহ মহামহোৎসবে যোগদান দান করেন এবং পথিমধ্যে শ্রীপুরে (শ্রীরামপুরে) ৺কানাই লাল জীউর অঙ্গনে কীর্তনানন্দে বিভোর হন। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে বর্গীদের দ্বারা শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দিরের অলঙ্কারাদি লুন্ঠিত হয়। প্রবাদ এই যে, কাশীশ্বর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বাঁকুড়ার বীর হাম্বির লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তাঁহার পৌত্র গোপাল সিং শ্রীবিগ্রহটি এক লক্ষ টাকা কর্জায় জামিনে রাখিয়া কলিকাতা নিবাসী ৺গোকুল মিত্রের নিকট আবদ্ধ রাখেন। কিন্তু কর্জাকৃত টাকা পরিশোধ করিতে না পারায় শ্রীবিগ্রহ ৺গোকুল মিত্রের স্থাপিত মন্দিরেই আজিও সেবিত হইতেছেন। উক্ত মূর্তি অপহৃত হওয়ায় ৺কাশীশ্বরের বংশীয়গণ শূন্য মন্দিরে প্রায় আশীতি বর্ষ যাবত উদ্দেশ্যে সেবা প্রচলিত রাখিয়া পরে একটি নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আজিও মন্দিরে বৈষ্ণব ব্যবস্থায় যাবতীয় যাত্রা নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হয়। কাশীশ্বরের প্রতিষ্ঠিত তুলসীমঞ্চ শ্রীশ্রীবৃন্দাবনধামে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। স্মার্ত্যবাদ ও তন্ত্রবাদ এস্থানে প্রাবল্য লাভ করিলেও শ্রীচৈতন্য যুগের ভক্তিবাদ প্রচলনের অন্তবর্তীকালে সাম্যবাদী ধর্মপূজার স্রোত এস্থানে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

চাতরা গ্রামে জনাই নিবাসী জমিদার ৺কালীবাবুর বিখ্যাত শ্মশানঘাট, ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের বলরাম (দেওয়ান) হালদার বংশের প্রতিষ্ঠিত শিবালয় ও জাগ্রত দেবী শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন।

ইহাভিন্ন, এই স্থানে একটি প্রাচীন শীতলা মন্দির আছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে মহাসমারোহে শীতলা দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসব উপলক্ষে বহু যাত্রীর সমাগম হয় এবং তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে।

আকনা—মদনমোহনজীউর মন্দির

সেওড়াফুলির রাজা মনোহর চন্দ্র রায়ের জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত শ্রীরামপুরের নিকটবর্তী মোহনপুর গ্রামে

বর্তমানে যে স্থানে ওলফ্ হাসপাতালটি অবস্থিত পূর্বে তথায় দক্ষিণ ভারতীয় রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবদিগের একটি আখড়া ছিল। এই বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। রাজা মনোহর চন্দ্র রায় আখড়া প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় জমি দান করেন। এই আখড়ায় বৈষ্ণবগণ মদনমোহনজীউ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

কোন অজ্ঞাত কারণে আখড়ায় বসবাসকারীরা উক্ত বিগ্রহের সেবাপূজার কোনরূপ ব্যবস্থা না করিয়াই হঠাৎ একদিন আখড়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

অতঃপর ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তৎকালীন দিনামার সরকার বিগ্রহের সেবাপূজার নিমিত্তে মাসিক ১০৲ ব্যয় বরাদ্দ করিয়া উক্ত বিগ্রহ জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্টেট ৺গোপাল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট গচ্ছিত রাখেন। তিনি স্বগৃহে বিগ্রহের সেবাপূজার ব্যবস্থা করেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে দিনামার সরকার যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট শ্রীরামপুরের উপর তাঁহাদের প্রভুত্ব হস্তান্তরিত করেন তখন এই বিগ্রহের সেবাপূজার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এককালীন ১০,০০০ টাকা দান করেন। এই টাকা পাইয়া শ্রীমুখোপাধ্যায় দেবালয় নির্মাণ কার্য আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার জীবদ্দশায় মন্দির নির্মাণ সমাপ্ত না হওয়ায় তাঁহার পত্নী তাঁহার আরব্ধ কার্য সমাপ্ত করিয়া মন্দিরে উক্ত মদনমোহনজীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই মন্দির স্থানীয় ভক্তদের তত্ত্বাবধানে আছে।

আকানায় বরকা গাজী পীরের একটি আস্তানা আছে। আস্তানাটি ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় বলিয়া জানা যায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পীরের আস্তানায় মানত পূজাদি দিয়া থাকেন।

মাহেশ—জগন্নাথদেবের মন্দির ও রথযাত্রা

মাহেশ সুপ্রাচীন গ্রাম। কাশীরাম দাসের মহাভারতে এস্থানের নামোল্লেখ রহিয়াছে। এস্থানে ধ্রুবানন্দ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অগ্রদূত ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী ভাগীরথীর তীরে জগন্নাথদেবের মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার্চনা করিতেন বলিয়া জানা যায়। কিংবদন্তী আছে একদা ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী জগন্নাথ দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্রে গমন করেন। তথায় জগন্নাথদেব স্বপ্নাদেশে তাঁহাকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে বলেন; এবং আরো জানান যে, তিনি শীঘ্রই মাহেশে জগন্নাথদেবের দর্শন পাইবেন। স্বপ্নাদেশ অনুসারে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী মাহেশে আসিয়া উপস্থিত হন এবং ভাগীরথীর কূলে জগন্নাথদেবের বিগ্রহ পাইয়া তথায় মন্দির নির্মাণ করতঃ জগন্নাথদেবের নিত্য-পূজাদি ব্যবস্থা করেন। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দে ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী দেহরক্ষা করিলে পর ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীগণ শিষ্য পরম্পরায় দীর্ঘকাল শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবা প্রচলিত রাখিয়া অবশেষে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তরঙ্গ কমলাকর পিপ্পালাইয়ের উপর দেবসেবার ভার অর্পণ করেন। ১৫৬২ খৃষ্টাব্দে কমলাকর পণ্ডিতের তিরোভাবের পর তদ্বংশীয়গণই অদ্যাবধি উক্ত বিগ্রহের সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের ভাগীরথী তীরের মন্দির ভগ্ন হইলে কলিকাতা নিবাসী নয়ন চাঁদ মল্লিক ১৬৭৭ শকাব্দে বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করাইয়া দেন। কথিত আছে ১৪১৯ শকাব্দে শ্রীচৈতন্যদেব খড়দহে রাঘব পণ্ডিত ভবনে যাইবার পথে এই মাহেশ গ্রামে আগমন করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের ও সেবায়েত কমলাকরের সংস্পর্শে এস্থান নানাশ্রেণীর সজ্জন বহুল হইয়া উঠে এবং স্নানযাত্রা ও রথযাত্রা ব্যপদেশে সমগ্র বৈষ্ণব জগতের নিকট এস্থান তীর্থে পরিণত হয় এবং উল্লিখিত উৎসব ও মেলা উপলক্ষে অসংখ্য ব্যক্তির ও ব্যবসায়ীবৃন্দের আগমন ও অবস্থান মূলে গ্রামে স্থায়ী লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ক্রমশঃ মাহেশের শ্রীবিগ্রহের খ্যাতি ও স্বীকৃতি পুরীধামের সমতুল্য হইয়া উঠে। নবাব খানেওয়ালিশান ১৬৪৯ সালে জগন্নাথদেবের সেবার্থে জগন্নাথপুর গ্রাম দেবোত্তর করিয়া সনন্দ প্রদান করেন ও ১৬৫১ সালে উহার রাজস্ব ভার হ্রাস হয়। সেওড়াফুলীর রাজা মনোহর চন্দ্র রায় মহাশয় ছত্র দণ্ডাদি সহ স্বয়ং বার্ষিক স্নানযাত্রা উৎসবে যোগদান করায় অধিকারী মহাশয়গণ কর্তৃক সম্মানিত হন ও তদবধি তদ্বংশীয় ব্যক্তির উপস্থিতিতে স্নানযাত্রা নিষ্পন্ন

করার প্রথা প্রচলিত হয়। নয়ন চাঁদ মল্লিক মহাশয়ও সেবার্থে বহু অর্থ ও সম্পত্তি প্রদান করেন। বিগ্রহের রথযাত্রাই বিশিষ্ট উৎসব। পূর্বে জগন্নাথদেবের রথ প্রতি বর্ষ শ্রীশ্রীবল্লভজীউর শ্রীমন্দির পর্যন্ত আগমন করিত, কিন্তু ১৮৪৯ সালে উভয় বিগ্রহের সেবাইতগণের মধ্যে উৎসবের আয়ের অংশ বিভাগ লইয়া মনোমালিন্য হওয়ায় বল্লভপুরে উক্ত রথের আগমন বন্ধ হইয়া যায়। ফলে বল্লভপুরে নূতন জগন্নাথ মূর্তি ও রথ শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাহেশের প্রান্তে রজমণী দাসী একটি শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ (গোপীনাথজীউ) ও ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথদেবের প্রাচীন রথটি কবে প্রথম নির্মিত হয় তাহা সঠিক ভাবে বলা যায় না। তবে জনৈক মোদক কর্তৃক রথটি সংস্কৃত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। প্রাচীন রথটি অকর্মণ্য হইলে কলিকাতা শ্যামবাজার নিবাসী কৃষ্ণরাম বসু মহাশয় ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে একটি সুদৃশ্য উচ্চ কাঠের রথ করাইয়া দেন। এই রথটি নষ্ট হইয়া যাইলে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র গুরুপ্রসাদ বসু যে রথটি নির্মাণ করাইয়া দেন উহা অগ্নিদগ্ধ হইলে ১৮।২ খৃষ্টাব্দে কালাচাঁদ বসু একটি নূতন রথ নির্মাণ করেন, কিন্তু ঐ রথে জনৈক ব্যক্তি একদা উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করিলে অপবিত্র জ্ঞানে রথটি পরিত্যক্ত হয় এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বম্ভর বসু পুনরায় একটি রথ নির্মাণ করাইয়া দেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই রথটিও অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয়। অতপর কৃষ্ণচন্দ্র বসু ১২৯২ বঙ্গাব্দে বর্তমান লৌহ নির্মিত রথটি নির্মাণ করাইয়া দেন এবং অদ্যাপি প্রতি বৎসর এই রথ টানা হইতেছে।

কৃষ্ণচন্দ্র বসু মহাশয়ের পুত্রগণ এযাবত মাহেশের রথযাত্রার যাবতীয় ব্যয় বহন ও পরিচালনা করিতেছেন। রথযাত্রাকালীন জি, টি, রোডের উভয় পার্শ্বে সাময়িক গৃহ নির্মাণে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রয়ের দোকান বসাইবার তাঁহাদের অধিকার আছে এবং সেবায়েতগণ তাহার সমগ্র আয় উপসত্ব গ্রহণ করেন।

মাহেশের রথযাত্রা ও স্নানযাত্রা সম্পর্কে শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত "সংবাদ পত্রে সেকালের কথা" হইতে এবং সম্প্রতি "Statesmen" ও "যুগান্তর" পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি সংবাদ আমরা নীচে উদ্ধৃত করিলাম :—

(১১ই জুলাই ১৮১৮। ২৮ আষাঢ় ১২২৫)

রবিবার রথযাত্রা হইল তাহাতে মাহেশের রথ অতি বড় এত বড় রথ এতদ্দেশে নাই লোকযাত্রাও অতি বড় হয় এই রূপ প্রতি বৎসর রথ চলিতেছে কিন্তু এ বৎসরে রথ চলন স্থানে নূতন রাস্তা হওনে অধিক মৃত্তিকা উঠিয়াছে এবং অতিশয় বৃষ্টিপ্রযুক্ত কর্দম হইয়াছে তাহাতে রথ কত দূর আসিয়া রথের চক্র কর্দমে মগ্ন হইলে কোন প্রকারেও লোকেরা উঠাইতে পারিল না শেষে লোকযাত্রা ভঙ্গ হইল ইহাতে রথ চলিল না। তাহাতে লোকেরা আপন আপন বুদ্ধি মত নানা প্রকার কহিতে লাগিল কেহ কহে অধিকারীরা অশুচি তাহারা স্পর্শ করিয়াছে। কেহ কহে ঠাকুরের প্রতিবর্ষ সোনার হাত আসিত এ বৎসর রূপার হাত আসিয়াছে। আর কেহ কহিল যে উড়িষ্যাতে রথ চলে নাই অতএব এখানেও চলিল না। যে হউক রথ না চলাতে অনেকের অনেক ক্ষতি হইল যে ব্যক্তি বাজার ইজারা করিল এবং যে ব্যক্তি ঠাকুরের মন্দির ইজারা করিল তাহাদিগের লাভ কিছুমাত্র হইল না এবং দোকানি পসারী কলিকাতা হইতে এবং অন্য অন্য স্থান হইতে আসিয়াছে তাহাদিগেরও সামগ্রী বিক্রয় না হওয়াতে যথোচিত ক্ষতি হইল। যখন নিতান্ত রথ না চলিল তখন ২৪ আষাঢ় মঙ্গলবার বিকালে জগন্নাথ দেবকে রথ হইতে নামাইল ও রাধাবল্লব ঠাকুরের বাটী শ্রীমন্দিরে লইয়া রাখিল ও (রথ) খোলাতে লোক যাত্রার অভাব প্রযুক্ত জিনিস অতি শস্তা হইয়াছে অধিক কি লিখিব ১ পয়সাতে আনারস চারিটা পাওয়া যাইতেছে।"

(১৯ জুন ১৮১৯। ৬ আষাঢ় ১২২৬)

১১ আষাঢ় ২৪ জুন বৃহস্পতিবার রথযাত্রা হইবেক। অনেক অনেক স্থানে রথযাত্রা হইয়া থাকে কিন্তু তাহার মধ্যে জগন্নাথক্ষেত্রে রথযাত্রাতে যেরূপ সমারোহ ও লোক-যাত্রা হয় মোং মাহেশের রথযাত্রাতে তাহার বিস্তার ন্যূন নহে এখানে প্রথম দিনে অনুমান এক দুই লক্ষ লোক

দর্শনার্থে আইসে এবং প্রথম রথ অবধি শেষ রথ পর্যন্ত নয়দিন জগন্নাথদেব মোং বল্লভপুরে রাধাবল্লভ দেবের ঘরে থাকেন। তাহার নাম গুঞ্জাবাড়ী ঐ নয়দিন মাহেশ গ্রামাবধি রাধাবল্লভপুর পর্যন্ত নানা প্রকার দোকান পসার বসে এবং সেখানে বিস্তর বিস্তর ক্রয় বিক্রয় হয়। ইহার বিশেষ বিশেষ কত লিখা যাইবেক। এমত রথযাত্রার সমারোহ জগন্নাথক্ষেত্র ব্যতিরিক্ত অন্যত্র কুত্রাপি নাই।

এবং ঐ যাত্রার সময়ে অনেক স্থান হইতে অনেক অনেক লোক আসিয়া জুয়া খেলা করে ইহাতে কাহারো কাহারো লাভ হয় ও কাহারো কাহারো সর্বনাশ হয়। এই বার স্নানযাত্রার সমযে দুই জন জুয়া খেলাতে আপন যথাসর্বস্ব হারিয়া পরে অন্য উপায় না দেখিয়া আপন যুবতি স্ত্রী বিক্রয় করিতে উদ্যত হইল এবং তাহার মধ্যে একজন···দশ টাকাতে আপন স্ত্রী বিক্রয় করিল। অন্য ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রীতা হইতে সম্মতা হইল না তৎপ্রযুক্ত ঐ ব্যক্তি খেলার দেনার কারণ কএদ হইল।

[সংবাদ পত্রে সেকালের কথা]

"Serampore, July 14.—As in the past, the historic Ratha jatra festival at Mahesh, Hooghly, drew more than 100,000 people from far and wide in West Bengal to-day.

People began pouring into this temple town by car, train, bus, launch and country craft from early morning Thousands more could not come for lack of transport. From rural areas around Serampore and from adjacent districts, like Bankura, Burdwan, Nadia and 24-Parganas, many walked.

This festival is the biggest of its kind in Bengal and only second to the one at Puri.

People scrambled for vautage positions on housetops, and balconies on both sides of the Grand Trunk Road to see the Ratha (Chariot) as it passed.

A shot was fired at 4 P. M. to signal the start of the Ratha's journey. The District Magistrate, Hooghly, Mr K. P. A. Menon and the Superintendent of Police, Mr A. B. Chowdhury, were among the first to pull it.

The main task of pulling, however, fell to thousands of workers from the mills and people to the locality.

More than 700 policeman, assisted by about 500 Volunteers, organized the procession and controlled the crowds which jammed all approaches to the town by road and river".

—The Statesman, 15th July, 1961.

"শ্রীরামপুর (হুগলী) ১৪ই জুলাই—আজ মাহেশে রথযাত্রা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। এই রথযাত্রাকে কেন্দ্র করিয়া শুধু হুগলী জেলা, কলিকাতা এবং বারাকপুরের শিল্পাঞ্চলের লোকেরাই এখানে আসেন নাই পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন দূর দূরাঞ্চল হইতেও সহস্র ভক্ত এবং পুণ্যকামী নরনারী আসিয়া হাজির হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার বেশ কিছু সংখ্যক নরনারী পদব্রজে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। এই রথের মেলা আগামী এক সপ্তাহ ধরিয়া চলিবে এবং আগামী ২২শে জুলাই উল্টোরথ টানা হইবে। আজ সারা দিন ধরিয়াই টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে ছিল। তবু মেলায় লোকের ভীড় অন্যান্য বৎসরের মতই হইয়াছে বলিয়া অভিজ্ঞ মহল অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

আজ বেলা ৪ ঘটিকা নাগাদ মাহেশের রথতলা হইতে রথযাত্রা সুরু হয়। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে সাত ঘটিকা নাগাদ পৌনে এক মাইল দূরে জগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ীতে যাইয়া পৌছায়।

রথটানার সময় মাঝে মাঝে বৃষ্টি হইলেও বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই। এই সময়ে জগন্নাথদেবের সেবাইতগণ ছাড়াও হুগলীর জেলা শাসক শ্রী কে. পি. এ. মেনন, অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রী টি সি. দত্ত, পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রী এ. বি. চৌধুরী, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রী বি. স্যান্যাল, শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শ্রী এস. বি মজুমদার এবং এস. ডি. পি. ও শ্রী বি. বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ সর্বক্ষণ সঙ্গে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে রথের দড়িও টানিয়াছেন।

প্রায় ১২৫ টন ওজনের লৌহ নির্মিত রথের উপরে জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের মূর্তি বসান ছিল।

রথ টানিবার সময় লোকের ভীড় এরূপ বৃদ্ধি পায় যে, উহা নিয়ন্ত্রণ করা পুলিশের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়ে। তবে মাঝে মাঝে বিশৃঙ্খলা চলিলেও পুলিশ উহা আয়ত্বে আনিতে সমর্থ হয়। মাহেশের পুলিশ ফাঁড়ির নিকট যখন রথখানি পৌঁছায় সেই সময় ঐ স্থান এক জনসমুদ্রে পরিণত হয়। ঐ সময় রাস্তার ছাদে এবং অলিন্দে তিল ধারণের স্থানই ছিল না। ঠিক ঐ সময় নিকটবর্তী একটি বাড়ীর ছাদ হইতে এক ব্যক্তি রাস্তায় পড়িয়া যান। তাঁহাকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। অবশেষে রথ নির্বিঘ্নেই "মাসীর বাড়ী" যাইয়া পৌছায়।

আজ রথযাত্রা উপলক্ষে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্ম পুলিশের পক্ষ হইতে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। ৬০০ পুলিশ কনেষ্টবল ছাড়াও প্রায় ৪৫০ গ্রামরক্ষী এবং কিছু সংখ্যক স্পেশাল কনেষ্টবলকে মেলা উপলক্ষে আজ মোতায়েন করা হয়। বালিখালের নিকট হইতে জি. টি. রোড ধরিয়া যে সকল গাড়ী চলাচল করিয়া থাকে আজ উহা বেলা ১২টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। অবশ্য যাত্রীবাহী বাস এবং লরীগুলিকে অন্য রাস্তা দিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া হয়।

বরাহনগর হইতে বারাকপুর এবং উত্তরপাড়া হইতে শেওড়াফুলি পর্যন্ত গঙ্গার উভয়তীরে খেয়া পারাপারের ঘাটগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। একটি ভ্রাম্যমান আদালত এবং থানা স্থাপন করা হয়। ইহা-ছাড়া একদল ডুবুরীকেও নিয়োগ করা হয়।

সরকারী ব্যবস্থাদি ছাড়াও কংগ্রেস, কমিউনিষ্ট পার্টি এবং হিন্দু মহাসভা এবং আরও কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ক্যাম্প খুলিয়া যাত্রীদের সহায়তা করেন।

আজ রথের প্রথম দিন। মেলা তেমন জমিয়া উঠে নাই। বৃষ্টির জন্ম এখনও অনেকে ঘর তুলিতে পারেন নাই। কয়েক ব্যক্তি ঘরের চালায় হাত দিয়াছেন মাত্র। ইহাছাড়া যে সকল দোকানদারগণ বিভিন্ন পণ্য দ্রব্যের দোকান পাতিয়া বসিতেছেন, তাঁহাদের বেচা-কেনা তেমন সুরু হয় নাই। তাঁহাদের আশা আগামীকাল হইতে মেলা ঠিকভাবে চলিলে বেচা-কেনাও হয়ত তদানুপাতে চলিবে।

জগন্নাথ, সুভদ্রা এবং বলরামের বিগ্রহকে সারা বৎসর যে বস্ত্র ব্যবহার করান হয় উহা রথের দিন খণ্ড খণ্ড করিয়া বিতরণ করা হয়। উহা সাধারণ লোকে ঠাকুরের আশীর্বাদ বলিয়াই গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং উক্ত বস্ত্রখণ্ড মাথায় বাঁধিয়া থাকেন।

মাহেশের রথযাত্রা উপলক্ষে আজ হাওড়া হইতে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত একখানা আপ এবং একখানা ডাউন স্পেশাল ট্রেণ চালান হয়। কিন্তু শ্রীরামপুর স্টেশনে টিকেট খরিদের জন্ম বিশেষ কোন ব্যবস্থা না থাকায় যাত্রীদের চরম দুর্ভোগ পোহাইতে হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া গিয়াছে। অনেক যাত্রী সময়মত টিকেট খরিদ করিতে না পারায় ট্রেণ ধরিতে পারেন নাই।

—যুগান্তর, ৩০শে আষাঢ়, ১৩৬৮।

স্নানযাত্রা

(৫ জুন .৮১৯। ২৪ জ্যৈষ্ঠ ১২২৬)

আগামী মঙ্গলবার ৮ জুন ২৭ জ্যৈষ্ঠ মোং মাহেশে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা হইবেক। এই যাত্রা দর্শনার্থে অনেক অনেক তামসিক লোক আবাল বৃদ্ধ বণিতা আসিবেন। ইহাতে শ্রীরামপুর ও চাতরা ও বল্লভপুর ও আকনা ও মাহেশ ও রিসিড়া এই কএক গ্রাম লোকেতে পরিপূর্ণ হয় এবং পূর্বদিন রাত্রিতে কলিকাতা ও চুঁচুড়া ও ফরাসডাঙ্গা প্রভৃতি শহর ও তন্নিকটবর্তী গ্রাম হইতে বজরা ও পিনিস ও ভাউলে এবং আর আর নৌকাতে অনেক ধনবান লোকেরা নানাপ্রকার গান ও বাদ্য ও নাচ ও অন্য অন্য প্রকার ঐহিক সুখসাধন সামগ্রীতে বেষ্টিত হইয়া আইসেন পরদিন দুইপ্রহরের মধ্যে জগন্নাথদেবের স্নান হয়। যে স্থানে জগন্নাথদেবের স্নান হয় সেখানে প্রায় তিন চার লক্ষ লোক একত্র দাঁড়াইয়া স্নান দর্শন করে।

পুরুষোত্তমক্ষেত্র ব্যতিরেকে এই যাত্রা এমন সমারোহ অন্যত্র কোথাও হয় না।

[সংবাদ পত্রে সেকালের কথা]

(১৬ জুন ১৮২১। ৪ আষাঢ় ১২৩৮)

১৫ জুন, ৩ আষাঢ় শুক্রবার মোং মাহেশের স্নান-

যাত্রাতে লোক অধিক হইয়াছিল অনুমান হয় তিন লক্ষ লোকের কম নহে। এই বৎসর বৃষ্টিপ্রযুক্ত লোকেদের কোন কষ্ট হয় নাই কিন্তু স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টিপ্রযুক্ত জল কষ্ট হইয়াছে। [সংবাদ পত্রে সেকালের কথা]

কালীপূজা

শ্রীরামপুর, ১লা নভেম্বর—অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা এই বৎসর শ্রীরামপুরে অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং সাড়ম্বরে শ্যামাপূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পূজা উপলক্ষে সমগ্র শহর আলোকসজ্জায় সজ্জিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠে। বাজীর আগুনে কোনরূপ হতাহতের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য যে, এই বৎসর মাইক্রোফোনের উৎপাত কম ছিল, ফলে নাগরিকগণ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। কেবলমাত্র রিষড়া এলাকায় হানা দিয়া পুলিশ ৬০ জন জুয়াড়ীকে গ্রেপ্তার করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আকনা তরুণ সঙ্ঘ, নিউগেট বাহির সঙ্ঘ, আর. এম. এস. মাঠের এবং কালীতলায় পূজা প্রভৃতি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইলেও বর্তমান বৎসরে থানার পুলিশের পূজা নানারূপ অব্যবস্থার জন্য তাহার পূর্ব সুখ্যাতি অক্ষুন্ন রাখিতে পারে নাই।

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৯।

রাসযাত্রা

বৈষ্ণব পীঠস্থান বল্লভপুর শ্রীরামপুরের শ্রীশ্রীরাধাবল্লভ জীউ ও শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর রাস উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নগর প্রদক্ষিণ করার সময় প্রচুর জন-সমাগম হয় এবং বহুরাত্রি পর্যন্ত বিরাট ভোগের আয়োজন ছিল। আলোক সজ্জা, পুণ্যার্থী সমাবেশ, নামকীর্তন, প্রসাদ বিতরণ, ঠাকুর লইয়া নগর পরিভ্রমণ ইত্যাদি এই বৎসর অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা ব্যাপকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। আকনা পাড়াস্থ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউর মন্দিরে রাসলীলা মনোজ্ঞ হয়। এতদ্ব্যতীত, ক্ষেত্রমোহন সাহ ঠাকুরবাটিতে এবং নিউগেট ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ জীউর রাসলীলাও সুন্দরভাবে প্রতিপালিত হইয়াছে। রাসলীলা উৎসব শ্রীরামপুরের একটি বৃহৎ উৎসব।

যুগান্তর, ২৬শে কার্তিক ১৩৬৭।

শ্রীরামপুরে অনুষ্ঠান।

অদ্য সন্ধ্যায় ৬ ঘটিকায় শ্রীরামপুর ধর্মসভা ভবনে সিঁথি বৈষ্ণব সম্মিলনী ও শ্রীরামপুর ধর্মসভার উদ্যোগে মহাকবি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভুর তিরোভাব তিথি উপলক্ষে আরাধনা হইবে। শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায় সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

(৭ই কার্তিক, ১৩৬৫ আনন্দবাজার পত্রিকা।)

শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত বৈদ্যবাটী ও সেওড়াফুলি ও রিষড়ায় অনুষ্ঠিত উৎসব-পার্বণাদি সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণী শ্রীসুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড গ্রন্থের সাহায্যে লিখিত।

সেওড়াফুলি—সেওড়াফুলি রাজবংশ অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মনোহর রায়, দান ও বহু দেবদেবীর বিগ্রহ ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ১১৪১ সালের ১৫ই জ্যৈষ্ঠ তিনি রাজবাটীতে শ্রীশ্রীসর্বমঙ্গলা দেবীর সেবা প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহার পূজা নির্বাহের জন্য শ্রীরামপুরের বহু সম্পত্তি দেবোত্তর করিয়া দেন। সর্বমঙ্গলাদেবীর নিত্য পূজা হয় এবং বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে উৎবাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এই রাজবংশের রাজা হরিশচন্দ্র সেওড়াফুলি ভাগীরথীর তীরে ১২৩৪ সনে পাষাণময়ী নিস্তারিনী নামে খ্যাত দক্ষিণ কালিকা মূর্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেবা পরিচালনার্থে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি দান করিয়া যান। এই মন্দিরে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত বৃষবাহন ও দ্বিভুজা সুদৃশ্য ভৈরবমূর্তি, বর-চক্র-গদা-অভয়ধারী তাম্রনির্মিত মহাবিষ্ণু-মূর্তি, পিতল নির্মিত চতুর্ভুজা মহালক্ষ্মী মূর্তি ও পিতল নির্মিত দ্বিভুজা ও উপবিষ্টা অন্নপূর্ণামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই চারিটি দেব বিগ্রহ সম্প্রতি মন্দিরে আনিয়া রাখা হইয়াছে। উল্লিখিত বিগ্রহাদি সহ নিস্তারিনী কালীর নিত্য সেবা পূজা হয়।

এইস্থানে রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি ১৩৬৫ সালে মন্মথনাথ পাত্র নামে জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক নির্মিত।

বৈদ্যবাটী—শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত ভাগীরথীর তীরবর্তী বৈদ্যবাটী একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু স্থান। কলিকাতা হইতে এইস্থানের দূরত্ব প্রায় চৌদ্দ মাইল। পূর্ব রেলপথে এইস্থানে একটি স্টেশন আছে।

বৈদ্যবাটীর নিমাই-তীর্থঘাট বৈষ্ণবদিগের নিকট একটি পবিত্র তীর্থস্থান। শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীক্ষেত্রে গমনকালে এইস্থানে বিশ্রাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এইস্থান তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। মহাপ্রভুর মহিমায় এইস্থানে নিমগাছে জবাফুল ফুটিয়াছিল। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী চণ্ডীমঙ্গল কাব্য, শ্রীচৈতন্যের জীবনী, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, অযোধ্যারামের সত্যনারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থাদিতে নিমাইতীর্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সুদূর অতীতকাল হইতে নিমাইতীর্থের ঘাটে স্নান করা এক মহাপুণ্যজনক ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত। আজও ভক্তজনের কাছে নিমাইতীর্থের মাহাত্ম্য অক্ষুন্ন আছে। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ভক্ত নরনারী বিভিন্ন পাল-পার্বণে এই ঘাটে পুণ্যস্নান করিতে আসেন। ইহাছাড়া বৈশাখ, শ্রাবন, ফাল্গুণ ও চৈত্র মাসে কলিকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থান হইতে বহুলোক নিমাইতীর্থ হইতে গঙ্গাজল লইয়া হাঁটাপথে তারকেশ্বর গমন করেন। পৌষ সংক্রান্তির স্নান, মাঘী পূর্ণিমার স্নান এবং চৈত্র মাসে বারুণী স্নান উপলক্ষে এইস্থানে সপ্তাহকালব্যাপী তিনটি মেলা বসে। এই মেলায় বিশ হাজারের অধিক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। পূর্বে আরো অধিক যাত্রী হইত এবং একমাত্র উড়িষ্যা প্রদেশ হইতেই আট-দশ হাজার যাত্রী আসিতেন।

নিমাইতীর্থ ঘাটের অনতিদূরে প্রসিদ্ধ ওলাবিবিতলা ও পার্শ্ববর্তী ঘাটে বৈষ্ণবদের তীর্থভূমি বন্ধেশ্বরের মঠ এবং ভদ্রকালীর প্রাচীন মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ভদ্রকালী বিশেষ জাগ্রত দেবতা। শোনাযায় একটি পুষ্করিণী খননকালে ভদ্রকালী দেবীর মূর্তিটি আবিষ্কৃত হয় এবং জনৈক সন্ন্যাসী দেবীর পূজার্চ্চনা করিতেন। দেহরক্ষা করিলে পর ১১১০ সালে রাজা মনোহর রায় এইস্থানে একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া তারকেশ্বরের মোহান্তের হস্তে ইহার পূজা পরিচালনায় ভার অর্পণ করেন। তদবধি ইহা তারকেশ্বরের মোহান্তদিগের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে। দেবীর নিত্য পূজা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈদ্যবাটীতে রাজা মনোহর রায় তাহার পিতামহ রাজা রাঘবেন্দ্র রায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে রাঘবেশ্বর শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

মহামহাবারুণী

(৭ এপ্রিল ১৮২১। ২৬ চৈত্র ১২১৭)

"গত শনিবারে মহামহাবারুণীর যোগে গঙ্গা স্নানে অনেক অনেক দেশীয় লোক আসিয়াছিল তাহাতে মোকাম বৈদ্যবাটিতে উৎকল দেশীয় অনেক লোক আসিয়াছিল তাহারা অধিক পথ গমনেতে দুর্বল হইয়া অতিশয় প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপেতে উত্তপ্ত জল পান করিয়া ওলাউঠা রোগে অনেক লোক পথে ও মোকাম বৈদ্যবাটিতে মরিয়াছে এবং তদ্দেশস্থ লোকেরা অতিশয় নির্দ্দয় ঐ বৈদ্যবাটীতে যে যে লোকের ওলাউঠা রোগ হইয়াছিল তাহারা অবসন্ন হইলে তাহার সঙ্গী লোকেরা ত্যাগ করিয়া পালাইল। ইহাতে গঙ্গার তীরে যে যে অবসন্ন লোক ছিল তাহার মধ্যে অনেকে জোয়ার সময়ে সজীব গঙ্গা পাইয়াছে। তথাকার দারোগা অনেক লোককে উঠাইয়া ঘোল ও দধি প্রভৃতি খাওয়াইয়াছিল তাহার মধ্যেও অনেক মরিল কচ্চিৎ কেহ কেহ বাঁচিয়াছে।"

[সংবাদ পত্রে সেকালের কথা]

রিষড়া—শ্রীরামপুর থানার অন্তর্গত একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি স্টেশন আছে; হাওড়া স্টেশন হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র এগার মাইল।

রিষড়ায় গ্রাম্যদেবী সিদ্ধেশ্বরী কালী বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত। ৮১১ সালে জটাধর পাকড়াশী কর্তৃক এই কালী মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৩১২ সালে দশঘরা নিবাসী ঈশ্বর চন্দ্র সাহা কর্তৃক মন্দিরটি পুনর্নির্মিত হয়। বর্তমানে পাকড়াশী বংশের

শ্রীকৃষ্ণগোপাল পাকশাড়ী ভিন্ন আরও পাঁচ ঘর সেবায়েতের দ্বারা দেবীপূজা সাড়ম্বরের সহিত সম্পন্ন হয়।

রিষড়ার প্রাচীন দাঁ পরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই স্থানে একটি শিবমন্দির আছে; শিবের নিত্যপূজা হয়। ইঁহাদের কুলদেবতা মদনগোপাল জীউকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জাকজমকের সহিত রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হইত। বর্তমানে এই উৎসবটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রিষড়ার নিকটবর্তী মোড়পুকুরে পূর্বে শ্রীরামপুরের গোস্বামীদের 'সাধন কানন' নামে একটি সুরম্য বাগান ছিল। কেশব চন্দ্র সেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মসমাজের জন্য উহা ক্রয় করেন এবং তিনিও মধ্যে মধ্যে এই নির্জন কাননে আসিয়া বাস করিতেন। এখন বিপ্লবী শ্রীনিবারণ চন্দ্র চক্রবর্তী সাধন কাননের স্বত্ব ক্রয় করিয়া করিয়া তথায় ১৬ই জানুয়ারী ১৯৬১ খৃষ্টাব্দে একটি পার্থ সারথির মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ইহাছাড়া রাধাগোবিন্দজীউর মন্দির ও গৌড়ীয় মঠ এবং লৌকিক দেবতা হিসাবে রিষড়ার কালুরায় ও দক্ষিণরায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। কালুরায়ের মন্দির অতুল-চন্দ্র ভড় কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে স্থানীয় মুখোপাধ্যায় পরিবার ইঁহাদের নিত্যপূজা করিয়া থাকেন।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ উত্তরপাড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কোতরং। ৮।৯১৪·৯৪০।৪৫১।২,২৫৩
ভদ্রকালী। ৯।৬৪৮·০৫৫।৩৬১।১,৮২৯

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

(খ) চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) কলিকাতা হইতে প্রায় ৯ মাইল দূরে জি টি. রোডের ধারে এই স্থানটি অবস্থিত। পূর্ব রেলপথে হিন্দ্‌মোটর স্টেশন অথবা হাওড়া হইতে জি. টি. রোড দিয়া মোটরবাসে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শীতলা অষ্টমী তিথিতে শীতলাপূজা, পৌষ সংক্রান্তিতে মাণিক পীরের উরস্‌, ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা ও শিবরাত্রি উৎসব এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে নীলপূজা ও চড়কপূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে সাতদিন-ব্যাপী। প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

মানিক পীরের উরস্‌ উপলক্ষে মেলা। পৌষ মাসে তিনদিনব্যাপী।

(চ) এই স্থানে ভদ্রকালী মন্দিরটি খুব প্রাচীন না হইলেও মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত কালী মূর্তিটি দেখিতে খুবই সুন্দর। ইহাভিন্ন, এই স্থানে রামসীতা ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীবলাই চন্দ্র নিয়োগী, চাকুরী,
২, বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী স্ট্রীট,
পোঃ ভদ্রকালী, হুগলী।

২। গ্রাম ঃ রঘুনাথপুর। ১০।৩৬৯·৮৪।৭১৯।৩,৮৪৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য ও বৈরাগী।

গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যেমন—নস্করপাড়া, দাসপাড়া, পালপাড়া, মাইতিপাড়া, কোলেপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথের উত্তরপাড়া, বালি বা ডানকুনি রেলস্টেশন হইতে অথবা চণ্ডীতলা-জনাই বাস রুটে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। বালি হইতে নৌকা-যোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখী পূর্ণিমা হইতে চারদিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব হয়, এই উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নরনারী যোগদান করেন এবং ভোগ বিতরণ ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে সাড়ম্বরে গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) চড়কের মেলা। চৈত্র সংক্রান্তিতে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রঘুনাথজীউ ঠাকুরবাড়ী, একটি পঞ্চানন্দ, একটি বাবাঠাকুর, তিনটি শীতলা ও একটি মনসাদেবী আছে।

এই গ্রামে রঘুনাথজীউ ঠাকুর বাড়ী প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া গ্রামটির নাম রঘুনাথপুর হইয়াছে।

শ্রীনবেন্দু বাঙ্গাল,
ও
শ্রীননীলাল চক্রবর্তী,
গ্রাম ও পোঃ অভয়নগর, হুগলী।

উত্তরপাড়া—ইহা হাওড়া হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত এবং বর্তমানে ৪টি ওয়ার্ড লইয়া গঠিত হুগলী জেলায় একটি মিউনিসিপ্যাল শহর। ১৯৬১ সালের আদম-সুমারী অনুযায়ী এই শহরের লোকসংখ্যা ২১,১৩২। পূর্ব ভারতীয় রেলপথের উত্তরপাড়ায় একটি রেল-স্টেশন আছে। হাওড়া হইতে মোটরবাসেও এই স্থানে যাতায়াত করা যায়।

উত্তরপাড়া পূর্বে হাওড়া জেলার বালি গ্রামের একটি পাড়া ছিল। কালক্রমে ইহা একটি স্বতন্ত্র শহরে পরিণত হইয়া সীমান্তবর্তী হুগলী জেলায়

অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শহরটিতে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ হাসপাতাল এবং দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থ সমন্বিত একটি প্রাচীন গ্রন্থাগার আছে। এই স্থানে বৎসরের বিভিন্ন সময়ে দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, কার্তিকপূজা, সরস্বতীপূজা, রাসযাত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসবাদি সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

উত্তরপাড়ায় রাসযাত্রা উৎসব সম্পর্কে ১৩৬৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকায় নিম্নলিখিত প্রকাশিত হয় :—

"উত্তরপাড়া ১লা ডিসেম্বর—উত্তরপাড়ার 'নূরমঞ্জিলে' চারদিনব্যাপী রাসযাত্রা উৎসব গত শনিবার সমাপ্ত হইয়াছে। উৎসব উপলক্ষে প্রত্যহ কীর্তন-ভজন সংগীতাদির আয়োজন করা হয়। সমাপ্তি দিবসে বিশিষ্ট শিল্পী সহযোগে সঙ্গীত, কৌতুক ও নাটিকার এক বিচিত্রানুষ্ঠান আয়োজিত হয়।"

কোন্নগর—হাওড়া হইতে প্রায় নয় মাইল দূরে হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত একটি প্রাচীন পল্লী। পূর্ব রেলপথে এই স্থানে একটি রেলস্টেশন আছে। জি. টি. রোড দিয়া মোটর বাসেও এই স্থানে যাতায়াত করিতে পারা যায়।

কোন্নগরে গঙ্গা তীরে অবস্থিত দ্বাদশ শিব মন্দির ও ঘাট একটি দর্শনীয় বস্তু। দ্বাদশ মন্দিরের প্রতিটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরগুলি ১৭৪২ শকাব্দে কলিকাতা হাটখোলা দত্ত বংশের হরসুন্দর দত্ত মহাশয় কর্তৃক নির্মিত বলিয়া জানা যায়।

প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় কোন্নগরে মহাসমারোহে রাজরাজেশ্বরী দেবীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং আড়াইশত বৎসরেরও অধিক প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে।

ইহাভিন্ন প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এই স্থানে চড়ক উপলক্ষে একটি মেলা বসে।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ উত্তরপাড়া

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের উৎসব (মাণিকপীর)

কোতরাং গ্রামে মাণিকপীরের নামে একটি নির্দিষ্ট বেদী আছে। উক্ত বেদীতে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির দিন মাণিকপীরের উৎসব পালন করা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং ইহাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই যোগদান করিয়া থাকেন। উৎসবের দিন অনেকে পীরের নিকট মুরগী ও গরু মানত করেন। মুরগীগুলিকে বলি দেওয়া হয় এবং গরুগুলিকে পীরের নামে উৎসর্গ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহাভিন্ন, মানত স্বরূপ গ্রামবাসীগণ তাঁহাদের গরু বা ছাগলের দুধ নিয়মিত ২১ দিন ব্যাপী পীরের নিকট উৎসর্গ করেন। মাণিকপীরের খাদেম, জনৈক মুসলমান।

চড়ক-গাজন-নীলপুজা

রঘুনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তির দুই-তিন পূর্ব হইতে সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত সাড়ম্বরে গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। গ্রামে পঞ্চানন্দ ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া এই উৎসব পালন করা হয়। উৎসব উপলক্ষে অনেকে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করেন। চৈত্র-সংক্রান্তির পূর্ব দিন নীলপূজা এবং গ্রামে শীতলা দেবীর স্থানে ছাগবলি সহ সাড়ম্বরে পূজা হয়। শীতলা দেবীর পূজার স্থানে সারাদিনব্যাপী শীতলা মাহাত্ম্য গান শুনিতে বহু লোকের সমাগম হয়। নীলপূজার দিন গাজনের সন্ন্যাসীরা ঢাকঢোল বাজাইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ান। সংক্রান্তির দিন মহাধুমধামের সহিত পঞ্চানন্দ ঠাকুরের পূজা হয়। এইদিন গাজনের সন্ন্যাসীর দল পূজা প্রাঙ্গণে ঢাকঢোলের তালে তালে নানারূপ নৃত্য করেন, চড়ক গাছে ঘোরেন এবং কাঁটার উপর গড়াগড়ি দেন।

উৎসবটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহাতে আশেপাশের কয়েকটি গ্রাম হইতে প্রায় সহস্রাধিক নরনারী যোগদান করিয়া থাকেন।

দোলযাত্রা

কোতরাং গ্রামে সেওড়াফুলী রাজপরিবার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের দোলপূর্ণিমায় সাড়ম্বরে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রারম্ভে ইহা সেওড়াফুলী রাজ পরিবারের পারিবারিক উৎসব ছিল তবে বর্তমানে গ্রামের সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হইয়াছে। রাধাকৃষ্ণের নিত্যপূজা হয়। পূজারী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী। গ্রামের মণ্ডল পরিবার পুরুষানুক্রমে রাধাকৃষ্ণের সেবায়েতের কার্য করিতেছেন। বর্তমান সেবায়েত শ্রীযুগল মণ্ডল। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ উত্তরপাড়া

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব বা তিরোভাবের মেলা (মাণিকপীর)

কোতরাং পৌর এলাকার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর গ্রামে মাণিকপীরেরউৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী পীরের বেদী সংলগ্ন পীরোত্তর দশ কাঠা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

কোন্নগর, বাঁশাই, রঘুনাথপুর, উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মেলায় দৈনিক গড়ে প্রায় আড়াই হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে ও দশ-পনর জন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজা দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়-গামছার দোকান, কৃষিযন্ত্রপাতির দোকান, বই ছবির দোকান ও মাটির হাঁড়ি-কলসী ও খেলনা ইত্যাদির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নিয়মিত তিনদিন তরজা, কৃষ্ণযাত্রা ইত্যাদি হইয়া থাকে এবং অনেকে জুয়া খেলেন। মেলায় তিনদিন মাণিকপীর তলায় বহু ঘুড়ি উড়ান হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

রঘুনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চড়কপূজা উপলক্ষে চৈত্র সংক্রান্তির দিন ঠাকুর বাড়ী প্রাঙ্গণে প্রায় এক বিঘা পরিমাণ দেবোত্তর জমিতে একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

উত্তরপাড়া, বালি, আড়িয়াদহ, গরলগাছা, ডানকুনি, ভদ্রকালি ও মনোহরপুর প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় দেড় সহস্রাধিক নরনারীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ সাইকেল রিক্সা, বাস ও মোটর যোগে আসিয়া থাকেন।

এই মেলায় মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, বই-ছবির দোকান, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান ও আশেপাশের গ্রাম হইতে মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রা, থিয়েটার, লটারী, তরজা, জলসা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি যাত্রাদল আছে। প্রতি বৎসর তরজাদল বরাহনগর, মণিরামপুর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকে। প্রায় সহস্রাধিক দর্শকের সমাগম হইয়া থাকে।

দোলযাত্রার মেলা

কোতরাং পৌর এলাকা অন্তর্গত ভদ্রেশ্বরে প্রতি বৎসর রাধাকৃষ্ণের দোলোৎসব উপলক্ষে ফাল্গুন মাসের দোল-পূর্ণিমা তিথি হইতে সপ্তাহকালব্যাপী দেবোত্তর প্রায় দেড় বিঘা জমিতে ও নিকটবর্তী রাস্তার দুই ধারে একটি মেলা বসে। মেলাটি দুই শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

কোন্নগর, বাঁশাই, রঘুনাথপুর ও উত্তরপাড়া প্রভৃতি অঞ্চল হইতে মেলায় সর্বশ্রেণীর প্রায় এগার-বার হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং ত্রিশ-চল্লিশজন ফেরিওয়ালা আসেন। প্রধানতঃ ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, বাসনকোসনের দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্রের দোকান, বই-ছবির দোকান ও আশেপাশের গ্রাম হইতে মাটির হাঁড়িকুড়ি, খেলনা, বেতের ও বাঁশের তৈয়ারী ধামাকুলা ইত্যাদির দোকান-পাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, পুতুলনাচ ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকে।

জেলা : হুগলী
থানা : চণ্ডীতলা

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : শিয়াখালা।

১২।৭৬৮'৫৮।৪৬২।২,৮৮৮

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ মাহিষ্য, সদগোপ, জেলে, কুমার, দুলে, বাগ্দী ও মুসলমান।

গ্রামে পালপাড়া, পাত্র পাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া হইতে শিয়াখালা পর্যন্ত একটি মার্টিন রেলপথ আছে। অহল্যাবাঈ রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লা পক্ষের শনি অথবা মঙ্গলবার গ্রামে প্রতিষ্ঠিত উত্তরবাহিনী বিশালাক্ষী দেবীকে কেন্দ্র করিয়া দেশমালা উৎসব, ১৬ই আষাঢ় দেবীর অভিষেক উৎসব এবং আশ্বিন মাসে বিজয়াদশমীর পরের দিন বিশালাক্ষীদেবীর জাত অনুষ্ঠিত হয়। বিশালাক্ষীর জাত উৎসবটি প্রায় চারশত বৎসরের ও দেশমালা উৎসবটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন এবং অভিষেক উৎসবটি গত বাংলা ১৩৪৪ সন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ইহাভিন্ন গ্রামে একটি হরিবাসরে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বিশালাক্ষী দেবীর অভিষেক উৎসব উপলক্ষে মেলা। ১৬ই আষাঢ়। বাংলা ১৩৪০ সন হইতে মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

বিশালাক্ষীর জাত উপলক্ষে মেলা। প্রতি বৎসর বিজয়াদশমীর পরের দিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষীদেবীর তিন প্রকোষ্ঠ যুক্ত মন্দির এবং মন্দিরের সম্মুখে উত্তর দিকে পাকা নাট মন্দির আছে। গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি মনসা, তিনটি রক্ষাকালীর বেদী, আটটি শিব, একটি গড়ের বাবা ও একটি হরিসভা আছে।

শিয়াখালা আনুমানিক ছয়শত বৎসরের প্রাচীন বর্ধিষ্ণু গ্রাম। পূর্বে শিবশক্তির লীলাক্ষেত্র গ্রামটি শিবাক্ষেত্র নামে পরিচিত ছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। 'শিবাক্ষেত্র' হইতে 'শিয়াখালা' হওয়া স্বাভাবিক। খুব সম্ভব হোসেন শাহের শাসনকালে বাংলায় চৈতন্য ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্মের প্রগতির কালে এই স্থানে শিবসাধনা প্রভাব বিস্তার লাভ করে। অনুমান স্বরূপ এই গ্রামে ও আশেপাশের গ্রামে বনে-জঙ্গলে বহু প্রাচীন শিব মন্দির দৃষ্ট হয়।

শিয়াখালা ও শ্রীপতিপুর (শ্রীপতিপুর পূর্বে শিয়াখালারই অংশ ছিল। গত সেটেল্‌মেণ্টে শ্রীপতি-পুরের ভিন্ন ডাক নম্বর হইয়াছে) গ্রামের নাম যে 'শিবাক্ষেত্র' ছিল ইহার প্রমাণ বহু প্রাচীন পুঁথি পত্রে পাওয়া যায়। স্বর্গীয় রাধামোহন তর্কভূষণ কৃত সত্যনারায়ণের ব্রতকথাতে শিয়াখালা গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। স্বর্গীয় সারদা চরণ মিত্র মহাশয় কর্তৃক সংকলিত 'রাঢ়ের কায়স্থ' পুস্তকে সমাজ সংস্কারক গোপীনাথ বসু ওরফে হোশেন শাহের প্রধান মন্ত্রী ঐতিহাসিক পুরন্দর খাঁ নামের উল্লেখ আছে।

পুরন্দর খাঁ শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত 'নাদা' গ্রাম হইতে মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের জনৈক পূর্ব পুরুষকে শিয়াখালা গ্রামে আনাইয়া বসবাসের ব্যবস্থা করান।

চৈতন্যযুগে প্রাচীন শিয়াখালা গ্রামে কৃষ্ণানন্দ তর্কপঞ্চানন ও পুরন্দর খাঁ উভয়েই গ্রাম কেন্দ্রিক সভ্যতার শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুশীলনের জন্য পুরোধা ছিলেন। উভয়েরই বংশধরেরা অদ্যাপি এই গ্রামে বাস করিতেছেন এবং শৈব পুরন্দরের স্মৃতি বিজড়িত 'পুরন্দর গড়' ও একটি বিশাল প্রাচীন দীঘি আজও

বিদ্যমান। সেটেলমেন্ট রেকর্ডে গ্রামটি 'সেয়াখালা' নামে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

শ্রীব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়,
ডাঃ যামিনী কান্ত বল,
শ্রীশচীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়,
গ্রাম ও পোঃ শিয়াখালা, হুগলী।

২। গ্রাম : মাঝের হাট (মৌজা : কুমিরমোড়া)।
৪৬।১,১০'৬৪।১,০৮৩।৫,১২৬

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন কুমিরমোড়া। 'কুমির-মোড়া-মাঝের হাট রোড' ও 'কানাইডাঙ্গা-ভগবতীপুর রোড' দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ শাহসুফী সুলতান পীর সাহেবের উরস অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) পীরের উরস্ উপলক্ষে মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে শাহসুফী সুলতান পীর সাহেবের হুজরা খানা (প্রার্থনা স্থল) আছে।

শ্রীলেহাজদ্দিন, কৃষিকার্য,
মাঝের হাট, খানকা সরীফ,
হুগলী।

বাক্‌সা (মৌজা নং ৭৭)।

বাকসা সিংহ পরিবারের গোবিন্দ চন্দ্র সিংহ এবং তাঁহার দুই পুত্র গুরুদাস সিংহ এবং রাম চন্দ্র সিংহ দয়াদাক্ষিণ্যের জন্য এই অঞ্চলে বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। এই বংশের প্রতিষ্ঠিত শীতলা দেবীর মন্দির অদ্যাপি এই স্থানে দৃষ্ট হয় এবং দোল দুর্গোৎসবাদি হিন্দু-ধর্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ দেওয়ান শান্তিরামের আমলে যেভাবে হইত, অদ্যাপি সেইরূপ ভাবেই মহা সমারোহের সহিত এই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়।

জনাই গ্রামের উত্তর-পূর্ব দিকে বাকসা গ্রামের শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউর নবরত্নের সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গের প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম। বাকসার মিত্রবংশোদ্ভব দেওয়ান ভবানী চরণ মিত্র ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে দ্বাদশ শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রত্যেকটি মন্দির ষাট ফুট উচ্চ এবং প্রতি বৎসর এই স্থানে চৈত্র মাসের সংক্রান্তি দিবসে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রায় লক্ষাধিক লোক উহাতে যোগদান করেন।

বাকসার রঘুনাথ জীউর রথের ন্যায় সুবৃহৎ নবরত্নের মন্দির স্থাপত্যশিল্পের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এইরূপ মন্দির বঙ্গদেশে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি করা হয় না। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভ্রুকুটরাম মিত্র এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার দৈনিক সেবার জন্য তিনি জমি দান করিয়া যান।

দেওয়ান ভবানী চরণ মিত্র পূর্বোক্ত দ্বাদশ শিবমন্দির ব্যতীত গ্রামের মধ্যে আরও ছয়টি শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দুইটি করিয়া তিনটি বিভিন্ন স্থানে উক্ত মন্দিরগুলি বিদ্যমান আছে। চণ্ডীতলা থানার অন্তর্গত বহুগ্রামে প্রায় শতাধিক শিবের প্রাচীন মন্দির অদ্যাপি দৃষ্ট হয় ইহা হইতে এই অঞ্চলে বহু প্রাচীনকাল হইতে শৈব ধর্মের যে প্রতিপত্তি ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা সুদূর অতীতকাল হইতে এই স্থানে প্রচলিত থাকিলেও, সেন রাজাগণের সময় হইতেই শৈব ধর্মের এইস্থানে প্রাদুর্ভাব হয়।

ইহাভিন্ন, চণ্ডীপুর থানার অন্তর্গত জনাই গ্রামে জাগ্রতকালী ও রামচন্দ্র মন্দির, আদান গ্রামে প্রাচীন শিবমন্দির ও ষষ্ঠীতলা, বেগমপুর গ্রামে দুইটি শিবমন্দির, গটুলগ্রামে মুণ্ডমালা কালীমন্দির পায়রাগাছা গ্রামে কালিরায় ও দক্ষিণরায়, নৈটীগ্রামে জাগ্রত পঞ্চানন মন্দির এবং কলাছাড়া গ্রামে বিশালাক্ষী ও পঞ্চানন্দ ঠাকুরের মন্দির আছে।

("হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ", ৩য় খণ্ড, শ্রীসুধীরকুমার মিত্র, পৃঃ ১২৬২-১২৬৬)

জেলা : হুগলী
থানা : চণ্ডীতলা

উৎসব বিবরণী

উত্তরবাহিনী বিশালাক্ষী পূজা

শিয়াখালার উত্তরবাহিনী দেবীর মাহাত্ম্য এই অঞ্চলে সুপরিচিত। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে শিয়াখালার গোপীনাথ বসুমল্লিক যিনি তদানিন্তন বাংলার বাদশাহ হোসেন শাহ্ কর্তৃক পুরন্দর খাঁ নামে খ্যাত হন, কান্যকুব্জ হইতে আগত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের বংশধর কৃষ্ণানন্দ তর্কপঞ্চানন মহাশয়কে শিয়াখালায় আহ্বান করিয়া আনেন। আজও এই গ্রামে তাঁহার এবং পুরন্দর খাঁর বংশধরগণ বসবাস করিতেছেন। কিংবদন্তী আছে কৃষ্ণানন্দের পৌত্র রাজেন্দ্র নাথ লেখাপড়ায় খুবই অমনযোগী ছিলেন। পিতামাতার উপদেশ ও তিরস্কার সকলই কিছুই তাঁহার উপর ব্যর্থ হয়। একদিন তাঁহার পিতা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া গৃহিনীকে ভাতের পরিবর্তে পুত্রকে ছাই দিবার আদেশ করেন। স্বামীর আদেশ অমান্য করিতে না পারিয়া স্নেহময়ী জননী অন্নব্যঞ্জনের সহিত পাত্রের একপার্শ্বে কিঞ্চিৎ ছাই দিয়া পুত্রকে পরিবেশন করেন। রাজেন্দ্র নাথ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সেইদিনই গৃহত্যাগ করেন এবং গ্রামের নির্জন শ্মশান সন্নিকটে দামোদর ও সরস্বতীর মধ্যবাহিনী কৌষিকী নদীতে প্রাণ বিসর্জন দিতে সংকল্প করেন। এমন সময় নিকটবর্তী বনভূমি হইতে বামা কণ্ঠে দৈব্যবানী শুনিতে পান—তুই মরবি কেন, নদীতে ডুব দে আমায় পাবি, তোর মনবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। রাজেন্দ্র নাথ দৈব নির্দেশ অনুসারে নদীগর্ভ হইতে এক পাষাণ প্রতিমা উদ্ধার করিয়া নদীতীরে উহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দেবী প্রতিমার নাম উত্তরবাহিনী; ইনি বিশালাক্ষী নামে খ্যাত। উত্তর জীবনে রাজেন্দ্র নাথ উত্তরবাহিনীর সেবা-পূজায় আত্মোৎসর্গ করেন এবং পণ্ডিত সমাজে তিনি সার্বভৌম উপাধিতে ভূষিত হন।

দেবী উত্তরাস্যা বলিয়াই উত্তরবাহিনী নাম। কিংবদন্তী আছে, একদা জনৈক ধনী ব্যক্তি নৌকায় কৌষিকী নদী দিয়া নৃত্য-গীত করিতে করিতে যাইতেছিলেন। নৃত্য-গীতে আকৃষ্ট হইয়া দেবী মানবীরূপ ধারণ করিয়া নদীর তীরে দাঁড়াইয়া গান শুনিতেছিলেন। হঠাৎ নৌকায় গান বন্ধ হইলে দেবী তাঁহাদের বলিলেন—তোরা বেশ গাইতেছিলিস, আবার গা। তদুত্তরে নৌকাযাত্রীরা দেবীকে উপহাস করিয়া বলেন—গা শোনার সখ থাকে তো ফিরে চা। এই কথা শুনিয়া দেবী বিশালাক্ষী উত্তর দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে যাত্রীসহ নৌকাটি নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইল এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত দেবী বিশালাক্ষীর মূর্তিও উত্তরমুখী হইয়া পড়িল। সেই হইতে দেবী বিশালাক্ষী এই স্থানে উত্তরবাহিনী নামে খ্যাত হন। কালক্রমে নদী মজিয়া গেলে ১৩৪০ সনে দেবীর ভোগপুকুর খননকালে একটি নৌকার ভগ্নাংশ পাওয়া যায়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে, এই স্থানেই পূর্বোক্ত ধনী ব্যক্তির নৌকাডুবি হইয়াছিল। বর্তমানে এই স্থানটি 'ডিঙিবুড়' নামে খ্যাত।

উত্তরবাহিনী বিশালাক্ষী গ্রামের সাধারণের দেবী। পাশাপাশি তিন প্রকোষ্ঠযুক্ত মন্দিরের মধ্য প্রকোষ্ঠে উত্তরাস্যা বিশালাক্ষীর পাষাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। শবরূপে শায়িত মহাকালের বক্ষস্থলে দক্ষিণ পা এবং পার্শ্বে জোড়হস্তে উপবিষ্ট নীলবর্ণের বটুক ভৈরবের মস্তকে বাম পা স্থাপন করিয়া ত্রিনয়নী, দ্বিভুজা দেবী দণ্ডায়মানা। দেবীর দক্ষিণ হস্তে খড়্গ ও বাম হস্তে খর্পর এবং দুই পায়ের মধ্যস্থলে শিবের নাভিদেশে একটি বৃহদাকার অসুর মুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। দেবী হরিদ্রাবর্ণ, এলোকেশী, বস্ত্র পরিহিতা এবং নানালঙ্কার ও মুণ্ডমালায় বিভূষিতা। মূর্তির উচ্চতা প্রায় ছয় ফুট। দেবীর মন্দিরের দক্ষিণ প্রকোষ্ঠে বাণেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং বাম প্রকোষ্ঠে পরমানন্দ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

মন্দিরের সম্মুখে উত্তরদিকে পাকা নাটমন্দির, ভাণ্ডার-ঘর, ভোগরন্ধন ঘর এবং একটি বৃহৎ চালাঘর আছে। দেবীর মন্দিরের মেঝে পাথর দ্বারা বাঁধান। মন্দিরের উত্তরে 'ভোগপুকুর' দক্ষিণ পাড়ে বাঁধান ঘাট সহ একটি

পুষ্করিণী এবং সাধারণের ব্যবহারের জন্য মন্দির সংলগ্ন একটি কূপ আছে। পুরন্দর খাঁ উত্তরবাহিনী দেবীর বিশেষ ভক্ত ছিলেন এবং তিনিই দেবীর মন্দিরাদি নির্মাণ করাইয়া দেন। কথিত আছে একবার বর্ধমানাধিপতি রাজরোষে পড়িয়া উত্তরবাহিনীদেবীর কৃপায় সঙ্কট মুক্ত হন এবং দেবীর নিত্যসেবাদির জন্য বহু ভূ-সম্পত্তি দান করেন। প্রাচীন মন্দিরটি জীর্ণ হইয়া পড়িলে শিয়াখালা পিপলস্ এসোসিয়েসনের উদ্যোগে গঙ্গার সুবিখ্যাত ভট্টাচার্য বংশীয়গণ এবং জগৎপুরের রামনিধি শেঠ মহাশয়দের সাহায্যে প্রায় পয়তাল্লিশ বৎসর পূর্বে মন্দিরটি সংস্কৃত করা হয়।

উত্তরবাহিনী বিশালাক্ষী দেবীকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর শিয়াখালা গ্রামে নিম্নলিখিত উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হয়।

দেশমালা উৎসব—প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসের শুক্লাপক্ষের যে-কোন শনি অথবা মঙ্গলবার সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য উত্তরবাহিনীর মন্দিরে সাড়ম্বরে দেশমালা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রায় চল্লিশ বৎসরের প্রাচীন। উৎসব উপলক্ষে দেবীর উদ্দেশ্যে একটি পাঁঠাবলিসহ ছাঁচি কুমড়া, আখ, আদা ইত্যাদি বলি এবং আমোদ-প্রমোদের জন্য মন্দির প্রাঙ্গণে যাত্রাভিনয়ের আয়োজন করা হয়।

বার্ষিক উৎসব—আদিতে কৌষিকী নদী হইতে দেবীর যে পাষাণ মূর্তিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহা খুব ক্ষুদ্রাকৃতি (পাঁচ-ছয় ইঞ্চি দীর্ঘ) বলিয়া, উক্ত পাষাণ মূর্তির অনুরূপ বৃহদাকারের মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া মন্দিরে দেবীর যথারীতি পূজা করা হইত। প্রতি ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর অন্তর এইরূপ নূতন মূর্তি নির্মাণ করা হইত। দেবীর ক্ষুদ্রাকৃতি পাষাণ মূর্তিটি এতকাল যাবত মন্দিরেই রক্ষিত ছিল, গত কয়েক বৎসর হইল উহা অপহৃত হইয়াছে।

গত বাংলা ১৩৪০ সনের ১৬ই আষাঢ় গ্রামবাসীদের সাহায্যে দেবীর মৃন্ময় মূর্তি অপসারণ করিয়া বর্তমান প্রস্তর মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই কারণে প্রতি বৎসর ১৬ই আষাঢ় সাড়ম্বরে দেবীর বার্ষিক উৎসব পালন করা হইতেছে। উৎসব উপলক্ষে হোমপূজা ও পশু বলি দেওয়া হয় এবং সর্বজনীন ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

বিশালাক্ষীর জাত—প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শুক্লাপক্ষের একাদশী তিথিতে দেবীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ঘট বিসর্জন দিয়া নূতন ঘট স্থাপন করা হয়—ইহাই বিশালাক্ষীর জাত নামে খ্যাত।

উৎসব উপলক্ষে বিশালাক্ষী দেবীর বিশেষ পূজাপাঠ ও কয়েকটি পশু বলিসহ "বন্ধানী" পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এই পর্বে পুরন্দর খাঁ ওরফে গোপীনাথ বসুমল্লিক পরিবারের, বর্ধমানের মহারাজার, তাজপুরের সিংহ পরিবারের, বাকসার চৌধুরী পরিবারের এবং শিয়াখালা কারকুন পরিবারের ও কালীচরণ মুখোপাধ্যায় পরিবারের নামে সঙ্কল্প করিয়া বিশেষ পূজা দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রায় চার শত বৎসরের প্রাচীন। উৎসবের দিন দেশ-বিদেশ হইতে সর্বশ্রেণীর প্রায় চার-পাঁচ হাজার নরনারীর সমাগম হয় এবং সাঁওতাল নাচ, লাঠি খেলা ইত্যাদির মধ্যে আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করা হয়।

ভোগ উৎসব—পূর্বে ষোড়শোপচারে বিশালাক্ষী দেবীর নিত্যপূজা হইত; কিন্তু কোনরূপ অন্নভোগের ব্যবস্থা ছিল না। প্রায় ছত্রিশ বৎসর পূর্বে ষোলই পৌষ তারিখে জনৈক পরিব্রাজক সন্ন্যাসী এই মন্দিরে দেবী দর্শনে আসেন এবং বিশালাক্ষী দেবীর অন্নভোগের দ্বারা পূজার ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এই কারণে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে দেবী ভোগ উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, একটি প্রাচীন রীতি অনুসারে এই গ্রামে শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় কোন দুর্গামণ্ডপে অথবা গৃহস্থের বাড়ীতে কেহ চণ্ডী পাঠ করিতে পারেন না। কেহ ইচ্ছা করিলে দুর্গাপূজার তিনদিন দেবী উত্তরবাহিনী মন্দিরে চণ্ডীপাঠের আয়োজন করিতে পারেন। নিম্নলিখিত ধ্যানে দেবীর পূজা হয় :

ধ্যায়েদেবীং বিশালাক্ষিং তপ্তজাম্বূনদ প্রভাং।
দ্বিভুজাম্বিকাং চণ্ডী খড়্গা খেটকধারিণীং ॥
নানালঙ্কার সুভগাং রক্তাম্বরধরাং শুভাং।
সদাষোড়শ বর্ষীয়াং প্রসন্নাস্যাং ত্রিলোচনাং ॥

মুণ্ডমালা বলীয়স্তাং পীনোন্নত পয়োধরাং।
শবোপরি মহাদেবীং জটামুকুট মণ্ডিতাং॥
শত্রুক্ষয় কারীং দেবীং সাধকাভিষ্ট দায়িকাং।
সর্ব্ব সৌভাগ্য জননীং মহাসম্পদং প্রদংস্মরেৎ॥

হরচৌধুরী বংশীয় ব্রাহ্মণগণ বংশ পরাম্পরায় পালাক্রমে দেবীর নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত "উত্তরবাহিনী সেবাসমিতি" কর্তৃক বর্তমান দেবীর নিত্যপূজা ও উৎসবাদি পরিচালিত হইয়া থাকে।

জেলা : হুগলী
থানা : চণ্ডীতলা

মেলা বিবরণী

আর্বিভাব ও তিরোভাবের মেলা
(শাহ সুফী সুলতান পীর)

মাঝেরহাট গ্রামে ১লা মাঘ শাহ সুফী সুলতান পীর সাহেবের উরস্ উপলক্ষে জনৈক গ্রামবাসীর প্রায় তিন বিঘা জমিতে অপরাহ্নে কয়েক ঘণ্টার জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

নবাবপুর, মিরযোড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় দেড় হাজার নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে আসেন। ফেরিওয়ালার সংখ্যা প্রায় দশ-বারজন। মেলায় তেলে-ভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান, ধামা-কুলার দোকান ও কাঁচা আনাজপত্রের দোকানপাটও বসিয়া থাকে।

বিশালাক্ষীর জাত মেলা

শিয়াখালা গ্রামে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া একাদশী তিথিতে বিশালাক্ষী দেবীর 'জাত' উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে ও মন্দির সংলগ্ন প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় আশেপাশের দশ-বারো মাইলের মধ্যে অবস্থিত বিভিন্ন গ্রাম হইতে এবং হাওড়া ও কলিকাতা হইতে মোট প্রায় চার-পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশটি দোকানপাটে বসে এবং দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল এবং হাওড়া ও কলিকাতা হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন।

মেলায় মোট প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে। ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবারের দোকান, তামা-পিতল, কাঁচ ও মাটির বাসনকোসনের দোকান এবং মনিহারী দোকান বসে। চ্যাঙারী, ধামা-কুলা, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল ইত্যাদি দোকানগুলি সাধারণতঃ প্রতি বৎসর আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে সেবা-সমিতির তত্ত্বাবধানে কিঞ্চিৎ দান আদায় করা হয় এবং উহা দেবীর সেবায় ব্যয় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় লোকদের লাঠি খেলা, সাঁওতালদের নাচগান এবং যাত্রা-থিয়েটার অভিনয় হয়। এই সকল আমোদ-প্রমোদে প্রায় দুই-তিন হাজার নর-নারী অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—এই গ্রামে বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ১৬ই আষাঢ় একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বিশালাক্ষীর জাত মেলার অনুরূপ।

জেলা : হুগলী
থানা : জাঙ্গিপাড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : রাজবলহাট।

৬।১,৪২৭৯০।১,২৫৩।৮,৩৫০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কামার, কুমার, তাঁতী, হাড়ী, ডোম, স্বর্ণবণিক, গোপ, মাহিষ্য, সদ্‌গোপ, মুচি, ছুতোর, তামলি ও মুসলমান।

গ্রামটি চারিটি চক ও চৌদ্দটি পাড়ায় বিভক্ত। চকগুলি যথাক্রমে—বৃন্দাবনচক, স্থপরচক, দফরচক ও বহুরচক প্রভৃতি।

পাড়াগুলি যথাক্রমে—সাহাচৌধুরীপাড়া, বন্দ্যোপাধ্যায়পাড়া, নন্দীপাড়া, ভড়পাড়া, বণিক-পাড়া, কুণ্ডুপাড়া, দাসপাড়া, দেপাড়া, দুলেপাড়া, মুচিপাড়া, হাড়ীপাড়া, কড়াপাড়া প্রভৃতি।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্পী।

(গ) হাওড়া ময়দান হইতে হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা ছোট জলপথে আঁটপুর স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। পূর্বভারতীয় রেলপথে হাওড়া-তারকেশ্বর শাখায় হরিপাল রেলস্টেশনটি গ্রাম হইতে প্রায় তের মাইল দূরে অবস্থিত। হরিপাল হইতে পাকা রাস্তায় দ্বারহাট্টা পর্যন্ত মোটরবাস চলাচল করে।

ইহাভিন্ন গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে প্রবাহিত দামোদর নদ দিয়া বর্ষাকালে নৌকায় যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) আষাঢ়ে রথযাত্রা উৎসব, আশ্বিনে দুর্গাপূজা, কার্তিকে কালীপূজা, পৌষসংক্রান্তি, ফাল্গুনে দোলযাত্রা, চৈত্রে রামনবমী এবং চড়ক ও বুড়া শিবের গাজন প্রভৃতি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাহা ছাড়া, গ্রামে প্রতিষ্ঠিত রাজবল্লভী দেবীর নিত্য পূজা ও বৎসরের বিভিন্ন তিথিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে অনুষ্ঠিত প্রায় সবগুলি পূজাই বেশ প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উপলক্ষে দুইদিন মেলা বসে। মেলাটি বহু প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে চারদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

রামনবমীর মেলা। চৈত্র মাসে। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে রাজবল্লভী দেবীরমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির ও মূর্তি বহুকালের প্রাচীন। দেবীর বৃহৎ মন্দির প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরের প্রবেশপথে প্রথমেই "নহবৎ খানা" দৃষ্টিগোচর হয়। তাহারপর কাছারীবাড়ী ; এবং দেবীর মূল মন্দির ও তৎসংলগ্ন শিবমন্দির ও বুড়াশিবের মন্দিরসহ দেবীর মন্দিরবাড়ীর প্রথম মহল। প্রথম মহলে একটি বিরাট নাটমন্দির ও একটি চত্বর আছে। প্রথম মহলের পর রান্নাবাড়ী ও খিড়কী পুকুর এবং পার্শ্ব-ভাগে স্নানের পুষ্করিণী। দেবীর মূল মন্দিরের কোন কোন অংশ মার্বেল পাথরের দ্বারা কারুকার্য খচিত দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাছাড়া, দেবীর একটি ঘড়িশালা আছে।

শ্রীনিমাই চন্দ্র সাহা চৌধুরী, ছাত্র,
রাজবলহাট, হুগলী।

Rajbalhat—A considerable village famous for handloom cloth on the left bank of the Damodar in thana Jangipara of the Serampur subdivision. In the early British period it was a place of importance, being selected in 1786 for the seat of a Commercial Residency. The Residency was transferred to Haripal about 1790. "Rajbaulhaut" appears in Rennell's Atlas as a police station and the junction of several roads.—

(District Handbooks, 1951, Hooghly by A. Mitra, p. 34)

বিশেষ দ্রষ্টব্য—রাজবলহাট গ্রামের অনুষ্ঠিত রাজবল্লভীদেবীর উৎসব-পার্বণ সম্পর্কে আমাদের

প্রতিনিধি শ্রীতরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি উৎসব বিবরণী অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।

২। গ্রাম : খুঁড়িগাছি। ৪৮।২৫০'৫৭।২১০।৪০০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, নমঃশূদ্র, তিলি, ধোপা, মুচি, তাঁতী ও মুসলমান।

গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রেলস্টেশন জাঙ্গিপাড়া। তাহাছাড়া, প্রায় এক মাইল উত্তরে ইছানগরী স্টেশন হইতে মোটর-বাসে গ্রামে যাতায়াত করা চলে। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ জগৎবল্লভপুর-হারানন্দ রোড।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে ডাকাতে কালীর পূজা।

(ঙ) ডাকাতে কালীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা, একটি মনসা, একটি ধর্ম-ঠাকুর, একটি বিশালাক্ষী ও পীরের একটি স্থান আছে।

গ্রামে ডাকাতে কালীর একটি মন্দির ও তৎসংলগ্ন একটি মঠ আছে। দিলাকাশ গ্রাম নিবাসী জনৈক ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া উল্লিখিত মঠটি স্থাপন করেন।

শ্রীমনোহর রায়, কৃষিজীবি,
গ্রাম : নন্দীগ্রাম,
পোঃ দিলাকাশ,
হুগলী।

৩। গ্রাম : আঁটপুর।৭২।৩২৯'৮১।১০৮।১,৫২০

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, নাপিত, ছুতার, মালাকার, স্বর্ণকার, কামার, ধোপা, বারুই, হাড়ী, মুচি, বাগ্‌দী ও দুলে।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও তাঁতশিল্প।

(গ) হাওড়া ময়দান হইতে ছোট রেলপথে অবস্থিত আঁটপুর স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। স্টেশন হইতে রাজবলহাট পর্যন্ত নিয়মিত মোটরবাস চলাচল করে। গ্রামে যাতায়াতের প্রধান পথ গজা-রাজবলহাট রোড।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে সর্বজনীন রথযাত্রা, আশ্বিন মাসে সর্বজনীন দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে সর্বজনীন শ্যামাপূজা এবং ফাল্গুন মাসে স্থানীয় মিত্র-বংশের কুলদেবতা রাধাগোবিন্দজীউর দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে রাধাগোবিন্দজীউর একটি মন্দির ব্যতীত একটি কাঠের উপর সুন্দর কারুকার্য খচিত চণ্ডীমণ্ডপ আছে। প্রতিটি চণ্ডীমণ্ডপে দুর্গাপূজা হইয়া থাকে।

সভাপতি,
আঁটপুর ইউনিয়ন বোর্ড,
হুগলী।

আঁটপুর—প্রাচীনকালে এই স্থান ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং তাঁতের কাপড়ের জন্য ইহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। পূর্বে এই স্থানের নাম 'বিষখালি' ছিল, পরে এই অঞ্চলে ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজার অষ্ট সেনাপতি বসবাস করিত বলিয়া ইহা আঁটপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ লাভ করে। যে আটটি গ্রাম লইয়া আঁটপুর গঠিত হইয়াছিল, সেই আটটি গ্রাম আজও বিদ্যমান আছে।

আঁটপুর নামকরণ সম্বন্ধে আর একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। মুসলমান রাজত্বকালে এইস্থানে আঁনোর খাঁ ও আঁটোর খাঁ নামে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান জমিদার বাস করিতেন, তাঁহাদের নামানুসারে আনোরবাটি ও আঁটপুর নামকরণ হইয়াছে। কিন্তু এই স্থানে কোন মুসলমানের বাস নাই।

কৃষ্ণরাম মিত্র (আঁটপুর নিবাসী বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্র বাহাদুরের দেওয়ান) কৃষ্ণরামের দেবালয় ভজনালয় প্রভৃতি স্থাপনের মধ্যে আঁটপুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। তিনি বৈষ্ণবাটী হইতে গঙ্গাজল ও গঙ্গামাটি আনাইয়া এবং সেই গঙ্গামাটিতে ইঁট পোড়াইয়া রাধাগোবিন্দের মন্দির নির্মাণ করান। মন্দির একশত ফুট উচ্চ এবং মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটির অষ্টাদশ পুরাণোক্ত সমুদয় দেবদেবীর মূর্তি এবং পুরাণানুযায়ী কারুকার্যমণ্ডিত চিত্রাবলী দেখিলে প্রাচীন বাংলার ভাস্কর্যশিল্প যে কত উন্নত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইটের কারুকার্যখচিত হুগলী জেলার মন্দিরগুলির মধ্যে ইহা বৃহত্তম। মন্দিরের মধ্যে সিংহাসনের উপর রাধাকান্ত ও শ্রীরাধার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

["হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড, শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ১৩১৬-১৩১৭]

৪। **গ্রাম : ফুরফুরা। ১০২।৭৮৩·৭৩।৪৬৩।২,৫৮৮**

(ক) বাগ্দী, দুলে, সাঁওতাল, জেলে, হাড়ী, মুচি, মাহিষ্য ও মুসলমান।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে। যেমন—পীরসাহেবপাড়া, গোবিন্দপুর, নগর ফুরফুরা, মুনসী-পাড়া, পটী গোবিন্দপুর।

(খ) কৃষিকার্য, কৃষিমজুরী ও মৎস্যব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-শিয়াখালা ছোট রেলপথে শিয়াখালা, হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা লাইনে সীতাপুর অথবা ইষ্টার্ণ রেলপথে হরিপাল স্টেশনে নামিয়া রিক্সাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর একুশে ফাল্গুন হইতে তেইশে ফাল্গুন তিনদিনব্যাপী 'ইছালে ছাওয়ার' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গত বাংলা ১৩০৭ সন হইতে উৎসবটি পালন করা হইতেছে।

(ঙ) ইছালে ছাওয়ার উৎসব উপলক্ষে মেলা। ইহা এই অঞ্চলে ফুরফুরা শরীফের মেলা নামে খ্যাত। ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় উনষাট বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিসার,
জাঙ্গিপাড়া, হুগলী।

Phurphura—A village in thana Chanditala of Serampur subdivision. It is situated not far from the left bank of the Saraswati river, above 6 miles west of Serampur town. A considerable centre of Musalmans, it is inhabited by many respectable *aimadars* or rent-free tenure-holders. They are known as Ashraf."

Phurphura (J. L. 102)—20 miles from Howrah to Sehakhala on the Howrah-Sehakhala Railway. From Sehakhala south-west by road to Phurphura (3 miles). Or by road from Calcutta to Uttarpara (8 miles). From Uttarpara to Sehakhala 14 miles and from Sehakhala to Phurphura (3 miles).

The actual place of the shrines is called Mohra Simla.

(a) An old low mosque. An inscription on black basalt in the Tughra character fixed over the entrance to the tomb (b). It records the erection of mosque by the great Khan Ulugh Mukhlis Khan in the year 1375 A.D., and is therefore assumed to belong to this mosque which is without any inscription Judging from the architectural details, the mosque appears to belong to a group of mosques which were built only within a limited period (1460-1519 A.D.). According to tradition it was built in 1595 A.D.

(b) The tomb of Hazrat Muhammad Kabir Saheb generally called Shah Anwar Kuli of Aleppo. Two stones near the tomb are pointed out as those on which

the saint used to kneel at the time of shaving."

(District Handbooks, 1951, Hooghly by A. Mitra, p. 222)

৫। গ্রাম : হিজুলী। ১১৩।৩১২·৯২।৫৩।৩০১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্গোপ, নাপিত, তাঁতী, বাগ্দী, দুলে, বাউরী ও সাঁওতাল।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল উত্তরে হরিপাল রোড ষ্টেশন। হরিপাল-আঁটপুর রাস্তায় মোটরবাস বা রিক্সায় আসিয়া ভুড়কুশ মোড় হইতে প্রায় এক মাইল কাঁচা রাস্তায় হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) বৈশাখ মাসে শীতলাপূজা, জ্যৈষ্ঠ মাসে মঙ্গলচণ্ডীপূজা ও দশহরা তিথিতে মনসাপূজা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসের অমাবস্যায় মনসাপূজা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা এবং কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও পূর্ণিমায় রাসযাত্রা, পৌষ মাসে পৌষপার্বণ, মাঘ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা, ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা, চৈত্র মাসে শিবের গাজন ও চড়ক প্রভৃতি পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) বিশালাক্ষী দেবীর পূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষী, শিব, শ্রীধর, নারায়ণ ও মনসার মন্দির এবং ষষ্ঠীপূজার নির্দিষ্ট স্থান আছে।

শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দেবশর্মা,
গ্রাম হিজুলী,
পোঃ জঙ্গলগোড়ী, হুগলী।

৬। গ্রাম : কাপড়পুর। ১১৭।১৬৮·১৪।৫৪।৩৫৭

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, তাঁতী, মাহিষ্য, বাগ্দী।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া ময়দান হইতে ছোট রেলপথে সীতাপুরহাট রেলস্টেশনটি গ্রাম হইতে প্রায় দেড় মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাভিন্ন, হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা রেলপথে প্রসাদপুর স্টেশন হইতেও গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ মাসের অমাবস্যা তিথিতে পৌষকালী পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) পৌষকালীপূজার মেলা। পৌষ মাসে একদিন।

(চ) গ্রামে কালীদেবীর একটি প্রাচীন মন্দির ব্যতীত একটি শীতলা, একটি শিব ও কয়েকটি মনসার স্থান আছে।

শ্রীকানাই লাল চক্রবর্তী, যাজকবৃত্তি,
গ্রামঃ কাপড়পুর,
পোঃ ডিঙ্গালহাটি, হুগলী।

নিম্নে জাঙ্গিপাড়া থানার মধ্যে অবস্থিত আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মন্দিরের বিবরণ দেওয়া হইল।

সীতাপুর স্টেশনের নিকট কোটাপুর গ্রামে রাজরাজেশ্বরী মন্দির অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়। মন্দিরগাত্রে সুন্দর সুন্দর পোড়ামাটির চিত্র আছে।

প্রসাদপুর স্টেশনের পূর্বদিকে গোবিন্দপুর গ্রামের শ্রীধরজীউর মন্দির ১৬৩৯ সনে নির্মিত হয়। মন্দিরে শ্রীধর, লক্ষ্মী ও চণ্ডীর বিগ্রহ আছে। মন্দিরের মধ্যে বিগ্রহগুলি প্রত্যহ পূজিত হয়। স্টেশনের দুই মাইল পশ্চিম দিকে হরিরামপুর গ্রামের জোড়া শিবমন্দির ১৬৬০ সনে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া লেখা আছে। মন্দির দুইটির আকারে ছোট হইলেও ইহাদের গাত্রে ইংরাজ সওদাগরের জাহাজ, বন্দুক হস্তে কয়েকজন সৈন্য প্রভৃতির চিত্রগুলি এখনও বিনষ্ট হয় নাই। দুইটি মন্দিরেই শিবলিঙ্গ আছে এবং নিত্যপূজা হয়।

রাইগড় স্টেশনের আধ মাইল দূরে কৃষ্ণনগরের শিবমন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির চিত্রগুলি মনোহারিত্বে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে। এই মন্দির ১৬৬৫ সনে নির্মিত হয় এবং ইহার বর্তমান সেবায়েত হইতেছেন শ্রীপুলিন বিহারী তা।

(শ্রীসুধীর কুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত)।

জেলা : হুগলী
থানা : জাঙ্গিপাড়া

উৎসব বিবরণী

ইছালে ছাওয়ার উৎসব
(ফুরফুরা শরীফ)

ফুরফুরা গ্রাম মুসলমানদিগের নিকট একটি তীর্থস্থান। শোনাযায় এখানকার পীর বংশ সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে সুদূর পারস্য হইতে ভারতে আসেন। ফুরফুরা পীর বংশে অনেক ভক্ত ফকির ও মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে।

এই স্থানে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের ২১শে হইতে ২৩শে তারিখ পর্যন্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের "ইছালে ছাওয়ার" বা ধর্মসভা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি বাংলা ১৩০৭ সনে হজরত আবুবকর সিদ্দিকী আল কোবাইশী ফুরফুরারী কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। উৎসব উপলক্ষে পীর মৌলানা আবু বক্কার সাহেবের বহু শিষ্য ও অনুরাগীর দল এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে প্রতি বৎসর প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার মুসলমান এই স্থানে সমবেত হন। উৎসবের তিনদিনব্যাপী ধর্মসভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বহু জ্ঞানীগুণী, মৌলভী ও ফকির যোগদান করেন। উৎসব উপলক্ষে অন্নসত্রের ব্যবস্থা করা হয়।

উল্লিখিত ইছালে ছাওয়ার উৎসব সম্পর্কে ১৮ই এপ্রিল ১৯৬১ আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

"জাঙ্গিপাড়া, (হুগলী) ১৪ই এপ্রিল—ফুরফুরা শরীফ হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার একটি প্রাচীন গ্রাম। প্রতি বৎসর এখানে মুসলমানদের যে ধর্মীয় জমায়েত বসে তাহাকে 'মাহফিলে ওয়াজ ও ইছালে ছাওয়ার' বা ইসলামী ধর্মসভা বলা হয়। এবারও কিছুদিনপূর্বে অনুষ্ঠিত তিনদিন-ব্যাপী ফুরফুরা শরীফের ইছালে ছাওয়ার বাংলা তথা ভারত ও পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রায় লক্ষাধিক ধর্মার্থী মুসলমান-এর সমাবেশ হইয়াছিল।

মার্টিন কোম্পানীর হাওড়া ময়দান শিয়াখালা লাইনে শিয়াখালায় নামিয়া ফুরফুরা শরীফে যাইতে হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এ বৎসরেও স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা ছিল।

ফুরফুরা শরীফের ইছালে ছাওয়ারের প্রতিষ্ঠাতা আমীরুল শরীয়ত মোজাদ্দাদে মিল্লাত মরহুম হজরত পীর সাহেব কেবলার সমাধিসৌধের নিকট বিপুল সংখ্যক ধর্মার্থীর নীরব শ্রদ্ধা নিবেদনের ভাবগম্ভীর দৃশ্য উপস্থিত সকলের মনেই দাগ কাটে।

ইহা কোন মামুলি মেলা নয়। তাই এখানে প্রয়োজনীয় ন্যায্য মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের দোকান ব্যতীত অন্য কোন দোকান খোলা হয় না। দুই বেলা পীর সাহেবের দরবার হইতে অতিথিদের বিনামূল্যে খাওয়ান হয়।

হেজবুল্লাহ কমিটির স্বেচ্ছাসেবকগণ অক্লান্তভাবে ধর্মার্থীদের সেবা করেন। মরহুম পীর সাহেব কেবলার স্মরণে তাঁহারই পুত্রদের দানে রাজ্য সরকার "মওলানা আবু বকর মেমোরিয়াল ফুরফুরা ইউনিয়ন হেল্‌থ সেণ্টার" নামে এখানে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রও ১৯৪৯ সালের ৪ঠা মার্চ্চ উদ্বোধন করেন। এই স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং জেলাবোর্ড যাত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখেন।

কলিকাতা হইতে ফুরফুরা শরীফ পর্যন্ত পাকা রাস্তার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইলেও দুই-এক জায়গায় রাস্তাটি অপেক্ষাকৃত সরু বলিয়া এইবার জমায়েতের সময় রাষ্ট্রীয় পরিবহণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। প্রকাশ, রাস্তাটি চওড়া হইলে যাত্রীদের এই অসুবিধা দূর হইবে।"

ইতুপূজা

"জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুর বাজারে দ্বিতীয় বার্ষিক মিত্র বা ইতুপূজা সমারোহে সম্পন্ন করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। কার্তিক মাসের শেষ তারিখে সংক্রান্তি দিবসে এক বৃহৎ মৃৎপাত্রে নানারূপ শাকের লতা ধান্য চারা বহু প্রকার রবিশস্য মাটির উপর বপন করিয়া একটি ঘটের মধ্যে স্থাপন করিয়া পূজা, বাদ্যভাণ্ড দ্বারা আরম্ভ হয়। একমাস যাবত প্রতি রবিবারে পূজা করা হয় এবং গত অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে ভোগ আরতি দ্বারা পূজা শেষ করিয়া ঠাকুর বিসর্জন দেওয়া হয়। বাজারের দোকানীগণ

এ পূজায় অংশ গ্রহণ করিয়াছিল পূজার প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।”

—বসুমতী, ১৯শে পৌষ ১৩৬৭।

কালীপূজা

খুঁড়িগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া আট-দশদিনব্যাপী “ডাকাত কালী” নামে খ্যাত কালীদেবীর বিশেষ পূজা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহা এই অঞ্চলের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের নিজস্ব উৎসব। গ্রামে ‘ডাকাতে কালী’-র মন্দিরের অভ্যন্তরে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ, জয়া-বিজয়া ও মহাদেব সহ কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। উৎসবটি বহু-কালের প্রাচীন। সাধারণের বিশ্বাস প্রায় সাত-আট শত বৎসর পূর্বে (বীরাঙ্গনা রাণী রায়বাঘিনীর আমলে) দুর্দান্ত প্রতাপশালী নমঃশুদ্র সম্প্রদায় কর্তৃক এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সময় হইতেই ইহা হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানা ও হাওড়া জেলার আমতা থানার উত্তরাঞ্চলের নমঃ-শূদ্র সম্প্রদায়ের আরাধ্যদেবী বলিয়া পরিচিত।

নিকটবর্তী দিলাকাশ, হরিশপুর, বসন্তপুর, রশিদপুর, উদয়নারায়ণপুর, জাঙ্গিপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং সীমান্তবর্তী জেলাগুলি হইতে বহু নমঃশূদ্র উৎসবে যোগদান করেন। কিছু সংখ্যক অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরাও উৎসবে যোগদান করেন।

উৎসব উপলক্ষে প্রতিদিন সাড়ম্বরে যথারীতি পূজা হয়। ভক্তরা সাধারণতঃ কালীদেবীর নিকট ছাগ বলি ও ফল-মিষ্টি ইত্যাদি মানত করেন। দেবীর নিত্য পূজা হয়। সেবায়েত নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ভুক্ত জনৈক ব্যক্তি। পূজারীর শাণ্ডিল্য গোত্র, পদবী বন্দ্যোপাধ্যায়।

ডাকাতে কালীর পূজার প্রস্তুতি প্রায় মাসাধিককাল পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। উৎসবের সাত-আটদিন থিয়েটার যাত্রাভিনয়, কৃষ্ণযাত্রা, কবিগান, তরজা, পুতুলনাচ এবং পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে মৃন্ময় পুতুল নির্মাণ করিয়া প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

উল্লিখিত উৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া নবমী তিথিতে এবং কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ডাকাতে কালীর বিশেষ পূজাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

দোলযাত্রা

দ্বারহাট্টা, ৯ই মার্চ—বিগত দোল পূর্ণিমা দিবস জাঙ্গীপাড়া থানার আঁটপুর গ্রামে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরজীউর দোলযাত্রা বেশ নির্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গিয়াছে। এতদুপলক্ষে রাধাগোবিন্দ জীউর মন্দির “চত্বরে” মেলা বসে, পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী, শিশু এই উৎসবে যোগ দেয়। বহু দোকান-পত্রাদি বসে। স্থানীয় কীর্তন সম্প্রদায় মন্দির প্রাঙ্গণে হরিসংকীর্তন করে। শ্যামসুন্দর জীউর বকুলতলায় হোলি খেলার মাতন দেখার জন্য অগণিত পুরনারীগণের সমাবেশ অতীব রমনীয়, আবিরে আবিরে সর্বত্র লালে লাল হইয়া যায়। বাজনা-বাদ্য, জনসমাগম, হরিধ্বনি প্রভৃতি পরিবেশে আঁটপুর তীর্থের মাটি মুখরিত হইয়া উঠে।

—বসুমতী, ৩০শে ফাল্গুন ১৩৬৭।

রথযাত্রা

জাঙ্গিপাড়ায় বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত রথযাত্রা উৎসব সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে একটি মেলা বসে। উহাতে আদিবাসীদের নৃত্যগীত বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।”

—আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৩শে আষাঢ়, ১৯৬৭।

রাধাবল্লভীদেবীর পূজা

হুগলী জেলার জাঙ্গিপাড়া থানার অন্তর্গত রাজবলহাট একটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম। কলিকাতা হইতে এই স্থানের দূরত্ব প্রায় ২৬ মাইল। হাওড়া-আমতা মার্টিন রেলপথে আঁটপুর স্টেশন অথবা পূর্ব রেলপথে হরিপাল রেল স্টেশন হইতে মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ভূরিশ্রেষ্ঠী রাজগণ কংসাবতী নদীর তীরবর্তী এই স্থানটিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য একটি বন্দর বা নগর প্রতিষ্ঠা করেন। শোনা যায় সেই সময় হইতে বহু বিদেশী সওদাগর কংসাবতী নদী পথে নানারূপ পণ্যবহর লইয়া এই বন্দরে আসিতেন। এই গ্রামে হাটতলা নামে একটি প্রাচীন স্থান আছে; বর্তমানে ইহা একটি নির্জন পরিত্যক্ত স্থানরূপে বিদ্যমান

কেবলমাত্র অতীতের সাক্ষীরূপে দুইটি প্রাচীন জীর্ণ মন্দির ও একটি বৃহৎ জলাশয় দেখিতে পাওয়া যায়। একদা এই হাটতলাই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থলরূপে সদা চঞ্চল মুখর থাকিত। ইংরাজ রাজত্বের গোড়ার দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ইংরাজগণ এই স্থানে একটি বৃটিশ রেসিডেন্সী স্থাপন করেন। বর্তমানে এই গ্রামে বহু তাঁতী সম্প্রদায়ের বসবাস আছে এবং অদ্যাপি রাজবলহাটের তাঁতের শাড়ীর বিশেষ খ্যাতি আছে।

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রাজবল্লভীর নামানুসারে সম্ভবতঃ গ্রামের নাম রাজবল-হাট হইয়াছে। রাজবল্লভী দেবী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া এই অঞ্চলে খ্যাত।

রাজবল্লভী দেবীর মন্দিরটি একটি সাধারণ পাকা গৃহ মাত্র। ইহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দির প্রবেশ পথে নহবতখানায় প্রতিদিন প্রভাত ও সন্ধ্যায় সানাই-এর সুর বাজে। নহবতখানার পর দেউড়িতে কয়েকটি আটচালা ঘর আছে। ইহার একটি ঘরে একটি জলঘড়ি রক্ষিত আছে। প্রতি বৎসর শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় জলঘড়ি হইতে সময় নিরূপণ করিয়া দেবীর পূজার্চনা হইয়া থাকে। মন্দির প্রাঙ্গণে জোড়াশিব মন্দিরে দুইটি শিবলিঙ্গ এবং রাজবল্লভী দেবীর মন্দির সম্মুখস্থ পাকা নাটমন্দিরের নিকট একটি মন্দিরে বুড়া শিব নামে খ্যাত একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বুড়া শিবমন্দিরে গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

রাজবল্লভ দেবীর মন্দির অভ্যন্তরে প্রায় ছয়ফুট উচ্চ দ্বিভুজা দেবীর মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। দেবীর বাম হস্তে রুধির পাত্র, দক্ষিণ হস্তে অসি এবং কণ্ঠে মুণ্ডমালা দেখিতে পাওয়া যায়। বস্ত্র পরিহিতা দেবী মহাকাল ভৈরবের বক্ষে দক্ষিণ পদ এবং বিরূপাক্ষ শিবের মস্তকে বাম পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা। শরৎকালের জ্যোৎস্না প্রভার ন্যায় দেবীর বর্ণ। কোন কারণে একদা দেবী মূর্তির অঙ্গহানি হইলে প্রাচীন মূর্তিটি পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান মূর্তিটি নির্মিত হয়। প্রাচীন রীতি অনুসারে দেবীর মূর্তি ব্রাহ্মণ দ্বারা নির্মাণ করাইতে হয়।

এই মন্দিরে একটি বাসুদেব মূর্তি, ভগবতী মূর্তি এবং লক্ষ্মী ও সরস্বতী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাদের নিত্য-পূজা হয়। সরস্বতী মূর্তিটিকে নীল সরস্বতীর ধ্যানে পূজা করা হয় এবং প্রতি বৎসর মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতী পূজায় একটি ছাগ বলি দেওয়া হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে রাজা রুদ্রনারায়ণ কর্তৃক বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয় এবং ১৩৪০ সনে স্থানীয় কতিপয় ব্যক্তিদের অর্থানুকূল্য মন্দিরটির আমূল সংস্কার সাধিত হয়। ১৩৪৬ সনে মন্দির সম্মুখস্থ নাট মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়।

এই গ্রামে রাজবল্লভী দেবীর আবির্ভাব সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, এই স্থানে জনৈক বৃদ্ধ মালাকারের গৃহে একদা নামগোত্রহীনা একটি সুন্দরী বালিকা আসিয়া হাজির হয়। বৃদ্ধ মালাকার বালিকাটির মাতাপিতার কোনরূপ সন্ধান করিতে না পারিয়া মায়াপরবশত তাহাকে নিজ গৃহে লালন-পালন করিতে থাকেন। একদিন নিকটবর্তী কংসাবতী নদী দিয়া জনৈক ধনবান সওদাগর সপ্তডিঙ্গা সাজাইয়া নৃত্য-গীত প্রভৃতি আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে যাইতেছিলেন। মালাকার গৃহের বালিকাটি নৃত্য-গীতে আকৃষ্ট হইয়া মাঝিদের নৌকা থামাইতে বলেন। কিন্তু উক্ত নৌকার সওদাগর বালিকাটির রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে অপহরণের জন্য তাহাকে নৌকা তুলিতে বলেন। আশ্চর্যের বিষয় বালিকাটি পরপর ছয়টি নৌকায় পদস্পর্শ করিবা মাত্র একটি একটি করিয়া ছয়টি নৌকা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হয়। সপ্তম নৌকায় তুলিবার সময় এক দৈববাণীতে সওদাগর জানিতে পারেন যে, এই বালিকা স্বয়ং ভগবতী। তখন তিনি তাঁহার কৃত কর্মের জন্য দেবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা প্রার্থনা করেন এবং দেবীর তাঁহার কাতর অনুনয়ে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে এই স্থানে দেবী মন্দির নির্মাণ করিয়া পূজা-অর্চনার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দিয়া নিজে অন্তর্ধান হন। সওদাগরের নিমজ্জিত ছয়টি নৌকা দেবীর কৃপায় জলে ভাসিয়া উঠে এবং সওদাগর দৈব নির্দেশ অনুযায়ী রাজবল্লভীদেবীর পূজা-অর্চনায় সুবন্দোবস্ত করেন। এই রূপেই এই গ্রামে রাজবল্লভী দেবীর পূজার প্রচলন হয়। বহুকাল পূর্বে বর্তমান রাজবল্লভী মন্দিরের সম্মুখ দিয়া

কংসাবতী নদী প্রবাহিত ছিল, এখন সেই নদীর কোন চিহ্ন নাই। মন্দিরের পশ্চাদ্‌ভাগে মালঞ্চ নামে একটি স্থান আছে, বর্তমানে এই স্থানটি বাঁশবনে পরিণত হইয়াছে। অবশ্য কয়েক ঘর মালাকার অদ্যাপি এই স্থানে বাস করিতেছেন।

রাজবল্লভী দেবীর যথারীতি নিত্য ভোগপূজাদি অনুষ্ঠিত হয়। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল হইতে মানসিক পূজা ও দেবী দর্শন করিতে বহু ভক্তের সমাগম হয়। সাধারণত ষোড়শোপচারে পূজা, ছাগ বলি, অর্থ, বস্ত্র ও স্বর্ণালঙ্কার মানসিক করা হয়। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর শারদীয়া সপ্তমী হইতে নবমী তিথি পর্যন্ত সাড়ম্বরে রাজবল্লভী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। নবমী তিথিতে প্রথমে দেবীর নিকট একটি ছাগ ও পরে একটি মহিষ বলি দেওয়া হয়। স্থানীয় একটি কর্মকার পরিবার বংশানুক্রমে প্রতি বৎসর দেবীর নিকট উল্লিখিত বলি প্রদান করেন। এই কারণে উক্ত পরিবার কিছু দেবোত্তর ভূসম্পত্তি উপস্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন। নবমী পূজার দিন প্রাচীন প্রথানুসারে মন্দিরের নিকটে দেবী পুকুরে সাতটি ছোট কাষ্ঠ নির্মিত নৌকা ভাসাইয়া পর পর ছয়টিকে ডুবাইয়া দিয়া সপ্তম নৌকাটিকে ভাসাইয়া রাখা হয়। সম্ভবতঃ দেবীর আবির্ভাব স্মৃতি স্মরণ উপলক্ষেই এই পর্ব পালন করা হয়। নবমী তিথিতে মহিষ বলি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মন্দিরে বহু লোকের সমাগম হয়।

রাজবলহাটে শীলপাড়ার দামোদরজীউর মন্দিরটি ১৬৪৬ শকাব্দে এবং রাধাবল্লভজীউর মন্দিরটি ১৬১৬ শকাব্দে নির্মিত। মন্দিরগাত্রে অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়। দামোদর মন্দিরে দামোদর শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে। ভড় পাড়ায় ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে নির্মিত একটি আধুনিক মন্দিরে রঘুনাথ নামে একটি শিলা খণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে।

ইহাভিন্ন এই স্থানে জনৈক তান্ত্রিক কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে সিদ্ধেশ্বরী নামে খ্যাত একটি মৃন্ময়কালী মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সিদ্ধেশ্বরী কালী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী বলিয়া খ্যাত। দেবীর নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর এই মন্দিরে 'সয়লা' নামে একটি উৎসব পালিত হয়। এই উৎসব উপলক্ষে মেয়েরা পরস্পরের সহিত সখীত্ব এবং ছেলেরা পরস্পরের সহিত 'সাঙাৎ বা বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া থাকেন। বন্ধুত্ব পাতনোর সময় ছেলে-মেয়েরা নিম্নলিখিত ছড়া কাটেন :

নীচে দই, উপরে খই,
তুমি আমার জন্মের সই ॥

রাজবলহাট গ্রামে বিভিন্ন পল্লীতে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা, ভাদ্র সংক্রান্তিতে রান্নাপূজা ও বিশ্বকর্মাপূজা, মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা, চৈত্র মাসে গাজন ও হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা : হুগলী
থানা : জাঙ্গিপাড়া

মেলা বিবরণী

ইছালে ছাওয়ার উৎসবের মেলা

ফুরফুরা গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে ইছালে ছাওয়ার উৎসব উপলক্ষে পীরোত্তর প্রায় কুড়ি বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য দিবারাত্রিব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় উনষাট বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সবগুলি জেলা হইতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ, এমনকি পাকিস্তান হইতে, সর্বমোট প্রায় একলক্ষ যাত্রীর সমাগম হয়। যাত্রীগণ সাধারণতঃ ট্রেণ, মোটরবাস ও মোটরযোগে মেলায় আসেন।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটি দোকানপাটের অধিকাংশই খাবারের দোকান। বিক্রেতারা স্থানীয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

কালীপূজার মেলা

খুঁড়িগাছি গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত ডাকাতে কালীপূজা উপলক্ষে অমাবস্যার পরদিন কালী মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। তবে মাঝে কয়েক বৎসর মেলাটি বন্ধ ছিল। বর্তমানে মেলাটি পুনরায় বসিতেছে।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজার দোকান চা-পান-বিড়ির দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির পুতুল ও খেলার দোকান এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ দিলাকাশ, কুলাকাশ, বোড়হল, গুটি, জাঙ্গিপাড়া প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কবিগান, তরজা এবং থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। কোন কোন বৎসর নাগরদোলা ও সার্কাসের দল আসে।

কাপড়পুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে পৌষকালীর পূজা উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন দেবোত্তর প্রায় এক বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

মেলায় আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম এবং হাওড়া ও কলিকাতা হইতে প্রায় আট-দশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়; যাত্রীগণের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশী।

মেলায় প্রায় ষাট-সত্তরটি দোকানপাটের মধ্যে খাবার ও মনিহারী দোকানের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া, হাঁড়িকুড়ি, ধামাকুলা প্রভৃতি জিনিসপত্রের কয়েকটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু দান বা তোলা দেন।

অন্যান্য মেলার ন্যায় এই মেলায় আমোদ-প্রমোদের তেমন কোন ব্যবস্থা নাই।

দোলযাত্রার মেলা

আঁটপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় স্থানীয় মিত্র পরিবারের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দজীউর দোলযাত্রা উৎসব উপলক্ষে রাধাগোবিন্দের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রায় দশ কাঠা জমির উপর বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, শাকসব্জী ও বই-ছবি প্রভৃতির মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন।

এই মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা করা হয় না।

বিশালাক্ষীপূজার মেলা

হিজুলী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমায় বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে মন্দির সংলগ্ন প্রায় তিন বিঘা জমির (জমির কিছু অংশ দেবোত্তর এবং কিছু অংশ সেবাইতের) উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে।

নিকটবর্তী রাধানগর, আঁটপুর, জাঙ্গিপাড়া, হরিপাল, দ্বারহাট্টা, গোপীনাথপুর, শিয়াখালা, ফুরফুরা প্রভৃতি গ্রামাঞ্চল হইতে মেলায় প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হইয়া থাকে।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা ইত্যাদি জিনিসপত্রের কুড়ি-বাইশটি দোকান বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়।

আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর পুতুলনাচ, কৃষ্ণযাত্রা বা যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

রথযাত্রার মেলা

আঁটপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গ্রামের হাটের আটচালায় ও পার্শ্ববর্তী রাস্তার দুই পাশে প্রায় দশ কাঠা জমিতে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

আঁটপুর ইউনিয়ন ও নিকটবর্তী জাঙ্গিপাড়া, দ্বারহাট্টা, গোপীনাথপুর ও রাজবলহাট প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মোট প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মোট প্রায় ত্রিশটি দোকানপাটের মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, শাকসব্জী ও বই-ছবি প্রভৃতির আমদানী হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

জেলা : হুগলী
থানা : গোঘাট

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : বাজুয়া। ৩২।৯৮২'০৬।২৩১।১,৫১৫

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বর্গক্ষত্রিয়, কামার, স্বর্ণকার, ময়রা, নাপিত, ধোপা, তাঁতী, সাঁওতাল।

গ্রামে ছাব্বিশটি পাড়া আছে। যেমন— বড় ঘোষপাড়া, ছোট ঘোষপাড়া, পাত্রপাড়া, মণ্ডলপাড়া, সামন্তপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, মল্লিকপাড়া, আচার্যপাড়া, নাপিতপাড়া, তাঁতীপাড়া, সাঁতরাপাড়া, উত্তর ও দক্ষিণ সাঁওতাল পাড়া, ধোপাপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) হাওড়া ময়দান হইতে ছোট রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ বুড়া শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন। প্রধান সেবায়েত ডাঃ অনুকূল চন্দ্র পাল। চক্রবর্তী পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ শিবের পূজারী।

(ঙ) গাজন মেলা। পয়লা বৈশাখ। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি জীর্ণ পাকা মন্দিরে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে; ইহা বুড়াশিবের মন্দির নামে খ্যাত। ইহাভিন্ন গ্রামে তিনটি শীতলা, পাঁচটি মনসা, একটি কালী, দুইটি চণ্ডী এবং বিশালাক্ষী, বাবাঠাকুর ও স্বরূপনারায়ণ প্রভৃতি দেব-দেবী আছে।

শ্রীরতন চন্দ্র ঘোষ, কৃষিজীবি,
গ্রামঃ বাজুয়া, হুগলী।

বাজুয়া গ্রামে নবাব নাসিরুদ্দীনের আমলের নির্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। মজলিস খানওয়ার ৯৩৮ হিজরায় এই মসজিদ নির্মাণ করেন।

বাজুয়ার দীঘির পাড়ে রামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসবের মেলা হয়। (হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ", ৩য় খণ্ড, শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ১৪৩৯-১৪৪০)

২। গ্রাম : রঘুবাটী। ৩৫।৮০১'৪৩।১৮।৬৪২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, বাগ্দী, দুলে, নাপিত, ডোম, রুইদাস, বর্গক্ষত্রিয়, সাঁওতাল ও মুসলমান।

গ্রামে ষোলটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা ছোট রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যায়। অহল্যাবাঈ রোডের মদিনার চৌমাথা হইতে তারক মুখার্জি রোড দিয়া কেবলমাত্র গ্রীষ্মকালে গ্রামে মোটরবাসে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। মাঘ মাসে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি সত্তর বৎসরের প্রাচীন। এতদঞ্চলে মেলাটি মাঘীপূর্ণিমার মেলা নামে খ্যাত।

(চ) গ্রামে বিশ্বেশ্বরজীউ শিবের মন্দির, হরিসভার জন্য একটি আটচালা ঘর এবং তিনটি শীতলা, দুইটি মনসা ও পাঁচটি পঞ্চানন আছে।

শ্রীসূর্যনারায়ণ কোলে, কৃষিজীবি,
গ্রাম ও পোঃ রঘুবাটী, হুগলী।

৩। গ্রাম : জোত চণ্ডী। ৪০।৩৭৩'৮৭।১৫৮।৫৭৯

(ক) ব্রাহ্মণ, নমঃশূদ্র, তেলী, সদ্‌গোপ, মাঝি, দুলে, মুচি, কলু, মালি, বাউরি ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) বিষ্ণুপুর অথবা বর্ধমান রেলস্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যাইতে পারে। অহল্যাবাঈ রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। উৎসবটি এতদঞ্চলে জোতচণ্ডীর গাজন উৎসব নামেও পরিচিত। উৎসব উপলক্ষে সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

(ঙ) গাজন মেলা। চৈত্র মাসে চারদিনব্যাপী। মেলাটি বেশ প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব মণ্ডপ এবং কনকেশ্বরী চণ্ডী, শীতলা ও মনসাদেবী আছে।

গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কনকেশ্বরী চণ্ডী বিশেষ জাগ্রত ঈশ্বরী। সেই কারণে গ্রামের নামও চণ্ডীপুর হইয়াছে।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়,
গ্রাম : জোত চণ্ডী,
পোঃ সেনাই, হুগলী।

৪। গ্রাম : বেঙ্গাই। ৪২।১,৭২৬·২৭।৩৪৮।১,৯৬৫

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, দুলে, কুমার, হাড়ী ও সাঁওতাল। গ্রামে সতেরটি পাড়া আছে। যথা—বাড়ুজ্যেপাড়া, ভট্টাচার্যপাড়া, রায়পাড়া, দুলে পাড়া, পণ্ডিতপাড়া, কুলোরপাড়া, হাড়ীপাড়া, তামলি-পাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও কুটীর শিল্প।

(গ) তারকেশ্বর স্টেশনে নামিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়। অহল্যাবাঈ রোড ও বর্ধমান-মেদিনীপুর রোড এই দুইটি জেলাবোর্ডের রাস্তা এই গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ শঙ্করনাথ শিবের গাজন এবং আষাঢ় মাসে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব দুইটি সর্বজনীন এবং বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) গাজনের মেলা। পয়লা বৈশাখ। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। মেলাটি এতদঞ্চলে 'কালকে জুজু' ও 'ভগবতী' মেলা নামে খ্যাত।

রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) শ্যামরায়, ক্ষুদিরায়, কানুরায় ও যাত্রাসিদ্ধি-রায় নামে গ্রামে চারিটি ধর্মরাজ ঠাকুর আছে। শ্যামরায় নামে ধর্মঠাকুরটি গ্রামের সর্বসাধারণের এবং অপর তিনটি ব্যক্তিবিশেষের। একটি চালাঘরে কূর্মাকৃতি ধর্মরাজ শিলা এবং একটি ভগ্নপ্রায় প্রাচীন মন্দিরে শঙ্করনাথ নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গ্রামে একটি ক্ষেত্রপাল দেবতা আছে। অজন্মা বা অনাবৃষ্টির জন্য ক্ষেত্রপালের ভোগ-পূজাদি দেওয়া হয়।

ইহাভিন্ন গ্রামে মোট ছয়টি কালীতলা, চারটি মনসা ও চারটি কালীমূর্তি, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের পিতৃকুলের পূর্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডী আসনের উপর একটি কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। তাহাছাড়া, গ্রামের বাড়ুজ্যে পাড়ায় একটি লক্ষ্মীঠাকুর আছে।

শ্রীতারাপদ ঘোষ, কৃষিজীবি,
বেঙ্গাই, হুগলী।

৫। গ্রাম : সীতানগর। ৫৬।৩১৩·৬৬।১০১।৫২১

(ক) ব্রাহ্মণ, সদ্‌গোপ, কামার, বাগ্দী, বৈরাগী, নাপিত ও মুচি।

গ্রামে পাঁচটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণ-পাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, সদ্‌গোপপাড়া, বাগ্দীপাড়া ও মুচিপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) মার্টিন রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা অথবা পূর্বভারতীয় রেলপথে বর্ধমান স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা চলে। ওল্ড বেনারস রোড হইতে গোঘাট-কুমারগঞ্জ নামে একটি রাস্তা বাহির হইয়া গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে ওল্ড বেনারস রোড দিয়া মোটরবাস চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি গ্রামের

সর্বজনীন এবং আনুমানিক প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা এই দুইদিন। মেলাটি আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ব্যক্তি-বিশেষের একটি মন্দিরে কূর্মরূপী বাঁকুড়া নামক খ্যাত ধর্মরাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি আনুমানিক প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন এবং সংস্কার অভাবে বর্তমানে জীর্ণ প্রায়। ইহা ব্যতীত গ্রামে তিনটি শীতলা ও দুইটি মনসাদেবী আছে।

শ্রীদেবেন্দ্র নাথ পণ্ডিত, কৃষিজীবি,
গ্রাম: সীতানগর,
পো: বাজুয়া, হুগলী।

৬। গ্রাম: গোবিন্দপুর। ৫৭।১,২৬৩'৭০।১৯৭।১,১১৫

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে এগারটি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণ-পাড়া, সিংপাড়া, রায়পাড়া, সরকারপাড়া, মুচিপাড়া, দুলেপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) তারকেশ্বর স্টেশন হইতে আরামবাগ হইয়া ওল্ড বেনারস রোড দিয়া মোটরবাসে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে সাড়ম্বরে শীতলাপূজা এবং ফাল্গুন মাসের শুক্লাষ্টমী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব পালন করা হয়। শীতলা পূজাটি প্রাচীন; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবটি গত ষোল-সতের বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উপলক্ষে মেলা। ফাল্গুন শুক্লাষ্টমী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি ষোল-সতর বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা ও মনসা আছেন।

শ্রীশিবরাম সরকার, শিক্ষক,
গ্রাম: গোবিন্দপুর,
পো: বাজুয়া, হুগলী।

৭। গ্রাম: নবাসন। ৭৪।৫৯৬'৯৪।১৪৪।৮১৪

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তিলি, নাপিত; বাগদী, মুচি ও ডোম।

গ্রামে সাতটি পাড়া আছে। যেমন—ব্রাহ্মণপাড়া, পালপাড়া, নাপিতপাড়া, বাগদীপাড়া, ডোমপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা ছোট রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন হইতে গ্রামে যাতায়াত করা যাইতে পারে।

আরামবাগ-তেঁতুলমুড়ি রোড হইতে নবাসন-বড়কাঁটাপুকুর জেলাবোর্ডের রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে। কেবলমাত্র বর্ষাকালে নিকটবর্তী দ্বারকেশ্বর নদী দিয়া নৌকা চলাচল করে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে স্বরূপ নারায়ণ ধর্মরাজ ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন উৎসব।

(ঙ) ধর্মরাজ ঠাকুরের রথযাত্রা উপলক্ষে মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে দুইটি শীতলা, দুইটি মনসা ও বুড়াশিব নামে খ্যাত একটি পঞ্চানন্দ আছেন।

শ্রীযতীন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, চাকুরী,
গোঘাট, হুগলী।

৮। গ্রাম: শ্যামবাটী। ১০৩।১৯৬'১৪।৯৩।৫৪১

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, গোয়ালা, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, তিলি, কুমোর।

গ্রামে চারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও চাকুরী।

(গ) জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দশীতে রামেশ্বর নামে খ্যাত স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করিয়া শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন

এবং প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পাকা মন্দিরে রামেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির সংলগ্ন একটি নাটমন্দির ও তাহার পাশে একটি বড় দীঘি আছে। ইহা ভিন্ন, গ্রামে শীতলা আছে।

শ্রীজানকী নাথ মুখোপাধ্যায়, চাকুরী,
গ্রাম: শ্যামবাটী,
পো: ধূলেপুর, হুগলী।

৯। গ্রাম: ধুলেপুর। ১০৫।৪০৯'১৫।১০১।৬৩৬

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, সদ্‌গোপ, তিলি, মাঝি, বাগ্দী, কলু, হাড়ী ও মুচি।

গ্রামে উপরোক্ত প্রত্যেক সম্প্রদায়ের নামে ভিন্ন ভিন্ন পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাঁপাডাঙ্গা। মহকুমা শহর আরামবাগ হইতে কালীপুর-উদয়রাজপুর নামে জেলাবোর্ডের একটি রাস্তা গ্রামের মধ্য দিয়া গিয়াছে। আরামবাগ হইতে প্রায় দুই মাইল মোটরযোগে অতিক্রম করিলে ধূলেপুর গ্রাম। এই গ্রামের পূর্ব-সীমানা দিয়া দ্বারকেশ্বর নদ প্রবাহিত। বর্ষাকালে কোলাঘাট হইতে নৌকা বা ষ্টীমার যোগে রাণীচক এবং তথা হইতে নৌকাযোগে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত কালসোনা বিগ্রহের পূজার্চনা ও মকরসংক্রান্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন বলিয়া দাবি করা হয়।

(ঙ) মকরসংক্রান্তির মেলা। পৌষ সংক্রান্তি হইতে তিনদিনব্যাপী। মেলাটি বহু প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে তিনটি পঞ্চানন্দ, তিনটি শীতলা এবং অন্যান্য দেবদেবী আছে। তাহাছাড়া প্রায় প্রতি ঘরেই মনসা দেবীর পূজা হয়।

শ্রীসন্তোষ কুমার রায়, শিক্ষক,
গ্রাম ও পো: ধূলেপুর, হুগলী।

১০। গ্রাম: মোহনপুর। ১১৩।৭২১'০৪।১১১।৫৮৬

(ক) হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল।

গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাঁপাডাঙ্গা। গোঘাট-বল্লভচক রাস্তা দিয়া মোটর চলাচল করে এবং এই রাস্তা দিয়াই গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক পূজা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বিশালাক্ষীপূজার মেলা। চৈত্র মাসে তিন-দিনব্যাপী মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে মাটির দেওয়াল ও টিনের আটচালাযুক্ত একটি দেবালয়ে বিশালাক্ষী দেবীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বিশালাক্ষীর নিত্য পূজা হয়।

শ্রীলক্ষ্মীকান্ত সরকার,
গ্রাম: মোহনপুর,
পো: কুমুড়সা, হুগলী।

**১১। গ্রাম: গুরুলিয়া ভাতশালা।
১৬৩।৫৮৭'১২।১২১।৬০৫**

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, একাদশ তিলি, গন্ধবণিক, নাপিত, ছুতার, কলু, গোয়ালা, দুলে, ডোম, হাড়ী ও মুসলমান।

গ্রামে প্রায় চৌদ্দটি পাড়া আছে। যথা— ব্রাহ্মণপাড়া, বৈষ্ণবপাড়া, গোয়ালপাড়া, দুলেপাড়া, ডোমপাড়া, ছুতারপাড়া, কলুপাড়া, নাপিতপাড়া, হাড়ীপাড়া, বেনেপাড়া, মুসলমানপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চন্দ্রকোনা রোড। চন্দ্রকোনা রোড হইতে মোটরবাস ক্ষীরপাই হইয়া রামজীবনপুরে আসে এবং অপর একটি বাস ঘাটাল হইতে ক্ষীরপাই হইয়া রামজীবনপুরে আসে। রামজীবনপুর হইতে প্রায় দুই মাইল পথ হাঁটিয়া গ্রামে পৌছান যায়। কোলাঘাট হইতে ঘাটাল পর্যন্ত নৌকা চলাচলের ব্যবস্থা আছে।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে শ্মশানকালীর বার্ষিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজাটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) শ্মশানকালীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিনব্যাপী। মেলাটি মাত্র গত দুই বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) গ্রামে শ্মশানকালী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীক্ষুদিরাম চক্রবর্তী,
গ্রামঃ গুরুলিয়া ভাণ্ডশালা,
পোঃ পশ্চিমপাড়া, হুগলী।

শালিবাহন রাজার দেওয়ান জগৎসিংহের নামানুসারে প্রতিষ্ঠিত জগৎপুর গ্রামে শ্রীশ্রীজগৎতারিনী দেবী জাগ্রতা দেবী বলিয়া এই অঞ্চলে কথিত হইয়া থাকে। দেবী কালীমূর্তি, প্রতি বৎসর সংক্রান্তিতে (?) এই স্থানে একটি মেলা বসে। এইদিন বিশ্বকর্মা পূজার দিন যেরূপ ঘুড়ি উড়ান হয়, সেইরূপ বালকবৃন্দ এই স্থানে ঘুড়ি উড়ায়। ঘুড়ি উড়ান এই মেলার একটি বিশেষত্ব।

("হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড, শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ১৩৫৮।)

শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্রের 'হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ' ৩য় খণ্ড, গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত গ্রামগুলির বিবরণী উদ্ধৃত করা হইল :—

আনুড় (মৌজা নং ৪৪)।

গোঘাট থানার অন্তর্গত কামারপুকুর ইউনিয়নের মধ্যে আনুড় একটি ব্রাহ্মণ প্রধান গ্রাম। এই গ্রামের বিশালাক্ষী মাতা জাগ্রতা' দেবী বলিয়া কথিত। নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য বহুদূর হইতে ভক্তগণ আসিয়া দেবীর পূজা দিয়া থাকেন। দেবীর কোন মন্দির নাই, বিশালাক্ষী আকাশের নীচে মুক্তপ্রান্তরে অবস্থান করেন। বর্ষাতাপাদি হইতে রক্ষার জন্য গ্রামের রাখাল বালকেরা প্রতি বৎসর একটি সামান্য আচ্ছাদন করিয়া দেন। গ্রামের রাখাল বালকগণই দেবীর প্রিয় সঙ্গী। পার্শ্বস্থ ভগ্নস্তূপ দেখিয়া একসময় এই স্থানে মায়ের একটি মন্দির ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। পরবর্তীকালে এই স্থানে ইষ্টক নির্মিত মন্দির নির্মাণ করিতে কেহ সফলকাম হন নাই। এই স্থানে শ্মশান অবস্থিত। ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিশালাক্ষী দেবীর নিকট প্রায়ই আসিতেন। শ্মশানে তান্ত্রিক সাধকের প্রতিষ্ঠিত একটি পঞ্চমুণ্ডীর আসন আছে। বিশালাক্ষী মায়ের স্থানে বাৎসরিক মেলা একটি উল্লেখ্য অনুষ্ঠান। [পৃঃ ১৩৬৪]

কাঁটালী (মৌজা নং ৭৭)।

কাঁটালী এই অঞ্চলে পূর্বে একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল। শৈলেশ্বর শিব এই গ্রামের জাগ্রত দেবতা। শৈলেশ্বরতলায় চড়কের সময় মেলায় এখনও বহু জনসমাগম হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য দূরদেশ হইতে যাত্রিগণ শৈলেশ্বর শিবের কাছে 'ধর্ণা' দেয়। পূর্বে তারকেশ্বরের বিরাট মন্দিরের মত শৈলেশ্বরের মন্দির ছিল। বর্তমান একটি কুঁড়ে ঘরে শৈলেশ্বরদেবের পূজাদি হয়।

কাঁটালী গ্রামে বিশালাক্ষী মাতা আছেন। তিনিও জাগ্রতা দেবী বলিয়া কথিত। বিশালাক্ষী মাতার রথযাত্রায় মেলা উপলক্ষে বহু লোক সমাগম হয়।

কামারপুকুর (মৌজা নং ৮২)

কামারপুকুর—হুগলী-বাঁকুড়া-মেদিনীপুর জেলার প্রায় সন্ধিস্থলে কামারপুকুর একটি ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম

হইলেও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মে এই নগণ্য স্থান আজ পৃথিবীর নিকট সুপরিচিত এবং ভারতবাসীর নিকটও ইহা অন্যতম তীর্থক্ষেত্ররূপে প্রখ্যাত। এই তীর্থস্থান কেবল ভারতের নয়, সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকার জনসাধারণ পর্যন্ত এই তীর্থ দর্শনার্থে কামারপুকুরে সমাগত হন। গ্রামের চতুর্দিকে শস্যাদি পূর্ণ শ্যামল ক্ষেত্র এবং ভূতির খাল নামক একটি ক্ষুদ্র জলধারা বিসর্পিত গতিতে উত্তর হইতে দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া অনতিদূরে আমোদর নদে মিলিত হইয়াছে বলিয়া গ্রামখানির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যথেষ্ট বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—রামকৃষ্ণদেব যে স্থানে জন্মগ্রহণ করেন, উহা ঢেঁকিশালরূপে ব্যবহৃত হইত। জন্ম স্থানটির ঠিক উপরেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসি-বৃন্দের পরিচালনায় এবং ভক্তবৃন্দের সহায়তায় রামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি সমন্বিত প্রস্তর মন্দির ১৯৫১ খৃষ্টাব্দের ১১ মে তারিখে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সেইদিন হইতে যথাবিধি বিগ্রহ পূজিত হইতেছে। জন্মগ্রহণ-কালীন পরিবেশের স্মারকরূপে বিগ্রহের বেদীর সম্মুখভাগে একটি ঢেঁকি চুল্লি ও প্রদীপ খোদিত করা হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক পরিকল্পিত। ইহাছাড়া প্রশস্ত নাটমন্দির অতিথিভবন, চিকিৎসালয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার প্রভৃতি নির্মিত হওয়ায় কামারপুকুর এখন শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে।

রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কামারপুকুর কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সারদেশ্বরানন্দ (নলিনী মহারাজ) শ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ কর্মদক্ষতায় ও উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির ও বিভিন্ন ধরনের দশটি প্রতিষ্ঠান কামারপুকুরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির—ঠাকুরের পিতৃদেব ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় গৃহদেবতারূপে রঘুবীর শিলাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। পূর্বে মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনিযুক্ত একটি ঘরে রঘুবীর থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির নির্মাণ-কালে রঘুবীরের মন্দিরও ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। কিন্তু উহার দৈর্ঘ, প্রস্থ ও অবস্থিতি-স্থান ঠিক পূর্বের মতই আছে। এই মন্দিরে শিলারূপী রঘুবীর ছাড়া রামেশ্বর শিব, শীতলাদেবী, গোপালমূর্তি ও আরও একটি নারায়ণ 'শিলা' আছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মভিটার উপর তাঁর আমলের তিনটি চালাঘর এবং তাঁহার স্বহস্তে রোপিত একটি আমগাছ অদ্যাবধি বর্তমান আছে। এইগুলি ভক্তগণের হৃদয়ে ঠাকুরের পুণ্যলীলার মধুর স্মৃতি জাগাইয়া তোলে।

যুগীদের শিবমন্দির—কামারপুকুর যুগীদের শিবমন্দির একটি প্রাচীন দেবস্থান। চন্দ্রমণি দেবী এই মন্দিরে পল্লীর ধনী কামারণীর সহিত কথা কহিবার সময় এক দিব্যদর্শন করেন এবং তাহার পর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হয়। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কিছু কারুকার্য আছে।

কামারপুকুরে লাহা বাবুদের বিষ্ণুমন্দিরের গায়ে কুড়িটি দেব দেবীর সুন্দর টেরাকোটা মূর্তি কারুকার্য খচিত ইঁটে অংকিত আছে। দুইদিকে পাঁচটি করিয়া দশটি এবং মাথার উপর লম্বা ভাবে দশটি মূর্তি আছে। মাথার উপর গণেশজীউর মূর্তি আছে। ইহাছাড়া শ্রীরামচন্দ্র, মহাবীর, হনুমান, মহাদেব, লক্ষ্মীনারায়ণ, দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তিগুলি উল্লেখ্য। লাহাদের পঞ্চচূড় শিবমন্দির এখন ভগ্নাবস্থায়।

গোপেশ্বর শিবমন্দির—রামকৃষ্ণের জন্মস্থানের পূর্বদিকে গোপেশ্বর শিবের মন্দির অবস্থিত। ইহা খুব প্রাচীন মন্দির। স্থানীয় জমিদার গোস্বামী বংশীয়দের কোন পূর্বপুরুষ কর্তৃক ইহা নির্মিত হয়। কেহ কেহ সুখলাল গোস্বামী ইহার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া মত প্রকাশ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের যখন দিব্যোন্মাদ অবস্থা হয়, তখন তাঁহার মাতা শ্রীমতী চন্দ্রমণি পুত্রের আরোগ্য কামনায় গোপেশ্বর মন্দিরে 'হত্যা' দেন এবং তথায় মুকুন্দপুরের শিবের নিকট 'হত্যা' দাও—মনস্কামনা পূর্ণ হইবে, এই প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন।

মুকুন্দপুরের শিবমন্দির—শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম স্থানের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এই মন্দির অবস্থিত। গোপেশ্বর শিবের প্রত্যাদেশ অনুসরণ করিয়া চন্দ্রমণি দেবী এই মন্দিরে 'হত্যা' দিয়া সুফল লাভ করেন বলিয়া তদবধি বহু নর-নারী এই মন্দিরে ব্যাধিমুক্ত হইবার জন্য 'হত্যা' দেন।

ধনী কামারণীর মন্দির—ধনী কামারণী শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম হইতেই ধাত্রীমাতারূপে অপার্থিব স্নেহে তাঁহাকে লালন-পালন করেন। উপনয়নের সময় অগ্রজ রামকুমার ও আত্মীয়স্বজনের বিরোধিতা সত্ত্বেও রামকৃষ্ণ ধনী কামারণীকে ভিক্ষা-মাতারূপে গ্রহণ করেন। তাঁহার বাস্তুভিটায় ১৩৫২ সনে একটি ছোট মন্দির নির্মিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে "শিশু গদাধরকে কোল করিয়া ধনী কামারণী উপবিষ্টা" এই চিত্রখানি স্থাপনা করা হইয়াছে। এই মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণের একখানি প্রতিকৃতির নিত্যপূজা হয়।

কামারপুকুরে রামকৃষ্ণ তরুণ সঙ্ঘ একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান। ইহাদের চেষ্টায় প্রতিবৎসর 'রামকৃষ্ণ মেলা' হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছোট মন্দিরও ইহাদের দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিদ্যামহাপীঠ সংলগ্ন রাস্তার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি পূর্ণাবয়ব মূর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সঙ্ঘ কর্তৃক প্রত্যহ পূজিত হয়। (পৃঃ ১৩৬৫-১৩৭৬)

গড়-মান্দারণ (মৌজা নং ৯২)।

গোঘাট থানার অন্তর্গত গড়-মান্দারণ, একটি খুব প্রাচীন স্থান। আরামবাগ শহরের চারি ক্রোশ পশ্চিমে এই স্থানটি অবস্থিত। এখানে দুইটি গড়ের ধ্বংসাবশেষ আছে; একটি গড়-মান্দারণ আরেকটির নাম ভিতরগড়।

ভিতরগড় হইতে বাহির হইলে কিঞ্চিৎ উত্তর ও পশ্চিমে মান্দারণের গড়ের বিরাট মাটির প্রাচীর দেখা যায়। এই প্রাচীরের পনের ফুট হইতে স্থানে স্থানে কুড়ি ফুট পর্যন্ত উচ্চ। প্রাচীরের উভয় দিক দিয়া আমোদর নদ গড়ের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পূর্ব দিকে প্রায় দক্ষিণ সীমায় বাহির হইয়াছে। ইহার মধ্যে যে ধ্বংসস্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে, ইহা দুইশত বর্গগজ বিস্তৃত এবং ইহার মধ্যস্থলের উচ্চতা প্রায় চল্লিশ ফুটের মত হইবে। স্তূপের সর্বোচ্চ চূড়ায় সমতল ক্ষেত্রে একটি প্রাচীন প্রস্তর নির্মিত বৃহৎ সমাধি আছে। ইহার নাম বড় আস্তানা। ইহা তিন স্তর বিশিষ্ট। প্রত্যেক স্তর দুই ফুট উচ্চ। তৃতীয় স্তরের সর্বোচ্চ ধাপে সমাধিটি অবস্থিত। সমাধিটি ছয় ফুট লম্বা ও তিন ফুট উচ্চ। ইহার উত্তর দিকে দুহাত দূরে একটি ইষ্টকস্তম্ভ আছে, উহাতে প্রদীপ জ্বলে। সমাধির চতুর্দিকে ছোট বড় সুনিপুণ অসংখ্য মাটির ঘোড়া দেখা যায়। জনশ্রুতি সন্তানাদি না হইলে সন্তানের জন্য এবং ব্যধি হইতে আরোগ্য লাভের জন্য এই সকল মাটির মূর্তি সমাধির পাশে রাখা হয়। এই সমাধি গৌড়াধিপ হুসেন শাহের সেনাপতি ইসমাইল গাজীর।

বড় আস্তানার এক মাইল উত্তর-পূর্ব ভিতর-গড়ে আরও একটি দুর্গের বিশাল স্তূপ এখনও বর্তমান আছে। দুর্গমূলস্থিত সমতলক্ষেত্র এখন স্থানীয় মুসলমানদের গোরস্থানরূপে ব্যবহৃত হইতেছে। উপরে এক পুরাতন ইদ্‌গা। ঈদের সময় এইখানে বিশেষ জনতা হয় এবং নামাজ পড়া হয়। ইদ্‌গা-সংলগ্ন এক জীর্ণ সমাধি-মন্দিরও গাজী সাহেবের কবর বলিয়া কথিত হয়। ইহার নাম ছোট আস্তানা।
[পৃঃ ১৪৪০-১৪৪২]

গোঘাট (মৌজা নং ৯৬)।

গোঘাট আরামবাগ শহর হইতে ছ'মাইল দূরে অবস্থিত। গোঘাটের রথ খুব প্রসিদ্ধ। এই রথ আষাঢ় মাসে রথযাত্রার পরিবর্তে দুর্গাপূজার সময় বিজয়া দশমীর দিন চালান হয়। [পৃঃ ১৪৩৭]

শ্যামবাজার (মৌজা নং ১৩৯)।

গোঘাট থানার অন্তর্গত শ্যামবাজার একটি প্রাচীন গ্রাম। শ্যামবাজারে শ্রীশ্রীগদাধরজীউ নামক

শিবঠাকুর গ্রাম্য দেবতারূপে পূজিত হন। পূর্বে এই স্থানে চৈত্র-সংক্রান্তিতে মেলা হইত। [পৃ: ১৩৫৮]

পাণ্ডুগ্রাম (মৌজা নং ১৩৬)।

পাণ্ডুগ্রামে সাধক আউলচাঁদ গোস্বামীর আবির্ভাব হয়। তাঁহার তিরোধান উপলক্ষে অনন্ত চতুর্দশী তিথি হইতে বার দিন ধরিয়া পূজা ও মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহাছাড়া গ্রামে নারায়ণানন্দ ব্রহ্মচারীর হরিবাসর উপলক্ষে একটি মেলাও উল্লেখ্য। গ্রামে বহু প্রাচীন মন্দির আছে। শ্যামসুন্দরজীউর বিগ্রহ খুব সুন্দর। ইহা পাঁচশত বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া কথিত আছে। [পৃ: ১৩৫৮-১৩৫৯]

বদনগঞ্জ (মৌজা নং ১৪৯)।

বদনগঞ্জ গোঘাট থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান। বদনগঞ্জে কালীপূজার সময় বহু প্রাচীন কাল হইতে একটি উৎসব চলিয়া আসিতেছে। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব পদকর্তা আউলিয়া মনোহর দাস এই গ্রামে বাস করিতেন। মনোহর দাস শ্রীমদ্ নিত্যানন্দ প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীমতী জাহ্নবী দেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বদনগঞ্জে ইঁহার সমাধি আছে এবং প্রতি বৎসর মকরসংক্রান্তিতে তাঁহার পুণ্যস্মৃতি উদ্বোধনার্থে তথায় একটি মেলা হয়। [পৃ: ১৩৫৯-১৩৬০]

দামোদরপুর (মৌজা নং ২০৫)।

বালির দক্ষিণে দামোদরপুর গ্রাম। এই গ্রামে চাঁদশাহ নামে একজন ফকির বাস করিতেন। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তাঁহার কবর হয়। প্রতি বৎসর বৈশাখী পূর্ণিমায় তিন দিন এই স্থানে মেলা হয়। তাঁহার কবরস্থানে সিন্নি মানত করিলে ব্যাধিমুক্ত হয় বলিয়া বহু লোক উক্তস্থানে সিন্নি দেয়। গ্রামে এখন কোন মুসলমান নাই, হিন্দুগণই উৎসব পরিচালনা করেন। [পৃ: ১৩৫৮]

বালি-দেওয়ানগঞ্জ (মৌজা নং ২১০)।

গোঘাট থানার অন্তর্গত বালির ইউনিয়নের মধ্যে বালি ও দেওয়ানগঞ্জ প্রসিদ্ধ গ্রাম; আরামবাগ মহকুমার মধ্যে পূর্বে এইরূপ সমৃদ্ধশালী পল্লী আর দ্বিতীয় ছিল না। সুদূর অতীতে নয় ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থাতেও এইরূপ শিল্পপ্রধান ব্যবসাক্ষেত্র ও সমৃদ্ধি যে কোন শহরের লোভনীয় ছিল।

বস্তুতঃ বালি দেওয়ানগঞ্জ দুইটি পল্লী বলিয়া সরকারী কাগজপত্রে লিখিত হইলেও ইহা প্রকৃতপক্ষে একই পল্লীর দুইটি পাড়া বলিলে ঠিক বলা হয়।

বালির পূর্বনাম 'মকদমনগর' ছিল; মকদম পীরের একটি ক্ষুদ্র আস্তানা অদ্যাপি এই গ্রামে আছে। একবার দ্বারকেশ্বর নদীর প্রবল বন্যায় বালির ঘরবাড়ি, হাটবাজার সমস্ত ভাঙ্গিয়া যায় ও গ্রামের সমস্ত স্থান বালি চাপা পড়িয়া যায়। সেই সময় শালিবাহন রাজার দেওয়ান জগৎসিংহ মকদম-নগরের দুরবস্থা দেখিয়া দুঃখিত হন এবং তিনি বহু ব্যয়ে গ্রামের সমস্ত বালি সরাইয়া নগরটি পুনরুদ্ধার করেন এবং এই নগরের দক্ষিণে একটি গঞ্জ বা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিগন্ত বিস্তৃত বালুকাময় স্থানটি সেই সময় হইতে 'বালি' নাম ধারণ করে এবং দেওয়ানজীর চেষ্টায় সে স্থানে গঞ্জ স্থাপিত হয় সেই স্থান 'দেওয়ানগঞ্জ' বলিয়া প্রখ্যাত হয়।

কালাচাঁদ গোস্বামী নামে এক সিদ্ধপুরুষ বালিতে বাস করিতেন। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথা এই অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়। দেহান্তরের পর তিনি বৃন্দাবনে তাঁহার এক পরিচিত ব্যক্তিকে সশরীরে দর্শন দিয়া তাঁহার ব্যবহৃত দণ্ড, খড়ম ও কৌপীন তাঁহাকে দেন। উক্ত জিনিসগুলি আজও প্রত্যহ পূজা করা হয়। বালিতে তাঁহার সমাধি মন্দিরে প্রতি বৎসর সমারোহের সহিত একটি উৎসব হয় এবং ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য মহোৎসবের পর উচ্ছিষ্ট অন্ন রোগীগণ ভোজন করেন।

কাঁলাচাদের সমসাময়িক আর একজন মুসলমান সিদ্ধমহাপুরুষের নামও এই অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ। তাহার নাম আজম খাঁ পীর। কিম্বদন্তি যে দ্বারকেশ্বরে ভীষণ বন্যার সময় তিনি হাঁটিয়া নদী পার

হইতেন। অভীষ্ট ফললাভের জন্ত তাঁহার নামে লোকে সিন্নি মানত করে।

বালিতে অসংখ্য প্রাচীন দেবমন্দির আছে। বালির ঘোষেদের রাসের মেলা এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ মেলা। ঘোষেদের শ্রীশ্রীদামোদর জীউর রাস উৎসব উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী যাত্রা গান ও আতসবাজী পোড়ান হয়। ঘোষেদের এই ঠাকুরের নামে বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে।

বালির মঙ্গলা মন্দির উনবিংশ শতাব্দীতে নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। মন্দিরে কোন প্রস্তর ফলক নাই। মন্দিরের গঠনশৈলী ও কলানৈপুণ্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের ত্রয়োদশ রত্নের মধ্যে কয়েকটি ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দিরের বিভিন্ন দেওয়ালে পোড়া-মাটির যে সব কারুকার্য আছে সেগুলি পোড়ামাটি-শিল্পের প্রাচীনতম নিদর্শন। প্রতিটি মূর্তি ও তার ভঙ্গিমা অপূর্ব শিল্পসুষমায় মণ্ডিত, কিন্তু এই সব মূর্তিগুলি নোনা লাগিয়া ক্রমশঃ নষ্ট হইয়া যাইতেছে।

দুর্গামন্দির জোড়বাংলা মন্দির; কিন্তু ইহার বিশেষত্ব মন্দিরের চূড়ায় একটি গম্বুজের উপর নয়টি রত্ন আছে। পোড়ামাটির শিল্পকলার দিক হইতে মন্দিরের গায়ে যে সব নিদর্শন আছে, সেগুলি নানা ধরনের। কোনটি ইতিহাস বর্ণিত কোন দৃশ্য। কোনটি বা সমসাময়িক সমাজের বিশেষ কোন বর্ণনা। শিল্পনৈপুণ্যের দিক হইতে এই চিত্রগুলি অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য।

পোড়ামাটি শিল্পকলার দিক হইতে বালির পঞ্চরত্ন দামোদর মন্দির ও ইহার পশ্চাতে দুর্গামন্দিরটিও উল্লেখযোগ্য।

প্রতিবৎসর বিজয়াদশমীর দিন ও পরবর্তী অষ্টম দিবসে শ্রীশ্রীশীতলা মাতার স্থানেও একটি মেলা হয়; ইহা রথের মেলা বলিয়া খ্যাত। সেইজন্য শীতলা মাতার পূজা ও নগর সংকীর্তন এই স্থানের একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। দশমীর দিন বালির মালিকপাড়ায় শীতলাতলা হইতে একটি কারুকার্য খচিত পিতলের রথ উত্তর মুখে বালির হাটতলায় যায় এবং অষ্টম দিবসে উহা পুনরায় মালিপাড়ায় ফিরিয়া আসে। এই রথ বুলি নামে একটি স্ত্রীলোক তৈয়ারী করিয়া দেন। [পৃঃ ১৩৫০-১৩৭৬]

জেলা : হুগলী
থানা : গোঘাট

উৎসব বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাব উৎসব
(ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ)

গোবিন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমী হইতে তিনদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং গত প্রায় ষোল-সতের বৎসর অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবের অন্ততঃ পক্ষকাল পূর্বে উদ্যোক্তরা গ্রামে গ্রামে ভিক্ষায় বাহির হন এবং ভিক্ষালব্ধ চাউল ও অর্থাদির দ্বারায় উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। উৎসবের তিনদিন প্রত্যহ শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমার যথারীতি বাদ্যভাণ্ডসহ পূজা, কালীপূজা, রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত পাঠ এবং প্রত্যহ আপামর জনসাধারণের মধ্যে ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই উপলক্ষে দূর দূরান্তর হইতে বহু ভক্ত ও গুণীব্যক্তির সমাবেশ ঘটে।

কালীপূজা

শুকলিয়া ভাতশালা গ্রামে বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে শ্মশানকালীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে একাযোগে কালী, শীতলাপূজা ও মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি দুইদিন ধরিয়া চলে এবং তিন-চারদিন পূর্ব হইতেই ইহার প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। প্রস্তুতির মধ্যে হরিনাম সংকীর্তনের জন্য সুসজ্জিত বেদী নির্মাণই প্রধান কার্য। অষ্টমী তিথির প্রাতঃকাল হইতে শীতলার "জাগরণ গান" আরম্ভ হয় এবং দ্বিপ্রহরে শীতলার পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ, আরতি ও প্রসাদ বিতরণ করা হয়। বৈকালে শীতলামঙ্গল এবং রাত্রে শ্মশানকালীর যথারীতি পূজাদি ও শীতলার নগর পরিক্রমাশেষে বলিদান, আরতি, প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। নবমী তিথিতে অষ্টমপ্রহরব্যাপী অখণ্ড তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্তন ও প্রসাদ বিতরণ হয়। হরিনাম যজ্ঞ এই উৎসবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। সাধারণতঃ আতপ-চাল, ফল, মিষ্টি ইত্যাদি দিয়া পূজা দেওয়া হয়। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে ছাগ ও ভেড়া বলি দেওয়া হয়। বর্তমান সেবায়েত একাদশ তিলি সম্প্রদায় ভুক্ত হিন্দু। পূজারী সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, উৎসবে কিছু সংখ্যক অহিন্দু ও অংশ গ্রহণ গ্রহণ করেন। উৎসবটি প্রায় শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া অনুমান করা হয়।

গ্রামে একটি কালীপূজা মণ্ডপ আছে; উক্ত মণ্ডপে শ্মশানকালী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাচীন কালী মন্দিরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ায় স্থানীয় গ্রামবাসীগণ সেই স্থানেই বর্তমান কালী মণ্ডপটি নির্মাণ করিয়াছেন। প্রাচীন মন্দিরটি কোন সময়ে কাহার দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল তাহার সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে এই গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ই শ্মশান-কালীর সর্বশেষ পূজারী ছিলেন। তিনি অসুখ-বিসুখের ঔষধপত্রাদি দিতেন। রোগমুক্তির আশায় দূর-দূরান্তর হইতে বহুসংখ্যক নরনারী এখানে আসিতেন। জনশ্রুতি আছে চক্রবর্তী মহাশয়ের অনাচারে দেবী অত্যন্ত কুপিত হন এবং পূজারীর মৃত্যু হইলে কোন ব্রাহ্মণেই এই জাগ্রতা দেবীর পূজারীপদ গ্রহণ করিতে সাহসী না হওয়ায় দেবীর নিত্যপূজা বন্ধ হইয়া যায়।

কালক্রমে অবহেলা ও অযত্নে কালী মন্দিরটি ধ্বংস-প্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বৎসর পর এই গ্রাম নিবাসী শ্রীরসময় অধিকারী নামে জনৈক বৈষ্ণব দেবীর কৃপালাভে সমর্থ হইয়া কালীর সেবায়েতের আসন গ্রহণ করেন এবং ভূতপূর্ব পূজারী স্বর্গীয় চক্রবর্তী মহাশয়ের মতই বর্তমানে স্বপ্নাদৃষ্ট ঔষধপত্রাদি বিতরণ করিতেছেন। দেবীর কাছে মানত করিলে বিভিন্ন রোগ বিশেষ করিয়া স্ত্রীরোগ নিরাময় হয় এই বিশ্বাসে বহু নরনারী এই স্থানে আসিয়া থাকেন। কালী দেবীর স্বপ্নাদেশে বর্তমান মণ্ডপটি নির্মিত হয় এবং কালীমূর্তি গঠন করিয়া গত বাংলা ১৩৭৪ সনের বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে মহাসমারোহে মণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজা

চণ্ডীপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে কনকেশ্বরী

চণ্ডীপূজা ও তাঁহার ভৈরব স্বয়ম্ভুনাথ শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সংক্রান্তি তিথিতে নীলপূজা, শিবের গাজন ও হোমপূজাদি হইয়া থাকে। শিবের নিকট ভক্তরা সাধারণতঃ সিদ্ধি, গাঁজা সহ নৈবেদ্য দিয়া পূজা দিয়া থাকেন। গাজন উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসবের আয়োজন করা হয় এবং ইহা এইস্থানের গাজন উৎসবের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলা যাইতে পারে। সেনাই, গৌরীপুর, নবহরিবাটি প্রভৃতি আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। উৎসবটি প্রাচীন। শিবের নিত্যপূজা হয়। ভরদ্বাজ ও সাবর্ণ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় ও গঙ্গোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ শিবের পূজাদি করিয়া থাকেন।

মকরসংক্রান্তি উৎসব

প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত ধূলেপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'কালসোনা' (রাধাকৃষ্ণ) বিগ্রহের বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। উৎসবটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন। এই গ্রামের প্রাচীন রায়বংশ কালসোনা বিগ্রহের সেবায়েত।

কিংবদন্তী আছে যে, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে এই গ্রামের প্রসিদ্ধ প্রতিহার রায়বংশের জনৈক ভক্তিমান ব্যক্তি স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া কালসোনা নামে খ্যাত রাধাকৃষ্ণের দারুময় মূর্তি নির্মাণ করিয়া নিত্যসেবা পূজার ব্যবস্থা করেন। আরো শোনা যায় যে, কালসোনা বিগ্রহ বিশেষ জাগ্রত দেবতা বিবেচনা করিয়া উহাকে বর্ধমানের মহারাজা রাজবাটীতে লইয়া যান। কিন্তু তাঁহার প্রতি স্বপ্নাদেশ হওয়ায় তিনি পুনরায় এই স্থানে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যসেবা পূজার জন্য বহু ভূসম্পত্তি দান করেন। অদ্যাবধি ঐ সকল ভূসম্পত্তির আয় হইতে বিগ্রহের নিত্যপূজা ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইতেছে।

গ্রামে টিনের চালাযুক্ত তিন প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট একটি পাকা মন্দিরে কালসোনা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দির প্রাঙ্গণে ভোগরন্ধনশালা ও রাসমঞ্চ আছে। সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। মন্দিরের পশ্চাতে কৃষ্ণসায়র নামে একটি সরোবরের তীরে একটি শিবমন্দির ও একটি দুর্গামণ্ডপ আছে। প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে এই মণ্ডপে দুর্গাপূজা হয়।

মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রাধিকার মূর্তি শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত। প্রবাদ আছে যে প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সাধক অভিরাম গোস্বামী একদা এই মন্দিরে বিগ্রহ দর্শনে আসেন। তাঁহার মত তেজস্বী বৈষ্ণবের প্রণাম গ্রহণ অক্ষম হইয়া শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা পশ্চাতে গিয়া আড়াল করিয়া দাঁড়ান। তদবধি শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণেই রহিয়া গিয়াছেন। অভিরাম গোস্বামী মকরসংক্রান্তি তিথিতে এই স্থানে বিগ্রহ দর্শনে আসেন; সেই কারণে প্রতি বৎসর এই তিথিতেই উৎসবের আয়োজন করা হয়।

উৎসবের পূর্বদিন দেবদেবীর নববস্ত্রে ও নানাবিধ অলঙ্কার ভূষিত হইয়া নববেশ ধারণ করেন এবং এই দিন পূজা ও ভোগের উপকরণ সংগ্রহ, রন্ধনশালা ও প্রসাদ বিতরণের স্থানে আচ্ছাদন নির্মাণ এবং নহবৎখানা প্রভৃতি প্রস্তুত করা হয়।

সংক্রান্তির দিন আতপ চাল, দুধ, মিষ্টান্ন, ফলমূলাদিসহ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার পরে ভোগ নিবেদন এবং সন্ধ্যা হইতে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। এইরূপ ভাবে পূজা, আরতি ও ভোগ নিবেদন ও প্রসাদ বিতরণ ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত চলে। ভক্তেরা অর্থ-অলঙ্কার ও ষোড়শোপচারে নৈবেদ্য দিয়া পূজাদি দিয়া থাকেন। মকরসংক্রান্তিতে উৎসব ব্যতীত কালসোনা বিগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর জন্মাষ্টমী, রাস, দোল ও উত্থান একাদশী তিথিতে বিশেষ উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবাদিতে আশে-পাশে বিভিন্ন গ্রাম হইতে বহু লোকজনের সমাগম হয়। উক্ত বিগ্রহের সেবায়েত সদগোপ সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু এবং পূজারী—সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পদবী চক্রবর্তী। এই পূজায় সর্বসম্প্রদায়ের লোকজন যোগদান করেন এবং অতিথিশালায় ব্যবস্থা থাকায় দূর দূরান্ত হইতে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে।

মহোৎসব

রঘুবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমায় চব্বিশ প্রহর-ব্যাপী অখণ্ড নামসংকীর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন এবং প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মহোৎসব শেষে কালীপূজা এই উৎসবেরই একটি অঙ্গ। সাধারণতঃ মাকরী সপ্তমী তিথি হইতে উৎসবের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়। এইদিন গোধূলীতে কালী-মূর্তি নির্মাণের জন্য "মায়ের মাটি তোলা হয়।" হরিনাম সংকীর্তনের জন্য গ্রামে একটি স্থায়ী আটচালা আছে। মহোৎসবের সময় এই আটচালায় রাধাকৃষ্ণের মৃন্ময় যুগল-মূর্তি নির্মাণ করিয়া বামাবর্তে ঘুরিয়া চব্বিশ প্রহরব্যাপী নাম সংকীর্তন যজ্ঞের সূচনা হয়। গ্রামে মারীভয় নিবারণের জন্য এই নাম যজ্ঞের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিদিন বেলা এগার ঘটিকার মধ্যে যুগলমূর্তি পূজা, পরে আরতি ও ভোগ দেওয়া হয়। উৎসবের তিনদিন প্রত্যহ সমাগত যাত্রীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। চব্বিশ প্রহর নাম সংকীর্তনের পর "ধূলট" উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া কালী পূজার পর উৎসবের সমাপ্তি ঘটে। এইদিনে সর্বজনীন ভোজের ব্যবস্থা করা হয়। উৎসবের পূজারী ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখোপাধ্যায় পদবীধারী ব্রাহ্মণ।

রথযাত্রা

নবাসন গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে ধর্মরাজ ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া সাড়ম্বরে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই গ্রামে ধর্মরাজ ঠাকুরের কোন মূর্তি নাই। প্রতি বৎসর গোঘাট গ্রামে প্রতিষ্ঠিত কূর্মাকৃতি স্বরূপনারায়ণ ঠাকুরকে উৎসব উপলক্ষে এই স্থানে আনিয়া যথারীতি পূজা ও উৎসব পালন করা হয় এবং উৎসব শেষ হইলে পুনরায় উক্ত বিগ্রহকে গোঘাটের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে ধর্মঠাকুরকে রথে আরোহন করাইয়া রথের দঁড়ি টানা হয়। প্রধানতঃ ধর্মরাজ ঠাকুরের নিকট ছাগ বলি মানত এবং ষোড়শোপচারে ভক্তেরা পূজা দিয়া থাকেন। ভট্টাচার্য ও চট্টোপাধ্যায় পদবীধারী দুইজন ব্রাহ্মণ ধর্মরাজের পূজাদি করেন। উৎসবটি সর্বজনীন এবং হইতে নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চলের বহু লোকজন যোগদান করেন।

বেজাই গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শ্যামরায় ধর্মঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব এবং সপ্তাহকাল পরে পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সর্বজনীন ও বহুকালের প্রাচীন। গ্রামে সাধারণের একটি দেবালয়ে ধর্মরাজ ঠাকুরের কূর্মমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন গ্রামে ব্যক্তিবিশেষের ক্ষুদিরায়, কালুরায় ও যাত্রাসিদ্ধরায় নামে আরও তিনটি ধর্মঠাকুর আছেন। রথযাত্রায় নির্দিষ্ট দিনে ঐ তিনটি ধর্মঠাকুরকে পূজা মণ্ডপে আনিয়া মহাসমারোহে শ্যামরায়ের সহিত যথারীতি পূজা, ভোগ ও আরতি শেষে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবের দিনে ধর্মরাজের নিকট ছাগ বলি দেওয়া হয়। পূজারী-ব্রাহ্মণ। সকল সম্প্রদায়ের নরনারী উৎসবে যোগদান করেন। শ্যামরায়ের নিত্য পূজা হয়।

বিশালাক্ষীপূজা

মোহনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে ব্যক্তি বিশেষের প্রতিষ্ঠিত বিশালাক্ষী দেবীর বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি মাটির দেবালয়ে বিশালাক্ষী দেবীর পাষাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। রামনবমী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী সাড়ম্বরে বিশালাক্ষী দেবীর পূজা, হোম ও ছাগ বলি দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন এবং ইহা ব্যক্তি বিশেষের উৎসব হইলে ইহাতে গ্রামের সর্বসাধারণ এমনকি অহিন্দুরাও যোগদান করিয়া থাকেন। মানতকারীরা বিশালাক্ষী দেবীর নিকট ষোড়শোপচারে পূজা ও ছাগ বলি দিয়া থাকেন। দেবীর নিত্য পূজা হয়। সেবায়েত জনৈক একাদশ তিলি সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু এবং পূজারী ব্রাহ্মণ।

জেলা : হুগলী
থানা : গোঘাট

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা (ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ)

গোবিন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুনী শুক্লাষ্টমী তিথি হইতে তিনদিনব্যাপী রামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে রামকৃষ্ণ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি গত ষোল-সতর বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। হুগলী জেলার সরকারী খাস মহল অফিসের ভূতপূর্ব তহশীলদার শ্রীনিবারণ চন্দ্র গুহ মহাশয় এই মেলার প্রবর্তন করেন। প্রত্যহ বিকালের দিকে মেলায় লোক সমাগম ও কেনা-বেচা হয়।

মেলায় স্থানীয় এবং রঘুবাটী, বেঙ্গাই, গোঘাট, মান্দারণ, হাজিপুর, পশ্চিমপাড়া, বকুল্তা, কুমারগ, শ্যাওড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে হিন্দু-মুসলমান এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানত: বালী, বীজুয়া, আরামবাগ, তারকেশ্বর, গোঘাট প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। পনর-কুড়িটি দোকানপাট বসে এবং আঠার-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। সাধারণত: ময়রা, তেলেভাজা ইত্যাদি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান ও চা-পান-বিড়ির দোকান বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনী ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। দর্শক ও শ্রোতার সংখ্যা আনুমানিক সাত-আটশত।

কালীপূজার মেলা

শুকলিয়া ভাতশালা গ্রামে প্রতি বৎসর বৈশাখী শুক্লা অষ্টমী তিথিতে শ্মশানকালীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পূজা মণ্ডপ প্রাঙ্গণে প্রায় তিন বিঘা জমিতে দুইদিনব্যাপী বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র গত দুই বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

মেলায় শ্যামবাজার, বদনগঞ্জ, পশ্চিমপাড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে এবং রামজীবনপুর পৌর এলাকা হইতে সর্বসম্প্রদায়ের মোট প্রায় নয়শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং প্রায় পাঁচ-ছয়জন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ প্রধানত: রামজীবনপুর ও বদনগঞ্জ হইতে আসেন। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, বাসনকোসনের দোকান, বই-ছবির দোকান, মাটির খেলনা-পুতুলের দোকান, বাঁশের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান ও পান-বিড়ির দোকান ইত্যাদি বসে। বিক্রেতাদের নিকট দান গ্রহণ করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক, কীর্তন, ভাঁড়নাচ ও যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

চড়ক-গাজন-নীলপূজার মেলা

বজুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ বুড়াশিবের গাজন উপলক্ষে বোড়া পুকুরের পশ্চিমপাড়ে এবং গোঘাট-কুমারগঞ্জ রোডের পূর্বদিকে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় দশ কাঠা জমির উপর বিকালের দিকে মাত্র তিন-চার ঘণ্টার জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। নিকটবর্তী রঘুবাটী ইউনিয়ন হইতে প্রায় চার শত নরনারী মেলায় আসেন।

মেলায় কয়েকটি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান এবং লোহার জিনিসপত্রের দোকান ইত্যাদি বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানত: স্থানীয় এবং দুই-একজন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় একটি দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

জোত চণ্ডী গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে শিব মণ্ডপের সম্মুখে ও পিছনে প্রায় পনর কাঠা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি

বহুদিনের প্রাচীন এবং প্রায় চারদিন স্থায়ি হয়। মেলায় প্রায় আট-নয় শত নরনারীর আসেন।

বিক্রেতাগণ সাধারণতঃ গোঘাট, আরামবাগ, একলক্ষী, কোতুলপুর, খাটুল, আকতপুর, ভুরকুণ্ডা, খানাটি, নবাসন, সেনাই, কোয়ালপাড়া, কামারপুকুর, জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় আসেন। মোট প্রায় চল্লিশটি দোকানপাট বসে এবং পনর-কুড়িজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, কাঁচ-তামা-পিতল ও মাটির বাসনকোসনের দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, কাঠ, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী সৌখীন জিনিসপত্রের দোকান প্রভৃতিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়, কবিগান ও কীর্তন এবং ম্যাজিক প্রদর্শনী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হয়।

বেঙ্গাই গ্রামে প্রতি বৎসর পয়লা বৈশাখ শঙ্কর শিবের গাজন উপলক্ষে জেলাবোর্ডের রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় দশ শতক জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। স্থানীয় লোক ইহাকে 'কালকে জুজু' বা ভগবতী মেলা বলিয়া থাকেন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর, আহুড়, রঘুবাটী ইউনিয়ন হইতে হিন্দু, মুসলমান ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রায় পাঁচ-ছয় শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও মনিহারী দ্রব্যাদির কুড়ি-বাইশটি দোকান বসে। কামারপুকুর ও আহুড় হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থায়ী একটি দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে আশে-পাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

মকরসংক্রান্তি মেলা

ধুলেপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসের সংক্রান্তি তিথি হইতে ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত কালসোনার বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে দেবগৃহ সংলগ্ন প্রায় দুই-তিন বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি 'কালসোনার মেলা' নামে খ্যাত। মেলাটি সাধারণতঃ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে এবং ইহা বহুকালের প্রাচীন মেলা।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের কুমুড়সা, ভাতুর, রঘুবাটী, বেঙ্গাই, ভুরকুণ্ডা, নকুণ্ডা, গোঘাট, সাওড়া, বালি, কিশোরপুর, গৌরহাটী এবং পাতুল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে ও বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং বর্ধমান জেলা হইতে প্রধানতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রায় সাত-আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়। মেলায় সমাগত যাত্রীর মধ্যে নারীর সংখ্যাই অধিক। মেলায় যাত্রীগণ প্রধানতঃ গরুর গাড়ী, মোটর গাড়ী ও সাইকেল যোগে আসেন।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আরামবাগ, মায়াপুর, খানাকুল, একলক্ষী, গোঘাট, বালিদেওয়ানগঞ্জ, সালেপুর, গৌরহাটী আমদৈ প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় ফেরিওয়ালা আসেন প্রায় পনর-কুড়িজন। মেলায় দোকানপাটের সংখ্যা প্রায় সত্তর-আশিটি; তন্মধ্যে মিষ্টান্ন, মনিহারী, কৃষিসংক্রান্ত যন্ত্রপাতি, বাসনকোসন, খেলনা পুতুল প্রভৃতি দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া মেলায় বই-ছবি এবং অন্যান্য নানাবিধ জিনিসপত্রের দোকানপাটও বসে। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে যৎকিঞ্চিৎ দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, লটারী, থিয়েটার, কীর্তন, পাঁচালী গান প্রভৃতি ব্যবস্থা করা হয়। থিয়েটার ও যাত্রাভিনয় স্থানীয় দল কর্তৃক অভিনীত হয়। গ্রামেই 'ধুলেরপুর মিলনী সঙ্ঘ' নামে একটি থিয়েটার ক্লাব আছে। থিয়েটার অনুষ্ঠানে যোগদানকারীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ-ছয় হাজার।

মহোৎসবের মেলা

রঘুবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘীপূর্ণিমা তিথি হইতে চব্বিশ প্রহরব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে 'শিবতলা' নামক স্থানে বিশেশ্বর জীউ শিবের নামে দেবত্তোর প্রায় পাঁচ বিঘা

জমিতে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় সত্তর বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং আশেপাশের রায়না, গণেশবাটী, হরিশচন্দ্রপুর, লস্করদীঘি, কামারপুকুর, সেনাই, আগাই, গোঠাই, ভুরকুণ্ডা, খাটগ্রাম, শালকোঠা, বরণহাটি, বিজলকোণা, গৌরাঙ্গবাটী, বাজুয়া, কুমারগঞ্জ, একলক্ষী, সীতানগর, ভাদুর, আত্রা, মাধবপুর, গোবিন্দপুর, কালিপুর, আরামবাগ, মদিনা, গোঘাট, রতনপুর, কাঁটা-পুকুর, শালিঞ্চা, রাজগ্রাম, নবাসন প্রভৃতি গ্রাম হইতে বহু নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ সিঙ্গুর, তারকেশ্বর, আরামবাগ, একলক্ষী, ভুরকুণ্ডা কামারপুকুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। প্রায় পঞ্চাশখানি দোকানপাট বসে এবং দশ-পনরজন ফেরিওয়ালা আসেন। সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে খাবার ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, কাঁসা-পিতলের বাসনকোসনের দোকান, মাদুরের দোকান, জুতার দোকান, বই-ছবির দোকান প্রভৃতিই বেশী। তাহাছাড়া গঙ্গামাটির বিখ্যাত পুতুল, সন্তোষপুরের ছুতার মিস্ত্রীর কাঠের পুতুলের দোকান ও বাজুয়ার কামারদের তৈয়ারী খুন্তী, বঁটি প্রভৃতি দোকানপাটও বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থায়ী একটি দল কর্তৃক প্রতি বৎসর যাত্রাভিনয় হয়। কোন কোন বৎসর নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক প্রদর্শনীরও ব্যবস্থা করা হয়।

বিশালাক্ষীপূজা

মোহনপুর গ্রামে চৈত্র মাসে রামনবমী তিথিতে বিশালাক্ষী দেবীর উৎসব উপলক্ষে দেবালয় প্রাঙ্গণে ও আটচালায় দেবত্তোর প্রায় উনিশ শতক জমিতে তিন-দিনব্যাপী বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন।

নিকটবর্তী ইউনিয়ন সাওড়া, কুমুড়সা, বালী হইতে মেলায় প্রায় আড়াই শত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বালী-দেওয়ানগঞ্জ, শালেপুর, কামারপুকুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকান-পাট বসে এবং চার-পাঁচজন ফেরিওয়ালা আসেন। মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, কাপড়চোপড়, মাটির খেলনা-পুতুল এবং বড়মা, বালী, তেলীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর বেতের তৈয়ারী ধামা, চ্যাঙারী ইত্যাদির দোকানপাট আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়।

রথযাত্রা মেলা

বেঙ্গাই গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে শ্যামরায় ঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের মধ্যস্থলে বাড়ুজ্যে পাড়ায় প্রায় দশ শতক জমির উপরে ও জেলাবোর্ডের রাস্তার উভয় পার্শ্বে বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন।

মেলায় স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী কামারপুকুর, রঘুবাটী প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মোট প্রায় পাঁচ-ছয়শত হিন্দু-মুসলমান ও সাঁওতাল নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী প্রভৃতি দ্রব্যাদির পনের-কুড়িটি দোকানপাট বসে ও দুই-চারিজন ফেরিওয়ালা আসে। কামারপুকুর ও আনুড় হইতে প্রতি বৎসর বিক্রেতারা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য যাত্রাভিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়। স্থানীয় যুবক সম্প্রদায় যাত্রাভিনয় করেন।

নবাসন গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে স্বরূপনারায়ণ ধর্মঠাকুরের রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে গ্রামের "বড় গাবদা" নামক পুষ্করিনীর পাড়ে এবং গোঘাট ও বড়কাঁটাপুকুর নামে জেলা বোর্ডের রাস্তার সংযোগ স্থলে প্রায় তিন বিঘা জমি জুড়িয়া রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় গোঘাট, রঘুবাটী ও কামারপুকুর প্রভৃতি ইউ-নিয়ন হইতে প্রায় চার-পাঁচ শত নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ গোঘাট, কামারপুকুর, আকত-পুর প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই মেলায় আসেন। মোট প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে এবং তিন-চার জন ফেরিওয়ালা আসেন। তেলেভাজা, ময়রা, মনিহারী, মাটির খেলনা-পুতুল, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামাকুলো প্রভৃতি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা নাই।

প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে সীতানগর গ্রামে শিবতলায় রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রা দুই দিবসে বিকালের দিকে মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আড়াইশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় তিন-চারশত নরনারীর সমাগম হয় এবং কয়েকটি মাত্র তেলেভাজা ও খাবারের দোকান বসে।

শিবরাত্রির মেলা

শ্যামবাটী গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে রামেশ্বর শিবের শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে দেবোত্তর প্রায় চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি সাধারণতঃ তিনদিন স্থায়ী হয় এবং বিকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্যন্ত মেলায় বেচাকেনা চলে। মেলাটি প্রায় দেড়শত বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় প্রধানতঃ স্থানীয় এবং মথুরা, ধুলেপুর, শালেশ্বর, জয়কৃষ্ণপুর, বালী-দেওয়ানগঞ্জ, গৌরহাটি, ভিরোল, মইগ্রাম প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচ-সাত হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ বালী ও দিয়াড়া ইউনিয়ন হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই আসেন। মেলায় প্রায় পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে এবং দুইতিনজন ফেরিওয়ালাও আসেন। ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, লোহার বাসনপত্রের দোকান, তৈয়ারী জামা-কাপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, মাটির খেলনা ও পুতুলের দোকান বসে। লক্ষ্মীপুর ও মথুরা ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর বাঁশের তৈয়ারী ঝুড়ি ইত্যাদির দোকান আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য গ্রামের একটি যাত্রাদল অভিনয় করে।

জেলা : হুগলী
থানা : আরামবাগ

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : ডিহি বায়ড়া।

৪৪।৭৮৭।৩৪।২৭০।১,৪২২

(ক) ব্রাহ্মণ, সদগোপ, নাপিত, তেলি, কুমার, চাষী, ধোপা, বাগ্দী, দুলে, হাড়ি ইত্যাদি।

গ্রামে দশটি পাড়া আছে। যথা—বাগ্দীপাড়া, তেলিপাড়া, ঘোষপাড়া, ধোপাপাড়া, দুলেপাড়া, ব্রাহ্মণপাড়া, পানপাড়া, অগ্রদানীপাড়া, কুলীপাড়া, নাপিতপাড়া ইত্যাদি।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) পূর্ব রেলপথে তারকেশ্বর ও মার্টিন রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা রেলস্টেশন। ইউনিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণীস্নান উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) বারুণীর স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় পাঁচশত বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, দুইটি শিব এবং একটি স্বরূপনারায়ণ, একটি শ্যামনারায়ণ, একটি যাত্রাসিদ্ধি নামখ্যাত ধর্মরাজ আছে।

গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বিরাট দীঘি আছে। ইহা রণজিৎ রায়ের দীঘি নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর বারুণী ও মকরসংক্রান্তি উপলক্ষে বহুলোক এই দীঘিতে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন।

শ্রীগোপাল মুখোপাধ্যায়, চাকুরী,
সমাজ শিক্ষা সংগঠক,
আরামবাগ উন্নয়ন সংস্থা,
পোঃ আরামবাগ, হুগলী।

২। গ্রাম : মলয়পুর।

৬৯।২,০৩৮।৬১।৭৪১।৪,৮৯৭

(ক) হিন্দু ও মুসলমান।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, কায়েতপাড়া, বাগ্দীপাড়া, মুচিপাড়া, ডোমপাড়া, মুসলমানপাড়া প্রভৃতি নামে কয়েকটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) তারকেশ্বর রেলস্টেশন হইতে গ্রামটি প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। স্টেশন হইতে গ্রামে যাইবার পথে দামোদর নদী ও উহার শাখা নদী বেঁশের খাল পার হইয়া গ্রামে যাতায়াত করিতে হয়। বর্ষাকালে গ্রামে যাতায়াত করা খুবই কষ্টকর।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি তিথিতে ধুমধামের সহিত ক্ষুদিরায় নামে খ্যাত ধর্মরাজের বার্ষিক পূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে বুড়োশিবের গাজন ও চড়ক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন, গ্রামে কয়েকটি দুর্গাপূজা, শীতলাপূজা ও দোল উৎসব হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

চড়কের মেলা। চৈত্র মাসে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে বিশালাক্ষী দেবী প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যপূজা হয়।

মলয়পুর গ্রামটি প্রাচীন ও বর্ধিষ্ণু। গ্রামে অনেকগুলি প্রাচীন ভগ্ন মন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে সুন্দর পোড়ামাটির কাজ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীকানাই লাল দাস, শিক্ষক,
বাগাকা প্রাথমিক বিদ্যালয়,
হুগলী।

৩। গ্রাম : রসুলপুর।

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, উগ্রক্ষত্রিয়, বর্গক্ষত্রিয়, গোয়ালা ও মুসলমান। গ্রামে বারটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) তারকেশ্বর রেলস্টেশনে নামিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর বৈশাখ মাসে চব্বিশ প্রহরব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব, জ্যৈষ্ঠ মাসে দশহরা তিথিতে মনসাপূজা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। মহোৎসব উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

(ঙ) মনসাপূজার মেলা। জ্যৈষ্ঠ মাসে ছয়দিন-ব্যাপী। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মনসামন্দির ও তিনটি শিব আছে।

শ্রীআহাম্মদ হোসেন, প্রধান শিক্ষক,
শেখপুর জুনিয়ার হাইস্কুল (প্রাথমিক বিভাগ)
পোঃ রসুলপুর, হুগলী।

শ্রীসুধীর কুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড গ্রন্থ হইতে আরামবাগ থানার অন্তর্গত নিম্নোক্ত গ্রামগুলির বিবরণী উদ্ধৃত করা হইল :—

তিরোল (মৌজা নং ১৭)।

তিরোল আরামবাগ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামের কালীমাতা এই অঞ্চলে জাগ্রতা দেবী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১০৯০ সনে তিরোলের ত্রিলোচন বিদ্যাবাগীশ এই কালী প্রাপ্ত হন বলিয়া শুনা যায়। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মুক্তরাম চক্রবর্তী স্বপ্নে পাগলের অসুখ হইলে লোহার বালা হাতে পরাইয়া দিলে সারিয়া যাইবে বলিয়া একটি মন্ত্র পান। সেই সময় হইতে তিরোলের পাগলা রোগের বালা গ্রহণ করিবার জন্য সর্বধর্মাবলম্বী লোকের এই স্থানে সমাবেশ হয়।

[পৃঃ ১৫৪৯-১৩৫০]

গৌরহাটী (মৌজা নং ১১২)।

গৌরহাটি আরামবাগ থানার অন্তর্গত একটি প্রাচীন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। এই স্থানে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। আরামবাগ শহর হইতে এই গ্রামের দূরত্ব প্রায় নয় মাইল। প্রাচীনকালে গৌরহাটির তাঁতের কাপড় বাংলাদেশে প্রসিদ্ধ ছিল ; এখনও এই গ্রামে বহু তাঁতী বাস করে এবং তাঁতের কাপড় তৈয়ারী হয়।

গৌরহাটি হাটতলায় প্রতি বৎসর লক্ষ্মীপূজার পরদিন হইতে চারদিন যাবত খুব সমারোহের সহিত হরিসভা উপলক্ষে কীর্তন ও একটি মেলা হয়। সংকীর্তন ও মেলা উপলক্ষে চতুষ্পার্শ্বস্থিত গ্রাম হইতে এই স্থানে বহু লোক সমাগম হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে ও গৌরহাটি গ্রামের মেলার প্রসিদ্ধি আছে।

[পৃঃ ১৪৪৯]

ভবানীপুর (মৌজা নং ১৫১)।

গৌরহাটি ইউনিয়নের অধীন ভবানীপুর গ্রামে শাখামঙ্গল পীরের একটি মেলা হয়। গৌরহাটি মৌজায় অগ্নিকোণে ডিহিপুকুরে প্রতি বৎসর ১৪ই হইতে ১৬ই মাঘ পর্যন্ত এই তিনদিন পীরের মেলা উপলক্ষে আশেপাশের গ্রাম হইতে বহু মুসলমান পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য জমায়েত হয়।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ আরামবাগ

উৎসব বিবরণী

মনসাপূজা

রসুলপুর গ্রামে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথি হইতে দুইদিনব্যাপী ধুমধামের সহিত মনসাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে মনসাদেবীর পাকা মন্দিরে একটি কাষ্ঠ সিংহাসনের উপর একটি গোলাকৃতি প্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠিত আছে। উক্ত প্রস্তরখণ্ডের গাত্রে স্বর্ণনির্মিত দুইটি চক্ষু এবং উক্ত চক্ষুদ্বয়ের কিঞ্চিৎ উপরে স্বর্ণনির্মিত অর্ধচন্দ্র মুদ্রিত আছে। এই মূর্তিই গ্রামে জগতী মনসা নামে খ্যাত। মন্দির ও মূর্তি ব্যক্তি-বিশেষের।

উৎসব উপলক্ষে মনসা দেবীর যথারীতি মনসাপূজা এবং শতাধিক মানতের ছাগ ও মেষ বলি হয়। আশেপাশের বিভিন্ন গ্রাম হইতে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বহু নরনারী মনসা দেবীর নিকট পূজা দিতে আসেন। ভক্তদের বিশ্বাস জগতী মনসার নিকট মানত করিলে সর্প দংশনের ভয় থাকে না এবং চর্মরোগের আরাম হয়। মানত হিসাবে প্রধানতঃ ছাগ ও মেষবলি দেওয়া হয়। উৎসবটি প্রাচীন।

জ্যৈষ্ঠ মাসে উৎসব ব্যতীত মনসাদেবী নিত্যপূজা হয়। তবে প্রতি শনি-মঙ্গলবার পূজা দিবার জন্য লোক সমাগম বেশী হয়। সপ্তাহের এই দুইদিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যায় পূজা শেষ হয়। মুখোপাধ্যায় পদবীধারী জনৈক ব্রাহ্মণ দেবীর নিত্য পূজাদি করিয়া থাকেন।

জেলা : হুগলী
থানা : আরামবাগ

মেলা বিবরণী

বারুণীস্নানের মেলা

ডিহি বায়ড়া গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বারুণী তিথিতে বহু লোক রণজিৎ রায়ের দীঘিতে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন।

রণজিৎ রায় এই অঞ্চলের জমিদার বলিয়া পরিচিত এবং উল্লিখিত দীঘিটি তিনিই খনন করান। কিংবদন্তী আছে যে, দেবী মহামায়া একদা তাঁহার কন্যা পরিচয়ে জনৈক শাঁখারীর নিকট হইতে শাঁখা পরিয়াছিলেন এবং রণজিৎ রায়ের প্রত্যয়ের জন্য দেবী এই দীঘি হইতে শাঁখা সহ তাঁহার হস্ত তুলিয়া রায় মহাশয়কে দেখাইয়াছিলেন। সেই কারণে গ্রামবাসীগণ এই দীঘিটিকে পবিত্র জ্ঞান করেন এবং বারুণী ও অন্যান্য যোগে এই দীঘিতে পুণ্যস্নান করিয়া থাকেন।

প্রতি বৎসর বারুণী তিথিতে উক্ত দীঘির চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ত্রিশ বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। রণজিৎ রায় মহাশয়ই এই মেলার প্রবর্তন করেন এবং মেলার বিক্রেতাদের নিকট হইতে খাজনা বাবদ যাহা আদায় হয় তাহা দুর্গাপূজা ও গ্রামের অন্যান্য পূজাদিতে ব্যয় করা হইবে বলিয়া নির্দেশ দিয়া যান।

আরামবাগ, গোঘাট, পুরশুড়া, তারকেশ্বর, খানাকুল ঘাটাল প্রভৃতি থানা হইতে রিক্সা, গরুরগাড়ী, সাইকেল ও হাঁটিয়া প্রতি বৎসর প্রায় দশ হাজার নরনারী মেলায় আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ আরামবাগ, খানাকুল, কোতলপুর, গোঘাট, শেওড়াফুলি, তারকেশ্বর ও কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে ও বহু ফেরিওয়ালা আসেন। অধিকাংশ দোকানপত্র খোলা জায়গায় বসে।

সমগ্র দোকানপাটগুলির মধ্যে ময়রা, তেলেভাজা ও শিল্পসামগ্রীর দোকানের সংখ্যাই বেশী। ইহাভিন্ন, বাসনকোসন, মনিহারী, কাপড়চোপড়, বই-ছবি, ঔষধপত্র, কৃষি ও কারিগরি জিনিসপত্র, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও পুতুল, এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র আমদানী হইয়া থাকে। মাটির তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি প্রতি বৎসর ঘাটাল থানা হইতে আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, সার্কাস ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। গ্রামের একটি দলই যাত্রাভিনয় করেন। যাত্রাদলের অধিকারী গড়বাড়ী নিবাসী শ্রীকালীপদ রায়।

মনসাপূজার মেলা

রসুলপুর গ্রামে জগতী মনসার পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দশহরা তিথি হইতে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন এবং নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় এক হাজার নরনারী সমাবেশ হয়।

বাতানল, কেশবপুর, ছোট বৈনান, কামারহাটি প্রভৃতি অঞ্চল হইতে বিক্রেতাগণ প্রতি বৎসর মেলায় দোকানপাট দিয়া থাকেন। মেলায় প্রধানতঃ ময়রা, তেলেভাজা, বাদাম, মনিহারী ও খেলনার দোকানপাট বসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের কোন ব্যবস্থা নাই।

জেলা ঃ হুগলী
থানা ঃ খানাকুল

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম ঃ কিশোরপুর। ১।৪২৪'৫৪।২৪০।১,৫৭৫

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) বন্দিপুর হইতে কিশোরপুর রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে পাঁচ দিন। মেলাটি বহু প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, সাঁকরাইল, হুগলী।

২। গ্রাম ঃ বন্দীপুর। ৫।৪৬৯'৩৯।২৩১।১,৪০৮

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) ঠাকুরানীর চর হইতে নদীপথে নৌকায় গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে তিনদিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন। বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, সাঁকরাইল, হুগলী।

৩। গ্রাম ঃ ময়াল। ৭।১৪৬'৮৫।২২০।৭৪০

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রঘুনাথপুর ময়াল রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুর্নযাত্রার দিন সাড়ম্বরে জগন্নাথদেবের পূজা, হরিনাম সংকীর্তন ও রথটানা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ)

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, সাঁকরাইল, হুগলী।

৪। গ্রাম ঃ মহিষগোট। ১০।৬৪৯'৪৭।৩২০।১,৭০৫

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রঘুনাথপুরময়াল বাঁধ রাস্তা ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক পুর্ণিমা হইতে দুইদিন-ব্যাপী সাড়ম্বরে সর্বজনীন রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, সাঁকরাইল, হুগলী।

৫। গ্রাম ঃ মাযুয়া। ১১।৩৫৪'৭৭।১৮৯।১,১৩১

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পিলখাঁ-রঘুনাথপুর রোড দিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে পুর্ণিমার দিন লক্ষী-নারায়ণজীউর দোল উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, শাঁকরাইল, হুগলী।

৬। গ্রাম : পীলখাঁন। ১৩।৯৪৮'২৮,৩৩০।১,৬৯৯

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পিলখাঁ রোড ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে তিনদিনব্যাপী শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) শিবরাত্রির মেলা। ফাল্গুন মাসে তিনদিন। মাত্র দশ বৎসর হইল মেলাটি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, শাঁকরাইল, হুগলী।

৭। গ্রাম : ঘোষপুর। ১৪।৩,২৮১'৯০।১,১১৯।৬,১৭১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) "বন্দর রোড" নামে একটি রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন।

(ঙ) সরস্বতী পূজার মেলা। মাঘ মাসে একদিন। মেলাটি প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, শাঁকরাইল, হুগলী।

৮। গ্রাম : রঘুনাথপুর। ৩৫।২২৮'১৩।৫৭।৩১৫

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) পিলখাঁন রঘুনাথপুর রোড ধরিয়া গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ফাল্গুন সংক্রান্তি হইতে দুইদিন-ব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র গত দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। ফাল্গুন মাসে দুইদিন। মেলাটি মাত্র দশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, শাঁকরাইল, হুগলী।

৯। গ্রাম : কৃষ্ণনগর। ৩৭।৭৭৫'৮৭।২৩০।১,৩৮৯

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) সামন্ত রোড ধরিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, কার্তিক মাসে রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত উৎসবগুলি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

রাসযাত্রার মেলা। কার্তিক মাসে দুইদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপীনাথজীউর একটি মন্দির আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, শাঁকরাইল, হুগলী।

১০। গ্রাম : খানাকুল। ৪৫।২৬৭·০১।২৪০।১,৩৬১

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য, চাকুরী ও ব্যবসায়।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন তারকেশ্বর সামন্ত রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ভীম একাদশী তিথিতে এবং ফাল্গুন মাসের শিবরাত্রি তিথিতে শিবপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। ভীম একাদশী তিথিতে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন

(চ) গ্রামে ঘণ্টেশ্বর শিবের মন্দির আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, সাঁকরাইল, হুগলী।

খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রাম সম্পর্কে শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্র "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ," ৩য় খণ্ড গ্রন্থে যে বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন নিম্নে উহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা হইল :—

খানাকুল কৃষ্ণনগর হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত একটি প্রাচীন স্থান; বহু ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ ও ন্যায়-স্মৃতি-তন্ত্রের পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া ইহা বঙ্গের প্রাচীনতম পল্লীগুলির মধ্যে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। এই স্থানের ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বহুমুখী প্রতিভার জন্য বঙ্গদেশে বিশেষভাবে পরিচিত। যাদবেন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার পৌত্র বংশীধর চৌধুরী সপ্তদশ শতাব্দীতে পণ্ডিত নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে নারাণ ঠাকুরের সহায়তায় এই অঞ্চলের তিনশত গ্রাম লইয়া খানাকুল কৃষ্ণনগরের সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা সেই সময় সমগ্র বাংলায় একটি আদর্শস্থান বলিয়া গণ্য হইত। ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে এতবড় শক্তিশালী সমাজ পূর্বে আর কোথাও ছিল না। বংশীধর চৌধুরী খানাকুল কৃষ্ণনগর সমাজ স্থাপন করিবার জন্য বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ কুলীন ও পণ্ডিত আনাইয়া এই স্থানে বসবাস করান। একমাত্র নবদ্বীপ ছাড়া এত পণ্ডিত ব্যক্তির বাস বাংলায় আর কোন জেলায় ছিল না বলিয়া খানাকুলকে তৎকালে দ্বিতীয় নবদ্বীপ বলা হইত।

খানাকুল উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে অভিরাম গোস্বামী ১৩১৬ শকে এই স্থানে আবির্ভূত হন। সুতরাং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পূর্বে তিনি এই দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন। মহাপ্রভুর পূর্বে বৈষ্ণবগণ সহজিয়া ভাবের ছিল, পরে ঐ পন্থের বৈষ্ণবগণ চৈতন্য ধর্মে মিশিয়া যান।

অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ-জীউ ও তাঁহার বিরাট মন্দির একটি দর্শনীয় জিনিস। এইরূপ সুবৃহৎ মন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই আছে। শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর বিগ্রহ একখানি কষ্টি পাথরের উপর খোদিত। অভিরাম সর্বপ্রথম একখানি খড়ের ঘরে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমান মন্দির ১২১৯ সনে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের দক্ষিণে পুরাতন নবরত্ন মন্দির বিরাজিত। ইহা ১১৮১ সনে নসীরাম নির্মাণ করিয়া দেন। নাটমন্দির হুগলী ও মেদিনীপুর জেলার 'ধীবরমণ্ডলী' ১২৬৩ সনে নির্মাণ করিয়া দেন। পরে উহা ভগ্ন হইলে উক্ত ধীবরগণের বংশধরগণ ১৩২০ সনে উহা পুনরায় সংস্কার করিয়া দেন।

শ্রীশ্রীগোপীনাথজীউর শ্রীমূর্তি একখানি কষ্টি প্রস্তরের উপর খোদিত। প্রস্তরখানিতে বস্ত্রহরণ-লীলার চিত্রও উৎকীর্ণ—নিম্নে যমুনা প্রবাহিতা, উচ্চে পর্বতে ধেনু চরিতেছে, কদম্ববৃক্ষোপরি শ্রীগোপীনাথ বংশীধ্বনী করিতেছেন, গোপীগণ চতুর্দ্দিকে বস্ত্র ভিক্ষা করিতেছেন।

মন্দিরের মধ্যে গোপীনাথের বিগ্রহ ছাড়া বলরাম, মদনমোহন, গোপাল ও অভিরাম ঠাকুরের মূর্তি আছে। এইরূপ সুরম্য মন্দির ও মন্দিরগাত্রে ইটের কারুকার্যখোচিত অসংখ্য দেবমূর্তি দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ প্রশস্ত নাট

মন্দির খুব কম আছে। অভিরামে শিষ্যের বংশধরগণ অদ্যাপি পূজা ভোগরাগ ও উৎসবাদি যথাবিধি নির্বাহ করিতেছেন। গোপীনাথের রাসমঞ্চ দেখিতে খুব সুন্দর। রাসের সময় বিগ্রহ এই স্থানে আনা হয় এবং রাসের মেলায় দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

খানাকুলের ঘণ্টেশ্বর শিবের খ্যাতি বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। কানা দ্বারকেশ্বর বা কানা নদীর ধারে এই বিরাট মন্দির আজও দণ্ডায়মান আছে। স্থাপত্যশিল্পে এই মন্দির একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। এই স্থানে শ্মশান অবস্থিত।

ঘণ্টেশ্বরদেব অনাদি স্বয়ম্ভু এই বিরাট শিবলিঙ্গ কাহারও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়। কোন স্মরণাতীত কাল হইতে যে ইহার মহিমা প্রকটিত হইয়া আসিতেছে, তাহা বলা যায় না। প্রাচীন কীর্তিমালায় সুশোভিত এই স্থানে শ্মশানকালী, বিশালাক্ষী, অন্নপূর্ণা, ষষ্ঠী ঠাকুরাণী, ধর্মঠাকুর, ক্ষুদিরাম ও গৌর-নিতাই বিরাজমান থাকায় ইহা এমনি রমণীয় যে, সেইজন্য ইহাকে 'গুপ্তকাশী' বলা হইত।

শ্রীমদ বটুক বাবাজীর নির্দেশেই ঘণ্টেশ্বরের বিরাট মন্দির উবিদপুরের মটুক কারক নির্মাণ করিতে আরম্ভ করেন কিন্তু অর্ধ-নির্মিত অবস্থায় তিনি পরলোকগমন করিলে কানাই লাল দে মন্দিরের নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। মন্দিরে ঘণ্টেশ্বরের মূর্তি ছাড়া কালভৈরবের মূর্তি আছে। কিংবদন্তী আছে প্রায় সাড়ে পাঁচ শত বৎসর পূর্বে ঘণ্টেশ্বর-দেবের সেবায়েত স্বপ্নাদেশে মাঘ মাসের এক অকাল বন্যায় কালভৈরবের মূর্তি প্রাপ্ত হন এবং উহাকে ঘণ্টেশ্বরের পাশে স্থাপন করিতে আদিষ্ট হন। তদবধি মাঘ মাসের দশমীর পরদিন ভৈমী একাদশীতে ও শিবরাত্রি উপলক্ষে এই স্থানে দুইটি বৃহৎ মেলা হয়।

মন্দিরের পুরোভাগে বিশাল নাট মন্দির ও নহবতখানা এবং বামদিকে অন্যান্য দেবালয়গুলি স্থানটিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করিয়াছে। মন্দিরের উত্তর ও পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া রত্নাকর বলয়াকারে প্রবাহিত হয়। এই স্থানে বহু সাধক সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। স্বামী ভৈরবচন্দ্র ও তাঁহার স্ত্রী যমুনা দেবী সর্ব প্রথম ঘণ্টেশ্বর দেবের সেবার ভার গ্রহণ করিবার জন্য প্রত্যাদিষ্ট হন। পরে দশরথ বটব্যাল সেবার ভার পান। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি এই সেবাকার্যে ব্রতী আছেন। দেবতার কোন ভূসম্পত্তি নাই। সাধারণের দানে দেবপূজা নির্বাহ হয়। দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য ঘণ্টেশ্বরদেবের স্বপ্নাদ্য ঔষধ সেবায়েতগণ দিয়া থাকেন।

খানাকুল-কৃষ্ণনগরের মেলা ও উৎসব

খানাকুল থানার কৃষ্ণনগর গ্রামে অভিরাম গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত 'গোপীনাথ মন্দির' ও যাদবেন্দু সিংহরায় প্রতিষ্ঠিত 'রাধাবল্লভের মন্দির'—প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। এই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতি বৎসর সমারোহ সহকারে রাসপূর্ণিমা, দোলপূর্ণিমা, স্নানযাত্রা, রথযাত্রা ও জন্মাষ্টমীর মেলা হয়। রাসযাত্রার মেলায় তিনদিন যাবত যাত্রাভিনয় হয় এবং এই মেলায় যে 'অন্নকূট' হয় তাহা সুপ্রসিদ্ধ। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা সপ্তমীতে শ্রীমদ্‌ অভিরাম গোস্বামী প্রচলিত 'মহোৎসব' উপলক্ষে বিরাট মেলা হয় এবং গোপীনাথের নাট মন্দিরে তিনদিনব্যাপী কীর্তন গান হয়। এই উৎসবের শেষ দিনে দরিদ্রনারায়ণ-সেবা ও নগর-সংকীর্তন হয়। যাত্রীগণের জন্য এখানে যাত্রীনিবাস আছে। মন্দিরে প্রবেশের বাম দিকে একটি বহু প্রাচীন সিদ্ধ বকুল গাছ উচ্চ বেদীর উপর আছে।

("হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড, শ্রীসুধীর কুমার মিত্র, পৃঃ ১৩৭৯-১৪০৮।)

১১। গ্রাম : কুমারহাটা। ৫০।৩৪৯'৮৪।১৭৪।৭১৩

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, কুমার, হাড়ি, বাগদী, ডোম, দুলে ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও জাতিব্যবসায়।

(গ) গ্রামের মধ্য দিয়া 'রাজা রামমোহন রোড' ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া রূপনারায়ণ-নদীর তীরে 'গড়ের ঘাটে' গিয়া মিশিয়াছে। এই স্থান হইতে নদীপথে দক্ষিণ দিকে তের মাইল অগ্রসর হইলে দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কোলাঘাট রেলস্টেশন।

(ঘ) বৈশাখ মাসের শেষার্ধে শীতলাপূজা ও ভগবতীপূজা এবং চৈত্র মাসে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

(ঙ) ভগবতীপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় দুইশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি প্রাচীন শিবমন্দির, একটি শীতলামন্দির এবং গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে ভগবতীমন্দির ও মধ্যস্থলে একটি দুর্গামণ্ডপ আছে।

শ্রীনৃপতি সরকার,
গ্রামঃ কুমারহাট,
পোঃ রাজাহাটী বন্দর, হুগলী।

১২। গ্রাম : নন্দনপুর। ৬২।১,৫৩৫'১০।৮৩৫।৪,৫৮৩

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) খানাকুল-গড়ের ঘাট রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা হইতে নয়দিনব্যাপী ধর্মরাজপূজা ও তদুপলক্ষে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। মাঘ মাসে নয়দিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে ধর্মরাজ ও শীতলার মন্দির আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল, সাঁকরাইল, হুগলী।

১৩। গ্রামঃ শ্যামমাঝি বন্দর।
(মৌজা : মাড়খানা)
৬৬।৬১২'১৮।৫০৯।২,৭৪১

(ক) ব্রাহ্মণ. মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয়, রাজবংশী, মালাকার, কুমার, নাপিত, তেলি, কেওড়া, মুচি ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের কোলাঘাট স্টেশন হইতে নদীপথে মোটরলঞ্চ অথবা নৌকাযোগে গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) চৈত্র মাসে বারুণী তিথিতে গঙ্গাপূজা ও বারুণী স্নান।

(ঙ) বারুণী স্নানের মেলা। চৈত্র মাসে একদিন। মেলাটি একশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গঙ্গাদেবীর মন্দির আছে। মন্দিরটি পাকা তবে উপরে টিনের চালযুক্ত। গ্রাম সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, 'শ্যামমাঝি-বন্দরপাড়া' মৌজা মাডোখানার অংশ বিশেষ। রূপনারায়ণ নদের তীরবর্তী এই স্থানটি প্রাচীনকাল হইতেই ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল। এই গ্রামে শ্যাম চরণ মাঝি নামে জনৈক ধর্মপ্রাণ ব্যবসায়ী বাস করিতেন। তাঁহার নামানুসারেই গ্রামের নামকরণ হইয়াছে।

শ্রীরজনী কান্ত পাল,
গ্রামঃ শ্যামমাঝি-বন্দরপাড়া,
পোঃ মাড়াখানা, হুগলী।

১৪। গ্রাম : চক্রপুর। ৮৪।৪০০'৪২।১৯৬।৮৬০

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) জগৎপুর-ধরমপোতা রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) কার্তিক মাসে দুইদিনব্যাপী কালীপূজা। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) কালীপূজার মেলা কার্তিক মাসে দুইদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি কালীমন্দির আছে।

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল,
সাঁকরাইল, হুগলী।

১৫। গ্রাম: রাউতখানা।

৮৭।১,১৭০ ২৬।৩৪২।১,৭৫৬

(ক) হিন্দু। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) রাউতখানা-নতিবপুর রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) শিবপূজা (বুড়াশিব নামে খ্যাত)। প্রতি-বৎসর ২রা বৈশাখ উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সম্প্রতিকালের।

(ঙ) শিবপূজার মেলা। বৈশাখ মাসে দুইদিন। মেলাটি সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল,
সাঁকরাইল, হুগলী।

১৬। গ্রাম: গৌরাঙ্গপুর।

১০০।২১৫·৯৬।৫৬।৩২৬

(ক) হিন্দু। গ্রামে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) সামন্ত রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে দুইদিন। বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল,
সাঁকরাইল, হুগলী।

১৭। গ্রাম: আটঘরা।

১০৩।১৮০·৩০।১০৩।৬৫৭

(ক) হিন্দু। গ্রামে তিনটি পাড়া আছে

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) সামন্ত রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি মাত্র গত আট-দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(ঙ) রাসযাত্রা মেলা। কার্তিক মাসে একদিন। মেলাটি গত আট-দশ বৎসর হইল আরম্ভ হইয়াছে।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, চাকুরী,
পোঃ সার্কেল,
সাঁকরাইল, হুগলী।

১৮। গ্রাম: বালীপুর।

১১৩৩।৮৩·৫৬।৭৯৪।৩,১৩৪

(ক) মাহিষ্য, তিলি, তাঁতি, কেওরা, দুলে ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন চাঁপাডাঙ্গা। ইউ-নিয়ন বোর্ডের কাঁচা রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে। পুরশুড়া হইতে বালীপুর পর্যন্ত মোটর চলা-চলের ব্যবস্থা আছে। রাকসা ও কোলাঘাট পর্যন্ত নদীপথে নৌকা চলে।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ মকর স্নান ও তদুপলক্ষে তিনদিনব্যাপী গঙ্গাপূজা হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন। ইহাভিন্ন, প্রতি বৎসর ২৪শে চৈত্র হইতে ৩০শে চৈত্র (সংক্রান্তি তিথি) পর্যন্ত সাড়ম্বরে শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন এবং উৎসব উপলক্ষে ভক্তেরা সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন।

(ঙ) মকরস্নান ও গঙ্গাপূজার মেলা। মাঘ মাসে তিনদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শীতলা ও একটি মনসা আছে।

শ্রীহৃষিকেশ পোড়ে, বালীপুর,
ও
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, হুগলী।

১৯। গ্রাম: নতিবপুর।

১৩৮।৭৬৭.৯১।৫৯৮।৩,১৯১

(ক) ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, মাহিষ্য, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, কামার, রুইদাস, নাপিত, ডোম, তাঁতি, তিলি, দুলে ও মুসলমান।

(খ) কৃষিকার্য ও ব্যবসায়।

(গ) খানাকুল হইতে একটি মেটে রাস্তা দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা এবং প্রতি বৎসর ৩০শে মাঘ হইতে ২রা ফাল্গুন পর্যন্ত বড়খান পীরের উরস্ অনুষ্ঠিত হয়। দুর্গাপূজাটি মাত্র দশ-বারো বৎসরের এবং পীরের উরস্‌টি বহুকালের প্রাচীন।

ইহাভিন্ন গ্রামের হরিসভায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসের একাদশী তিথি হইতে দোলপূর্ণিমা তিথি পর্যন্ত মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি সত্তর-আশী বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) পীরের উরস্-এর মেলা। মাঘ-ফাল্গুনে তিন-দিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

দুর্গাপূজার মেলা। আশ্বিন মাসে।

হরিসভার মেলা। ফাল্গুন মাসে ৪ দিন। প্রায় সত্তর-আশী বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি শিব, তিনটি পঞ্চানন, চারটি শীতলা, একটি ধর্মরাজ, পাঁচ-ছয়টি মনসা এবং পীরের স্থান আছে।

শ্রীআবদুল কাদের শা, নতিবপুর,
ও
শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, হুগলী।

নতিবপুর ইউনিয়নের ভৈরবপুরে ভৈরবীমাতা একটি উঁচু স্তূপের উপর আকাশতলে বিরাজ করিতেছেন। দেবীর মন্দির করিলে কুপিত হন বলিয়া কোন মন্দির হয় নাই। পূজা ও উৎসবের কোন নির্দিষ্ট দিন নাই। দেবীর প্রত্যাদেশ হইলে পূজা হয়।

("হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ," ৩য় খণ্ড, শ্রীযুক্ত সুধীর কুমার মিত্র।)

২০। গ্রাম: ঠাকুরানীচক্।

(ক) হিন্দু। গ্রামে সাতটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) খানাকুল হইতে মাইনান-ঠাকুরানীচক রোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে দুইদিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহুকালের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। মাঘমাসে দুইদিন। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, হুগলী।

২১। গ্রাম: সুন্দরপুর।

(ক) হিন্দু ও মুসলমান। গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) নিকটবর্তী রেলস্টেশন রাজহাটী। পান-শিউলীরোড দিয়া গ্রামে যাতায়াত চলে।

(ঘ) জগদীশ উৎসব। ২৯শে পৌষ হইতে ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী উৎসব। উৎসবটি বহুদিনের প্রাচীন।

(ঙ) জগদীশের মেলা। পৌষ মাসে পাঁচদিন। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

(চ) ×

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র কুমার, হুগলী।

শ্রীযুত সুধীর কুমার মিত্রের "হুগলী জেলার ইতিহাস ও বঙ্গসমাজ" ৩য় খণ্ড গ্রন্থ হইতে নিম্নোক্ত গ্রামগুলির বিবরণী উদ্ধৃত করা হইল :—

পাতুল (মৌজা নং ২৬)।

খানাকুল থানার অন্তর্গত পোল ইউনিয়নের মধ্যে পাতুল একটি বহু পুরাতন গ্রাম। পাতুলের মানিকেশ্বর শিব বহু প্রাচীন ও জাগ্রত দেবতা বলিয়া খ্যাত। এই শিবের কাছে হত্যা দিলে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে মুক্তি পাওয়া যায় বলিয়া এই মন্দিরে দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রী সমাগম হয়। শিবতলায় চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রতি বৎসর খুব ধুমধামের সহিত গাজন উৎসব হয়।

পাতুল শিবতলায় বহু প্রাচীনকাল হইতে বারোয়ারী কালীপূজার অনুষ্ঠান হয়। এই পূজা রাধানগরের সুবিখ্যাত তান্ত্রিক আগমবাগীশ বংশের ব্যক্তি ব্যতীত আর কেহ করিতে সাহস করেন না। পাতুলে বৈশাখী পূর্ণিমায় প্রতি বৎসর চারপাঁচ দিনব্যাপী মহাসমারোহের সহিত হরিনাম সংকীর্তন হয়। এই হরিসভা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন।

[পৃঃ ১৪২৪-১৪২৫]

রাজহাটী (মৌজা নং ৮২)।

রাজহাটী হাটতলায় বিশালাক্ষী দেবীর মন্দির আছে। এই গ্রামে বক্রেশ্বর শিব আছেন। গাজনের সময় এইখানে একটি মেলা হয়।

কোটরা।

খানাকুল থানার নিকট কোটরা গ্রামে শ্রীমদ্ অভিরাম গোস্বামীর অন্যতম শিষ্য শ্রীঅচ্যুত পণ্ডিতের শ্রীপাঠ আছে। সানেশ্বর শিবমন্দির এই গ্রামে উল্লেখযোগ্য দেবালয়।

জজুড় গ্রাম।

জজুড়গ্রাম গ্রামে ১লা বৈশাখ ভগবতীমাতার মেলা হয়। ভগবতীমাতার পুকুরে রবিবার স্নান করিলে খোস-চুলকানি প্রভৃতি সারিয়া যায় বলিয়া প্রতি রবিবার পুকুরে স্নানের জন্য বহু যাত্রীর সমাগম হয়।

জেলা : হুগলী
থানা : খানাকুল

মেলা বিবরণী

আবির্ভাব ও তিরোভাবের মেলা
(বড়খান পীর)

নতীবপুর গ্রামে বড়খান পীরের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে পীরোত্তর প্রায় দুই বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ৩০শে মাঘ হইতে ২রা ফাল্গুন পর্যন্ত একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন। নতীবপুর, সাবল সিংহপুর, চিংড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় পাঁচ-ছয় শত নর-নারীর সমাগম হয়।

এই মেলাতে খাবার, মনিহারী, ও কয়েকটি মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান এবং চা-পান-বিড়ির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণের নিকট তোলা আদায় করা হয় না।

কালীপুজার মেলা

চক্রপুর গ্রামে প্রতিবৎসর কার্তিক মাসে কালীপূজা উপলক্ষে কালীমন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। খানাকুল, আটঘরা, চিংড়া, জগৎপুর, নতীবপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় মোট প্রায় দুই সহস্র নরনারীর সমাবেশ হয়।

মেলায় খাবার, মনিহারী এবং কুম্ভকারদের তৈয়ারী মাটির জিনিসপত্র আমদানী হয়। দশ-বারো জন ফেরিওয়ালা নানাপ্রকার জিনিসপত্র বিক্রয় করে। বিক্রেতাগণ আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন। তাঁহাদের নিকট হইতে দান আদায় করা হয়।

জগদীশ্বরপুজার মেলা

সুন্দরপুর গ্রামে জগদীশতলায় প্রায় চার বিঘা জমির উপর জগদীশ্বরের পূজা উপলক্ষে প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তি হইতে পাঁচদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। প্রধানতঃ সবলসিংপুর, রাজহাটী, জগৎপুর, নতীবপুর, খানাকুল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় এক হাজার নর-নারী মেলায় আসেন।

ইহাতে খাবার, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও বেতের ধামাকুলা প্রভৃতি আমদানী হয়। বিক্রেতাদিগের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

কিশোরপুর গ্রামে ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী একটি ছোট মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন। নিকটবর্তী ঘোষপুর, পোলবা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে আনুমানিক এক হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলাটিতে কয়েকটি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান ও কয়েকটি মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকানপাট বসে।

ঘাসুয়া গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। অবশ্য মেলাটি মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। নিকটবর্তী কিশোরপুর, ঘোষপুর, পোলবা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচ শত যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রধানতঃ বিভিন্ন প্রকার খাবার ও মনিহারী দ্রব্যের আমদানী হয় এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে দোল উৎসব উপলক্ষে গোপীনাথজীউর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। খানাকুল, আটঘড়া, চিংড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় পাঁচশত যাত্রী আসিয়া থাকেন।

মেলাতে খাবার, মনিহারী এবং মাটির হাঁড়িকলসী ও পুতুলের দোকান বসে। ফেরিওয়ালাও দুই-তিনজন

আসিয়া থাকেন। বিক্রেতাগণ আশেপাশের গ্রাম হইতেই প্রতি বৎসর আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান আদায় করা হয়।

দুর্গাপূজার মেলা

নতীবপুর গ্রামে বারোয়ারীতলায় প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা উপলক্ষে দশদিন-ব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র দশ বৎসর যাবত বসিতেছে এবং ইহাতে জগৎপুর, চিংড়া, আটঘরা প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় দেড় সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবার, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, চা-পান-বিড়ি প্রভৃতি কুড়ি-পঁচিশটি দোকানপাট বসে। ইহাভিন্ন আট-দশজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা স্থানীয়, তাঁহাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য পুতুলনাচ, নাগরদোলা, ম্যাজিক এবং যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে।

বারুণীস্নানের মেলা

শ্যামমাঝি বন্দর গ্রামে প্রতি বৎসর মধুকৃষ্ণা একাদশী তিথিতে গঙ্গাপূজা, বারুণী স্নান উপলক্ষে গঙ্গা মাতার মন্দির সংলগ্ন স্থানীয় 'পল্লী উন্নয়ন' সমিতির প্রায় দশ-বার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। ইহা প্রায় একশত বৎসরের প্রাচীন মেলা। ধলভাঙ্গা, চাঁদকুণ্ড, জগৎপুর, নন্দনপুর, রাণীচক, কুমারহাট, ক্ষেপুত, ফৈজুর, বেসাই, গোপীগঞ্জ, শিবগেছে প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর প্রায় চার-পাঁচ হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং ফেরিওয়ালার সংখ্যাও প্রায় পঁচিশ-ত্রিশজন। ইহার মধ্যে মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল, মনিহারী এবং তেলেভাজা ও খাবারের দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাভিন্ন বই-ছবি, গামছা, লোহার হাতা-খুন্তি, কোদাল-কাস্তে ও কাটারী ইত্যাদির দোকানও অনেকগুলি বসে; এই সকল দোকানপাটগুলি বন্দর, গোপীগঞ্জ, বড়াল, রানীচক, কোলাঘাট, মনসাভাঙ্গা, কুলটিকরা, বেসাই প্রভৃতি অঞ্চল হইতে আসে। ধামা-কুলো, চ্যাঙ্গারী, প্রভৃতি জিনিসপত্রের দোকানগুলি অধিকাংশ মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা হইতে প্রতি বৎসর আসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে যাত্রাভিনয়, জলসা, পুতুলনাচ ও কীর্তনাদির ব্যবস্থা করা হয়।

ভগবতীপূজার মেলা

কুমারহাট গ্রামে ভগবতীদেবীর পূজা ও উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ কেবলমাত্র একদিনের জন্য দেবীর মন্দিরের সন্নিকটবর্তী প্রায় ছয় একর জমির উপর একটি বৃহৎ মেলা বসে। মেলার জমির সত্বাধিকারী বর্ধমান রাজ ষ্টেট ও ৺আদিত্য চরণ বসু মহাশয়ের বংশধরগণ। মেলা হইতে স্থানীয় রাজা রামমোহন রায় বিদ্যামন্দিরের কার্যকরী কমিটি দান-তোলা আদায় করিয়া থাকেন। ইহা আরামবাগ মহকুমার বৃহত্তম মেলা বলিয়া খ্যাত। প্রায় দুই শতাধিক বৎসরের এই প্রাচীন মেলাটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতালাভে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিচালিত হইতেছে। খানাকুল, পুড়শুড়া, আরামবাগ প্রভৃতি হুগলী জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন, মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলা হইতে মেলায় প্রায় দশ সহস্র নরনারীর সমাগম হয়। স্থানীয় সেচ্ছাসেবকদল প্রতি বৎসর যাত্রীদের জন্য পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করিয়া থাকেন।

মেলায় আড়াইশত দোকানপাট বসে। প্রায় কুড়ি-জন ফেরিওয়ালা আসে।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুল, তামা-পিত্তল, লোহা ও কাঁচের বাসনপত্র, কৃষি ও কারিগরী সংক্রান্ত জিনিসপত্র, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রী, মাদুর, কাপড়-গামছা, জুতা, বই-ছবি, হাকিমী ও কবিরাজী ঔষধপত্র প্রভৃতি আমদানী হয়। বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রগুলি আশে-পাশের গ্রাম হইতে এবং মেদিনীপুরের সবং থানা হইতে মাদুর বিক্রেতারা আসে।

আমোদ-প্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিক, নাগরদোলা

ও যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। মেলায় জুয়া ও লটারী খেলার প্রচলন আছে।

মেলায় প্রায় পঞ্চাশটি দোকানপাট বসে এবং কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। দোকানপাটের মধ্যে তেলেভাজা ও খাবার এবং মনিহারী দোকানের সংখ্যাই অধিক। ইহাছাড়া কাপড়ের দোকান, কারিগরী যন্ত্রপাতির দোকান, জুতার দোকান, মাটির তৈয়ারী হাঁড়ি-কলসী ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য দুইদিন যাত্রাভিনয়, দুইদিন কবিগান, দুইদিন হরিনাম সংকীর্তন হয়।

মকরস্নানের মেলা

প্রতি বৎসর মকর সংক্রান্তি যোগে স্নান ও গঙ্গাপূজা উপলক্ষে ১লা মাঘ হইতে তিনদিনব্যাপী বালীপুর গ্রামের পশ্চিম সীমান্তে নদীর তীরে ব্যক্তি-বিশেষের প্রায় চার বিঘা জমির উপর একটি মেলা বসে। মেলাটি বাংলা ১৩৪৫ সন হইতে আরম্ভ হয়। এই গ্রামের উত্তরে তারকেশ্বর, দক্ষিণে বাকসী কোনাঘাট, পূর্বে রাজবন হাট এবং পশ্চিমে রাধাবল্লভপুর প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্য হইতে মোট প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সমাগম হয়।

মহোৎসবের মেলা

নতিবপুর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হরিসভায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মহোৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় কুড়িশতক জমির উপর চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় আশী বৎসরের প্রাচীন। নতিবপুর, সাবলসিংহপুর, চিংড়া, প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় দুই সহস্র নর-নারীর সমাগম হয়। মেলায় খাবার, মনিহারীর দোকানপাটই বেশী আসে। ইহাভিন্ন, কাপড়চোপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান ও ঔষধপত্র ইত্যাদির দোকান কয়েকটি বসে। বিক্রেতারা উপরোক্ত গ্রামাঞ্চল হইতে প্রতি বৎসর আসেন।

বিক্রেতাগণ প্রায় সকলেই স্থানীয়। মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসী, পুতুলের দোকান বসে। এছাড়া কয়েকটি ধামা-কুলা ইত্যাদির দোকান বসে। ফেরিওয়ালার সংখ্যাও প্রায় দশ-বারো জন। মেলায় তোলা আদায় করা হয়।

বন্দিপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় চার বিঘা জমির উপর তিনদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। নিকটবর্তী ঠাকুরানীরচক্, ঘোষপুর, কিশোরপুর, পোল প্রভৃতি স্থান হইতে প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলাতে কয়েকটি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসী ও পুতুলের দোকান ও কয়েকটি ধামা-কুলার দোকান বসে।

রঘুনাথপুর গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে মহোৎসব উপলক্ষে এক বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি গত দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। ঘোষপুর, পোল, কিশোরপুর, খানাকুল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় চারশত দর্শকের সমাগম হয়।

মেলায় মনিহারী ও বিভিন্ন রকম খাবারের দোকান বসে এবং দুই-চারিজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণ স্থানীয়। তাঁহাদের নিকট হইতে দান আদায় করা হয়।

ঠাকুরানীরচক্ গ্রামে মহোৎসব উপলক্ষে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর ১লা মাঘ হইতে দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। জগৎপুর, ঘোষপুর, পোল, কিশোরপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় দুই-তিন হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান ও মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুলের দোকান এবং বেতের ও বাঁশের তৈয়ারী ধামা-কুলা প্রভৃতির কয়েকটি দোকান দেখা যায়। ইহাভিন্ন দশ-বারোজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতারা প্রধানতঃ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে আসিয়া থাকেন। মেলায় তোলা আদায় করা হয়।

রথযাত্রায় মেলা

ময়াল গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথ উপলক্ষে রথতলায় প্রায় চার বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন এবং কিশোরপুর, ঘোষপুর, পোল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচ শত যাত্রী আসেন।

মেলায় কয়েকটি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, আর মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান বসে। ফেরিওয়ালাও দুই একজন আসেন। মেলায় বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

কৃষ্ণনগর গ্রামে আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে গোপীনাথজীউর মন্দিরের সম্মুখে পাঁচ বিঘা পরিমিত জমিতে প্রতি বৎসর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি অবশ্য প্রতি দিন বিকালের দিকেই বসে। বহু দিনের মেলা; খানাকুল, আটঘড়া, চিংড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রীরা আসিয়া থাকেন।

মেলায় খাবারের দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান ও মনিহারী দোকানই দেখিতে পাওয়া যায়। ফেরিওয়ালাও দুই-তিনজন আসেন। বিক্রেতাগণ আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর আসেন। মেলায় বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

নন্দনপুর গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে রথযাত্রা উপলক্ষে রথতলায় দীর্ঘ নয়দিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। জগৎপুর, রাজহাটী, খানাকুল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় দেড় সহস্রাধিক নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুলের দোকান, এবং বেত ও বাঁশের ধামাকুলা ইত্যাদির দোকান বসে। চার-পাঁচজন আসেন ফেরিওয়ালা। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রাম হইতে আসেন, তাঁহাদের নিকট দান ও তোলা আদায় করা হয়।

গৌরাজপুর গ্রামে রথতলায় প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। প্রতিদিন বিকালের দিকে বসে। গ্রামের নিকটবর্তী আটঘড়া, চিংড়া, খানাকুল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত নরনারীর সমাবেশ হয়।

মেলায় কয়েকটি খাবারের দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুলের দোকান ও মনিহারী দোকান আসে। এই সকল বিক্রেতারা উপরোক্ত ইউনিয়ন হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকে। মেলায় তোলা আদায় করা হয়।

রাসযাত্রার মেলা

মহিষগোট গ্রামে কার্তিক পূর্ণিমায় রাস উৎসব উপলক্ষে প্রায় তিন বিঘা জমির উপর দুইদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রাচীন। কিশোরপুর, ঘোষপুর, পোল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় পাঁচশত যাত্রী আসেন।

মেলায় কয়েকটি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান বসে। দুই-একজন ফেরিওয়ালাও আসেন। বিক্রেতাগণ উপরোক্ত গ্রাম হইতে প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। বিক্রেতা-গণের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

কৃষ্ণনগর গ্রামে প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসোৎসব উপলক্ষে গোপীনাথজীউর মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর দুইদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

খানাকুল, আটঘড়া, চিংড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় দেড় হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় কতকগুলি খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান ও মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রেতারা আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতেই আসিয়া থাকেন। ফেরিওয়ালার সংখ্যা আনু-মানিক ষোলজন।

আটঘড়া গ্রামে কার্তিক পূর্ণিমায় রাস উৎসব উপলক্ষে চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি

মেলা বসে। মেলাটি মাত্র আট-দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। আটঘড়া, চিংড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় চারশত যাত্রী আসেন।

মেলায় খাবারের দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসী-পুতুলের দোকান, মনিহারী ইত্যাদি দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ এই গ্রামের আশেপাশের অঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর আসিয়া থাকেন। ফেরিওয়ালার সংখ্যা দুই-তিন জন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

শিবপূজার মেলা

খানাকুল গ্রামে প্রতি বৎসর মাঘ মাসে ভীম একাদশী তিথিতে ঘণ্টেশ্বর শিবের বার্ষিক পূজা উপলক্ষে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি বহু দিনের প্রাচীন। খানাকুল, আটঘড়া, চিংড়া প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় সাত-আট শত নরনারী আসেন।

মেলায় খাবার, মনিহারী, মাটির তৈয়ারী হাঁড়ি-কলসী, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী ধামা-কুলা, কৃষিযন্ত্রপাতি ইত্যাদি আমদানী হয়। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতেই প্রতি বৎসর বিক্রেতারা ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাদের নিকট হইতে তোলা আদায় করা হয়।

রাউতখানা গ্রামে প্রতি বৎসর ২রা বৈশাখ শিবপূজা উপলক্ষে শিবতলায় প্রায় এক বিঘা জমির উপর এক-দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি সম্প্রতি কালের এবং ইহাতে নতিবপুর, চিংড়া, জগৎপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় আট-নয় শত নর-নারীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়িকুড়ি ও খেলনা এবং বেত ও বাঁশের ধামা-কুলা ইত্যাদির দোকানপাট বসে। বিক্রেতাগণ স্থানীয়। প্রায় চার-পাঁচ জন ফেরিওয়ালা আসেন।

শিবরাত্রির মেলা

পিলখান গ্রামে শিবতলায় প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উৎসব উপলক্ষে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর তিনদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি মাত্র আট-দশ বৎসর যাবত আরম্ভ হইয়াছে। ঘোষপুর, কিশোরপুর, পোল, খানাকুল প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় এক হাজার নর-নারীর সমাগম হয়।

বিক্রেতাগণ স্থানীয়। মেলায় কয়েকটি খাবারের দোকান এবং কয়েকটি মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান বসে। ইহাছাড়া কয়েকটি ধামা-কুলার দোকান বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান ও তোলা আদায় করা হয়।

খানাকুল গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শিবরাত্রি উপলক্ষে ঘণ্টেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য বিকালের দিকে একটি মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন। মেলাতে প্রায় পাঁচ-শত যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় খাবারের দোকান, মনিহারী দোকান, মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান, স্থানীয় কারিগরের তৈয়ারী বাঁশের জিনিসপত্র ও বেতের ধামাকুলোর দোকানপাটও বসিয়া থাকে। আশেপাশের গ্রামাঞ্চল হইতে বিক্রেতা ও ফেরিওয়ালা আসেন। কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না।

সরস্বতীপূজার মেলা

ঘোষপুর গ্রামে মাঘ মাসে সরস্বতী পূজা উপলক্ষে প্রায় চার বিঘা জমির উপর একদিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলায় প্রায় এক হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। ঘোষপুর, পোল, ঠাকুরানীচক, কিশোরপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতেই যাত্রীরা আসেন।

জেলা : হুগলী

থানা : পুরশুড়া

গ্রাম বিবরণী

১। গ্রাম : শেয়োলুক। ৪।২,১৬৭·০৩।৫৯৮।৩,৬৫৯

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, ক্ষত্রিয়, ব্যগ্রক্ষত্রিয়, সদ্‌গোপ, নাপিত, ছুতার, কামার, মালাকার, দুলে, গোয়ালা, হাড়ী, ডোম, শুঁড়ী, তিলি, কুলী, মুসলমান ও সাঁওতাল।

গ্রামে ব্রাহ্মণপাড়া, ঘোষপাড়া, তিলিপাড়া, গোয়ালাপাড়া, সর্দারপাড়া, ডোমপাড়া, মুচিপাড়া, মোল্লাপাড়া, কাজীপাড়া প্রভৃতি অনেকগুলি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে তারকেশ্বর রেলস্টেশন অবস্থিত।

(ঘ) গ্রামে সদ্‌গোপ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত নারায়ণ ও গোস্বামীদের প্রতিষ্ঠিত প্রায় পাঁচ শত বৎসরের প্রাচীন গোপীনাথজীউ বিগ্রহ কেন্দ্র করিয়া প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায় রাসযাত্রা এবং ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রাসযাত্রার মেলা। প্রতি বৎসর কার্তিক পূর্ণিমায়। মেলাটি চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

দোলযাত্রার মেলা। ফাল্গুন মাসে একদিন। মেলাটি চারিশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপীনাথজীউর প্রাচীন মন্দির ব্যতীত পাঁচটি পঞ্চানন্দ, একটি বিশালাক্ষী ও একটি ধর্মঠাকুর আছে।

বিশালাক্ষী ও ধর্মঠাকুরের পূজারী যথাক্রমে ব্রাহ্মণ ও ছুতার সম্প্রদায়ভুক্ত।

শেয়োলুক গ্রাম বৈষ্ণব সাধক আউশিয়া গোস্বামীর সমাজবাড়ী রূপে খ্যাত।

শ্রীধীমান ঘোষ, সাংবাদিক,
৫৮, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা—৬।

২। গ্রাম : দেউলপাড়া। ১৩।৩৮১·২৮।১৬৮।৯৫৩

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, তিলি, বর্গক্ষত্রিয়, জেলে, ছুতার, কুমার, তাঁতী, দুলে, স্বর্ণবণিক ও মুসলমান।

গ্রামে আটটি পাড়া আছে। যথা—ব্রাহ্মণ-পাড়া, দেপাড়া, বর্গক্ষত্রিয়পাড়া, জেলেপাড়া, বাউরি-পাড়া, দুলেপাড়া, কুমারপাড়া ও মুসলমানপাড়া।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) তারকেশ্বর রেলস্টেশনে নামিয়া প্রায় চার মাইল মোটর বাসে কড়ারিয়া ঘাটে আসিয়া তথা হইতে হাঁটাপথে এক মাইল আসিলে এই গ্রামে পৌছান যায়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন গ্রামের বাউরি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মী-দেবীর বার্ষিক পূজা, শ্রাবণ মাসে মনসাপূজা এবং চৈত্র মাসে চড়কপূজা ও শিবের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

ইহাভিন্ন গ্রামে শীতলাপূজা হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি মন্দিরে পিতল-নির্মিত লক্ষ্মী-দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

এইস্থানে নাথ বংশের প্রতিষ্ঠিত প্রায় দুই-তিন শত বৎসরের প্রাচীন কয়েকটি মন্দির বা দেউল দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারনেই গ্রামের নাম দেউল পাড়া হইয়াছে।

শ্রীজীবন কৃষ্ণ বাউরী, শিক্ষক,
গ্রাম ও পোঃ দেউল পাড়া,
হুগলী।

৩। গ্রাম : মির্জাপুর (মৌজা : আলটি)।
১৪।২৯৮·৬৫।২৫৯।১,৪৭৪

(ক) ব্রাহ্মণ, বর্গক্ষত্রিয়, তাঁতি, জেলে ও মাহিষ্য। গ্রামে ছয়টি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) গ্রাম হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে তারকেশ্বর রেলস্টেশন। তারকেশ্বর হইতে দুই মাইল পথ কড়ারিয়া ঘাট পর্যন্ত মোটরবাসে আসিয়া বাকি পথ হাঁটিয়া গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তিতে মকরস্নান উপলক্ষে সাবিত্রীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামে একটি নির্দিষ্ট স্থানে অস্থায়ী চালাঘর নির্মাণ করিয়া তথায় সাবিত্রী-সত্যবানের মৃন্ময়মূর্তি পূজা করা হয়। উৎসবটি প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) পৌষসংক্রান্তির মেলা। পৌষ মাসে একদিন। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে একটি পঞ্চানন্দ, একটি শীতলা, একটি মনসা ও গঙ্গাদেবী আছেন।

শ্রীসুধন্য কুমার চক্রবর্তী,
গ্রাম: মির্জাপুর,
পো: আলাটি, হুগলী।

৪। গ্রাম: বলরামপুর। ৩৫।৩৮৯'৫৫।১৬৮।১,১৮১

(ক) ব্রাহ্মণ, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয় ও মুসলমান।

গ্রামটিতে দুইটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা মার্টিন রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন হইতে সাইকেলরিক্সা অথবা গরুর গাড়ীতে গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি বহু প্রাচীন। তবে গত বাংলা ১৩১০ সন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর দামোদর নদের বন্যার জল এই অঞ্চল দিয়া প্রবাহিত হওয়ায় সমস্ত বর্ষাকালব্যাপী এই গ্রাম জলে নিমগ্ন থাকিত। ফলে রথযাত্রা উৎসবটি বন্ধ ছিল। পরে ১৩৪২-৪৮ সনের মধ্যে দামোদরের বন্যার গতি পরিবর্তিত হওয়ায় ১৩৫০ সন হইতে গ্রামস্থিত প্রবীণ ব্যক্তিগণের উৎসাহে এই উৎসব পুনঃপ্রবর্তন হয়। ১৩৫৮ সন হইতে হুগলী জেলা পর্ষৎ হইতে যথারীতি লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত উৎসব অনুষ্ঠিত হইতেছে। উৎসবে আশে-পাশের গ্রাম হইতে বহু লোকজন যোগদান করেন।

তাহাছাড়া প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে চড়ক ও গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

(ঙ) রথযাত্রার মেলা। আষাঢ় মাসে রথযাত্রা পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়।

(চ) গ্রামে শীতলা, মনসা, শিব ও পীরের স্থান আছে।

শ্রীসুধন্য দোপুই,
গ্রাম: বলরামপুর,
পো: হাটা, হুগলী।

৫। গ্রাম: আকড়ি ফতেপুর।

৩৮।৭৭১'৩৮।৩৩৩।১,৮৮০

(ক) ব্রাহ্মণ, বৈরাগী, মাহিষ্য, বর্গক্ষত্রিয় ও মুসলমান।

গ্রামে চারিটি পাড়া আছে।

(খ) কৃষিকার্য।

(গ) হাওড়া-চাঁপাডাঙ্গা মার্টিন রেলপথে চাঁপাডাঙ্গা রেলস্টেশন হইতে সাইকেলরিক্সায় গ্রামে যাতায়াত করা হয়।

(ঘ) প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তি তিথিতে দামোদর নদে পুণ্যস্নান ও গোপীনাথজীউর পূজা এবং ১লা মাঘ হইতে চারদিনব্যাপী অখণ্ড হরিনাম সংকীর্তন মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় গোস্বামীগণ গোপীনাথ জীউর সেবায়েত এবং তাঁহারাই যথারীতি পূজার্চনা করিয়া থাকেন। উৎসবে আশেপাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন যোগদান করেন ও মালসা ভোগ দ্বারা মানত পূজাদি দিয়া থাকেন। অনেক অহিন্দুও গোপীনাথজীউর নিকট মানত পূজা দেন। উৎসবটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(ঙ) মহোৎসবের মেলা। ১লা মাঘ হইতে চার-দিনব্যাপী। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন।

(চ) গ্রামে গোপীনাথজীউর পাকা মন্দির, আদক বংশের লক্ষ্মীজনার্দন ঠাকুরবাড়ী এবং কালী, শীতলা ও মনসার নির্দিষ্ট স্থান আছে। নিকটবর্তী বিনগ্রামে একটি মন্দিরে কালীদেবীর ভৈরব জলেশ্বর নামে খ্যাত শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

শ্রীগৌর দাস শাসমল,
গ্রাম: আকড়ি ফতেপুর,
পো: পারম্ভামপুর, হুগলী।

পুরশুড়া থানার অন্তর্গত ভাঙ্গামোড়া (মৌজা নং ২) গ্রাম সপ্তদশ শ্রীপাটের অন্যতম। ইহা অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য রজনী পণ্ডিতের শ্রীপাট বলিয়া বৈষ্ণবদিগের নিকট তীর্থ স্থান।

ইহাভিন্ন, এই থানার অন্তর্গত শ্যামপুর (মৌজা নং ৪৭) গ্রামে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ এবং ঘোল দিঘরুই (মৌজা নং ৪৫) গ্রামে প্রতি বৎসর চৈত্র সংক্রান্তিতে চড়ক উপলক্ষে মেলা বসে।

জেলা : হুগলী
থানা : পুরশুড়া

মেলা বিবরণী

পৌষসংক্রান্তির মেলা

মির্জাপুর গ্রামে প্রতি বৎসর পৌষ মাসে সাবিত্রী পূজা উপলক্ষে দামোদর নদের পশ্চিম তীরে গঙ্গাদেবী তলায় দেবোত্তর প্রায় চার শতক পরিমিত জমিতে এক-দিনের জন্য একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় ত্রিশ বৎসরের প্রাচীন।

মেলায় ডিহিবাতপুর, তালপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে প্রায় চার-পাঁচশত নর-নারীর সমাগম হয় এবং কয়েকটি ময়রা-তেলেভাজা মনিহারী প্রভৃতির দোকান-পাট বসে ইহাভিন্ন কয়েকজন ফেরিওয়ালাও আসেন।

মহোৎসবের মেলা

আকড়ি ফতেপুর গ্রামে গোপীনাথজীউর পূজা ও মহোৎসব উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমিতে পয়লা মাঘ হইতে ৪ঠা মাঘ পর্যন্ত চারদিনব্যাপী একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিনশত বৎসরের প্রাচীন। মেলায় গড়ে প্রতিদিন প্রায় আটশত হইতে বারশত নরনারীর সমাগম হয়। বর্ধমান, চব্বিশ পরগণা, মেদিনীপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর যাত্রীর সমাগম হয়।

মেলায় শতাধিক দোকানপাট বসে এবং বহু ফেরিওয়ালা আসেন। তারকেশ্বর, চাঁপাডাঙ্গা, রাজবল-হাট প্রভৃতি স্থান হইতে প্রতি বৎসর মেলায় বিক্রেতাগণ আসেন।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ইত্যাদি খাবারের দোকান ও মনিহারী দ্রব্যাদির দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া বাসনকোসনের দোকান, তাঁতের শাড়ী, লুঙ্গী, গামছা প্রভৃতি জামাকাপড়ের দোকান, বই-ছবির দোকান, ঔষধপত্রের দোকান, মাছ-শাকসব্জীর দোকান ও চা-পান-বিড়ির দোকানপাটও বসে। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে কোনরূপ দান বা তোলা আদায় করা হয় না; তবে স্বেচ্ছায় যে যাহা দেন তাহা গ্রহণ করা হয় ও দেব সেবায় ব্যয় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য নাগরদোলা, ম্যাজিক, ও হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়।

দোলযাত্রার মেলা

শেয়োলুক গ্রামে প্রতি বৎসর ফাল্গুন পূর্ণিমায় দোলযাত্রা উপলক্ষে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় চারিশত বৎসরের প্রাচীন। নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল হইতে প্রায় চার-পাঁচশত নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ময়রা ও তেলেভাজার দোকান, লোহার জিনিসপত্রের দোকান, কাঁচের বাসনপত্র ও মাটির হাঁড়ি-কলসীর দোকান, কাপড়চোপড়ের দোকান এবং পার্শ্ববর্তী ভাঙ্গামোড়া, বৈকুণ্ঠপুর প্রভৃতি গ্রাম হইতে বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্রের দোকানপাট প্রায় প্রতি বৎসর আসে।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য স্থানীয় একটি দল কর্তৃক যাত্রাভিনয় হয়।

রথযাত্রার মেলা

দেউলপাড়া গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উপলক্ষে দেবোত্তর প্রায় চার বিঘা জমিতে রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রার দিন মেলা বসে। মেলাটি বহুদিনের প্রাচীন।

নিকটবর্তী গ্রামাঞ্চল এবং পুরশুড়া ও তারকেশ্বর থানা হইতে মেলায় মোট প্রায় আট হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় প্রায় দুইশত দোকানপাট বসে; তন্মধ্যে ময়রা-তেলেভাজা, মনিহারী, কাঁচ ও মাটির বাসন-কোসন এবং বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী জিনিসপত্র প্রভৃতির দোকানপাটের সংখ্যাই বেশী। তাহাছাড়া কাপড়-গামছার দোকান, মাটির পুতুলের দোকান, বই-ছবির দোকান, শস্য বীজ-চারাগাছ ও পান-বিড়ির দোকান প্রভৃতিও বসে। বিক্রেতাগণ প্রধানতঃ তারকেশ্বর, চাঁপাডাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চল হইতে প্রায় প্রতি বৎসরই

আসেন। বিক্রেতাগণের নিকট হইতে দান বা তোলা আদায় করা হয়।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য ম্যাজিক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা থাকে।

বলরামপুর গ্রামে প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে জগন্নাথ-দেবের রথযাত্রা ও পুনর্যাত্রা উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় রথতলায় প্রায় চারি বিঘা জমির উপর দুইদিন প্রত্যহ বিকালের দিকে মেলা বসে। মেলাটি বহুকালের প্রাচীন; তবে মাঝে প্রায় ৪০ বৎসর মেলাটি বন্ধ ছিল। ১৩৫০ সন হইতে পুনরায় ইহা চালু হইয়াছে।

পুরশুড়া, শ্যামপুর প্রভৃতি ইউনিয়ন হইতে মেলায় প্রায় বার শত নরনারীর সমাগম হয় এবং ময়রা, তেলেভাজা, বই-ছবি, ফলমূল প্রভৃতি দ্রব্যাদির পঁচিশ-ত্রিশটি দোকানপাট বসে ও কয়েকজন ফেরিওয়ালা আসেন।

মেলায় আমোদ-প্রমোদের জন্য কোন কোন বৎসর ম্যাজিক প্রদর্শনী ও হরিনাম সংকীর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। এখানে উল্লেখ থাকে যে, ঢাক-ঢোল-সানাই ইত্যাদি বাদ্যসহ মহা আড়ম্বরের সহিত শোভাযাত্রা-সহকারে রথ বাহির করা হয়। ইহাতে বহু সংখ্যক লোক যোগদান করেন।

জেলা : হুগলী
থানা : চুঁচুড়া

[চুঁচুড়া শহরে অনুষ্ঠিত ষণ্ডেশ্বরজীউর গাজেনোৎসব এবং অন্যান্য উৎসব-পার্বণাদি সম্পর্কে আমাদের প্রতিনিধি শ্রীঅরুণ কুমার রায় কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যাদি নিয়ে লিপিবদ্ধ করা হইল।]

হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুড়া কলিকাতা হইতে প্রায় ২৩ মাইল দূরে ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। ইহা হুগলী জেলার সদর শহর। ১৯৬১ সালের জনগণনা অনুসারে এই স্থানের মোট জনসংখ্যা ৮৩,১০৪। পূর্ব রেলপথে চুঁচুড়ায় একটি স্টেশন আছে।

চুঁচুড়ায় ভগীরথীর তীরে ষণ্ডেশ্বরজীউ নামে খ্যাত এক প্রাচীন শিবলিঙ্গ আছে। ইঁহার আবির্ভাব সম্পর্কে কিংবদন্তী আছে যে, ষোড়শ শতাব্দীতে চুঁচুড়ার শ্যামবাবুর ঘাটের নিকট দিগম্বর হালদার নামে শিবভক্তিপরায়ণ জনৈক নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করিতেন। একদা তাঁহার প্রতি ষণ্ডেশ্বরজীউর স্বপ্নাদেশ হয় যে,—"আমি শ্মশান সংলগ্ন (বর্তমান ট্রেণিং একাডেমী বিদ্যালয়ের পূর্ব ফটকের নিকট) ভাগীরথীর জলে নিমজ্জিত আছি, আগামী রথযাত্রার পরদিবস শুভ তৃতীয়া তিথিতে তিওর সম্প্রদায়ভুক্ত নীলমণি জেলের দ্বারা ভাগীরথীতে জাল ফেলিয়া আমার মূর্তি উদ্ধার কর এবং আমার যথারীতি নিত্য পূজার্চ্চনার ব্যবস্থা কর।" স্বপ্নাদেশ অনুসারে ভাগীরথীতে জাল ফেলিয়া ষণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গসহ ভৈরব বিগ্রহ নামে খ্যাত সাতটি গোলাকৃতি শীলা, একটি ত্রিশূল এবং পূজাপদ্ধতির বিবরণ লিখিত একটি তাম্রপাত্র উদ্ধার করা হয় এবং গঙ্গারতীরের ষণ্ডেশ্বরজীউ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্যপূজার ব্যবস্থা করা হয়। সেই সময় গঙ্গার তীরবর্তী এই স্থান গভীর বেতবনে পরিপূর্ণ বন্য হিংস্র জন্তুর আবাসস্থল ছিল। ক্রমেই ষণ্ডেশ্বরজীউর আবির্ভাবের কথা চারিদিকে প্রচারিত হয় এবং দলে দলে ভক্ত নর-নারী বিগ্রহ দর্শন করিতে এবং পূজা দিবার নিমিত্তে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকেন।

ষণ্ডেশ্বরজীউ বিশেষ জাগ্রত দেবতা বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। এসম্পর্কে লোকমুখে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী শোনা যায়। এমনকি ডাচ্ গভর্ণর ওভারবেক ষণ্ডেশ্বরজীউর অলৌকিক মহাত্ম্য দর্শনে প্রীত হইয়া দুইটী পিতল নির্মিত সুবৃহৎ জয়ঢাক উপহার দেন। গাজনোৎসবের প্রধান বাদ্যরূপে অদ্যাপি ঐ জয়ঢাক দুইটি ব্যবহৃত হয়।

বর্তমান ষণ্ডেশ্বরজীউর পাকা মন্দিরটি চুঁচুড়া নিবাসী সিদ্ধেশ্বর রায়চৌধুরী (মতান্তরে গৌরীকান্ত রায়) নির্মাণ করাইয়া দেন। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী একটি সাধারণ পাকা দালানঘর মাত্র। মন্দিরাভ্যন্তরে গৌরীপট্টসহ ষণ্ডেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গৌরীপট্টটি তামার পাত দ্বারা আচ্ছাদিত এবং উহা উত্তরমুখে বিস্তৃত। শিবলিঙ্গের পিছনে একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে এবং ত্রিশূলের উভয় পার্শ্বে দেওয়াল গাত্রে শ্বেতপাথরের দুইটি বৃষমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দির অভ্যন্তরের মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা এবং চতুঃপার্শ্বস্থ বারান্দা বেলে পাথর দ্বারা নির্মিত। মন্দিরের উত্তরদিকের দেওয়ালগাত্রের বহির্পার্শ্বে একটি গোমুখ দিয়া ষণ্ডেশ্বরের চরণামৃত মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া পড়ে এবং ভক্তরা এই স্থান হইতে ষণ্ডেশ্বরের চরণামৃত গ্রহণ করিয়া থাকেন।

ষণ্ডেশ্বর মন্দিরের সম্মুখে পূর্বমুখী একটি পাকা মন্দিরে শবরূপী শিবের উপর দণ্ডায়মানা দক্ষিণা কালিকার মৃন্ময় মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহা সিদ্ধেশ্বরী কালী নামে খ্যাত। ষণ্ডেশ্বরজীউর প্রতিষ্ঠাতা দিগম্বর হালদার মহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী তাঁহাকে এই স্থানে দাহ করিয়া তাহার উপর সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির নির্মাণ করা হয়। স্থানীয় মন্দির সংস্কার সমিতি কর্তৃক এই মন্দিরটি ২৭শে মাঘ ১৩৬৬ সনে পুনঃনির্মিত হয়।

সিদ্ধেশ্বরী কালীর নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে দেবীর পূজাদি অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রতি শনিবার এই মন্দিরে শনিপূজা

হইয়া থাকে। দেবীর বর্তমান পূজারী শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়।

এই মন্দিরের বামপার্শ্বে দক্ষিণমুখী বঙ্কুবিহারী মন্দিরে বাঁধান বেদীর উপর রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। বেদীর পাদদেশে গোপাল, লক্ষ্মী, বিষ্ণু ও শালগ্রাম শীলা আছে। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্যপূজা হয়। মন্দিরটি বাংলা ১৩৭৩ সনে সংস্কার করা হইয়াছে।

যণ্ডেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে দক্ষিণমুখী একটি জোড় বাংলা মন্দিরে শ্বেত পাথরের বেদীর উপর যোগাদ্যা নামে খ্যাত দুর্গামূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরটি ১২৫২ সনের ৬ই বৈশাখ নির্মিত। মন্দিরাভ্যন্তরে রাধাকৃষ্ণ, নারায়ণ শীলা ও শিবলিঙ্গ আছে। উল্লিখিত দেবদেবী সহ যোগাদ্যা দেবীর নিত্য পূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে শারদীয়া পূজা, আষাঢ় মাসে বিপদতারিণীব্রত, কার্তিক মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ তিথিতে অন্নকূট মহোৎসব, বৈশাখ সংক্রান্তিতে বার্ষিক পূজা এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার মঙ্গলচণ্ডীপূজা হইয়া থাকে। দেবীর বর্তমান সেবায়েত কলিকাতা নিবাসী শ্রীবরদা প্রসন্ন সোম এবং পূজারী শ্রীবলাই চন্দ্র ভট্টাচার্য, ইনি ভরদ্বাজ গোত্রীয় বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ।

যণ্ডেশ্বর মন্দির সংলগ্ন দুইটি জগন্নাথ মন্দিরের প্রতিটিতেই জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দির দুইটিতে প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা এবং আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পূর্বে রথযাত্রা উপলক্ষে রথ টানা হইত, বর্তমানে রথটানা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যণ্ডেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে গঙ্গার তীরে প্রশস্ত বাঁধান ঘাট আছে। ইহা নীলাম্বর শীল মহাশয় কর্তৃক নির্মিত। ঘাটের নিকট উত্তরমুখী একটি মন্দিরে রামসীতার সিমেণ্ট জমান মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। একটি সিংহাসনের উপর উপবিষ্ট রামসীতার দক্ষিণ পার্শ্বে ছত্রধারী লক্ষণ এবং বামপার্শ্বে পদতলে মহাবীরের মূর্তি আছে। ইহাভিন্ন, মন্দিরে গৌরাঙ্গদেবের মৃন্ময় মূর্তি ও শালগ্রাম শীলা আছে। ১৩৫৯ সনে গোলাপী গঙ্গাপুত্রী (জাতিতে ডোম) নামে জনৈক মহিলা এই মন্দির নির্মাণ করেন। প্রতি বৎসর রামনবমী তিথিতে এই মন্দিরে বিশেষ পূজা-পাঠ হইয়া থাকে। বর্তমান পূজারী শ্রীললিত মোহন ভট্টাচার্য।

গঙ্গার ঘাটে উত্তর-পূর্বমুখী একটি অপেক্ষাকৃত ছোট মন্দিরে প্রায় ১ ফুট উচ্চ শ্বেত পাথরের একটি শিবলিঙ্গ সহ দক্ষিণা কালীর প্রস্তর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই মন্দিরে একটি বুদ্ধমূর্তি এবং একটি অন্নপূর্ণা মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই উভয় মূর্তিই প্রায় ১ ফুট উচ্চ এবং শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত। অন্নপূর্ণা মূর্তিটি ডান পা মুড়িয়া উপবিষ্টা। উল্লিখিত দেবদেবীর নিত্যপূজা হয় এবং প্রতি বৎসর কার্তিক মাসে অমাবস্যা তিথিতে সাড়ম্বরে দক্ষিণা কালীর পূজা হইয়া থাকে। সারা বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র আষাঢ় মাসে অম্বুবাচীর চারদিন দেবীর মন্দির ও পূজা বন্ধ থাকে। মন্দিরটি প্রাচীন এবং গণেশ গিরি নামে জনৈক ভক্ত কর্তৃক এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানা যায়। দেবীর বর্তমান পূজারী শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়।

ঘাটের উত্তরে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে প্রবেশ দ্বার সহ অষ্টকোনাকৃতি একটি প্রাচীন মন্দিরে পাতালেশ্বর নামে খ্যাত গৌরীপট্ট সহ একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন এই মন্দিরে প্রায় ১½ ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তরের একটি সুন্দর বিষ্ণু মূর্তি এবং প্রায় ১ ফুট উচ্চ শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটি গণেশ মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্য পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যণ্ডেশ্বর মন্দিরের পশ্চাতে উত্তর-পূর্ব কোনে দক্ষিণ-মুখী একটি মন্দিরে নেপালেশ্বর নামে খ্যাত একটি শিবলিঙ্গ আছে। মন্দিরটি ১৩৬৭ সনে স্থানীয় কার্তিক চরণ পাল কর্তৃক সংস্কৃত হইয়াছিল। এই শিবলিঙ্গেরও নিত্য পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

যণ্ডেশ্বর মন্দিরের বামপার্শ্বে একটি ছোট পাকা মন্দিরে গর্দভের উপর উপবিষ্ট প্রায় দেড়ফুট উচ্চ প্রস্তর নির্মিত একটি শীতলা মূর্তি আছে। দেবীর নিত্য পূজা হয় এবং প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে প্রথম শনি অথবা মঙ্গলবার বিশেষ পূজা হইয়া থাকে। মন্দিরটি স্থানীয় নিউ ড্রামাটিক ক্লাব কর্তৃক ১৩৩৭ সনে নির্মিত। এইস্থানে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষদ্বয়ের নীচে প্রায় ২ ফুট উচ্চ কৃষ্ণ প্রস্তরের একটি সুন্দর সূর্য মূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়। যণ্ডেশ্বর

মন্দিরের সম্মুখে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের নীচে বাঁধান বেদীর উপর দুইটি ত্রিশূল সহ সপ্তভৈরব নামে খ্যাত সাতটি শীলা আছে। শীলাগুলি বণ্ডেশ্বরজীউর সহিত ভাগীরথী হইতে উত্তোলন করা হইয়াছিল।

শীতলা মন্দিরের ডান পার্শ্বে উত্তরমুখী একটি মন্দিরে দারুময় ষড়ভুজ মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীগৌরাঙ্গ এই ত্রিমূর্তির সমন্বয়ে মহাপ্রভুর বিগ্রহটি নির্মিত। মহাপ্রভুর নিত্যপূজা হয়।

ইহাভিন্ন, বণ্ডেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে অন্তিম নিবাস সংলগ্ন উত্তরমুখী একটি পাকা মন্দিরে শালগ্রাম শীলা ও কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরের মেঝে শ্বেতপাথর দ্বারা নির্মিত। এই মন্দিরে নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমীতে বিশেষ পূজা হয়।

প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে বণ্ডেশ্বরজীউর সাড়ম্বরে গাজন পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবটি তিন শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। প্রতি বৎসর ২১শে চৈত্র (চৈত্র মাস ৩১ দিনে হইলে ২২শে তারিখ) হইতে আরম্ভ হইয়া ১লা বৈশাখ পর্যন্ত অর্থাৎ ১১ দিনব্যাপী গাজন উৎসব পালন করা হয়।

গাজন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর প্রায় পঁচিশ জন ভক্ত সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন। স্ত্রী-পুরুষ বা জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। কোন স্ত্রীলোক সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলে তাঁহাকে 'ভট্টাসিনী' বলা হয়। গাজন উৎসবে একজন মূল সন্ন্যাসী থাকেন, তিনিই অন্যান্য সন্ন্যাসীদের পরিচালনা করেন। বর্তমান মূল সন্ন্যাসী শ্রীপাঁচু গোপাল ঘোষ, ইঁহারা পুরুষানুক্রমে মূল সন্ন্যাসীর ব্রত পালন করিতেছেন। মূল সন্ন্যাসীকে সারা চৈত্রমাসব্যাপী একবেলা হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও সংযম পালন করিতে হয়। প্রতি বৎসর ২২শে চৈত্র হইতে সন্ন্যাস গ্রহণেচ্ছুক ব্যক্তিদের শিব গোত্রান্তরিত করিয়া সন্ন্যাসরূপে গ্রহণ করা হয়। সন্ন্যাসব্রত গ্রহণকারীরা নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া গলায় উত্তরীয় ধারণ করেন এবং উৎসব সমাপ্তির দিন পর্যন্ত একবেলা হবিষ্যান্ন ভক্ষণ ও ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া সাত্বিক জীবনযাপন করেন।

মূল সন্ন্যাসী এবং দ্বারপালক, ভাণ্ডারী, নীলপাত্র, মদন, ভবতী ও এলো সন্ন্যাসী নামে অভিহিত নিয়পক্ষে এই ৭ জন ভক্তকে প্রতি বৎসর সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিতে হয়। গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসব্রতীগণ বণ্ডেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে বিশিষ্ট অঙ্গভঙ্গি সহকারে ঢাকের বাদ্যের তালে তালে নানারূপ নৃত্য-গীতের মাধ্যমে কতকগুলি নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন, স্থানীয় লোকে ইহাকে 'খাটাখাটুনি' বলেন। সন্ন্যাসীর সংখ্যা অধিক হইলে পুষ্পবটু, গন্ধবটু, পাত্রবটু, ভোগবটু প্রভৃতি নামে সেবাদল গঠন করা হয়। ইহাভিন্ন গাজনে পুরোহিত অর্থাৎ ধর্মাধিকারী, ভোগরন্ধনকারী ভোগাধিকারী এবং অতিথিভক্তরূপে সেবায়েতের পক্ষে একজন, ঢাকবাদ্যকারী দুইজন এবং সাধুনী কোটাল ও দেউলী কোটাল এই কয়জন ভক্ত থাকেন। চারধাম পর্যটনকারী কেবলমাত্র এমন ব্যক্তিই ধর্মাধিকারী হইতে পারেন। বর্তমান ধর্মাধিকারী শ্রীসুধীর মুখোপাধ্যায়।

২২শে চৈত্র পূর্বাহ্নে ৭ ঘটিকার মধ্যে বণ্ডেশ্বরজীউর অভিষেক, তৎসহ বণ্ডেশ্বরজীউর মন্দির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠিত অসিতাঙ্গাদি সপ্তভৈরব পূজা এবং মন্দির অভ্যন্তরে শিবলিঙ্গের পশ্চাতে প্রোথিত ত্রিশূলের নিকট কামদাত্রী কামাখ্যাদেবীর ঘট স্থাপন করিয়া পূজা করা হয়। দ্বিপ্রহরে জয়ঢাকের গুরুগম্ভীর বাদ্যের সহিত বণ্ডেশ্বর, কামাখ্যাদেবী, কালভৈরব ও সিদ্ধেশ্বরী কালীর গাজন পূজান্তে মন্দির প্রাঙ্গণে মূল সন্ন্যাসীর 'খাটখাটুনি' এবং হোমপূজা ও পরমান্ন ভোগ নিবেদন করিয়া সাধারণের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। সন্ধ্যায় বণ্ডেশ্বরজীউর আরতি হয়।

২৩শে চৈত্র প্রথম দিনের ন্যায় বণ্ডেশ্বরজীউসহ চতুর্দেবতার যথারীতি পূজা ও ভোগ নিবেদন করা হয়। এই দিন সন্ন্যাসীদের 'খাটাখাটুনি' বন্ধ থাকে।

২৪শে চৈত্র দ্বিপ্রহরে যথারীতি বণ্ডেশ্বরজীউর গাজনপূজা ও পরমান্ন ভোগ নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যায় রৌপ্য নির্মিত পঞ্চানন মূর্তিকে সুগন্ধি পুষ্পমাল্য-নির্য্যাস এবং নানারূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার দ্বারা মনোহর বেশে সজ্জিত করিয়া নানাবিধ ভোগ-নৈবেদ্য নিবেদন করা হয়।

মধ্য রাত্রিতে মন্দিরের আশেপাশে নিদ্রারত গাজনে সন্ন্যাসীদিগকে ঢাকের বাদ্য দ্বারা জাগরিত করিলে তাঁহারা মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়া ঢাক বাজনার বিভিন্ন তালে তালে বিভিন্ন প্রকার 'খাটাখাটুনি' প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ভোর রাত্রে যণ্ডেশ্বরজীউর বিশ্রাম পর্ব পালন করা হয়। এইরূপে ২৮শে চৈত্র পর্যন্ত অর্থাৎ সপ্তদিবসব্যাপী নিয়মিত গাজন পূজা ও সন্ন্যাসীদের 'খাটাখাটুনি' অনুষ্ঠিত হয়।

২৮শে চৈত্র সন্ন্যাসীরা মহাহবিষ্য পালন করেন। এই দিন রাত্রিকালে সকল সন্ন্যাসব্রতীগণ গঙ্গানীরে অবগাহন করিয়া মন্দির প্রাঙ্গণে মাত্র তিনটি চালের ভাত রাঁধিয়া একটি হাতে, একটি পাতে এবং একটি দাঁতে কাটিয়া হবিষ্য করিয়া থাকেন। এইদিন পূজারম্ভের প্রথমে কামারদের পূজা নিবেদনের পর যণ্ডেশ্বরজীউর যথারীতি ভোগ পূজাদি হয়।

২৯শে চৈত্র প্রাতঃকালে মূল সন্ন্যাসী বেত্র হস্তে ঢাক-ঢোলের বাজনসহ গৃহস্থদের মঙ্গল কামনা করিয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়ান এবং গৃহস্থরা মূলসন্ন্যাসীর পদ প্রক্ষালন করিয়া নানারূপ দ্রব্য সামগ্রী উপহার দিয়া থাকেন।

মধ্যাহ্নে যথারীতি পূজা ও ভোগ নিবেদনের পর যণ্ডেশ্বরজীউর ভোগের হাঁড়ি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হয়। পুষ্পমাল্য দ্বারা সজ্জিত ভোগের হাঁড়িটি ধর্মাধিকারী শিরে বহন করেন এবং বাদ্যভাণ্ডসহ ভক্ত ও সন্ন্যাসীর দল তাঁহার অনুগমন করেন।

রাত্রিকালে নির্দিষ্ট লগ্নে একটি আম্রশাখাযুক্ত নূতন ঘট স্থাপন করিয়া যণ্ডেশ্বর ও সপ্তভৈরবের গাত্র হরিদ্রা ও অধিবাস পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। অধিবাস পর্বের পর উক্ত ঘটটিকে স্থানীয় চাটুজ্যেদিগের গৃহে স্থানান্তরিত করা হয়। এইদিন সন্ন্যাসীরা হবিষ্য করেন না, কেবলমাত্র কয়েকটি ফল আহার করিয়া দিন অতিবাহিত করেন।

৩০শে চৈত্র মধ্যাহ্নে যথারীতি ভোগপূজাদির পর সন্ধ্যায় অগণিত মহিলা মন্দিরে নীলপূজা ও প্রদীপ দিতে আসেন। রাত্রিকালে যণ্ডেশ্বরজীউকে নববস্ত্র, পুষ্পমাল্য, চন্দন, স্বর্ণালঙ্কার ও টোপর পরাইয়া বরবেশে সজ্জিত করিয়া ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা দলে দলে বহুক্ষণ যাবত প্রচুর ধুনা পোড়ান এবং সন্ন্যাসীরা বিভিন্ন প্রকারের 'খাটাখাটুনি' প্রদর্শন করেন। সর্বশেষ মূল সন্ন্যাসী খাটাখাটুনি প্রদর্শন করিয়া মন্দির সোপানে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার কপালে মন্ত্রপূত লীলাবতী ডাব স্পর্শ করান মাত্র তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। মূর্চ্ছিত অবস্থায় মূল সন্ন্যাসীকে অন্যান্য সন্ন্যাসী ধরাধরি করিয়া গঙ্গার ঘাটে আনিয়া সর্বাঙ্গে গঙ্গাজল সিঞ্চন ও কর্ণে শিবমন্ত্র জপ করেন। এইরূপে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর মূল সন্ন্যাসী মূর্চ্ছাভঙ্গ হইলে পূর্বউক্ত চাটুজ্যেদিগের গৃহ হইতে লীলাবতী ঘট আনিয়া যণ্ডেশ্বরের মন্দির প্রাঙ্গণে একটি নিমগাছের নীচে স্থাপন করিয়া বাদ্যভাণ্ডসহ শাস্ত্রমতে হর-পার্বতীর বিবাহ পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। উল্লিখিত মন্ত্রপূত 'লীলাবতী' ডাবের জল পান করিলে বন্ধ্যানারী সন্তান লাভ করে এইরূপ বিশ্বাসে ঐ ডাব ক্রয় করিবার জন্য ভক্তদের মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। শোনা যায় ঐ ডাবটি ত্রিশ-চল্লিশ টাকা মূল্যে পর্যন্ত বিক্রয় হইয়া থাকে। এইদিন ভক্তরা যণ্ডেশ্বরজীউর নিকট 'মালপোয়া' ভোগ পূজা দিয়া থাকেন।

৩১শে চৈত্র অর্থাৎ সংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে অগণিত ভক্ত নরনারী যণ্ডেশ্বর শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রহরে হালদার ও পরিবারের প্রতিনিধিসহ সন্ন্যাসীগণ সাতবার যণ্ডেশ্বর মন্দির ও সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রদক্ষিণ করেন।

মধ্যাহ্নে যণ্ডেশ্বরজীউর যথারীতি পূজার পর অপরাহ্নে মন্দির প্রাঙ্গণে সুউচ্চ বাঁশের মঞ্চ নির্মাণ করিয়া সন্ন্যাসীরা একের পর এক উক্ত মঞ্চ হইতে নীচে সজ্জিত ধারাল বঁটীর উপর ঝাঁপ দিয়া পড়েন। ঝাঁপ দিবার পূর্বে সন্ন্যাসীরা প্রত্যেকে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রতীক্ষারত দর্শকদের উদ্দেশ্যে ফল নিক্ষেপ করেন। ঐ ফল সংগ্রহ করিবার জন্য দর্শকদের মধ্যে তুমুল হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। সন্ন্যাসীদের এই অনুষ্ঠানটিকে 'পাটভাঙ্গা' পর্ব বলা হয়।

১লা বৈশাখ সন্ন্যাসীরা ক্ষৌরকর্ম করিয়া পুনরায় গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যান। এইদিন যণ্ডেশ্বরজীউ, ভৈরবনাথ ও সিদ্ধেশ্বরী দেবীর ভোগপূজার পর সন্ন্যাসীদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। মধ্য রাত্রিতে ছাগ বলিসহ ভৈরব-

নাথের বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় এবং ছাগ বলির রক্তদ্বারা ভৈরবনাথকে স্নান করান হয়। পরিশেষে কামাখ্যাদেবীর ঘট বিসর্জন এবং ভক্তদের মধ্যে শান্তিজল প্রদান করিয়া গাজনোৎসব সমাপ্ত হয়।

গাজনোৎসব উপলক্ষে উল্লিখিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি প্রত্যক্ষ করিতে প্রতিদিন মন্দিরে অগণিত নরনারীর সমাবেশ হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছা-সেবক ও পুলিশ বাহিনী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকেন।

চৈত্র মাসে গাজনোৎসব ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে ষণ্ডেশ্বরজীউর সাড়ম্বরে শিবরাত্রি উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গাজনোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ ষণ্ডেশ্বর মন্দির প্রাঙ্গণে একটি মেলা বসে। ইহা বৈশাখী মেলা নামে খ্যাত। আশেপাশের বিভিন্ন স্থান হইতে এই উৎসব ও মেলায় মোট প্রায় দশহাজার নরনারীর সমাগম হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা, মনিহারী, মাটির পুতুল, বই-ছবি, লোহার তৈয়ারী বাসনপত্র ও ছুরি-কাঁচি-কাটারী প্রভৃতি জিনিসপত্র, কাঁচের বাসনপত্র, কাঠের তৈয়ারী বারকোস, পিলসুজ ইত্যাদি দ্রব্যের মোট প্রায় ত্রিশ-চল্লিশটি দোকানপাট বসে।

আমোদ-প্রমোদ উপলক্ষে এই স্থানে কয়েকদিনব্যাপী যাত্রাভিনয় হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর উত্তম অভিনয়কারী দলকে 'ষণ্ডেশ্বর চ্যালেঞ্জ শীল্ড' ও কয়েকটি ব্যক্তিগত রৌপ্য পদক উপহার দেওয়া হয়। যাত্রা উপলক্ষে দর্শকদের নিকট টিকিট বিক্রয় করা হয়। প্রতিদিন প্রায় দেড় হাজার নর-নারী যাত্রাভিনয় দেখিতে আসেন।

চুঁচুড়া শহরে অবস্থিত অন্যান্য কয়েকটি দেবালয়:

রঘুনাথ মন্দির—চুঁচুড়ার আখন বাজারের নিকট অবস্থিত রঘুনাথ মন্দিরের একটি প্রকোষ্ঠে শ্বেতপাথরের বেদীর উপর স্থাপিত একটি কাষ্ঠ মঞ্চে লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও মহাবীর সহ রাজবেশে সজ্জিত রামসীতার সুন্দর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরাভ্যন্তরে ভিন্ন বেদীর উপর একটি অতি সুন্দর কষ্টিপাথর নির্মিত বালগোপাল মূর্তি এবং অপর একটি বেদীতে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইহাভিন্ন এই মন্দিরে অনেকগুলি রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, গোপালমূর্তি এবং নারায়ণ শিলা দেখিতে পাওয়া যায়। মন্দিরটি সুগঠিত। মন্দিরের সম্মুখে প্রশস্ত চত্বর চারিদিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বারানসী নিবাসী শ্রীগোকুল চাঁদ নামে জনৈক ব্যক্তি ১৯১৭ সালে মন্দিরটি সংস্কার করিয়া দেন। বর্তমানে রাজস্থান প্রদেশের কোটা নিবাসী শ্রীরাজ কুমার আগরওয়ালা মন্দিরের সেবায়েত এবং পূজারী শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদ চৌবে। ইনি গত ৩৬ বৎসর যাবত এই মন্দিরে পূজারীর কার্য করিতেছেন। পূজারী মাসিক বেতনভোগী। একটি ট্রাষ্টী কর্তৃক রঘুনাথ মন্দিরের যাবতীয় পূজা-পার্বণ পরিচালিত হয়।

উল্লিখিত বিগ্রহাদির নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসে স্নানযাত্রা, আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, শ্রাবণ মাসে ঝুলনযাত্রা, ভাদ্র মাসে জন্মাষ্টমী, কার্তিক মাসে অন্নকূট মহোৎসব এবং চৈত্র মাসে রামনবমী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

রামনবমী উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর মন্দির সংলগ্ন প্রাচীর বেষ্টিত প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এবং মন্দির সম্মুখস্থ হসপিটাল রোডের দুইধারে একটি মেলা বসে। মেলাটি প্রায় তিন সপ্তাহকাল স্থায়ি হয়; তবে প্রথম চার-পাঁচদিনই মেলায় লোকসমাগম বেশী হয়।

মেলায় ময়রা, তেলেভাজা ও অন্যান্য খাবার, মনিহারী দ্রব্য, খেলনা-পুতুল, বই-ছবি, কাঁচের বাসন, বাঁশ ও বেতের তৈয়ারী শিল্প সামগ্রী, মাটির হাঁড়ি-কলসী প্রভৃতি দ্রব্যের প্রায় সত্তর-আশীটি দোকানপাট বসে এবং প্রতিদিন মেলায় প্রায় দেড় হাজার নরনারীর সমাগম হয়।

কালী মন্দির—চুঁচুড়ার খড়ুয়া বাজারের নিকট একটি প্রাচীন কালীমন্দিরে শ্বেতপাথর নির্মিত শবরূপী শিবের বক্ষে দণ্ডায়মান প্রায় দুই ফুট উচ্চ একটি সুন্দর কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালীমূর্তির জিহ্বা ও চক্ষু স্বর্ণ নির্মিত এবং দেবী নানারূপ স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কারে ভূষিতা।

কালীমন্দিরে পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পশ্চিমমুখী পর পর চারিটি মন্দিরের প্রথম ও চতুর্থ মন্দিরে দুইটিতে গৌরীপট্টহীন এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্দির দুইটিতে গৌরী-পট্টসহ শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। মন্দিরগুলি বাংলা

চারচালা রীতিতে গঠিত এবং প্রাচীন হইলেও অদ্যপি বেশ সুগঠিত আছে। কালীমন্দিরটি মেঝে শ্বেত পাথর দ্বারা নির্মিত এবং সম্মুখে থামযুক্ত বারান্দা আছে। মন্দির গাত্রে নানারূপ ফুল ও লতাপাতা খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়।

কালীদেবীর নিত্য দুইবেলা যথারীতি পূজা-আরতি এবং প্রতি বৎসর কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে ও মাঘী সপ্তমী তিথিতে সাড়ম্বরে পূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মন্দিরের সেবায়েত এবং পূজারী উভয়ই বিহার প্রদেশের অধিবাসী।

হুগলী ইমাম্বাড়া—ইহা চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। হাজী মহম্মদ মহসীনের দানকৃত অর্থের দ্বারা ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে প্রায় পৌনে তিন লাখ টাকা ব্যয়ে প্রাসাদতুল্য এই সুবৃহৎ ইমাম্বাড়াটি নির্মিত হয়। এইস্থানে মুসলমান সম্প্রদায় সাড়ম্বরে মহরম উৎসব পালন করিয়া থাকেন। উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় দশ হাজার মুসলমান নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে। মহরমের দিন ইমাম্বাড়া হইতে সুসজ্জিত তাজিয়া সহ এক বিরাট মিছিল বাহির হইয়া প্রায় একমাইল দূরবর্তী কারবালা প্রান্তরে উপস্থিত হয় এবং এই স্থানে মুসলমানগণ তাঁহাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন। ইমাম্বাড়া ও উহার যাবতীয় সম্পত্তি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইয়া থাকে। মহরম উপলক্ষে ইমাম্বাড়া সংলগ্ন জমিতে এবং কারবালা প্রান্তরে প্রতি বৎসর একটি মেলা বসে।

জৈন মন্দির—ইহা চুঁচুড়া শহরের অন্তর্গত যোগী পাড়া লেনে অবস্থিত। এই সুবৃহৎ মন্দির প্রাঙ্গণের মধ্য-স্থলে একটি অপূর্ব সুন্দর মন্দিরের অভ্যন্তরে শ্বেতপাথর নির্মিত মঞ্চের উপর পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, মহাবীর, আদিনাথ, চন্দ্রপ্রভু প্রভৃতি জৈন ধর্মগুরুদিগের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কলিকাতার দিগম্বর জৈন সম্প্রদায় কর্তৃক এই মন্দিরে নিত্যপূজা ও জৈন সম্প্রদায়ের যাবতীয় উৎসবাদি পরিচালিত হইয়া থাকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির—এই মন্দিরটি স্থানীয় ভক্তবৃন্দ কর্তৃক সম্প্রতি নির্মিত হইয়াছে। মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। নিত্যপূজা ব্যতীত প্রতি বৎসর ফাল্গুন মাসে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব উৎসব পালিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের নিকটবর্তী রথতলায় প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসে রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে প্রতি বৎসর এই স্থানে একটি মেলা বসে।

খৃষ্টান চার্চ—চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত বিখ্যাত ব্যাণ্ডেল চার্চ ব্যতীত শহরের মধ্যে মোগলটুলীতে "আর্মেনীয়া চার্চ" নামে একটি গীর্জা আছে। গীর্জাটি ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে খাজা জোহানস কর্তৃক নির্মিত এবং "সেণ্ট জন্ দি ব্যাপটিষ্ট"-এর নামে উৎসর্গীকৃত। ইহাভিন্ন চুঁচুড়া বিখ্যাত ঘড়ির মোড়ে একটি 'রোমান ক্যাথলিক চার্চ' আছে। এই গীর্জাটি ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত।

চুঁচুড়া শহরের বিভিন্ন পল্লীতে প্রতি বৎসর আশ্বিন মাসে দুর্গাপূজা, কার্তিক মাসে কালীপূজা ও কার্তিকপূজা এবং মাঘ মাসে সরস্বতীপূজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। চুঁচুড়ার কার্তিকপূজা একটি উল্লেখযোগ্য উৎসব। বিভিন্ন পল্লীতে প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে বহু সর্বজনীন কার্তিকপূজা হইয়া থাকে। ধুতি পাঞ্জাবী পরিহিত সুবৃহৎ কার্তিক-মূর্তিগুলি স্থানীয় অঞ্চলে 'বাবু কার্তিক' নামে খ্যাত। সর্বজনীন পূজাগুলির মধ্যে কোন কোনটি শতাধিক বৎসরের প্রাচীন বলিয়া দাবী করা হয়। বিসর্জনের দিন কার্তিকমূর্তি লইয়া বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই উৎসব ও শোভাযাত্রা প্রত্যক্ষ করিতে প্রতি বৎসর পূজামণ্ডপে বহু নর-নারীর সমাগম হইয়া থাকে।

পরিশিষ্ট ক
মেলা সারণি

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*১	মুর্শিদাবাদ	ফরাক্কা	৫৫	দিলোয়ারপুর	...	মহরম	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
*২	"	"	৫৮	নয়নসুখ	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	...	১,০০০
‡৩	"	"	"	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৫০ বৎসর	৪ দিন	...
*৪	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	...	...	...
‡৫	"	"	৬৩	মহাদেবনগর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...
*৬	"	"	"	"	...	মহরম	...	...	...
†৭	"	"	৯৬	অর্জুনপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৬০০
‡৮	"	"	...	খেজুরিয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
†৯	"	"	...	শিবনগর	পৌষ	শ্যামসুন্দর-দেবেরপূজা	...	৭ দিন	১,৫০০
†১০	"	সামসেরগঞ্জ	৭৫	দোগাছি	অগ্রহায়ণ	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	...	৭ দিন	১,৫০০
†১১	"	"	১০৩	জলদীপুর	অগ্রহায়ণ	লক্ষ্মীপূজা	...	৭ দিন	৫০০
*১২	"	"	১০৪	ধুসড়ীপাড়া	আশ্বিন	মনসাপূজা	৫০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
‡১৩	"	"	১০৫	জীয়ৎকুণ্ড	পৌষ	জীয়ৎকুণ্ডেশ্বরীপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৭,০০০-৮,০০০
†১৪	"	"	...	ফরিদপুর	বৈশাখ	লক্ষ্মীপূজা	...	৩০ দিন	৩,০০০
†১৫	"	"	১০৮	নিমতিতা	কার্তিক	ভগবতীপূজা	...	১ দিন	২,০০০
†১৬	"	"	"	"	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	৪ দিন	৫০০

✝১৭	মুর্শিদাবাদ	সামসেরগঞ্জ	১০৮	নিমতিতা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৮ দিন	১,৫০০
✝১৮	"	"	...	রামরামপুর	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	৫০০
✝১৯	"	"	...	নয়াহাট	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	২০০
✝২০	"	"	...	মহেশতলা	পৌষ	মদনমোহন দেবেরপূজা	...	৭ দিন	১,০০০
✝২১	"	"	...	হিজোল	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	৫০০
✝২২	"	"	...	কাঞ্চনতলা	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	৫০০
✝২৩	"	"	...	রঘুনন্দনপুর	পৌষ	নবান্ন	...	৩ দিন	১,০০০
✝২৪	"	"	...	জীবনজোলহাট	পৌষ	শ্যামচাঁদ ও বলরামপূজা	...	৭ দিন	১,৫০০
✝২৫	"	সুতী	১০	কদমতলা	কার্তিক	কালীপূজা	...	২ দিন	৫০০
✝২৬	"	"	...	বাজিতপুর	মাঘ	সর্বেশ্বরপূজা	...	১ দিন	৩,০৫০
‡২৭	"	"	২০	বহুতালী	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	২০০-৩০০
‡২৮	"	"	৩৩	ছিলোড়া	...	...	৫০ বৎসর	৭ দিন	৭,০০০
*২৯	"	"	৪০	বংশবাটী	মাঘ	রাজরাজেশ্বরীপূজা	২৫০ বৎসর	১০ দিন	৭০০
‡৩০	"	"	৪৩	হারুয়া	চৈত্র	চড়কপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
*৩১	"	"	৫৯	আরঙ্গাবাদ	অগ্রহায়ণ	অনন্তব্রহ্মাপূজা	২৫০ বৎসর	৭ দিন	৩,০০০-৪,০০০
✝৩২	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৬০০
‡৩৩	"	"	৮৪	রমাকান্তপুর	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	১,৫০০
*৩৪	"	"	"	"	চৈত্র	রক্ষাকালীপূজা	১২৫ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
✝৩৫	"	"	৮৬	নূরপুর	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	...	৬ দিন	১,২০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
✝ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৩৬	মুর্শিদাবাদ	সুতী	১০২	আহিরণ	আশ্বিন	খেতুর পঞ্চমী মহোৎসব	১০ বৎসর	৪ দিন	...
‡৩৭	”	”	”	”	...	লক্ষ্মীপূজা	...	৩ দিন	...
*৩৮	”	”	”	”	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	৭ দিন	...
‡৩৯	”	”	১০৫-১০৬	আলমপুর-জেহেগী নগর	বৈশাখ	মহামায়াপূজা	১০০ বৎসর	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪০	”	”	...	ছাপাঘাটি	...	পীরের উৎসব	...	১ দিন	...
†৪১	”	”	...	”	জ্যৈষ্ঠ	ধূলট উৎসব	...	১ দিন	৫০০
†৪২	”	”	...	কাশিমনগর	কার্তিক	কালীপূজা	...	১৫ দিন	২,০০০
†৪৩	”	”	...	লক্ষ্মীনারায়ণপুর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	...	৮ দিন	১,২০০
†৪৪	”	রঘুনাথগঞ্জ	৬	রঘুনাথগঞ্জ শহর	ফাল্গুন	তুলসী-বিহার উৎসব	...	৪ দিন	১,০০০
*৪৫	”	”	১৪	সেকান্দরা	কার্তিক	কৃষ্ণকালীপূজা	১০০ বৎসর	৮ দিন	১,০০০
*৪৬	”	”	১৫	মিঠিপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	”	১ দিন	১,০০০
‡৪৭	”	”	”	”	...	মহরম	১০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
†৪৮	”	”	২১	জোতকামাল	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	১ দিন	৫০০
*৪৯	”	”	৩৫	গিরিয়া	কার্তিক	কালীপূজা	৭-৮ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
‡৫০	”	”	”	ভৈরবটোলা	কার্তিক	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
†৫১	”	”	৬৫	ভাবকী	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	৫ দিন	৫০০
‡৫২	”	”	৬৭	গোসাঁইপুর	...	মহরম	৪০ বৎসর	১ দিন	৬,০০০
†৫৩	”	”	৮৯	রামপুর	ফাল্গুন	শিবপূজা	...	৩ দিন	২০০
‡৫৪		”	১০৮	বাড়ালা	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	প্রাচীন	৫ দিন	৪,০০০
†৫৫	”	”	১১০	জারুর	”	”	...	১ দিন	৪০০

‡৫৬	মুর্শিদাবাদ	রঘুনাথগঞ্জ	১৩১	মির্জাপুর	বৈশাখ	শীতলাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,৫০০-২,০০০
*৫৭	”	”	”	”	কার্তিক	কার্তিকপূজা	”	২ দিন	১২,০০০
†৫৮	”	”	১৩৮	গণকর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	২ দিন	২০০
†৫৯	”	”	১৪২	রাজনগর	আশ্বিন	লক্ষ্মীপূজা	...	৮ দিন	১,০০০
‡৬০	”	”	১৫৩	রঘুনাথপুর	চৈত্র	ব্রহ্মাপূজা	১৫ বৎসর	৭ দিন	৫০০
*৬১	”	সাগরদীঘি	১৪	বক্রেশ্বর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	৪ দিন	৪,০০০-৫,০০০
†৬২	”	”	”	”	চৈত্র	শিবপূজা	...	৪ দিন	৫০০
†৬৩	”	”	২১	জাগ্‌লাই	মাঘ	ব্রহ্মদৈত্য মেলা	...	৪ দিন	২,০০০
†৬৪	”	”	৩০	মোড়গ্রাম	ফাল্গুন	কমলেকামিনীপূজা	...	৮ দিন	১,০০০
‡৬৫	”	”	৩১	বেলোরিয়া	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৭ দিন	...
‡৬৬	”	”	৩৭	পাউলী	চৈত্র	চড়ক	”	১ দিন	...
*৬৭	”	”	৪৬	মণিগ্রাম	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	২০০ বৎসর	৬ দিন	৫,০০০-৭,০০০
†৬৮	”	”	৬২	বোখারা	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	...	৯ দিন	৯০০
†৬৯	”	”	৮৯	সাগরদীঘি	পৌষ	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	...	৮ দিন	১,২০০
†৭০	”	”	৯৬	সমসাবাদ	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরজীউর পূজা	প্রাচীন	৭ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৭১	”	”	১৩৫	নওপাড়া	কার্তিক	কালীপূজা	৯০ বৎসর	১ দিন	...
‡৭২	”	”	”	”	অগ্রহায়ণ	রাসযাত্রা	প্রাচীন	৪ দিন	৪০০-৫০০
†৭৩	”	”	১৩৭	বাংশিয়া	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	...	৭ দিন	১,২০০
‡৭৪	”	”	১৩৮	বিষ্ণুপুর	ফাল্গুন	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	১৫ বৎসর	৮ দিন	৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৭৫	মুর্শিদাবাদ	সাগরদীঘি	১৫৩	বালানগর	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	১,৫০০
†৭৬	"	"	...	মথুরাপুর	পৌষ	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	...	৯ দিন	২৫০
*৭৭	"	লালগোলা	১৭	দেওয়ান সরাই	...	মহরম	...	...	...
†৭৮	"	"	৪৯	শ্যামপুর	পৌষ	অনন্তশয্যা	...	৪ দিন	২০০
‡৭৯	"	"	৬৬	যশাইতলা	বৈশাখ	যশাই কালীপূজা	প্রাচীন	...	...
‡৮০	"	"	৬৭	জোতভিখান	...	মহরম	প্রাচীন	২ দিন (পৃথকভাবে)	৩,০০০
‡৮১	"	"	৭৫	রামচন্দ্রপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
*৮২	"	"	৮০	লালগোলা	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	১ মাস	৫,০০০-৬,০০০
‡৮৩	"	"	৯৪	ব্রহ্মোত্তর মাণিকচক্	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৬ বৎসর	৩ দিন	...
‡৮৪	"	"	"	"	পৌষ	মনসাপূজা	১২ বৎসর	৭ দিন	১০০
‡৮৫	"	ভগবানগোলা	১	দেবীপুর	মাঘ	কৃষ্ণজননীপূজা	৫০ বৎসর	৭ দিন	৬,০০০-৭,০০০
*৮৬	"	"	৬	ভগবানগোলা	পৌষ	দাতা পীরের উরস্	বহু কালের প্রাচীন	৮ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৮৭	"	"	১১	সুন্দরপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	১ দিন	৫৫০
†৮৮	"	"	"	"	ফাল্গুন	রামনবমী	...	১ দিন	৩০০
†৮৯	"	"	১৫	ললিতাকুড়ি	মাঘ	মকর সপ্তমী	...	১ দিন	৫০০
‡৯০	"	"	৭৯	রানীতলা	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১ বৎসর	৪ দিন	...
‡৯১	"	"	১০৫	গিরিধারীপুর	আষাঢ়	গঙ্গাপূজা	বহু কালের প্রাচীন	৭ দিন	৫০০-৬০০
†৯২	"	"	১১১	গোপীরামপুর	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	...	১ দিন	৩৫০
†৯৩	"	"	১২০	হরিরামপুর	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	...	১ দিন	৭০০
†৯৪	"	"	...	টেক্পাড়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	২৫০

*৯৫	মুর্শিদাবাদ	রানীনগর	৩৩	চাতরা	কার্তিক	কালীপূজা	৫০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০
‡৯৬	"	"	৫৬	চক্গ্রাম	কার্তিক	কালীপূজা	...	৪-৫ দিন	৫,০০০-৬,০০০
†৯৭	"	"	৬৯	গোয়াস	ফাল্গুন	রামনবমী	...	২ দিন	১,০০০
*৯৮	"	জিয়াগঞ্জ	৩	সাদেকবাগ	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	৯ দিন	১,৫০০-২,০০০
†৯৯	"	"	৬	জিয়াগঞ্জ বাজার	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	১ দিন	৫০০
†১০০	"	"	"	"	আষাঢ়	দশহরা	...	১ দিন	১,০০০
*১০১	"	"	১৩	নেহালিয়া	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	২০০ বৎসর	৫ দিন	৪,০০০-৫,০০০
*১০২	"	"	১৪	সৌধগঞ্জ	চৈত্র	কমলেকামিনীপূজা	৫০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
*১০৩	"	"	৩৯	আজিমগঞ্জ	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০-২,৫০০
‡১০৪	"	মুর্শিদাবাদ	৪১	কুমারপুর	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	২৫০ বৎসর	...	...
†১০৫	"	"	৪৪	লালবাগ	...	মহরম	...	৫ দিন	১০,০০০
*১০৬	"	"	৫২	মুর্শিদাবাদ শহর	ভাদ্র	বেরা উৎসব	২৫০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০-১২,০০০
†১০৭	"	"	৬৩	নশীপুর	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	...	৫ দিন	৩,০০০
‡১০৮	"	"	৮৭	কুমিরদহ	মাঘ	শিবপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৬০০-৫০০
‡১০৯	"	"	১০৩	বাটী	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	৮ দিন	২,৫০০
‡১১০	"	নবগ্রাম	২৩	পাঁচগ্রাম	কার্তিক	গোষ্ঠাষ্টমী	৫০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡১১১	"	"	"	"	পৌষ	শ্যামসুন্দরজীউরপূজা	১০ বৎসর	২০ দিন	১,০০০
†১১২	"	"	২৯	জুয়ানকান্দি	চৈত্র	চৈত্রসংক্রান্তি	...	১২ দিন	৫০০
†১১৩	"	"	৬৭	হিজরোল	ফাল্গুন	শ্যামচাঁদপূজা	...	১২ দিন	৫০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†১১৪	মুর্শিদাবাদ	নবগ্রাম	৬৮	ঈশানপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৮ দিন	৫০০
†১১৫	"	"	৭৪	মহরুল	ফাল্গুন	শ্যামচাঁদপূজা	...	১৫ দিন	২,০০০
‡১১৬	"	"	৭৯	অমরকুণ্ড	শ্রাবণ	গঙ্গাদিত্যপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
*১১৭	"	"	১০১	কিরীটেশ্বরী	পৌষ	কিরীটেশ্বরীপূজা	২৫০ বৎসর	৮ দিন	৫,০০০-৬,০০০
†১১৮	"	"	...	বেলেলে	ফাল্গুন	শ্যামচাঁদপূজা	...	১৫ দিন	২,০০০
‡১১৯	"	জলঙ্গী	৪	কুমারপুর	মাঘ	শিবপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	.
‡১২০	"	"	১৯	নরসিংহপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৪-৫ বৎসর	৪ দিন	...
‡১২১	"	"	২১	বারমাশিয়া	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡১২২	"	"	"	"	চৈত্র	শিবপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	...
‡১২৩	"	"	৩৭	সাদিখাঁর দিয়ার	বৈশাখ	কালীপূজা (রক্ষাকালী)	৩০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০-১,৫০০
†১২৪	"	"	...	কালীতলা	বৈশাখ	বার মেলা	...	১ দিন	১,০০০
†১২৫	"	"	...	দরগাতলা জলঙ্গী)	জ্যৈষ্ঠ	দরগাতলার মেলা	...	১ দিন	৬০০
†১২৬	"	"	...	জলঙ্গী	...	মহরম	...	১ দিন	৩০০
†১২৭	"	ডোমকল	১৫	জিতপুর	কার্তিক	কালীপূজা	...	৪ দিন	১,০০০
*১২৮	"	"	২০	দাসের চক্	বৈশাখ	মস্তরাম আউলিয়ার আবির্ভাব উৎসব	১০০ বৎসর	প্রতি মঙ্গলবার	৩,০০০-৫,০০০
†১২৯	"	"	৩০	কাটাকোপরা	চৈত্র	চড়ক	...	১৫ দিন	৮০০
‡১৩০	"	"	৪৬	ভগীরথপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	...
*১৩১	"	নওদা	৫	আলমপুর	আষাঢ়	নারায়ণপূজা	...	৫ দিন	১,৫০০
‡১৩২	"	"	"	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৩০ বৎসর	৫ দিন	২,০০০-৩,০০০

✱১৩৩	মুর্শিদাবাদ	নওদা	১০	বালী	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
✝১৩৪	”	”	৩৬	পাটিকাবাড়ী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৯ দিন	৫০০
‡১৩৫	”	হরিহরপাড়া	৯	রায়পুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	৫ দিন	...
‡১৩৬	”	”	১৭	নিশ্চিন্তপুর	বৈশাখ	কালীপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	২,০০০
‡১৩৭	”	”	”	”	জ্যৈষ্ঠ	সর্বমঙ্গলাপূজা	১০০ বৎসর	৬ দিন	২,০০০-৩,০০০
✱১৩৮	”	”	৩০	রুকুনপুর	বৈশাখ	কালীপূজা	১৫০ বৎসর	৪ দিন	৩,০০০
‡১৩৯	”	”	”	”	পৌষ	পৌষালী উৎসব	...	১ দিন	...
‡১৪০	”	”	”	”	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	২০০ বৎসর	৪ দিন	১,০০০
‡১৪১	”	”	”	”	”	অন্নপূর্ণাপূজা	৫ বৎসর	৪ দিন	৩০০-৪০০
✱১৪২	”	”	৩৪	হোসেনপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৭ দিন	২০০
✱১৪৩	”	”	৩৯	রামকৃষ্ণপুর	কার্তিক	কালীপূজা	২৫০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০
‡১৪৪	”	”	৫৪	স্বরূপপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	২ দিন	১,৫০০
‡১৪৫	”	”	”	”	কার্তিক	কার্তিকপূজা	১০ বৎসর	১০ দিন	...
✝১৪৬	”	”	...	তাজপুর	...	মহরম	...	১ দিন	৩০০
✱১৪৭	”	বেলডাঙ্গা	৩	মহুলা	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	২৫ বৎসর	১ দিন	২,০০০
✝১৪৮	”	”	”	”	পৌষ	উত্তরন্তী উৎসব	...	১ দিন	২০০
✱১৪৯	”	”	৭	ভাবতা	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	৬৭ বৎসর	১ দিন	...
✝১৫০	”	”	”	”	পৌষ	উত্তরন্তী উৎসব	...	১ দিন	২০০

✱ ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✝ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡১৫১	মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা	১৫	নওদা	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡১৫২	"	"	"	"	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	"	৪ দিন	১,০০০
‡১৫৩	"	"	২৭	দলুয়া	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	...
‡১৫৪	"	"	"	"	...	মহরম	...	১ দিন	১,০০০
‡১৫৫	"	"	"	"	...	চেহলাম পরব	প্রাচীন	১ দিন	...
‡১৫৬	"	"	২৯	নলকুণ্ড	চৈত্র	গাজন	৩৫০ বৎসর	১ দিন	৩০০
†১৫৭	"	"	৪৪	কুমারপুর	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	...	১৪ দিন	২০০
‡১৫৮	"	"	৫০	বেনাদহ	চৈত্র	গাজন	২৫০ বৎসর	৫ দিন	...
‡১৫৯	"	"	৫১	বেলডাঙ্গা	জ্যৈষ্ঠ	মহোৎসব	২০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
†১৬০	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	২০০
‡১৬১	"	"	"	"	কার্তিক	কালীপূজা	১৫০ বৎসর	৭ দিন	...
†১৬২	"	"	"	"	"	কার্তিকপূজা	...	১ দিন	২০০
†১৬৩	"	"	"	"	পৌষ	গঙ্গাস্নান	...	১ দিন	২০০
‡১৬৪	"	"	৫৪	মাণিকনগর	চৈত্র	চড়ক	বহু কালের প্রাচীন	৭ দিন	৫,০০০-৬,০০০
†১৬৫	"	"	"	"	বৈশাখ	মহোৎসব	...	১ দিন	৩০০
‡১৬৬	"	"	৫৮	আণ্ডিরণ	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	...
†১৬৭	"	"	৫৯	সরুলিয়া	...	মহরম	...	১ দিন	৩০১
‡১৬৮	"	"	৬১	মহম্মদপুর	মাঘ	উত্তরায়ণ	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡১৬৯	"	"	৬৪	মির্জাপুর	চৈত্র	নীলপূজা	"	৭ দিন	৫০০-৬০০
†১৭০	"	"	৭৯	শক্তিপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৪ দিন	৫০০
‡১৭১	"	"	১০৩	কাদখালি	মাঘ	উত্তরায়ণ	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০

‡১৭২	মুর্শিদাবাদ	বেলডাঙ্গা	১০৩	কাদখালি	...	মহরম	২০ বৎসর	১ দিন	...
‡১৭৩	”	”	১০৪	রামনগর	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৭০০-৮০০
†১৭৪	”	”	১০৮	মাঙ্গন পাড়া	পৌষ	গঙ্গাস্নান	...	১ দিন	- ৩০০
‡১৭৫	”	”	১১০	রামপাড়া	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৬০০
‡১৭৬	”	”	”	”	...	ফরিদ সাহেবের উরস্	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	...
‡১৭৭	”	”	১২০	নওপুখুরিয়া	বৈশাখ	মা-ভুমনীপূজা	৫০০ বৎসর	৮ দিন	...
‡১৭৮	”	”	১০৭	শুকুরপুকুর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৩০০-৪০০
‡১৭৯	”	বহরমপুর	২১	আন্দারমাণিক	বৈশাখ	শীতলাপূজা	১৫০ বৎসর	১ মাস কাল	৫,০০০-৬,০০০
‡১৮০	”	”	২২	বাসুদেবখালি	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡১৮১	”	”	২৩	জগন্নাথপুর	জ্যৈষ্ঠ	মাদার পীরের উরস্	প্রাচীন	১ দিন	...
‡১৮২	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৮০ বৎসর	৩ দিন	২০০-২৫০
‡১৮৩	”	”	৩১	আরোয়া	ভাদ্র	কালীপূজা	৫ বৎসর	১ দিন	...
‡১৮৪	”	”	৬১	সুঙ্গাই	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	৭ দিন	২০০-২৫০
‡১৮৫	”	”	৭৬	নওদাপাহুর	আষাঢ়	মনসাপূজা	...	৪ দিন	...
‡১৮৬	”	”	”	”	চৈত্র	চড়ক	৫২ বৎসর	১ দিন	২০০
‡১৮৭	”	”	৮২	কয়া	বৈশাখ	কালীপূজা	৫-৬ বৎসর	১ দিন	১,৫০০-২,০০০
*১৮৮	”	”	৯৩	বিষ্ণুপুর	পৌষ	কালীপূজা	২৫০ বৎসর	৩০ দিন	১০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†১৮৯	মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর	...	বহরমপুর	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	...	৩ দিন	১০,০০০
†১৯০	”	”	...	চৌরীগাছা	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	...	১ দিন	১,০০০
†১৯১	”	”	...	বসন্ততলা	বৈশাখ	শীতলাপূজা	...	৮ দিন	৫০০
†১৯২	”	”	...	কারবালা	...	মহরম	...	১ দিন	১,০০০
	”	”	...	”	পৌষ	চল্লিশা	...	১ দিন	১,০০০
†১৯৩	”	খড়গ্রাম	৯	নোনাডাঙ্গা	পৌষ	শ্যামসুন্দরদেবপূজা	...	১ দিন	২০০
‡১৯৪	”	”	৩০	জয়পুর	বৈশাখ	সিদ্ধেশ্বরীপূজা	বহু কালের প্রাচীন	...	...
‡১৯৫	”	”	৪০	ইন্দ্রানী	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
‡১৯৬	”	”	৭৯	মহম্মদপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
†১৯৭	”	”	৮৫	নগর	পৌষ	দাদা পীরের উৎসব	...	৩০ দিন	২,০০০
‡১৯৮	”	”	৮৮	মাড়গ্রাম	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	...
†১৯৯	”	”	১০৩	এরোয়ালী	কার্তিক	কালীপূজা	...	২ দিন	৬০০
‡২০০	”	”	১১৪	গুরুলিয়া	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡২০১	”	”	১৩৮	কালগ্রাম	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৪ দিন	১,২০০
‡২০২	”	”	১৪৫	মহীসার	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	২ দিন	২০০
†২০৩	”	”	...	মনসাতলা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	...	১৫ দিন	৩০০
‡২০৪	”	কান্দী	৩	বাহাদুরপুর	চৈত্র	চড়ক	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	...
†২০৫	”	”	২০	মহালন্দী	আষাঢ়	মেথরের মেলা	...	১ দিন	২,০০০
‡২০৬	”	”	২৩	আমুয়া	চৈত্র	চড়ক	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡২০৭	”	”	২৬-২৭	উগরা-ভাটপাড়া	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	৬ বৎসর	৪ দিন	১,২০০

‡২০৮	মুর্শিদাবাদ	কান্দী	৩৪	জিয়াদারা	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	৩ দিন	...
‡২০৯	"	"	৫৩	চাঁদনগর	বৈশাখ	গ্রামদেবীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡২১০	"	"	"	"	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৭৫ বৎসর	৫ দিন	১,৫০০
†২১১	"	"	৬৩	কান্দী	কার্তিক	রাসপূর্ণিমা	...	১ দিন	৩,০০০
†২১২	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৭০০
†২১৩	"	"	"	"	"	উল্টোরথ	...	১ দিন	৭০০
†২১৪	"	"	"	"	আশ্বিন	বিজয়া দশমী	...	১ দিন	১,০০০
‡২১৫	"	"	৬৭	যশহরি	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	...
‡২১৬	"	"	৭৫	মহাদেববাটী	ভাদ্র	বামনদেবপূজা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৭০০
‡২১৭	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	...
*২১৮	"	"	৮৪	দোহালিয়া	আশ্বিন	কালীপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০,০০০
‡২১৯	"	"	৮৫	রূপপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
*২২০	"	"	"	"	চৈত্র	রুদ্রদেবের গাজন	২০০ বৎসর	২ দিন	৫,০০০
†২২১	"	"	৮৮	বোয়ালিয়া	বৈশাখ	ফকির সাহেবের উৎসব		২ দিন	৬০০
‡২২২	"	"	৮৯	রসড়া	চৈত্র	চড়ক	৩০০ বৎসর	১ দিন	...
†২২৩	"	"	৯৩	জেমো বাজার	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	২,০০০
‡২২৪	"	"	৯৭	আন্দুলিয়া	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	বহু কালের প্রাচীন	৭ দিন	...

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡২২৫	মুর্শিদাবাদ	কান্দী	২৭	আন্দুলিয়া	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
*২২৬	"	বরঞা	১	ঝিকরহাটী	ভাদ্র	মনসাপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡২২৭	"	"	২	কালিকাপুর	মাঘ	ব্রহ্মময়ীপূজা	৫ বৎসর	১৫ দিন	৫,০০০
*২২৮	"	"	৩	শীতলগ্রাম	ভাদ্র	মনসাপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	৫০০-৬০০
‡২২৯	"	"	৬	সিদ্ধেশ্বরী	আষাঢ়	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	৭ দিন	১,০০০
†২৩০	"	"	১২	কুণ্ডল	মাঘ	শ্যামচাঁদদেব	...	৭ দিন	৩,০০০
†২৩১	"	"	২৯	থারজুনা	মাঘ	"	...	১৫ দিন	৩,০০০
‡২৩২	"	"	৩৬	কুলী	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	২ দিন	১,০০০
‡২৩৩	"	"	৪২	সাবলদহ	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	৬০০
*২৩৪	"	"	৫৬	বরঞা	ফাল্গুন	পীরশাহ আলমগীরের উরস্	১২-১৩ বৎসর	১৫ দিন	১,০০০
‡২৩৫	"	"	৫৭	শিমুলিয়া	পৌষ	কালীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡২৩৬	"	"	৭৫-৭৭	কোঁচবাধা-বাঁশবেড়ে-হাপিনা	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	...	...	...
†২৩৭	"	"	৭৯	যুগেশ্বর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	১৫ দিন	৫০০
‡২৩৮	"	"	৯১	সাহোড়া	জ্যৈষ্ঠ	"	৩৩ বৎসর	৪ দিন	৩,০০০-৪,০০০
†২৩৯	"	"	৯৯	ভাস্তোড়	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	...	৭ দিন	২,০০০
‡২৪০	"	"	১০৩	মান্দ্রা	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	৩ দিন	১,২০০
‡২৪১	"	"	১২৬	কেশের পাহাড়	মাঘ	নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব	...	১৫ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†২৪২	"	"	১৩৪	মাসাড্ডা	চৈত্র	শিবপূজা	...	২ দিন	৭০০
‡২৪৩	"	"	১৪৯	পাঁচথুপি	মাঘ	নিত্যানন্দপ্রভুর আবির্ভাব	১০০ বৎসর	১৫ দিন	...

‡২৪৪	মুর্শিদাবাদ	বরঞা	১৫১	মালিয়ান্দি	পৌষ	লক্ষ্মীনারায়ণপূজা	১৫০ বৎসর	৪ দিন	৯০০
+২৪৫	"	ভরতপুর	২	গুণানন্দবাটী	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	...
+২৪৬	"	"	৫	বৈদ্যপুর(?)	জ্যৈষ্ঠ	ধর্মরাজপূজা	...	১ দিন	৫০০
‡২৪৭	"	"	৮	শক্তিপুর	বৈশাখ	ক্ষেপাবাবাজীর আবির্ভাব	প্রাচীন	৩ দিন	...
+২৪৮	"	"	৯	জজান	বৈশাখ	সর্বমঙ্গলাপূজা	...	১৮ দিন	৫০০
‡২৪৯	"	"	১১	সরডাঙ্গা	চৈত্র	পীরের উরস্	সম্প্রতি	২ দিন	...
‡২৫০	"	"	১৭	গুন্দিরিয়া	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡২৫১	"	"	৩৬	জাখনী	বৈশাখ	চণ্ডীপূজা	৩০০ বৎসর	২-৩ দিন	৩০
+২৫২	"	"	৪২	তালগ্রাম	চৈত্র	আদিত্য উৎসব	...	১৪ দিন	৪,০০০
‡২৫৩	"	"	৪৪ }	গড্ডা	মাঘ	সরস্বতীপূজা	৫০ বৎসর	৪ দিন	৪০০
			৪৫ }	সিংহারি	...	...	...	...	...
+২৫৪	"	"	৫১	সাহাবাজপুর	চৈত্র	খেলারাম বাবাজীর মেলা	...	১৪ দিন	৪,৫০০
‡২৫৫	"	"	৫৪	স্বর্ণহাটী	বৈশাখ	মহোৎসব	...	১ দিন	...
‡২৫৬	"	"	৬৮	ভরতপুর	জ্যৈষ্ঠ	গদাধর পণ্ডিতের তিরোভাব	২৫০ বৎসর	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡২৫৭	"	"	৭৯	কড়েয়া	আষাঢ়	ধর্মরাজপূজা	৫০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
+২৫৮	"	"	৮১	সিজগ্রাম	চৈত্র-বৈশাখ	পীরের উরস্	...	১ দিন	৩,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

+ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†২৫৯	মুর্শিদাবাদ	ভরতপুর	৮৩	সৈয়দ কুলুটিয়া	ফাল্গুন	পীরের উরস্	...	১৪ দিন	২,০০০
†২৬০	"	"	৯২	সিমুলিয়া	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৫,০০০
‡২৬১	"	"	৯৩	এড়েরা	বৈশাখ	যোগাদ্যাপূজা	...	১ দিন	...
‡২৬২	"	"	"	"	চৈত্র	কালীপূজা	...	২ দিন	১,০০০-১,২০০
‡২৬৩	"	"	"	"	...	মহরম	...	...	...
*২৬৪	"	"	৯৫	জাউলিয়া	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৪ দিন	৫০০-৬০০
‡২৬৫	"	"	৯৬	সোনারুন্দী	মাঘ	বাউলদাসের উৎসব	প্রাচীন	৪ দিন	...
†২৬৬	"	"	১০৩	হামিদহাটি	বৈশাখ	পীরের উরস্	...	৫ দিন	৭০০
‡২৬৭	"	"	১০৪	কাগ্রাম	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১৫০ বৎসর	২ দিন	...
*২৬৮	"	"	১০৭	তালিবপুর	ফাল্গুন	পীরের উরস্	৩০ বৎসর	৭ দিন	৫,০০০
*২৬৯	"	"	১১৩	মালিহাটী	চৈত্র	রাধামোহন গোস্বামীর তিরোভাব	১৫০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
*২৭০	"	"	১১৬	উজুনিয়া শিশুয়া	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৩৫০ বৎসর	১ দিন	২,৫০০
*২৭১	"	"	"	"	চৈত্র	নীলপূজা	...	১ দিন	...
‡২৭২	"	"	১২৭	কাঞ্চন গড়িয়া	মাঘ	রাধামোহনজীউর উৎসব	প্রাচীন	৪ দিন	১,৫০০
‡২৭৩	"	"	১৩৬	বৈদ্যপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	...	১ দিন	...
				পুরগ্রাম (?)	বৈশাখ	ধর্মরাজ	প্রাচীন	...	৫,০০০
†২৭৪	নদীয়া	কৃষ্ণনগর	১০	বেলপুকুর	ফাল্গুন	গণেশপূজা	...	৫ দিন	৫,০০০
‡২৭৫	"	"	১১	সোনাডাঙ্গা	...	মহরম	৩০-৪০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡২৭৬	"	"	২৩	চুয়াখালী	চৈত্র	চড়ক	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০

‡২৭৭	নদীয়া	কৃষ্ণনগর	২৪	কুলদহ	বৈশাখ	কালীপূজা	২০০ বৎসর	...	...
‡২৭৮	”	”	”	”	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২৫ বৎসর	...	...
†২৭৯	”	”	”	”	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	১৫ বৎসর	...	...
†২৮০	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
†২৮১	”	”	৫৪	সুবর্ণবেহার	চৈত্র	গাজন	...	...	...
†২৮২	”	”	”	হরিশপুর	মাঘ	পঞ্চানন্দপূজা	২০০ বৎসর	৩-৪ দিন	...
†২৮৩	”	”	”	দেপাড়া	বৈশাখ	নৃসিংহদেবপূজা	২৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
†২৮৪	”	”	৬৮	আনন্দবাস	জ্যৈষ্ঠ	দশহরা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
†২৮৫	”	”	”	ভালুক	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪-৫ বৎসর	১ দিন	৫০০
*২৮৬	”	”	৯২	কৃষ্ণনগর	চৈত্র	বারদোল	২০০ বৎসর	১ মাস	১৫,০০০
‡২৮৭	”	”	৯৫	ঘূর্ণী	চৈত্র	চড়ক	...	...	...
‡২৮৮	”	”	”	”	...	ধর্মরাজপূজা	..	...	...
‡২৮৯	”	”	১২৬	আশাননগর	আষাঢ়	অম্বুবাচী	৩৫ বৎসর	৩ দিন	...
‡২৯০	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১৯৫৬ খৃঃ	...	...
‡২৯১	”	”	”	”	পৌষ	কৃষি-শিল্প প্রদর্শনী মেলা	১৯৫৬ খৃঃ	৭ দিন	...
*২৯২	”	নবদ্বীপ	২০	নবদ্বীপ	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	...	১,০০,০০০
†২৯৩	”	”	...	মাঝের চর	ফাল্গুন	ধর্মীয়	...	১১ দিন	১,০০০
†২৯৪	”	”	...	হুলোরঘাট	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৭ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
+২৯৫	নদীয়া	নবদ্বীপ	...	শ্রীমায়াপুর	ফাল্গুন	পরিক্রমা উৎসবের মেলা	...	৩ দিন	২,০০০
‡২৯৬	"	চাপড়া	১	হাতীশালা	কার্তিক	রাসযাত্রা	৪০ বৎসর	৪ দিন	৫০০
‡২৯৭	"	"	৪৩	কল্যাণদহ	চৈত্র	চড়ক	১০ বৎসর	১ দিন	৫০০-৭০০
‡৩৯৮	"	"	৭১	জলকর মহরাপুর	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡২৯৯	"	"	"	"	চৈত্র	শিবপূজা	...	৭ দিন	...
‡৩০০	"	"	৭৯	মহেশপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২০-২৫ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৩০১	"	"	১০০	দৈয়ের বাজার	আষাঢ়	পরিক্ষিৎ অধিকারী-বাবার আবির্ভাব উৎসব	১৫০ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৩০২	"	কৃষ্ণগঞ্জ	২	দিগাম্বরপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	১,২০০
+৩০৩	"	"	২৫	চন্দননগর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৭ দিন	১,০০০
+৩০৪	"	"	৩৭	শিবনিবাস	মাঘ	ভীম একাদশী	...	৩ দিন	৩,০০০
‡৩০৫	"	"	৩৯	কৃষ্ণগঞ্জ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	১০,০০০-১৫,০০০
+৩০৬	"	"	৪৭	মালীঘাট	চৈত্র	চড়ক	...	...	...
+৩০৭	"	"	৫২	মাটিয়ারী	আষাঢ়	পীরের উরস্	...	১৫ দিন	৫,০০০
‡৩০৮	"	"	৫৫	টুঙ্গী	চৈত্র	চড়ক	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	১,৫০০
‡৩০৯	"	"	৫৮	খাটুরা	আষাঢ়	অম্বুবাচী	...	১ দিন	১,৫০০
‡৩১০	"	"	৬৪	ননাগঞ্জ	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	...
‡৩১১	"	নাকাশীপাড়া	১৪	আকন্দডাঙ্গা	...	মহরম	৪০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
*৩১২	"	"	৫৩	ব্রহ্মাণীতলা	শ্রাবণ	ব্রহ্মাণীপূজা	১০০ বৎসর	৬-৭ দিন	৫,০০০

*৩১৩	নদীয়া	নাকাসীপাড়া	৫৮	গোটপাড়া	জ্যৈষ্ঠ	গোপীনাথদেবের স্নানযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	৭ দিন	১৫,০০০-১৬,০০০
*৩১৪	"	"	৬৫	ভেবুয়াডাঙ্গা গঙ্গার ঘাট	মাঘ	মকরস্নান	২১ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৩১৫	"	"	৭৬	নাঙ্গলা	আষাঢ়	অম্বুবাচী	...	২ দিন	১,৫০০
‡৩১৬	"	"	"	"	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	...	...
†৩১৭	"	"	৭৭	বাড়ীপাড়া	আষাঢ়	কাটাপীরের উরস্	...	১ দিন	১,০০০
‡৩১৮	"	"	৮২	ধনঞ্জয়পুর	...	মহরম	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৩১৯	"	"	৯৭	দোগাছিয়া	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০
*৩২০	"	"	১০২	মুরাগাছা	চৈত্র	সর্বমঙ্গলাদেবীরপূজা	১১৯৭ সন হইতে	১৫ দিন	২,০০০
†৩২১	"	"	...	ধানচিপুর	...	মহরম	...	১ দিন	১,০০০
†৩২২	"	কালীগঞ্জ	৪	পলাশী	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
‡৩২৩	"	"	৩৭	হাটগাছা	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	...	...
‡৩২৪	"	"	"	"	...	মহরম	"	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
†৩২৫	"	"	৮৯	মাটিয়ারী	চৈত্র	রামনবমী	...	৬-৭ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৩২৬	"	"	৯২	কামদেবপুর	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৩২৭	"	"	১০৫	মহুরাপুর	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	১০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৩২৮	"	"	১২৩	বড়চাঁদঘর	বৈশাখ	যশদায়িনীপূজা	১২৫ বৎসর	১ দিন	৫০০-১,০০০
‡৩২৯	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	...	...

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৩৩০	নদীয়া	কালীগঞ্জ	১২৩	বড়চাঁদঘর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	...	...
‡৩৩১	"	"	"	"	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	...	...
‡৩৩২	"	"	"	"	চৈত্র	হরিঠাকুরের আবির্ভাব	৪ বৎসর	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
†৩৩৩	"	"	"	জুরানপুর কালীতলা	মাঘ	মাঘী পূর্ণিমা	...	১ দিন	৪,০০০
‡৩৩৪	"	তেহট্ট	২১	বাওর	পৌষ	পৌষপার্বণ	১৬ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৩৩৫	"	"	৭৬	ইলশামারী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতি	২ দিন	১০,০০০
‡৩৩৬	"	করিমপুর	২	ধোড়াদহ	চৈত্র	রামনবমী	১০০ বৎসর	১১ দিন	১,০০০
‡৩৩৭	"	"	৬	করিমপুর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	...	৩-৪ দিন	...
*৩৩৮	"	"	৩৭	থানাপাড়া	পৌষ	জঙ্গলী পীরের উরস্	২০০ বৎসর	৭ দিন	১০,০০০
‡৩৩৯	"	"	৪৯	মুরুটিয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	১৫ দিন	...
*৩৪০	"	"	১১৯	শিকারপুর	চৈত্র	বাসন্তীপূজা	১৫-১৬ বৎসর	৭ দিন	...
*৩৪১	"	"	১২৩	ফুলখালি	চৈত্র	বারুণীস্নান	৪০ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
*৩৪২	"	"	১২৯	সুন্দলপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৬০-৭০ বৎসর	৩ দিন	২০০
‡৩৪৩	"	রানাঘাট	৪	তাহেরপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০-১২ বৎসর	...	১০,০০০
*৩৪৪	"	"	১৯	উলাবীরনগর	বৈশাখ	উলাইচণ্ডীপূজা	বহুকালের প্রাচীন	৪ দিন	৩,০০০
‡৩৪৫	"	"	২৯	মুগরাইল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	২-৩ দিন	২০০
‡৩৪৬	"	"	৩৯	বাহিরগাছি	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	১,০০০
*৩৪৭	"	"	৪৯	আড়ংঘাটা	জ্যৈষ্ঠ	যুগলকিশোরের স্নানযাত্রা	২২৫ বৎসর	১ মাস	১০,০০০
‡৩৪৮	"	"	৮২	শ্রীরামপুর	চৈত্র	চড়ক	...	...	...

‡৩৪৯	নদীয়া	রানাঘাট	৯৪	আইসমালী	কার্তিক	রাসযাত্রা	৫-৬ বৎসর	৪-৫ দিন	...
‡৩৫০	”	”	১০৬	ঘোলা	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	৫-৬ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৩৫১	”	”	১১৬	হবিবপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	...
‡৩৫২	”	”	”	”	মাঘ	এ্যালার উৎসব	...	...	...
‡৩৫৩	”	”	”	”	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	...	...	...
‡৩৫৪	”	”	”	”	মাঘ	নেতাজী জন্মোৎসব	...	...	...
‡৩৫৫	”	”	”	”	ফাল্গুন	পঞ্চম দোলযাত্রা	...	...	...
‡৩৫৬	”	”	১২৫	মাঝদিয়া	মাঘ	পীরের উরস্	২০০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
‡৩৫৭	”	”	১৮২	কামারগড়িয়া	শ্রাবণ	পীরের উরস্	৫০-৬০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
*৩৫৮	”	চাকদহ	২২	চাকদহ	মাঘ	গণেশজননীপূজা	২০০ বৎসর	১৫ দিন	৫,০০০-৭,০০০
*৩৫৯	”	”	২৪	যশড়া	জ্যৈষ্ঠ	জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা	৪০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
‡৩৬০	”	”	”	”	মাঘ	মাঘীপূর্ণিমা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	২০,০০০
‡৩৬১	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
†৩৬২	”	”	৩৮	চান্দুরিয়া	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	...	১ দিন	৩,০০০
*৩৬৩	”	”	৩৯	কালীগঞ্জ	মাঘ	রাজরাজেশ্বরীপূজা	১২৯৩ সন	৭ দিন	১০,০০০-১২,০০০
*৩৬৪	”	”	৬৩	ঘোষপাড়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	৭ দিন	৫০,০০০
‡৩৬৫	”	”	৭৮	চাঁদমারী	মাঘ	পীরের উরস্	১০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*৩৬৬	নদীয়া	চাকদহ	৮৩	শ্রীপাটকুলিয়া	অগ্রহায়ণ	দেবানন্দঠাকুরের তিরোভাব	৪৫০ বৎসর	৩ দিন	...
‡৩৬৭	"	"	৯১	ঘোড়াগাছা	ফাল্গুন	পীরের উরস্	৩০০ বৎসর	৩ দিন	...
‡৩৬৮	"	"	৯৩	কুমারপুর	ফাল্গুন	পীরের উরস্	১৫০ বৎসর	১ দিন	...
*৩৬৯	"	"	৯৪	মদনপুর	ফাল্গুন	অষ্টম দোল	৬-৭ বৎসর	৭ দিন	২,০০০
†৩৭০	"	"	১০৫	শিমুরালী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৭ দিন	৫০০
‡৩৭১	"	"	১২৩	বেজপাড়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২৫০ বৎসর	১ দিন	২৫০-৩০০
*৩৭২	"	"	১২৯	ঘেটুগাছি	অগ্রহায়ণ	ধর্মরাজপূজা	১৫০ বৎসর	১০ দিন	২,০০০
†৩৭৩	"	"	১৩০	গোটেরা	অগ্রহায়ণ	ধর্মরাজপূজা	...	৭ দিন	৫০০
‡৩৭৪	"	"	১৪১	শিবপুর	ফাল্গুন	পীরের উরস্	প্রাচীন	৩ দিন	...
*৩৭৫	"	"	১৫২	মথুরাগাছি	শ্রাবণ	খেদাইঠাকুরপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	৫০,০০০
‡৩৭৬	"	"	১৬১	নেউলিয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	১১৬৫ সন	২ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৩৭৭	"	"	১৬৫	চাকুডাঙ্গা	শ্রাবণ	মনসাপূজা	...	...	..
‡৩৭৮	"	"	১৮৩	শ্রীনগর	মাঘ	পীরের উরস্	৬০-৭০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
*৩৭৯	"	হরিণঘাটা	৪	বিরহী	কার্তিক	ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	৪০০ বৎসর	২ দিন	২০,০০০
‡৩৮০	"	"	১২	উত্তর রাজাপুর	বৈশাখ	ফতেমাবিবির উরস্	১৫০ বৎসর	৩ দিন	৬০০-৭০০
*৩৮১	"	"	৩৭	কাঠডাঙ্গা	মাঘ	পীরের উরস্	প্রাচীন	৭ দিন	৪০০
‡৩৮২	"	"	৫৩	বড়জাগুলী	...	পঞ্চাননতলার মেলা	৫ বৎসর	১ দিন	৩০০-৪০০
†৩৮৩	"	"	৬৫	ফতেপুর	বৈশাখ	গোষ্টযাত্রা	...	১ দিন	২,০০০
†৩৮৪	"	"	৭৫	হরিপুখরিয়া	বৈশাখ	রবিপূজা	...	১ দিন	৫০০
‡৩৮৫	"		...	মোহনপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	১,৫০০

✣৩৮৬	নদীয়া	হরিণঘাটা	...	করমচাবেলিয়া	ফাল্গুন	পীরের উরস্	...	৩ দিন	৩,০০০
✣৩৮৭	„	„	...	মানিকতলা	পৌষ	পীরের উরস্	...	১ দিন	৫,০০০
✣৩৮৮	„	„	...	নগর-উকরা	চৈত্র	কালীপূজা	...	১ দিন	২,০০০
✣৩৮৯	„	হাঁসখালী	২৯	ময়ূরহাট	পৌষ	মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসব	...	৩ দিন	১৫,০০০
✣৩৯০	„	„	৩৮	দক্ষিণপাড়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	৪ দিন	১,০০০
‡৩৯১	„	„	৪৩	পাটুলি	মাঘ	কালীপূজা	সম্প্রতি	...	১,২০০
‡৩৯২	„	„	৪৪	বাদকুল্লা	অগ্রহায়ণ	মহোৎসব	২৫ বৎসর	১ দিন	...
✣৩৯৩	„	„	৫৩	হাঁসখালী	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	২,০০০
‡৩৯৪	„	„	৬০	মামজোয়ানী	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৩৯৫	„	শান্তিপুর	৮	চরপানপাড়া	মাঘ	উত্তরায়ণ	১৫০ বৎসর	১ দিন	১,২০০
*৩৯৬	„	„	১২	বাগআঁচড়া	ফাল্গুন	বাগদেবীপূজা	১৫০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৩৯৭	„	„	২২	শান্তিপুর	বৈশাখ	ব্রহ্মাপূজা	২০০ বৎসর	৬ দিন	৫,০০০
*৩৯৮	„	„	„	„	„	পীরের উরস্	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০
*৩৯৯	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	৭ দিন	১,০০০
✣৪০০	„	„	„	„	শ্রাবণ	ঝুলন	...	৩ দিন	১৫,০০০
✣৪০১	„	„	„	„	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	১০,০০০
✣৪০২	„	„	„	„	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	৫,০০০
*৪০৩	„	„	„	„	„	রাসযাত্রা	২৫০ বৎসর	৩০ দিন	৭০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে

✣ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৪০৪	নদীয়া	শান্তিপুর	২২	শান্তিপুর	কার্তিক	জগদ্ধাত্রীপূজা	...	২ দিন	২০,০০০
†৪০৫	”	”	”	”	মাঘ	সরস্বতীপূজা	...	১ দিন	১২,০০০
‡৪০৬	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৪০৭	”	”	”	”	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
*৪০৮	”	”	৩২	বাবলা	ফাল্গুন	পঞ্চমদোল	বহু কালের প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০
*৪০৯	”	”	৫৪	ফুলিয়া	ফাল্গুন	হরিদাস স্মৃতি মহোৎসব	২০০ বৎসর	১ দিন	৩,০০০
‡৪১০	”	”	৬৬	আড়বান্দি	ফাল্গুন	ব্রহ্মাপূজা	৩০০ বৎসর	৭ দিন	৫,০০০
†৪১১	হাওড়া	জগাছা	...	দাসনগর	ভাদ্র	জন্মাষ্টমী	...	৩০ দিন	১,০০০
†৪১২	”	”	...	সানপুর	ভাদ্র	জন্মাষ্টমী	...	১৫ দিন	১০,০০০
‡৪১৩	”	”	...	রামরাজাতলা	চৈত্র	রামনবমী	২০০ বৎসর	৩ মাস	...
‡৪১৪	”	পাঁচলা	৮	জুজারসাহা	চৈত্র	গাজন	৬০ বৎসর	৩ দিন	৬০০-৭০০
‡৪১৫	”	”	”	”	...	ধর্মরাজপূজা	৬০ বৎসর	৭ দিন	৮০০
‡৪১৬	”	”	১২	দেউলপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	১,০০০
‡৪১৭	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	৮০-৯০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪১৮	”	”	২৯	ভবানন্দপুর	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	...	...
‡৪১৯	”	”	৩০	বেলডুবি	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৪২০	”	”	৩১	বেলকুলাই	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	৬০০
‡৪২১	”	”	৩৩	সাহাপুর	চৈত্র	গাজন	৪০-৪৫ বৎসর	১ দিন	২৫০

‡৪২২	হাওড়া	জগৎবল্লভপুর	৪	জগৎবল্লভপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	২ দিন	৫০০-৬০০
‡৪২৩	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	৬০০-৭০০
*৪২৪	”	”	১৬	বামুনপাড়া	মাঘ	পীরের উরস্	বহুকালের প্রাচীন	৪ দিন	৫,০০০
‡৪২৫	”	”	১৯	নবাসন	মাঘ	পীরের উরস্	৩০ বৎসর	১ দিন	...
‡৪২৬	”	”	৩০	শ্যামপুর	চৈত্র	চড়ক	৩০ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
†৪২৭	”	”	৪৬	নিজবালিয়া	পৌষ	সিংহবাহিনীপূজা	...	১৫ দিন	৩,০০০
‡৪২৮	”	”	৫০	মানসিংহপুর	বৈশাখ	ফুলদোল	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫,০০০
‡৪২৯	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	১ দিন	...
‡৪৩০	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৩০ দিন	...
‡৪৩১	”	”	৫৭	সাদতপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...
‡৪৩২	”	”	৫৮	হাঁটলা অনন্তবাটী	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫০-৬০ বৎসর	১ দিন	...
‡৪৩৩	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৪৩৪	”	”	”	”	...	মনসাপূজা	১০০ বৎসর	...	...
‡৪৩৫	”	”	৫৯	শিয়ালডাঙ্গা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	৪ দিন	৫,০০০
‡৪৩৬	”	”	৬০	কুমারপুর	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
†৪৩৭	”	”	৬৪	সিদ্ধেশ্বর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	৭ দিন	৫,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৪০৮	হাওড়া	জগৎবল্লভপুর	...	মানিকপুর	পৌষ	পীরের উরস্	...	৪ দিন	৬০০
†৪৩৯	„	„	...	মুন্সীরহাট	পৌষ	পীরের উরস্	...	১৫ দিন	৫,০০০
†৪৪০	„	„	...	নস্করপুর	পৌষ	মহোৎসব	...	৪ দিন	১,০০০
‡৪৪১	„	ডোমজুড়	১৫	দক্ষিণ ঝাপড়দহ	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৪৪২	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৪৪৩	„	„	১৬	রুদ্রপুর	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৪৪৪	„	„	„	বাছুরগোট	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৪৪৫	„	„	১৭	ওয়াদিপুর	চৈত্র	গাজন	২৫০ বৎসর	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৪৪৬	„	„	২৫	বেগড়ী	চৈত্র	শীতলাপূজা	৪০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
‡৪৪৭	„	„	২৬	বানিয়াড়া	চৈত্র	চড়ক	৩০ বৎসর	৩ দিন	২,৫০০
†৪৪৮	„	„	২৮	মহিয়াড়ী	অগ্রহায়ণ	রাসযাত্রা	...	৭ দিন	৫,০০০
*৪৪৯	„	„	৩৪	মাকড়দহ	ফাল্গুন	মাকড়চণ্ডীপূজা	১২২৯ সন	৭ দিন	৫০,০০০
*৪৫০	„	„	৪০	নার্না	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	৩ দিন	৩,০০০
*৪৫১	„	„	৪৪	গয়েশপুর	মাঘ	পীরের উরস্	৩০০ বৎসর	১৫ দিন	২,০০০-৩,০০০
*৪৫২	„	„	৫৪	পাকুড়িয়া	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	৭ দিন	...
‡৪৫৩	„	„	৫৫	বাঁকড়া	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৪৫৪	„	বাউড়িয়া	১	সন্তোষপুর	চৈত্র	চড়ক	বহুকালের প্রাচীন	৭ দিন	২,০০০
‡৪৫৫	„	„	২	বুড়িয়ালি	চৈত্র	চড়ক	৩০ বৎসর	৩ দিন	৬০০-৭০০
†৪৫৬	„	„	৬	ফোর্ট গশটার	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	৭ দিন	৩,০০০
‡৪৫৭	„	উলুবেড়িয়া	১	তুলসীবেড়িয়া	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	...	১ দিন	...

‡৪৫৮	হাওড়া	উলুবেড়িয়া	১	তুলসীবেড়িয়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	...
‡৪৫৯	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	কালীপূজা	৭৪ বৎসর	৭ দিন	৭,০০০-৮,০০০
‡৪৬০	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	গাজন	৪০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৪৬১	,,	,,	৩	কামিনা	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০ বৎসর	২ দিন	৩,০০০
†৪৬২	,,	,,	৯	চণ্ডীপুর	পৌষ	গঙ্গাপূজা	...	২ দিন	৫০০
‡৪৬৩	,,	,,	২৬	ময়নাপুর	চৈত্র	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৩০০-৪০০
*৪৬৪	,,	,,	৩৩	ডাহকা	বৈশাখ	পঞ্চানন্দ	বহুকালের প্রাচীন	২-৩ দিন	২,০০০
‡৪৬৫	,,	,,	৪৯	বীরশিবপুর	বৈশাখ	মহোৎসব	১২৮২ সন	৪ দিন	১৫,০০০
†৪৬৬	,,	,,	৬৩	বানিবন	পৌষ	পীরের উরস্	২০০ বৎসর	৫ দিন	৬,০০০
‡৪৬৭	,,	,,	৯০	বৃন্দাবনপুর	চৈত্র	গাজন	৩০০ বৎসর	৪ দিন	...
‡৪৬৮	,,	,,	৯৫	জগৎপুর	বৈশাখ	নববর্ষ	১০ বৎসর	১০ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৪৬৯	,,	,,	১০৫	চেঙ্গাইল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	৩০ দিন	২০০-৩০০
‡৪৭০	,,	,,	,,	,,	চৈত্র	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...
‡৪৭১	,,	,,	১০৯	উলুবেড়িয়া	কার্তিক	রাসযাত্রা	৭ বৎসর	৩০ দিন	৬,০০০-৭,০০০
‡৪৭২	,,	,,	১১২	বড়গাছা	চৈত্র	গাজন		...	...
*৪৭৩	,,	শ্যামপুর	৯	নাউল	মাঘ	ব্রহ্মাপূজা	৬৫ বৎসর	১ দিন	৬০০-৭০০
†৪৭৪	,,	,,	২৫	সীতাপুর	মাঘ	আক্ষিণস্নান	১০০ বৎসর	১ দিন	৫০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*৪৭৫	হাওড়া	শ্যামপুর	৩৩	রতনপুর	চৈত্র	রতনমালা দেবীর পূজা	প্রাচীন	২ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৪৭৬	„	„	৪৪	চিলরা	কার্তিক	রাসযাত্রা		৮ দিন	৫০০
†৪৭৭	„	„	৫৭	খাড়ুবেড়িয়া	কার্তিক	কালীপূজা	...	৮ দিন	১,০০০
†৪৭৮	„	„	৫৮	রাধানগর	বৈশাখ	অক্ষয়তৃতীয়া	...	১ দিন	৪০০
†৪৭৯	„	„	৬৮	ডিহিমণ্ডলঘাট	পৌষ	মহাকালীপূজা	...	৮ দিন	৬০০
†৪৮০	„	„	৭০	সিকোল	ফাল্গুন	বনমালীপূজা	...	১ দিন	১,০০০
†৪৮১	„	„	৭৬	গোবিন্দপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	৩০০
‡৪৮২	„	„	৭৭	নস্করপুর	বৈশাখ	বিশালাক্ষীপূজা	১০০ বৎসর	২ দিন	২০,০০০
‡৪৮৩	„	„	৭৮	মরশাল	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	সম্প্রতিকাল	১ দিন	...
‡৪৮৪	„	„	৭৯	শ্যামপুর	পৌষ	শীতলাপূজা	১০০ বৎসর	১৫ দিন	...
‡৪৮৫	„	„	৮৮	কমলপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১৬ বৎসর	১ দিন	...
*৪৮৬	„	„	„	„	মাঘ	সরস্বতীপূজা	২০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
†৪৮৭	„	„	৮৯	রাধাপুর	বৈশাখ	ভীম একাদশী	...	৮ দিন	৫০০
‡৪৮৮	„	„	৯০	পুরুলপাড়া	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	২ দিন	৪,০০০-৫,০০০
†৪৮৯	„	„	৯৩	কাশিদহ	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৮ দিন	৪০০
‡৪৯০	„	„	৯৯	ক্ষীরিশবেড়িয়া	চৈত্র	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	৭ দিন	...
‡৪৯১	„	„	১০২	পিছলদহ	ফাল্গুন	শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...
†৪৯২	„	„	১০৭	কুরচিবেড়িয়া	বৈশাখ	বৈশাখ সংক্রান্তি	...	১ দিন	৪০০
†৪৯৩	„	„	১০৮	শিবগঞ্জ	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	...	৫ দিন	২০০

*৪৯৪	হাওড়া	শ্যামপুর	১০৯	ডিঙ্গাখোলা	মাঘ	গঙ্গাপূজা	১৫০ বৎসর	৭ দিন	৬,০০০-৭,০০০
*৪৯৫	„	„	১২৮	বাগাণ্ডা	আশ্বিন	রথযাত্রা	২৫ বৎসর	২ দিন	৮,০০০-১০,০০০
†৪৯৬	„	„	১৩৭	নবগ্রাম	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৩০০
†৪৯৭	„	„	১৪২	গোলাবাড়ীয়া	বৈশাখ	বৈশাখীপূর্ণিমা	...	১ দিন	২০০
†৪৯৮	„	„	...	দেওয়ানতলা	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	৮ দিন	৩০০
†৪৯৯	„	„	...	„	চৈত্র	অন্নপূর্ণাপূজা	...	২ দিন	৪,০০০
†৫০০	„	„	...	„	আষাঢ়	দেওয়ানপীর	...	১ দিন	১,০০০
†৫০১	„	„	...	কাটাখোলা	বৈশাখ	মনসাপূজা	...	১ দিন	১০০
†৫০২	„	„	...	গোয়ালপাড়া	বৈশাখ	পঞ্চানন্দপূজা	...	১ দিন	৪০০
†৫০৩	„	„	...	উলুঘাটা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৩০০
†৫০৪	„	„	...	দেশানটোলা	ফাল্গুন	শীতলাপূজা	...	৮ দিন	৫০০
†৫০৫	„	„	...	নস্করপুর	বৈশাখ	বিশালাক্ষীপূজা	...	১ দিন	২,০০০
†৫০৬	„	„	...	সেয়াপুর	বৈশাখ	শীতলাপূজা	...	১০ দিন	১,০০০
†৫০৭	„	„	...	নাহাল	চৈত্র	কালীপূজা	...	২ দিন	২০০
†৫০৮	„	„	...	সুশালী	পৌষ	কালীপূজা	...	৪ দিন	২০০
†৫০৯	„	„	...	নৈয়ারিয়া (?)	পৌষ	শীতলাপূজা	...	৪ দিন	২৫০
†৫১০	„	„	...	বারোগাছি	জ্যৈষ্ঠ	গঙ্গাপূজা	...	৮ দিন	৩০০
†৫১১	„	„	...	কুলশীকারি	চৈত্র	রামনবমী	...	৮ দিন	৩০০
†৫১২	„	বাগনান	৪	দেউলগ্রাম	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৭ দিন	৩,০০০
‡৫১৩	„	„	৯	পশ্চিম বাইনান	চৈত্র	কালীপূজা	১২০৯ সন	১ দিন	...

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।
† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।
‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
†৫১৪	হাওড়া	বাগনান	৯	পশ্চিম বাইনান	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	...
*৫১৫	"	"	১৪	কল্যাণপুর	চৈত্র	গাজন	২০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
†৫১৬	"	"	১৮	বিরামপুর	ভাদ্র	কালীপূজা	...	১ দিন	৪,০০০
‡৫১৭	"	"	২০	শাঁওতা	জ্যৈষ্ঠ	সাবিত্রীপূজা	১৩৪২ সন	১ দিন	৬০০-৭০০
†৫১৮	"	"	"	মেল্লক	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
*৫১৯	"	"	৪৫	হারুপ	জ্যৈষ্ঠ	চড়ক	...	১ দিন	...
‡৫২০	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪০ বৎসর	২ দিন	১,০০০-১,৫০০
‡৫২১	"	"	৪৬	আণ্ডন্সী ভুঁইয়ারা	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪০ বৎসর	২ দিন	...
‡৫২২	"	"	"	"	চৈত্র	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	১০ দিন	২,০০০
‡৫২৩	"	"	৬৯	বীরকুল	পৌষ	কালীপূজা	...	১ দিন	১,০০০
‡৫২৪	"	"	৭৪	খালোড়	ভাদ্র	কালীপূজা	৪০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
‡৫২৫	"	"	"	"	পৌষ	কালীপূজা	৪০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
*৫২৬	"	"	৮৪	বৈদ্যনাথপুর	চৈত্র	গাজন	১৫০ বৎসর	১৮ দিন	৩,০০০-৪,০০০
†৫২৭	"	"	৮৫	খানজাদাপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
†৫২৮	"	"	...	ভুইরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	৩,০০০
†৫২৯	"	"	...	"	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	১,৫০০
‡৫৩০	"	"	...	কালীবাড়ী	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	২,০০০
†৫৩১	"	"	...	পিপুল্যান	চৈত্র	নীলপূজা	...	১ দিন	১,০০০
†৫৩২	"	আমতা	১৮	শিবপুর	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তি	...	১ দিন	৩০০
†৫৩৩	"	"	৬৫	ঝিকরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	৭ দিন	৪০০

†৫৩৪	হাওড়া	আমতা	৬৫	ঝিকরা	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৬০০
†৫৩৫	„	„	৯৯	খড়িগেরিয়া	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৪০০
†৫৩৬	„	„	১০০	খাসমালী	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৪০০
†৫৩৭	„	„	১০৫	জয়পুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৩০০
‡৫৩৮	„	„	১০৬	বিনলা কৃষ্ণবাটী	বৈশাখ	কালীপূজা	২৫০-৩০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৫৩৯	„	„	„	„	কার্তিক	রাসযাত্রা	„	১ দিন	১,০০০
‡৫৪০	„	„	„	„	চৈত্র	চড়ক	„	১ দিন	...
†৫৪১	„	„	১০৭	শিরোবেড়িয়া	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	২০০
‡৫৪২	„	„	১২০	খড়িয়প	অগ্রহায়ণ	কালীপূজা	১৫০ বৎসর	৭ দিন	২০,০০০
‡৫৪৩	„	„	১৩১	তাজপুর	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	৩০ দিন	৫০০-৭০০
‡৫৪৪	„	„	১৩২	মহিষামড়ি	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	৭ দিন	৫০০
‡৫৪৫	„	„	১৩৪	উদং	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	২,৫০০
‡৫৪৬	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	৬০-৭০ বৎসর	১ দিন	২,৫০০
†৫৪৭	„	„	১৩৫	খড়দহ	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৩০০
‡৫৪৮	„	„	১৩৮	সোনামুই	চৈত্র	গাজন	১০০ বৎসর	৮ দিন	৫,০০০
*৫৪৯	„	„	১৪৩	আমতা	বৈশাখ	চণ্ডীপূজা	৩০০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০
†৫৫০	„	„	„	„	মাঘ	„	„	১ দিন	৫০০
‡৫৫১	„	„	১৫১	সমেশ্বর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	২ বৎসর	৪ দিন	২০০
‡৫৫২	„	„	„	„	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৫৫৩	হাওড়া	আমতা	১৫১	সমেশ্বর	ফাল্গুন	অনন্তশয্যা	৫ বৎসর	১৫ দিন	৩,০০০
‡৫৫৪	"	"	১৫৩	রসপুর	ফাল্গুন	বিন্ধ্যবাসিনীপূজা	১০০ বৎসর	১৫-২০ দিন	৫,০০০-৬,০০০
†৫৫৫	"	"	১৭২	গৌরাঙ্গচক	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	২ দিন	২০০
‡৫৫৬	"	"	১৮০	কানপুর	পৌষ	কালীপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	৬,০০০-৭,০০০
‡৫৫৭	"	"	"	"	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	...
†৫৫৮	"	"	১৮১	পুরাশ	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	২০০
†৫৫৯	"	"	১৮৬	সোরাদ	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	২০০
†৫৬০	"	"	১৮৯	বসন্তপুর	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	২০০
‡৫৬১	"	"	২০১	কাষ্ঠসাঙ্গড়া	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	৩০০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
†৫৬২	"	"	২০২	খোসালপুর বাজার	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	২০০
†৫৬৩	"	"	২০৪	কুরিট	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	২০০
†৫৬৪	"	"	...	দুর্গাপুর	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৪০০
†৫৬৫	"	"	...	ভাতোর	চৈত্র	চড়ক	...	১ দিন	৪০০
†৫৬৬	"	"	...	খালনা	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৪০০
†৫৬৭	"	"	...	সিঙ্গটিবাজার	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	৩০০
†৫৬৮	"	"	...	হরিশপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	...	১ দিন	৩০০
‡৫৬৯	"	উদয়নারায়ণপুর	৩	রামপুর	চৈত্র	চড়ক	২০০ বৎসর	৪ দিন	৭০০-৮০০
‡৫৭০	"	"	৩৩	সিংটী	মাঘ	পীরের উরস্	৭০০ বৎসর	১ দিন	৫,০০০
‡৫৭১	"	"	৪৫	মনস্থকা	কার্তিক	কালীপূজা	...	১ দিন	...
‡৫৭২	"	"	৪৮	কাহ্নপাট	চৈত্র	গাজন	...	১ দিন	...
‡৫৭৩	"	"	৫২	সোনাতলা	চৈত্র	গাজন	৩০০ বৎসর	৪ দিন	৪০০-৫০০

‡৫৭৪	হাওড়া	উদয়নারায়ণপুর	৫৬	কানসোনা	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১২ বৎসর	২ দিন	৫,০০০-৬,০০০
‡৫৭৫	হুগলী	গোলবা	৯৬	গোলবা	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	...
‡৫৭৬	”	”	”	”	ভাদ্র	মনসাপূজা	সম্প্রতি	১ দিন	..
‡৫৭৭	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	সম্প্রতি	৭ দিন	...
‡৫৭৮	”	”	১০৮	তালচিনান সানিহাটী	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৪০০-৫০০
‡৫৭৯	”	”	১১৮	সালুকগড়	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	২ দিন	...
*৫৮০	”	”	১২৬	মহানাদ	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০০ বৎসর	১৫ দিন	৪,০০০
‡৫৮১	”	”	১৩৬	সুলতানগাছা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১৩৪২ সন	২ দিন	৪০০-৫০০
‡৫৮২	”	”	১৮০	সুগন্ধা	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৪০০ বৎসর	১ দিন	২,০০০
‡৫৮৩	হুগলী	ধনিয়াখালি	২৯	দশঘরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১৬৫০ শকাব্দে	২ দিন	১০,০০০-১২,০০০
‡৫৮৪	”	”	”	”	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	...	...
‡৫৮৫	”	”	৩৫	শাহাবাজার	মাঘ	পীরের উরস্	২০০-৩০০ বৎসর	৪-৫ দিন	৩,০০০-৪,০০০
‡৫৮৬	”	”	১১৭	পলাশী	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	প্রাচীন	...	...
‡৫৮৭	”	”	”	”	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	”	...	...
‡৫৮৮	”	”	১৩৫	শেয়াপুর	আশ্বিন	মনসাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৫৮৯	”	”	১২৭	কমুইবাঁকা	মাঘ	পীরের উরস্	১০০ বৎসর	৩-৪ দিন	২০০-৩০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
৫৯০	হুগলী	ধনিয়াখালি	...	কানানদী	পৌষ	টুসু উৎসব	প্রাচীন	১ দিন	২৫,০০০-৩০,০০০
৫৯১	"	"	...	ধনিয়াখালি	আষাঢ়	রথযাত্রা	৩০০ বৎসর	৭ দিন	...
৫৯২	"	"	...	"	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	...	১ দিন	...
৫৯৩	"	পাণ্ডুয়া	১২	ভোঁপুর	আষাঢ়	মনসাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০
৫৯৪	"	"	২০	বৈঁচি	"	রথযাত্রা	"	...	...
৫৯৫	"	"	"	"	জ্যৈষ্ঠ	জগৎগৌরীপূজা	"	...	...
৫৯৬	"	"	৭১	খরাল	...	ঈদলফেতর	...	...	...
৫৯৭	"	"	৭২	সোণাটিকরি	...	ঈদলফেতর	"	৩ দিন	১,০০০
৫৯৮	"	"	১০৮	পাণ্ডুয়া	মাঘ	পীরের উরস্	...	৩০ দিন	৪০,০০০
৫৯৯	হুগলী	বলাগড়	৯	গুপ্তিপাড়া	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
৬০০	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	"	২ দিন	১০,০০০-১৫,০০০
৬০১	"	"	"	"	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৩০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
৬০২	"	"	"	"	চৈত্র	রামনবমী	৪০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
৬০৩	"	"	২৬	বাকুলিয়া	পৌষ	কালীপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৩০০-৪০০
৬০৪	"	"	২৯	আলিসাগড়িয়া	মাঘ	ওলেশ্বরীপূজা	৫০ বৎসর	১ দিন	৮০০
৬০৫	"	"	৩৩	তিলডাঙ্গা	মাঘ	ধর্মরাজপূজা	৪০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
৬০৬	"	"	৩৪	নাটাগড়ি	বৈশাখ	নোয়াজনঠাকুরপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	১,০০০
৬০৭	"	"	৪১	ইন্চুরা	ভাদ্র	মনসাপূজা	...	১ দিন	১৫,০০০

‡৬০৮	হুগলী	বলাগড়	৪২	দেবীপুর	শ্রাবণ	মনসাপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...
‡৬০৯	„	„	৫৮	জাগুলিয়া	বৈশাখ	জাগেশ্বরীপূজা	„	৩ দিন	১,০০০
‡৬১০	„	„	৭০	এক্তারপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১৫০ বৎসর	৭ দিন	৫০০
‡৬১১	„	„	৭৩	বৃন্দাবনপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৫ বৎসর	৫ দিন	৫০০-৭০০
‡৬১২	„	„	৮৩	বাসনা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০ বৎসর	১ দিন	২০০-৩০০
‡৬১৩	„	„	৯৮	মুগুখোলা	মাঘ	ধর্মরাজপূজা	বহুকালের প্রাচীন	৩ দিন	৩,০০০
‡৬১৪	„	„	১০১	শ্রীপুর	কার্তিক	রাসযাত্রা	২০০ বৎসর	১৫ দিন	৫০,০০০
‡৬১৫	„	„	১১৮	সিজা	আষাঢ়	রথযাত্রা	৬০-৭০ বৎসর	২ দিন	৫০০-৬০০
‡৬১৬	„	„	১২৮	দক্ষিণ গোপালপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৫০ বৎসর	৯ দিন	১,০০০
‡৬১৭	হুগলী	মগরা	১	হোয়েরা	আষাঢ়	রথযাত্রা	১০০ বৎসর	১ দিন	২,৫০০
‡৬১৮	„	„	„	„	ভাদ্র	মনসাপূজা	১০০ বৎসর	১ দিন	২,৫০০
‡৬১৯	„	„	৪৫	কৃষ্ণপুর	মাঘ	উত্তরায়ণ মেলা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	২০,০০০
‡৬২০	„	„	...	ত্রিবেণী	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	„	১ দিন	১০,০০০
‡৬২১	„	চন্দননগর	...	চন্দননগর	বৈশাখ	অক্ষয় তৃতীয়া	৩৪ বৎসর	১৩ দিন	...
‡৬২২	„	„	...	„	অগ্রহায়ণ	মহোৎসব (খৃষ্টীয়) মেলা	৮০-৯০ বৎসর	১৮ দিন	...
‡৬২৩	„	„	...	„	অগ্রহায়ণ	জগদ্ধাত্রীপূজা	২০০ বৎসর	৩ দিন	...
‡৬২৪	„	„	...	„	চৈত্র	চণ্ডীপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*৬২৫	হুগলী	হরিপাল	২৯	নওপাড়া	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	২০০ বৎসর	৮ দিন	...
*৬২৬	„	„	৪১	দ্বীপা	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪০০ বৎসর	৯ দিন	১,০০০
*৬২৭	„	„	„	„	শ্রাবণ	ঝুলনযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
*৬২৮	„	„	„	„	কার্তিক	রাসযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
*৬২৯	„	„	„	„	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	...	১ দিন	১,০০০
*৬৩০	„	„	৪৪	চাঁদবাটী	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৩ বৎসর	১ দিন	২,৫০০
*৬৩১	„	„	১১০	কিঙ্করবাটী	আষাঢ়	রথযাত্রা	৮০ বৎসর	২ দিন	৮,০০০-১০,০০০
*৬৩২	„	„	১১৩	বন্দীপুর	বৈশাখ	ধর্মরাজপূজা	প্রাচীন	১ দিন	২,০০০-৩,০০০
*৬৩৩	„	তারকেশ্বর	১৪	মোক্তারপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	৭০-৮০ বৎসর	২ দিন	৮০০-৯০০
*৬৩৪	„	„	২৯	তারকেশ্বর	শ্রাবণ	শ্রাবণোৎসব	...	শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার	৫০,০০০
*৬৩৫	„	„	„	„	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	...	২ দিন	১০০,০০০
*৬৩৬	„	„	„	„	চৈত্র	চড়কপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ মাসব্যাপী	১৫০,০০০
*৬৩৭	„	„	৫৯	প্রতিহারপুর	জ্যৈষ্ঠ	স্নানযাত্রা	২০০ বৎসর	১ দিন	২০০
*৬৩৮	„	„	„	„	আষাঢ়	রথযাত্রা	২০০ বৎসর	২ দিন	...
*৬৩৯	„	শ্রীরামপুর	১০	চাতরা	বৈশাখ	শীতলাপূজা	প্রাচীন	৩ দিন	...
*৬৪০	„	„	১৩	শ্রীরামপুর	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	প্রাচীন	১ মাসব্যাপী	...
*৬৪১	„	„	১৫	মাহেশ	আষাঢ়	রথযাত্রা	৪০০ বৎসর	৭ দিন	১০০,০০০
*৬৪২	„	উত্তরপাড়া	৭	কোন্নগর	চৈত্র	চড়ক	বহুকালের প্রাচীন	...	...
*৬৪৩	„	„	৮	কোতরং	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	২৫০ বৎসর	৭ দিন	১১,০০০-১২,০০০

‡৬৪৪	হুগলী	উত্তরপাড়া	৯	ভদ্রকালী	পৌষ	মাণিক পীরের উরস্	বহুকালের প্রাচীন	৩ দিন	২,৫০০
‡৬৪৫	”	”	১০	রঘুনাথপুর	চৈত্র	চড়ক	১৫০ বৎসর	১ দিন	১,৫০০
‡৬৪৬	”	চণ্ডীতলা	১২	শিয়াখালা	আশ্বিন	বিশালাক্ষীর জাত	বহুকালের প্রাচীন	...	৪,১০০-৫,০০০
‡৬৪৭	”	”	৪৬	মাঝের হাট	মাঘ	পীরের উরস্	”	১ দিন	১৫,০০০
‡৬৪৮	”	”	৭৭	বাক্সা	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	১০০,০০০
‡৬৪৯	”	জাঙ্গিপাড়া	৬	রাজবলহাট	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	...
‡৬৫০	”	”	”	”	পৌষ	পৌষ সংক্রান্তি	প্রাচীন	৪ দিন	...
‡৬৫১	”	”	”	”	চৈত্র	রামনবমী	”	...	...
‡৬৫২	”	”	৪৮	খুড়িগাছি	”	কালীপূজা	”	১ দিন	...
‡৬৫৩	”	”	৭২	আঁটপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৬৫৪	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১৫০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
*৬৫৫	”	”	১০২	ফুরফুরা	”	ইছালে ছাওয়াব	৫৯ বৎসর	৩ দিন	১,০০,০০০
‡৬৫৬	”	”	১১৩	হিজুলী	মাঘ	বিশালাক্ষী দেবীর পূজা	...	১ দিন	১,৫০০
‡৬৫৭	”	”	১১৯	কাপড়পুর	পৌষ	পৌষ কালীপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৮,০০০-১০,০০০
‡৬৫৮	”	গোঘাট	৩২	বাজুয়া	বৈশাখ	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৪০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

✦ কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
*৬৫৯	হুগলী	গোঘাট	৩২	বাজুয়া	ফাল্গুন	শ্রীরামকৃষ্ণ আবির্ভাব	...	...	...
*৬৬০	"	"	৩৫	রঘুবাটী	মাঘ	মহোৎসব	৭০ বৎসর	৩ দিন	...
*৬৬১	"	"	৪০	জোত চণ্ডী	চৈত্র	গাজন	প্রাচীন	৪ দিন	৮০০-৯০০
*৬৬২	"	"	৪২	বেঙ্গাই	বৈশাখ	গাজন	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০-৬০০
*৬৬৩	"	"	"	"	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	৫০০-৬০০
*৬৬৪	"	"	৪৪	আমুড়	...	বিশালাক্ষীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	...
*৬৬৫	"	"	৫৬	সীতানগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	২৫০ বৎসর	২ দিন	...
*৬৬৬	"	"	৫৭	গোবিন্দপুর	ফাল্গুন	শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব	১৬-১৭ বৎসর	৩ দিন	৫,০০০-৭,০০০
*৬৬৭	"	"	৭৪	নবাসন	আষাঢ়	রথযাত্রা	১৫০ বৎসর	২ দিন	৪০০-৫০০
*৬৬৮	"	"	৭৭	কাঁঠালী	চৈত্র	চড়ক	প্রাচীন	১ দিন	...
*৬৬৯	"	"	"	"	...	বিশালাক্ষীর রথযাত্রা	"	১ দিন	...
*৬৭০	"	"	৮২	কামারপুকুর	ফাল্গুন	শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব	...	১ দিন	১৫,০০০
*৬৭১	"	"	১০৩	শ্যামবাটী	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১৫০ বৎসর	৩ দিন	৫,০০০-৭,০০০
*৬৭২	"	"	১০৫	ধূলেপুর	পৌষ	মকর সংক্রান্তি (রাধাকৃষ্ণপূজা)	বহুকালের প্রাচীন	৩ দিন	৭,০০০-৮,০০০
*৬৭৩	"	"	১১৩	মোহনপুর	চৈত্র	বিশালাক্ষীপূজা	১০০ বৎসর	৩ দিন	২৫০
*৬৭৪	"	"	১৩৬	পাণ্ডুগ্রাম	...	মহোৎসব	...	...	...
*৬৭৫	"	"	১৪৯	বদনগঞ্জ	পৌষ	জাহ্নবীদেবীর আবির্ভাব	প্রাচীন	১ দিন	...

‡৬৭৬	হুগলী	গোঘাট	১৬৩	গুরুলিয়াভাতশালা	বৈশাখ	কালীপূজা	২ বৎসর	২ দিন	৯০০
‡৬৭৭	”	”	২০৫	দামোদরপুর	বৈশাখ	পীরের উরস্	প্রাচীন	৩ দিন	...
‡৬৭৮	”	”	২১০	বালীদেওয়ানগঞ্জ	কার্তিক	রাসযাত্রা	প্রাচীন	৭ দিন	...
*৬৭৯	”	আরামবাগ	৪৪	ডিহিবায়ড়া	চৈত্র	বারুণী স্নান	৫০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
‡৬৮০	”	”	৬৯	মলয়পুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	১০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৬৮১	”	”	”	”	চৈত্র	চড়ক	১০০ বৎসর	১ দিন	...
‡৬৮২	”	”	১১২	গৌরহাটী (হাটতলা)	আশ্বিন	মহোৎসব	...	৪ দিন	...
‡৬৮৩	”	”	”	”	আষাঢ়	রথযাত্রা	...	১ দিন	...
‡৬৮৪	”	”	১৫১	ভবানীপুর	মাঘ	পীরের উরস্	...	১ দিন	...
‡৬৮৫	”	”	”	ডিহিপুকুর	মাঘ	পীরের উরস্	...	৩ দিন	...
‡৬৮৬	”	”	...	রসুলপুর	জ্যৈষ্ঠ	মনসাপূজা	প্রাচীন	৬ দিন	১,০০০
‡৬৮৭	”	খানাকুল	১	কিশোরপুর	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	৫ দিন	১,০০০
‡৬৮৮	”	”	৫	বন্দীপুর	মাঘ	মহোৎসব	বহুকালের প্রাচীন	৩ দিন	...
‡৬৮৯	”	”	৭	ময়াল	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৫০০
‡৬৯০	”	”	১০	মহিষগোট	কার্তিক	রাসযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৫০০
‡৬৯১	”	”	১১	মাযুয়া	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৬ বৎসর	১ দিন	৫০০
‡৬৯২	”	”	১৩	পীলখান	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	১০ বৎসর	৩ দিন	১,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

ক্রমিক নং	জেলা	থানা	মৌজা নং	স্থান	সময়কাল	উপলক্ষ	প্রাচীনত্ব	স্থায়িত্ব	জনসমাগম
‡৬৯৩	হুগলী	খানাকুল	১৪	ঘোষপুর	মাঘ	সরস্বতীপূজা	প্রাচীন	১ দিন	১,০০০
‡৬৯৪	”	”	৩৫	রঘুনাথপুর	ফাল্গুন	মহোৎসব	১০ বৎসর	২ দিন	৪০০
‡৬৯৫	”	”	৩৭	কৃষ্ণনগর	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৫০০
‡৬৯৬	”	”	”	”	কার্তিক	রাসযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	১,৫০০
‡৬৯৭	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৬৯৮	”	”	৪৫	খানাকুল	মাঘ	শিবপূজা	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৭০০-৮০০
‡৬৯৯	”	”	”	”	ফাল্গুন	শিবরাত্রি	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	৫০০
‡৭০০	”	”	”	”	চৈত্র	মহোৎসব	বহুকালের প্রাচীন	১ দিন	...
‡৭০১	”	”	৫০	কুমারহাট	বৈশাখ	ভগবতীপূজা	২০০ বৎসর	১ দিন	১০,০০০
‡৭০২	”	”	৬২	নন্দনপুর	মাঘ	রথযাত্রা (ধর্মরাজের)	বহুকালের প্রাচীন	৯ দিন	১,৫০০
‡৭০৩	”	”	৬৬	শ্যামমাঝি বন্দর	চৈত্র	বারুণী	১০০ বৎসর	১ দিন	৪,০০০-৫,০০০
‡৭০৪	”	”	৮৪	চক্রপুর	কার্তিক	কালীপূজা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	২,০০০
‡৭০৫	”	”	৮৭	রাউতখানা	বৈশাখ	শিবপূজা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৮০০-৯০০
‡৭০৬	”	”	১০০	গৌরাঙ্গপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৫০০
‡৭০৭	”	”	১০৩	আটঘরা	কার্তিক	রাসযাত্রা	৮-১০ বৎসর	১ দিন	৪০০

‡৭০৮	হুগলী	খানাকুল	১১৩	বালীপুর	মাঘ	মকরস্নান	বহুকালের প্রাচীন	৩ দিন	৩,০০০
‡৭০৯	”	”	১৩৮	নতিবপুর	আশ্বিন	দুর্গাপূজা	১০ বৎসর	১০ দিন	১,৫০০
‡৭১০	”	”	”	”	ফাল্গুন	পীরের উরস্	বহুকালের প্রাচীন	৩ দিন	৫০০-৬০০
‡৭১১	”	”	”	”	ফাল্গুন	মহোৎসব	৭০-৮০ বৎসর	২ দিন	২,০০০
‡৭১২	”	”	...	ঠাকুরাণীচক্	মাঘ	মহোৎসব	প্রাচীন	২ দিন	২,০০০-৩,০০০
‡৭১৩	”	”	...	সুন্দরপুর	পৌষ	জগদীশমেলা	বহুকালের প্রাচীন	৫ দিন	১,০০০
‡৭১৪	”	পুরশুড়া	৪	শেয়োলুক	কার্তিক	রাসযাত্রা	৪০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৭১৫	”	”	”	”	ফাল্গুন	দোলযাত্রা	৪০০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৭১৬	”	”	১৩	দেউলপাড়া	আষাঢ়	রথযাত্রা	বহুকালের প্রাচীন	২ দিন	৮,০০০
‡৭১৭	”	”	”	মির্জাপুর	পৌষ	পৌষসংক্রান্তি	৩০ বৎসর	১ দিন	৪০০-৫০০
‡৭১৮	”	”	৩৫	বলরামপুর	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২ দিন	১,২০০
‡৭১৯	”	”	৩৮	আকড়ি ফতেপুর	মাঘ	মহোৎসব	৩০০ বৎসর	৪ দিন	৮০০-১,২০০
‡৭২০	”	”	৪৫	ঘোল দিঘরুই	চৈত্র	চড়ক	...	...	...
‡৭২১	”	”	৪৭	শ্যামপুর	চৈত্র	চড়ক	...	...	...
‡৭২২	”	চুঁচুড়া	...	চুঁচুড়াশহর	চৈত্র	চড়ক	৩০০ বৎসর	৩ দিন	১০,০০০
‡৭২৩	”	”	...	”	চৈত্র	রামনবমী	...	১৫ দিন	৫,০০০
‡৭২৪	”	”	...	”	আষাঢ়	রথযাত্রা	প্রাচীন	২১ দিন	২,৫০০
‡৭২৫	”	”	...	”	...	মহরম	”	১ দিন	১০,০০০

* ১ম সংস্করণে উল্লিখিত এবং স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

† কেবলমাত্র প্রথম সংস্করণে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে।

‡ কেবলমাত্র স্থানীয় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে।

পরিশিষ্ট খ

স্থানসূচী

স

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

(As on 17th February 1964)

AGARTALA—
1 Laxmi Bhandar Books & Scientific Sales (Rest)

AGRA—
1 National Book House, Jeoni Mandi (Reg.)
2 Wadhawa & Co., 45, Civil Lines (Reg.)
3 Banwari Lal Jain, Publishers, Moti Katra (Rest)
4 English Book Depot, Sadar Bazar, Agra Cantt. (Rest)

AHMADNAGAR—
1 V. T. Jorakar, Prop., Rama General Stores, Navi Path (Rest)

AHMEDABAD—
1 Balgovind Kuber Dass & Co., Gandhi Road (Reg.)
2 Chandra Kant Chiman Lal Vora, Gandhi Road (Reg.)
3 New Order Book Co., Ellis Bridge (Reg.)
4 Mahajan Bros., Opp. Khadia Police Gate (Rest)
5 Sastu Kitab Ghar, Near Relief Talkies, Patthar Kuva, Relief Road (Reg.)

AJMER—
1 Book Land, 663, Madar Gate (Reg.)
2 Rajputana Book House, Station Road (Reg.)
3 Law Book House, 271, Hathi Bhata (Reg.)
4 Vijay Bros., Kutchery Road (Rest.)
5 Krishna Bros., Kutchery Road (Rest)

ALIGARH—
1 Friend's Book House, Muslim University, Market (Reg.)

ALLAHABAD—
1 Superintendent, Printing & Stationery. U. P.
2 Kitabistan, 17-A, Kamala Nehru Road (Reg.)
3 Law Book Co., Sardar Patel Marg, P. Box 4 (Reg.)
4 Ram Narain Lal Beni Modho, 2-A, Katra Road (Reg.)
5 Universal Book Co., 20, M. G. Road (Reg.)
6 University Book Agency (of Lahore), Elgin Road (Reg.)
7 Wadhwa & Co., 23, M. G. Marg (Rest)
8 Bharat Law House, 15, Mahatma Gandhi Marg (Rest)
9 Ram Narain Lal Beni Prashad, 2-A, Katra Road (Rest)

AMBALA—
1 English Book Depot, Ambala Cantt. (Reg.)
2 Seth Law House, 8719, Railway Road, Ambala Cantt. (Rest)

AMRITSAR—
1 The Law Book Agency, G. T. Road, Putligarh (Reg.)
2 S. Gupta, Agent, Government Publications, Near P. O. Majith Mandi (Reg.)
3 Amar Nath & Sons, Near P. O. Majith Mandi (Reg.)

ANAND—
1 Vijaya Stores, Station Road (Rest)
2 Charto Book Stall, Tulsi Sadan, Station Road (Rest)

ASANSOL—
1 D. N. Roy & R. K. Roy, Booksellers, Atwal Buildings (Rest)

BANGALORE—
1 The Bangalore Legal Practitioner Co-operative Society Ltd., Bar Association Building (Reg.)
2 S. S. Book Emporium, 118 Mount Joy Road (Reg.)
3 The Bangalore Press, Lake View, Mysore Road, P. O. Box 507 (Reg.)
4 The Standard Book Depot, Avenue Road (Reg.)
5 Vichara Sahitya Private Ltd., Balepet (Reg.)
6 Makkala Pustaka Press, Balamandira, Gandhinagar (Reg.)
7 Maruthi Book Depot, Avenue Road (Reg.)
8 International Book House (P) Ltd., 4F, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
9 Navakarnataka Pubns. (P) Ltd., Majestic Circle (Rest)

BAREILLY—
1 Agarwal Brothers, Bara Bazar (Reg.)

BARODA—
1 Shri Chandrakant Mohan Lal Shah, Raopura (Rest)
2 Good Companions Booksellers, Publishers & Sub-Agent (Rest)
3 New Medical Book House, 540 Madan Zampa Road (Rest)

BEAWAR—
1 The Secretary, S. D. College, Co-operative Stores Ltd. (Rest)

BELGHARIA—
1 Granthlok, Antiquarian Booksellers & Publishers (24-Parganas), 5/1 Ambica Mukherjee Road (Reg.)

BHAGALPUR—
1 Paper Stationery Stores, D. N. Singh Road (Reg.)

BHOPAL—
1 Superintendent, State Govt. Press
2 Lyall Book Depot, Mohd. Din Bldg. Sultania Road (Reg.)
3 Delite Books, Opp. Bhopal Talkies (Rest)

BHUBANESWAR—
1 Ekamra Vidyabhaban, Eastern Tower, Room No. 3 (Rest)

BIJAPUR—
1 Shri D. V. Deshpande, Recognised Law Booksellers, Prop. Vinod Book Depot, Near Shiralshetti Chowk (Rest)

BIKANER—
1 Bhandani Bros. (Rest)

BILASPUR—
1 Sharma Book Stall, Sadar Bazar (Rest)

BOMBAY—
1 Supdt. Printing and Stationery, Queens Road
2 Charles Lambert and Co., 101, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
3 Co-operator's Book Depot, 5/32, Ahmed Sailor Bldg. Dadar (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

BOMBAY—

4 Current Book House, Maruti Lane, Raghunath Dadaji St. (Reg.)
5 Current Technical Literature Co. (P) Ltd., India House, 1st floor (Reg.)
6 International Book House Ltd., 9, Ash Lane, M. G. Road (Reg.)
7 Lakkami Book Depot, Girgaum (Reg.)
8 Elpees Agencies, 24, Bhangwadi Kalbadevi (Reg.)
9 P. P. H. Book Stall, 190-B, Khetwadi Main Road (Reg.)
10 New Book Co., 188-190, Dr. Dadabhai Naoroji Road (Reg.)
11 Popular Book Depot, Lamington Road (Reg.)
12 Sundar Das Gain Chand, 601, Girgaum Road, Near Princess Street (Reg.)
13 D. B. Taraporewala Sons & Co. (P) Ltd., 210, Dr. Dadabhai Naoroji Road (Reg.)
14 Thacker and Co., Rampart Row (Reg.)
15 N. M. Tripathi Private Ltd., Princess Street (Reg.)
16 The Kothari Book Depot. King Edward Road (Reg.)
17 P. H. Rama Krishna and Sons, 147, Rajaram Bhuvan, Shivaji Park Road No. 5 (Rest)
18 C. Jamnadas and Co., Booksellers, 146-C, Princess St. (Reg.)
19 Indo Nath and Co., A-6, Daulat Nagar Borivli (Reg.)
20 Minerva Book Shop, Shop No. 1/80, N. Subhas Road (Reg.)
21 Academic Book Co., Association Building, Girgaum Road (Rest)
22 Dominion Publishers, 23, Bell Bldg. Sir P. M. Road (Rest)
23 Bombay National History Society, 91, Walkeshwar Road (Rest)
24 Dowamadeo and Co., 16, Naziria Building, Ballard Estate (Rest)
25 Asian Trading Co., 310, The Miraball, P. B. 1505 (Rest)

CALCUTTA—

1 Chatterjee and Co., 3/1, Bocharam Chatterjee Lane (Reg.)
2 Dass Gupta and Co. P. Ltd., 54/3, College Street (Reg.)
3 Hindu Library, 69A, Balaram De Street (Reg.)
4 S K. Lahiri and Co ,P.Ltd..College Street (Reg.)
5 M. C. Sarkar and Sons P. Ltd., 14, Bankim Chatterjee Street (Reg.)
6 W. Newman and Co. Ltd., 3, Old Court House Street (Reg.)
7 Oxford Book and Stationery Co., 17, Park Street (Reg.)
8 R. Chambray and Co. Ltd., Kent House P-33, Mission Road Extension (Reg.)
9 S. C. Sarkar and Sons (P) Ltd., 1C, College Square (Reg.)
10 Thacker Spink and Co. (1933) (P) Ltd., 3, Esplanade East (Reg.)
11 Firma K. L. Mukhopadhaya, 6/1A, Banchha Ram Akrur Lane (Reg.)
12 K K. Roy, P. Box No. 10210, Calcutta-19 (Rest)
13 Sm. P. D. Upadhyay, 77, Muktaram Babu Street (Rest)
14 Universal Book Dist., 8/2, Hastings Street (Rest)
15 Modern Book Depot, 9, Chowringhee Centre (Rest)
16 Soor and Co., 125, Canning Street (Reg.)
17 S. Bhattacherjee, 49, Dharamtala Street (Rest)
18 Mukherjee Library, 10, Sarba Khan Road (Reg.)

CALCUTTA—

19 Current Literature Co., 208, Mahatma Gandhi Road (Reg.)
20 The Book Depository, 4/1, Madan Street (1st floor) (Rest)
21 Scientific Book Agency, Netaji Subhas Road (Rest)
22 Reliance Trading Co., 17/1, Banku Bihari Ghosh Lane, District Howrah (Rest)
23 Indian Book Dist. Co., 6512, Mahatma Gandhi Road (Rest)

CALICUT—

1 Touring Book Stall (Rest)

CHANDIGARH—

1 Supdt. Govt. Printing and Stationery, Punjab
2 Jain Law Agency, Flat No. 8, Sector No. 22 (Reg.)
3 Rama News Agency, Booksellers, Sector No. 22 (Reg.)
4 Universal Book Store, Booth 25 Sector 22 D (Reg.)
5 English Book Shop, 34, Sector 22 D (Rest)
6 Mehta Bros. 15 Z. Sector 22 B (Rest)
7 Tandon Book Depot, Shopping Centre, Sector 16 (Rest)
8 Kailash Law Publishers, Sector 22 B (Rest)

CHHINDWARA—

1 The Verma Book Depot. (Rest)

COCHIN—

1 Saraswat Corporation Ltd., Palliarakav Road (Reg.)

CUTTACK—

1 Press Officer, Orissa Sectt.
2 Cuttack Law Times (Reg.)
3 Prabhat K. Mahapatra, Mangalabag, P.B. 35 (Reg.)
4 D. P. Sur & Sons, Mangalabag (Rest)
5 Utkal Stores, Balu Bazar (Rest)

DEHRA DUN—

1 Jugal Kishore & Co., Rajpur Road (Reg.)
2 National News Agency, Paltan Bazar (Reg.)
3 Bishan Singh and Mahendra Pal Singh, 318, Chukhuwala (Reg.)
4 Uttam Pustak Bhandar, Paltan Bazar (Rest)

DELHI—

1 J. M. Jaina & Brothers, Mori Gate (Reg.)
2 Atma Ram & Sons, Kashmere Gate (Reg.)
3 Federal Law Book Depot, Kashmere Gate (Reg.)
4 Bahri Bros., 188, Lajpat Rai Market (Reg.)
5 Bawa Harikishan Dass Bedi (Vijaya General Agencies) P, B. 2027, Ahata Kedara, Chamalian Road (Reg.)
6 Book-Well, 4, Sant Narankari Colony, P. B. 1565 (Reg.)
7 Imperial Publishing Co., 3, Faiz Bazar, Daryaganj (Reg.)
8 Metropolitan Book Co., 1, Faiz Bazar (Reg.)
9 Publication Centre, Subzimandi (Reg.)
10 Youngman & Co , Nai Sarak (Reg.)
11 Indian Army Book Depot, 3, Daryaganj (Reg.)
12 All India Educational Supply Co., Shri Ram Bldgs., Jawahar Nagar (Rest)
13 Dhanwant Medical & Law Book House, 1522, Lajpat Rai Market (Rest)
14 University Book House, 15, W. B. Bangalore Road, Jawahar Nagar (Rest)
15 Law Literature House, 2646, Balimaran (Rest)
16 Summer Bros, P. O. Birla Lines (Rest)
17 Universal Book & Stationery Co., 16, Netaji Subhash Marg (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

DELHI—

18 B. Nath & Bros., 3808, Charakhawalan (Chowri Bazar) (Rest)
19 Rajkamal Prakashan P. Ltd., 8, Faiz Bazar (Reg.)
20 Premier Book Co., Printers, Publishers & Booksellers, Nai Sarak (Rest)
21 Universal Book Traders, 80, Gokhale Market (Reg.)
22 Tech. & Commercial Book, Coy., 75, Gokhale Market (Rest)
23 Saini Law Publishing Co., 1416, Chabiganj, Kashmere Gate (Rest)
24 G. M. Ahuja, Booksellers & Stationers, 309, Nehru Bazar (Rest)
25 Sat Narain & Sons, 3141 Mohd. Ali Bazar, Mori Gate (Reg.)
26 Kitab Mahal (Wholesale Div.) P. Ltd., 28, Faiz Bazar (Reg.)
27 Hindu Sahitya Sansar, Nai Sarak (Rest)
28 Munshi Ram Manohar Lal, Oriental Booksellers & Publishers, P. B. 1165, Nai Sarak (Rest)
29 K. L. Seth, Suppliers of Law, Commercial Tech. Books, Shanti Nagar, Ganeshpura (Rest)
30 Adarsh Publishing Service, 5A/10, Ansari Road (Rest)

DHANBAD—

1 Ismag Co-operative Stores Ltd., P.O. Indian School of Mines (Reg.)
2 New Sketch Press, Post Box 26 (Rest)

DHARWAR—

1 The Agricultural College Consumers Co-operative Society (Rest)
2 Rameshraya Book Depot., Subhas Road (Rest)
3 Karnatakaya Sahitya Mandira of Publishers and Booksellers

ERNAKULAM—

1 Pai & Co., Cloth Bazar Road (Rest)
2 South India Traders, C/o, Constitutional Journal (Reg.)

FEROZEPUR—

1 English Book Depot, 78, Jhoke Road (Reg.)

GAUHATI—

1 Mokshada Pustakalaya (Reg.)

GAYA—

1 Sahitya Sadan, Gautam Budha Marg (Reg.)

GHAZIABAD—

Jayana Book Agency (Rest)

GORAKHPUR—

1 Vishwa Vidyalaya Prakashan, Nakhas Road (Reg.)

GUDUR—

1 The General Manager, The N. D. C. Publishing & Ptg. Society Ltd. (Rest)

GUNTUR—

1 Book Lovers Private Ltd., Kadriguda, Chowrasta (Reg.)

GWALIOR—

1 Supdt. Printing & Stationery, M. B.
2 Loyal Book Depot, Patankar Bazar, Lashkar (Reg.)
3 M. C. Daftari, Prop. M. B. Jain & Bros., Booksellers, Sarafa, Lashkar (Rest)

HUBLI—

1 Pervaje's Book House, Koppikar Road (Reg.)

HYDERABAD—

1 Director, Govt. Press
2 The Swaraj Book Depot, Lakdikapul (Reg.)
3 Book Lovers Private Ltd. (Rest)
4 Labour Law Publication 878, Sultan Bazar (Rest)

IMPHAL—

1 Tikendra & Sons Bookseller (Rest)

INDORE—

1 Wadhawa & Co., 56, M. G. Road (Reg.)
2 Swarup Brothers', Khajuri Bazar (Rest)
3 Madhya Pradesh Book Centre, 41, Ahilya Pura (Rest)
4 Modern Book House, Shiv Vilas Palace (Rest)
5 Navyug Sahitya Sadan, Publishers & Booksellers, 10, Khajuri Bazar (Rest)

JABALPUR—

1 Modern Book House, 286, Jawaharganj (Reg.)
2 National Book House, 135, Jai Prakash Narain Marg (R.)

JAIPUR—

Government Printing and Stationery Department, Rajasthan
Bharat Law House, Booksellers & Publishers, Opp. Prem Prakash Cinema (Reg.)
Garg Book Co., Tripolia Bazar (Reg.)
Vani Mandir, Sawai Mansingh Highway (Reg.)
Kalyan Mal & Sons, Tripolia Bazar (Rest)
Popular Book Depot, Chaura Rasta (Reg.)
Krishna Book Depot, Chaura Rasta (Reg.)
Dominion Law Depot, Shah Building P. B No. 23 (Rest)

JAMNAGAR—

1 Swadeshi Vastu Bhandar (Reg.)

JAMSHEDPUR—

1 Amar Kitab Ghar, Diagonal Road, P.B. 71 (Reg.)
2 Gupta Stores, Dhatkidih (Reg.)
3 Sanyal Bros., Booksellers & News Agents, Bistapur Market (Rest)

JAWALAPUR—

1 Sahyog Book Depot (Rest)

JHUNJHUNU—

1 Shashi Kumar Sarat Chand (Rest)
2 Kapram Prakashan Prasaran, 1/90, Namdha Niwas, Azad Marg (R.)

JODHPUR—

1 Dwarka Das Rathi, Wholesale Books and News Agents (Reg.)
2 Kitab Ghar, Sojati Gate (Reg.)
3 Choppra Brothers, Tripolia Bazar (Rest)

JULLUNDUR—

1 Hazooria Bros., Mai Hiran Gate (Rest)
2 Jain General House, Bazar Bansanwala (Reg.)
3 University Publishers, Railway Road (Rest)

KANPUR—

1 Advani & Co., P. Box. 100, The Mall (Reg.)
2 Sahitya Niketan, Shradhanand Park (Reg.)
3 The Universal Book Stall, The Mall (Reg.)
4 Raj Corporation, Raj House, P. B. 200, Chowk (Rest)

KARUR—

1 Shri V. Nagaja Rao, 26, Srinivasapuram (Rest)

KODARMA—

1 The Bhagawati Press, P. O. Jhumri Tilaiya, Dt. Hazaribagh (Reg.)

KOLHAPUR—

1 Maharashtra Granth Bhandar, Mahadwar Road (Rest)

KOTA—

1 Kota Book Depot (Rest)

KUMTA—

1 S. V. Kamta, Booksellers & Stationers (N. Kanara) (Reg.)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

LUCKNOW—
1 Soochna Sahitya Depot (State Book Depot)
2 Balkrishna Book Co. Ltd., Hazratganj (Reg.)
3 British Book Depot. 84, Hazratganj (Reg.)
4 Ram Advani, Hazratganj, P. B. 154 (Reg.)
5 Universal Publishers (P,) Ltd., Hazratganj) (Reg.)
6 Eastern Book Co., Lalbagh Road. (Reg.)
7 Civil & Military Educational Stores, 106/B, Sadar Bazar (Rest)
8 Acquareum Supply Co.. 213, Faizabad Road (Rest)
9 Law Book Mart, Amin-Ud-daula Park (Rest)

LUDHIANA—
1 Lyall Book Depot, Chaura Bazar (Reg.)
2 Mohindra Brothers, Katchari Road (Rest)
3 Nanda Stationery Bhandar, Pustak Bazar (Rest)
4 The Pharmacy News, Pindi Street (Rest)

MADRAS—
1 Supdt., Govt. Press, Mount Road
2 Account Test Institute, P. O. 760 Emgore (Reg.)
3 C. Subbiah Chetty & Co., Triplicane (Reg.)
4 K. Kaishnamurty, P. B-384 (Reg.)
5 Presidency Book Supplies. 8, Pycrofts Road, Triplicane (Reg.)
6 P. Vardhachary & Co., 8 Linghi Chetty Street (Reg.)
7 Palani Parchuram, 3, Pycrofts Road, Triplicane (Reg.)
8 NOBH Private Ltd. 199, Mount Road (Rest)
9 V. Sadanand, The Personal Bookshop, 10, Congress Bldg. 111, Mount Road (Rest)

MADURAI—
1 Oriental Book House, 258, West Masi Street,
2 Vivekananda Press, 48 West Masi Street (Reg.)

MANDYA SUGAR TOWN—
1 K. N. Narimhe Gawda & Sons (Rest)

MANGALORE—
1 U. R. Shenoye Sons, Car Street, Post, Box 128 (Reg.)

MANJESHWAR—
1 Mukenda Krishna Nayak (Rest)

MATHURA—
1 Rath & & Co., Tilohi Bldg. Bengali Ghat (Rest)

MEERUT—
1 Prakash Educational Stores, Subhas Bazar
2 Hind Chitra Press, West Kutchery Road (Reg.)
3 Loyal Book Depot, Chhipi Tank (Reg.)
4 Bharat Educational Stores. Chippi Tank (Rest)
5 Universal Book Depot, Booksellers & News Agents (Rest)

MONGHYR—
1 Anusandhan, Minerva Press Bulding (Rest)

MUSSOORIE—
1 Cambridge Book Depot, The Mall (Rest)
2 Hind Traders (Rest)

MUZAFFARNAGAR—
1 Mittal & Co., 85-C, New Mandi (Rest)
2 B. S. Jain & Co., 71, Abupura (Rest)

MUZAFFARPUR—
1 Scientific & Educational Supply Syndicate (Reg.)
2 Legal Corner, Tikmanio Huuse, Amgola Road (Rest)
3 Tirhut Book Depot (Rest)

MYSORE—
1 H. Venkataramiah & Sons. New Statue Circle (Reg.)
2 Peoples Book House, Opp. Jagan Mohan Palace (Reg.)

MYSORE—
3 Geeta Book House, Booksellers & Publishers, Krishnamurthipuram (Rest)
4 News papers House, Lansdowne Building (Rest)
5 Indian Mercantile Corporation, Toy Palace, Ramvilas (Rest)

NADIAD—
1 R. S. Desay. Station Road (Rest)

NAGPUR—
1 Supdt., Govt. Press & Book Depot (Reg.)
2 Western Book Depot, Residency Road (Reg.)
3 The Asstt. Secretary, Mineral Industry Association, Mineral House (Rest)

NAINITAL—
1 Coural Book Depot, Bara Bazar (Rest)

NANDED—
1 Book Centre, College Law General Books, Station Road (Rest)
2 Hindustan General Stores, Paper & Stationery Merchants P. B. No. 51 (Rest)
3 Sanjoy Book Agency, Vazirabad (Rest)

NEW DELHI—
1 Amrit Book Co., Connaught Circus (Reg.)
2 Bhawani & Sons, 8F, Connaught Place (Reg.)
3 Central News Agency, 23/90. Connaught Circus (Reg.)
4 Empire Book Depot. 278 Aliganj (Reg.)
5 English Book Stores, 7-L. Connaught Circus P. O. B. 328 (Reg.)
6 Faqir Chand & Sons, 15-A, Khan Market (Reg.)
7 Jain Book Agency, C-9, Prem House, Connaught Place (Reg.)
8 Oxford Book & Stationery Co., Scindia House (Reg.)
9 Ram Krishna & Sons (of Lahore) 16/B, Connaught Place (Reg.)
10 Sikh Publishing House. 7-C, Connaught Place (Reg.)
11 Suneja Book Centre, 24/90, Connaught Circus (Reg.)
12 United Book Agency, 31, Municipal Market, Connaught Circus (Reg.)
13 Jayana Book Depot, Chhaparwala Kuan, Karol Bagh (Reg.)
14 Navayug Traders, Desh Bauhdu Gupta Road, Dev Nagar (Reg.)
15 Sarawati Book Depot. 15, Lady Harding Road (Reg.)
16 The Secretary, Indian Met. Society, Lodi Road (Reg.)
17 New Book Depot. Latest Books, Periodicals, Sty & Novelles, P. B. 96, Connaught Place (Reg.)
18 Mehra Brothers, 50 G, Kalkaji (Reg.)
19 Luxmi Book Stores, 42 Janpath (Rest)
20 Hindi Book House, 82 Janpath (Rest)
21 People Publishing House (P) Ltd., Rani Jhansi Road (Reg.)
22 R. K. Publishers. 23, Beadon Pura, Karol Bagh (Rest)
23 Sharma Bros. 17, New Market, Moti Nagar (Reg.)
24 Aspki Dukan. 5/5777, Dev Nagar (Rest)
25 Sarvodaya Service, 66A-1, Rontak Road. P. B. 2521 (Rest)
26 H Chandson, P. B. No. 3034 (Rest)
27 The Secretary, Federation of Association of Small Industry of India, 23/B/2, Rohtak Road (Rest.)
28 Standard Booksellers & Stationers, Palam Enclave (Rest)
29 Lakshmi Book Depot., 57. Regarpura (Rest)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATIONS

NEW DELHI—
30 Sant Ram Booksellers, 16, New Municipal Market, Lody Colony (Rest)

PANJIM—
1 Singhals Book House P. O. B. 70 Near the Church (Rest)
2 Sagoon Gaydev Dhoud, Booksellers, 5-7, Rua, 31 de Jameria (Rest)

PATHANKOT—
1 The Krishna Book Depot, Main Bazar (Rest)

PATIALA—
1 Supdt, Bhupendra State Press
2 Jain & Co., 17, Shah Nashin Bazar (Reg.)

PATNA—
1 Supdt. Govt. Printing (Bihar)
2 J. N. P. Agarwal & Co., Padri-Ki-Haveli Raghunath Bhawan (Reg.)
3 Luxmi Trading Co., Padri-Ki-Haveli (Reg.)
4 Moti Lal Banarsi Dass, Bankipore (Reg.)
5 Bengal Law House, Chowhatta (Rest)

PITHORAGARH—
1 Maniram Punetha & Sons (Rest)

PONDICHERRY—
1 M/s. Honesty Book House, 9 Rue Duplix (R.)

POONA—
1 Deccan Book Stall, Deccan Gymkhana (Reg.)
2 Imperial Book Depot, 266, M. G. Rd. (R.)
3 International Book Service, Deccan Gymkhana (Reg.)
4 Raka Book Agency, Opp. Natu's Chawl Near Appa Balwant Chowk (Reg.)
5 Utility Book Depot, 1339, Shivaji Nagar (Rest)

PUDUKOTTAI—
1 Shri P. N. Swaminathan Sivam & Co., East Main Road (Rest)

RAJKOT—
1 Mohan Lal Dossabhai Shah, Booksellers and Sub-agents (Reg.)

RANCHI—
1 Crown Book Depot, Upper Bazar (Reg.)
2 Pustak Mahal, Upper Bazar (Rest)

REWA—
1 Supdt., Govt. State Emporium V. P.

ROURKELA—
1 The Rourkela Review (Rest)

SAHARANPUR—
1 Chandra Bharata Pustak Bhandar, Court Road (Rest)

SECUNDERABAD—
1 Hidustan Diary Publishers, Market Street (Reg.)

SILCHAR—
1 Shri Nishitto Sen, Nazirpatti (Rest)

SIMLA—
1 Supdt, Himachal Pradesh Govt.
2 Minerva Book Shop, The Mall (Reg.)
3 The New Book Depot, 79, The Mall (Reg.)

SINNAR—
1 Shri N. N. Jakhadi, Agent, Times of India, Sinnar (Nasik) (Rest)

SHILLONG—
1 The Officer-in-Charge, Assam Govt., B. D.
2 Chapla Bookstall, P. B. No. 1 (Rest)

SONEPAT—
1 United Book Agency (Reg.)

SRINAGAR—
1 The Kashmir Bookshop. Residency Road (Reg.)

SURAT—
1 Shri Gajanan Pustakalaya, Tower Road (Reg.)

TIRUCHIRAPALLI—
1 Kalpana Publishers, Wosiur (Reg.)
2 S. Krishnaswami & Co., 35, Subhash Chandra Bose Road (Reg.)
3 Palamiappa Bros. (Rest)

TRIVANDRUM—
1 International Book Depot, Main Road (Reg.)
2 Reddear Press & Book Depot, P. B. No. 4 (Rest)

TUTICORIN—
1 Shri K. Thiagarajan, 10/C, French Chapal Road (Rest)

UDAIPUR—
1 Jagdish & Co., Inside Surajapolo (Rest)
2 Book Centre, Maharana, Bhopal Consummers, Co-op. Society Ltd. (Rest)

UJJAIN—
1 Manak Chand Book Depot, Sati Gate (Rest)

VARANASI—
1 Students Friends & Co., Lanka (Rest)
2 Chowkhamba Sanskrit Series Office, Gopal Mandir Road, P. B. 8 (Reg.)
3 Glob Book Centre (Rest)
4 Kohinoor Stores, University Road, Lanka (Reg.)
5 B. H. U. Book Depot (Rest)

VELLORE—
1 A. Venkatasubhan, Law Booksellers (Reg.)

VIJAYAWADA—
1 The Book & Review Centre, Eluru Road, Governpet (Rest)

VISAKHAPATNAM—
1 Gupta Brothers, Vizia Bldg. (Reg.)
2 Book Centre, 11/97, Main Road (Reg.)
3 The Secy. Andhra University, General Co-op. Stores Ltd. (Rest)

VIZIANAGARAM—
1 Sarda & Co. (Rest)

WARDHA—
1 Swarajeya Bhandar, Bhorji, Market (Reg.)

FOR LOCAL SALE

1 Govt. of India Kitab Mahal, Janpath, Opp. India Coffee House, New Delhi
2 Govt. of India Book Depot, 8 Hesting Street, Calcutta
3 High Commissioner for India in London, India House, London, WC. 2

RAILWAY BOOKSTALL HOLDERS

1 S/S. A. H. Wheeler & Co., 15, Elgin Road, Allahabad
2 Gahlot Bros. K. E. M. Road, Bikaner
3 Higginbothams & Co. Ltd., Mount Road, Madras.
4 M. Gulab Singh & Sons Private Ltd., Mathura Road, New Delhi

FOREIGN

1 S/S. Education Enterprise Private Ltd., Kathumandu (Nepal)
2 S/S. Aktie Bologat, C. E. Fritzes Kungl, Hovobokhandel, Fredsgation-2, Box 1656, Stockholm-16 (Sweden)

LIST OF AGENTS FOR THE SALE OF GOVERNMENT OF INDIA PUBLICATION

FOREIGN

3 Reise-und Verkehrsverlag Stuttgart, Post 730, Gutenoergstra 21, Stuttgart. No. 11245, Stuttgart den (Germany West)
4 Shri Iswar Subramanyam, 452. Reversite Driv Apt. 6, New York, 27 NWY •
5 The Proprietor, Book Centre, Lakshmi Mansons, 49, The Mall, Lahore (Pakistan).

ON S. AND R. BASIS

1 The Head Clerk, Govt. Book Depot, Ahmedabad
2 The Asstt. Director, Extension Centre, Kapileswar Road, Belgaum
3 The Employment Officer, Employment Exchange, Dhar
4 The Asstt. Director, Footwear Extension Centre, Polo Ground No. 1, Jodhpur
5 The O.I/C., Extesion Centre. Club Road, Muzaffarpur
6 The Director, Indian Bureau of Mines, Govt. of India, Ministry of Mines & Fuel, Nagpur
7 The Asstt. Director, Industrial Extension Centre, Nadiad (Gujarat)
8 The Head Clerk. Photozincographic Press, 5, Finance Road, Poona.
9 Govt. Printing & Stationery, Rajkot
10 The O. I/C Extension Centre, Industrial Estate, Kokar, Ranchi
11 The Director, S. I. S. I. Industrial Extension Centre, Udhna, Surat
12 The Registrar of Companies, Narayani Building, 27, Brabourne Road, Calcutta-1
13 The Registrar of Companies, Kerala, 50, Feet Road, Ernakulam
14 The Registrar of Companies, H. No. 3-5-83, Hyderguda, Hyderabad
15 Registrar of Companies, Assam, Manipur and Tripura, Shillong
16 Registrar of Companies, Sunlight Insurance Bldg. Ajmeri Gate Extension, New Delhi
17 Registrar of Companies, Punjab and Himachal Pradesh, Link Road, Jullundur City
18 Registrar of Companies, Bihar, Jamal Road, Patna-1
19 Registrar of Companies, Raj. & Ajmer; Shri Kamta Prasad House, 1st Floor, 'C' Scheme, Ashok Marg, Jaipur

ON S. AND R. BASIS

20 The Registrar of Companies, Andhra Bank Bldg. 6, Linghi Chetty St. P. B. 1530, Madras
21 The Registrar of Companies, Mahatma Gandhi Road. West Cott. Bldg. P. B. 334, Kanpur
22 The Registrar of Companies, Everest 100, Marine Drive, Bombay
23 The Registrar of Companies. 162, Brigade Road, Bangalore
24 The Registrar of Companies, Gwalior
25 Asstt. Director, Extension Centre. Bhuli Road, Dhanbad.
26 Registrar of Companies, Orissa. Cuttack Chandi, Cuttack
27 The Registrar of Companies, Gujarat State, Gujarat Samachar Bldg. Ahmedabad
28 Publication Division, Sale Depot, North Block, New Delhi
29 The Development Commissioner, Small Scale Industries, New Delhi
30 The O. I/C., University Employment Bureau, Lucknow
31 O. I/C., S. I. S. I. Extension Centre, Malda
32 O. I/C.. S. I. S. I. Extension Centre, Habra, Tabalaria, 24-Parganas
33 O. I/C, S. I. S. I. Model Carpentry Workshop, Piyali Nigar, P. O. Burnipur
34 O. I/C., S. I, S. I., Chrontanning Extension Centre, Tangra 33, North Topsia Road, Calcutta-46
35 O. I/C., S. I. S. I. Extension Centre (Footwear), Calcutta
36 Asstt. Director, Extension Centre, Hyderabad
37 Asstt. Director, Extension Centre, Krishna Distt (A. P.)
38 Employment Officer, Employment Exchange, Jhabua
39 Dy. Director Incharge, S. I. S. I., C/o., Chief Civil Admn. Goa, Panjim
40 The Registrar of Trade Unions, Kanpur
41 The Employment Officer, Employment Exchange, Gopal Bhavan, Mornia
42 The O. I/C., State Information Centre, Hyderabad
43 The Registrar of Companies, Pondicherry
44 The Asstt. Director of Publicity and Information, Vidnana Saubha (P. B. 271) Bangalore.

জম্বু প্রেস, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯, ভারত হইতে মুদ্রিত এবং দি ম্যানেজার অব্ পাবলিকেশনস্, সিভিল লাইনস্, দিল্লী হইতে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত।

মূল্য : ১৪ টা. ৫০ প. বা ৩৩ শি. ১০ পে. বা ৫ ডে. ২২ সে